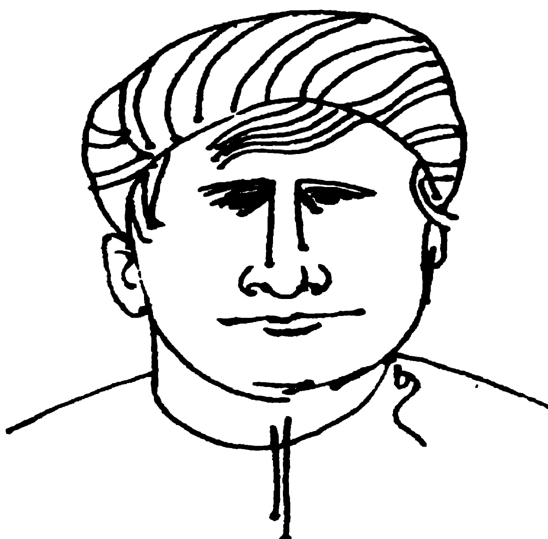
পূর্ণেন্দু পত্রী

ব • ঙ্কি • ম • যু • গ

প্রথম খণ্ড

১৮৩৮ – ১৮৫৮





দে'জ পাবলিশিং

১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট ।। কলকাতা ৭৩

BANKIMYUG (PART
by PURNENDU PATTRI
Published by Sudhangsu Sekhar Dey.
Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street Calcutta - 700 073

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বব ১৯৬০

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রকাশক :
সুধাংশুশেখব দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

শব্দগ্রন্থন :
অরিজিৎ কুমাব
লেজাব ইম্প্রেশনস
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৪

মুদ্রক :
বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায
দ্য ক্রিয়েশন
২৪বি/১বি ডা. সুরেশ সরকার রোড
কলকাতা ৭০০ ০১৪

মা-কে

বঙ্কিমের মতোই যিনি আর নেই

বঙ্কিমের মতোই যাঁর নিরন্তর থাকা

এই লেখকের অন্যান্য বই

আসুন বসুন
গত শতকের প্রেম
আমার রবীন্দ্রনাথ
কবিতার ঘর ও বাহির
পদ্য পাগলের পাণ্ডুলিপি
সাহিত্য সংক্রান্ত
কলকাতা সংক্রান্ত
সিনেমা সংক্রান্ত
শিল্প সংক্রান্ত
কিছু মানুষ কিছু বই
পুরনো কলকাতার কথাচিত্র

লেখকের কথা

বছর দশেক আগে কলকাতার বাইরে এক নিকটাত্মীয়ের বাড়িতে কাটাতে হয়েছিল কয়েকটা দিন। অখণ্ড অবসর। কিন্তু উপভোগের উপকরণ অপরিমিত। খোঁজ করি বইপত্রের। খুলে যায় বন্ধ আলমারির ডালা। ভিতরে গোটাপঞ্চাশেক বাংলা উপন্যাস। অধিকাংশই ছাপোষা। সেই অপাঠ্য বা অপ্রয়োজনীয় আবর্জনাস্তূপের ভিতরে হঠাৎ চোখে পড়ে এক রত্নখণ্ড। বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র উপন্যাস। অপবিসীম অযত্নে ছাপানো এবং বাঁধানো। তবু বাড়িয়ে দিই আগ্রহের হাত। আরেকবার খুঁটিয়ে বঙ্কিম-পাঠের পক্ষে এই তো আদর্শ সুযোগ। আগে যা পড়া, তার সবই যে হুবহু মনে আছে, এমন স্বীকারোক্তি মিথ্যাচার হতে বাধ্য। তা ছাড়া ইতিপূর্বের বঙ্কিম-পাঠ ধারাবাহিকতাহীন, এলোমেলো। যখন যেটা প্রয়োজনের, তার উপরেই ঝুঁকে পড়া প্রধানত। ৭৪-৭৫-এ তাঁর বইপত্র নিয়ে টুকটাক কিছু লেখার চেষ্টা করছিলুম হাল্কা চালে। তখনই বেশ-কিছু উপন্যাসের উপর চোখ বুলিয়ে যাওয়া। কিন্তু তখনো উপন্যাসের তটভূমি পেবিয়ে সমুদ্রস্নানের দিকে যত না এগিয়ে যাওয়া, তার চেয়ে তটভূমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে তথ্যের দরকারী ঝিনুক কুড়োনোটাই ছিল আসল অভিপ্রায়। এখন কেবল পড়াব জন্যে পড়া। অতএব পড়ায় ডুবি।

তিন দিন পরে যখন পড়া শেষ, যেন নেশাগ্রস্ত। যুক্তি, বিচারবোধ, প্রশ্ন, সন্দেহ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সব-কিছুকে দামোদরের বন্যা-তোড়ে ভাসিয়ে, চেতনার স্তরে স্তরে, চেতনাকেও অচেতন করে দিয়ে, অন্তর্চেতনার কোষে কোষে আচ্ছন্ন, অভিভূত, অতলগর্ভ এক অনুকম্পন। প্লাবিত অনুভবের সেই নির্জ্জান মুহূর্তে মনে হয়েছিল যেন নতজানু বসে আছি এমন এক ভারতবর্ষীয় মহাপুরুষের সামনে, বহ্নিমান পর্বত-সদৃশ যাঁর মূর্তির মহিমা। এমনই অহংকার-অলংকৃত তাঁর গাম্ভীর্যময় উপস্থিতি যে, কোনো স্তব বাক্য উচ্চারণও বুঝি বা শ্রদ্ধার পক্ষে সৌজন্যহীন। একমাত্র মগ্ন অবলোকন, একমাত্র মুগ্ধ আস্বাদনই বুঝি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উপযুক্ত পুষ্পচন্দন।

নিকটাত্মীয়ের বাড়িতে দিনযাপনের পালা শেষ। ফিরে আসি শহরে, কর্মক্ষেত্রে, জীবনের জটিলতায়। বঙ্কিম-মুগ্ধতা তলিয়ে যেতে থাকে চেতনাতলে। চিন্তা হয়ে যেতে থাকে বেদেনির ঝাঁপি। ডালা খুললেই বেরিয়ে আসে ছোটো-বড়ো-মাঝারী মাপের সাপ। অর্থাৎ প্রশ্ন, সন্দেহ, অনুযোগ, অভিযোগ, অসন্তোষ, এমন-কি আংশিক অতৃপ্তি। ছোবল এড়াতে খুঁজি বিষ-নিরোধী শিকড়। শিকড় খোঁজা মানে মুগ্ধ পাঠের পরিবর্তে এবার অন্য অন্বেষণ। অন্যান্যদের ভাবনার সঙ্গে নিজেকে মেলানোর চেষ্টা। খুঁটিয়ে দেখা। যতটা পারা যায় ভিতরের দিকে তাকানো। যতটা সম্ভব তাঁকে তাঁর চারপাশের সঙ্গে মেলানো। তাঁর হাতে-পায়ে-কলমে কতখানি শিকল জড়ানো, তারই সমান্তরালে দেখতে যাওয়া নিজের সময়ের শিকলকে একা তিনি ভেঙেছেনই বা কতখানি।

একটু এগোই। অনেকখানি থামি। এগোতে গেলেই হাঁপ ধরে যায় বুকে। মনে হয় শ্বাসকষ্টের রুগিকে বলা হয়েছে পাহাড়ে ওঠো। আর যত সে ওঠে ওপরে, তাকে জড়ায় জটিলতা, জড়ায় পাহাড়ি জঙ্গল, ক্রমে যা ঘন অরণ্য। নিস্তারহীন এক অভিযানে এইভাবে লিপ্ত হতে গিয়ে সে বুঝতে পারে দর্জির ফিতে দিয়ে পাহাড়-চূড়ো মাপতে এগোনো কতখানি ভ্রান্তিবিলাস।

অতঃপর আর বঙ্কিম নিয়ে মাতব্বরি নয়। তিনি থাকুন তাঁর যথাযোগ্য বেদীতে, তাঁর নিজস্ব সিংহাসনে সমাসীন। অক্ষম, অনুপযুক্ত, অনধিগত আমি প্রস্থান করি অভ্যস্ত জগতের নিরাপদ গণ্ডীর আড়ালে। কেবল টুকটাক্ খুচরো কিছু লেখার মধ্যেই চিহ্নিত হয়ে থাক আমার খণ্ডিত বঙ্কিম-চর্চা।

রবীন্দ্রনাথের গানে শুনি, তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি। এ তো ঘটে, ঘটছেই অহোরাত্র। কিন্তু আমার বেলায় যেটা ঘটছিল সেটা না-পূজার ছলে না-ভুলে থাকা। আমি যদি বা ভুলি, ভুলতে দেন না শ্রদ্ধেয় একজন। তিনি শঙ্করীপ্রসাদ বসু। যখনই এবং যেখানেই দেখা হবে, অন্যান্য কথাব শেষে বলবেনই, আপনি বঙ্কিম নিয়ে লেখা থামাবেন না। তাঁর প্রকাশ্য অনুরোধের গভীর স্তরে যেন মিশে থাকত গোপন আদেশ। বঙ্কিম সংক্রান্ত কিছু খুচরো লেখার তিনি ছিলেন সহৃদয় পাঠক। অকৃপণ ছিলেন প্রশংসায়। উদারতা ছিল উৎসাহ জোগানোয়। তাঁর নানান সময়ের অনুরোধের তাপে চাঙ্গা হয়ে উঠতে চেয়েছে ঝিমোনো উত্তেজনা। তখনই নাড়াচাড়া বঙ্কিম নিয়ে তথ্যের তত্ত্বের বই। যত পড়ি বা যতটুকু, সহজ ধারণা যায় বেঁকে, অথবা সহজের কাছে পৌঁছবার রাস্তাটা হয়ে যায় এমনই লম্বা থৈ নেই যার শেষের। সাঁতার না-জানা মানুষের কাছে যেমন নদী-সমুদ্র, বঙ্কিম ক্রমশই আমার কাছে তেমনি। ভীষণ আকর্ষণ সত্ত্বেও, উদবেগ-আতঙ্ক আর সংকটের সম্ভাবনায় শিউরে শিউরে ওঠা। অতএব বঙ্কিম-ভাবনায় ইতি। লিখে যাই আর সব সাত-পাঁচ।

তা হলে প্রশ্ন, 'বঙ্কিমযুগ'-এ পৌঁছলুম কী করে? উত্তরটা বেশ জটিল। নানান লতাগুল্মে জড়ানো। তবু জট খুলে আন্দাজ দিই খানিকটা।

৮৭-তে ভীষণ অসুখ। হাসপাতাল থেকে বাড়িতে কিঞ্চিৎ সুস্থ হয়ে ফিরলেও ডাক্তারের কড়া নির্দেশ কমপক্ষে টানা পনেরো দিন বেডরেস্ট-এর। মরা রক্ত পুনরায় জ্যান্ত হয়ে নড়ে-চড়ে উঠলে, ডাক্তারি অনুশাসনকে খানিকটা অমান্য করেই, হাত-পা এবং মাথার কাজে মাতি। যদিও কোনোটাই তেমন গুরুভার নয়। দিনে রঙিন চট কেটে কেটে ওয়াল হ্যাঙ্গিং বানানো। সন্ধের পর এ-বই সে-বই নিয়ে চোখ বোলানো। পড়া নয়, আলগা হয়ে ভাসতে থাকা অক্ষরের থৈ থৈ জলে।

এভাবে ভাসতে ভাসতেই হঠাৎ এক বিস্ময়কর সিদ্ধান্তের ডাঙায় আবিষ্কার করে বসি নিজেকে। দেখি যে হাত দিয়ে বসেছি তারিখ অভিধান রচনায়। মনে মনে বলি, বানাব উনবিংশ শতাব্দীর দিনপঞ্জী। রাক্কস-খোক্কস-এর মতো এরকম সর্বগ্রাসী কাজের নেশা কেন যে চেপে বসল আমার দুর্বল ঘাড়ে, তারও কারণ ছিল কিছুটা। কাছাকাছি সময়ে এমন কিছু লেখাজোখা, কখনো বইয়ে কখনো প্রবন্ধে, নজরে আসছিল বার বার যেখানে আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের সম্পর্কে শ্রদ্ধাহীনতাটা প্রকট থেকে প্রকটতর। অতি বিপ্লবাত্মক মূল্যায়নের ছোরা-ছুরি-বল্লমে মনীষী মাত্রেরই দেহ ক্ষতবিক্ষত, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্নভিন্ন। ধড় থেকে মাথা মাটিতে গড়াগড়ি খেয়েছে কোনো কোনো বীরদর্প-প্রাবন্ধিকের এক কোপের অস্ত্রাঘাতে। পড়ি আর এক বুক অসহায়তার ভিতরে লালন করে চলি ছাই-চাপা আগুনের মতো আক্ষেপ। ব্যক্তিগত সে আক্ষেপের কারণ মোটামুটিভাবে তিন।

১। যে-সময়কে নিয়ে সমালোচনা, চিনি কি সে সময়কে?

২। যে মনীষীদের উপর হামলা, তাঁদের জানা আছে কি বিশদ?

৩। উনিশ শতককে বিশদরূপে জানা যাবে, স্পষ্ট অনুভব করা যাবে তার ক্রমিক উত্থান অথবা পতন, তেমন বই আছে কি কোথাও?

আগে সময়টাকে চিনি, তারপর সময়ের নায়কদেব চেনার দিকে এগবো, মনে মনে এই রকম একটা চোরা-মতলব এঁটেই শুরু করে দিই দিনপঞ্জী রচনার কাজ, নিজের নিয়মিত কাজ-কর্মের বাইরে, কখনো বা তেমন উৎসাহ-তাড়িত হলে, জরুরি করণীয়কেও অগ্রাধিকার-চ্যুত করে। এইভাবে বোধহয় বছর দেড়েক। তারপর শিথিল হতে থাকে উৎসাহ-গ্রন্থী। ভিন্নতর কাজের চাপ ছিনিয়ে নেয় দিনপঞ্জীর কাজে মনঃসংযোগের অবসর। আরও অবাক কাণ্ড, নিজেরও মনে হতে থাকে কখনো কখনো, কাজটা শৌখিন মজদুরি-মার্কা। বন্ধ হয়ে গেলে খুব একটা ক্ষতি ঘটবে না কোনোখানে।

২

বন্ধ করে দিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত। ঝঞ্ঝাট-মুক্ত। হঠাৎ একদিন, প্রায় ঘুমিয়ে-থাকা স্থির জলে, জলের অন্তস্থল থেকে, উপরিতলকে ঈষৎ কাঁপিয়ে, বুদবুদের পর বুদবুদ। কী বলতে চায় এরা? নতুন কী এমন পরামর্শ জোগানোর জন্যে এদের আকস্মিক আকুলতা? পরামর্শে কান পাতি। বাঃ, বেশ তো লাগছে শুনতে। আগের চেয়ে বেশ তাৎপর্যে রাঙানো। দিনপঞ্জীটা হবে না উনবিংশ শতাব্দীর। হবে বঙ্কিম-কেন্দ্রিক। বঙ্কিমের জীবনের আদি আর অন্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে এর পরিসর। তা হলে আবার সেই বঙ্কিমে ফিরে যাওয়া? আবার সেই বৃহতের হাতছানিতেই সাড়া দেওয়া? সাড়া দিই ঠিকই। সেইসঙ্গে সচেতন থাকি নিজের অক্ষমতার মাত্রায়। তাই, শুরুতেই সিদ্ধান্ত, সম্পূর্ণ নয়, নানা খণ্ডে ভাগ করে এগোতে হবে তাঁর জীবনী রচনায়। প্রথম খণ্ডের সময়সীমা হবে মাত্র কুড়ি বছর। ১৮৩৮ থেকে ৫৮। আদৌ দুরূহ হবে না কাজটা। কেননা প্রথম কুড়ি বছরের বঙ্কিম, কিঞ্চিৎ কবিতাচর্চা সত্ত্বেও, না কবি, না কথাশিল্পী, না প্রতিভাবান কেউ, না কলকাতার নায়কগোষ্ঠীর একজন। ১৮৫৭ পর্যন্ত তাঁর প্রধানতম ও একমাত্র পরিচয়, ছাত্র। ১৮৫৬ পর্যন্ত প্রধান বাসভূমি নৈহাটি থেকে নদীর ওপারের হুগলি কলেজ পর্যন্ত

তাঁর যাতায়াতের সীমা। দূর শৈশবে ব্যতিক্রমের মধ্যে শুধুই মেদিনীপুর। ১৮৫৭-য় যখন বি. এ. পরীক্ষা দিতে কলকাতায়, তখনো কলকাতাকে চিনে নিতে তেমন কোনো চঞ্চলতা নেই তাঁর। পত্রিকা মারফত যাঁদের কথা কানে বা মনে পৌঁছে থাকবে, বিন্দুমাত্র আগ্রহের কম্পন-শিহরন নেই তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার। এমন-কি ছুটছেন না নাগরিক বহুবিধ উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক সমাবেশে। গায়ে লাগুক নানান সভা-সমিতির অধিবেশনের উষ্ণ তাপ, এও তাঁর অনিচ্ছার অন্তর্গত। ৫৮য় পরীক্ষা দিয়ে বি. এ. পাস করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর অনাগ্রহের মুঠোয় আপনা থেকেই ধরা দেবে রুপোলি রঙের যে পাখিটি, তার নাম ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও তৎসহ ডেপুটি কালেকটর-এর চাকরি। অনিচ্ছাসত্ত্বেও গ্রহণ করতে হবে যাকে প্রধানত বাবার আদেশে। চাকরি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতা ছেড়ে যশোহরে। অর্থাৎ তাঁর জীবনের এই প্রথম কুড়িটা বছরে কলকাতার বাস্তবতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ঘটল না কখনো।

তা হলে খুব কি আর জটিল এই কুড়িটা বছর? বা ঘটনাবহুল? বা আত্মনির্মাণের সংঘাত-ধ্বনিতে সশব্দ? তা যখন নয়, তখন সহজেই সামলিয়ে নেওয়া যাবে এ-পরিকল্পনা। কিন্তু হাতে-কলমে কাজ করতে দেখি, এ তো সাতকাণ্ড রামায়ণ। দেখি, যত এগোন যায়, জড়ো হতে থাকে বলবার, ভাববার, সংযোজনের, সংশোধনের উপকরণ। অথচ এও এক আশ্চর্য—তাঁকে নিয়ে হাতে-গোনা যে-কটি জীবনী, সেখানে তাঁর এই ছাত্রজীবনটা দ্রুতটানের রেখায় আঁকা চটজলদি স্কেচের মতো। বাদী-বিবাদী রঙের ঘনিষ্ঠ বিন্যাসে তৈলচিত্রের মতো ডিটেলে ডিটেলে উদভাসিত নয়। অথবা নয় ভাস্কর্যের মতো মণ্ডলাকার, যাকে দেখা যাবে ত্রি-মাত্রিক আলো-ছায়ার জটিল বুনোটে। কোনোমতে শৈশব-কৈশোরটাকে চিনিয়ে দিয়েই জীবনীকারেরা দৌড়তে বা দৌড়ে পৌঁছতে চেয়েছেন তাঁর যৌবনে, যখন তিনি লেখক। যেন লেখক হওয়ার পর থেকেই তাঁর চর্চাযোগ্য জীবনের শুরু। এখানেও কিঞ্চিৎ মজা। লেখক-হয়ে-ওঠা মাত্রই আলোচ্য অথবা বিবেচ্য নন তিনি তেমন। 'রাজমোহনস ওয়াইফ' তো নয়ই, এমন-কি 'দুর্গেশনন্দিনী'ও মন টানে না সমালোচকদের। কোনোমতে, বলতে হয় তাই বলার ভঙ্গিতে দায়টা সেরেই 'কপালকুণ্ডলা'-র পাশে। যতক্ষণ না লিখছেন এই বিস্ময়কর উপন্যাসটি, ততক্ষণ যেন তিনি খড়-দড়ি-কাদা মাটির কাঠামো, প্রণম্য প্রতিমারূপ সম্পূর্ণ হতে সামান্য বাকি। অথচ, 'রাজমোহনস ওয়াইফ'-এর দিকেও তাকানো উচিত ছিল আমাদের আরো একটু আগ্রহে ঝুঁকে, যতই তা লেখা হোক বিদেশী ভাষায়, যতই স্মরণীয় সৃষ্টির মর্যাদা দুর্লভ হোক তার ববাতে। ইংরেজি ভাষা ছেড়ে বাংলায় উপন্যাস লিখবেন যখন এর পরে পরে, তাদের গড়ন-গঠনের অনেক আদি বীজ-কণা মিলে যাবে এখানে। আরেক ভাবেও বলা যেতে পারে কথাটা। বঙ্কিম যা হয়ে উঠবেন পরে, তাঁর মনে-মননে, তার প্রথম মহড়াটা যেন এখানেই। তথ্যসন্ধানের, তথ্যবিচারের, তথ্য সংঘাতের ঝক্কি সামলিয়ে কাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যেতেই টের পাই, তেমন স্ফুলিঙ্গময় না হয়েও তাঁর এই প্রস্তুতিপর্বের জীবনটাও কত ভাবেই না অনুধাবনযোগ্য, কত কার্যকারণসূত্রেই না দারুণ কোনো দলিলের মতো মূল্যবান। এই মূল্য মাপামাপির সম্বন্ধে অতিরিক্ত সচেতনতাই আমাকে আতঙ্কিত করে রাখে সারাক্ষণ। লিখিত পাণ্ডুলিপি ছাপাখানার দরজায় পৌঁছিয়ে দিয়েও নিস্তার মেলে না ভুল-ভ্রান্তি সংক্রান্ত উদবেগের পীড়ন থেকে। কেবলই মনে হয়েছে হয়তো উদ্ধার করা হয় নি এমন কিছু যা পেলে বেড়ে যেতে পারত আরো খানিকটা আলোর ঝলক, তাঁকে চিনবার। হয়তো অজস্র ফাঁক-ফোকর থেকে গেছে তথ্য সংগ্রহে, তথ্যের সংযোজনে। হয়তো হাত বাড়িয়েও

ছুঁতে পারি নি অজানা কোনো দরজা খোলার চাবি। তবুও বঙ্কিম আর তাঁর দিনপঞ্জীর বেলায় থামতে পারা গেছে একটা সীমায় পৌঁছে। কিন্তু এ বইয়ে পরিকল্পিতভাবেই তাঁর ব্যক্তিগত দিনপঞ্জীর সমান্তরালে সারা দেশের যে দিনপঞ্জীকে নির্মাণ করে যাওয়ার চেষ্টা, সে যেন এমনই এক রেলগাড়ি, যার থামার স্টেশন নেই কোনোখানে। দ্রৌপদীর শাড়ির মতো ক্রমাগত টেনে যাওয়ার পরও পাহাড়-প্রমাণ রয়ে যায় তার বাকি-থেকে-যাওয়া। বই ছাপাতে হলে বাধ্যতামূলকভাবেই থামতে হয় কোথাও। আবার থামতে গিয়ে প্রশ্নের খোঁচা, বঙ্কিমের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সমান পদক্ষেপে এগিয়ে চলা তাঁর সমসময়ের এই দিনপঞ্জীতে ঐতিহাসিক মুহূর্তগুলো চিহ্নিত হয়েছে তো যথাযথ? বঙ্কিমের জীবনের প্রত্যেকটি বছরের সঙ্গে জুড়ে থাকা সমসময়ের এই দিনপঞ্জীকে এ বইয়ে খুব বড়ো একটা ভূমিকায় প্রতিষ্ঠা করতে চাওয়া তো এই কারণেই যে এ থেকে বঙ্কিম-প্রতিভার ক্রমবিকাশের স্তরগুলোই চেনা হবে না কেবল, চেনা যেতে থাকবে সামাজিক উপাদানকে আত্মস্থ করার কুশলতাও। ডেপুটির চাকরিতে যোগ দেওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যে বঙ্কিমকে মনে হতে থাকে নিজের চারপাশ সম্পর্কে নিদারুণ রকমের উদাসীন, ঔপন্যাসিকরূপে আবির্ভাবের পর, উপন্যাস ছাড়িয়ে প্রাবন্ধিক, প্রবন্ধ ছাড়িয়ে দার্শনিকতার দিকে ধাপে ধাপে যত তাঁর এগিয়ে-চলা, ততই আমাদের বিস্মিত হতে হয় তাঁর সামাজিক-সচেতনতায়, সামাজিক-জিজ্ঞাসার নানান ফুলকিতে মশালের মতো দাউ দাউ জ্বালিয়ে দেওয়ার সাহসিকতায়।

৩

তাঁর প্রয়াণের পর কেটে গেছে ২৮ বছর ২ মাস ৯ দিন। ১৯২২-এর ১৮ জুন। সাহিত্য পরিষদে বিশেষ নবম অধিবেশন। উপলক্ষ, বঙ্কিমের মর্মর মূর্তির প্রতিষ্ঠা। সভাপতি, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তাঁব ভাষণের শেষাংশেই সম্ভবত প্রথম ধরা পড়ল বঙ্কিম-চরিত্রের সেই জঙ্গমতা, কালস্রোতে ভাসতে ভাসতেও যা উদঘাটন করে চলে পরিবর্তিত নানান রূপের উজ্জ্বলতা।

প্রয়াণের আগে বঙ্কিম জানিয়ে গিয়েছিলেন, মৃত্যুর পর ১২ বছর না পেরোলে কেউ যেন উদ্যোগী না হয় তাঁর জীবনীরচনায়। প্রয়াণের পর ১২ বছব মানে ১৯০৬। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলন তখন তুঙ্গে। আর সে আন্দোলনেব বণসংগীত 'আনন্দমঠ'-এর গান 'বন্দেমাতরম'। আর সে আন্দোলনের রণধ্বনিও ঐ— 'বন্দেমাতরম'। ভারতবর্ষ আর বিশেষ করে বাংলাদেশের অতি-অস্থির রাজনীতির প্রাঙ্গণে মূর্তিহীন বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটেছে তখন যেন এক মহাযুদ্ধের মন্ত্রদাতা উদবোধকরূপে। সাহিত্যের বঙ্কিম সেনাপতিত্বে। হবপ্রসাদ তাঁর ভাষণের শেষাংশে বলছেন সেদিন—

> "তখন লোকে বুঝিল, তিনি কি ছিলেন— তাঁহার দূরদৃষ্টি কত তীক্ষ্ণ ছিল। এতদিন তিনি কবি ছিলেন, লেখক ছিলেন, উপন্যাসলেখক ছিলেন, ইতিহাস লেখক ছিলেন। এখন লোকে দেখিল, তিনি ঋষি ছিলেন, Saint ছিলেন, তিনি সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। এতদিন লোকে তাঁহাকে লৌকিকভাবে দেখিত, এখন তাঁহাকে অলৌকিক বা লোকোত্তরভাবে দেখিল। এতদিন তাঁহাকে মানুষ বলিয়া জানিত, এখন তাঁহাকে অতিমানুষভাবে জানিল।... এতদিন তাঁহার সম্ভোগকায় দেখিয়াছিল, নির্মাণকায়

দেখিয়াছিল, এখন কেবলমাত্র তাঁহার ধর্মকায় দেখিতেছে। এখন তাঁহার নবেলগুলির প্রত্যেক অক্ষরে নূতন নূতন মানে দেখিতেছে; তাঁর ধর্ম্মতত্ত্বে, গীতারহস্যে নূতন নূতন মানে দেখিতেছে, এমন কি, তাঁহার লোক-রহস্যের মধ্যে অন্তর্নিহিত গূঢ় অর্থ দেখিতেছে।”

এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকের গোড়ায় যা বলেছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এখন, শতাব্দীর শেষ হওয়ার দু-তিন দশক আগে থেকেই মুছে যেতে শুরু করেছ বঙ্কিমের সে ঋষি-রূপ। তাঁদের সময়ের লোকোত্তর প্রতিভাকে আমাদের সময় টেনে আনতে চাইছে লোকসমাজের কেন্দ্রে। মহামানবকে দেখতে চাইছে এখন এক মানবপুত্র হিসেবে যিনি একই সঙ্গে মুক্তিদাতা এবং শৃঙ্খলিত। আরো চুল চিরেও দেখতে চাইছেন কেউ কেউ, তিনি সত্যি সত্যিই কোনো টলটলায়মান বিগ্রহ কিনা। প্রশ্ন উঠছে। ওঠাটাই স্বাস্থ্যকর। ধরা পড়ছে সীমাবদ্ধতা। পড়তেই পারে। চিহ্নিত হচ্ছে স্ববিরোধীতা। সৃষ্টিশীল প্রতিভার পক্ষে অস্বাভাবিক বা অমার্জনীয় অপরাধ নয় সে-সব। কিন্তু এ-সবকেও ছাড়িয়ে যেতে চায় কোনো কোনো উদ্যম। বঙ্কিমের মূর্তিটাকে বানানো যেতে পারে কতখানি খর্ব করে, সেটাই যেন এক উল্লসিত অভিপ্রায়। অবশ্য সত্যসন্ধানী অবলোকনে ধরাও পড়ে যায় তত্ত্বপ্রয়োগের এই-সব কৃত্রিম কসরৎ।

“এই কারণে বাঙ্গালী সমাজে বঙ্কিমবাবুকে সরাসরি কটাক্ষে বা পরোক্ষ শ্লেষে কি ভাবে হেয় করা যায়, তাঁর প্রচার ও প্রতীতিকে ভঙ্গুর প্রমাণ বা কিভাবে ক্ষুণ্ন করা যায়, তার জন্যে আজও চেষ্টা চলছে। বঙ্কিমের ভাবমূর্তিতে যাতে কাদা লেগে থাকে সে-চেষ্টার কসুর আমরা করি না।”

এই বেদনাবিদ্ধ উচ্চারণ একজন বিশিষ্ট বামপন্থী বুদ্ধিজীবীর, যিনি অর্থনীতিবিদ হিসেবে অধিকতর খ্যাত। প্রাবন্ধিক অশোক মিত্র তাঁর ‘নারী সাম্য ও বঙ্কিমচন্দ্র’ নামের প্রবন্ধে উদাহরণ দিয়েছেন মাত্র দুটি খাতের, সোজা বঙ্কিমকে বাঁকিয়ে-চুরিয়ে বিকৃতকায় করে দেখানো যায় যাতে। তার প্রথমটি, ডেপুটিগিরি। দ্বিতীয়টি মুসলমান বিদ্বেষ। ডেপুটিগিরি হল সেই শিকল যা দিয়ে তিনি ব্রিটিশ স্বার্থের সঙ্গে অচ্ছেদ্য। আর মুসলমান বিদ্বেষের মূলে অবশ্যই তাঁর গোঁড়া হিঁদুয়ানি।

মানুষের শরীরে সাময়িক কোনো ‘ইনফেকশন’-এর সংক্রমণ যেভাবে হয়ে ওঠে ধ্বংসাত্মক, সমাজ-চিন্তার ভিতরে ঢুকে-পড়া একবগ্গা রাজনৈতিক তত্ত্বনির্ভরতাও ঠিক ততখানিই ক্ষতিকারক। যত আন্তরিক কিংবা আভ্যন্তরিক উৎস থেকে উৎপত্তি হোক, শ্লোগান মাত্রেই সাময়িক। ব্যক্তি নিরপেক্ষ আর সৃজনশীল বস্তু নিরপেক্ষ কিছু শ্লোগানই টিকে থাকে খানিকটা দীর্ঘ সময়।

এক সময় সিনেমা বানাতাম। তখনকার অভিজ্ঞতায় ধরা পড়েছে একটা মজার ব্যাপার। সিনেমা বস্তুটা যতক্ষণ ধরে তৈরি হয়, ততক্ষণ মনে হতে থাকে, নির্মিত হচ্ছে দুর্দান্ত কিছু। যখন মুক্তিলাভ আসন্ন, তখন বুঝতে বাকি থাকে না যে, এ-এক নিশ্ছিদ্র মাস্টারপীস। আর যেই না শুভমুক্তি, যেই না হলঘরের দর্শকদের মুঠোয় গিয়ে পড়ল সে-মুক্তাফল, নিমেষে চিহ্নিত হয়ে গেল তার যাবতীয় দৈন্য-দুর্বলতা। বইয়ের বেলাতেও অনেকটা তাই। বিশেষত সেই জাতের বই, যেখানে বলবার কথাগুলো ওজনে কিছুটা ভারী। যতক্ষণ লেখালেখি থেকে ছাপাছাপি, মনের গোপনে সুড়সুড়ি— এ একেবারে এপিক। তারপর বাজারে বেরিয়ে পাঠক-সমালোচকের হাতের তালুর তাপ পাওয়া মাত্রই ধরা পড়তে থাকবে ত্রুটির পর ত্রুটি। ছাপার

ত্রুটি ধরা পড়বে, সেই সঙ্গে বানানের ত্রুটি। তথ্যের ভ্রান্তি ধরা পড়বে, সেই সঙ্গে তত্ত্বের বিকৃতি। অমনোযোগের পরিমাপ ধরা পড়বে, সেইসঙ্গে অবিবেচনার অপরাধ।
এতসব জেনেও এই কঠিনকে ভালোবাসা। অযোগ্য জেনেও এগোনো। পিছনে যদি প্রভাবিত হওয়ার সবচেয়ে সেরা প্রেরণা-মন্ত্রটিকে বাছতে বলা হয়, তা হলে সেটা হবে লিটন স্ট্রেচির, — অজ্ঞানতাকে অঢেল ভরসা জুগিয়ে দেয় যা। বলেছিলেন ঐতিহাসিকের পক্ষে প্রথম যা দরকার, সেটা "ইগনরেন্স"।

> "...ignorance which simplifies and clarifies, which selects and omits, with a placid perfection unattainable by the highest art."

৪

শেষ হতে গিয়েও ভূমিকাটা শেষ হল না এখানে। অনেক আগে পড়া 'ভবতোষ দত্ত'-র "চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র" বইখানা জোগাড় করে পাতা ওল্টাতে গিয়েই চমকাতে হয় খানিকটা। যে ৫৮-য় দাঁড়ি টানছি আমি এ-বইয়ে, ধরে নিচ্ছি বঙ্কিমের জীবনেব একটা পর্বের পরিসমাপ্তি হিসেবে এই ৫৮-কে বিশ্বাসযোগ্য মনে হতে পারে আমার মতো আরো কারো কারো, সেই ৫৮ সম্পর্কে ভবতোষবাবুর মূল্যায়ন আরো বড়ো মাপের। তিনি এই সালটাকে সনাক্ত করছেন বাংলার-ই একটা যুগের শেষ হিসেবে। এবং সন্দেহ নেই, সেটাও সত্যি। কেন শেষ বলছেন তিনি? কোন যুক্তিতে? কীভাবে সাজাচ্ছেন যুক্তি বিন্যাস?
রামমোহন থেকে শুরু। তাঁর প্রগতি-চিন্তার ক্রমবিস্তার। ইয়ংবেঙ্গল ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে মেশালে যুক্তির চর্চা। যুক্তিই হয়ে উঠল পুরোনো জীর্ণ সমাজের কাঠামো ভাঙার অস্ত্র। ইয়ংবেঙ্গল যখন ভাঙতে চাইছে, ধর্মসভা চাইছে পুরোনো মূল্যবোধের হাড়-কঙ্কালকে টিকিয়ে রাখতে। এই দুই পরস্পরবিরোধী শক্তির সংঘাতের মাঝখানে মধ্যপন্থী তত্ত্ববোধিনী সভা-র প্রতিষ্ঠা। ধর্মালোচনাকেও যুক্তির সীমানায় বাঁধতে চাইলেন অক্ষয়কুমার দত্ত আর বিদ্যাসাগর। ওদিকে নিজের পত্রিকা বিবিধার্থসংগ্রহের মাধ্যমে রাজেন্দ্রলাল মিত্র চাইছেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনায় আরো বেশি আগ্রহ। এ-সবের মাঝখানেই সচেষ্ট ভিন্ন এক শক্তি, ভিন্ন এক ধর্মের প্রচারে আর প্রতিযোগিতায়। মিশনারিদের খৃস্টধর্ম সেটা। এই ত্রিভুজ বা চতুর্ভুজ লড়াইয়ে জড়িয়ে কলকাতা এগোচ্ছে। পরিবর্তিত হচ্ছে। পরিণতও। হিন্দু কলেজ হয়ে গেল প্রেসিডেন্সি। স্থাপিত হযেছে সরকারি শিক্ষা বিভাগ। ১৮৫৪-য় লর্ড ডালহৌসি পাঠালেন শিক্ষা-বিষয়ের পরিকল্পনা। সুচিন্তিত মন্তব্য এল জন স্টুয়ার্ট মিলের কাছ থেকে। জন্ম নিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। বঙ্কিম সেখান থেকেই প্রথম উত্তীর্ণ হলেন বি.এ. পরীক্ষায়, যদুনাথ বসুর সঙ্গে। ঠিক এই সময়ে কলকাতার সমাজে নতুন চিন্তা রূপ নিচ্ছিল কীভাবে, তা জানাতে গিয়ে তিনি উদ্ধৃত করলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'বাংলার ইতিহাস' থেকে। এ থেকে আভাস পাওয়া গেল যে মিশনারিদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে নেমেই হিন্দুধর্ম পেয়ে গেল তাদের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাত হানার ব্রাহ্মধর্ম। ধর্মসভা আগাগোড়া সংস্কার-বিবোধী। হিন্দু ধর্ম, দেখে-শুনে, আরো একটু উদার হওয়ার অভিপ্রায়ে, মেনে নিলে দরকারি নানা-সংস্কার।
ভবতোষবাবুর আলোচনায় এরপর গুরুত্ব পাবে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। যিনি গোঁড়া থেকে আধুনিক হচ্ছেন ক্রমশ। আধুনিকতা তাঁকে প্রতিষ্ঠা পাইয়ে দিচ্ছে তখনকার বাঙালি সমাজের

প্রতিনিধিস্থানীয় হিসেবে। ঈশ্বর গুপ্তের রুচির পুরোপুরি সমর্থক না হয়েও বঙ্কিম তখন ঈশ্বর গুপ্তেরই তালিম-দেওয়া ছাত্র। অন্যদিকে ঈশ্বর গুপ্তও বঙ্কিমের দাম্পত্য-প্রণয়-প্রধান কবিতাবলীর পুনরাবৃত্তিতে অসন্তুষ্ট হয়েও বঙ্কিম সম্বন্ধে স্নেহকাতর। বঙ্কিমের জীবনে, এ-সবের চেয়েও 'সংবাদ প্রভাকর'-এর ভূমিকাটা ছিল আরো বড়ো মাপের। ভবতোষবাবুর সঠিক মন্তব্যকেই স্মরণ করছি এখানে।

> "সংবাদ প্রভাকর ছাড়া কলকাতার বিদ্বৎসমাজের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের আর কোনো যোগসূত্র ছিল কিনা সন্দেহ।"

ভবতোষবাবু এরপর সময় বা সামাজিক পটভূমি ছেড়ে বঙ্কিমের ব্যক্তিগত বিকাশের তথ্যচিত্র রচনায় ব্যস্ত। সে-তথ্যচিত্রে কোনো রকমের খামতি না থাকলেও বলব, তিনি এড়িয়ে গেছেন এমন এক প্রসঙ্গ, যাকে আলতোভাবে হলেও, না-ছুঁয়ে ১৮৫৮-কে বাংলার একটা যুগাবসানের বছর হিসেবে চিহ্নিত কবার প্রয়াস খণ্ডিত থেকে যেতে চায় যেন। সেটা অবশ্যই, সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী প্রতিক্রিয়া হিসেবে, স্বতন্ত্র আত্মবিশ্বাস আর আত্মগরিমা নির্ভর সাহিত্যের বিকাশ। সেইসঙ্গে তার ভাষা-সচেতনতারও বৈপ্লবিক উদ্যম। তখনই বাংলা সাহিত্যে রোপিত হতে চলেছে উপন্যাসের বীজ। তখনই সাহিত্যের ভাষাকে সংবর্ধনা জানাতে মালা গাঁথা হচ্ছে কথ্য ভাষার ফুলে। তখনই স্বাদেশিকতা, অথবা স্বদেশপ্রেম হয়ে উঠতে চাইছে সাহিত্যের প্রধানতম অবলম্বন।

১৮৫৮। এই বছরেই সরাসরি সাম্রাজ্যবাদের অধীনস্থ হবে ভারতবর্ষ। আর এই বছরেই এক অর্থে জাতীয় সাহিত্যের অভ্যুদয়।

৫

'চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র'-র দ্বিতীয় প্রবন্ধ — 'বঙ্কিমযুগের মনন-সাধনা'। এ প্রবন্ধের শুরুতেই ভবতোষবাবুর প্রশ্ন—

> "বঙ্কিমযুগ বলতে কোন্ সময়টাকে বোঝায়? যে সময় থেকে তিনি উপন্যাস লিখছিলেন, না, যে সময় থেকে বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রকাশ করলেন?" এ প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছেন তিনি। "এই হিসাবে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত সময়টিকে বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ বলে অভিহিত করা সম্ভব।"

এইটুকু পড়লে মনে হয় তিনি যেন মেনে নিতেই অনুরোধ জানাচ্ছেন এই সুনির্দিষ্ট সময়গ্রন্থীকেই। কিন্তু নিজেও যে অতখানি নিঃসন্দিগ্ধ নন, তা জানিয়ে দেন এর পরেব লাইনেই।

> "কিন্তু এটাও মনে রাখা দরকার, বঙ্কিমযুগের পূর্ব থেকেই অনেক চিন্তার বীজ বাঙালি মনীষার ক্ষেত্রে ছড়িয়ে ছিল। ক্ষেত্র শস্যপূর্ণ হয়েছে বঙ্কিমের সময়ে।"

এই দ্বিধাটাই স্বাভাবিক এবং সুস্থ বৈদগ্ধের অভিজ্ঞান। বৃহৎ কোনো প্রতিভার রাজত্বকালকে পাটিগণিতের ফরমুলা দিয়ে চিহ্নিত করতে চাওয়াটা স্বস্তিকর তো নয়ই, সম্ভবপর কিনা সেটাও প্রকাণ্ড প্রশ্ন।

আমরা যখন মানুষের সভ্যতার ইতিহাস পড়ি অথবা তা নিয়ে লিখতে চাই, তখন শুরু করি কোথা থেকে? নিশ্চয় ইতালির আলোকিত রেনেসাঁস থেকে নয়। তা শুরু হয় খৃস্টপূর্ব এবং অজ্ঞাতপূর্ব কোনো দিন-মাস-বছরের চিহ্নরেখাহীন সেই অতল অন্ধকার থেকে যখন

আদিমকালের আঁতুড়ঘরে সবে জন্ম নিয়েছে দুপেয়ে মানুষের চারপেয়ে বন্য পূর্বপুরুষেরা। আর সেই কারণেই 'স্টাডি অব হিস্‌ট্রি'-তে টয়েনবিকে লিখতে হয়—

> "...the factor which we are seeking to identify is something not simple. but multiple, not an entity, but a relation."

ভবতোষবাবু 'বঙ্কিমযুগ' চিহ্নিত করতে গিয়ে ভাবছেন বঙ্কিম-প্রতিভার চূড়ান্ত বিকাশের যুগ, বাংলাদেশের যুগভাবনাকে প্রস্তুত করে তোলার যুগ। আমি বঙ্কিমযুগ বলতে বোঝাতে চেয়েছি বঙ্কিমের সঙ্গে যুক্ত সময়, যার গর্ভে তাঁর জন্ম, যার ক্রোড়ে তাঁর ধারাবাহিক নির্মাণ। যে-বঙ্কিম বঙ্গদর্শনে 'কৃষ্ণচরিত্র' লিখবেন, তাঁর চেতনাকোষে-এর বীজ তো রোপণ হয়েছিল সেই সুদূর শৈশবে সালের হিসেবে যা ১৮৪৮। এই বছরেবই ফাল্গুনী পূর্ণিমার রাতে পণ্ডিত প্রবর হলধব চূড়ামণির মুখ থেকে কৃষ্ণকাহিনী শুনতে শুনতে কৃষ্ণ-সম্পর্কিত এক জটিল প্রশ্ন তুলে বঙ্কিম চমকিয়ে দিয়েছিলেন উপস্থিত পণ্ডিত সমাজকে। এরকম দৃষ্টান্ত আরো অনেক। বঙ্কিমের জন্মের ৫ বছর আগে রামমোহন আর ৭ বছর আগে ডিরোজিও-র প্রয়াণ ঘটলেও বঙ্কিমের চবিত্রে-চিন্তায় মনন-চর্চায় যুক্তিনির্ভরতার যে শক্ত গাঁথুনি, তার অনেকখানি উপাদানই ঐ দুই পূর্বসূরী-সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা থেকেই অর্জন করা।

আসলে 'বঙ্কিম যুগ'-এর অনুসন্ধানে আর তার প্রতিষ্ঠায় আমাদের দুজনের তাকানোটা দু-রকমেব অথবা দুটো ভিন্ন দিকে। ভবতোষবাবু 'বঙ্কিম যুগ' হিসেবে বোঝাতে চান সেই সময়-পরিধিকে, যা বঙ্কিমের দ্বারা রচিত, তাঁর কল্পনার ছোঁয়ায় উদ্দীপ্ত, তাঁর জোগানো বোধে উদ্‌বুদ্ধ, তাঁর মনীষার মন্ত্রে উজ্জীবিত। আর আমি বোঝাতে চেয়েছি সেই কালখণ্ডকে যা তাঁর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রসারিত, যা তাঁর ক্রমাগত নির্মিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে জুগিয়ে গেছে পরিপুষ্ট হয়ে ওঠার অন্নজল।

৬

বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যে সম্রাট। কিন্তু আত্মচরিতে, স্বেচ্ছায়, দরিদ্র। সাহিত্যকে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন সমাজেব অথবা মানুষের বৃহৎ পরিসরে। কিন্তু নিজের জীবন পাছে ব্যক্ত হয়ে পড়ে কোনোভাবে, লুকিয়ে রেখেছিলেন একান্তভাবে নিজের সত্তার গভীবে। নিজে তো লেখেননি কিছুই, পাছে কেউ তাঁর আত্মচরিতের ক্ষতিপূরণে লিখে বসে জীবনচরিত, তাই জারি করে দিয়েছিলেন এই নিষেধানামাও যে, প্রয়াণের পরে ১২ বছর পার না-হওয়া পর্যন্ত প্রকাশ করা চলবে না তাঁর জীবনচরিত। এখন সে নিষেধনামা অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু এখন জীবনচরিত রচনার মালমশলা হয়ে গেছে নিদারুণ রকমের সীমিত। এ-সব জানার পরও কোনো কোনো সংবাদে নড়ে-চড়ে বসতে হয় কিছুটা। বঙ্কিমের আত্মচরিত আর জীবনচরিত নিয়ে কৌতূহলজাগানো তেমন দুটি সংবাদ খুঁজে পাওয়া গেল 'শনিবারের চিঠি'র বঙ্কিম সংখ্যায়, যা ঐ পত্রিকার ১০ বর্ষের ৯ সংখ্যা। সাল ১৩৪৫। মাস আষাঢ়।

> "বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পূর্ণ জীবনেতিহাস আজও অলিখিত থাকার পুরা অপরাধ বাঙালী জাতির নহে ; বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং আপনার কীর্তিকে পুরোভাগে স্থাপন করিয়া আপনি অন্তরালে থাকিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের দৌহিত্র দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শনে'-র ১৩১৮ আষাঢ় সংখ্যা হইতে 'বঙ্কিম-চরিত' রচনার নামে যে ছেলেখেলা করেন (পাঁচ সংখ্যা ধরিয়া) তাহার সূত্রপাতে

লিখিয়াছেন, "মাতামহদেব স্বর্গারোহণের সময় বলিয়া গিয়াছিলেন যে, দ্বাদশ বৎসরের পূর্বে যেন কেহ তাঁহার জীবনচরিত না লেখে। ঠিক দ্বাদশ বৎসরের পরেই স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল, দেশের লোক তখন হইতে সেই সাহিত্য-সম্রাটকে 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের ঋষিজ্ঞানে অধিকতর ভক্তিভরে পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সে মহাপুরুষ কি উদ্দেশ্যে তাঁহার জীবনচরিত দ্বাদশ বর্ষ লিখিতে নিষেধ করিয়া যান, সে রহস্য সম্পূর্ণ বুঝিয়া উঠা কঠিন, ...আমরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহার জীবনচরিত প্রকাশ করি, ইহাও বোধহয় তাঁহার ইচ্ছা ছিল। ...তাঁহার স্বরচিত আত্মচরিত অবলম্বনে আমাদের তত্ত্বাবধানে তাঁহার যে বিস্তৃত জীবনচরিত লিখিত হইতেছে, তাহা প্রকাশে কিছু বিলম্ব আছে।"

দ্বাদশ বৎসর পার হইয়া প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর হইতে চলিল দিব্যেন্দুবাবুও ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেলেন, কিন্তু বঙ্কিমের 'স্বরচিত আত্মচরিত অবলম্বনে রচিত' জীবনী আজিও বাহির হইল না। দিব্যেন্দুবাবুর এক সহোদর আজিও জীবিত আছেন। তিনি যদি 'স্বরচিত-আত্মচরিত' টুকুই যথাযথ প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে হয়তো আমাদের ক্ষোভ কিয়ৎ পরিমাণে মিটিত; কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, এই কীর্তিমান পুরুষের গোপন ও গূঢ় সাধনেতিহাস আজিও অজ্ঞাত রহিয়া গেল।"

এই হল প্রথম দফার সংবাদ। দ্বিতীয় দফার সংবাদটি জোটে এই প্রবন্ধেরই এক ফুটনোটে। প্রসঙ্গ শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'বঙ্কিম জীবনী'।

"বঙ্কিমচন্দ্রের ভাগিনেয় কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী হইতে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন; এই পুস্তিকা আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। শ্রীযুক্ত জয়ন্তকুমার দাশগুপ্তের মতে শচীশবাবু এই গ্রন্থ হইতে বহু উপকরণ আত্মসাৎ করিয়াছেন।"

'শনিবারেব চিঠি'-র বঙ্কিম সংখ্যায় বেরনো আলোচ্য প্রবন্ধের নাম — 'বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী'। লেখক-নাম অনুপস্থিত। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হওয়াই স্বাভাবিক। যদি ব্রজেন্দ্রনাথের বদলে অন্য কেউ হন, তাহলেও ধাঁধাটি থেকে যায় উত্তরহীন। ধাঁধাটি হল — হুগলী কলেজের ছাত্র বঙ্কিম সম্পর্কে এখানে যা পড়ি, পরে সাহিত্য পরিষদ-এর জন্যে লেখা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্কিমজীবনীতে তার অনুল্লেখ।

"বক্‌লণ্ড লিখিয়াছেন, "He took a prominent part in the student's Debating Club."

কী আশ্চর্য। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্কিমজীবনী' পড়ে আমরা জেনে গিয়েছিলাম এই উল্টোটাই। তিনি প্রকাশ্যে কথা বলতে ভয় পেতেন। যেহেতু ছিলেন তোতলা। পরিণত জীবনে সেই কারণেই সভা-সমিতি থেকে যতটা সম্ভব দূরত্বে থাকাটাই ছিল তাঁর বেশি পছন্দের।

৭

এবার কৃতজ্ঞতা জানানোর পালা।

এ-বই যদিও শেষ পর্যন্ত আমার একলা প্রাণের শ্রদ্ধা নিবেদন, পিছনে সাহায্য রয়ে গেছে কারো কারো। প্রতিষ্ঠানের নাম করতে গেলে সবার আগে অবশ্যই সাহিত্য পরিষদ। পরিষদের অরুণা চট্টোপাধ্যায় আর বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়কে সামলাতে হয়েছে আমার অনেক জরুরি দাবি-দাওয়া। নিজের ছাপানো প্রবন্ধের কপি দিয়ে উৎসাহ জুগিয়েছেন গবেষক স্বপন বসু। ব্যক্তিগত সংগ্রহের বই থেকে জেরকস করে নেওয়ার সুযোগ পাইয়ে দিয়েছেন শ্রদ্ধেয়

প্রাবন্ধিক অলোক রায়। আর বিজিতকুমার দত্ত। যদিও এই খণ্ডে সংগৃহীত সে-সব উপকরণ কাজে লাগেনি, কারণ এখনো ঔপন্যাসিক হয়ে ওঠেননি বঙ্কিম। 'কৃষ্ণনগর কলেজ স্মারক গ্রন্থ'টি উপহার হিসেবে পাঠিয়ে কৃতজ্ঞ করেছেন বন্ধুবর সুধীর চক্রবর্তী। সবচেয়ে অভিভূত মেদিনীপুর থেকে পাঠানো হরিপদ মণ্ডলের 'মেদিনীপুরে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র' পুস্তিকাটি পেয়ে। সুবিমল লাহিড়ীর সহযোগিতা না পেলে এ-বইয়ে থেকে যেত ভ্রান্ত তথ্যের ছড়াছড়ি। অজস্র ভুল শুধরে দিয়েছেন তিনি। সংশোধন করে দিয়েছেন বানান। এক কথায় সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। এঁদের সকলকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের সময় আলাদা করে অবশ্যই মনে পড়বে প্রকাশক আর মুদ্রাকরের সহযোগিতা।

এ বইয়ের ছাপাছাপি শেষ হতে চলেছে যখন স্নেহভাজন আর বই-পাগল সৌম্যেন পাল সংগ্রহ করে আনেন শনিবারের চিঠি-র 'বঙ্কিম সংখ্যা' আব ভবতোষ দত্ত-র 'চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র'। আমাদের সম্পর্ক ধন্যবাদ দেওয়া-নেওয়ার বাইরে।

পূর্ণেন্দু পত্রী

সূচিপত্র

সময়সীমা	পৃষ্ঠা
১৮৩৮	১৭-৩৪
১৮৩৯	৩৫-৪০
১৮৪০	৪১-৪৫
১৮৪১	৪৬-৫০
১৮৪২	৫১-৬৪
১৮৪৩	৬৫-৭৫
১৮৪৪	৭৬-৮৭
১৮৪৫	৮৮-৯৪
১৮৪৬	৯৫-১০৪
১৮৪৭	১০৫-১১১
১৮৪৮	১১২-১২০
১৮৪৯	১২১-১৩৭
১৮৫০	১৩৮-১৪৯
১৮৫১	১৫০-১৫৬
১৮৫২	১৫৭-১৯৪
১৮৫৩	১৯৫-২৩৫
১৮৫৪	২৩৬-২৫৫
১৮৫৫	২৫৬-২৬৮
১৮৫৬	২৬৯-২৯৬
১৮৫৭	২৯৭-৩৩৪
১৮৫৮	৩৩৫-৩৭১

পরিশিষ্ট ৩৭৩　ব্যবহৃত বই ও প্রবন্ধ ৪১৬
নির্দেশিকা ৪২১

১৮৩৮

৩৮ বছর আগে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-এর প্রতিষ্ঠা।

২৩ বছর আগে খানাকুল কৃষ্ণনগর থেকে পাকাপাকি ভাবে কলকাতায় চলে এলেন রামমোহন রায়। এই বছরেই তাঁর উদ্যোগে গড়ে উঠবে 'আত্মীয় সভা', বেদান্ত চর্চার সঙ্গে সামাজিক সমস্যা আলোচনার কেন্দ্র। ২১ বছর আগে প্রধানত দেশীয় নাগরিকদের অর্থে ও উৎসাহে কলকাতায় গড়ে উঠবে উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 'হিন্দু কলেজ'।

২০ বছর আগে মিশনারিরা নিজেদের চেষ্টায় গড়ে তুলবে শ্রীরামপুর কলেজ। এই বছরেই কলকাতায় তৈরি হবে 'স্কুল বুক সোসাইটি' ; পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে জ্ঞানের প্রসার আর নতুন নতুন স্কুল স্থাপনার উদ্দেশ্যে। শুরু হয়ে গেছে বাংলা ভাষায় সংবাদপত্রের আত্মপ্রকাশ।

১৪ বছর আগে সংস্কৃত কলেজ-এর জন্ম।

১৩ বছর আগে বাংলা ভাষায় উপন্যাসোপম উপাখ্যান লিখবেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'নববাবুবিলাস' নামে।

১০ বছর আগে ডিরোজিও-র নেতৃত্বে সমাজ, নীতি, ধর্ম, বিজ্ঞান ইত্যাদি আলোচনার জন্যে গড়ে উঠেছে 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েসান'। বিদ্যাসাগর গ্রাম থেকে কলকাতায় এসে ভর্তি হলেন সংস্কৃত কলেজে ছাত্র হিসেবে।

৯ বছর আগে কলকাতায় পৌঁছে গেছেন মিশনারি শিক্ষাবিদ আলেকজাণ্ডার ডাফ। এই বছরেই রক্ষণশীলেরা গড়বে 'ধর্মসভা'।

৭ বছর আগে হিন্দু কলেজ থেকে পদত্যাগ করবেন ডিরোজিও, বিদ্রোহী 'ইয়ং বেঙ্গল' সম্প্রদায়ের গুরু। এই সম্প্রদায়ের কানে তাঁরই দেয়া মন্ত্র— to begin to reason, to

question আর to doubt-এর। এই বছরেই সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হয়ে বেরোতে শুরু করবে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর'।

৫ বছর আগে ব্রিস্টলে রামমোহন রায়ের মৃত্যু।

৩ বছর আগে হুগলীতে 'মহম্মদ মহসিন কলেজ'-এর জন্ম, পরে যা খ্যাত হবে হুগলী কলেজ নামে। কলকাতায় গড়ে উঠল 'মেডিকেল কলেজ'।

১ বছর আগে মফস্বলের পুলিশ ব্যবস্থার সংস্কার ঘটানোয় উদ্যোগী একটি কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিয়ে দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রস্তাব, পুলিশকে পদোন্নতি দিয়ে নয়, শিক্ষিত ইংরেজ, ইউরোপীয় বা ভারতীয়দের সরাসরি নিযোগ করা হোক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বা ডেপুটি কালেকটর-এর পদে। এবং সরকারিভাবে গৃহীত হবে সে প্রস্তাব।
বঙ্কিমচন্দ্র জন্মালেন এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে।

কলকাতা থেকে মাত্র ২৪ মাইল রেলপথ পেরোলেই নৈহাটি স্টেশন। নৈহাটি মিউনিসিপ্যালিটিরই একটা পাড়া কাঁঠালপাড়া। আগে এই কাঁঠালপাড়া ছিল চব্বিশ পরগনার বারাসত মহকুমার ভিতরে। এখন বদলি হয়ে ব্যারাকপুর মহকুমায়। আগে ছিল ছোট্ট একটা গ্রাম। এখন সমৃদ্ধ অঞ্চল। কাঁঠালপাড়া নামের উৎপত্তি খুঁজতে গিয়ে সঠিক উত্তর মেলাতে পারেননি কেউ। অগুনতি কাঁঠাল গাছ থাকলেও তার জন্যে যে নয় তার কারণ কাছাকাছি অনেক গ্রামেই কাঁঠালগাছের প্রাচুর্য।
কাঁঠালপাড়াব উল্টোদিকে হুগলীর চুঁচুড়া। মাঝখানে গঙ্গা। 'বঙ্কিমজীবনী'র লেখক গঙ্গার দুপারের লেখকদের চিনিয়ে দিতে চেয়েছেন এইভাবে

> "চুঁচুড়ায় ভূদেবচন্দ্রের বাসস্থান, কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মস্থান। আর একদিন, প্রায় দুইশত বর্ষ পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম, গঙ্গার এক পারে ভারতচন্দ্র রায়, অপর পারে রামপ্রসাদ সেন। তার আগে, চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম, গঙ্গার এক কূলে কাশীরাম দাস, অপর কূলে কৃত্তিবাস। আরও একটু দূরে—অজয়ের কূলে একদিকে জয়দেব, অপরদিকে চণ্ডীদাসকে দেখিয়াছিলাম।"

কাঁঠালপাড়া বঙ্কিমের জন্মস্থান হিসেবে স্থায়ী সত্য, কিন্তু চুঁচুড়া ভূদেবের স্থায়ী বাসস্থান নয়। শেষ জীবনেই ওখানে বসবাস ও মৃত্যু। এই কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমের জন্ম। তারিখ ১৯৩৮-এর ২৬ জুন। বাংলায় ১৩ আষাঢ়, ১২৪৫। জন্ম সময় রাত নটা বেজে তিন মিনিট। মায়ের প্রসব যন্ত্রণার শুরু মধ্যাহ্নের খাওয়া-দাওয়ার পরই, কিন্তু কাউকে জানাননি তা। সন্ধের পরে যন্ত্রণার বাড়াবাড়ি। তখন লোক ছুটল ধাই ডাকতে। পরিষ্কার করা হল সূতিকাগার, নবজাতকের নাড়ি কাটার মহাঅস্ত্র বাখারির ছাল হাতে নিয়ে ধাই এসে সব দেখেশুনে জানালে, আজ রাত্রে প্রসবের সম্ভাবনা ক্ষীণ। কিন্তু তারই একটু পরে ভূমিষ্ঠ হল সন্তান।
বঙ্কিমের জন্মমুহূর্তের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে প্রকম্পিত শঙ্খধ্বনির এক কল্পকাহিনী। শচীশচন্দ্রের 'বঙ্কিম জীবনী'-তে তা অতিশয় সংক্ষিপ্ত। দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতামহের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনাচ্ছলে, ব্যাপারটাকে পৌঁছে দিয়েছেন অলৌকিকতার চূড়ান্তে। বঙ্কিমচন্দ্র দক্ষের বংশধর। তিনি নিজেই জানিয়েছেন যে, এক শ্রেণীর ফুলিয়া কুলীনদের পূর্বপুরুষ ছিলেন অবসথী গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায়। অতীতে 'অবসথী' উপাধি দেওয়া হতো তাঁদেরই, যাঁরা টোল বা চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপক হিসেবে বিশিষ্ট। 'অবসথ'-এর একটা মানে

হল টোল। আদিশূর যখন বাংলার অধীশ্বর, তখন পুত্রেষ্টি যজ্ঞের জন্যে কান্যকুব্জ থেকে আনিয়েছিলেন পাঁচজন ব্রাহ্মণকে। দক্ষ সেই সব দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতদের একজন। বিশেষ করে 'বেদ' বিষয়ে অনন্যসাধারণ ছিল তাঁর পাণ্ডিত্য। সর্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায় এই দক্ষের অধস্তন নবম পুরুষ। আর গঙ্গানন্দের ঊর্ধ্বতন অষ্টম পুরুষ। গঙ্গানন্দের বসবাস ছিল হুগলী জেলার দেশমুখো গ্রামে। গঙ্গানন্দ থেকে রামজীবনেব মাঝখানে রয়ে গেছে চাব পুরুষ। কৃষ্ণবল্লভ, পীতাম্বর, নন্দগোপাল, আর রামকান্ত। এই রামজীবনই বিয়ে করেছিলেন কাঁঠালপাড়ার রঘুদেব ঘোষালের বড়ো মেয়ে রোহিণী দেবীকে। রঘুদেব-এর ছেলে ছিল না, তাই মেয়েকেই দান করে গিয়েছিলেন সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি। রামজীবনের ভোগে আসে সে-সব। তাঁব দুই ছেলে, রামহরি আর জগন্নাথ। রামহরি বড় হয়ে আব ফিরে গেলেন না দেশমুখো গ্রামে। ঐ সময় থেকেই চাটুজ্যে পরিবারের স্থায়ী বসবাস কাঁঠালপাড়ায়। রামহরির স্ত্রী আনন্দমোহিনী। তিনি 'সতী' হয়েছিলেন স্বামীর সঙ্গে সহমরণে। রামহবি আর জগন্নাথ অবস্থাপন্নেব জীবন কাটিয়ে গেলেও তাঁর ছেলে শিবনারায়ণ আর জয়নারায়ণকে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল বিষয়-সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমায়। তা ছাড়া গাযেব জোবেও নাকি জ্ঞাতিরা দখল করে নেয় অনেক জমিজমা। ফলে শিবনারায়ণের জীবন গড়াতে থাকে নিঃস্বতার দিকে। নির্ধন তবুও ন্যায়পরায়ণ, তিনি ছিলেন আত্মীয়দের অত্যাচারেও নির্ভীক। আবার অন্যদিকে অন্যের কাছে অনুগ্রহ ভিক্ষায় অনাগ্রহী।

বঙ্কিমচন্দ্র এঁকে গেছেন তাঁর পিতামহের খানিকটা চরিত্র-চিত্র।

> "পিতামহ ঠাকুর ছিলেন একজন অসাধারণ ব্যক্তি। শিক্ষাব হিসেবে তাঁহার অতি সামান্য শিক্ষা হইযাছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু জীবনে তিনি কখনও মিথ্যা বলেন নাই, বা কাহাকেও ভয় করিতেন না। তাঁহার স্পষ্টবাদীতায় প্রতিবেশীবর্গ বিবক্ত হইলেও, উচিত কথা বলিতে তিনি কখনও বিরত হন নাই। কেহ যাচ্ঞা করিলে তিনি ঘরের ঘটি-বাটি পর্যন্ত বিক্রয় করিয়া প্রার্থীর অভাব পূর্ণ কবিতেন। কিন্তু দান করিতেন অত্যন্ত গোপনে। তিনি অত্যন্ত পুত চরিত্রের লোক ছিলেন।"

শিবনারায়ণেব স্ত্রীর নাম তারামণি। এঁদের তিন সন্তান। কাশীনাথ, যাদবচন্দ্র আর নবকৃষ্ণ। যাদবচন্দ্র বঙ্কিমের বাবা। মা, দুর্গাদেবী। যাদবচন্দ্রের প্রথমা স্ত্রী মারা যান নিঃসন্তানা অবস্থায়। তারপরই দুর্গা দেবীব সঙ্গে বিয়ে। বঙ্কিমের মাতামহের নাম পণ্ডিত ভবানীচরণ বিদ্যাভূষণ। হুগলীতে তাঁর ছিল প্রকাণ্ড চতুষ্পাঠী। অনেক ছাত্রের ভরণ-পোষণ হত সেখান থেকে। বিখ্যাত বংশে যেমন জন্ম তেমনি নিজেও কবে গেছেন পাণ্ডিত্যের প্রমাণ দেওয়া অনেক কাজ। তাব মধ্যে দুটো হল— 'গীতগোবিন্দ' আর 'মহানির্বাণ তন্ত্রে'-র টীকা রচনা। সংস্কৃত বইপত্রের সংগ্রহ ছিল বিশাল। ছিল এমন সব বই যা সেকালেই দুর্লভ। বঙ্কিমেরা চারভাই। দুই দাদা হলেন শ্যামাচবণ আর সঞ্জীবচন্দ্র, ছোটোভাই পূর্ণচন্দ্র। একমাত্র বোন নন্দবানীর জন্ম বড়োদাদা শ্যামাচরণের পরে। সঞ্জীবচন্দ্রের আসল নাম সঞ্জীবনচন্দ্র। বঙ্কিম জানিয়েছেন, সঞ্জীবন সঞ্জীব হয়ে যায় উচ্চারণ-সংক্ষেপে। তবুও প্রকৃত নামটাকে স্মবণীয় করে রাখতেই বঙ্কিম দাদার জীবনীর নামকরণ করেছিলেন 'সঞ্জীবনী সুধা'।

যাদবচন্দ্রের সময় থেকেই বংশের প্রায় সকলেই সরকারি চাকুরে। আর বেশির ভাগই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। বঙ্কিমেরা চার ভাইও তাই। যাদবচন্দ্রের কাকা জয়নারায়ণের পৌত্র নকুলের ছেলে পঙ্কজও তাই। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমের বড় জামাই রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কাশীনাথই সরকারি চাকুরে হিসেবে এই বংশে প্রথম। ছিলেন উড়িষ্যার জাজপুরে নিমকের

দারোগা। অর্থাৎ সল্ট ইন্‌সপেক্‌টর। ফার্সিটা জানতেন ভালোই। এই দাদাই যাদবচন্দ্রকে পাইয়ে দিয়েছিলেন ঐ চাকরি। পরে, বঙ্কিমের জন্মের বছরে, হয়ে যান ডেপুটি কালেক্‌টর, মেদিনীপুরের। তার আগের দুবছর মেদিনীপুরেই ছিলেন কালেক্টরের খাজাঞ্চি হয়ে। ফার্সি তো জানতেনই। ইংরেজিতেও অভ্যস্ত। পাঁচ টাকা মাইনের মুন্সিগিরি থেকে পাঁচশো টাকা মাইনের ডেপুটি কালেক্‌টর হওয়ার মাঝখানে রয়ে গেছে যাদবচন্দ্রের বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, নিষ্ঠা আর সৎ চরিত্রের পরিচয়। ছিলেন ভক্তিমান মানুষও। একদিকে যেমন উদ্ধার করেছিলেন হৃত বিষয়-আশয়, অন্যদিকে তেমনি ধর্মে-কর্মে ছিল তাঁর উদার হাতের অর্থব্যয়। গৃহদেবতাব পুজোয়, উৎসবে, খরচ করেছেন অঢেল। যাদবচন্দ্রের গৃহদেবতা রাধাবল্লভ। এঁরও ইতিহাস আছে অনেকখানি। কলিকাতাস্থ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দেওয়া তথ্য—

> "প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে কাঁটালপাড়া গ্রামে এক দরিদ্র ঘোষাল ব্রাহ্মণের গৃহে একজন সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হন। ঘোষালের স্ত্রী ও দুইটি কন্যা। তিনি অতি দরিদ্র, তাঁহার দিনপাত হওয়া কঠিন ছিল। তথাপি তিনি সপরিবারে সন্ন্যাসীর যথেষ্ট পরিচর্য্যা করিলেন, সন্ন্যাসী আরোগ্য লাভ করিয়া বলিলেন, 'আমি তোমার সেবায় বড়ই সন্তুষ্টি লাভ করিলাম আমাব আর কিছুই নাই, এই রাধাবল্লভ বিগ্রহটি আমি তোমাকে দিয়া গেলাম, তুমি ইহার সেবা করিও।' ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, 'ঠাকুর, আমারই দিন চলে না, আমি কি করিয়া বিগ্রহের সেবা করিব?' সন্ন্যাসী কহিলেন, 'আচ্ছা, আমি ফিরে আসা পর্য্যন্ত যেরূপ পার চালাও, আসিয়া অন্যরূপ ব্যবস্থা করিব।' কিছুদিন পরে সন্ন্যাসী ফিরিয়া আসিয়া রাধাবল্লভের নামে একটি তালুক লিখিয়া দিলেন। ক্রমে ঘোষাল মহাশয় বেশ সম্পন্ন লোক হইয়া উঠিলেন। ফুলে ও বল্লভী মেলে দুইজন ভঙ্গ কুলীনের সঙ্গে দুই কন্যার বিবাহ দিলেন এবং জামাইদিগকে রাধাবল্লভের সেবার ভার দিয়া পরলোক গমন কবিলেন। এই ফুলে মেলে যে জামাই হইল তাহারই বংশে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম।"

রঘুদেব ঘোষাল যখন জীবিত, তখনই এই রাধাবল্লভের বিগ্রহ নিয়ে গ্রাম্য-ষড়যন্ত্রের শুরু। শেষপর্যন্ত মুর্শিদাবাদ মহারাজের উকীল শুকদেব রায়ের হস্তক্ষেপে নিষ্পত্তি। যাদবচন্দ্রের আমলে শুরু হযে যায় এই বিগ্রহকে ঘিরে জাঁকজমকের উৎসব। রোজ চাল রাঁধা হয় দশ সের। রোজকার বাজার খরচ ন-সিকে। প্রসাদ পায় গরীব দুঃখীরা। উৎসবের সময় চেহাবা অন্য রকম। অক্ষয় চন্দ্র সরকারের সাক্ষ্য—

> "আমাদের ওপারে রায় বাহাদুরের বাড়ী ছিল যাত্রাগান ও মহোৎসবের মিলন মন্দির —এতদঞ্চলের একরূপ টাউনহল। পালা-পার্বণ তো ফাঁক যাইবেই না, অন্য সময়েও উৎসব আছে। দুর্গোৎসবে কৃষ্ণনগর ঘূর্ণীর উৎকৃষ্ট শশী পাল ঠাকুর গড়িবে। উৎকৃষ্ট চিত্রকর চুঁচুড়ার মহেশ ও বীরচাঁদ সূত্রধর চিত্র করিবে। প্রতিমা সর্বাঙ্গসুন্দর হইবে জগমোহন স্বর্ণকারের চণ্ডীর গানে উচ্চকণ্ঠে 'মা' 'মা' রবের মোহিনী শক্তি, অথবা নীলকমলের প্রসিদ্ধ রামায়ণ গান। যাত্রার সঙ্গে মদন অধিকারীর তুক্কো বা গোবিন্দ অধিকারীর কালীয়দমন গান, দাশরথি রায়ের কথার ছটা-ঘটা, সঙ্গে সঙ্গে তিনকড়ির সুরে তালে মাখামাখি গান, ফরাসডাঙ্গার জগৎমোহিনী ঢপ ; বর্দ্ধমানের সহচরী ও যাদুমণির কীর্তন ; মধুকানের গান— এইরূপ ছোট-বড়-মাঝারি কত গানই প্রায়ই হইত না ধরণীর কথকতাই ক্রমাগত তিনমাস চলিয়াছে। এ সকলের কত পরিচয় দিব। আর তাঁহার ভবনে প্রতিষ্ঠিত রাধাবল্লভজীউ ও তাঁহার নিত্য সেবার কথা কত বলিব। বঙ্কিমের বাল্যাবস্থায় এই বিগ্রহের ও অতিথি সেবার সুন্দর বন্দোবস্ত ছিল। এখনও অনেকটা আছে।"

বালক বয়সের দেখা এই রাধাবল্লভ মন্দিরের স্মৃতি পরিণত বয়সের ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের লেখায় ছায়া ফেলবে হুবহু-ই যেন অনেকটা। 'বিষবৃক্ষ'-য় নগেন্দ্রর বাড়ির বৈঠকখানা, পুজোর দালান, ঠাকুর দালান, অন্দরমহল গড়ে উঠবে সেই স্মৃতিব আদলেই।

"এইটি নগেন্দ্রর বৈঠকখানা। তৃণপুষ্পময় ভূমিখণ্ডদ্বয়ের দুই পার্শ্বে অর্থাৎ বামে ও দক্ষিণে দুইসারি একতলা কোঠা। এক সারিতে দপ্তরখানা ও কাছাবি। আব এক সারিতে তোষাখানা এবং ভৃত্যবর্গের বাসস্থান। ফটকের দুই পার্শ্বে দ্বাররক্ষকদিগের থাকিবার ঘব। এই প্রথম মহলের নাম 'কাছারি বাড়ী'। উহার পার্শ্বে 'পূজার বাড়ি'। পূজাব বাড়িতে রীতিমত বড় পূজার দালান ; আর তিন পার্শ্বে প্রথামত দোতালা চক বা চত্বব। মধ্যে বড উঠান। এ মহলে কেহ বাস করে না। দুর্গোৎসবের সময বড় ধুমধাম হয়, কিন্তু এই উঠানে টালিব পাশ দিয়া ঘাস গজাইতেছে। দালান, দরদালান, পায়রায় পুরিয়া উঠিযাছে, কুঠরী সকল আসবাবে ভরা—চাবি বন্ধ। তাহার পাশে ঠাকুর বাড়ি—সেখানে বিচিত্র দেব মন্দির, সুন্দর প্রশস্ত বিশিষ্ট 'নাটমন্দির'। তিনপাশে দেবতাদিগেব পাকশালা, পূজারীদিগেব থাকিবাব ঘর, এবং অতিথিশালা। সে মহলে লোকের অভাব নাই। গলায় মালা, চন্দনতিলক বিশিষ্ট পূজারীর দল, পাচকের দল ; কেহ ফুলের সাজি লইযা আসিতেছে, কেহ ঠাকুর স্নান কবাইতেছে, কেহ ঘণ্টা নাড়িতেছে, কেহ বকাবকি করিতেছে, কেহ চন্দন ঘসিতেছে, কেহ পাক কবিতেছে। দাসদাসীরা কেহ জলের ভার আনিতেছে, কেহ ঘর ধুইতেছে, কেহ চাল ধুইয়া আনিতেছে, কেহ ব্রাহ্মণদিগের সহিত কলহ কবিতেছে! অতিথিশালায় কোথাও ভস্মমাখা সন্ন্যাসী ঠাকুর জটা এলাইয়া দিয়া চিৎ হইযা শুইয়া আছেন। কোথাও ঊর্দ্ধ্ববাহু এক হাত উচ্চ করিয়া দত্তবাড়ীর দাসী ঔষধ বিতবণ করিতেছে। কোথাও শ্বেতশ্মশ্রুবিশিষ্ট গৈরিকবসনধারী ব্রহ্মচারী রুদ্রাক্ষমালা দুলাইযা নাগবী অক্ষরে হাতে লেখা ভগবদ্গীতা পাঠ কবিতেছেন। কোথাও বৈবাগীর দল শুষ্ককণ্ঠে তুলসীর মালা আঁটিযা, কপাল জুড়িয়া তিলক কাটিয়া মৃদঙ্গ বাজাইতেছে মাথায় আর্কফলা নড়িতেছে এবং নাসিকা দোলাইয়া "কথা কইতে যে ভোলেন না—দাদা বলাই সঙ্গে ছিল—কথা কইতে যে ভোলেন না" বলিয়া কীর্তন কবিতেছে। কোথাও বৈষ্ণবীবা বৈবাগীভঞ্জন বসকলি কাটিয়া, খঞ্জনীর তালে তালে 'মধো কানের' কি 'গোবিন্দ অধিকারী'-র গীত গাহিতেছে। কোথাও কিশোর বযস্কা নবীনা বৈষ্ণবী প্রাচীনাব সঙ্গে গাহিতেছে, কোথাও অর্দ্ধ বযসী বুড়া বৈরাগীব সঙ্গে গলা মেলাইতেছে।..."

দীর্ঘ বিবরণ। 'বিষবৃক্ষ'-ব গোটা সপ্তম পবিচ্ছেদটাই কাঁঠালপাড়ার রাধাবল্লভের বাড়িরই একটু উনিশ-বিশ করা ছবি। এই বঙ্কিমই যখন পবিপূর্ণ যুবক, তখন একদিন হঠাৎ এক বন্দুকের আওযাজে ভেঙে গেল কাঁঠালপাড়াব মাঝরাতের ঘুম। জেগে উঠল গ্রাম। বেজে উঠল ঢাক ঢোল। আবম্ভ হয়ে গেল মহাষ্টমীব রাত্রের সন্ধিপুজো। তখন সব লোকেব বাড়িতে ঘড়ি থাকত না, তাই বন্দুকেব শব্দে সবাইকে জাগানো। রাত তখন হয়াতো দ্বিতীয় প্রহর। অস্ত যায়নি অষ্টমীর চাঁদ। যাদবচন্দ্রের ঠাকুরবাড়ি তখন আলোয় আলোময। পুজোর দালানের সিঁড়ির ধাপে ধাপে প্রদীপের আলো সাজানো। যেটা নিভছে তক্ষুনি জ্বালিযে দিচ্ছে ছেলের দল। একটু পরে থামল ঢাক-ঢোলের আওয়াজ। তখন দশভূজার সামনে কেবল পুবোহিত আর তন্ত্রধারদের মন্ত্রোচ্চারণেব গম্ভীর ধ্বনি। পূর্ণচন্দ্র এই বর্ণনার পরে লিখছেন—

"ভিতরের দালানের মধ্যস্থলে সিংহ পৃষ্ঠে অসুরমর্দিনী বাটী আলো করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, সম্মুখে স্তূপাকার বিল্বপত্র ও নানাপ্রকার ফুল, তম্মধ্যে পদ্মফুলের ভাগই বেশি, তাহার নিকটে পুরোহিত ও তন্ত্রধাব বসিযা পূজা করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের সন্নিকটে

একটি থামে ঠেস দিয়া পৃথক আসনে এক ব্যক্তি বসিয়া, ইনি দেখিতে সাধারণ মনুষ্যের মতো নহেন, তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হয়, তিনি যেন সকলের হইতেই স্বতন্ত্র।"

সকলের থেকে আলাদা-হওয়ার এই স্বাতন্ত্র্যই রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন বঙ্কিমের মধ্যে, প্রথম দর্শনের দিনে। কিন্তু পূর্ণচন্দ্র যাঁর কথা জানাচ্ছেন, তিনি বঙ্কিমের বাবা, যাদবচন্দ্র। ১৯৭৫-এর নভেম্বরে জন্ম। দ্বারকনাথ ঠাকুরের সমসাময়িক। রাজা রাধাকান্ত দেব-এর থেকে দশ বছরের বড়ো। নানা জনের বিবরণ থেকে গড়ে ওঠে তাঁর যে মূর্তি সেটা সত্যিই অসম্ভব ব্যক্তিত্ববানের। পূর্ণচন্দ্র তাঁর অশীতি-অতীত বয়সকালের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখছেন

"দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ, দেহ না-ক্ষীণ না-স্থূল, অথচ বয়সোপযোগী বলিষ্ঠ, খড়্গের ন্যায় নাসিকা, চক্ষু দুইটির দৃষ্টি অতি তীব্র, মস্তক ও মুখমণ্ডল কেশহীন।"

অক্ষয়চন্দ্র সরকারের বর্ণনায় আরেক ধরনের ছবি—

যাদবচন্দ্রের ন্যায় রাশভারী লোক আমি আগেই দেখিয়াছি। তথাপি তাঁহার রসপরিগ্রহ সকল বিষয়েই সমান ছিল। রাশভারী লোকের রহস্যে আস্বাদন—সেটি বড় অপূর্ব্ব পদার্থ। কেবল খাইতে-খাওয়াইতে নয়, তিনি সঙ্গীত ও সাহিত্যের রসও বিশেষ উপভোগ করিতে পারিতেন। এ রস তিনি একাই উপভোগ করিতেন না, —বিপুল অর্থব্যয়ে আপামর সাধারণকেও সেই রস উপভোগ করিবার সুচারু সুবিধা করিয়া দিতেন। এই জন্য বঙ্কিম নিজেও বাল্যকাল হইতেই উৎকৃষ্ট যাত্রা, গান, কবি, কীর্ত্তন, কথকতার রস আস্বাদন করিবার অবাধ সুবিধা পাইযাছিলেন এবং সেরূপ সুবিধা পাওয়া সাধারণের কপালে বড একটা ঘটিয়া উঠে না।"

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় জানান—

"আজকাল শিক্ষিত বাবু সমাজে বঙ্কিমচন্দ্রের নামই প্রকট। পরন্তু দক্ষিণ বাংলায় ব্রাহ্মণ সমাজে রায় বাহাদুর বলিলে, কেবল যাদব চাটুজ্যে মহাশয়কে বুঝাইত।"

ডেপুটি কালেকটর হিসেবেও নিজের কাজের এলাকায় শ্রদ্ধা কুড়িয়েছেন সকলের। নিজেব কর্মদক্ষতার গুণেই যাদবচন্দ্র কাঁথিতে হয়ে গিয়েছিলেন 'যাদবরাম'। যাদবরাম রায় কাঁথি অঞ্চলের প্রাতঃস্মরণীয় আর আদর্শবান এক জমিদার। যাদবচন্দ্রকে স্থানীয় মানুষ সম্মানিত করেছিল যাদবরাম-এর সঙ্গে একাত্ম করে দিয়ে।

যাদবচন্দ্রের জীবন শৈশব থেকেই অলৌকিকতার নানা ঘটনাবলী দিয়ে মোড়া। যখন বযস মোটে ১৫/১৬ বছর মাত্র, তখন অশুচি পোশাকে ঠাকুরঘরে ঢুকে পডার অপরাধে বাবা শিবনারায়ণের কাছে তিরস্কৃত হয়ে তাঁর সংসার ত্যাগ। সঙ্গে যা ছিল তা লুট হয়ে যায় রাস্তায়। প্রায় এক মাস পরে হেঁটে হেঁটে দাদা কাশীনাথের কাছে হাজির। কাশীনাথ তখন জাজপুরে নিমকার দারোগা। কাশীনাথের কাছ থেকেই এরপর ফার্সিটা শিখে নেওয়া। আরো পরে কাজ চালানোর মতো ইংরেজি।

এই সময়েই একদিন তুমুল জ্বর। অচৈতন্যতার ঘোর আর কাটেই না। বাঁচার আশা ক্ষীণতর দেখে মৃত ধরে নিয়েই তাঁর দেহকে সৎকারের জন্যে বৈতরণীর তীরে নিয়ে এল আত্মীয়েরা। মৃত বালকের দেহ যখন গঙ্গাতীরে শোয়ানো, তখনই সেখান দিয়ে যাচ্ছিল একটা নৌকো, যার ভিতরে গৈরিক বেশবাসের এক সৌম্যকান্তি সন্ন্যাসী। নৌকো এসে ঠেকল ঘাটে। সন্ন্যাসী নৌকো থেকে নেমে এসে দাঁড়ালেন চিতার পাশে। শোকাকুল আত্মীয়েরা এরপব তাঁর মুখ থেকেই শুনবে অবাক এক প্রশ্ন।

এই সুন্দর ছেলেটিকে জীবন্ত দগ্ধ করতে এনেছ কেন এখানে? এ তো মরেনি এখনো। পুরোপুরি বজায় আছে জীবনের লক্ষণ।

তাঁর আদেশে এসে গেল গরম দুধ। দুধ খাইয়ে মাথা থেকে নাভী পর্যন্ত ম্যাসাজ। একটু একটু জ্ঞান ফিরে এল যাদবচন্দ্রের। বেঁচে উঠে তাঁর একটাই প্রার্থনা সন্ন্যাসীর কাছে—আমাকে দীক্ষিত করুন।

একদিন সত্যি সত্যিই দ্বাররুদ্ধ করে দীক্ষা দিলেন সন্ন্যাসী। দীক্ষান্তে তিনি যখন বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে, দেখা গেল পায়ে নেই খড়ম। সন্ন্যাসী তাঁর খড়ম আর এক গাছা পৈতে দিয়ে গিয়েছিলেন যাদবচন্দ্রকে। যাদবচন্দ্র নিয়মিত আর নিয়মনিষ্ঠায় পুজো করতেন সে দুটির। ১৮ থেকে ৮৬ বৎসরের মধ্যে ছেদ পড়ে নি কখনো। কিন্তু এই খড়ম আর পৈতের কথা কখনও কাউকে বলতেন না তিনি।

বঙ্কিম সম্ভবত শুনে থাকবেন এ কাহিনী। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমকে প্রভাবিতও করবে এই সন্ন্যাসী আব তাঁব অলৌকিক জীবনদানের কৃতিত্ব। আনন্দমঠ-এ যুদ্ধের দৃশ্যের পর জীবানন্দের দেহ খুঁজে না পেয়ে যখন শান্তির কান্না, তখনই আকস্মিক ভাবে আবির্ভাব ঘটবে বিশালকায় জটাজূটধাবী এক মহাপুরুষের। আর তাঁর দেওয়া ওষুধেই পুনর্জীবন ঘটবে জীবানন্দের। বেঁচে উঠে জীবানন্দ যখন শান্তিকে বলবে, 'এই মহাত্মাকে প্রণাম কর', তখন দুজনেই দেখতে পাবে কেউ নেই কোথাও। অলৌকিক শক্তিমান মহাপুরুষের আবির্ভাব শুধু বঙ্কিমের ঐ 'আনন্দমঠ'-এই নয়। তাদের দেখা মিলবে 'চন্দ্রশেখরে', 'দেবী চৌধুরাণী'-তে, 'কপালকুণ্ডলা'-য়, 'সীতাবাম'-এ।

বাবার কাছ থেকে, উত্তরাধিকার সূত্রেই যেন, বঙ্কিম পেয়েছিলেন তিনটে জিনিস। এক, জীবনের শুরুতে লৌকিক উৎসব, গান-বাজনা-কথকতায় আগ্রহ। দুই, শেষ জীবনে নিষ্কাম ধর্মবোধ। তিন, আজীবনই অলৌকিকত্বে বিশ্বাস।

বঙ্কিমের জীবনে আর সকলের চেয়ে বাবার প্রভাবটাই গভীর। অবশ্য রঘুদেব ঘোষালের সঙ্গে বঙ্কিমের জীবনের বহিরঙ্গের কিছু সাদৃশ্যের কথা তুলেছেন কেউ কেউ। রঘুদেবেব মতো তিনিও অপুত্রক। তাঁরও তিন কন্যা। রঘুদেবের কনিষ্ঠা কন্যার মতো তাঁর কনিষ্ঠা কন্যাও সন্তানহীনা। এসব দেখেই আত্মীয়দের অনুমান, রঘুদেবই ফিরে এসেছেন বঙ্কিমে।

আমাদের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের বাইরে হলেও, অতীত শতাব্দীর জীবনচবিত যেখানে অন্বেষণ-অনুসন্ধানের বিষয়, সেখানে যাদবচন্দ্রের জীবনের মতো দৈব-সংঘটনের নানা দৃষ্টান্ত এসে যেতে বাধ্য। তবে তাঁর কোনো সন্তানই লিখে যাননি তাঁদেব পিতার জীবনকাহিনী। তাঁকে মোটামুটি জানার পক্ষে মৌল সম্বল যা, তা যাদবচন্দ্রেরই লিখে যাওয়া অতি সংক্ষিপ্ত একটি আত্মচরিত। তাও নিজের হাতে লেখা নয়। বলে গেছেন মুখে মুখে। লিখেছেন বড়ো ছেলে শ্যামাচরণ। যাদবচন্দ্রকে তবুও চিনতে পাবি যতখানি, বঙ্কিম-জননী দুর্গা দেবী বা দুর্গাসুন্দরী সে তুলনায় একেবারেই অপবিচিতা যেন। ছিটেফোঁটা কিছু কথাবার্তাই শুধু মেলে এখানে ওখানে। ছিলেন মোটাসোটা, গায়ের বঙ কালো। কিন্তু মাধুর্যময়। শান্ত করুণা-মেশানো মূর্তি। সঞ্জীবচন্দ্রের ছেলে জ্যোতিশচন্দ্রের বর্ণনা—

> "যখন মাতামহী লাল কস্তাপেড়ে শাড়ি পরিয়া বাউটি ঝুলাইয়া ফাঁদী নথ নাকে দিয়া গৃহিণীপনা করিতেন, তখন সত্যিই তাঁহাকে লক্ষ্মী-সদৃশা দেখাইত।... পিতামহীর মুখে কিছুমাত্র অপবিত্রভাব দেখি নাই।"

স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে জ্যোতিষচন্দ্র শুনিয়েছেন মাতামহীর মুখের যৎকিঞ্চিৎ সংলাপও। বলতেন—

> "দাদা, যাহার যা সহে, তাহা করাই ভাল, যাহা সহে না, তা না করাই ভাল, আমরা গৃহস্থ লোক, আমাদের বাবুয়ানীতে কাজ কি ?"

অনুমান, 'দেবী চৌধুরাণী'-র ব্রজেশ্বর-এর মায়ের চরিত্রে বঙ্কিম খানিকটা আভাস দিয়েছেন নিজের মায়ের। ব্রজেশ্বরের মায়ের মতো তিনিও নাকি পা ছড়িয়ে বসে তোলাতেন পাকা চুল। তাঁরই মতো পরতেন যশম, ফাঁদি নথ, বাউটি। আর লালপেড়ে শাড়িটা ছিল তাঁরও প্রিয় পরিধান।

১৮৩৮-কে চিরস্মরণীয় হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন বঙ্কিম-গবেষক অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, যেহেতু এই বছরেই বঙ্গমাতা প্রসব করেছেন একাধিক মহারত্ন-সদৃশ মনীষীকে। কাব্যের হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ধর্মের কেশবচন্দ্র সেন। রাজনীতির কৃষ্ণদাস পাল। আর সর্বোপরি সব-কিছুর সমাহারে গড়া বঙ্কিমচন্দ্র।

আবার হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বঙ্কিমের জন্মকালকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন ব্যাপ্ত রাজনৈতিক পটভূমিকায়। মহারাণী ভিকটোরিয়া তখন সবেমাত্র ইংলণ্ডের সিংহাসনে। আফগানযুদ্ধে ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ্‌রা বিব্রত। পঞ্চনদের বীর রণজিৎ সিংহের বিক্রমে ইংরেজরা হতচকিত হলেও তিনি মৃত্যুশয্যায়। এই সন্ধিক্ষণেই বঙ্কিমের জন্ম।

রাজনীতির কথা যখন তোলা হলই, তখন তো উচিত ছিল ভারতবর্ষের পক্ষে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘটনাকে চিনিয়ে দেওয়া। এই বছরেই উত্তর ভারতে ঘটেছিল ভয়াবহ রকমের দুর্ভিক্ষ। কিন্তু সেসব খবর পৌঁছোচ্ছিল না বিলেতের ভারত-ভাগ্যবিধাতাদের কানে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সুকৌশলে আড়াল করে রাখত এদেশের গুরুত্বপূর্ণ সব খবরকে। কিন্তু যেভাবেই হোক জর্জ টমসনের কানে পৌঁছে থাকবে এই দুর্ভিক্ষের খবর। তিনি লিবার‍্যাল আর মানবিকতাবাদী রাজনৈতিক নেতা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে ছিলেন অসমসাহসী যোদ্ধা। তিনি চাইলেন, ভারতবর্ষ সম্পর্কে শুধু তথ্য সংগ্রহের সুবিধেই নয়, চাইলেন ইংলণ্ডে ভারতবর্ষীয়দের স্বার্থে জনমত গড়ে তোলারও প্রয়োজনীয়তা। এর জন্যে চাই সংঘবদ্ধ আন্দোলন। আর সেই আন্দোলন পরিচালনার জন্যে সংগঠন।

এই বছরের জুলাই মাসে লণ্ডনের ফ্রি ম্যাসন হলে ডাকা হল এক জনসভা। সভাপতির আসনে বার্ক-শিষ্য লিবার‍্যাল নেতা লর্ড ব্রুয়াম। ঐ সভাতেই জন্ম হল 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র। লণ্ডনে গড়া এই সংগঠনের প্রভাব পড়বে ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলার রাজনীতিতে, যখন দ্বারকানাথের আগ্রহের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁরই সঙ্গে টমসন আসবেন কলকাতায়। কলকাতার ইয়ং বেঙ্গল সমাজ তাঁকে মেনে নেবে প্রায় রাজনৈতিক গুরুর মতোই। কলকাতার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এই টমসন-এর কাছ থেকেই দীক্ষা নেবে, নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিজেদের অভাব-অভিযোগ আর অসন্তোষকে সংঘবদ্ধ জাতীয় আন্দোলনের স্তরে পৌঁছে দিতে। এদেশে রাজনৈতিক কার্যক্রম বা দলীয় রাজনীতির সূচনা টমসনেরই পৌরোহিত্যে।

> "David Hare had prepared the soil, on which George Thompson planted the first seed of native political education in our country. His countrymen may have styled him Thompson the grievance-monger, but to him is due the credit of having given the start to our political institutions."
>
> ভোলানাথ চন্দ্র

এসব ছাড়াও, বঙ্কিমের জন্মের পটভূমি হিসেবে, আমাদের মনে রাখতে হবে, শিক্ষিত সমাজের নেতৃত্ব অথবা হস্তক্ষেপের সমস্ত রকম ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে অথবা এড়িয়ে গড়ে-ওঠা

ইতস্তত নানান গণ আন্দোলনকেও। নিতান্ত অস্তিত্ব রক্ষার প্রবল গরজে সমাজের নিচু স্তরে দরিদ্র, দুর্বল, নিগৃহীত আর নিষ্পিষ্ট জনগোষ্ঠীর এই সব আন্দোলন-এর কোনো কোনোটির সঙ্গে পরিণত বঙ্কিমকেও জড়িয়ে পড়তে হবে কখনো প্রত্যক্ষভাবে, যেমন নীল বিদ্রোহ। কখনো পরোক্ষে যেমন সন্ন্যাসী বিদ্রোহ। আবার তাঁব প্রবন্ধে কখনো বা তিনি হয়ে উঠবেন কোনো কোনো বিদ্রোহের অনাগ্রহী সমালোচক, যেমন পাবনার কৃষক বিদ্রোহ। বঙ্কিমের জন্মের মাত্র ১ বছর আগে গণ আন্দোলনের একটা প্রলম্বিত ধারা এসে থামবে তিতুমীরের বিদ্রোহে ও পরাজয়ে। কিন্তু নিভে যাবে না। সাঁওতাল বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, ময়মনসিংহের গারো বিদ্রোহ, ত্রিপুবার কৃষক বিদ্রোহকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে নদী-শাখানদীব মতো তা এগিয়ে যাবে মহাবিদ্রোহেব সমুদ্র-কল্লোলে মিশে যেতে।

আপন চৈতন্যের এক সীমারেখায় দাঁড়িয়ে বঙ্কিমকেও হযে উঠতে হবে বিদ্রোহের রূপকার।

১৮৩৮

বছরের প্রধান ঘটনাবলী

কলকাতার কাঁসারিপাড়ায় সাংবাদিক, বাগ্মী, আর রাজনৈতিক নেতা কৃষ্ণদাস পালের জন্ম। বাবা, ঈশ্বরচন্দ্র।

বছরের গোড়ায় সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশ্রেণীতে ভর্তি হলেন বিদ্যাসাগর। সহপাঠী মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ আর মদনমোহন তর্কালঙ্কার। যদিও স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন হরনাথ তর্কভূষণ, কিন্তু শিক্ষক হিসেবে তত মনোযোগী ছিলেন না বলেই বিদ্যাসাগর পড়তেন হরচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে। এই শ্রেণীতে এক বছর পড়ার পর বার্ষিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় হওয়ার সুবাদে ৮০ টাকা পুরস্কার। এ ছাড়াও সংস্কৃত গদ্য রচনার জন্যে আরও ১০০ টাকা।

৮ টাকা বৃত্তি পেয়ে হেয়ার স্কুল থেকে 'জুনিয়র স্কলারশিপ' পরীক্ষায় পাস করলেন প্যারীচরণ সরকার। এর পরে পড়বেন হিন্দু কলেজে।

সম্ভবত এই বছরেই 'সংবাদ মৃত্যুঞ্জয়ী' সাপ্তাহিকের প্রকাশ। অন্য সব পত্রিকার থেকে এটি আলাদা ছন্দের সূত্রে। বিজ্ঞাপন থেকে সংবাদ সম্পাদকীয় সব ছাপা হতো ছন্দে। নমুনা অবশ্য মারাত্মক।

> "আমাদের যে বিজ্ঞাপন দিবে গো।
> তাঁহার পঁক্তির প্রতি মূল্য চার আনা গো।
> চারি ঘোড়ার গাড়ি চড়ে গতকাল বিকালে গো।
> গিয়াছেন গবনর সাহেব চানকের বাগানে গো।
> কলিকালে জত সব ভালো মানুষের ছেলে গো।
> লেখাপড়া শিখে কেহ ধর্ম কর্ম মানে না গো।"

সম্পাদক, পার্বতীচরণ দাস। বেশি দিন চলে নি।

শিবচন্দ্র দেব হয়ে গেলেন বালেশ্বরের ডেপুটি কালেক্টর।

পিতৃবিয়োগ লালবিহারী দে-র। এক জ্ঞাতিভায়ের বাসায় কষ্টে-সৃষ্টে থেকেই এরপর পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া। প্রবল ইচ্ছে হিন্দু কলেজে পড়ার। কিন্তু ডাফ সাহেবের স্কুলের ছাত্র শুনে ডেভিড হেয়ার ভর্তি করতে অনিচ্ছুক। তাঁর অভিযোগ—'তুমি নিউ টেষ্টামেন্ট পড়ো ; তাহলে তুমি আধা খৃষ্টান, তুমি আমার ছেলেদের নষ্ট করবে।'

'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়'-এর প্রথম দু-বছরের সম্পাদক হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঢাকা কলেজের অধ্যাপক হয়ে গেলে, পরের দু-বছরেব সম্পাদক হলেন উদয়চাঁদ আঢ্য।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লাইব্রেরীয়ান পণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার-এব সম্পাদনায় বেবল 'ব্যবহার বিচাব শব্দাভিধান'। একই শব্দ বাংলার নানা জায়গায ব্যবহার হয নানা ভিন্ন অর্থে। এই সমস্যাকে ঘুচিয়ে আদালতেব বিচাব-কাজকে সাহায্য করতেই এই অভিধান।

বেবল 'পারস্য বঙ্গীয় ভাষাভিধান'। সংকলক, নীলকমল মুস্তফী। ছিলেন নদীয়া জেলার জজ-সেরেস্তাদাব। তিন হাজাব ফারসী শব্দের বাংলা অর্থ নিয়ে এই প্রথম এ জাতীয় অভিধান।

বেবল জযগোপাল তর্কালঙ্কাবেব 'পারসীক অভিধান'।

> "... অনন্তর ক্রমে যেমন যবনেরদের ভারতরাজাধিপত্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল তেমন রাজকীয় ভাষা বোধে সর্ব্বত্র সমাদর হওয়াতে যাবনিক ভাষার উত্তরোত্তর এমত্ বৃদ্ধি হইল যে অন্য সকল ভাষাকে পরাস্ত করিয়া আপনি বর্ধিষ্ণু হইল এবং অনেক অনেক স্থানে বঙ্গভাষাকে দূর কবিয়া স্বয়ং প্রভুত্ব করিতে লাগিল বিষয় কর্ম্মে বিশেষত বিচাবস্থানে অন্য ভাষার সম্পর্কও বাখিল না তবে যে কোন স্থলে অন্য ভাষা দেখা যায সে কেবল নাম মাত্র। সুতরাং আমাদেব বঙ্গভাষার তাদৃশ সমাদর না থাকাতে এইক্ষণে অনেক সাধুভাষা লুপ্তপ্রায় হইযাছে এবং চিরদিন অনালোচনাতে বিস্মৃতিকূপে মগ্না হইয়াছে যদ্যপি তাহার উদ্ধার করা অতি দুঃসাধ্য তথাপি আমি বহুপরিশ্রমে ক্রমে ক্রমে শব্দ সংকলন করিয়া সেই বিদেশীয় ভাষাস্থলে স্বদেশীয় সাধু ভাষা পুনঃ সংস্থাপন করিবাব কারণ এই পারসীক অভিধান সংগ্রহ কবিলাম।..."

বেরল জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের 'বঙ্গাভিধান'।

কেশবচন্দ্র সেন-এব সহকারী, 'কেশব আকাদেমি'-র প্রতিষ্ঠাতা প্রসন্নকুমার সেন-এর জন্ম হুগলিব গরিফায।

ডি. গুপ্ত নামে খ্যাত চিকিৎসক দ্বাবকানাথের জন্ম।

কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়-এর জন্ম বরিশালের মীরপুরে। বাবা, গৌরাঙ্গসুন্দর।

বিখ্যাত চিকিৎসক ও রসায়নবিদ নবীনচন্দ্র মিত্রের জন্ম চব্বিশ পরগনার নৈহাটীতে। বাবা, রামনাথ।

কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণীতে মৃৎশিল্পী আর শিল্পশিক্ষক যদুনাথ পাল-এর জন্ম। বাবা, আনন্দ।

পরীক্ষায় প্রথম হয়ে হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হলেন ভোলানাথ চন্দ্র।

টমাস মুরের লেখা 'Letters and Journals of Lord Byron' বেরিয়েছিল ১৮৩০-এ।

১৮৪০-এর আগেই বেরিয়ে যায় এর চারটে সংস্করণ। মধুসূদন কিনলেন এই বছরে বেরনো সংস্করণটি। ছোট হরফে ছাপা ৭৩৫ পাতার বই। বায়রন তখন মধুসূদনের মনের নায়ক।

৯৭ বছর বয়সে রামনিধি গুপ্তের (নিধুবাবু) প্রয়াণ। পলাশী যুদ্ধের ১৬ বছর আগে জন্ম। কলকাতার কুমোরটুলির বাসিন্দা হলেও, বর্গী আক্রমণের সময় তাঁর বাবা চলে গিয়েছিলেন ত্রিবেণীর চাপড়া গ্রামে। সেখানেই নিধুবাবুর জন্ম। ৬ বছর বয়সে ফিরে আসেন কলকাতায়। সংস্কৃত, ফার্সি ছাড়াও জানতেন ইংরেজি।

ঢাকার প্রথম বাংলা মাসিকপত্র 'কবিতা কুসুমাবলী'-র প্রকাশক, 'ঢাকার রত্নস্বরূপ' হরিশচন্দ্র মিত্রের জন্ম। বাবা, অভয়াচরণ। পৈত্রিক নিবাস, হাওড়া শালিখা।

ফেব্রুয়ারি

হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুলের এলাকাতেই ৫৩ জন হিন্দু আর ৩ জন মুসলমান ছাত্রকে নিয়ে খুলল 'ইনফ্যাণ্ট স্কুল'। প্রধান শিক্ষক মিঃ গোমেশ। খরচ জোগাতো হুগলী কলেজই।

টাউন হলে ভোজসভা. ফ্রী-প্রেস-এর তিন বছর পূর্তি উপলক্ষে। দ্বারকানাথ ঠাকুর তখন পশ্চিমভাবতে, সভায় যোগ দিতে না পারার জন্যে ক্ষমা চেয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন একটা চিঠি। শোনানো হল সভায়। তাঁর নামে টোস্ট প্রস্তাব এইচ. এম. পার্কারের। কুখ্যাত প্রেস-অ্যাকট চালু হযেছিল ১৮২৩-এ। বাতিল ১৮৩৫-এর ১৫ সেপ্টেম্বরে।

৫ ফেব্রুয়ারি

দ্বারকানাথ ঠাকুর 'ডিসট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি'কে দান করলেন এক লাখ টাকা, প্রধানত অন্ধদের সাহায্যে। পরে টাকা জুগিয়েছেন আরো। সোসাইটি তৈরি হয়েছিল 'কলিকাতাবাসী এতদ্দেশীয দরিদ্র লোকের দিগের উপকারার্থে'।

> "দানেব টাকা স্বতন্ত্র জমা রাখার সিদ্ধান্ত হয় এবং স্থির হয় তহবিলের নাম হবে 'দ্বারকানাথ ফাণ্ড'। অলকাসুন্দরীর জীবৎকালে দ্বারকানাথ এক লাখ উপর শতকরা সোসাইটিকে সূদ দেবেন বলে স্থির হয। মৃত্যুর পব ফাণ্ডের সমস্ত টাকা সোসাইটির হাতে আসবে এবং তখন সোসাইটিই স্থির কববেন কীভাবে সে টাকা বিনিয়োগ করা হবে।"
>
> দ্বারকানাথ ঠাকুর/কৃষ্ণ কৃপালনী

২০ ফেব্রুয়ারি

ইযং বেঙ্গল গোষ্ঠীর ৫ জন বিশিষ্ট প্রতিনিধিরূপে তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, তাঁরাচাদ চক্রবর্তী আর রাজকৃষ্ণ দে-র স্বাক্ষর-করা এক আবেদনপত্রেব প্রচার, দেশের বিভিন্ন সমস্যা নিযমিত আলোচনার জন্যে একটা সংগঠন গড়তে চেয়ে। তারই জন্যে আগামী ১২ মার্চ সংস্কৃত কলেজে সভা।

২৫ ফেব্রুয়ারি

হিন্দু কলেজে জমিদারদের এক প্রাথমিক আলোচনা সভা, জমিদারদের স্বার্থরক্ষার জন্যে 'ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি' নামে সংগঠন গড়ার ইচ্ছেয়। সভাপতি, রাধাকান্ত দেব। সমস্ত আলোচনাই বাংলায়। তৈরি হল ৪০ দফা কর্মসূচী। 'বেঙ্গল হরকরা'-র মতে ভারতবর্ষে সমস্বার্থের মানুষদের একসূত্রে গাঁথবার মতো সংগঠনের সূচনা হল এই সোসাইটি থেকেই।

১৮৩৭ থেকে দ্বারকানাথ ঠাকুরের মাথায় ঘুরছিল এই সোসাইটি গড়ার ভাবনা।

২৮ ফেব্রুয়ারি

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি, প্রেসিডেন্সি কলেজের আইনের অধ্যাপক চন্দ্রমাধব ঘোষ-এর জন্ম ঢাকার বিক্রমপুরে। বাবা, দুর্গাপ্রসাদ।

মার্চ

দ্বারকানাথ ঠাকুরের মাতৃবিয়োগ। তিনি তখন এলাহাবাদে। মা অলকাসুন্দরীব অসুস্থতার খবর পেয়ে স্থলপথে না এসে স্টিমারে চেপে রওনা দিলেন কলকাতায়।

১২ মার্চ

সংস্কৃত কলেজের সভায় ২০০ জনেব উপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল প্রস্তাব যে তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত সভার নাম হবে 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' বা 'সোসাইটি ফব দা অ্যাকুইজিশন অব জেনারেল নলেজ'।

"১৮৩৮ সালেব ২০শে ফেব্রুয়াবি ডিরোজিওপন্থীদের নেতৃত্বে 'সোসাইটি ফব দা অ্যাকুইজিশন অব জেনারেল নলেজ' (জ্ঞানান্বেষণ সমিতি) নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। সভাপতি, তাবাচাঁদ চক্রবর্তী। সহকারী সভাপতি, বামগোপাল ঘোষ, সেক্রেটাবিদ্বয় প্যাবীচাঁদ মিত্র ও রামতনু লাহিড়ী।
১৮৩৮ সালের ১২ই মার্চ এই সোসাইটির কাজ আবস্ত হয।
ডেভিড হেয়ারকে তাঁরা অনরাবি পরিদর্শক নির্বাচিত করেন। ১৮৪০ ও ১৮৪৩ সালের মধ্যে এই সোসাইটিতে পঠিত নিবন্ধগুলো তিনখানি গ্রন্থে প্রকাশ করা হয়।"

ডিরোজিও ও ইয়ংবেঙ্গল/সুশোভন সরকাব।
ডিরোজিও/রমাপ্রসাদ দে -সম্পাদিত

"ডিরোজিওর মৃত্যুর পর 'একাডেমিক এসোসিয়েশন' হেয়ারের স্কুলে উঠিয়া আসে। এই যুবকদল মহামতি হেয়ারকে তাহার সভাপতিরূপে বরণ করিয়া সভাব কার্য চালাইতে থাকেন। দুঃখের বিষয় ১৮৫৩ সালের মধ্যে ঐ সভা উঠিয়া যায়। এই নব্যবঙ্গেব নেতৃগণ নিরুদ্যম না থাকিয়া, আপনাদের জ্ঞানোন্নতিব জন্য নিজেদের মধ্যে একটি সার্কুলেটিং লাইব্রেরী ও একটি এপিস্টোলারি এসোসিয়েশন স্থাপন কবেন। লাইব্রেরী হইতে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ক্রয কবিয়া বন্ধুগণের পাঠের জন্য বিতরণ করা হইত। এবং এপিস্টোলারি এসোসিয়েশনের যোগে কে কি পড়িলেন, সে বিষয়ে চিঠিপত্রে আলাপ হইত। রামগোপাল ঘোষ ও লাহিড়ী মহাশয় এই দুই কার্য প্রধানভাবে দেখিতেন।
এই সকল ক্ষুদ্র চেষ্টা অবশেষে মহৎ ফল প্রসব করিল। ইঁহাবা অনুভব করিতে লাগিলেন যে নিজেদের জ্ঞানোন্নতির জন্য একটি সভা স্থাপন করা আবশ্যক। তদনুসারে তারিণীচবণ বাঁড়ুয্যে, রামগোপাল ঘোষ, বামতনু লাহিড়ী, তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও বাজকৃষ্ণ দে, এই কয়েকজন স্বাক্ষর করিয়া ১৮৩৮ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি দিবসে এক অনুষ্ঠান-পত্র বাহির করিলেন। তাহাতে এক নূতন সভার প্রস্তাব কবিয়া বলা হইল যে সর্ব্ববিধ জ্ঞান উপার্জনে পরস্পরের সহায়তা করা ও পরস্পরের মধ্যে প্রীতিবর্দ্ধন করা উক্ত সভাব উদ্দেশ্য। এই অনুষ্ঠান-পত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অপর কথা এই তাঁহারা প্রস্তাব করিলেন যে, এই নিয়ম করা উচিত যে যিনি বক্তৃতা দিব বলিয়া সমুচিত কারণ ভিন্ন বক্তৃতা না দিবেন, তাঁহাকে জরিমানা দিতে হইবে। এরূপ নিয়ম কোনও সভাতে পূর্ব্বে দেখা যায় নাই। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে তাঁহারা কিরূপ চিত্তের একাগ্রতার সহিত উক্ত কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন সেক্রেটারী রামকমল সেন মহাশয়ের নিকট হইতে উক্ত কলেজের হল চাহিয়া লইয়া সেখানে নব্যশিক্ষিত দলের এই সভা আহ্বান করা হইল।

... ঐ সভাতে কিরূপ বিষয় সকলের আলোচনা হইত, তাহার ভাব পাঠকগণের গোচর করিবার জন্য কয়েকজন বক্তার ও তাঁহাদের আলোচিত বিষয়ের নাম উদ্ধৃত করিতেছি—

K. M. Banerjee
Reform-— civil and social – among educated natives.
Hurro Chunder Ghosh
Topographical and statistical sketch of Bankurah.
Mahesh Chunder Deb
Condition of Hindu Women.
Govind Ch. Sen.
Brief outline of the History of Hindustan.
Govind Ch. Bysak
Descriptive notices of Chittagong.
Peary Chandra Mitra
State of Hindusthan under the Hindus.
Govinda Ch Bysak
Descriptive notices of Tipperah.
Prosonno Kumar Mitra
The Physiology of Dissection."

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ/শিবনাথ শাস্ত্রী

১৯ মার্চ

'শিষ্ট বিশিষ্ট মান্য জমিদারদের' উপস্থিতিতে টাউন হলের সভায় প্রতিষ্ঠিত হল 'বেঙ্গল ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি' বা 'ভূম্যধিকারী সভা'। সভায় অংশগ্রহণকারী জমিদারের সংখ্যা দুশো। এ ছাড়া হাজির ছিলেন ডেভিড হেয়ার, জর্জ প্রিন্সেপ. টি. ডিকেন্স-এর মতো কয়েকজন য়ুরোপীয়ও। দ্বারকানাথ ঠাকুরের নিজের ঘরের পাশের ঘরেই গোড়ার দিকে বসত এই সোসাইটির অধিবেশন। সোসাইটি গড়ে ওঠাব আগে ১৮৩৭-এর ১২ নভেম্বরে হিন্দু কলেজের এক বৈঠকে প্রথম আলোচনা হয়, এই জাতীয় সোসাইটি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে। সেখানে একমত হয়েই গড়া হল একটা কমিটি, যারা খাড়া করবে এর 'the draft of a prospectus and a set of rules, regulations and by-laws.' কমিটিতে ছিলেন রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, ভবানীচরণ মিত্র, প্রসন্নকুমার ঠাকুর। কমিটির উপর সভার নির্দেশ—

"সমাজের বিধান প্রস্তুতকরণ সময়ে ইহা স্মরণ রাখিবেন যে এই সমাজ জাতি কি দেশ কি বর্ণ কিছু বিভেদ না করিয়া সর্ব্বপ্রকার লোকের নিমিত্ত স্থাপন হইল, অতএব তাহার বহির্ভূত কেহই থাকিবেন না। এই সমাজের এমত সাধারণ নিয়ম হইবে যে তদ্দারা সর্ব্বপ্রকার ব্যক্তিই তাহাতে প্রবিষ্ট হইতে পারেন। এবং দেশের মধ্যে যে কোনো ব্যক্তি ভূমি সম্পর্কীয় হন তিনি স্বচ্ছন্দে ঐ সমাজের অন্তঃপাতী হইতে পারেন।"

কথার প্যাঁচে মনে হতে পারে যে সর্বসাধারণের জন্যেই বুঝি এর দরজা খুলে রাখা। আসলে 'ভূমি সম্পর্কীয়' মানেই কেবল জমিদারদের দিকেই ইঙ্গিত। প্রজা স্বার্থ নয়। জমিদারদের নিজস্ব স্বার্থেই এই সভা। ইংরেজ সরকার নিষ্কর জমি বাজেয়াপ্ত করার কথা ভাবছে তখন। সেটাই জমিদারদের আতঙ্কিত আর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আসল কারণ। ১৯ মার্চ-এর সভায় সভাপতি ছিলেন রাধাকান্ত দেব। সভা শুরু হয়েছিল বিকেল চারটেয়। শেষ সাড়ে পাঁচটায়। রামকমল সেন তাঁর ভাষণে বলেছিলেন— "এই বৈঠকের তাবৎ ব্যাপার বঙ্গভাষাতে প্রকাশ করিতে আমাদের কল্প আছে।" টি. ডিকেন্স ছাড়া সকলেই ভাষণ দিয়েছিলেন বাংলায়। এই

উদ্বোধন-এর পর সোসাইটির স্থায়ী আপিস গড়ে ওঠে ক্লাইভ ঘাট স্ট্রিটে। সেখানেই নিয়মিত অধিবেশন। সভার কাজের মধ্যে ছিল গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। তিনমাস পরপর মিলিত হতেন সভ্যরা। গোপন ভোটে বা ব্যালটে নির্বাচিত হত ১২ জনের কার্যকরী সমিতি। সদস্য হতে চাইলে ভর্তির ফি ৫ টাকা। বার্ষিক চাঁদা ২০ টাকা। একেবারে গোড়ায় এই সভার নাম ছিল অন্য। Zamindary Association। পিছনে জনসাধারণ নেই, প্রধানত বিশেষ এক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষাই এর মৌল অভিপ্রায়, এমন অভিযোগ সত্ত্বেও ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ মনে করেন আধুনিক যুগের রাজনৈতিক চেতনা-বিকাশের দিক থেকে দেখলে ইতিহাসে একটা বিশিষ্ট স্থান রয়েছে এর।

> "সে যুগের বাঙালী নেতারা এই 'রাজনৈতিক সমাজ' সম্বন্ধে কিরূপ উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন ১৮৬৮ সনে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের একটি ভাষণের নিম্নলিখিত উক্তি হইতে তাহা কতকটা অনুমান করা যায়– 'এই সমাজই সর্বপ্রথমে জনসাধারণকে বিধিসঙ্গত উপায়ে (Constitutionally) নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও ন্যায্য অধিকারের দাবী করা ও এ বিষয়ে প্রকাশ্যে স্বাধীন মত প্রকাশের পথ প্রদর্শন করে। বাহ্যতঃ জমিদারের স্বার্থের দিকেই ইহার দৃষ্টি ছিল, কিন্তু জমিদার ও প্রজাদের স্বার্থ এমনভাবে বিজড়িত যে একের উপকারে অন্যের উপকার, একের অপকারে অন্যের অপকার। সুতরাং এই সমাজের দ্বারা পরোক্ষে প্রজাদেরও স্বার্থ রক্ষা হইত।'
>
> এই উক্তি সর্বথা সত্য বলিয়া মানিয়া না লইলেও 'ভূম্যধিকারী সমাজের প্রতিষ্ঠা'-কে এ দেশের রাজনীতিক আন্দোলন ও তাহার ফলে যে মুক্তি সংগ্রামের উদ্ভব হয়, তাহার অগ্রদূত বলা যাইতে পারে। কারণ এই সমাজ দ্বারা যে শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের রাজনীতিক লক্ষ্য ও আদর্শ অনেক প্রগতিশীল হয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"
>
> বাংলা দেশের ইতিহাস/রমেশচন্দ্র মজুমদার

২১ মার্চ

'ইংলিশম্যানে'র সংবাদে জানা গেল, গতকাল কলকাতায় ফিরেছেন দ্বারকানাথ। কিন্তু ততক্ষণে শেষ হয়ে গেছে মায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। তবে মায়ের শ্রাদ্ধটা করেছিলেন ঘটা করেই। ৫০ হাজার কাঙালি ভোজন ছাড়াও দক্ষিণা দিয়েছিলেন প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে ৮ আনা, অন্যদের ৪ আনা।

১ এপ্রিল

মেডিকেল কলেজের বাড়িতেই তৈরি হল ২০ শয্যার 'ফিভার হসপিটাল'। প্রধান উদ্যোগী, ডেভিড হেয়ার।

৯ এপ্রিল

ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটির এই দিনের অধিবেশনে অনেক নতুন নামের প্রস্তাব। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের প্রস্তাবে হুগলির জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে সদস্য করা হল ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটির।

১৭ এপ্রিল

হুগলির গুলিটা রাজবল্লভ হাটে মামার বাড়িতে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম। বাবা, কৈলাসচন্দ্র।

২৮ এপ্রিল
প্রাচ্য বনাম পাশ্চাত্য শিক্ষা পদ্ধতির দ্বন্দ্ব মেটাতে বড়লাট বেণ্টিঙ্ক অ্যাডাম সাহেবকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন তদন্তের। এই তারিখে তাঁর তিন খণ্ডের রিপোর্ট পেশ সরকারের কাছে। অ্যাডাম ছিলেন মেকলের 'filtration theory'-র বিরুদ্ধে। মেকলে চেয়েছিলেন শিক্ষা উঁচু তলা থেকে চুইয়ে নামবে নীচের দিকে। অ্যাডাম চাইতেন, শিক্ষা নীচু তলা থেকে উঠে আসুক উপরে। পাঠশালাই হওয়া উচিত জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি।
১৮৩৫-এর ২ ফেব্রুয়ারি মেকলে তাঁর শিক্ষাসম্বন্ধীয় মন্তব্যে লিখেছিলেন—

> "যে কোন উৎকৃষ্ট য়ুরোপীয় পুস্তকালয়ের এক আলমারি সমগ্র সংস্কৃত ও আরব্য সাহিত্যের সমতুল্য"।

এরই সমর্থনে তাঁর দীর্ঘ আলোচনার উপসংহার ছিল—

> "ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, আমরা ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের পার্লিয়ামেণ্ট বিধির দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ নহি, আমরা প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য কোনও প্রতিজ্ঞা দ্বারা আবদ্ধ নহি, আমরা আমাদের ধনভাণ্ডার যেরূপে ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পারি; যাহা জানা আবশ্যক তাহারই শিক্ষা দিবার জন্য আমাদের ইহার ব্যবহার করা কর্তব্য; সংস্কৃত অথবা আরবী ভাষা অপেক্ষা ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অধিক; দেশবাসীগণ ইংরাজী শিক্ষা করিতে সমুৎসুক; ধর্ম অথবা ব্যবহারশাস্ত্রের ভাষা বলিয়া সংস্কৃত অথবা আরবী ভাষা প্রচার করিবার বিশেষ কারণ বিদ্যমান নাই; এতদ্দেশীয় লেখকদিগকে ইংরাজীতে সুপণ্ডিত করা সম্ভব; এই উদ্দেশ্যে আমাদের সকল চেষ্টা প্রযুক্ত করা উচিত।"

মে
আলেকজাণ্ডার ডাফ-এর 'জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনসটিটিউশন' উঠে এল নিজেদের বাড়িতে, হেদুয়ার পূর্ব পাড়ে।

১৬ মে
'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'-র প্রথম অধিবেশন। সভার কাজ চলত ইংরেজি আর বাংলা দুটোতেই। ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, দর্শন, সমাজ, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে পাঠ করা হত প্রবন্ধ। পরে তা নিয়ে আলোচনা। ১৮৪০, ৪১, ৪৩-এ সভায় পাঠ কবা প্রবন্ধ নিয়ে তিনটে সংকলন বেরয় 'Selection of Discourses Delivered at the meeting of the Society for the Acquisition of General Knowledge' নামে। এই দিনের সভায় প্রথম বক্তৃতা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বিষয়, 'On the Nature and Importance of Historical Studies.'
এ দেশের ইতিহাস-চর্চায় এই প্রথম আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা। ইতিহাস যে পরম করুণাময়ের আশীর্বাদ নয়, অতীত আর বর্তমানের জীবনের মধ্যে কার্যকারণময় যোগসূত্র আবিষ্কারের একটা পদ্ধতি, এই প্রথম স্বীকৃতি পেল একজন ভারতীয়ের কণ্ঠস্বরে। আজকের স্বনামধন্য ঐতিহাসিক ই. এইচ. কার-এর মুখ থেকে আমরা শুনছি—'ইতিহাস হল অতীত আর বর্তমানের মধ্যে কথোপকথন, যার সাহায্যে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও কিছু বোঝা যায়'। কৃষ্ণমোহন কার পড়েননি, পড়া সম্ভব ছিল না বলেই। কিন্তু না-পড়েই, এমন-কি ঐতিহাসিক না হয়েও, তিনি, ব্যক্তিগত বিরল প্রতিভার জোরেই, পৌঁছে যেতে পেরেছিলেন ঐ একই সত্য-উপলব্ধির স্তরে। বলতে পেরেছিলেন—

> "no blind fate has dictated them, no necessity has linked them together.

no heavenly phenomena have preceded or followed them as necessary antecedents or consequents."

হুগলি জেলার গরলগাছায় উত্তরপাড়া কলেজের প্রিন্সিপ্যাল আর বিখ্যাত 'ওয়ার্ডবুক'-প্রণেতা শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম। বাবা, হরিরাম। হিন্দু কলেজে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহপাঠী।

১৩ জুন

কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহপাঠী প্রাবন্ধিক নীলমণি কুমারের জন্ম।

'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'-য় উদয়চরণ আঢ্যের বক্তৃতা। বিষয়, 'এতদ্দেশীয় লোকদিগের বাংলাভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করণের আবশ্যকতা প্রস্তাব'।

বাংলা ভাষা সম্পর্কে ইংরেজনবীশ ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়কে ক্রমশই সচেতন হয়ে উঠতে দেখা যাবে এর পরে।

৮ জুলাই

টাউন হলে সুপ্রীম কোর্ট ও মফঃস্বল কোর্টে জুরী ব্যবস্থা প্রচলনেব পক্ষে দ্বারকানাথ ঠাকুরের বক্তৃতা।

১০ জুলাই

টাউন হলে গণপ্রতিবাদ জানাতে জনসভা। ১৮৩৫ থেকে মরিশাস আর বুর্বঁতে ভারতীয় শ্রমিক বা কুলি-চালানের শুরু। ক্রমে দেখা গেল অনেককেই পাঠানো হচ্ছে ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে। পটলডাঙার বাড়িতে আটকে রাখা এ-রকম একশোর বেশি শ্রমিক চোখে পড়ে ডেভিড হেয়ারের। মিঃ ক্লার্ক-এর সহযোগিতায় মুক্তি দেওয়া হয় তাদের। তারপরই বিভিন্ন উপনিবেশে কুলি-চালানের এই অন্যায় প্রথার বিরুদ্ধে এই জনসভা। এখান থেকেই ঠিক হয়, সরকারের কাছে পাঠানো হবে একটি আবেদন পত্র। জনসভায় ভাষণ দিয়েছিলেন বিশপ উইলসন, ডাঃ চার্লস, রেভারেণ্ড টি. বোয়াজ, মিঃ টি. ডিকেন্স, মিঃ এল. ক্লার্ক, দ্বারকানাথ ঠাকুর, ডঃ ডানকান স্টুয়ার্ট প্রমুখেরা।

আগস্ট

কুলি-চালান সংক্রান্ত সরকারি কমিটিতে ডেভিড হেয়াবের সাক্ষ্য।

> "আমাদের মনে হয় সন্দেহাতীতভাবে এ কথা প্রমাণ করা হয়েছে যে মরিশাস এবং অন্যান্য জায়গায় যে-সমস্ত এদেশীয় লোকেদেব চালান দেওয়া হয়, সাধারণত দেশীয় দালালরাই নানারকমভাবে ভুলিয়ে-ভালিয়ে প্রতারণা করে তাদের কলকাতায় নিয়ে আসে। এই সমস্ত দালালদের বলা হয় দফাদার বা আড়কাঠি। ইউরোপীয় এবং অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ঠিকাদার কিংবা জাহাজ ব্যবসায়ীরা এদের নিযুক্ত করে। এরা এই সব প্রতারণার কথা বেশ ভালোভাবেই জানে এবং প্রত্যেকটি কুলি চালান দেওয়ার জন্যে বেশ মোটা রকমের টাকা পায়।"

২ সেপ্টেম্বর

নদীয়ার উলা বীরনগরের মামার বাড়িতে হাটখোলার দত্ত বংশের কেদারনাথ দত্তের জন্ম।

শিক্ষকতা দিয়ে জীবনের শুরু। পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। বই লিখেছেন বাংলা, ইংরেজি আর উর্দুতে। সম্পাদনা করেছেন ‘সজ্জন তোষণী’ পত্রিকা।

৩০ অক্টোবর

কলকাতা মেডিকেল কলেজে উপাধি পরীক্ষার শুরু। সাতদিনের পরীক্ষায় ১১ জন ছাত্রের মধ্যে পাস মোট ৫ জনের। উমাচরণ শেঠ, দ্বারকানাথ গুপ্ত, রামকৃষ্ণ দে, নবীনচন্দ্র মিত্র, আর শ্যামাচরণ দত্ত। প্রথম হওয়ার সুবাদে গভর্নর অকল্যাণ্ডের কাছ' থেকে সোনার ঘড়ি উপহার পেয়েছিলেন উমাচরণ। ছাত্রদের উৎসাহ জোগাতে দ্বারকানাথ ঠাকুর, রুস্তমজী কাওয়াসজী, রামকমল সেন, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখেরা চালু করেছিলেন নানা রকম বৃত্তি আর পুরস্কার। ১৮৪৬-৪৭-এ এডুকেশন কাউন্সিলের সুপারিশে সরকারের নিষেধনামায় উঠে যায় এ-সব বৃত্তি আর পুরস্কারের প্রথা।

১৯ নভেম্বর

কলকাতায় কেশবচন্দ্র সেন-এর জন্ম। বাবা, প্যারীমোহন। মা, সারদাসুন্দরী। ঠাকুর্দা, রামকমল সেন। তিনি কেশবচন্দ্রকে ডাকতেন ‘বিশু’। মারা যাওয়ার আগে ছেলে প্যারীমোহনকে বলেছিলেন— "Peary! Your son Bisu is destined to be a great man--- a religious reformer."

১৮৩৯

বছরের প্রধান ঘটনাবলী

এই বছরের মাঝামাঝি সময়ে প্যারীচরণ সরকার হিন্দু কলেজের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম হলেন গণিতে।

এই বছবেই কৃষ্ণনগরে মিশনারি বিদ্যালয়-এব প্রতিষ্ঠা। উমেশচন্দ্র দত্তগুপ্ত ভর্তি হলেন এখানেই।

> "কিন্তু তাঁর ছাত্রাবস্থাতেই এই বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে একটা বড় আন্দোলন হয়। মিশনারীরা চিন্তামণি সরকারকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত কবলে স্কুলেব শিক্ষক ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করেন। এই সময়ে ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন ব্যক্তিব প্রচেষ্টায় কৃষ্ণনগর এ. ভি. স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এক সময় এই বিদ্যালয়ের নাম ছিল ব্রজমোহন স্কুল। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উমেশচন্দ্রেরও ভূমিকা ছিল। মিশনাবী বিদ্যালয় উমেশচন্দ্রের প্রত্যাশা পূর্ণ করতে পারেনি। ফলতঃ তিনি এই বিদ্যালয় ত্যাগ করে পুণ্যশ্লোক রামতনু লাহিড়ীর অনুজ প্রসাদ লাহিড়ীর কাছে ইংরেজি অধ্যয়ন শুরু করেন।"
>
> সেকালের শিক্ষাগুরু/হারাধন দত্ত

ভূদেব মুখোপাধ্যায় ভর্তি হলেন হিন্দু কলেজের জুনিয়র স্কুলের সপ্তম শ্রেণীতে। মধুসূদন ছাড়াও সহপাঠী পেলেন রাজনারায়ণ বসু, গৌরদাস বসাক, বঙ্কুবিহারী দত্ত আর শ্যামাচরণ লাহাকে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভর্তি হলেন সংস্কৃত কলেজের ন্যায় শ্রেণীতে। অধ্যাপক নিমাইচাঁদ শিরোমণি।

মেডিকেল কলেজের সঙ্গে খোলা হল হিন্দুস্থানী ক্লাস। আরো দুটো নাম ছিল এর। মিলিটারি ক্লাস আর সেকেণ্ডারি ক্লাস। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ছাত্রদের এখানে হিন্দুস্থানী ভাষায় শেখানো হত চিকিৎসাবিদ্যা।

ছাত্রাবস্থাতেই নিমতলার ধর্মদাস দত্তের তৃতীয় কন্যা সৌদামিনী দেবীর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল রাজেন্দ্রলাল মিত্রের, ১৭ বছর বয়সে। এই সময়ে পিসিমা মারা গেলে তিনি কলকাতা থেকে ফিরে যান শুঁড়োয়। পিসিমার কাছে থাকার সময়ই তিনি ভর্তি হয়েছিলেন জোড়াসাঁকোর রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের বাড়িতে বসা পাঠশালায়। সেখানে তিন বছর পড়ে আট বছর বয়সে ভর্তি হন পাথুরেঘাটার ক্ষেম বসুর ইংরেজি স্কুলে। ১৮৩৪-এ ভর্তি হয়েছিলেন গোবিন্দচন্দ্র বসাকের হিন্দু ফ্রি স্কুলে।

ঢাকার মানিকগঞ্জের বায়রা গ্রামে মামার বাড়িতে দীননাথ সেন-এর জন্ম। ঢাকায় ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা তিনি। ঢাকার সাংস্কৃতিক-সামাজিক ইতিহাসেও ছিলেন একজন উল্লেখযোগ্য মানুষ। ১৮৯৮-এ প্রথমবার ঢাকায় এসে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'ঢাকার দর্শনীয় জিনিষ তিনটি, প্রথমে মা ঢাকেশ্বরী, তারপর কালীপ্রসন্ন বাবু ও দীননাথ বাবু'। কালীপ্রসন্ন হলেন বিখ্যাত 'বান্ধব' পত্রিকার সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ। দীননাথ প্রথম জীবনে ছিলেন নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক। পরে ক্রমান্বয়ে অ্যাসিস্টান্ট ইনস্পেকটর থেকে ইনস্পেকটর। একাধিক শিক্ষা-বিষয়ক বইয়ের রচয়িতা। বাবা, গোকুলচন্দ্র।

হুগলির রাধানগর-কৃষ্ণনগরে রাজকুমার সর্বাধিকারীর জন্ম। বাবা, যদুনাথ। বি.এ. বি.এল. পাস করে লক্ষ্ণৌ-এ গিয়ে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সহায়তায় সহ সম্পাদক হয়ে যাবেন 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সভা' আর 'সমবায় হিন্দুস্থানী' পত্রিকার।

১৯ জানুয়ারি

দ্বারকানাথ ঠাকুরের চতুর্থ পুত্র ভূপেন্দ্রনাথের মৃত্যু মাত্র ১৩ বছর বয়সে।

২১ জানুয়ারি

দ্বারকানাথ ঠাকুরের পত্নী দিগম্বরী দেবীর মৃত্যু।

২৪ জানুয়ারি

'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' লিখলে, দ্বারকানাথের পরিবারে দুটি শোকাবহ ঘটনা পর পর ঘটে যাওয়ার ফলে তিনি খুবই কাতর হয়েছেন। তাঁর মধুর স্বভাবের প্রতিশ্রুতিমান তেরো বছরের পুত্রটি গত শনিবার অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। পরবর্তী দিবসেই তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ায় দ্বারকানাথের শোক গভীরতর হয়েছে।

১ ফেব্রুয়ারি

এগ্রি-কালচারাল অ্যাণ্ড হর্টি-কালচারাল সোসাইটি-র এক ভোজসভায় সভাপতি সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড রায়ান। তিনি তখন ঐ সোসাইটিরও সভাপতি। হাজির ৮০ জন সদস্য। ডেভিড হেয়ারের সুস্বাস্থ্য কামনা করে সভাপতি পানপাত্র তুলে নেওয়ার আগে জানালেন যে, হেয়ার শুধু নিজের সর্বশক্তি দিয়ে নয়, নিজের রোজগারের সমস্ত অর্থ দিয়েও সাহায্য করেছেন এদেশের শিক্ষা বিস্তারকে।

২৬ ফেব্রুয়ারি

টাউন হলের সভায় গড়া হল 'কলিকাতা মিকানিক ইনস্টিটিউট' বা 'মেকানিকস্ ইনস্টিটিউট',

সভাপতি, স্যার জন পিটার গ্রান্ট। সহ সভাপতি, রেভারেণ্ড টি. ভোয়াজ আর ডা. ফ্রেডারিক করবিন। অবৈতনিক যুগ্ম সম্পাদক কোল্‌সওয়ার্দি গ্রান্ট আর তাঁর দাদা জর্জ। উদ্দেশ্য, শিল্পকলার, বিশেষ করে শ্রমজাত শিল্প বিষয়ে, শিক্ষাদান। অধিকাংশ সদস্যই ইংরেজ। দেশীয় মাত্র ৩ জন। রমানাথ ঠাকুর, হরিমোহন ঘোষ আর প্যারীচাঁদ মিত্র। প্রতিষ্ঠানটি স্থায়ী হয়নি বেশি দিন। কিন্তু কলকাতার ভবিষ্যৎ শিল্পচর্চার সূচনা হবে এখান থেকেই। উঠে যাওয়ার পর এর পুনঃপ্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব দিয়ে লেখালেখি ছাপা হয়েছিল 'সংবাদ প্রভাকরে'।

> "মেকানিক্‌স ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা একটা সামাজিক আন্দোলন হিসেবে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে গড়ে উঠতে থাকে শিল্পবিপ্লবের পর থেকে। শিল্পবিদ্যার বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে, অর্থনীতি রসায়ন বলবিদ্যা ইত্যাদি, শ্রমিকদের বুনিয়াদি শিক্ষাদান করাই এই সব সোসাইটির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ট্রেভেলিয়ানের বিবরণ থেকে বোঝা যায়, উনিশ শতকের দ্বিতীয় প্রহর থেকে ইংলণ্ডে শ্রমিকদের এই আত্মশিক্ষার আন্দোলন বেশ জোরালো হয়ে ওঠে। ১৮২৪ সালে 'মেকানিক্‌স ম্যাগাজিন' ১৬,০০০ কপি শ্রমিকদের মধ্যে বিক্রী হওয়া তার প্রমাণ।
> আমাদের দেশে শিল্প-বিপ্লব হয়নি বটে, কিন্তু ইংরেজদের সংস্পর্শে আসার দরুন ইংলণ্ডের সমাজজীবনের অনেক উপাদান আমরাও লাভ করেছিলাম। তার মধ্যে এই 'মেকানিকস্ ইনস্টিটিউট' একটি। ১৮৩৯ সালে (ইংলণ্ডের খুব বেশি দিন পরে নয়) কলকাতায় 'মেকানিক্‌স ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠিত হয় একই উদ্দেশ্যে, কিন্তু স্বভাবতই সে উদ্দেশ্য সফল হয়নি। ১৮৪৩ সালে ইংলণ্ডের বিখ্যাত সমাজ-সংস্কারক জর্জ টমসন কলকাতায় আসেন এবং এই ইনস্টিটিউটে বক্তৃতাও দেন (টাউন হলে ১৮৪৩, ৭ মার্চ)। তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রতিষ্ঠা অবধি এই ইনস্টিটিউটের কার্যকরী সমিতিব একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন।"
>
> সাময়িকপত্রে বাংলার সামাজচিত্র/বিনয় ঘোষ

মাইকেল মধুসূদনের একাধিক চিঠিতে যে M. I.-এর উল্লেখ, সেটা এই প্রতিষ্ঠান। গৌরদাস বসাক ছাড়াও আরো অনেক সহপাঠীসহ সম্ভবত এখানে ড্রইং শিখতেন মাইকেল।

মার্চ

বেরল 'সংবাদ ভাস্কর' সাপ্তাহিক পত্রিকা, সম্পাদক হিসেবে শ্রীনাথ রায়ের নাম থাকলেও আসলে দেখতেন গৌবীশঙ্কর ভট্টাচার্য। পরে হয়ে যায় অর্ধসাপ্তাহিক আর বারত্রয়িক।

২২ এপ্রিল

হিন্দু ল কমিটির পরীক্ষা দিলেন বিদ্যাসাগর। আদালতের জজ-পণ্ডিত হতে গেলে দিতে হত এই ল পরীক্ষা।

৩০ এপ্রিল

মাতৃভাষায় চিকিৎসাবিদ্যার স্কুল খোলার সরকারি সিদ্ধান্ত।

৮ মে

বিখ্যাত 'মুখার্জিস ম্যাগাজিন'-এর সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জন্ম চব্বিশ পরগনার বরাহনগরে। বাবা, মথুরামোহন।

১৬ মে
ল পরীক্ষার প্রশংসাপত্রে ঈশ্বরচন্দ্রের নামের শেষে দেখা যাবে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি।

৩০ মে
লণ্ডনের 'আসাম কোম্পানী' আর দ্বারকানাথের 'বেঙ্গল টি অ্যাসোসিয়েশন' জুড়ে গিয়ে হল 'আসাম কোম্পানী', এখানে ১০০টি করে শেয়ার ছিল দ্বারকানাথ ঠাকুর আর মতি শীল-এর।

১৪ জুন
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর 'সংবাদ প্রভাকর' হয়ে গেল দৈনিকপত্র।

২১ জুন
প্রেসিডেন্সি কলেজের এখনকার বাড়ির উত্তর-পূর্ব কোণে ডেভিড হেয়ার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন তাঁর পরিকল্পিত আদর্শ পাঠশালার। মাতৃভাষায় লেখাপড়া শেখানোর উদ্দেশ্যকে মনে রেখেই হিন্দু কলেজের পরিচালক সমিতি চেয়েছিলেন হিন্দু কলেজের কাছাকাছি একটা পাঠশালা। এখন যেখানে প্রেসিডেন্সি কলেজ, মিশনারিরা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে সেখানে হিন্দু ছাত্রদের খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করতে গড়তে চেয়েছিল একটা গির্জা। সে গোপন খবর টের পেয়ে গিয়ে ডেভিড হেয়ার, রাজা রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, মতিলাল শীল প্রমুখেরা দল বেঁধে দরবার করলেন লর্ড অকল্যাণ্ডের কাছে। তাঁর হস্তক্ষেপে গির্জা চলে গেল হেদুয়ার পশ্চিম পাড়ে। আর গির্জার জায়গায় গড়া শুরু হল হেয়ার-এর পাঠশালা।

১৪ সেপ্টেম্বর
'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'য় প্যারীচাঁদ মিত্রে প্রথম বক্তৃতা। বিষয় : The Hindus Possess Historical Works. Original Country of Brahmin. The Aborigin of India.

২৭ সেপ্টেম্বর
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচিত হলেন হেদুয়ার ক্রাইস্ট চার্চ গির্জার আচার্য। ১৮৫২ পর্যন্ত ছিলেন এই পদে। তাঁকে নিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ব্যঙ্গ—

"হেদোর এঁদো জল কেউ যেওনা তায়,
কৃষ্ণ বন্দ্যো জটে বুড়ী শিকলি দেবে পায়।"

৬ অকটোবর
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে আচার্য করে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে 'তত্ত্ববোধিনী সভা'-র প্রতিষ্ঠা, মাত্র দশ জন সদস্য নিয়ে। পরের বছরে সংখ্যাটা হয়ে যায় ১০৫। গোড়ায় দেবেন্দ্রনাথ নাম দিয়েছিলেন 'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা'। বিদ্যাবাগীশই পাল্টে করে দেন 'তত্ত্ববোধিনী'।

● মাতৃভাষায় চিকিৎসাবিদ্যা শেখানোর স্কুল খোলা হলে সেখানে শিবচন্দ্র কর্মকার রসায়ন ও ভেষজবিদ্যার আর নবকৃষ্ণ গুপ্ত ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যার অধ্যাপক। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে উর্দুতে পরীক্ষা নিয়ে প্রথম ভর্তি করা হয় ৮০ জন ছাত্রকে।

১৩ নভেম্বর
'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'য় প্যারীচাঁদ মিত্রের দ্বিতীয় বক্তৃতা। বিষয় : Accounts of the remarkable countries and chief cities and how they are governed. The Hindu Republics. Constitutions of Hindu Kingdom.

২৪ নভেম্বর
'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার চতুর্থ সম্পাদক হলেন রামগোপাল ঘোষ।
বড়লাট লর্ড অকল্যাণ্ড প্রকাশ করলেন সরকারি শিক্ষানীতির 'মিনিট' বা নির্দেশপত্র। শিক্ষার জন্যে ব্যয় বরাদ্দ বাড়ল অবশ্য অনেক। ছিল ১ লক্ষ। দাঁড়াল ২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। কিন্তু মাতৃভাষায় শিক্ষাক্রম চালু করার বদলে তিনি জারী করলেন এক ধরনের স্থিতাবস্থা। ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষাদান যেমন চলছে তেমনই চলবে। এখুনি শিক্ষার বাহন পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। তবে শিক্ষা কমিটিকে নির্দেশ দিলেন মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত বইপত্র রচনার দিকে মনোযোগী হতে।

২৯ নভেম্বর
বেরল সাপ্তাহিক 'সম্বাদ রসরাজ'। আসল পরিচালক 'সম্বাদ ভাস্কর'-এর গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। সম্পাদক হিসেবে প্রথম দিকে ছাপা হত কালীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম। পরে গঙ্গাধর ভট্টাচার্যের নাম ছাপা হতে থাকে। গঙ্গাধর মারা গেলে ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়। সাপ্তাহিক থেকে অর্ধ-সাপ্তাহিক হয়ে যায় পরে। 'পাপের দমন ও ধর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি দিবাব জন্য' প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও এই পত্রিকার কাজ ছিল কুৎসা রটনা আর অকথ্য ভাষার গালিগালাজ। হয়তো সেই কারণেই প্রচার সংখ্যা ছিল অন্য সব পত্রিকার চেয়ে বেশি।

৩০ নভেম্বর
'ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি'-র পক্ষ থেকে টাউন হলে বিরাট জনসভা। সভাপতি, ব্যারিস্টার ডিকেন্স। উদ্দেশ্য, ভারত সরকারের পুনর্গ্রহণ-নীতির বিরুদ্ধাচরণ। পুনর্গ্রহণ মানে লাখেরাজ সম্পত্তি ভোগের অধিকার জমিদারদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' তার ২২ মার্চের সংখ্যায় সোসাইটির এই বিরোধিতাকে একপেশে আর স্বার্থপ্রণোদিত আখ্যা দিয়ে লিখেছিল—

> "দীর্ঘকাল ধরে এদেশের লোকেদের মধ্যে বহুল প্রচারিত মত হল এই যে, জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রজাদের যেসব ন্যায্য অভিযোগ আছে তার তুলনায় সরকারের বিরুদ্ধে জমিদারদের অভিযোগ অকিঞ্চিৎকর। আশা করা অন্যায় হবে না যে এখন যেমন জমিদারেরা সংঘবদ্ধ ভাবে সরকারের কাছে তাঁদের অভিযোগের প্রতিকার চাইছেন, তেমনি এক জোট হয়ে তাঁরা প্রজাদের অভাব-অসুবিধা দূরীকরণে যত্নবান হবেন।"

এই দিনের সভায় 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'-র অভিযোগের উত্তরে দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁর জোরালো ভাষার বক্তৃতায় জানালেন যে, সোসাইটির গরিষ্ঠ-সংখ্যক সদস্যদের মধ্যে কেউই লাখেরাজদার নন। তাহলে এর মধ্যে স্বার্থরক্ষার প্রশ্ন আসে কী করে? তাছাড়া সোসাইটি তো শুধু পুনর্গ্রহণ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না। আদালতে মাতৃভাষার প্রচলন, মামলায় সাক্ষ্যদানকারী গরিবদের জন্যে দৈনিক ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা, সরকারি দলিলপত্রে স্ট্যাম্প-শুল্ক হ্রাস করা ইত্যাদি সমস্যাও তো সোসাইটির অন্তর্গত।

৩ ডিসেম্বর
রাজেন্দ্রলাল মিত্র মেডিকেল কলেজে ক্লাস শুরু করলেন ছাত্র হিসেবে।

১৯ ডিসেম্বর
'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' দ্বারকানাথের ৩০ নভেম্বরের বক্তৃতার প্রসঙ্গে, তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধা জানিয়েও লিখলে—

> "এক ধরণের স্বার্থবুদ্ধি আছে যাকে ঠিক নীচ বলা চলে না। স্বজনের' হিত সেখানে লক্ষ্য নয়, সেই রকম গোষ্ঠীগত বা দলগত কোন প্রকার সুবিধার দাবী, আর্থিক দিক থেকে না হলেও নৈতিক দিক থেকে স্বার্থদোষযুক্ত।"

ব্যক্তিস্বার্থ যেমনই হোক, শ্রেণীস্বার্থ দ্বারা চালিত বলেই 'ভূম্যধিকারী সভা'-য় একযোগে মিলতে পেরেছিলেন মধ্যপন্থী প্রসন্নকুমার ঠাকুর আর রক্ষণশীল রাধাকান্ত দেব বা রামকমল সেন-এরা। যদিও সভার ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছিল যে এই সভা বর্ণ জাতি বা দেশ-এর বিভেদ বাদ দিয়েই এই সভার দরজা খোলা থাকবে ভূমি-সম্পর্কীয় সকলের জন্যেই। কিন্তু 'ভূমি-সম্পর্কীয়' অর্থে এখানে প্রজারা নয়, জমিদাররাই আসল। সাধারণ প্রজার পক্ষে বাৎসরিক ২০ টাকা আর ৫ টাকা প্রবেশিকা দিয়ে শহরে এসে সদস্য হওয়ার সম্ভাবনা অবাস্তব।

২৫ ডিসেম্বর
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রস্তাবে তত্ত্ববোধিনী সভার সদস্য হলেন অক্ষয়কুমার দত্ত।

১৮৪০

বছরের প্রধান ঘটনাবলী

এই বছর থেকে শিক্ষাব্যবস্থায় নানা পরিবর্তন। নিয়ম চালু হল, স্কুলেব জুনিয়র বিভাগে তিনভাগের দু-ভাগ সময় পড়ানো হবে ইংরেজি। বাকি এক ভাগ বাংলা। সিনিয়র বিভাগে এক ঘণ্টা বাংলা, বাকি সব সময় ইংরেজি। এই নিয়মে বাংলা শিখিয়েও লাভের ঘরে জমা পড়েনি খুব বেশি কিছু। কারণ একটাই। বাংলা পাঠ্যপুস্তকের অভাব।

ভারতীয় মহিলাদের অশিক্ষাকে মনে রেখে আর স্কুলের আবশ্যকতার উপর জোর দিয়ে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বের করলেন একটি পুস্তিকা—'নেটিভ ফিমেল এডুকেশন'। এই বছরেই বেরবে তাঁর 'উপদেশ কথা'। পাদরি হিসেবে গির্জায় যে-সব উপদেশ দিয়েছেন, বাংলা ভাষায় তারই সংকলন।

এই বছর থেকেই সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার শুরু। এ ছাড়া প্রতিভাবান ছাত্রদের মধ্যে উচ্চতর শিক্ষার আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে চালু হল 'লাইব্রেরী পদক পরীক্ষা' বা 'লাইব্রেবী মেডাল একজামিনেশন'। কলেজ-লাইব্রেরিতে নানাবিধ বই। সে-সব পড়ে যে ছাত্র পরীক্ষায় প্রমাণ করতে পারত নিজের অর্জিত জ্ঞানের ক্ষমতা, পুরস্কার জুটত তারই কপালে। কোনো নির্দিষ্ট বই বা বিষয় ধার্য থাকত না এর জন্যে। এই পরীক্ষায় পুরস্কার পাওয়া অসম্ভব কৃতী ছাত্রের নাম প্যারীচরণ সরকার।

সম্ভবত এই বছরেই হিন্দুমেলার উদ্বোধক নবগোপাল মিত্রর জন্ম।

হুগলির কোন্নগরে শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম। সংস্কৃত কলেজ থেকে পেয়েছিলেন 'বিদ্যা বাচস্পতি' উপাধি। তাঁর লেখা 'ভারতবর্ষের বিশেষ বিবরণ' এক সময় বাংলা-বিহার-আসাম-উড়িষ্যার স্কুল-পাঠশালায় ছিল একমাত্র পাঠ্য পুস্তক। এ ছাড়াও তিনি মানচিত্র রচনা করেছিলেন বাংলা-হিন্দী-ওড়িয়া-কানাড়ি-ইংরেজি আর উর্দু ভাষায়।

বাংলা থিয়েটারের আদি যুগের বিখ্যাত অভিনেতা বিহারীলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম।
চব্বিশ পরগনার রাজারহাট-বিষ্ণুপুরে প্রখ্যাত বিচারপতি স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রর জন্ম। বাবা, রামচন্দ্র।
কটকের জাজপুরে গোপাল উড়ে-র জন্ম। বাবা, মুকুন্দ করণ। চাষী পরিবারের ছেলে অল্প বয়সে জীবিকার খোঁজে কলকাতায় এসে ফল বেচতেন। তাঁব কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হয়ে বিদ্যাসুন্দর যাত্রাদলের কর্তৃপক্ষ দলে টেনে নেন তাঁকে। রাজা নবকৃষ্ণের বাড়িতে বিদ্যাসুন্দর পালায় মালিনীর ভূমিকায় নেমে নাচে-গানে মুগ্ধ করেছিলেন সবাইকে। এরপর তাঁর নিজের তৈরি যাত্রাদল-এর নাম হয়ে যায় 'গোপাল উড়ের দল'।
হেয়ার স্কুল থেকে 'স্কুল বুক সোসাইটি'র নিয়ম অনুযায়ী রাজনারায়ণ বসু ভর্তি হলেন হিন্দু কলেজে। স্কুল সোসাইটির নিয়ম ছিল প্রত্যেক রছর বিভিন্ন স্কুল থেকে ৪০ জন ছাত্র ভর্তি হবে হিন্দু কলেজে। রাজনারায়ণ ভর্তি হয়েছিলেন তৃতীয় শ্রেণী বা থার্ড ক্লাসে। এর আগের বছর হিন্দু কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়।
বরানগবের 'ভারত শ্রমজীবী' পত্রিকার সম্পাদক, ভারতে শ্রমজীবী আন্দোলনের সংগঠক শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়েব জন্ম। বাবা, রাজকুমার। মা, গঙ্গামণি দেবী।
আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে কলকাতায় এলেন রেভারেণ্ড জেমস লঙ। বয়স তখন ২৬। ছিলেন ইংলণ্ডের প্রোটেস্টান্ট চার্চ-এব প্রতিনিধি। যদিও ধর্মযাজক, তবুও ভারতপ্রেমিক এই মানুষটির নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, ভাষা, সমাজসেবা, গ্রন্থাগার আন্দোলন, ইত্যাদি নানা দিকেই খোলামনের আগ্রহ। কলকাতায় পৌঁছে যোগ দিয়েছিলেন মির্জাপুরের চার্চ সোসাইটির স্কুলে, এখন যা সেণ্ট পল স্কুল।
ডঃ আলেকজাণ্ডাব ডাফ সাহেবেব পরিচালনায় প্রতিষ্ঠা হল 'চুঁচুড়া ফ্রি চার্চ ইনসটিটিউশন'। আসলে চুঁচুড়ার বড়বাজারে একটা স্কুল খুলেছিলেন হালিশহরের হরলাল রায় আর চুঁচুড়ায় রাজকৃষ্ণ আঢ্য। ডাফ সাহেব যখন চুঁচুড়ায়, তখন দুই প্রতিষ্ঠাতার উৎসাহে বিশ্বম্ভর হালদারের পুজোবাড়িটাকে সরকারের কাছ থেকে কিনে নিয়ে এই স্কুলের কাজের শুরু।
কলকাতার হাটখোলার বিখ্যাত দত্ত পরিবারে জন্মালেন প্রাণনাথ দত্ত। বাংলার প্রথম কার্টুন পত্রিকা 'বসন্তক'-এর প্রতিষ্ঠাতা। নিজে ছিলেন শিল্পী। বাবা, লোকনাথ।
যশোহরের পলুয়া মাগুরায় জন্ম অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সাংবাদিক শিশিরকুমার ঘোষ-এর। বাবা, হরিমোহন।
এদেশে সংগীতবিদ্যার গবেষক ও প্রচারক শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের জন্ম কলকাতার পাথুরিয়াঘাটায়।
বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে সংগীতাচার্য যদুনাথ ভট্টাচার্যের জন্ম। যদুভট্ট নামেই খ্যাত ছিলেন তিনি।

১৫ জানুয়ারি

দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাপ্রসাদ রায়, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ বিশিষ্ট নাগরিকদের আবেদন, আফগান-যুদ্ধ-জয়ী ইংরেজ সম্প্রদায়কে অভিনন্দন জানাতে হিন্দু কলেজের জনসভায় যোগ দেওয়ার জন্যে।

১৮ জানুয়ারি

কলকাতায 'কলেজ পাঠশালা'-র জন্ম। আসলে এটি একটি চতুষ্পাঠী। হিন্দু কলেজের ধর্মহীন

শিক্ষায় অসন্তুষ্ট হয়ে এটি গড়ে ওঠে দ্বারকানাথ আর প্রসন্নকুমার ঠাকুরের চেষ্টায। শিক্ষক, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। পাঠশালাটি ছিল হিন্দু কলেজেরই অধীন।

২৫ জানুয়ারি

বেরল 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার শেষ সংখ্যা, ৯ বছব চলার পর। ছিল 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর সাপ্তাহিক মুখপাত্র। হিন্দু ধর্ম আর সমাজের রক্ষণশীলতাই ছিল এই পত্রিকার আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য। আক্রান্ত হয়েছেন রামমোহন রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব প্রমুখেরা। সম্পাদক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, বন্ধু রসিককৃষ্ণ মল্লিকের সহযোগিতায। অবশ্য সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আরো অনেকে। যেমন প্যারীচাঁদ মিত্র, তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামচন্দ্র মিত্র, হরমোহন চট্টোপাধ্যায়।

২৯ জানুয়ারি

'লিটেবারি গেজেট'-এ খবর বেবল, মেডিকেল কলেজের ছাত্রদেব পুরস্কার দেওয়ার জন্যে মতিলাল শীল দান করেছেন এক লক্ষ টাকা।

ফেব্রুয়ারি

জোড়াসাঁকোয় কালীপ্রসন্ন সিংহের জন্ম। বাবা, নন্দলাল।

১২ ফেব্রুয়ারি

নিমাইচন্দ্র শিরোমণির মৃত্যু হলে সর্বানন্দ ন্যাযবাগীশ অস্থায়ী ভাবে সংস্কৃত কলেজে ন্যাযশাস্ত্রের অধ্যাপক। পরে যোগ দেন জয়নারায়ণ তর্কালঙ্কার। বিদ্যাসাগর ন্যায শ্রেণীতে দ্বিতীয় বছবে তাঁব ছাত্র।

সংবাদ প্রভাকর থেকে অনুবাদ করে 'ক্যালকাটা কুরিয়ার'-এ বেবল কালীপ্রসন্ন সিংহেব জন্মসংক্রান্ত সংবাদ।

> "Last night a series of nautches commenced at the residence of Babu Nundolal Sing, at Jorasanko, in celebration of the birth of his child, a boy, which took place lately There were large assemblage of native gentlemen and professors of Sanskrit present on the occasion. The former were brightly gratified with the musical performances of the nautch-girls, and the latter with the valuable presents of Cashmere shawls etc "

১১ মার্চ

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুবের জন্ম। বাবা, দেবেন্দ্রনাথ।

মে

আলেকজাণ্ডার ডাফ ফিরে এলেন কলকাতায। ১০ বছর আগে কলকাতায় গড়েছিলেন নিজের স্কুল 'জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন', রামমোহন রায়ের পাঠানো পাঁচজন ছাত্র নিয়ে। পরে ছাত্র সংখ্যা বাড়ার পর স্থানাভাবের জন্যে ঐ স্কুল উঠে আসে গরানহাটায় গোরাচাঁদ বসাকের বাড়িতে। ১৮৩৭-এর জানুয়ারি মাসে ডাফ চলে গিয়েছিলেন স্কটল্যাণ্ডে, স্কুলের নিজস্ব বাড়ি তৈরির জন্যে নানা জায়গায় বক্তৃতা দিযে টাকা সংগ্রহ করতে। ১৮৩৭-এর ২৩ ফেব্রুয়ারিতে হেদুয়ার পূর্ব পাড়ে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হল স্কুল বাড়ির। ১৮৩৮-এ স্কুল উঠে এল নিজেদের বাড়িতে।

১০ মে
কাশিমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় মুর্শিদাবাদ থেকে বেরল 'মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী' নামের সাপ্তাহিক পত্রিকা। সম্পাদক, গুরুদয়াল চৌধুরী। এক বছর পরে বন্ধ।

জুন
চানক থেকে শ্রীনিবারণ রায় বের করলেন 'আয়ুর্বেদ দর্পণঃ' নামে চিকিৎসা বিষয়ের মাসিক পত্রিকা। তিনমাস পরে বন্ধ। ১৮৫২য় বেরিয়ে আবার বন্ধ।

১৩ জুন
'তত্ত্ববোধিনী সভা'র উদ্যোগে, সিমলা পল্লী বা সিমলে পাড়ায় দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হল 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা'র। তত্ত্ববোধিনী সভার কাজও চলত ঐখানে। অক্ষয়কুমার দত্ত প্রথম দিন থেকে ঐ পাঠশালার শিক্ষক।

> "তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যগণ সভার উদ্দেশ্যের সঙ্গে যোগ রাখিবার এমন একটি বিদ্যালয় স্থাপনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন যেখানে কোমলমতি বালকদিগের মাতৃভাষায় শিক্ষাদানেব সঙ্গে সঙ্গে ধর্মবিষয়ক তথ্যাদিও বুঝাইয়া দেওয়া হইবে।"
>
> তত্ত্ববোধিনী সভা-র কার্যবিবরণী/তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

জুলাই
বেরল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের 'জ্ঞানপ্রদীপ'-এর প্রথম খণ্ড, 'বালকদিগের শিক্ষার্থ বিবিধ প্রস্তাব ও দৃষ্টান্ত'সহ।

১জুলাই
বেরল 'গভর্নমেণ্ট গেজেট'। এতে থাকত সরকারি আইন-কানুনের বঙ্গানুবাদ। ১৮৫২ পর্যন্ত সম্পাদক ছিলেন জে. সি. মার্শম্যান। পরে কিছুদিনের জন্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

২০ অগাস্ট
বিলেত যাওয়ার আগে একটা ট্রাস্ট গড়ে দ্বারকানাথ ঠাকুর পৈত্রিক দুটি জমিদারি আর নিজের আরো দুটো উপার্জিত জমিদারি লিখে দিলেন পুত্র-পৌত্রদের নামে।

> "আমাদের হাতে পড়িয়া যদি বাণিজ্য-ব্যবসায়-কার্যের পতন হয়, তবে, স্বোপার্জিত যে সকল বৃহৎ বৃহৎ জমিদারী আছে তাহাও তাহার সঙ্গে বিলুপ্ত হইবে, এবং পৈতৃক বিষয় বিরাহিমপুর ও কটকের জমিদারীও থাকিবে না। তাঁহার বাণিজ্য-ব্যাপারের ক্ষতিতে আমরা যে পূর্বপুরুষদিগের বিষয় হইতেও বঞ্চিত হইব, এইটি তাঁহার মনে অতিশয় চিন্তার বিষয় ছিল। অতএব য়ুরোপে যাইবার পূর্ব্বে, ১৭৬২ শকে, আমাদের পৈতৃক বিষয় বিরাহিমপুর ও কটকের জমিদারীর সঙ্গে তাঁহার স্বোপার্জিত ডিহি সাহাজাদপুর ও পরগনা কালীগ্রাম একত্র করিয়া, এই চারিটি সম্পত্তির উপরে একটি ট্রস্ট্ ডীড্ লিখিয়া তিনজন ট্রস্টী নিযুক্ত করিয়াছিলেন।"
>
> আত্মজীবনী/দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৭ অগাস্ট
'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র খবরে জানা যাচ্ছে য়ুনিয়ন ব্যাঙ্কের অ্যাকাউনটেণ্ট এ. এইচ. সিম ১লাখ বিশ হাজার তহবিল তছরূপ করার খবর পাছে জানাজানি হয়, হলে ব্যাঙ্ক উঠে যাবে জেনে দ্বারকানাথ নিজের পকেট থেকে পুরিয়ে দিলেন সেটা।

১৭ সেপ্টেম্বর
খ্যাতনামা জমিদার ও স্বদেশপ্রেমিক প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হুগলির উত্তরপাড়ায়। বাবা, জয়কৃষ্ণ।

২ অক্টোবর
বিবেকানন্দের সময়ে চিকাগো বিশ্বধর্ম সম্মেলনে যোগদানকারী বিশিষ্ট ব্রাহ্মনেতা আর প্রখ্যাত সাংবাদিক প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের জন্ম হুগলির বাঁশবেড়িয়ায়। বাবা, গিরীশচন্দ্র।

২১ অকটোবর
'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'য় প্যারীচাঁদ মিত্রের তৃতীয বক্তৃতা। বিষয়, 'External and Internal Commerce of India.' 'Ancient Rules for the Mercantinc Class.'

২ নভেম্বর
কলকাতার সুবর্ণবণিক পরিবারে ডাঃ বলাইচন্দ্র সেন-এর জন্ম। বাবা, শ্যামাচরণ।

২৬ নভেম্বর
কলকাতা মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মধুসূদন গুপ্তকে যে সার্টিফিকেট দেওযা হল, তা লেখা হয়েছিল ইংরেজি, বাংলা আর আববি এই তিনটে ভাষাতেই। নীচে অ্যাসেসর, পরীক্ষক আর কলেজের অধ্যাপক মিলিয়ে ২১ জনের স্বাক্ষব।

১৬ ডিসেম্বর
ব্রাহ্মনেতা আর 'বামাবোধিনী' পত্রিকাব সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্তর জন্ম চব্বিশ পরগনাব মজিলপুরে। বাবা, হরমোহন।

১৮৪১

বছরের প্রধান ঘটনাবলী

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম। বাবা, গিবীন্দ্রনাথ।

রাজনারায়ণ বসু উঠলেন হিন্দু কলেজের কলেজ বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীতে। মধুসূদনও তখন ঐ শ্রেণীতে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় হিন্দু কলেজের পঞ্চম শ্রেণীতে। আর্থিক অনটনে এ বছব বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল তাঁর পড়াশোনা। বন্ধু মধুসূদন দত্ত নিজের জলপানির টাকায় মিটিয়ে দিয়েছিলেন সে-সমস্যা। এই বছরেই হিন্দু কলেজ থেকে বেব করবেন হাতে-লেখা দেযাল পত্রিকা।

হাটখোলার দত্ত পরিবাবে শিল্পী গিরীন্দ্রকুমার দত্তর (চৌধুরী) জন্ম। বাবা, রাজেন্দ্র। "আলালের ঘরে দুলাল"-কে তিনি চিত্রিত করেছিলেন ৬টি লিথোগ্রাফে। 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' উপন্যাস আর 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' নিয়েও ছবি এঁকেছিলেন তিনি।

ভূদেব উত্তীর্ণ হিন্দু কলেজের সিনিযর বিভাগের পঞ্চম শ্রেণীতে। এই বছরেই জুনিয়র বৃত্তি পেলেন বছর ৮ টাকা। এবং এই বছরেই তাঁর বিয়ে। আবার এই বছরেই সহপাঠীদের জন্যে বের করেছিলেন একটা হাতে-লেখা পত্রিকা, 'প্রাইভেট অবজার্ভার'। বলতে গেলে এখানেই তাঁর সংবাদপত্র পরিচালনায় হতেখড়ি।

বেরল অক্ষয়কুমার দত্তর 'ভূগোল'। ভূমিকা—

> "ইদানীং দেশাহিতৈষী বিদ্যোৎসাহী মহাশয়দিগের দৃঢ় উদ্‌যোগে স্থানে ২ যে প্রকার পদ্ধতি ক্রমে বঙ্গভাষার অনুশীলন হইতেছে, তাহাতে ভবিষ্যতে এ দেশীয় ব্যক্তিগণের বিদ্যাবুদ্ধির উন্নতি হওনের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এ ভাষায় এ প্রকার প্রচুর গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না যে তদ্দ্বারা বালকদিগকে সুচারুরূপে শিক্ষা প্রদান করা যায়। এই সুযোগযুক্ত সময়ে যদি এ অকিঞ্চিন হইতে কিঞ্চিৎ দেশের উপকার সম্ভবে এই মানস করিয়া চন্দ্রসুধালোভী উদ্বাহু বামনের ন্যায় দীর্ঘ আশায় আসক্ত হইয়া বহুক্লেশে বহু ইংরাজি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া বালকদিগের বোধগম্য অথচ সুশিক্ষাযোগ্য এই ভূগোল পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছি।"

তত্ত্ববোধিনী সভার অনুমতি নিয়ে লেখা এ বইয়ের প্রকাশকও ছিল ঐ সভা। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় অক্ষয়কুমার দত্ত-র দর্শন বা বিজ্ঞান বিষয়ে লেখা গদ্য রচনার মধ্যে দিয়ে বাংলা গদ্য-সাহিত্য একই সঙ্গে হয়ে উঠেছিল বিষয়ে ভারী অথচ সরসতায় প্রাঞ্জল।

এই বছরের শেষ দিকে হিন্দু কলেজে প্রথম সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা। প্রথম বছরের পরীক্ষায় প্রথম হয়ে ৪০ টাকা বৃত্তি পেলেন প্যারীচরণ সরকার।

হুগলী মহম্মদ মহসীন কলেজের ছাত্র রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিয়ে ফুলিয়ার দেবীচরণ মুখোপাধ্যায়ের মেয়ে রাখালদাসী দেবীর সঙ্গে।

অদ্বৈতচরণ আঢ্যের বড়ো ছেলে গোবিন্দচন্দ্র আঢ্যের জন্ম কলকাতায়। ২২ বছর বয়সে, বাবার নির্দেশে, 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়'-এর সম্পাদক।

প্রখ্যাত ধর্মপ্রচারক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জন্ম নদীয়ার শান্তিপুবে। বাবা, আনন্দকিশোব।

ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতা অঘোরনাথ গুপ্তের জন্ম নদীয়ার শান্তিপুরে। বাবা. যাদবচন্দ্র রায় কবিভূষণ।

ব্রিটিশ সরকারেব প্রতিনিধিরূপে নেপাল, ভূটান, তিব্বতের পলিটিক্যাল এজেন্ট ; কুচবিহাবেব নাবালক রাজা নৃপেন্দ্রনাবায়ণ-এর দেওযান, বাগ্মী, লেখক, ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে অনুপ্রাণিত কালিকাদাস দত্ত-ব জন্ম বর্ধমানের মেড়াল-এ।

ওবিয়েন্টাল সেমিনারীর পড়া শেষ করে শম্ভুনাথ পণ্ডিত সদব দেওয়ালী কোর্টের সহকাবী রেকর্ড-কীপার।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার পক্ষপাতী, ১৮৩৬-এ গড়ে ওঠা বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভাব অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সভ্য বামলোচন ঘোষকে সরকার নিয়োগ করলেন কৃষ্ণনগরেব প্রধান সদর আমীন। 'কৃষ্ণনগর কলেজ', 'কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরী', গড়ে ওঠাব পিছনে ছিল তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা।

১৬ জানুয়ারি

১৫ টাকা মাইনেয় হিন্দু কলেজের জুনিযব বিভাগেব পণ্ডিতের চাকবি পেলেন মুক্তাবাম বিদ্যাবাগীশ।

২৫ ফেব্রুয়ারি

গভর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ডের বোন মিস এমিলি ইডেনের সম্মানার্থে দ্বারকানাথ আয়োজন করলেন বিরাট ভোজসভার।

> "গত রাত্রে দ্বারকানাথ ঠাকুরের ওখানে যে সমাবেশ হয়েছিল সে রকম জমজমাট সমাবেশ সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। এই সমাবেশে উপস্থিত হয়েছিলেন মাননীয়া মিস ইডেন, স্যার এডওয়ার্ড রায়ান এবং কলকাতাব অভিজাত সমাজেব অধিকাংশ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। আসবাবপত্রে, পর্দায়, গালিচায়, ভিলার প্রত্যেকটি কক্ষ ছিল নূতন ধরনে ও সুরুচিসম্মতভাবে সুসজ্জিত ও আলোকোদ্ভাসিত। সেদিনের রাত্রির মতো এত চমৎকার বাজি-পোড়ানো আমরা ইতিপূর্বে ভারতের অন্য কোনোখানে দেখিনি। গৃহকর্তা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অমায়িকতার সঙ্গে সকল অতিথির পরিচর্যা করেছেন, কিসে তাঁদের আরাম ও তৃপ্তি হয় সেদিকে সর্বদা লক্ষ রেখেছেন। অতিথিরাও যে এ-সমাবেশ খুবই উপভোগ করেছেন তার প্রমাণ এই যে বহু রাত অবধি তাঁরা ভিলাতেই ছিলেন, বাড়ি ফিরেছেন খুবই দেরি করে।"
>
> ক্যালকাটা কুরিয়র

কৃষ্ণ কৃপালনী-র দ্বারকানাথ-জীবনী থেকে জানা যায় যে এর কিছুদিন পরে তিনি ঐ ভিলা বা বেলগাছিয়ার ঐ বাগানবাড়িতেই দেশীয় ভদ্রলোকদের জন্যে আয়োজন করেছিলেন ঐ রকম আরও এক বিরাট ভোজসভা।

১০ মার্চ

সাহেব-সমাজে মদ্যপান নিরোধের জরুরি প্রয়োজনে টাউন হলে মদ্যপান বিরোধী ব্যক্তিদের প্রাথমিক সভা। উপস্থিত মধ্যে আর্কডিকন, রেভারেণ্ড ডাফ, গোগারলি, বোঁয়াজ, ইমস্, লঙ, আর টি. ইলিযাস প্রমুখেরা। সভাপতি, আর্কডিকন। 'মদ্যপান মিতাচারী সভা' স্থাপন করে ঐদিনই গড়া হল অস্থায়ী কমিটি। অস্থায়ী সম্পাদক হলেন রেভারেণ্ড লঙ।

> "উনিশ শতকের প্রথম দুই দশকে ভারতে বসবাসকারী ইয়োরোপীয়দের মধ্যে মদ্যপান বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তিই সুস্থ অবস্থায় দেশে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পেতেন, এঁদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই অকালে মৃত্যু বরণ করতেন। উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে এবং চতুর্থ দশকের প্রথমার্ধে মদ্যপান ঘটিত মৃত্যুর সংখ্যা অত্যন্ত অল্প ছিল। চতুর্থ দশকের শেষার্ধে মদ্যপানের হার বৃদ্ধি পায়। ইয়োরোপীয়দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে দেশীয় ব্যক্তিদের মধ্যেও তা সংক্রামিত হয়।"
>
> সমাজবিজ্ঞানী জেম্‌স লঙ/ বিনয়ভূষণ রায়, শারদীয় এক্ষণ, ১৩৯৭

১৭ এপ্রিল

১০০ টাকা মাইনেয় সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারির পদে রসময় দত্ত। ১০ বছর ছিলেন ঐ পদে।

২৩ এপ্রিল

'মদ্যপান মিতাচারী সভা'-র বৈঠক। আর্কডিকন সভাপতি। যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হলেন ডঃ করবাইন আর রেভারেণ্ড লঙ।

১২ মে

সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভায় প্যারীচাঁদ মিত্রের তৃতীয় বক্তৃতা। বিষয়, 'Historical Proofs of the existance of the Hindu Court of Justice'।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র বহিষ্কৃত হলেন মেডিকেল কলেজ থেকে। এই সময়ে কলেজে গোলমাল হয় একটা। রাজেন্দ্রলাল গোলমালের মধ্যে না থাকলেও, দোষী ছাত্রদের নাম জানাতে অনিচ্ছাপ্রকাশ করার ফলেই, অধ্যক্ষের প্রিয়পাত্র হওয়া সত্ত্বেও পেতে হয়েছিল এই শাস্তি।

অগাস্ট

হিন্দু কলেজের পঞ্চম শ্রেণী থেকে পরীক্ষা দিয়ে মাসে ৮ টাকা জুনিয়র বৃত্তি পেলেন মধুসূদন দত্ত।

১৯ অগাস্ট

বিলেতের বন্ধু জন স্টরম্-কে দ্বারকানাথ ঠাকুরের চিঠি—

> "মুহূর্তেকের জন্যেও আপনি নিশ্চয় ভাবতে পারেন না যে আমি কিংবা 'রিফর্মার' কিংবা

মনুষ্যপদবাচ্য অন্য যে-কোনো ব্যক্তি সতীদাহের মতো একটা পৈশাচিক প্রথা রহিত করার বিরুদ্ধে আপীল পেশ করার খরচ বাবদ একটা কানাকড়িও দিতে চাইব।"

কলকাতার ধর্মসভা সতীদাহ প্রথা রদ করার বিরুদ্ধে বিলেতের 'হাউস অফ কমনস'-এ আপীল করে এক সময়। সেই আপীল পেশ করতে গিয়ে ম্যাকডুগাল নামক জনৈক সাহেব নিজের পকেট থেকে খরচ করেছিলেন ২০০ টাকা। ধর্মসভার কাছ থেকে সে-টাকা আদায় করতে না পেরে তিনি হন স্টরম-এর শরণাপন্ন হন, তাঁকে উদার ও অকৃপণ দ্বারকানাথের বন্ধু জেনে। জন স্টরম তাঁর চিঠিতে দ্বারকানাথকে লিখেছিলেন—নিজের ও দেশেব সুনামেব খাতিরে তিনি যেন ঐ টাকাটা মিটিয়ে দেন। ২০০ টাকাটা দ্বারকানাথের কাছে ছিল নস্যি। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রত্যাখ্যান, সতীদাহ-র বিরুদ্ধে তাঁর প্রবল বিক্ষোভটাকে চিনিয়ে দিতেই।

৮ সেপ্টেম্বর

'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'-য় প্যারীচাঁদ মিত্রের পঞ্চম বক্তৃতা। বিষয়— "Sources of Revenue etc."

১৪ সেপ্টেম্বর

'তত্ত্ববোধিনী সভা'-র উৎসব। চলেছিল রাত দুটো পর্যন্ত, ধুমধামসহ। বিষয়কাজে অবহেলা দেখিয়ে দেবেন্দ্রনাথের এই জাতীয় উদ্যমে সন্তুষ্ট ছিলেন না দ্বারকানাথ। এর কয়েক মাস পরেই তিনি চলে যাবেন ইংলণ্ডে।

১৪ অক্টোবর

টাউন হলে মদ্যপান মিতাচারী সভা বা 'টেমপারেন্স সোসাইটি'-র সভা। পুস্তিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত। সমিতির বন্ধুদের জানানো হয় পুস্তিকায় আগ্রহীদের মির্জাপুরে লঙ সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করতে।

নভেম্বর

ঢাকার তেলিরবাগে বিধবা বিবাহ আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক দেশপ্রেমিক দুর্গামোহন দাশের জন্ম। বাবা, কাশীশ্বব।

৪ ডিসেম্বব

১২ বছর ৫ মাস অধ্যয়নের পর সংস্কৃত কলেজের ছাত্রজীবন শেষ হল ঈশ্ববচন্দ্র বিদ্যাসাগরের। প্রশংসাপত্র পেলেন কলেজের।

১০ ডিসেম্বর

২১ বছর বয়সে সংস্কৃত কলেজের পড়া শেষ হলে অধ্যাপকদের কাছ থেকেও স্বতন্ত্র এক প্রশংসাপত্র।

"অস্মাভিঃ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরায় প্রশংশাপত্রং দীয়তে। অসৌ কলিকাতায়াং শ্রীযুক্তকোম্পানী-সংস্থাপিত বিদ্যামন্দিরে দ্বাদশবৎসরান পঞ্চমাসাংশ্চোপস্থায়াধো লিখিত শাস্ত্রাণ্যধীতবান।

ব্যাকরণম্— শ্রীগঙ্গাধরশর্মভিঃ
কাব্যশাস্ত্রম্— শ্রীজয়গোপালশর্মভিঃ
অলঙ্কারশাস্ত্রম্— শ্রীপ্রেমচাঁদশর্মভিঃ
বেদান্তশাস্ত্রম্— শ্রীশম্ভুচন্দ্রশর্মভিঃ
জ্যোতিঃশাস্ত্রম্— শ্রীযোগধ্যানশর্মভিঃ
ধর্মশাস্ত্রম্— শ্রীশম্ভুচন্দ্রশর্মভিঃ
সুশীলতয়োপস্থিতস্যৈতস্যৈতেষু শাস্ত্রেষু সমীচীনা ব্যুৎপত্তিরজনিষ্ট।
১৭৬৩ এতচ্ছকাব্দীয়-সৌরমার্গশীর্ষস্য বিংশতিদিবসীয়ম্।
Rasamay Dutt, Secretary, 10th Decr. 1841"

২৫ ডিসেম্বর

এই তারিখের 'ইংলিশম্যান'-এ বেলগাছিয়া ভিলার ভবিষ্যৎ নিয়ে খেদ। কারণ কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে এই ভিলার অবলোপ আর ভিতরের মূল্যবান সব সামগ্রী বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দ্বারকানাথ ঠাকুর নিজেই।

> "দমদম রোড-এর উপর দ্বারকানাথের যে-সুরম্য গৃহপ্রতিষ্ঠান রয়েছে, সেটি ভেঙে দেবার ঘোষণাব বিষয় আমরা বিশেষভাবে উল্লেখ করছি। নববিবাহিত দম্পতী এই সুন্দর ভিলায় নিরিবিলি তাঁদের মধুচন্দ্রিমা যাপন করেছেন, এখানকার সুন্দর পরিবেশে শিল্পশালায় ছবি ও ভাস্কর্য ও তাবৎ সামগ্রী দেখে, মধুর আবেশে বিভোর হয়ে ভেবেছেন, এই মধুর সুন্দর ভুবনে তাদের দুজনা ছাড়া আর বুঝি কেউ নেই। বিবাহিত অবিবাহিত কত শত লোকই এই ভিলায় এসেছেন গেছেন, হাইকোর্টের জজ এসেছেন, উচ্চপদে অধিষ্ঠিত সিভিলিয়ান এসেছেন, আবার এসেছেন অ্যাটর্নি অফিসের নিম্নতম কেরানী কিংবা কোনো কুঠীর চাকুরে—সকলে শনিবারের রাত্রে এসে সহৃদয় ও অমায়িক গৃহকর্তার উদার আতিথ্যগ্রহণে তৃপ্ত হয়েছেন। এইসব আমোদ-প্রমোদের মেলা কি অতীতের হাসিখেলার হিসেবে গণ্য হবে? যেসব মহামূল্য সামগ্রী এই একটি মনোরম স্থানে—এই পরীদের রাজ্যে দ্বারকানাথ সমাহৃত করেছেন, সে-সমস্তই কি বাকপটু নীলামদারের হাতুড়ির ঘায়ে বিকিয়ে যাবে, সর্বোচ্চ দাম যে হাঁকবে তার কাছে, জলের দরে?"

শেষ পর্যন্ত অমূলক থেকে গেছে 'ইংলিশম্যান'-এর আশঙ্কা। দ্বারকানাথেব মনেও হয়তো মাত্র একবার উঁকি দিয়েই মিলিয়ে গিয়েছিল বেলগাছিয়া ভিলাকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার বাসনা।

২৯ ডিসেম্বর

বাংলা বিভাগের প্রধান পণ্ডিত হয়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যোগ দিলেন বিদ্যাসাগর।

৩১ ডিসেম্বর

হিন্দু ল কমিটির পরীক্ষা দিলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

১৮৪২

বছরের প্রধান ঘটনাবলী

কলকাতায় কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম। সংগীতজ্ঞ হিসেবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি পেয়েছিলেন তিনি। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর শিষ্য। বাজাতে জানতেন সেতার, সুরবাহার, ন্যাস-তরঙ্গ। পেয়েছিলেন বার্লিন, ফিলাডেলফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ফ্রান্স আর ইটালী থেকে পদক আর প্রশংসাপত্র। 'ইংরেজি স্বরলিপি-পদ্ধতি' নামের রচিত-বইয়ে তিনি যুক্তি দেখিয়েছিলেন ভারতীয় সংগীতের স্বরলিপি ইংরেজি পদ্ধতিতে করার বিরুদ্ধে।

বৃত্তি পেয়ে ভূদেব হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে। এই বছর সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা দিয়ে বর্ধমান রাজার বৃত্তি পেয়েছিলেন ৪০ টাকা করে।

বছরের শেষ দিকে ভূদেবের সঙ্গেই ঐ পরীক্ষা দিয়ে প্রথম হয়েছিলেন প্যারীচরণ সরকার। তিনি পেয়েছিলেন ৪০ টাকা সরকাবি বৃত্তি। এঁদের সঙ্গেই পরীক্ষা দিয়েছিলেন মাইকেল মধুসূদন।

এ বছরে কলেজ ছাড়ার আগেই উনিশ বছর বয়সে প্যারীচরণের বিয়ে। পাত্রী হাটখোলার রাজা শিবনারায়ণ বসুর মেয়ে।

রাজনারায়ণ বসু হিন্দু কলেজের সিনিয়র বিভাগের বৃত্তি পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করে দু বছরের বৃত্তি পেলেন মাসে ৩০ টাকা করে। মধুসূদন দত্ত-ও তখন সিনিয়র বিভাগের ছাত্র। ঐ সময়ে রামগোপাল ঘোষ ঘোষণা করলেন— যে দুজন ছাত্র ইংরেজিতে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে লিখতে পারবে আদর্শ প্রবন্ধ, তিনি তাদের পুরস্কৃত করবেন পদক দিয়ে। প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছিলেন মধুসূদন। পেয়েছিলেন সোনার পদক। রুপোর পদক ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের, দ্বিতীয় হয়ে। ঐ প্রতিযোগিতার পরীক্ষক ছিলেন সি. এইচ. ক্যামেরন; ইণ্ডিয়ান ল কমিশনের সভাপতি আর সুপ্রীম কাউন্সিলের সদস্য। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ার

সময়েই মধুসূদনের ইংরেজি কবিতা লেখার শুরু। ছাপা হচ্ছিল জ্ঞানান্বেষণ, লিটেরারি গেজেট, লিটেরারি গ্লীনার ইত্যাদি পত্রিকায়। কবিতা পাঠিয়েছিলেন বিলেতের 'বেণ্টকেস মিসেলিনি', 'ব্লাকউড ম্যাগাজিন'-এও। পিছন থেকে ছিল অধ্যক্ষ ক্যাপটেন ডি. এল. রিচার্ডসন-এর উৎসাহ। আর সেই সময় থেকেই মধুসূদনের মনে বিলেত যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। প্রিয়বন্ধু গৌরদাস বসাককে লিখছেন—

> "Oh! how should I like to see you write my 'life', if I happen to be a great poet, which I am almost sure I shall be, if I can go to England."

পরের বছরেই হিন্দু কলেজ থেকে ঘটবে তাঁর আকস্মিক অন্তর্ধান।
'ক্যালকাটা রিভিউ'-এ রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী লিখলেন কিশোরীচাঁদ মিত্র।
রাজনারায়ণ বসুর হিন্দু কলেজে প্রথম শ্রেণীতে ওঠার বছরেই কিশোরীচাঁদ-এর পড়া শেষ সেখানে।

জানুয়ারি
রমেশচন্দ্র দত্তের পিতৃব্য ও অভিভাবক সাহিত্যিক শশীচন্দ্র দত্ত যোগ দিলেন বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটে। ৩১ বছর চাকরি করবেন এখানে। ৮০ থেকে বেতন পৌঁচেছিল ৬০০ টাকায়।

১ জানুয়ারি
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ হিন্দু-কলেজ পাঠশালার প্রধান পণ্ডিত থেকে হয়ে গেলেন সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক। মদনমোহন তর্কালঙ্কার চলে এলেন তাঁর জায়গায়।

৬ জানুয়ারি
এই দিন বিকেলে টাউন হলে ভারতীয় এবং য়ুরোপীয় নাগরিকদের বিরাট সমাবেশ, য়ুরোপ-যাত্রার আগে দ্বারকানাথ ঠাকুরকে সম্মান জানাতে। সভাপতি, কলকাতার শেরিফ। দ্বারকানাথের হাতে সভার দেওয়া মানপত্র তুলে দিলেন তিনিই।
ঐ দিনই 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' তার সম্পাদকীয়-য় দ্বারকানাথকে অনুরোধ জানায় রামমোহন রায়ের ভগ্নপ্রায় সমাধি-মন্দিরের সংস্কার সাধনের জন্যে।

> "রামমোহন রায়ের সহৃদয় ও সর্ব-পুরাতন অনুরক্ত জনের অন্যতম আমাদের অতি আদরের দেশে পাড়ি দিবার জন্য পা বাড়িয়েছেন। পত্রিকার পক্ষ থেকে তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাতে গিয়ে আমরা এই আস্থাই প্রকাশ করতে চাই যে বিলাতে তাঁর সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা হবে সেই বিশিষ্ট ব্যক্তির হতাদরে ভগ্নপ্রায় সমাধিটির সংস্কার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা এবং তার উপর এমন একটি স্মৃতিসৌধ রচনা যার আকর্ষণে অনাগতকালের ভারতীয় তীর্থযাত্রীরা ও দেশে গিয়ে দেখে আসতে পারবেন কোথায় রামমোহন রায়ের দেহাবশেষ চিরবিশ্রাম লাভ করেছে।... ইংলণ্ডের একটি অজ্ঞাতপ্রায় কবরে রামমোহন শেষনিদ্রায় শয়ান থাকবেন— এটা ভারতের পক্ষে শ্লাঘাজনক হতে পারে না। আমাদের মনোগত ইচ্ছা যদি ব্যক্ত করা হত, তাহলে আমরা বলতাম দ্বারকানাথের সম্মানে আজ যে সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সেখানে যেন এই স্মৃতিরক্ষা-বিষয়ে জনগণ তাঁদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে প্রস্তাব গ্রহণ করেন, এবং যদি সেই প্রখ্যাত ব্যক্তির দেহাবশেষের উপর স্মৃতিসৌধ রচনার জন্য চাঁদা তোলা সম্ভব হয়, তবে সে-অর্থ তাঁর বন্ধুর হাতে তুলে দিয়ে প্রকাশ্য সভায় তাঁকে সৌধরচনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। দ্বারকানাথ এ-প্রস্তাবে অকুণ্ঠিত সহমত হবেন —এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।"

সংবর্ধনা সভা দ্বারকানাথের কাছে পেশ করে দুটি অনুরোধ: ১. তিনি যেন রামমোহন রায়ের অবহেলিত সমাধিটির সংস্কারের ব্যবস্থা করেন। ২. তিনি যেন নিজের পূর্ণাবয়ব একটি তৈলচিত্র আর আবক্ষ একটি মার্বেল মূর্তি বিলাতের উৎকৃষ্ট শিল্পীদের দিয়ে তৈরি করে স্বদেশে পাঠান উত্তরপুরুষদের কথা মনে রেখে। দুটি অনুরোধই সভায় সকলের সমর্থন পাওয়ার পর সভার মধ্যে শুরু হয়ে যায় চাঁদা তোলা।
ঐদিন সকাল ১০টায় টাউন হলেই ছিল কলেজের পুরস্কার বিতরণী সভা। সভাপতি গভর্নর জেনারেল অকল্যাণ্ড। ইংরেজি সাহিত্যে অসম্ভব দক্ষতা দেখিয়ে ভোলানাথ চন্দ্র লর্ড অকল্যাণ্ডের হাত থেকে পেলেন সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

৭ জানুয়ারি
তারাচাঁদ চক্রবর্তী, প্যারীচাঁদ মিত্র ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যাযেব সঙ্গে রামগোপাল ঘোষেব আলোচনা বাংলায আর ইংরেজিতে একটা মাসিক পত্রিকা আর বন্ধ হয়ে যাওযা 'সমাচার দর্পণ' আবার প্রকাশ করা নিযে।

৮ জানুয়ারি
দ্বারকানাথকে মানপত্র উপহার দিল প্রতিনিধি দল।

৯ জানুয়ারি
নিজস্ব 'ইণ্ডিয়া' জাহাজে চেপে দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিলেত যাত্রা। সহযাত্রী ছিলেন ভাগনে চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, ব্যক্তিগত চিকিৎসক ম্যাকগাওনান, একান্ত সচিব পরমানন্দ মৈত্র, তিনজন ভৃত্য, একজন মুসলমান বাবুর্চি, বিদায় জানাতে হুগলিব মোহানা পর্যন্ত গিযেছিলেন ভাই রামনাথ, রামমোহন রায়ের বড়ো ছেলে রাধাপ্রসাদ, আব কয়েকজন ইওরোপীয় ও ভারতীয বন্ধু-বান্ধব। পবে তাঁরা কলকাতায় ফিরে আসেন 'দ্বারকানাথ' নামের স্টীমারে চেপে।

১০ জানুয়ারি
'জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন'-এর নাম পাল্টে কবা হল 'কাউন্সিল অব এডুকেশন' বা শিক্ষাসংসদ।

১৩ জানুয়ারি
টাউন হলে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সংবর্ধনা প্রসঙ্গে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া-ব সম্পাদকীয়—

> "গত বৃহস্পতিবার দ্বারকানাথ ঠাকুবের সম্মানে টাউন হলে যে-সভা হযে গেল তাতে যেমন বিপুল জনসমাবেশ হয়েছিল ও উদ্দীপনাব সঞ্চার হযেছিল তেমনটা বহুকাল পর্যন্ত ঘটেনি বলে এই সভার কথা লোকে অনেকদিন মনে রাখবে। সমাজের সর্বস্তরের ব্যক্তিরা এই সভায় যোগ দিয়েছিলেন—তাঁদের মধ্যে ছিলেন সরকারের বিশ্বস্ত ও বিশিষ্ট কর্মচারীবৃন্দ, কতিপয় ব্যারিস্টার, বণিক ও ব্যবসায়ী, য়ুরোপীয় ও দেশীয় ব্যক্তি, সম্ভ্রান্ত বাবুবৃন্দ এবং বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দরিদ্র ছাত্রেরা। এ সভা ছিল কলকাতা জনসমাজের অনুভূতির প্রতিধ্বনি।"

১৫ জানুয়ারি
দ্বারকানাথের জাহাজ পৌঁছল মাদ্রাজে।

১৮ জানুয়ারি
দ্বারকানাথ পৌঁছলেন সিংহল বা শ্রীলঙ্কায়।

১৯ জানুয়ারি
সিংহলে পৌঁছে দ্বারকানাথ প্রথম চিঠি লিখলেন কলকাতায়।

২৭ জানুয়ারি
'ইণ্ডিয়া' জাহাজে বসেই দ্বারকানাথের দ্বিতীয় চিঠি।

১১ ফেব্রুয়ারি
দ্বারকানাথের জাহাজ পৌঁছল সুয়েজে।

১২ ফেব্রুয়ারি
সুয়েজ ছেড়ে চারটে আরবি ঘোড়ায় টানা ঢাকা গাড়িতে মরুভূমির মসৃণ পথ দিয়ে দ্বারকানাথের কায়রো যাত্রা।

১৪ ফেব্রুয়ারি
দ্বারকানাথ পৌঁছলেন কায়রোয়।

> "কায়রোর দৃশ্যাবলী মধ্যে আমি যেন খুঁজে পেলাম আরব্য-রজনীর গল্পের জগৎ।"

২৪ ফেব্রুয়ারি
দ্বারকানাথ কায়রো ছাড়লেন 'ইনক্রোর্নথর্ন' স্টীমারে চেপে। নীল নদের উপর দিয়ে স্টীমার চলল আলেকজান্দ্রিয়ার দিকে।

২৫ ফেব্রুয়ারি
দ্বারকানাথ পৌঁছলেন আলেকজান্দ্রিয়ায়।

২৮ ফেব্রুয়ারি
দ্বারকনাথ আলেকজান্দ্রিয়া থেকে লিখলেন কলকাতায়:

> "ছত্রিশ বছর বাদে ১৮৭৮ অব্দে, দ্বারকানাথের সর্বকনিষ্ঠ পৌত্র সপ্তদশবর্ষীয় রবীন্দ্রনাথ তাঁর মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে ও তাঁর অভিভাবকত্বে, পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ওই একই সমুদ্রপথে আলেকজান্দ্রিয়া অবধি গিয়েছিলেন, কেবল তাঁদের জাহাজ ছিল অনেক বড় একটি পি. অ্যাণ্ড ও. জাহাজ এবং পিতামহের সেই অনেক ছোট 'ইণ্ডিয়া' জাহাজের সুয়েজে পৌঁছতে যত সময় লেগেছিল তার চাইতে অনেক কম সময়ে তাঁরা সুয়েজ পৌঁছেছিলেন। ঘোড়ায়-টানা বাক্স গাড়িতে চেপে তাঁদের মরুভূমি পার হতে হয়নি, কারণ ততদিনে সুয়েজ থেকে কায়রো অবধি রেল-যোগাযোগের লাইন পাতা হয়ে গেছে। পৌত্রেরা হয়তো জানতেন না যে এই রেল-লাইন পাতাবার জন্য তাঁদের পিতামহ তাঁর দ্বিতীয়বার বিদেশ সফরের সময় মহম্মদ আলি পাশাকে রাজি করাবার জন্য বিধিমত চেষ্টাচরিত্র করেছিলেন। বারো বছর বাদে, ১৮৯০ অব্দে, আবার একবার এই দুই পৌত্র বিলাত যাবার পথে বোম্বাই থেকে সুয়েজ পাড়ি দিয়েছিলেন, কিন্তু এতদিনে সুয়েজখাল কাটা হয়ে গেছে বলে জাহাজ থেকে তাঁদের নামতে হয়নি।"

দ্বারকানাথ ঠাকুর। কৃষ্ণ কৃপালনী

১২ মার্চ
লর্ড অকল্যাণ্ড ভারতবর্ষ ছেড়ে স্বদেশে। ভারতবর্ষের বড়লাট হয়ে এদেশে এসেছিলেন ১৮৩৩-এর ৪ এপ্রিল।

১৯ মার্চ
দ্বারকানাথ পৌঁছলেন মাল্টায়।

এপ্রিল
রামগোপাল ঘোষ বের করলেন ইংরেজি-বাংলা দ্বিভাষিক 'বেঙ্গল স্পেকটেটর পত্রিকা', প্যারীচাঁদ মিত্র, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের সাহায্য নিয়ে। প্রথম ৫ মাস ছিল মাসিক। পরের ৬ মাস পাক্ষিক। ১৮৪৩-এর মার্চ থেকে সাপ্তাহিক। নভেম্বরে বন্ধ। 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ-হয়ে-যাওয়া 'সমাচার দর্পণ'-কেও বাঁচিয়ে তোলার ইচ্ছে ছিল রামগোপালের। কিন্তু অর্থাভাবে পারেননি। এই পত্রিকাব প্রথম সংখ্যাতেই প্রশ্ন তোলা হয়েছিল— "পুরুষ যদি স্ত্রীর মরণোত্তর পুনর্বিবাহ করিতে পারে, স্ত্রী কেন স্বামীর পরলোক হইলে বিবাহকরণে সক্ষমা না হয়?" পঞ্চম সংখ্যাতেও বিধবা বিবাহ নিয়ে প্রবন্ধ। আর সেখানেই উদ্ধৃত হয়েছিল পরাশর সংহিতার সেই বচন, যাকে ব্যবহার করে বিদ্যাসাগর প্রমাণ করলেন যে বিধবা বিবাহ শাস্ত্রবিরোধী নয়।

১১ এপ্রিল
দ্বারকানাথ মাল্টা থেকে নেপলস-এর দিকে।

১৪ এপ্রিল
দ্বারকানাথ পৌঁছলেন নেপলস-এ। ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরি দেখে মুগ্ধ।

২১ এপ্রিল
দ্বাবকানাথ নেপলস ছেড়ে রোমেব দিকে।

২৩ এপ্রিল
দ্বারকানাথ পৌঁছলেন বোমে। কলোসিয়াম দেখে মুগ্ধ হয়েও মন্তব্য—

"একদিন হাজার হাজার মানুষের ক্রন্দনে-আর্তনাদে বিদীর্ণ হত এই রঙ্গভূমিব আকাশ।"

সেন্ট পিটার্স গির্জার উৎসব দেখে তাঁর মনে হয়েছিল হিন্দু পুজোর মতোই। গির্জা দেখে আপ্লুত। আলাপ হয়েছিল পোপের সঙ্গে। রোম থেকে ফ্লোরেন্স। সেখান থেকে ভেনিস।

১৬ মে
ভেনিস ছেড়ে জার্মানীর দিকে যাত্রা দ্বারকানাথের।

২০ মে
লণ্ডনে পৌঁছবার আগে ইনস্‌ব্রুক থেকে লেখা চিঠিতে দ্বারকানাথ জানাচ্ছেন রোম ছাড়ার

পর দেখেছেন আর যে-সব শহর। সে তালিকায় রয়েছে ফ্লোরেন্স, বোলোনা, পাদুয়া ও ভেনিস।

ভেনিস দ্য মেদিচি দেখে মন্তব্য—

"এ ধরনের মূর্তি আর কোথাও দেখা যায় না।"

টাসকানি বেড়িয়ে—

"টাসকানির প্রত্যেকটা কুটীর পর্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জিত। তা ছাড়া চেহারায় ও বেশভূষায় তাদের বেশ একটা স্বাচ্ছন্দ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যে-দেশের চাষাভূষো কেনা গোলামের মতো, সে-সব দেশে এ-রকমটা দেখা যায় না।"

ভেনিস দেখে—

"ভেনিস এক অদ্ভুত আশ্চর্য জায়গা, এখানকার রাস্তা-ঘাট সবই খাল, খালের ধারে অবস্থিত বলে মনে হয় বাড়িঘর সব উঠেছে জল থেকে, এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি যেতে হলে গোন্দোলা চড়ে যেতে হয়।"

ভেনিসেই তিনি দেখেছিলেন টিসিয়ান-এর চিত্রমালা।

৩১ মে

দ্বারকানাথ পৌঁছলেন জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্টে।

এই দিনেই ডেভিড হেয়ার কলেরায় আক্রান্ত, কলকাতায়।

"পূর্বে বলা হইয়াছে যে হেয়ার সাহেব আপনার ঘড়ির কারবার গ্রে (Grey) নামক তাঁহার এক বন্ধুকে বিক্রয় করিয়া তাঁহারই সঙ্গে বর্তমান কয়লাঘাটের নিকটস্থ এক ভবনে বাস করিতেন। সেখানে ১৮৪২ সালের ৩১ মে দিবসে রাত্রি ১টার সময়ে তিনি হঠাৎ দারুণ ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হন। তিনি আমরণ কৌমার্য ব্রত ধারণ করিয়াছিলেন, সুতরাং সে-সময়ে তাঁহার প্রিয় বেহারা ব্যতীত আর কেহ তাঁহার সঙ্গী ছিল না। দুই একবার দাস্ত ও বমন হওয়াতেই হেয়ার বুঝিলেন যে কালশত্রু তাঁহাকে ধরিয়াছে। নিজের বেহারাকে বলিলেন— "গ্রে সাহেবকে গিয়া আমার কফিন (শবাধার) আনাইতে বল।" প্রাতঃকালে ডাক্তার ডাকা হইল। তাঁহার প্রিয় ছাত্র মেডিকেল কলেজের উত্তীর্ণ সুযোগ্য ডাক্তার প্রসন্নকুমার মিত্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং বিধিমতে তাঁহাব প্রাণরক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চিকিৎসাবিদ্যাতে যাহা হয়, ঔষধে যাহা করিতে পারে, বন্ধুজনের যত্ন, আগ্রহ ও চেষ্টাতে যাহা সম্ভব, কিছুই বাকি রহিল না। কিন্তু কিছুতেই রোগের উপশম হইল না। রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন ওলাউঠা হইলে সর্বাঙ্গে ব্লিস্টার লাগাইত। তদনুসারে হেয়ারের গাত্রে ব্লিস্টার দেওয়া হইয়াছিল। পরদিন অপরাহ্নে তিনি ধীরভাবে প্রসন্ন মিত্রকে বলিলেন— "প্রসন্ন! আর ব্লিস্টাব দিও না; আমাকে শান্তিতে মরিতে দাও।"

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ/শিবনাথ শাস্ত্রী

জুন

অক্ষয়কুমার ঘোষ আর টাকী-র প্রসন্নকুমার ঘোষ বের করলেন 'বিদ্যাদর্শন' নামের এক মাসিকপত্র। মাত্র ছ'টি সংখ্যা বেরিয়েই বন্ধ। উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত বাংলাভাষাকে প্রাঞ্জল করে তোলা।

১ জুন

অবিভক্ত জোড়াসাঁকোর বাড়িতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ-এর

জন্ম। আসলে তিনি সারদা দেবীর তৃতীয় গর্ভেব সন্তান। কিন্তু যেহেতু প্রথম কন্যাটি ছিল স্বল্পজীবিত, তাই সত্যেন্দ্রনাথ দ্বিতীয়।

এই দিন সন্ধ্যাতেই ডেভিড হেয়ারের মৃত্যু।

সেদিন ছিল প্রচণ্ড দুর্যোগ। বৃষ্টি অবিশ্রান্ত। তবু পরের দিন তাঁর শবাধারের পিছন পিছন শোকযাত্রায় হেঁটেছিল কলকাতার পাঁচ-সাত হাজার মানুষ। সেখানে ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ইংরেজ-বাঙালীর ভেদাভেদ ছিল না কোনো।

২ জুন

> "পরদিন প্রাতে হেয়ার চলিয়া গিয়াছেন এই সংবাদ কলিকাতা শহরে প্রচাব হইলে উভ্রব বিভাগে ঘরে ঘরে হায় হায় ধ্বনি উঠিল। তিনি যে সকল দবিদ্র পবিবাবেব পিতামাতা ছিলেন, সেই সকল পবিবারেব হিন্দুরমণীগণ আর্তনাদ করিয়া ক্রন্দন কবিতে লাগিলেন; তিনি যে সকল দরিদ্র বালককে পালন করিতেন, তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে গ্রে সাহেবের ভবনের অভিমুখে ছুটিল। গ্রে সাহেবের ভবনে ছোট বড় বাঙ্গালি ভদ্রলোকে লোকারণ্য! হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয় বাধাকান্ত দেব হইতে স্কুলের ছোট ছোট বালক পর্যন্ত কেহ আর আসিতে বাকি থাকিল না। কথা উঠিল তাঁহার সমাধি কোথায় হইবে? তিনি খ্রীষ্টীয় ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন না বলিয়া খ্রীষ্টীয় সমাধিক্ষেত্রে তাঁহার সমাধি লাভ কবা কঠিন হইল। অবশেষে তাঁহারই প্রদত্ত, ও হিন্দুকলেজের সংলগ্ন, ভূমিখণ্ডে তাঁহাকে সমাহিত করা স্থির হইল। তাঁহার শব যখন গ্রে সাহেবের ভবন ত্যাগ করিল, তখন গাড়িতে ও পদব্রজে হাজার হাজার লোক সেই শবের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কলিকাতা সেদিন যে দৃশ্য দেখিয়াছিল তাহা আর দেখিবে না। বহুবাজারের চৌরাস্তা হইতে মাধব দত্তের বাজার পর্যন্ত সমগ্র রাজপথ জনতার প্লাবনে নিমগ্ন হইয়া গেল। একদিকে শহরের পথে যেমন শোকের বন্যা, অপরদিকেও তেমনি আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। মুষলধারে বৃষ্টি ও ঝড় হইতে লাগিল। মনে হইল দেবগণও প্রচুর অশ্রুবারি বর্ষণ করিতেছেন। এইরূপে সুরনরে মিলিয়া হেয়ারের জন্য শোক করিলেন।"
>
> রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ/শিবনাথ শাস্ত্রী

৯ জুন

ক্যালে থেকে ব্রিটিশ চ্যানেল পেরিয়ে লণ্ডনেব ডোভাবে পৌঁছলেন দ্বাবকানাথ।

১০ জুন

দ্বারকানাথ লণ্ডনে। উঠলেন অ্যালবেমার্ল স্ট্রিটের সেন্ট জর্জ হোটেলে। পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে লেখা চিঠির প্রথম লাইন—

> "গত বিশ বছর ধরে আমার ধ্যানের বিষয় ছিল, আমি শেষ পর্যন্ত আমার সেই বহুঈপ্সিত জায়গায় এসে পৌচেছি।"

১১ জুন

দ্বারকনাথকে নিয়ে যাওয়া হল চিজউইক উদ্যানে উদ্যানপালন বিষয়ক উৎসব দেখাতে, 'উত্তম বেশভূষায় সুসজ্জিত' আঠারোশো দর্শকের মাঝখানে।

১২—১৫ জুন

স্যার রবার্ট পীল প্রমুখ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের কাছে নিজের পরিচয়-পত্র পেশ করলেন দ্বারকানাথ। দেখা করতে গেলেন বোর্ড অব কণ্ট্রোলের প্রেসিডেন্ট লর্ড ফিটজেরাল্ড-এর সঙ্গে। পেলেন আন্তরিক অভ্যর্থনা। পরিচিত হলেন চবমপন্থীদের নেতা এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ব্রুয়াম, মার্কুইস অব ল্যান্সডাউন-এর সঙ্গে।

১৬ জুন

মহারানী ভিকটোরিয়ার সঙ্গে দ্বাবকানাথের সাক্ষাৎকার, লর্ড ফিটজেরাল্ড-এর মাধ্যমে। ভিকটোরিযা তাঁর ডায়েরিতে লিখলেন—

> "The Brahmin speaks English remarkably well, and is a very inteligent, interesting man."

১৭ জুন

মেডিকেল কলেজের থিয়েটার রুমে ডেভিড হেয়ারের মৃত্যুতে শোকসভা। আহ্বায়ক রাজা বাজকৃষ্ণ রায। সভাপতি প্রসন্নকুমার ঠাকুর। ৫০০ জন নাগরিকের উপস্থিতিতে তৈবি হল ডেভিড হেযার মৃত্যু-বার্ষিকী উদযাপন কমিটি। সদস্যরা হলেন রাজা রাজকৃষ্ণ রায়, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল সিংহ, বৈকুণ্ঠনাথ রায়চৌধুরী, রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, দিগম্বর মিত্র আর রমাপ্রসাদ রায়। সম্পাদক, হরচন্দ্র ঘোষ। পরে এই কমিটিতে যুক্ত হয়েছিলেন কৈলাসচন্দ্র দত্ত, রামচন্দ্র দত্ত, দীননাথ দত্ত, ব্রজনাথ ধর, আর প্যারীচাঁদ মিত্র। কমিটির সিদ্ধান্ত, তৈরি করা হবে হেয়ারের একটা মার্বেল স্টাচু। স্টাচু কমিটি গড়া হল ঐ সভাতেই। আর তার জন্যে দেওয়া হল অর্থসংগ্রহের ডাক। পনেরো-কুড়ি দিনের মধ্যেই অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৮ হাজার ২২০ টাকা। সবচেয়ে বেশি টাকা দিয়েছিলেন কাশিমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ রায়। ৩ হাজার। বৈকুণ্ঠনাথ রায়চৌধুরী ১ হাজার। রামগোপাল ঘোষ আর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রত্যেকে ৫০০ করে। প্যারীচাঁদ মিত্র, রামতনু লাহিড়ী আর নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রত্যেকে ১০০। কিশোরীচাঁদ মিত্র আর রাজনাবায়ণ বসু ৫০। তাবাচাঁদ দত্ত ৪০। মধুসূদন দত্ত, প্যারীচরণ সরকার প্রত্যেকে ২০।

১৮ জুন

লণ্ডনের 'কোর্ট জার্নাল'-এ 'মহামান্য মহারাণীর অভ্যর্থনা কক্ষে' শিরোনামে ছাপা হল দ্বারকানাথের সঙ্গে মহারানীর পরিচয়-এর ঘটনা। পরিচয়-এর পর মহারানী নিজের ডায়েরিতে লিখেছিলেন—"ব্রাহ্মণ চমৎকার ইংরেজি বলেন—ভারি বুদ্ধিমান ও আগ্রহ-উদ্দীপক লোক।"

২২ জুন

হিন্দু কলেজে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে 'হেয়ার মেমোরিয়াল কমিটি'-র সভা। ঠিক হল, তাঁর মূর্তি গড়ার জন্যে চাঁদা বা দানের টাকা নেওয়া হবে হিন্দু কলেজ, ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি আর কার অ্যাণ্ড টেগোর কোম্পানির আপিসে। সংগৃহীত অর্থ জমা পড়বে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে।

২৩ জুন
মহারানীর ব্যক্তিগত বিশেষ আমন্ত্রণে দ্বারকানাথ পরিদর্শন করলেন এক বিরাট সৈন্য সমাবেশ। সঙ্গে মহারানী ছাড়াও যুবরাজ অ্যালবার্ট, ডিউক অব ওয়েলিংটন, ডিউক অব কেম্ব্রিজ।

বেঙ্গল স্পেকটেটর-এ ছাপা হল জনৈক পাঠকের ক্ষোভ, 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' আর 'চার্চ অব ইংলণ্ড ম্যাগাজিন'-এ ডেভিড হেয়ারের বিরুদ্ধে নানা দোষারোপ দেখে।

২১ জুলাই
উত্তর ইংল্যাণ্ড আর স্কটল্যাণ্ডের পণ্যোৎপাদক অঞ্চলগুলো দেখাব জন্যে দ্বারকানাথের লণ্ডন ত্যাগ।

অগাস্ট
'বেঙ্গল স্পেকটেটর' প্রতিবাদ জানালে ডেভিড হেয়াবের প্রতিমূর্তি স্থাপনের প্রসঙ্গে 'বেঙ্গল হেরাল্ড' আর 'লিটেরারি গেজেট'-এর মন্তব্যে।

> "সম্প্রতি বেঙ্গাল হেরলড ও লিটেরারি গেজেট পত্রে মৃত মেং হিযার সাহেবের মুখবিশ্রী প্রযুক্ত তাঁহার প্রতিমূর্তি করণের প্রতি উক্ত পত্র সম্পাদকদিগের আপত্তি দেখিয়া আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম; আমরা তন্মহাশয়দ্বয়কে যথোচিত সম্মানপূর্ব্বক এই নিবেদন করি যে উক্ত পরোপকার পরায়ণ পরম দয়ালু ধার্মিক মহাত্মার চিরস্থায়ি স্মবণ চিহ্ন করিবার তাৎপর্য এই যে তন্মহাশয়ের প্রতি আমারদের অতিশয় ভক্তি প্রকাশ হইবেক এবং তাঁহার নামও চিরকাল থাকিবেক; আর তাঁহার অন্তঃকরণের ভাব প্রকাশার্থে প্রতিমূর্তি করা, ইহার সহিত তাঁহার শরীরের সম্বন্ধ কি আছে; অতএব তাহাদিগেব তর্কের প্রবলতা কিছুই দেখিতে পাই না, যদি তাঁহারা এমত লেখেন যে মহৎ ও সৎকর্ম্মকারী ব্যক্তিও শ্রীহীন হইলে প্রস্তর কিংবা ধাতু দ্বারা তাঁহাব প্রতিমূর্তি করা উচিত নয়; ইহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে তাঁহাদিগের এ যুক্তি যদি সুযুক্তি হইত তবে কদাকার সক্রেটিসের প্রতিমূর্তি হইত না।..."

৭ অগাস্ট
সম্ভবত মধুসূদনের কোনো অসংগত আচরণে ক্ষুব্ধ হয়েই রাজনারাযণ তাঁকে কলকাতা ছেড়ে দেশের বাড়িতে গিয়ে থাকার নির্দেশ দেন। এই তাবিখের চিঠিতে মধুসূদন প্রিয় বন্ধু গৌবদাস বসাককে সেই দুঃসংবাদ জানিয়ে লিখছেন, আজ না পারলে, কাল, বেলেঘাটায় যাওয়াব পথে, কলেজে গিয়ে দেখা করবেন।

> "Your Byron shall be sent to-morrow with the fatal letter to Mr. Kerr. Farewell ! I don't know when I shall return from our country house. When you go to the Mechanic's give my compliments to Harris. ..."

হিন্দু কলেজ ছেড়ে দেওয়ার জন্যে তাঁর ভিতরে যে দীর্ঘ প্রস্তুতিপর্ব চলছিল, এই চিঠিতে তার প্রথম আভাস। রিচার্ডসন কিছুদিনের ছুটিতে স্বদেশে চলে গেলে মিঃ কার তাঁর জায়গায় হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ। কোনো কারণে একদিন মধুসূদন তিরস্কৃত হয়েছিলেন এই কার সাহেবের কাছে। তখন থেকেই কলেজ ছাড়ার সিদ্ধান্ত গোপনে শিকড় ছড়াতে থাকে তাঁর

চেতনায়। এই চিঠিতে যে 'মেকানিকস'-এর উল্লেখ, সেটা 'মেকানিকাল ইনসটিটিউশন'।

২৩ অগাস্ট
দ্বারকানাথ এডিনবরায়।

৩ সেপ্টেম্বর
মহারানী ভিকটোরিয়া এডিনবরায় এসে স্বাগত জানালেন দ্বারকানাথকে।

৫ সেপ্টেম্বর
দ্বারকানাথকে মানপত্র দিয়ে সম্মান জানাল 'ইউনিটেবিয়ান সোসাইটি অব এডিনবরা'।

অকটোবর
মধুসূদনের জীবনে এ বছরের অকটোবর মাসটা বেশ ঘটনাবহুল। বাবার হুকুম তামিল করতে যদি তাঁকে কলকাতা ছেড়ে দেশের বাড়িতে থাকতেও হয়, সেটা যে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি তার প্রমাণ এই অকটোবরেই তাঁকে দেখা যাবে বাবাব সঙ্গে তমলুকে পাড়ি দিতে। তমলুকের রাজা রাজনারায়ণের বন্ধু। তাঁকে দেখতেই রাজনারায়ণের তমলুকে আসা। তমলুকে বওনা হওয়ার আগে গৌরদাসকে লেখা চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে অল্পদিন আগেই তিনি বেশ কয়েকটি কবিতা পাঠিয়েছেন ব্ল্যাকউড ম্যাগাজিনে।
সব কটি কবিতাই ওয়ার্ডসওয়ার্থকে উৎসর্গ করা।

> "Good Heavens ? What a thing have I forgotten to inform you of ! I have sent my poems to the Editor of the Blackwood's Tuesday last. I haven't dedicated them to you. as I intended. but to William Wordsworth. the Poet. My dedication runs thus -
> These Poems are most respectfully dedicated to William Wordsworth Esquire. the Poet by a foreign admirer of his genius—the author.
> Oh! to what a painful state have I committed myself. Now I think the Editor will receive them graciously: Now I think he will reject them."

তমলুকে যাওয়ার পথে তাঁর চোখে পড়েছিল সমুদ্রের দিকে পাড়ি দেওয়া ইংলণ্ডগামী জাহাজের সার। ঐ জাহাজ দেখেই তাঁব বেদনায় সমুদ্র-সান্নিধ্যের তৃপ্তি। আর সমুদ্রের সূত্রেই ইংলণ্ডে পৌঁছনোর আকুতি। গৌরদাসকে চিঠিতে লিখছেন—

> "I am grieved to think that I will not meet ye to-morrow: but Gour. there is one consolation for me. I am come nearer that sea which will perhaps see me at a period— which I hope is not far off—ploughing its bosoms for England's glorious shore. The sea from this place is not very far: what a number of ships have I seen going to England "

এরই কাছাকাছি সময়ে 'লিটেরারি গ্লীনার'-এর জন্যে যে কবিতা লিখবেন, সেখানেও ভিন্ন স্বদেশ-সন্ধানের আকুলতা।

> Oft like a sad bird I sigh
> To leave this land. though mine own land it be:

এই অকটোবরেই কবিতা পাঠিয়ে 'বেন্টলে'স মিসেলেনি'-র সম্পাদককে চিঠি। এ চিঠির ভাষা আর ভঙ্গি বিস্ময়করব্রূপে বিনয়াবনত, আত্মঘোষণার স্বভাবসিদ্ধ বাকভঙ্গিকে কোথাও

প্রশ্রয় না দিয়ে। ব্রিটিশ-বন্দনা অবশ্য যথারীতি।

> ".... 'Famee', Sir, is not my object at present: for I am really conscious I do not deserve it: —all that I require is Encouragement. I have a strong conviction that a Pubic like the British -- discerning, generous, and magnanimous --will not damp the spirit of a poor foreigner I am a Hindu -- a native of Bengal - and study English at the Hindu College in Calcutta I am now in my eighteenth year,—'a child'--to use the language of a poet of your land, Cowley, "in learning but not in age" "

১ অকটোবব

আবার ইংরেজি ক্লাস শুরু হল সংস্কৃত কলেজে। শ্যামাচবণ সবকার হয়ে গেলেন ইংবেজিব দ্বিতীয় শিক্ষক। ৬ বছর ঐ কলেজে ইংবেজি পডাতে পডাতেই শিখেছিলেন সংস্কৃত।

১৫ অকটোবর

এই দিন সন্ধ্যায় দ্বারকানাথেব লণ্ডন ছেড়ে প্যাবিস যাত্রা। জাহাজ ছেড়েছিল অবশ্য পবেব দিন।

১৮ অকটোবর

দ্বারকানাথ পৌঁছলেন প্যাবিসে। ডায়াবিতে লিখলেন, এ হচ্ছে সৌন্দর্য ও প্রাণোচ্ছলতায় পূর্ণ, জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিল্পকলার তীর্থস্বরূপ।

২৬ অকটোবর

প্যারীচাঁদ আর কিশোরীচাঁদ মিত্রের বাবা বামমোহন মিত্রের মৃত্যু।

২৮ অকটোবর

দ্বারকানাথ আর লুই ফিলিপেব সাক্ষাৎকার।

তমলুক থেকে গৌরদাসকে লেখা মধুসূদনের চিঠিতে অন্য ধরনেব বিলাপ, সাময়িকভাবে কবিতাব দরজা খোলাব চাবি হারিয়ে। অবশ্য কলকাতায পৌঁছলেই যে সে চাবি আবার এসে যাবে মুঠোয়, সে বিষয়ে সংশয়হীন।

৯ নভেম্বর

স্বদেশে ফেরার জন্যে মার্সেই থেকে জাহাজে চাপলেন দ্বারকানাথ।

সঙ্গে সে যুগের বিখ্যাত মানুষ, জর্জ টমসন।

২৫ নভেম্বর

গৌরদাসকে লেখা চিঠিতে মধুসূদন জানাচ্ছেন—

১. কলেজ ছাড়ার ব্যাপারে তিনি দৃঢ়-সংকল্প। যতদিন না রিচার্ডসন ফিরে আসছেন, ততদিন আর মাথা গলাবেন না সেখানে।

২. ইংলণ্ড পাড়ি দেওয়ার ব্যাপারেও সুনিশ্চিত। সম্ভবত সামনের শীতে।

৩. বিদেশ যাওয়ার সময় সঙ্গে নিতে চান গৌরদাসের একটা মিনিয়েচার ছবি, দেশি বা বিদেশী কোনো শিল্পীকে দিয়ে আঁকানো।

২৬ নভেম্বর

গৌরদাসকে লেখা চিঠিতে মধুসূদন আবার জানাচ্ছেন কলেজ সম্পর্কে ঘৃণা। কলেজ ছাড়বেন কালই। আর তাঁর বিলেত পাড়ি দেওয়ার গোপন খবর যদি গৌরদাস ফাঁস করে দেয় তাঁর বাবা-মা-র কাছে, তাহলে পূর্ণচ্ছেদ পড়বে তাঁদের বন্ধুত্বে। জানাচ্ছেন, কেন তিনি বাবা-মাকে ছাড়তে চলেছেন। না, নিষ্ঠুরতা এর একমাত্র কারণ নয়।

> "But, "to follow poetry", (says A. Pope,) "one must leave both father and mother"."

২৭ নভেম্বর

এই তারিখে মধুসূদনের দুখানা চিঠি। দুটোই গৌরদাসকে লেখা। একটা রাত্রে। অন্যটা মধ্যরাত্রে। জানতে পেরেছেন, আব ঠিক তিনমাস পরে নাকি তাঁর বিয়ে। চঞ্চলমতির ছেলেকে সুস্থ স্বাভাবিক করে তুলতেই রাজনারায়ণের মনে হয়েছে, এটাই উৎকৃষ্ট চিকিৎসা। প্রথম চিঠিতে গৌরদাসের ভুল ইংরেজি নিয়ে ভর্ৎসনা, টমাস মুরের বায়রন-জীবনী নিয়ে ব্যক্তিগত আবেগ, কলেজ ছেড়ে দিয়েও কলেজের জন্যে চোরা টানের ইশারা। দ্বিতীয় অর্থাৎ মাঝরাতের চিঠিটা মর্মান্তিক, তাঁর বিপন্ন অস্তিত্বের বিলাপে।

> "....You don't know the weight of my afflictions. I wish, (oh! I really wish) that somebody would hang me! At the expiration of three months from hence I am tobe married; dreadful thought! It harrows up my blood and makes my hair stand like quills on the fretful porcupine! My betrothed is the daughter of a rich zemindar ; — poor girl! What a deal of misery is in store for her in the ever inexplorable womb of Futurity! You know my desire for leaving this country, is too firmly rooted to be removed. The sun may forget to rise, but I cannot remove it from my heart. ...I must either be in E-d or cease "to be" at all: —one of these must be done !.."

১ ডিসেম্বর

বেঙ্গল স্পেকটেটরের খবর, কাউন্সিল অব এডুকেশনের প্রেসিডেন্ট ক্যামেরন সাহেব এখন থেকে হিন্দু কলেজের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে যারা নীতি বিষয়ে লিখতে পাববেন উৎকৃষ্ট রচনা, তাদের পুরস্কৃত করবেন নিজের স্বাক্ষর-করা স্বর্ণমুদ্রায়। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের নীতিশিক্ষা দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা না-থাকার বিরুদ্ধে বেশ কিছুকাল পত্র-পত্রিকায় যে বাদানুবাদ চলছিল, তা সামলাতেই ক্যামেরনের এই ঘোষণা।

২৯ ডিসেম্বর

দ্বারকানাথের সঙ্গে জর্জ টমসন কলকাতায় পৌঁছলে 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'য় দুজনকেই স্বাগত-সম্ভাষণ— . .

> "মিঃ জর্জ টমসন এ যুগের অসাধারণ ব্যক্তিদের অন্যতম। তাঁর অতুলনীয় বাগ্মীতার জোরে তিনি ব্রিটিশ-শাসিত সকল উপনিবেশ থেকে নিগ্রো-ক্রীতদাস প্রথা উচ্ছেদ করে, সম্প্রতি এ-দেশে এসেছেন দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে। তাঁর আসার ফলে ভারতের মঙ্গল সাধিত হবে বলে আমাদের স্থির বিশ্বাস।"

১৮৪৩

পাঁচ বছব বয়সে মাদ্রাজ-নিবাসী কুলপুবোহিত বিশ্বম্ভব ভট্টাচার্যের কাছে বঙ্কিমের হাতেখড়ি। এরপর গ্রামের পাঠশালার শিক্ষক রামপ্রাণ সরকারেব উপব তাঁর শিক্ষাব ভাব। পাঠশালা যাদবচন্দ্রেরই তৈরি। আর পণ্ডিত মহাশয়ের জীবিকাও যাদবচন্দ্রের অনুগ্রহের উপরই নির্ভর। বিদ্যাবুদ্ধির পুঁজি যৎসামান্য। বঙ্কিম নিজেও খুব একটা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না তাঁর সম্পর্কে। সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী লিখতে গিয়ে জানাচ্ছেন—

> "সে সময়ে গ্রাম্য প্রদেশে পাঠশালার গুরু মহাশয় শিক্ষামন্দিরের দ্বাররক্ষক ছিলেন; তাঁহার সাহায্যে সকলকেই মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতে হইত। অতএব সঞ্জীবচন্দ্র যথাকালে এই বেত্রপাণি দৌবারিকেব হস্তে সমর্পিত হইলেন। গুরু মহাশয় যদিও বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্যেই নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তথাপি হাট বাজার করা ইত্যাদি কার্য্যে, তাঁহার মনোভিনিবেশ বেশী ছিল, কেন না তাহাতে উপরি লাভের সম্ভাবনা। সুতবাং ছাত্রও বিদ্যার্জ্জনে তাদৃশ মনোযোগী ছিলেন না। লাভের ভাগটা গুরুবই গুরুতর ছিল।"

এখানে প্রশ্ন ওঠে দুটো। যে শিক্ষককে সঞ্জীবচন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্যেই নিয়োগ করা, তিনিও কি ঐ গ্রাম্য-পাঠশালার পণ্ডিত রামপ্রাণ সরকার? যদি পাঠশালার পণ্ডিতই হয়ে থাকেন তাহলে হাট-বাজারের প্রসঙ্গ ওঠার কথা নয়। আব লাভেব হিসেব নিকেশটাও অবান্তর। এখানে যা ইঙ্গিত, তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে স্বতন্ত্র এক শিক্ষক তিনি। আর তাঁর উপরেই দায়িত্ব পড়েছিল যাদবচন্দ্রের পরিবারের হাট-বাজারের।

এ ছাড়াও প্রশ্ন ওঠে আরো। সেটা বঙ্কিমের বাল্যশিক্ষা নিয়ে। 'বঙ্কিম জীবনী'-তে পড়ছি—

> "পাঠশালায় ইতরজাতীয় বালকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র সাদরে গৃহীত হইলেন।"

অন্য দিকে আর-এক বঙ্কিম-গবেষক গোপালচন্দ্র রায় তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র'-য় জানাচ্ছেন—

> "বঙ্কিমচন্দ্র পাঠশালায় পড়তেন না। গুরুমহাশয় সকাল সন্ধ্যা দুবেলা বাড়িতে এসে পড়িয়ে যেতেন। বাড়িতে এই গুরুমহাশয়ের কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রও পড়তেন।"

গোপালবাবুর মন্তব্যের সমর্থন মেলে ছোটো ভাই পূর্ণচন্দ্রের 'বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা'-য়—

> "সেকালের পল্লীগ্রাম মাত্রেই পাঠশালা থাকিত। আমাদের গ্রামেও পাঠশালা ছিল, আমাদের বাড়ির সন্নিকটে একটি ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র কখনও পাঠশালায় পড়েন নাই, আমার জ্ঞানে তো নহে। হুগলী কলেজে ভর্তি হইবার পূর্বে তাঁহাকে একজন Private tutor সকালে ও সন্ধ্যার পর পড়াইয়া যাইত।"

তাহলে কি পাঠশালার পণ্ডিত আর প্রাইভেট টিউটর একই ব্যক্তি। অর্থাৎ ঐ রামপ্রাণ সরকারই?

গোপালচন্দ্র রায় জানাচ্ছেন—

> "বঙ্কিমচন্দ্র বাড়িতে গুরুমশায় রামপ্রাণ সরকারের কাছে ৮/১০ মাস মাত্র পড়েছিলেন।"

শিক্ষক যিনিই হোক, বঙ্কিমকে বর্ণমালা শেখাতে গিয়ে তিনি হতবাক। ছাত্রটি যেন একই সঙ্গে শ্রুতিধব এবং স্মৃতিধর। একবার বললেই শেখা হয়ে যায় তৎক্ষণাৎ। তখনও 'বর্ণপরিচয' লেখা হয়নি। তার বদলে 'শিশুবোধক'-এর চল। ঐ বইয়ের 'অলস' 'অবশ' শিখেই ছাত্র শিক্ষককে জানিয়ে দিলে আমার 'যশম' 'পশম'ও শেখা হয়ে গেল। শিক্ষক যা শেখান, নিমেষে ছাত্রের মুখস্থ। ফলে ভীত শিক্ষকের করুণ জিজ্ঞাসা—

> "বাবা বঙ্কিম এরূপ ভাবে পড়িয়া গেলে আর কতদিন তোমায় পড়াইব?"

৪১ বছর পরে 'প্রচার'-এ 'গ্রাম্যকথা' নামের ব্যঙ্গাত্মক বচনা লিখবেন যখন, তখন সম্ভবত তাঁর মনে পড়ে গিয়ে থাকবে শৈশবের পাঠশালা, শৈশবেব শিক্ষক।

১৮৪৩

বছরের প্রধান ঘটনাবলী

কলেরায় আক্রান্ত হয়ে সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণ শ্রেণীর অধ্যাপক গঙ্গাধর তর্কবাগীশ-এর মৃত্যু। বিদ্যাসাগরকে ছেলের মতো ভালোবাসতেন তিনি। মৃত্যুকালে বিদ্যাসাগরই নিয়েছিলেন তাঁর চিকিৎসার ভার।
যখন ছাত্র, বয়স মোটে ১৭, 'সেয়ালদহে'-র রামমোহন মিত্রের ১১ বছরের প্রসন্নময়ী দেবীর সঙ্গে রাজনারায়ণ বসুর বিয়ে।
সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় প্রথম হয়ে হিন্দু কলেজে প্যারীচরণ সরকারের পড়া শেষ। ইংরেজি প্রবন্ধ রচনার দক্ষতায় শিক্ষকদের কাছে অসম্ভব প্রিয়। কলেজ ছাড়ার সময় কর্তৃপক্ষ আর শিক্ষক সকলেই তাঁকে সাম্মানিক অভিজ্ঞান-পত্র দিয়েছিলেন।
এমিলি ওরমের সঙ্গে লঙ সাহেবের বিয়ে।
মাতৃবিয়োগ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের। হুগলি কলেজ ছেড়ে রঙ্গলাল চলে এলেন খিদিরপুরে. মামার বাড়িতে।
হিন্দু কলেজে প্রথম শ্রেণীতে উঠলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

জানুয়ারি

জে. রবিনসনের সম্পাদনায় শ্রীরামপুর থেকে বেরল 'মঙ্গলোপাখ্যান পত্র' নামের মাসিক পত্রিকা। বাঁদিকে ইংরেজি, ডান দিকে বাংলা। এরই ইংরেজি নাম 'দি ইভানজেলিস্ট'। ভারতবর্ষের আর পৃথিবীর গুরুতর সব সংবাদ, সেইসঙ্গে ভ্রাতাদের মধ্যে মঙ্গল সমাচার বিনিময়ই উদ্দেশ্য।

১১ জানুয়ারি
হিন্দু কলেজে জর্জ টমসনকে সংবর্ধনা জানানোর সভা। উদ্যোক্তা রামগোপাল ঘোষ, 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'-র পক্ষ থেকে। তিনিই সভার সভ্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন টমসনের। টমসনের ভাষণে ব্রিটিশ-বিরোধী কোনো চেতনা জাগিয়ে তোলার ইচ্ছে প্রকাশ পায়নি সেদিন। বরং শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে শিক্ষিত সমাজের সুস্থ সম্পর্ক গড়ে তোলার আবেদন জানালেন তিনি। তবে, এদেশের শিক্ষিত মানুষ হয়ে উঠুক সমগ্র দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষার, অভাব-অভিযোগের যোগ্য প্রতিনিধি এও ছিল তাঁর কাম্য।

২০ জানুয়ারি
রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে জর্জ টমসনের বক্তৃতা।

২৩ জানুয়ারি
এগ্রি-হর্টিকালচারের বাড়িতে জর্জ টমসনের বক্তৃতা। সভাপতি, স্যার জন পিটার গ্রান্ট।

২৮ জানুয়ারি
টাউন হলে সি.বি. গ্রিনলকে সংবর্ধনা জানানোর সভায় জর্জ টমসনের বক্তৃতা। সভাপতি, টি. ডিলট্রি।

৩০ জানুয়ারি
চন্দ্রশেখর দেবের বাড়িতে ডাকা সভায় জর্জ টমসন-এর বক্তৃতা। সভাপতি, বরদাকান্ত রায়। টমসনের ভাষণে ছিল ব্রিটিশ শাসক আর দেশের জনগণের মধ্যে মধ্যস্থের ভূমিকা পালনে সক্ষম শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে ইংরেজদের সহযোগিতার উপর গুরুত্ব।

৬ ফেব্রুয়ারি
শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানবাড়িতে ডাকা সভায় জর্জ টমসনের বক্তৃতা। সভায় হাজির ছিলেন ২০০ বাঙালি আর ৫ ইংরেজ। সভা বসেছিল রাত্রে।

৮ ফেব্রুয়ারি
'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'-র অধিবেশন হিন্দু কলেজের হলঘরে। সভাপতি, তারাচাঁদ চক্রবর্তী। শ্রোতাদের মধ্যে জর্জ টমসন, ক্যাপটেন রিচার্ডসন ছাড়াও আরও অনেক গণ্যমান্য ইংরেজ এবং বাঙালি বুদ্ধিজীবী। বক্তা, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। বিষয়, "Present Condition of the East India Company's Courts of Judicature and Police under the Bengal Presidency."
সম্ভবত এটাই ছিল দক্ষিণারঞ্জনের প্রথম আর প্রধান রাজনৈতিক বক্তৃতা। তাঁর বক্তব্যের ভিতরে কোম্পানির কর্মচারীদের ক্ষমতার অপব্যবহার, পুলিশের অসাধুতার দৃষ্টান্ত ছাড়াও ছিল ব্রিটিশ শাসন পদ্ধতির আর শোষণের কায়দা-কানুনের কঠোর সমালোচনা। রিচার্ডসন রক্ষণশীল মানসিকতার মানুষ। দক্ষিণারঞ্জনের বক্তৃতায় রাজদ্রোহিতার গন্ধ পেয়ে বক্তৃতার মাঝখানেই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—

"I cannot convert the college into a den of treason !"

অর্থাৎ চাইলেন সভা বন্ধ করে দিতে। সভাপতির মঞ্চ থেকে তখুনি উঠে দাঁড়ালেন সভাপতি তারাচাঁদ। সরাসরি রিচার্ডসনের দিকে তাকিয়ে তাঁর দৃঢ় প্রতিবাদ—

> "Captain Rechardson, with due respect I beg to say that I cannot allow you to proceed any longer in this course of conduct towards our Society and on behalf of my friend Babu Dhakin I must say that your remarks are anything but becoming. I am bound also to add that I consider your conduct as an insult to the society and that if you do not retract what you have said and make due apology, we shall represent the matter to the committee of Hindu College. and if necessary to the Government itself."

এর পরই সভা ত্যাগ করে সভ্যেরা চলে যান শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানবাড়িতে। সভার কাজ শেষ হয় সেখানে। এর পর থেকে হিন্দু কলেজের হলঘরের বদলে সভার জন্যে জায়গা নির্দিষ্ট হয়ে উঠবে ফৌজদারী বালাখানা। কলুটোলা স্ট্রিট আর চিৎপুর রোড মিলেছে যেখানে, সেই চৌমাথার উত্তর-পূর্ব কোণের প্রকাণ্ড বাড়িটাই ছিল ফৌজদারী বালাখানা বা বালাখানা বাড়ি। হুগলির ফৌজদাররা এখানে বসে মামলা-মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করত বলেই এই নাম। ভিতরে ছিল বিরাট হল ঘর।

অধিকাংশ ইংরেজি সংবাদপত্রেই দক্ষিণারঞ্জনের এই দিনের বক্তৃতা নিন্দিত হয়েছিল অভদ্র ভাষায়। একমাত্র 'বেঙ্গল হরকরা' সম্পূর্ণ বক্তৃতাটা দু-সংখ্যায় ছাপিয়ে (২, ৩ মার্চ) প্রশংসা জানিয়েছিল উচ্ছ্বসিত ভাষায়। আর প্রশংসা করেছিলেন টমসন। প্রশংসা শুধু দক্ষিণারঞ্জনকে নয়। 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'-র প্রত্যেক সদস্যকেই তাঁর সাধুবাদ, ইংরেজদের সমালোচনা করার সাহস দেখে।

এই প্রসঙ্গে আমরা নজর ফেরাব অন্য এক ভাবনার দিকে। সেটা রিচার্ডসনকে নিয়ে। যিনি সামান্য রাজদ্রোহিতার গন্ধে এতখানি ক্ষিপ্ত, তাঁর সম্পর্কেই ভিন্ন এক মানসিকতার খবর জানিয়ে দেন ভোলানাথ চন্দ্র তাঁর 'পুরাতন হিন্দু কলেজের স্মৃতি'-নামের প্রবন্ধে। মৃদুলকান্তি বসু-র অনুবাদে সেই প্রবন্ধেই পড়ি—

> "যাহা সম্ভবত ডিরোজিও-ও পড়াইতে সাহস করিতেন না, বাঙ্গালী ছেলেরা বিচার্ডসনের নিকট প্রথম সেই নূতন বিষয় পড়িল। তিনি তাহাদের রাষ্ট্রনীতি পড়াইতেন—যে শিক্ষাদান বর্তমানে দণ্ডার্হ অপরাধ বা নিন্দনীয় দুর্নীতি বলিয়া বিবেচ্য। প্রথম চার্লস-এর হত্যা এবং দ্বিতীয় জেমস-এর রাজ্যচ্যুতি—এই দুইটি প্রধান ও কেন্দ্রীয় ঘটনা, যাহা ইংরাজ জাতির রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব সমাপ্ত করিয়া পরিবর্তন আনিয়াছিল। তিনি মধ্যে মধ্যে তাহার আলোচনা করিয়া তাহার যাথার্থ্য বা অপ্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা কবিতেন। এই বিষয়ে তৎকালীন লেখকদিগের রচনা হইতে যুক্তি সংগ্রহ করিয়া তিনি আমাদের তৈয়ারি করিতেন...। রিচার্ডসন কোন পক্ষে ছিলেন আমার স্পষ্ট মনে নাই, কিন্তু তিনি তাঁহার চারিপার্শ্বে রাজপক্ষ রাউণ্ডহেডদের উপভোগ করিতেন। এই শিক্ষা তাহার স্বাভাবিক ফল প্রসব করিয়াছিল।"

৯ ফেব্রুয়ারি

মধুসূদন দত্ত খৃস্টধর্মে দীক্ষা নিলেন কলকাতার মিশন রো-এর 'ওল্ড মিশন চার্চে'। আর্চডিকন ডেয়ালট্রি-র দেওয়া নতুন নাম হল মাইকেল। পাছে গণ্ডগোল ঘটে তাই চার্চ কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা করেছিলেন কড়া পাহারার। অনুষ্ঠানে 'নির্বাচিত সাক্ষী' হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। শহরে বেশ সোরগোল পড়ে গিয়েছিল এই ঘটনায়।

হিন্দু কলেজ থেকে অন্তর্হিত হয়ে, পাছে তার উপর কোনোভাবে বলপ্রয়োগ হয় সেই আতঙ্কে, খৃস্টান পাদ্‌রিদের সাহায্য নিয়ে লুকিয়েছিলেন ফোর্ট উইলিয়মে। গোপনে এই সংবাদ পেয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন গৌরদাস বসাক আর ভূদেব মুখোপাধ্যায়। কিন্তু প্রিয় দুই বন্ধুর অনুরোধেও নিজের স্থির-সংকল্পে মধুসূদন ছিলেন অনড়।

মধুসূদনের খৃস্টান হওয়ার পিছনে ছিল প্রধানত দুটো কারণ। এক, বাবা-মায়ের মনোনীত এক ধনী পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করার অনিচ্ছা। দুই, ইংলণ্ড যাওয়ার তীব্র ইচ্ছে। হিন্দুর পক্ষে কালাপানি পার হওয়া নিয়মবিরুদ্ধ। গেলেই জাতিনাশ। কিন্তু খৃস্টান হলে সে নিয়ম অচল। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা চিঠি থেকে এ-বিষয়ে জানা যায় অনেক বিস্তৃত তথ্য।

১০ ফেব্রুয়ারি

কিশোরীচাঁদ মিত্রের বাড়িতে প্রতিষ্ঠা হল 'হিন্দু থিও-ফিলানথ্রপিক সোসাইটি'-র বা 'বিশ্ব-প্রেমোদ্দীপনী সভা'-র। যোগদানকারীদের মধ্যে ছিলেন আলেকজাণ্ডার ডাফ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, রামগোপাল ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখেরা। সভার অধিবেশন হত মাসে একবার। ঈশ্বরের প্রকৃতি আর গুণ, নীতি আর ধর্মবিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ হত ইংরেজি আর বাংলায়। দেশবাসীর নৈতিক উন্নতির সর্বোৎকৃষ্ট উপায় নির্ধারণের দিকেই ছিল সভার মনোযোগ। এখানে বিভিন্ন সময়ে বাংলা প্রবন্ধ পাঠ করেছেন অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর সম্ভবত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। বেশির ভাগ প্রবন্ধ পাঠই কিশোরীচাঁদ মিত্রের। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠ করেছিলেন দুটো প্রবন্ধ। কৃষ্ণমোহনের প্রথম প্রবন্ধটি ছিল কিশোরীচাঁদ মিত্রের 'On the system of Philosophy inculcated by the Bhagavat Geeta' প্রবন্ধের প্রত্যুত্তরে লেখা 'On the Bhagavat Geeta'. গীতার উপদেশাবলীই ছিল কিশোরীচাঁদ মিত্রের জীবনের 'মোটো'। ১৮৪৬-এ কিশোরীচাঁদ সরকারি চাকরি নিয়ে কলকাতা ছেড়ে চলে গেলে এই সভা উঠে যায়।

১৩ ফেব্রুয়ারি

শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানবাড়িতে ডাকা সভায় জর্জ টমসনের বক্তৃতা। সভাপতি, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল।

২০ ফেব্রুয়ারি

দৈনিক 'ইণ্ডিয়ান মিরর'-এর সম্পাদক, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী, বিধবা বিবাহ সমর্থক, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রবক্তা নরেন্দ্রনাথ সেন-এর জন্ম কলকাতার কলুটোলায়। বাবা, হরিমোহন, পিতামহ, রামকমল।

শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানবাড়িতে ডাকা সভায় টমসনের বক্তৃতা। সভাপতি, চন্দ্রশেখর দেব।

২৭ ফেব্রুয়ারি

শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানবাড়িতে ডাকা সভায় জর্জ টমসনের বক্তৃতা। দারোগা আর আদালতের আমলাদের দুর্নীতিপরায়ণতা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে জানালেন যে, শ্রোতাদের বারে বারে আঘাত করতে হবে বিচারের দ্বারে কঠিন থেকে কঠিনতর ভাবে।

"যদি এখানে তা শ্রুত না হয়, তবে বাতাস আপনাদের অভিযোগগুলি সমুদ্রের ওপারে

বহন করে নিয়ে যাক এবং আপনাদের কাজে আপনাদের সাহায্যের জন্যে ইংলণ্ড গর্জন করে উঠুক।"[১]

রায়তদের জন্যে দুঃখপ্রকাশ করে বললেন—

"তারা মহাজন, জমিদার, তাদের দালালরা আর লুঠেরার দল আর সবশেষে সকলের থেকে খারাপ দেশের প্রতিটি অংশে ছড়িয়ে থাকা আইন-ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত যে দস্যুদল ইতিমধ্যেই দরিদ্র জনসাধারণের ওপর পঙ্গপালের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাদের শিকার।"

মার্চ

ইংরেজি আর বাংলা একই সঙ্গে দুটো ভাষায় বেরনো ইয়ং বেঙ্গলী মুখপত্র 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' মাসিক থেকে হয়ে গেল সাপ্তাহিক।

১ মার্চ

মতিলাল শীল-এর ব্যক্তিগত দানে তিন লক্ষ টাকার ট্রাস্ট গড়ে প্রতিষ্ঠা হল 'শীলস কলেজ', নিজেব কলুটোলাব বাড়িতে। অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন, অধ্যাপক রেভারেণ্ড মিঃ জনসন। অন্যতম বক্তা জর্জ টমসন তাঁর ভাষণে বললেন—

"আমার অন্তঃকরণে যে আনন্দোদয় হইয়াছে তাহা প্রকাশ না করিলে অসুখী হইব। এই সভাতে সকলে আহ্লাদজনক বিষয় দেখিতেছি, আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান শীলবাবু সৎ-পরিশ্রমে ধনোপার্জ্জন করিয়া তাহার কিয়দংশ স্বদেশীয় জনগণের বিদ্যাবৃদ্ধির নিমিত্ত অর্পণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, ইঁহার নিতান্ত মানস এই যে ধন ব্যয় করিয়া লোকের বিদ্যাবৃদ্ধি করিবেন।"

সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের জেসুইট পাদ্রীদের তত্ত্বাবধানে চলত এই কলেজ। নামকরণ হয়েছিল হিন্দু কলেজ-কে মনে রেখে।

এই কলেজ গড়ে তোলার পিছনে যে থেকে গিয়েছিল একটা ব্যক্তিগত কারণ, সে কাহিনী জানতে পাবা যায় যোগেশচন্দ্র বাগলের 'কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র' থেকে। মতিলালের বড়ো ছেলে হীরালাল পড়তেন হিন্দু কলেজে। জনৈক শিক্ষক একদিন তাঁকে মাত্রাতিরিক্ত শাস্তি দিলে অপমানিত বোধ করেন মতিলাল। কলেজ থেকে ছেলেকে ছাডিয়ে এনে সিদ্ধান্ত নেন, নিজেই গড়বেন একটা কলেজ।

৬ মার্চ

৩১ নং ফৌজদারী বালাখানার সভায় জর্জ টমসনের বক্তৃতা। সভাপতি, হরকুমার ঠাকুর।

৭ মার্চ

মেকানিক ইনস্টিটিউটের সভায় জর্জ টমসনের বক্তৃতা। সভাপতি, ঐ ইনস্টিটিউটের সহঃ সভাপতি রেভারেণ্ড বোয়াজ।

৮ মার্চ

'বেঙ্গল স্পেকটেটর'-এ 'শীলস কলেজ' উদবোধনের রিপোর্ট—

"শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীল কর্ত্তৃক বদান্যতা প্রকাশ পূর্ব্বক হিন্দু বালকগণের শিক্ষার্থে স্থাপিত অভিনব বিদ্যালয়ের পাঠারম্ভ ১ মার্চ বুধবার প্রাতে হইয়াছিল তৎকালীন অনেক

সম্ভ্রান্ত ইংরাজ ও বিবি লোক এবং বাঙালি উপস্থিত ছিলেন। ঐ বিদ্যালয়ে এককালীন ৫ শতাধিক বালকের শিক্ষা হইতে পারিবেক। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান জজ, স্যার জে. পি. গ্রান্ট, এডবোকেড জেনারেল প্রধান কৌন্সেলি, শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, কাপ্তেন বর্চ্চ, রেবেরণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্য, মেং জার্জ টমসন, ডাক্তার কার, জেবিয়া কলেজের অধ্যাপকগণ, জে. প্যাটন অনেক মহাশয় ঐ পাঠারম্ভ দেখিতে আসিয়াছিলেন।"

৯ মার্চ
এগ্রি-হর্টিকালচার সোসাইটির বাড়িতে ডাকা সভায় টমসনের বক্তৃতা। সভাপতি, স্যার জন পিটার গ্রান্ট।

১৩ মার্চ
ফৌজদারী বালাখানায় ডাকা সভায় টমসনের বক্তৃতা। সভাপতি, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ।

১৪ মার্চ
ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে অনুষ্ঠিত সভায় টমসনের বক্তৃতা। সভাপতি, স্যর রবার্ট জিন।

১৬ মার্চ
পেরেন্টালে অ্যাকাডেমিক ইনস্টিটিউশনের ডাকা সভায় টমসনের বক্তৃতা। সভাপতি, ডঃ ডাফ।

২০ মার্চ
ফৌজদারী বালাখানায় টমসনের বক্তৃতা। সভাপতি, হরিমোহন সেন।

২২ মার্চ
জমিদার সভার অধিবেশনে টমসনের বক্তৃতা।

এপ্রিল
মদনমোহন তর্কালঙ্কার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকরি নিলেন পণ্ডিত হিসেব।

৬ এপ্রিল
ফৌজদারী বালাখানার সভায় টমসন সভাপতি।

১৩ এপ্রিল
ফৌজদারী বালাখানার সভায় টমসনের বক্তৃতা। সভাপতি, মিঃ জি. টি. ই. স্পিড।

১৫ এপ্রিল
'হিন্দুস্তান' জাহাজে চেপে হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ক্যাপটেন রিচার্ডসন-এর স্বদেশ যাত্রা।

১৯ এপ্রিল
হিন্দু কলেজের নূতন ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপ্যাল হলেন জেমস ক্যর।

২০ এপ্রিল

কলকাতায় গড়া হল 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'।

"জর্জ টমসন এদেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবার জন্য ও রাজনীতির চর্চা বিষয়ে এদেশীয়দিগকে উৎসাহিত করিবার মানসে এদেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় বক্তা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার বক্তৃতা যাঁহারা শুনিয়াছিলেন, তাঁহারা বলেন যে, তাঁহার এক এক বক্তৃতাতে তৎকালীন সমাজ অগ্নিময় হইয়া উঠিত। তাঁহার উৎসাহে ও সাহায্যে কলিকাতায় ফৌজদারী বালাখানা নামক স্থানে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' নামে এক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাকে বর্তমান ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনের পূর্ব্বপুরুষ মনে করা যাইতে পারে। জর্জ টমসন এদেশে পদার্পণ করিবামাত্র ডিরোজিওর ছাত্রদল তাঁহার চারিদিকে আবেষ্টন করিলেন। রামগোপাল তাঁহাদের অগ্রগণ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ফৌজদারী বালাখানা হইতে জর্জ টমসনের ও রামগোপাল ঘোষের রব বজ্রনির্ঘোষে উত্থিত হইতে লাগিল। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া তদানীন্তন শ্রীরামপুরস্থ পত্রিকা 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' একবার লিখিলেন— "এখন দুইদিকে বজ্রধ্বনি হইতেছে, পশ্চিমে বালা হিসারে ও কলিকাতার ফৌজদারী বালাখানাতে।"

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ/শিবনাথ শাস্ত্রী

সোসাইটির সম্পূর্ণ নাম, বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি, ইংলণ্ডের ব্রিটিশ সোসাইটির অনুকরণে। টমসন চেয়েছিলেন এই সভা জমিদারদের সভা না হয়ে হবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক সচেতনতার প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠার সময়ে সভার সভাপতি, জর্জ টমসন। সহকারী সভাপতি জি. এফ. রেমফ্রে আর রামগোপাল ঘোষ। সম্পাদক, প্যারীচাঁদ মিত্র।

"প্যারীচাঁদ মিত্র অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সহিত সভার কার্য চালাইতেন এবং ভারত সরকার ও লণ্ডনের British India Society—এ উভয়ের মধ্যে বহু পত্রালাপ করিতেন। অনেকে মনে করেন যে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ প্রথা এবং অন্য কয়েকটি শাসন সংস্কার প্রধানতঃ এই নতুন রাজনীতিক সমাজের চেষ্টারই সুফল। সরকারী কাজে আরও অধিক সংখ্যক ভারতীয় নিয়োগ এবং আদালতে দেশীয় ভাষার ব্যবহার প্রভৃতি সংস্কারের জন্যে সরকারের নিকট আবেদন করা হয়।

"প্যারীচাঁদ মিত্র জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য করেন এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে রায়তগণের দুরবস্থা বাড়িয়াছে এই মর্মে প্রবন্ধ লেখেন। সম্ভবত এই কারণে রাধাকান্ত দেব, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি Bengal British India Society স্থাপনে কোন প্রকার সাহায্য করেন নাই এবং ১৮৪৩ হইতে ১৮৫০ সন পর্যন্ত এই সমাজ ও পূর্বে প্রতিষ্ঠিত Landholder's Society (ভূম্যধিকারী সমাজ) অনেকটা পরস্পর-বিরোধী ছিলেন। টমসন উভয়ের সঙ্গেই ছিলেন।"

বাংলা দেশের ইতিহাস/রমেশচন্দ্র মজুমদার

এই দিনের সভায় গৃহীত হয়েছিল ৬ দফা প্রস্তাব।

১. ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন এই ভারত সাম্রাজ্যের সম্বন্ধে সরকার আর ইংলণ্ডের অধিবাসীদের কর্তব্য হবে এই যে এদেশের উন্নতির জন্যে সর্বপ্রকার চেষ্টা করা।

২. একটি সোসাইটি স্থাপন।

৩. এর নাম হবে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি।

৪. সোসাইটি কাজ করবে রাজভক্তি বজায় রেখে এবং আইনকানুন মেনে।

৫. ছাত্র ছাড়া যে-কোনো প্রাপ্তবয়স্কই সভ্য হতে পারবেন চাঁদা দিয়ে, আর গৃহীত প্রস্তাবের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে।
৬. চন্দ্রশেখর দেব, রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী আর প্যারীচাঁদ মিত্রকে নিয়ে গঠন করা কমিটির কাজ হবে সোসাইটির উদ্দেশ্য জনসাধারণকে জানানো।
সোসাইটির কার্যকরী সভা গড়া হয়েছিল যাঁদের নিয়ে—
জি. এম. রেমফ্রি, জি. টি. এফ. স্পীড, এম. ক্রো, হরিমোহন সেন, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, গোবিন্দচন্দ্র সেন, চন্দ্রশেখর দেব, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ব্রজনাথ ধর, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ সেন, সাতকড়ি দত্ত।

২৩ এপ্রিল
'বেঙ্গল হরকরা' আর 'ইণ্ডিয়া গেজেট' পত্রিকা জানিয়েছিল কয়েকদিন আগে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'-র একটা বিশেষ সভার কার্যবিবরণী। সভার উদ্দেশ্য, মাদ্রাজের সিভিলিয়ান জন সালিভ্যানকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। সভায় প্রধান বক্তাদের মধ্যে ছিলেন রামগোপাল ঘোষ আর কিশোরীচাঁদ মিত্র। কিশোরীচাঁদের ছিল সেটাই প্রথম প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা। সালিভ্যানকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের কারণ, ইংলণ্ডের East Indian Stock-এর স্বত্বাধিকারীদের কাছে তিনি প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন যে, ১৮৩৩ খৃস্টাব্দের Charter Act-এর ৮৭তম ধারা এমনভাবে বদলানো হোক যাতে শিক্ষিত ভারতবাসীদের নিয়োগ করা যেতে পারে এদেশের শাসনকাজে। পরে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি এই বিষয়ে বের করেছিল একটা পুস্তিকা।

৩০ এপ্রিল
খানিকটা অর্থাভাবে, খানিকটা অন্য স্কুলের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে উঠে গেল তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা। নতুন পাঠশালা তৈরি হল হুগলির বংশবাটী গ্রামে। প্রধান শিক্ষক হলেন শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ, যেহেতু অক্ষয়কুমার দত্তের পক্ষে সম্ভব ছিল না কলকাতা ছেড়ে যাওয়া। রামগোপাল ঘোষ পরিদর্শক হলেন ঐ পাঠশালার।

> "যাঁহারা দেবেন্দ্রনাথের অনুরোধে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় ছেলে পাঠাইতেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল যে ছেলেরা প্রধানতঃ অর্থকরী বিদ্যা উপার্জ্জন করুক, এবং তাহার সঙ্গে যতটুকু সম্ভব জ্ঞান ধর্ম্ম উপার্জ্জন করুক। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল অন্যরূপ। তিনি জ্ঞান ও ধর্ম্মকে সর্ব্বোপরি স্থান দিয়াছিলেন এবং বাংলা ভাষাতেই সকল বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে, ইহা তাঁহার দৃঢ় পণ ছিল। এইভাবে পরিচালিত একটি স্কুলকে কলিকাতায় অধিক দিন বাঁচাইয়া রাখা বোধহয় এখনও সম্ভব নহে, তখনকার তো কথাই নাই। কিছুদিন পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার ছাত্রেরা দেবেন্দ্রনাথের খাতিরে সকাল ৬টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত ঐ পাঠশালায় পড়িয়া, আবার ১০টার সময় ইংরেজী স্কুলে যাইতে লাগিল। কিন্তু এত কষ্ট স্বীকার আর কত দিন করা সম্ভব? অল্পকালের মধ্যেই তাহারা একে একে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা ছাড়িয়া যাইতে লাগিল, পাঠশালা প্রায় ছাত্রশূন্য হইল।"
>
> আত্মজীবনী/দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর/পরিশিষ্ট

১০ মে
ডেপুটি গভর্নর ডব্লু বার্ড এক জনসমাবেশে সম্মান জানালেন দ্বারকানাথকে, কোর্ট-অব-

ডিরেক্টর থেকে উপহার-স্বরূপ পাঠানো স্বর্ণপদকে। প্রত্যুত্তরে দ্বারকানাথ—

"এ সম্মান একান্ত ব্যক্তিগতভাবে আমার প্রাপ্য বলে আমি মনে করি না।... এই সম্মানের মধ্যে দিয়ে শাসকরা আমার মারফৎ ভারতের জনসাধারণকে এই আশ্বাস দিতে চান যে, এদেশের সুখ সমৃদ্ধি ও শিক্ষার উন্নতি শাসকদের কাছে বিশেষভাবে কাম্য।"

১ জুন

প্রত্যেক বছর ১ জুন মিলবার প্রস্তাবটা প্রথম দিয়েছিলেন কিশোরীচাঁদ মিত্র। সেই পরামর্শ মেনেই চল্লিশজন হেয়ার-অনুরাগীর উপস্থিতিতে কিশোরীচাঁদ মিত্রের বাড়িতে সভা। প্রত্যেক বছর ডেভিড হেয়ারের স্মৃতি উদযাপনের জন্যে তৈরি হল একটা কমিটি, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামচন্দ্র মিত্র, রামগোপাল ঘোষ আর প্যারীচাঁদ মিত্রকে নিয়ে। সম্পাদক; কিশোরীচাঁদ মিত্র। এই দিনের সভায় বক্তা ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামচন্দ্র মিত্র, রামগোপাল ঘোষ আর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

৮ জুন

জর্জ টমসন কলকাতা থেকে চলে গেলেন দিল্লীতে। তাঁর অবর্তমানে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সভাপতি হলেন ডব্লু থিওবোল্ড। থিওবোল্ড অবসর নেওয়ার পর রামগোপাল ঘোষ।

২৬ জুন

দু বছর হিন্দু কলেজের চাকরির পব মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ যোগ দিলেন কলকাতা মাদ্রাসার ইংরেজি স্কুল সংলগ্ন বাংলা শ্রেণীর পণ্ডিতের পদে। মাইনে ৪০ টাকা।

২ জুলাই

লালবিহাবী দে দীক্ষা নিলেন খৃস্টধর্মে। এরপরই স্কটল্যাণ্ডের জাতীয় চার্চের উপর রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ নিয়ে এদেশের স্কটিশ মিশনারিরা ভাগাভাগি হযে যায়। ডাফেব নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা গড়ে তোলে নিজেদের নতুন সমাজ 'Free Protesting Church of Scotland' তখনকার কসাইটোলায়, যা এখনকার বেনটিঙ্ক স্ট্রিট। রাধানাথ সেনের বাড়িতে গড়া হল তাঁদেব নতুন স্কুল 'দি ফ্রী চার্চ ইনস্টিটিউশন'। লালবিহারী ছিলেন বিদ্রোহী-পক্ষে।

২৩ জুলাই

ঢাকার বিক্রমপুব পবগনার ভবাকব গ্রামেব এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিখ্যাত 'বান্ধব' পত্রিকাব সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ-এব জন্ম। বাবা, শিবনাথ। কুড়ি বছর বয়সে ভবানীপুরে দেওয়া তাঁর খৃষ্টধর্ম বিষযে বক্তৃতা শুনে আকৃষ্ট হয়েছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রেভাবেণ্ড ড্যাল প্রমুখেরা। পরে দীক্ষা নিয়েছিলেন ব্রাহ্মধর্মে।

৫ অগাস্ট

'বেঙ্গল হেরাল্ড' পত্রিকায় দ্বারকানাথ ঠাকুর সম্বন্ধে খবর—

"আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর দ্বারকানাথ ঠাকুর দ্বিতীয়বার বিলাত সফরে বেরবার আগে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ঘুরে আসার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন বলে জানা গেল। আগামী দু-এক সপ্তাহের মধ্যেই স্টীমার যোগে এলাহাবাদ অভিমুখে তাঁর বেরিয়ে পড়ার কথা। সেখান থেকে ডাকের গাড়ি ধরে যাবেন আগ্রা, দিল্লী প্রভৃতি শহরে।"

এবারে তাঁর সহযাত্রী হবেন টমসন।

১৬ অগাস্ট

বেরল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-র প্রথম সংখ্যা। সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত।

"...একটি যন্ত্রালয়, একখানি পত্রিকা, অতি আবশ্যক হইল। আমি ভাবিলাম, তত্ত্ববোধিনী সভার অনেক সভ্য কার্য্যসূত্রে পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে আছেন। তাঁহারা সভার কোন সংবাদই পান না, অনেক সময় উপস্থিত হইতেও পারেন না। সভায় কি হয়, অনেকেই তাহা অবগত নহেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজে বিদ্যাবাগীশের ব্যাখ্যান অনেকেই শুনিতে পান না ; তাহার প্রচার হওয়া আবশ্যক। ...আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া ১৭৬৫ শকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারের সংকল্প করি।

পত্রিকার একজন সম্পাদক নিয়োগ আবশ্যক। সভ্যদিগের মধ্যে অনেকেরই রচনা পরীক্ষা করিলাম। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্তের রচনা দেখিয়া আমি তাঁহাকে মনোনীত করিলাম। তাঁহার এই রচনাতে গুণ ও দোষ দুইই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। গুণের কথা এই যে, তাঁহার রচনা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ও মধুর ; আর দোষ এই যে, ইহাতে তিনি জটা-জূট-মণ্ডিত ভস্মাচ্ছাদিত-দেহ তরুতলবাসী সন্ন্যাসীর প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু চিহ্নধারী বহিঃসন্ন্যাস আমার মতবিরুদ্ধ। আমি মনে করিলাম, যদি মতামতের জন্য নিজে সতর্ক থাকি, তাহা হইলে ইহাঁর দ্বারা অবশ্যই পত্রিকা সম্পাদন করিতে পারিব।

ফলতঃ তাহাই হইল। আমি অধিক বেতন দিয়া অক্ষয়বাবুকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম। তিনি যাহা লিখিতেন, তাহাতে আমার মতবিরুদ্ধ কথা কাটিয়া দিতাম, এবং আমার মতে তাঁহাকে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতাম। কিন্তু তাহা আমার পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়! আমি খুঁজিতেছি, ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ ; আর তিনি খুঁজিতেছেন, বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির কি সম্বন্ধ ; আকাশ পাতাল প্রভেদ—ফলতঃ, আমি তাঁহার ন্যায় লোককে পাইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আশানুরূপ উন্নতি করি। অমন রচনার সৌষ্ঠব তৎকালে অতি অল্প লোকেরই দেখিতাম। তখন কেবল কয়েকখানা সংবাদপত্রই ছিল। তাহাতে লোকহিতকর জ্ঞানগর্ভ কোন প্রবন্ধই প্রকাশ হইত না। বঙ্গদেশে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সর্ব্বপ্রথমে সেই অভাব পূরণ করে।..."

আত্মজীবনী/দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কী ভাবে অক্ষয়কুমারের নির্বাচন, তার ইতিহাস—

"কোন ব্যক্তিকে ইহার সম্পাদকতার ভার অর্পণ করা যায় এই গুরুতর বিষয়টি সভার বিবেচ্য হইলে অবশেষে স্থিরীকৃত হইল যে, প্রার্থিগণ "বেদান্ত ধর্মানুযায়ী সন্ন্যাস ধর্মের এবং সন্ন্যাসীদিগের প্রশংসাবাদ" এই বিষয়টি অবলম্বনপূর্ব্বক এক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের নিকট প্রেরণ করিবেন। যাঁহার প্রবন্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে তিনিই সম্পাদকের পদে অভিষিক্ত হইবেন। ভবানীচরণ সেন, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে ইহার প্রতিযোগিতা হয়। অক্ষয়বাবুর প্রবন্ধটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইলে, ইনি ৩০্ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। তখন এই পদ 'গ্রন্থ সম্পাদকতা' বলিয়া অভিহিত ছিল। ইঁহাকে সভারও কোন কোন কার্য্য করিতে হইত। এতদ্ভিন্ন উদ্ভিদাদি বিজ্ঞান বিষয়ে উপদেশ পাইবার জন্য মেডিকেল কলেজে গমন করিতেন।"

নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস/অক্ষয়-চরিত

এই তারিখেই খানিকটা দ্বিধার ভাব মনে রেখেই দ্বারকানাথ তৈরি করলেন উইল। ভদ্রাসন বাড়ি দেবেন্দ্রনাথকে। বৈঠকখানা বাড়ি গিরীন্দ্রনাথকে। ভদ্রাসনের পশ্চিমদিকের জমি আর সেখানে বাড়ি তৈরির জন্যে নগদ কুড়ি হাজার টাকা নগেন্দ্রনাথকে। কার-ঠাকুর কোম্পানির যে আধখানা অংশের অধিকারী ছিলেন তিনি, তার সবটাই দেবেন্দ্রনাথকে।

৩১ অক্টোবর

নদীয়া, বাগআঁচড়া গ্রামে, যা এখন যশোহর জেলার বনগ্রাম মহকুমার অধীনে, এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে সাহিত্যিক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম। বাবা, মহানন্দ।

হুগলির বাঁশবেড়িয়ায় ব্রাহ্ম-নেতা রামমোহন রায়ের জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম। বাবা, দ্বারকানাথ তর্কচূড়ামণি।

১০ ডিসেম্বর

হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে যোগ দিলেন প্যারীচরণ সরকার। তাঁর মেজদা প্রসন্নকুমার তখন ঐ স্কুলের ৫ম শিক্ষক।

২১ ডিসেম্বর

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দীক্ষা নিলেন ব্রাহ্মধর্মে।

> "১৭৬৫ শকের ৭ই পৌষে আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম-ব্রত গ্রহণ করিবার দিন স্থির করিলাম। সমাজের যে নিভৃত কুঠরীতে বেদপাঠ হইত, তাহা একটা যবনিকা দিয়া আবৃত করিলাম ; বাহিরের লোক কেহ সেখানে না আসিতে পারে, এই প্রকাব বিধান করিলাম। সেখানে একটি বেদী স্থাপিত হইল ; সেই বেদীতে বিদ্যাবাগীশ আসন গ্রহণ করিলেন। আমরা সকলে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া বসিলাম। আমাদের মনে এক নতূন উৎসাহ জন্মিল ; অদ্য আমাদের প্রতি-হৃদয়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম-বীজ রোপিত হইবে। আশা হইল, এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া কালে ইহা অক্ষয় বৃক্ষ হইবে, এবং যখন ইহা ফলবান্ হইবে, তখন ইহা হইতে আমরা নিশ্চয় অমৃতলাভ করিব।...
> প্রথম, শ্রীধর ভট্টাচার্য্য উঠিয়া বেদীর সম্মুখে প্রতিজ্ঞা পাঠ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। পরে, শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য; পরে, আমি। তাহার পরে পরে ব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, তারকনাথ ভট্টাচার্য্য, হরদেব চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, হরিশচন্দ্র নন্দী, লালা হাজারী লাল, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, ভবানীচরণ সেন, চন্দ্রনাথ রায়, রামনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, জগচ্চন্দ্র রায়, লোকনাথ রায় প্রভৃতি ২১ জন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।"

আত্মজীবনী/দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১ ডিসেম্বর

'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র খবর—

> "পয়লা তারিখে বাবু দ্বারকানাথ দিল্লী এসে পৌঁচেছেন এবং শহরের দ্রষ্টব্য দেখায় ব্যস্ত আছেন।"

'বেঙ্গল হরকরা'-র খবর—

> "দিল্লী-সম্রাট তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করেছেন, তিনি সম্রাটের অতিথি হয়ে অবস্থান করছেন বেগমদের প্রাসাদে। গুজব শোনা যাচ্ছে, বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর হবেন দিল্লীশ্বরের রাজদূত আর মিঃ টমসন হবেন তাঁর সেক্রেটারী এবং অচিরেই বাবু বিলাত রওনা হয়ে যাবেন।"

পরে প্রমাণিত হয়েছিল এটি গুজবই।

১৮৪৪

যাদবচন্দ্রের চাকরিস্থল এখন মেদিনীপুর। তাই সঞ্জীবচন্দ্র আর বঙ্কিমকে নিয়ে তাঁদের মাকে চলে আসতে হল এখানে। সঞ্জীবচন্দ্র এখানে এসে ভর্তি হয়ে গেলেন মেদিনীপুর উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে। বঙ্কিমচন্দ্র সংক্রান্ত যে-কোনো জীবনীই আমাদের জানিয়ে দেয় যে সঞ্জীবচন্দ্রের সঙ্গে ঐ স্কুলে তখনই যাতায়াত ছিল বঙ্কিমের। পূর্ণচন্দ্র জানাচ্ছেন—

> "মেদিনীপুরে একটি হাই স্কুল ছিল। টিড নামে একজন বিলাতী সাহেব উহার হেডমাষ্টার ছিলেন। অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রও মধ্যে মধ্যে ঐ স্কুলে যাইতেন। একদিন সাহেব ক্লাস পরিদর্শনে আসিয়া তাঁহার পরিচয় লইলেন। সঞ্জীবচন্দ্র অনুজের কথা বলিবার সময় তাঁহার যে একবেলার মধ্যে বর্ণপরিচয় হইয়াছিল, সে কথার উল্লেখ করেন। টিড সাহেব শুনিয়া প্রীত হইলেন এবং তাঁহার অনুরোধেই অতি শৈশবে ইংরাজি শিক্ষার জন্য পিতৃদেব বঙ্কিমচন্দ্রকে ঐ স্কুলে ভর্তি করিয়া দেন।"
>
> বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যশিক্ষা/কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র

কিন্তু আসলে ইতিহাসটা সরল নয় এতখানি। বঙ্কিম এবং সঞ্জীবচন্দ্র মেদিনীপুরে এসেছিলেন দুবার। প্রথমবারে যখন বঙ্কিম আসেন তখন তাঁর বর্ণপরিচয় ঘটেনি। সুতরাং তাঁরও ঐ স্কুলে ভর্তি হওয়াটা অসম্ভব। প্রথমবারে এসে সঞ্জীবচন্দ্র মেদিনীপুরের ঐ স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু অল্প সময়ের জন্যে। কেননা তাঁদের ফিরে যেতে হয়েছিল কাঁঠালপাড়ায়। ফিরে গিয়ে সঞ্জীবচন্দ্র ভর্তি হয়েছিলেন হুগলি কলেজে। তখনই রামপ্রাণ সরকারের নিয়োগ 'গুরু মহাশয়' হিসেবে। এঁর কাছেই এবার বঙ্কিমের অ-আ-ক-খ শেখা। সেও বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। আট-দশ মাস পরেই আবার সকলকে চলে আসতে হল মেদিনীপুরে। সঞ্জীবচন্দ্র আবার ভর্তি হলেন সেখানকার স্কুলে। তখনই সঙ্গে যেতেন বঙ্কিম।
বঙ্কিমের নিজের লেখা 'সঞ্জীবনী সুধা'-র দিকে একটু নজর পাতলেই নজরে পড়ে যেত পড়াশোনার এই আসল হিসেবটা। বঙ্কিম নিজেই সেখানে জানিয়ে দিয়েছেন এসব।

"এই সময়ে আমাদিগের পিতা, মেদিনীপুরে ডেপুটি কালেকটরী করিতেন। আমরা সকলে কাঁটালপাড়া হইতে তাঁহার সন্নিধানে নীত হইলাম। সঞ্জীবচন্দ্র মেদিনীপুরের স্কুলে প্রবিষ্ট হইলেন। কিছু কালের পর আবার আমাদিগকে কাঁটালপাড়ায় আসিতে হইল। এবার সঞ্জীবচন্দ্র হুগলী প্রেরিত হইলেন। তিনি কিছুদিন সেখানে অধ্যয়ন করিলে আবার এক জন "গুরু মহাশয়" নিযুক্ত হইলেন। আমার ভাগ্যোদয় ক্রমেই এই মহাশয়ের শুভাগমন; কেননা, আমাকে ক, খ, শিখিতে হইবে। কিন্তু বিপদ অনেক সময়ে সংক্রামক। সঞ্জীবচন্দ্রও রামপ্রাণ সরকারের হস্তে সমর্পিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে আমরা আট দশ মাসে এই মহাত্মার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মেদিনীপুর গেলাম। সেখানে সঞ্জীবচন্দ্র আবার মেদিনীপুরের ইংরেজী স্কুলে প্রবিষ্ট হইলেন।"

জট-পাকানো তথ্যের গিঁট এর পরেও রয়ে যায় অনেক। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর 'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র'-য় জানাচ্ছেন, বঙ্কিমের বা সঞ্জীবের মেদিনীপুরে এসে সেখানকার স্কুলে ভর্তি হওয়ার বছরটা আনুমানিক ১৮৪৫/১৮৪৬। আর পূর্ণচন্দ্র জানাচ্ছেন, ১৮৪৪। পূর্ণচন্দ্রের ঐ বাল্যশিক্ষার প্রবন্ধে

"বৎসরান্তে পরীক্ষার ফলে সাহেব তাঁহাকে ডবল প্রমোশন দিতে চাহিলেন, কিন্তু পিতৃদেবের আপত্তিতে তাহা ঘটিল না।"

'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র'-য় হেমেন্দ্রনাথ উদ্ধৃত কবেছেন 'সখা'-র সাক্ষ্য, যা বঙ্কিমের নিজের বলা কথা দিয়ে সাজানো।

"খৃঃ ১৮৪৬ অব্দে ইঁহার পিতা যখন মেদিনীপুরের ডেপুটি ছিলেন, সেই সময়ে ইঁহাকে সেখানকার ইংরাজী স্কুলে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। সেখানকার শিক্ষকেরা ইঁহাকে স্কুলে পাইয়া কৌতুক দেখিতে লাগিলেন। বালককে পুরা এক বৎসর এক শ্রেণীতে রাখিতে হয় না—প্রতি ছয় মাস অন্তর এক এক ক্লাশ উপরে উঠাইয়া দিতে হয়, তবুও বালক যে ক্লাশেই উঠে সেই ক্লাশেই সবার উপরে হয়! সুতরাং এইরূপে অতি উচ্চশ্রেণীতে উঠিলে, এই বালকের মুখের দিকে চাহিয়া বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদিগকে ইহার উপর ক্লাশে উঠা বন্ধ করিতে হইয়াছিল।"

এরপরই তিনি 'সমালোচনী'-র প্রথম বর্ষ, ১৩০৮-০৯, থেকে উদ্ধৃত করেছেন বঙ্কিমের স্বীকারোক্তি, শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে বলা।

"সখা নামক বালকপাঠ্য মাসিক পত্রে তাঁর বাল্যজীবনের যে বিবরণ প্রকাশ হইয়াছিল তাহা অনেকটা ঠিক। সত্য সত্যই কয় বৎসর তিনি বৎসরে দুইবার ক্লাশ প্রমোশন পাইয়াছিলেন।"

যখন মেদিনীপুর স্কুলের ছাত্র, বঙ্কিমের সেই সময়কার বিস্ময়কর মেধাশক্তির প্রশংসা এবং বর্ণনা, দুটোই জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর জীবনীকারেরা। স্কুলের একজন শিক্ষকও নাকি এক সময় বিস্মিত কণ্ঠস্বরে প্রশ্ন তুলেছিলেন "এই ছেলেটি কি বস্তুতঃই শ্রুতিধর?" 'বঙ্কিমজীবনী'-কার আমাদের গল্প শুনিয়েছেন একটা। গল্পটির কথক মেদিনীপুরের দেবরা থানার জনৈক ভদ্রলোক, এক সময়ে বঙ্কিমের সহপাঠী ছিলেন যিনি।

"একদা স্কুলের সম্মুখ পথ দিয়া জনৈক খোট্টা বানর লইয়া ডুগডুগি বাজাইতে বাজাইতে যাইতেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সেই শব্দে আকৃষ্ট হইয়া বানর দেখিতে ছুটিলেন। তৎপ্রতি নিমেষশূন্য নয়নে চাহিতে চাহিতে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন—"বানরটাকে এনে আমাদের কেলাসে ভর্ত্তি করে দিলে হয়, দেখি ইংরেজি শিখতে পারে কিনা।"

"বঙ্কিমচন্দ্র বানর দেখিয়া যখন ক্লাসে ফিরিয়া আসিলেন, তখন শিক্ষক কর্তৃক পাঠে অমনোযোগিতার জন্য বিশেষরূপে ভৎর্সিত হইলেন। তিরস্কৃত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যুদ্দীপ্ত

> নয়নে শিক্ষকের পানে একবার চাহিলেন, তারপর তাঁহার স্থানে বসিয়া এক সপ্তাহের পাঠ এক ঘণ্টায় আয়ত্ত করিলেন।"

এসব বিবরণে স্মৃতির সঙ্গে কতটা মিশে গেছে স্তুতি, তার অঙ্ক কষে নেওয়া সম্ভব নয় আর। তবে বঙ্কিমের পাঠ-তৃষ্ণাটা যে এই ছাত্রজীবন থেকেই প্রবল, তা নিয়ে সন্দেহ নেই কোনো। হেমেন্দ্রনাথ যখন 'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র' লিখছিলেন তখন মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক শশধর বন্দ্যোপাধ্যায় নথি ঘেঁটে পাওয়া একটা পুরোনো কাগজ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তাঁকে। মন্তব্যটি কার তার উল্লেখ নেই। উল্লেখিত হয়েছে শুধু মন্তব্যটিই—

> "While at the Midnapur Zilla School, he attracted notice for regular attendance and excellence in English and History."

বঙ্গদর্শনে বঙ্কিম নিজেও জানিয়েছেন বালক বয়স থেকে ইতিহাসের দিকে তাঁর অমোঘ টানের খবর। জানিয়েছেন, যখন বয়স এগারো তখনই রোলিয়াস সাহেবের সমস্ত প্রাচীন ইতিহাস, হিউমের ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস ইত্যাদি বই পড়া হয়ে গেছে আদ্যন্ত।

১৮৩৪-এর অগাস্টে, মাত্র ১৮ জন ছাত্র নিয়ে, মেদিনীপুর ইংরেজি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। পিছনে আর্থিক সাহায্য বর্ধমানের মহারাজার। ১৮৩৫/৩৬-এর কোনো একটা সময়ে সরকারের হাতে চলে এল পরিচালনার ভার। ১৮৩৬-এর ৯ জুলাই থেকে একটানা ১১ বছর এফ. টিড এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তাঁর আগে সংস্কৃত কলেজের রসিকলাল সেন। ১৮৪০-এ সরকারি আইন অনুযায়ী জেলা স্কুলের সম্মান পেয়ে যায় এই বিদ্যালয়। ১৮৪৭-এর ৯ জুলাই টিড সাহেব ঢাকায় বদলি হয়ে গেলে তাঁর জায়গায় এলেন ডবলিউ সিনক্লেয়ার। আড়াই বছর চাকরির পর ১৮৫০-এর ৮ ডিসেম্বরে তাঁর মৃত্যু। এরপর ঐ পদে রাজনারায়ণ বসু, ১৫০ টাকা মাইনেয়।

রাজনারায়ণ বসুর অনেক বছর পরের প্রধান শিক্ষক হরিপদ মণ্ডল। এককালের ছাত্র বঙ্কিমচন্দ্রকে শ্রদ্ধা জানাতেই তাঁর একটি ছোট্ট পুস্তিকা— 'মেদিনীপুরে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র'। পুস্তিকাটি উপহার হিসেবে তাঁর কাছ থেকে পাওয়ার পর বঙ্কিমের ছাত্রজীবনের আরও কিছু অজানা তথ্য এখন এসে যাচ্ছে আমাদের হাতে। তিনি জানাচ্ছেন, শ্যামাচরণ এই স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন ১৮৩৮ অর্থাৎ বঙ্কিমের জন্মের বছরে। সঞ্জীবচন্দ্রের বয়স তখন ৪। শ্যামাচরণের ১৪। তিন বছর তিনি পড়াশোনা করেছিলেন এখানে। তাঁর সহপাঠীদের একজন, ক্ষেত্রমোহন জানা। পরে শিক্ষক হয়েছিলেন ঐ স্কুলেরই। ১৮৪২-এ ক্ষেত্রমোহন পাস করে গেলেন জুনিয়র পরীক্ষায়। কিন্তু শ্যামাচরণ পড়া ছেড়ে দিয়েছিলেন তার আগেই। বাবার নির্দেশে তিনি তখন আট টাকা মাইনের চাকরিতে।

বঙ্কিমচন্দ্রেরও এক সহপাঠীর নাম জানিয়েছেন তিনি। বৈকুণ্ঠনাথ ভূঁইয়া। দেবরা থানার লোয়াদার কাছে কাঁকড়া গ্রামের ছেলে। বানরের প্রসঙ্গে বঙ্কিম-জীবনীকার-এর লেখায় মেদিনীপুর জেলার দেবরা থানার যে ভদ্রলোকের নামহীন উল্লেখ, ইনিই সেই সহপাঠী। টিড আর সিনক্লেয়ার ছাড়া আর কোন্ কোন্ শিক্ষকের কাছে এই স্কুলে বঙ্কিমের পড়াশোনা, তারও কয়েকটি নাম জানিয়ে দিয়েছেন হরিপদবাবু।

> "মেদিনীপুরে বঙ্কিম টীড সাহেব ও মিঃ সিনক্লেয়ার ব্যতীত যেসব শিক্ষকদের নিকট পড়েছেন, তার মধ্যে বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভোলানাথ ঘোষ ও ক্ষেত্রমোহন জানা যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শিক্ষক ছিলেন। ক্ষেত্রমোহন পূর্ব্বে ঐ স্কুলেই অধ্যয়ন করেছিলেন। ১৮৪১ সালে জুনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় প্রথম হয়ে ৮ টাকা মাসিক বৃত্তি লাভ করেন এবং পরে ১৮৪৪ সালে শিক্ষক নিযুক্ত হন। ভোলানাথ ঘোষ-এর নিকট বঙ্কিম ২/১ মাস মাত্র পড়েছিলেন।"

হরিপদবাবুর ঐ পুস্তিকায় রয়েছে ছাত্রজীবনে লেখা বঙ্কিমের একটি ছড়ারও মজার খবর। মেদিনীপুরের দারোগা সাহেবের এক ছেলে তাঁর সহপাঠী। তাকে খ্যাপানোর জন্যেই নাকি বঙ্কিম বানিয়েছিলেন এই ছড়া।

দেখো ভাই — দারোগা কানা,
ঘোড়াও কানা;
সহিসও কানা।
তিন কানায় মিলে বানায়
কোতোয়ালি থানা।

দারোগা সাহেবের ছেলে মায়ের কাছে জানাল অনুযোগ। সে খবর পৌঁছল দারোগা সাহেবের কানে। তিনি অভিযোগ পৌঁছে দিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে। প্রধান শিক্ষক শুরু করলেন তদন্ত। ডাক পড়ল বঙ্কিমচন্দ্রের। প্রধান শিক্ষকের প্রশ্ন

—কেন তুমি অমন ব্যঙ্গ করে লিখলে?

বঙ্কিমের নির্ভয় উত্তর

—ব্যঙ্গ মোটেই নয়। যা সত্য, তাই ছড়া কেটে বলেছি।

এরপর হরিপদবাবুর কথা—

"টিড সাহেব জানতেন দারোগা সত্যিই কানা; কিন্তু ঘোড়া ও সহিস?
হ্যাঁ, অনুসন্ধান করতে থানায় গিয়ে জানা গেল ঘোড়াটিরও এক চোখ নাই, বৃদ্ধ সহিসও প্রভুর মতোই একনেত্র।
পরদিন দুই ভাইকে একসঙ্গে ডেকে প্রধান শিক্ষক মশাই বঙ্কিমের বুক চাপড়িয়ে বললেন
—তুমি বড় হবে, অনেক বড় হবে।"

রাজনারায়ণের আত্মচরিতে তাঁর পূর্ববর্তী প্রধান শিক্ষকদের নিয়ে কথাবার্তা অল্পই।

"আমার মেদিনীপুরস্থ কর্ম্মে আসার পূর্ব্বে দুইজন সাহেব ছিলেন। তাঁহাদিগের নাম টীড এবং সিনক্লেয়ার। টীড সাহেবের সময় উক্ত স্কুল স্থাপিত হয়। তিনি নিজের কর্ম্মের প্রতি বিলক্ষণ মনোযোগী ছিলেন। কিন্তু সিনক্লেয়ার সাহেব বার্দ্ধক্য বশতঃ ছিলেন না। তাঁহার সময়ে স্কুলের বড় দুরবস্থা হয়। তিনি তিনশত টাকা করিয়া পাইতেন স্কুলের হাতার ভিতর একটি বাঙ্গলায় থাকিতে পাইয়াছিলেন। আমি দেড়শত টাকা পাইতাম ও উক্ত বাঙ্গলায় থাকিতে পাইতাম।..."

বঙ্কিম টিড আর সিনক্লেয়ার ছাড়া আর যাঁদের কাছে পড়েছেন, তাঁদেব কয়েকজনের নাম আছে 'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র'-য়। বৈকুণ্ঠ চ্যাটার্জী, ভোলানাথ ঘোষ আর ক্ষেত্রমোহন জানা ছিলেন দ্বিতীয়, তৃতীয় আর চতুর্থ শিক্ষক। হরিপদ মণ্ডল-এর পুস্তিকায়ও এ-সব নামের উল্লেখ রয়ে গেছে ঠিকই কিন্তু বৈকুণ্ঠ সেখানে ব্যানার্জি।

বঙ্কিম যখন মেদিনীপুরে যান, তখন তিনি রুগ্ণ বালক। খেলাধুলোয় অক্ষম। সেই কারণেই হয়তো বাইরেটা ঈষৎ শান্ত। তবে টিড সাহেবের বাড়ি থেকে তাঁর ডাক আসত রোজই। শ্রীমতী টিড লোক পাঠিয়ে ডেকে নিয়ে যেতেন তাঁকে। স্কুলের সামনেই মাঠ। ঐখানেই খেলাধুলো করত দুই সাহেবের ছেলেরা। আর গল্প করত দুই সাহেবের বিবি। দুই সাহেবের একজন টিড। অন্যজন মলেট। তিনি 'হ্যালবেরি' সিভিলিয়ান আর মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট। শ্রীমতী টিড আর শ্রীমতী মলেটের গপ্পের আসর বসত শ্রীযুক্ত মলেটের বাড়িতে। মলেট সাহেবের বাড়ি আর যাদবচন্দ্র বা বঙ্কিমের বাড়ির মাঝখানে উঁচু পাঁচিল শুধু একটা। বঙ্কিম দুর্বল, তাই খেলাধুলোর থেকে সব সময়েই সাত হাত দূরে।

তবে মলেট সাহেবের বাড়িতে যাওয়াও বন্ধ হয়ে গেল একদিন। সেদিন ছিল মলেট সাহেবের কুঠির মাঠে টি পার্টি। বঙ্কিম মলেট সাহেবের বাড়িতে উপস্থিত। তবু তাঁকে বাদ দিয়েই ডাক পড়ল টিড আর মলেট সাহেবের ছেলেমেয়েদের। সেখান থেকে তখুনি চলে এলেন বঙ্কিম। তারপর থেকে আর কখনো যান নি মলেট সাহেবের বাড়িতে। এমন-কি শ্রীমতী টিডের আন্তরিক ডাকাডাকিতেও। ঐ বালক বয়সেই আত্মসম্মানবোধের ব্যাপারে তিনি সচেতন।

পরে, যাদবচন্দ্র যখন বদলি হয়ে আলীপুরে, তখন দেখা হয়েছিল মলেট সাহেবের সঙ্গে। বঙ্কিম তাঁর কুঠিতে না যাওয়ার জন্যে জানিয়েছিলেন আক্ষেপ।

মেদিনীপুরে বঙ্কিমের স্কুল-জীবন দীর্ঘস্থায়ী হতে পারল না আবার বাবার বদলি হয়ে যাওয়ায়। নিজেই লিখছেন—

> "পরীক্ষার অল্পকাল পূর্ব্বেই আমাদিগকে মেদিনীপুর পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইল। আজি এ স্কুলে কাল ও স্কুলে, আজি গুরুমহাশয়, কালি মাষ্টার, আবার গুরুমহাশয়, আবার মাষ্টার, —এইরূপে শিক্ষাবিভ্রাট ঘটিলে কেহই সুচারুরূপে বিদ্যোপার্জ্জন করিতে পারে না।"

মেদিনীপুরের পড়াশোনায় পূর্ণচ্ছেদ পড়ল যখন, তখন তাঁর বয়স দশ-এর মতো। বয়সের তুলনায় বঙ্কিম বালক বয়স থেকেই অনেক পরিণত। তবুও এতটা কি প্রত্যাশা করা সম্ভব যে ঐ বয়সেই টিড সাহেব তাঁর চৈতন্যবিকাশে ফেলতে পারবেন কোনো পাকা ছাপ? এমন অসম্ভবের সীমানাকে ডিঙিয়ে তবুও কেউ কেউ ভাবতে পেরেছেন যে টিড সাহেবের সাহচর্য প্রথমে বঙ্কিমের মনের গড়নে আধুনিকতা জুগিয়ে পরে সেই আধুনিকতার সূত্রেই তাঁকে দীক্ষা দিয়ে থাকবে স্বচ্ছ, সংক্ষিপ্ত ভাষা গঠনে তথা কম্‌প্যাকট্‌ কমপোজিশনে।

> "...বঙ্কিম জীবনে প্রথম সাহেব, স্কুলের হেড, এফ টিড সাহেবের সমাজ-সেবা তথা ওয়েলফেয়ার স্টেটের নাগরিক মোড অব কনডাক্ট বঙ্কিমচন্দ্রকে এক ধরনের আধুনিক হতে সাহায্য করেছিল। এই আধুনিকতা তাঁকে তাঁর বাক্য গঠনে স্বচ্ছ সংক্ষিপ্ততা তথা কমপ্যাকট কমপোজিশন দিয়েছিল।"

বঙ্কিমচন্দ্রের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য /
উদয়ন ঘোষ/অনীক, বঙ্কিম মূল্যায়ন সংখ্যা।

হেড মাষ্টার হিসেবে বঙ্কিমকে কতদিনে পড়িয়েছিলেন টিড সাহেব, এবং কেমন ভাষায় পড়িয়েছেন, তা সঠিক জানার উপায় নেই আর। কিন্তু এটা আর নতুন করে জানার প্রয়োজন নেই যে টিড সাহেবের কাছে শিক্ষানবিশীর পরও বাক্য গঠনে স্বচ্ছ সংক্ষিপ্ততা আয়ত্তাধীন করতে অথবা তাঁর নিজস্ব ভাষাবিন্যাসের সিদ্ধিতে পৌঁছতে বঙ্কিমের লেগে যাবে আরো দীর্ঘ কুড়ি বছরের মতো সময়, যতক্ষণ না বেরচ্ছে তাঁর প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী। দুর্গেশনন্দিনীর আগে বঙ্কিমের লেখা দীর্ঘ কোনো গদ্য রচনার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়নি আজও। যা আমরা পাই ও পড়ি, তা সবই টুকরো-টাকরা। প্রভাকরে অনর্গল কবিতা লিখবেন যখন, তখনও তাঁর ঐ সব টুকরো-টাকরা গদ্যে স্বচ্ছতা আর সংক্ষিপ্ততা দুইই থেকে যাবে অনুপস্থিত। তখনো তাঁর গদ্য শৃঙ্খলাহীন, অপরিণত এবং দিশেহারা।

টিড সাহেবের প্রভাব বঙ্কিমের সাহিত্য-জীবনে কতখানি, তা মাপতে গেলে পা রাখতে হবে অনুমানের চোরাবালিতেই অনেকটা। কিন্তু টিড সাহেবের স্কুলে পড়ার সময়ই বঙ্কিমের ছড়া

বানানোর যে অল্প একটু নিদর্শন হাতে এসে গেল আমাদের, তা থেকে পৌঁছনো যেতে পারে দুটো সংগত সিদ্ধান্তে।

এক, ছড়া বানানোর প্রবণতাটা ছেলেবেলা থেকেই দৌড়ঝাঁপ করেছে তাঁর চেতনায়। দুই, কৌতুকপ্রবণতা তাঁর সহজাত প্রতিভার অবিচ্ছেদ্য অংশ ঐ বালক বয়স থেকেই। এও অনুমান করা যায় সহজে যে, বাল্যকালে লিখেছিলেন আরও একাধিক ছড়া, যথোচিত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে যা বিনষ্ট। তবুও অনুমানকে বসতে দেবার শক্ত কাঠের পিঁড়েটাকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি তাঁর পরিণত বয়সের রচনায়। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের একচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ-এর নাম, 'হীরার আয়ি'। অধ্যায়টির সূচনা একটা ছড়া দিয়েই। হীরার আয়ি গুড়ি গুড়ি হাঁটছিল লাঠি ধরে। পিছনে বালকের দলের নাচতে নাচতে হাততালি দিয়ে এই ছড়া কাটা—

হীরার আয়ি বুড়ী।
গোবরের ঝুড়ি।
হাঁটে গুড়ি গুড়ি।
দাঁতে ভাঙে নুড়ি।
কাঁঠাল খায় দেড় কুড়ি।

এইখানেই শেষ নয় ছড়া কাটাব। হীরার আয়ি নগেন্দ্রের বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেলে বালকদেরও ছত্রভঙ্গ। কারণ মোচা গোঁফওয়ালা তিন-তিনটে দ্বারোয়ান মজুত সেখানে। ছত্রভঙ্গ হল বটে কিন্তু তখনও ছড়ার ছত্র আওড়াতে আওড়াতেই। তিনজনের জন্যে তিনটে আলাদা আলাদা ছড়া।

১। রামচরণ দোবে,
সন্ধ্যাবেলা শোবে,
চোর এলে কোথায় পালাবে?
২। রামদীন পাঁড়ে
বেড়ায় লাঠি ঘাড়ে
চোর দেখলে দৌড় মারে পুকুরের পাড়ে।
৩। লালচাঁদ সিং,
নাচে তিড়িং মিড়িং,
ডালরুটির যম, কিন্তু কাজে ঘোড়ার ডিম।

ছড়ায় যে শোনা যাবে অভিধান-ছাড়া শব্দের হাততালি-সহ নাচ, সেটাও জানিয়ে দিলেন যেন এই ফাঁকে। মেয়েলি ছড়া কাটার শুরু 'কপালকুণ্ডলা' থেকেই। শুনেছি শ্যামাসুন্দরীর মুখে। 'ইন্দিরা'-য় ছড়া কেটেছিল সুভাষিণীর মেয়ে হেমা, বামুন ঠাকুরানীর এক মাথা শণের নুড়ি পাকা চুলের দিকে তাকিয়ে।

চলে বুড়ী শোনের নুড়ী
খোঁপায় ঘেঁটু ফুল।
হাতে নড়ি গলায় দড়ী
কানে জোড়া দুল।

'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর ব্রহ্মানন্দ 'একটু কবিতাপ্রিয়'। নিজের-লেখা ছড়া তাই বঙ্কিমই বসিয়ে দিলেন তাঁর মুখে—

মনে করি চাঁদা ধরি হাতে দিই পেড়ে।
বাবলা গাছে হাত লেগে আঙুল গেল ছিঁড়ে।

১৯০৫-এ ক্লাসিক থিয়েটারে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে বঙ্কিম স্মৃতিসভা। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সেখানে পাঠ করেছিলেন 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' নামের এক নিবন্ধ। সেখানেই রয়েছে তাঁর শৈশবকালের উপর বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের প্রভাবের প্রসঙ্গ। তারই এক জায়গায় পড়ি বিষবৃক্ষ আর দুর্গেশনন্দিনীকে উদরস্থ করার কাহিনী।'

> "ঐ দুই গ্রন্থের কোন্ অংশ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বোধ হইয়াছিল, তাহা যদি অকপটে বলিয়া দেখি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনারা আমার কাব্যরসগ্রাহিতার প্রশংসা করিবেন না। বিষবৃক্ষের মধ্যে যেখানে ছেলের পাল 'হীরার আয়ি বুড়ী হাঁটে গুড়ি গুড়ি' বলিয়া সেই বৃদ্ধার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল ও বৃদ্ধার ইষ্টিরস নামক ব্যাধির প্রতিকার বিষয়ে কেষ্টরস নামক ঔষধের উপযোগিতা সম্বন্ধে প্রতিবেশীরা আলাপ করিতেছিল, সেই স্থানটাই গ্রন্থের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলাম।"

প্রমাণ হয়ে গেল ছড়াকার বঙ্কিমেরও ছিল বেশ উৎফুল্ল এক পাঠকসমাজ।

১৮৪৪

বছরের প্রধান ঘটনাবলী

বছরের গোড়ায় হিন্দু কলেজ ছাড়তে বাধ্য হলেন রাজনারায়ণ বসু। কারণ অতিরিক্ত মদ্যপানজনিত পীড়া।

> "হিন্দু কলেজে যত দিন থাক, ছাত্রবৃত্তি উপভোগ করিয়া পড়, তাহাতে অধ্যক্ষেরা আপত্তি করিতেন না। অধিক দিন ছাত্রেবা পড়িবে বলিয়া এই সকল ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হইত। আমার ইচ্ছা ছিল যে, আরো দুই তিন বৎসর পড়ি, কিন্তু একটি উৎকট পীড়া জন্মানোতে আমি ১৮৪৪ সালের প্রথমে কলেজ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। উক্ত উৎকট পীড়ার কারণ অপরিমিত মদ্যপান। তখন হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা মনে করিতেন যে, মদ্যপান করা সভ্যতার চিহ্ন, উহাতে দোষ নাই।...
>
> একদা আমি গোলদীঘিতে মদ খাইয়া টুপভুজঙ্গ হইয়া রাত্রিতে বাটীতে আসাতে মাতাঠাকুরাণী অতিশয় বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আমি আর কলিকাতার বাসায় থাকিব না, বোড়ালে গিয়া থাকিব।" পিতাঠাকুর আমার আচরণের বিষয় অবগত হইয়া আমাকে পরিমিত মদ্যপায়ী করিবার জন্য একটি কৌশল অবলম্বন করিলেন। সেই কৌশল অবলম্বন করাতে আমি প্রথম জানিতে পারিলাম যে, বাবারও যবনস্পৃষ্ট আহার চলে।...
>
> প্রায় প্রতিদিন মুন্সী আমীর আলীর বাটী হইতে আমাদিগের বাসায় একটি টিনের বাক্স আসিত। আমি মনে করিতাম যে, মুন্সী আমীর আলী পিতাঠাকুরকে তরজমা জন্য সদর দেওয়ানীর কাগজপত্র পাঠাইয়া দিয়া থাকেন।...
>
> একদিন সন্ধ্যার পর আমাকে পিতাঠাকুর তাঁহার লিখিবার ঘরে ডাকিলেন। ডাকিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। আমি বুঝিতে পারিলাম না যে ব্যাপারটা কি। তাহার পর দেখিলাম, তিনি একটি দেরাজ খুলিয়া একটি কর্কস্ক্রু ও একটি সেরীর বোতল ও একটি ওয়াইন গ্লাস বাহির করিলেন। তৎপরে প্রকাণ্ড টিনের বাক্সটি খুলিলেন। টিনের বাক্স

খোলা হইলে আমি দেখিলাম যে, তাহাতে সদর দেওয়ানীর কাগজ নাই, পোলাও, কালিয়া, কোপ্তা রহিয়াছে। পিতাঠাকুর আমাকে বলিলেন, "তুমি প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আমার সঙ্গে এই সকল উত্তম দ্রব্য আহার করিবে, কিন্তু মদ (সেরী) দুই গ্লাসের অধিক পাইবে না; যখনই শুনিব অন্যত্র মদ খাও, সেইদিন অবধি এই খাওয়া বন্ধ করিয়া দিব।" কিন্তু আমি সেইরূপ পরিমিত পানে সন্তুষ্ট হইতাম না। অন্যত্র পান করিতাম। এইরূপ অপিরিমিত মদ্যপানে আমার একটি পীড়া জন্মিল। ..."

রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত

চুঁচুড়ার বড়বাজারে 'চুঁচুড়া সেমিনারি' নামে একটা স্কুল খুললেন হরিচন্দ্র রায়। খরচ জোগান দিত ছাত্রদের বেতন আর স্থানীয় বিদ্যোৎসাহীদের চাঁদা। বেশি দিন স্থায়ী হতে পারেনি অর্থাভাবে।

সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিত হরনাথ তর্কভূষণের মৃত্যু।

এই বছরের শেষ দিকে জেসুইট পাদ্রীদের সঙ্গে মতান্তর ঘটলে মতিলাল শীল সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে কলেজের দায়িত্ব তুলে দিলেন ক্যাপ্টেন পামার আর অন্য কয়েকজন দেশী-বিদেশী শিক্ষকদের হাতে। যোগেশচন্দ্র বাগল জানান, পরিচালনার ভার পড়েছিল কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর। ৩ অক্টোবরের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'য় অবশ্য জানানো হয়েছিল সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের কারণ।

"The Jesuits were to be removed from the school because they used beef and beer as tiffin inside the, school, and a portion of the tiffin was taken by some students."

এর পরই এই কলেজ নাম বদলিয়ে হয়ে যায় 'শীলস্ ফ্রি কলেজ'। একেবারে শুরুতে ছাত্রদের কাছ থেকে নেওয়া হত এক টাকা মাইনে, বিনা মূল্যে পাঠ্যপুস্তক জোগানোর পরিবর্তে। পরে দেশের আর্থিক অবস্থার কথা ভেবে, আর সেটা উচ্চশিক্ষার অনুকূল নয় বুঝে গিয়েই, বেতন না-নেওয়ার সিদ্ধান্ত। 'কলকাতার ইতিহাসে' বিনয়কৃষ্ণ দেব -এর মন্তব্য—

"This is the only institution in Calcutta which imparts education to the poor native students free of charge. Some of the boys get free boarding."

ফ্রী স্কুল বা অবৈতনিক বিদ্যালয় কিন্তু তখন কলকাতায় অসংখ্য। তবে তার বেশির ভাগই প্রাইমারি স্তরের। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া যাঁকে উপাধি দিয়েছিল 'কলকাতার রথচাইল্ড', সেই মতিলালের গড়া বিদ্যালয় ছিল উচ্চতম শিক্ষার কেন্দ্র।

সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হলেন রামগতি বন্দ্যোপাধ্যায় (ন্যায়রত্ন)। বয়স তখন ১৩।

১২ বছর ৭ মাস অধ্যয়নের পর দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ পড়া শেষ করলেন সংস্কৃত কলেজের। শেষ পরীক্ষায় প্রথম হয়ে বৃত্তির সঙ্গে পদবী পেলেন বিদ্যাভূষণ।

কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটির আর্থিক সাহায্যে রামচন্দ্র মিত্র বের করলেন 'পক্ষীর বিবরণ'। প্রথম সংখ্যায় ছিল সাধারণভাবে পাখিদের নিয়ে কথা। পরের সংখ্যায় ভারতবর্ষের পাখিদের বৃত্তান্ত থাকবে ঘোষণা সত্ত্বেও দ্বিতীয় সংখ্যাটি বেরোয় নি।

জানুয়ারি

সংস্কৃত কলেজ থেকে পাস করে বেরলেন গিরিশচন্দ্র কবিরত্ন। উচ্ছ্বসিত প্রশংসাপত্র লিখে দিয়েছিলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটারি আর সংস্কৃত কলেজের পরীক্ষক জি. টি. মার্শাল।

১ জানুয়ারি
প্যারীচরণ সরকারকে দেওয়া হল হিন্দু কলেজের পক্ষ থেকে প্রশংসাপত্র। অধ্যক্ষ জে. ক্যর, প্রধান শিক্ষক জি. লুইস আর অন্যান্য শিক্ষকদের স্বাক্ষর করা। এ ছাড়া স্বতন্ত্র প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন ইংরেজির অধ্যাপক রিচার্ডসন, গণিতের অধ্যাপক ডি. এল. রিজ, অধ্যক্ষ জে. ক্যর প্রমুখেরা। রিজ তাঁর প্রশংসাপত্রে লিখেছিলেন গণিতের ব্যাপারে 'highest order'-এ তিনিই।

২০ জানুয়ারি
রবীন্দ্রনাথের সেজদাদা, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র, হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম। লণ্ডনের ভাস্কর এডোয়ার্ড হজেস বেইলিকে দেওয়া হল ডেভিড হেয়ারের মূর্তি গড়ার দায়িত্ব।

২৬ জানুয়ারি
কলকাতায় স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম। বাবা, রামচন্দ্র।

২৩ ফেব্রুয়ারি
টাউন হলে সভা, ত্রিশ জন গণ্যমান্য দেশী-বিদেশী নাগরিকের উপস্থিতিতে। আলোচ্য বিষয়, বাংলা ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের নদীগুলোয় বাষ্পীয় পোতের প্রবর্তন করা।

২৮ ফেব্রুয়ারি
প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার গিরীশচন্দ্র ঘোষের জন্ম বাগবাজারে। বাবা, নীলকমল।

১৩ মার্চ
নিপীড়িতের শুধু উকিল নয়, রক্ষাকর্তা নামে খ্যাত স্বদেশপ্রেমিক মনোমোহন ঘোষ -এর জন্ম ঢাকার বৈরাগদি-তে। বাবা, রামলোচন।

২০ এপ্রিল
ঢাকার মাগুরখণ্ড-বিক্রমপুরে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম। বাবা, কৃষ্ণপ্রাণ। মা, উদয়তারা দেবী। যখন ছাত্র তখন থেকেই দ্বারকানাথ বহুবিবাহ, শিশুবিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ-বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত।

৮ মে
টাউন হলের সভায় গড়ে উঠল 'ইণ্ডিয়ান জেনারেল স্টীম নেভিগেশন কোম্পানী'। পরিচালনা সভায় একমাত্র ভারতীয় প্রতিনিধি রুস্তমজী কাওয়াসজী।

১ জুন
ফৌজদারী বালাখানায় ডেভিড হেয়ারের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী সভা। সভাপতি, রামগোপাল ঘোষ। শুধুমাত্র মৃত্যুবার্ষিকী পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে স্বর্গত বন্ধুর স্মৃতি যাতে চিরস্থায়ী হয়ে থাকে তার জন্যে উদ্যোগী হওয়ার আবেদন জানালেন সম্পাদক। হেয়ারের একটি পূর্ণাঙ্গ

জীবনচরিত রচনার প্রয়োজনে লণ্ডনে যোশেফ হেয়ারের কাছে পাঠানো প্রশ্নাবলীর কথাও উঠল আবার। হয়তো যোশেফ কন্টিনেন্টে চলে যাওয়ায় কমিটির পাঠানো বার্তা পাননি। সুতরাং আবার একবার বার্তা পাঠাতে হবে তাঁকে। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব রাখলেন হেয়ার প্রাইজ ফাণ্ড নামে একটা ফাণ্ড খোলার। প্রতি বছর এই স্মৃতিরক্ষা কমিটি ঐ ফাণ্ড থেকে পুরস্কার দেবে শ্রেষ্ঠ বাংলা রচনাকে।

২০ জুন

এই দিনের অধিবেশনে গৃহীত হল হেয়ার প্রাইজ ফাণ্ড খোলার প্রস্তাব। এর জন্যে দরকার ৪০০০ টাকার চাঁদা। ঐ পরিমাণ চাঁদা না উঠলে পরিকল্পনায় হাত দেওয়া হবে না। চাঁদা সংগ্রহের জন্যে ইওরোপীযদের কাছেও যাওয়ার সিদ্ধান্ত। টাকা জমা থাকবে ব্যাঙ্কে। তার সুদের টাকা থেকেই দেওযা হবে পুরস্কার। কোন্ কোন রচনাকে পুরস্কার দেওয়া হবে তা স্থির করার জন্যে গড়া হবে স্বতন্ত্র একটা তিন সদস্যের কমিটি। পুরস্কার তহবিলের অছি নির্বাচিত হলেন রামগোপাল ঘোষ, হরিমোহন সেন আর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২ আগস্ট

রামকমল সেন -এর মৃত্যু। তাঁর চার ছেলের একজন হরিমোহন, কেশবচন্দ্র সেনের বাবা।

৩১ আগস্ট

হুগলির শ্রীরামপুরের হরিপাল থানার কৈকালা গ্রামে চন্দ্রনাথ বসুব জন্ম। বাবা, সীতানাথ বসু।

১৩ সেপ্টেম্বর

টাউন হলে উইলিয়াম উইলবারফোর্স বাউ-এর ভারতবর্ষ থেকে বিদায় উপলক্ষে জনসভা। ভারতবর্ষের অস্থায়ী বড়লাট যখন, দাসত্ব প্রথা নিবারণ আর শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে উদ্যোগী হয়ে ওঠায় কলকাতার শিক্ষিত মহলে তিনি হয়ে উঠেছিলেন শ্রদ্ধেয়।

১০ অক্টোবর

গভর্নর জেনারেল হার্ডিঞ্জ প্রস্তাব করলেন, উচ্চতর শিক্ষার প্রাথমিক ধাপ হিসেবে গড়া হবে বাংলার বিভিন্ন জেলায় ১০০টি দেশীয় ভাষার বিদ্যালয়। আর এই সমস্ত বিদ্যালযের ছাত্রদের ভিতর থেকেই যোগ্য ছাত্রদের নির্বাচিত করা হবে সরকারি পদের জন্যে।

১৯ অক্টোবর

শোভাবাজার রাজবাড়িতে অভিনয় হল দুটো নাটকের। 'লাভার্স অব সালামাঙ্কা' আর 'দি ফকস অ্যাণ্ড দি উলফ'। সাঁসুসি থিয়েটারের ম্যানেজার মিঃ ব্যারির উপরই রাধাকান্ত দেব চাপিয়ে দিয়েছিলেন নাট্যানুষ্ঠানের ভার। নাটকের সঙ্গে ছিল মঁসিয়ে রজিয়ারের টাইট অ্যাণ্ড স্ল্যাক রোপ নাচ।

নভেম্বর
রাজনারায়ণ দত্ত ছেলে মধুসূদন দত্তকে ভর্তি করিয়ে দিলেন বিশপস কলেজে।

১৬ নভেম্বর
নীলমাধব শর্মার মৃত্যু হলে বিদ্যাসাগরের সৌজন্যে সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাধ্যক্ষের চাকরি পেলেন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, ৩০ টাকা মাইনেয়। মাত্র দেড় মাস গ্রন্থাধ্যক্ষ থাকার পরই হয়ে যাবেন ব্যাকরণেব দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক।

২৫ নভেম্বর
ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশনে বিরাট সভা লর্ড হার্ডিঞ্জ-এর শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাবকে সমর্থন জানাতে। রামগোপাল ঘোষের ধন্যবাদ-জ্ঞাপক প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে কিশোরীচাঁদ মিত্রের বক্তৃতা।

ডিসেম্বর
গভর্নর জেনাবেল হার্ডিঞ্জ-এব ১০ অক্টোবরেব প্রস্তাবকে মনে বেখে এই মাসের প্রথম দিকে এক সভায় কলকাতাব ৫০০ জন শিক্ষিত নাগরিক একটি ধন্যবাদ-জ্ঞাপক প্রস্তাবে স্বাক্ষর করে তুলে দেন তাঁব হাতে। প্রত্যুত্তরে হার্ডিঞ্জ-এর মন্তব্য : তিনি শাসক আব শাসিতকে পরস্পরের উপকাবক মনে করেন বলেই শিক্ষার প্রতি জানিয়েছেন এতখানি সমর্থন। তা ছাড়া এদেশীয়দেব বুদ্ধি ও সততা দিয়ে চাকরিঘটিত সেবা সরকারের পক্ষেও প্রযোজনীয়। সভায় রামগোপাল ঘোষ স্বাগত জানান ইংরেজ কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রস্তাবিত এই প্রবুদ্ধ শিক্ষা বা enlightened education-কে, যা সামাজিক, রাজনৈতিক, আর নৈতিক অবনমন থেকে দেশকে মুক্ত করাব এক উপযুক্ত উপায়।
এই মাসের শেষ সপ্তাহে বাঁশবেড়িয়ায় 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা'-ব বার্ষিক পুরস্কার বিতবণী অনুষ্ঠান। উপস্থিত শতাধিক সম্ভ্রান্তদের মধ্যে ছিলেন বামগোপাল ঘোষ, রমাপ্রসাদ রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব, গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুব, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায। এঁরা পরীক্ষাও নেন ছাত্রদের। দুটি ছাত্রের বাংলা ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতায় মুগ্ধ হযে জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাদের হাতে তুলে দেন অতিরিক্ত ২৫ টাকার পুবস্কার।

২৯ ডিসেম্বর
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাযের জন্ম খিদিবপুবে। বাবা, অ্যাটর্নি গিরিশচন্দ্র।

১৮৪৫

বছরের প্রধান ঘটনাবলী

নদীয়ার বনগ্রাম সাবডিভিশনে বঙ্গদর্শন পত্রিকার লেখক লালমোহন বিদ্যানিধির জন্ম। বাবা, রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য।

অদ্বৈতচরণ আঢ্য নিজের ছাপাখানা থেকে বের করলেন শ্রীমদ গোপাল ভট্টর 'হরিভক্তি বিলাস'।

কবিকেশরী রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের মৃত্যু।

গত বছরে পণ্ডিত হরনাথ তর্কভূষণের মৃত্যু হলে শিক্ষাবিভাগের সেক্রেটারি মৌয়াট সাহেব ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ মার্শাল সাহেবকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন ঐ পদের জন্যে একজন যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচন করে দিতে। মার্শাল অনুরোধ জানিয়েছিলেন বিদ্যাসাগরকে। বিদ্যাসাগরের জবাব, *আমি তো একটা চাকরি করছি। আমার চেয়ে যোগ্য ব্যক্তিকে দেওয়া* উচিত ঐ চাকরি। পণ্ডিত তারানাথ বাচস্পতি তখন অম্বিকা কালনায় স্বাধীন ব্যবসায়ে ব্যস্ত। আবার চতুষ্পাঠী স্কুলে ছাত্রও পড়াতেন। বিদ্যাসাগর নিজে ছুটলেন তারানাথের কাছে। ৬০ মাইল রাস্তা একদিনে হেঁটে কলকাতা থেকে কালনায় গিয়ে ফিরে এলেন পরের দিনই, ঐভাবে পায়ে হেঁটেই। রাজী করালেন চাকরি গ্রহণে। এই বছর থেকে ৯০ টাকা মাইনেয় সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপক হয়ে গেলেন তিনি। বিদ্যাসাগর নিজের উৎসাহে এর আগে এভাবেই চাকরি পাইয়ে দিয়েছেন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ আর গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে।

বিদ্যাসাগরের হাঁটার ক্ষমতা প্রসঙ্গে এখানে আরও একটা কাহিনী। পেটের অসুখের বাড়াবাড়িতে ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলেন পরামর্শ নিতে। ডাক্তার বললেন সকাল সন্ধে হাঁটতে। বিদ্যাসাগরের প্রশ্ন, কতক্ষণ হাঁটব? ডাক্তারের উত্তর, যতক্ষণ না ক্লান্ত হচ্ছেন।

বিদ্যাসাগর বললেন, সমস্ত দিন সমস্ত রাত হাঁটলেও ক্লান্তি আসবে না আমার। রাধারমণ মিত্র তাঁর 'কলিকাতায় বিদ্যাসাগর' প্রবন্ধে এই পদব্রজে হাঁটার কাহিনীটি উল্লেখ করেই লিখলেন—

> "অনেকদূর যাইতে হইলে গোশকট বা ঘোড়ার গাড়ি চড়িতে চাহিতেন না। পাল্কিই পছন্দ করিতেন।"

আমাদের প্রশ্ন, ৬০ মাইলটাও কি অনেকদূর ছিল না তাঁর কাছে? তা হলে পদব্রজে গেলেন কেন?

লর্ড হার্ডিঞ্জ-এর উৎসাহে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হাত দিলেন 'সর্ব্বার্থ সংগ্রহ' নামের মহাকোষ গ্রন্থ রচনায়।

অনেকটা বঙ্কিমের মতোই বাড়িতে গুরুমশায়ের কাছে কিছুটা লেখাপড়া শিখে কেশবচন্দ্র সেন ভর্তি হলেন হিন্দু কলেজে। বড়ো ভাই নবীনচন্দ্র তখন সেখানে কলেজ বিভাগের ছাত্র।

ছাত্রজীবন কাটিয়ে ৬ বছর ৫ মাসের হিন্দু কলেজের পড়া শেষ করলেন ভূদেব।

উত্তরপাড়ার বিখ্যাত জমিদার জয়কৃষ্ণ আর রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সেখানে বালিকা বিদ্যালয় গড়ে তুলতে চেয়ে চিঠি লিখলেন শিক্ষা-সংসদের কাছে। বাড়ি করতে খরচ পড়বে ২ হাজার টাকা। সরকারকে তার অর্ধেকটা দেওয়ার জন্যেই অনুরোধ ঐ চিঠিতে। শিক্ষা-সংসদ সম্মত না হয়ে জানিয়েছিলেন—স্বাধীনভাবে কোনো বালিকা বিদ্যালয় কিছুদিন কি ভাবে চলে তা না দেখে সরকার কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে রাজী নন।

জানুয়ারি

বাখরগঞ্জের বাসণ্ডা গ্রামে চণ্ডীচরণ সেন-এর জন্ম। বাবা, নিমচাঁদ। মা, গৌরী দেবী।

১ জানুয়ারি

সংস্কৃত কলেজের প্রশংসাপত্র পেলেন গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

১৪ জানুয়ারি

গঙ্গাধর তর্কবাগীশ-এর মৃত্যু হলে তাঁব জায়গায় সংস্কৃত কলেজে ৫০ টাকা মাইনেয় ব্যাকরণের দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপকের চাকরি পেলেন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। গিবিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন পেয়ে গেলেন সংস্কৃত কলেজেব গ্রন্থাধ্যক্ষের চাকবি। ৩০ টাকা মাইনে।

২৩ ফেব্রুয়ারি

'ওরিয়েন্টাল সেমিনারি'-র প্রতিষ্ঠাতা গৌরমোহন আঢ্যের মৃত্যু নৌকাডুবিতে।

মার্চ

দ্বারকানাথ ঠাকুর ঠিক করেছিলেন এই মাসের গোড়ায় আবার রওনা দেবেন বিলেতে। সেটা হয়ে ওঠেনি। মার্চের আগেই কলকাতায় এসে গেছে মহারানী ভিকটোরিযার আর প্রিন্স অ্যালবার্ট-এর পাঠানো দুটো পূর্ণাবয়ব তৈলচিত্র। দ্বারকানাথের অনুরোধে এ দুটি ছবি তাঁদের কলকাতা শহরকে উপহার।

১ মার্চ

টাউন হলে বিকেলে বেলায় নাগরিক সভা। সে সভায় স্থির হল মহারানীর কাছে পাঠানো

হবে মানপত্র, চমৎকার দুটো প্রতিকৃতি পাঠানোর স্বীকৃতি হিসেবে।

'বেঙ্গল হরকরা'-র সান্ধ্য ক্রোড়পত্রে বলা হল—

"সকল প্রস্তাবই সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়—একটি প্রস্তাবে সংগত কারণেই স্থির হয় আমাদের শ্রদ্ধেয় সম-নাগরিক দ্বারকানাথ ঠাকুরকে ধন্যবাদ জানানো হোক যেহেতু এ-দুটি চমৎকার শিল্প-নিদর্শন কলকাতার জন্য তিনিই সংগ্রহ করে দিয়েছেন। এই প্রস্তাবের প্রত্যুত্তরে সমবেত নাগরিকদের ধন্যবাদ জানিয়ে দ্বারকানাথ বলেন যে, তিনি যতটুকু যা করেছেন, কর্তব্যবোধেই করেছেন। তিনি পুনরায় বিলেত যাচ্ছেন কেবল সুদূরবর্তী দেশ দেখার আনন্দলাভের জন্য, কোনো স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়; বন্ধুদের নিশ্চিতি দিয়ে বলেন, এটা নিঃসন্দেহে সত্য যে দেশবাসী অনেকের সঙ্গে অনেক বিষয়ে তাঁর মতের মিল হয় না-কিন্তু তাঁদের প্রত্যেককে আশ্বাস দিয়ে তিনি বলতে চান যে ভাগ্য তাঁকে যেখানেই নিয়ে যাক না কেন, তিনি তাঁর নিজের ও অন্য সকলের এই যে বিরাট দেশ —তার স্বার্থ ও মঙ্গলের প্রতি কখনও অমনোযোগী হবেন না, পরন্তু তাঁর নিজের ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটুকু সম্ভব দেশের স্বার্থ ও মঙ্গল সাধনে সর্ব্বদা যত্নবান থাকবেন।"

দ্বারকানাথ ঠাকুর/কৃষ্ণ কৃপালনি

মার্চ

লণ্ডনে ডেভিড হেয়ারেব মূর্তি গড়া শেষ।

২ মার্চ

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের মৃত্যু।

"১৮৩৫ কিংবা ১৮৩৬ সালে দেবেন্দ্রনাথের জীবনপরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। ১৮৩৮-সালে তিনি বিদ্যাবাগীশের কাছে উপনিষদ্ পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৩৯ সালে তত্ত্ববোধিনী সভা, ১৮৪০ সালে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা, ও ১৮৪৩ সালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রবর্ত্তিত হয়। পাঠশালায় উপনিষদ্ পড়ানো হইতে লাগিল, এবং পত্রিকায় উপনিষদের বৃত্তি ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইতে লাগিল। এবং দুই কার্য্য প্রধানতঃ বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের সহায়তায় সম্পন্ন হইত।"

আত্মজীবনী/দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর/পরিশিষ্ট

৮ মার্চ

শনিবার সন্ধ্যায় 'বেন্টিঙ্ক' নামের জাহাজে চড়ে দ্বারকানাথ ঠাকুর পাড়ি দিলেন বিদেশে। সঙ্গে কনিষ্ঠপুত্র নগেন্দ্রনাথ, ভাগনে নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাঃ ডাবলিউ. ব্যালে, প্রাইভেট সেক্রেটারি টি. আর. সেফ আর তিনজন সেবক। এ ছাড়া চারজন মেডিকেল ছাত্র, ডাঃ এইচ. এইচ. গুডিভের তত্ত্বাবধানে। দ্বিতীয় বিলেত-যাত্রার কথা ভাবছিলেন যখন, তখন দ্বারকানাথ সচেতন হয়ে উঠেছিলেন দেশের শিক্ষা সমস্যা নিয়ে। এই সময়েই কাউন্সিল অব এডুকেশনকে একটা চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন যে, মেডিকেল কলেজের দুজন ছাত্র যদি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাশাস্ত্রে আরও উন্নত শিক্ষায় আগ্রহী হয়, তিনি তাঁদের যাতায়াতের ব্যয় ছাড়াও বিলেতে শিক্ষা নেওয়ার সমস্ত খরচ বইতে রাজী। কাউন্সিল কৃতজ্ঞতাসহ এই প্রস্তাবে রাজী হয়ে যে দুজন ছাত্রকে নির্বাচন করে দেন, তাঁরা হলেন ভোলানাথ বসু আর সূর্যকুমার চক্রবর্তী। পরে সরকার নিজেদের খরচে আরও একজন ছাত্রকে

পাঠাতে রাজী হয়। নাম, দ্বারকানাথ বসু। এরও পরে চতুর্থ একজন ছাত্রকেও নির্বাচন করা হয় জনসাধারণের কাছ থেকে তোলা চাঁদায় তাঁর খরচের টাকা তুলে দেওয়ার পর।

এপ্রিল

রাজেন্দ্রলাল সরকারের ছোটোভাই উমেশচন্দ্র আর তাঁর স্ত্রী খৃস্টধর্মে দীক্ষা নিলে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিচলিত হয়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় মিশনারি শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রবন্ধ ছাপিয়েই থামলেন না। কলকাতাব বাড়িতে বাড়িতে গিযে অনুবোধ জানাতে লাগালেন মিশনারি স্কুলে ছেলেদের না পাঠাতে।

মে

দ্বারকানাথ সুয়েজ বন্দরে নেমে যখন সময় কাটাচ্ছেন শেফার্ডস হোটেলে, কায়বোব ভাইসরয় মহম্মদ আলি পাশা তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন উৎকৃষ্ট জিন, গদি আর রেকাব চড়িয়ে সোনাব সাজসবঞ্জামে সাজানো নটা আরবি ঘোড়া, একটা মালবাহী অশ্বতর আর পথপ্রদর্শক হিসেবে কিছু রক্ষীবাহিনী দিয়ে। দ্বাবকানাথ ফার্সী জানতেন। ফলে পাশাব সঙ্গে আলোচনায় অসুবিধে ঘটেনি কোনো। আলোচনার ফাঁকে ভাইসরযকে তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন সুয়েজ আব আলেকজান্দ্রিয়া শহরকে রেলপথ দিযে জুড়ে দিতে। পাশা মন দিয়ে শুনেছিলেন সে প্রস্তাব। এই প্রসঙ্গে বলে নিতে হয় য়ুবোপের রেলপথ দেখে আসাব পর তাঁর কল্পনায় একটা ছবি তৈরি করেছিলেন ভারতীয় রেলপথ গড়ে তোলার। এমন-কি ছকে ফেলেছিলেন পবিকল্পনাও, 'গ্রেট ওয়েস্টার্ন অব বেঙ্গল' নাম দিয়ে এক বেল কোম্পানি গডার।

১৮ মে

দ্বারকানাথ নেপলসে। কলকাতায় গিবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা এই তাবিখের চিঠিতে নবীনচন্দ্র জানাচ্ছেন যে, আগামীকাল তাঁবা রওনা হবেন পারী-র দিকে। সেখানে তাঁরা ছিলেন ১৫ দিন। তাঁর মুগ্ধতার সংবাদ পম্পেই, ভিসুবিয়াস, নেপলসেব কৃত্রিম জলপ্রপাত, রেলগাড়ি ইত্যাদি দেখে। আরও অবাক ওখানকার মিউজিযামে ভাবতীয় সামগ্রী দেখে। নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন রাজা লুই ফিলিপের প্রাসাদে।

২৫ মে

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর রামকমল সেনের বড়ো ছেলে হরিমোহন সেন-এর উদ্যোগে, উমেশচন্দ্র সরকারের খৃস্টধর্মে দীক্ষা নেওয়াকে মনে রেখে, ধর্মসভা আর ব্রাহ্মসভা নিজেদেব ভিতরকার মতাদর্শগত সমস্ত বিভেদ ভুলে গিয়ে এক হাজার লোকেব এক সভায় সিদ্ধান্ত নিলে কলকাতায় গড়তে হবে এমন একটা অবৈতনিক স্কুল সেখানে বিন্দুমাত্র প্রভাব নেই মিশনারিদের। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাই সে-সভায় যোগ দিয়েছিলেন রাধাকান্ত দেব, সত্যচরণ ঘোষাল, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখেরা। সভা বসেছিল সিমলায় রাজাবাবুর ভবনে। মতিলাল শীলই তখন কলকাতার রাজাবাবু। সভায় গৃহীত হল প্রস্তাব যে, গড়তে হবে প্রথম শ্রেণীর ইংরেজি বিদ্যালয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বিবরণ—

> "... এই সভাতে নিশ্চিত হইল, যে হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় নামে এক পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইবেক, এবং তাহার ধর্ম্মসম্পাদন জন্য শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব সভাপতি হইলেন;

> শ্রীযুক্ত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, অপূর্ব্বকৃষ্ণ বাহাদুর, সত্যচরণ বাহাদুর, আশুতোষ দেব, প্রমথনাথ দেব, ব্রজনাথ ধর, মতিলাল শীল, রমানাথ ঠাকুর, রাজচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নীলরত্ন হালদার, বীরনৃসিংহ মল্লিক, রমাপ্রসাদ রায়, নন্দলাল সিংহ, দুর্গাচরণ দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, কাশীনাথ বসু, হরিমোহন সেন, ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, ও রাজকৃষ্ণ মিত্র অধ্যক্ষ হইলেন; শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও হরিমোহন সেন সম্পাদক হইলেন, এবং শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ দেব ও প্রমথনাথ দেব ধনাধ্যক্ষ হইলেন। এই পাঠশালার ব্যয়নির্ব্বাহ জন্য মাসিক সহস্র টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এবং এককালীন দান ও মাসিক দাতব্য এই উভয় দ্বারা যাহাতে মাসিক উক্ত সহস্র টাকা আয় হইতে পারে এমত ধন সংগৃহীত হইলেই বিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ হইবেক।..."

ঐ বিবরণেই জানা যায় এককালীন দশ হাজার আর মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি এসেছিল আশুতোষ দেব আর প্রমথনাথ দেব -এর কাছ থেকে। সাহায্য এসেছিল মেদিনীপুর থেকেও।

১ জুন

ফৌজদারী বালাখানায় ডেভিড হেয়ারেব তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপনের সভা। সভাপতি, রামগোপাল ঘোষ। বাংলায় প্রবন্ধ পাঠ করলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। শিক্ষা হিন্দু সমাজের মনোজগতে কী কী পরিবর্তন এনেছে সেটাই ছিল তাঁর প্রবন্ধের বিষয়।

> "তিন বললেন যে, এক সময় এমন অবস্থা ছিল হিন্দুরা জনহিতকর কাজের উপযোগিতা একেবারেই বুঝতে পারত না। এবং তার জন্য এক পয়সা চাঁদা দেওয়াও কর্তব্য বলে মনে করত না। তাদের জৈবিক প্রয়োজনগুলির পরিতৃপ্তি সাধন ছাড়া আর কিছুই তখন তারা বুঝত না। কিন্তু তারপর তাঁর স্বদেশের ভাগ্যাকাশে সুপ্রসন্ন উষার উদয় হল। যদিও স্বদেশবাসীব অধিকাংশের মধ্যে গণচেতনার উন্মেষ ঘটল না, যদিও প্রায় সকলেই উদাসীন, নিস্পৃহ হয়েই রইলেন, তবুও এদেশের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষিত এবং বুদ্ধিদীপ্ত এমন সব লোকের সংখ্যা বাড়তে লাগল যাঁদের এই সমস্ত অভিযোগে অভিযুক্ত করা চলে না। ...তাঁরা জেনেছিলেন দেশের সমস্ত অমঙ্গল অপসারণ করার সবচাইতে প্রশস্ত পথ হলো শিক্ষার আলো বিকীর্ণ করা।"

ডেভিড হেয়ার/প্যারীচাঁদ মিত্র

এরপর এই শিক্ষার সূত্রে তিনি চলে এসেছিলেন ডেভিড হেয়ারের শিক্ষার উন্নতি ছাড়াও আরও সেই সব সামাজিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দানের প্রসঙ্গে যার মধ্যে রয়েছে প্রেসের স্বাধীনতা, কুলি-ব্যবসা নিরোধ ইত্যাদি। এরপরের বক্তা ছিলেন কিশোরীচাঁদ মিত্র। তাঁর ভাষণ ছিল ইংরেজিতে। একটি বিদেশী জাতির কল্যাণ সাধনে নিজেকে উৎসর্গ করা হেয়ারের বিষয়ে বলতে বলতে তিনি চলে এলেন বাংলা ভাষায়।

> "আমি জানি, আমাদের শিক্ষিত বন্ধুদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁদের কাছে বাংলায় লেখা কিছুই ভালো লাগে না; তাঁদের রুচি বোধ হয় মাতৃভাষায় যা কিছু লেখা আছে, তারই বিপরীতধর্মী। যত উন্নত ভাবনা, যত সূক্ষ্ম অনুভূতি হোক না কেন, তা যদি মাতৃভাষায় প্রকাশ করা হয়, তাহলে তা তাঁদের কাছে নিতান্ত সাদামাটা, পুরনো কিংবা অনুপযোগী, তবে আমার ধারণা, এই আত্মাভিমান অতি দ্রুত লোপ পাচ্ছে। বাংলা ভাষা আমাদের দেশের ভাষা, আমাদের শৈশবের ভাষা। আমাদের প্রথম জীবনের ধ্যান ধারণা, ভাবানুষঙ্গ এই ভাষার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীসূত্রে জড়িত; আমি মনে করি এই ভাষাচর্চার উপযোগিতা ও গুরুত্ব অবিলম্বে সকলের কাছেই স্বীকৃত হবে।"

ডেভিড হেয়ার/প্যারীচাঁদ মিত্র

৭ জুন

কলকাতায় স্থাপিত হল 'ফ্রেনলজিক্যাল সোসাইটি'।

২১ জুন

লণ্ডনে পৌঁছে নবীনচন্দ্র গিরীন্দ্রনাথকে জানাচ্ছেন যে আজই তাঁরা পৌঁচেছেন এখানে।

৭ জুলাই

দ্বারকানাথ বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন বাকিংহাম প্যালেসে। নবীনচন্দ্র গিরীন্দ্রনাথকে চিঠিতে জানাচ্ছেন—

> "বাবু এই মাত্র মহারানীর কাছ থেকে ফিরলেন। মহারানীর যে প্রতিকৃতি এখন কলকাতার টাউন হলে দেখতে পাও, মহারানীর কাছ থেকে সেটি উপহার পেয়ে কলকাতার নাগরিকবৃন্দ মহারানীকে যে মানপত্র দিয়েছিল, বাবু সেটি তাঁর হাতে দিতে গিয়েছিলেন। ... মহামান্য মহারানী আরো একটি ছবি দিয়েছিলেন—তাঁর ও প্রিন্স অ্যালবার্টের একটি মিনিয়েচর বাবুব ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্য, টাউন হলের জন্য নয়।"

দ্বাবকানাথ ঠাকুর/কৃষ্ণ কৃপালনি

১২ জুলাই

রানাঘাটের শিমহাট গ্রামে মামার বাড়িতে বিদ্যাসাগর-সুহৃদ ও সমাজ-সংস্কাবক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের জন্ম। বাবা, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৩ অগাস্ট

গিরীন্দ্রনাথকে লেখা নবীনচন্দ্রের চিঠি থেকে জানা যাবে দ্বারকানাথ আয়ারল্যাণ্ডে আর নবীনচন্দ্ররা লণ্ডনে।

অক্টোবর

ঢাকায় পশ্চিমপাড়ায় নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম। বাবা, কাশীকান্ত। তাঁর সম্পাদিত তিন খণ্ডের 'ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী'তেই বেরিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনী। কৃষ্ণনগর কলেজ প্রতিষ্ঠার বিজ্ঞপ্তি জারী।

৩১ অক্টোবর

নদীয়ার গোস্বামী দুর্গাপুর গ্রামের সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে কবি, সাহিত্যিক প্রাবন্ধিক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম। বাবা, আনন্দচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

১ নভেম্বর

কৃষ্ণনগর কলেজের প্রতিষ্ঠা।

১১ নভেম্বর

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ পুত্র বীরেন্দ্রনাথের জন্ম।

২৪ নভেম্বর
ডি এল. রিচার্ডসন অধ্যক্ষ নির্বাচিত হলেন কৃষ্ণনগর কলেজের।

২৬ নভেম্বর
দ্বারকানাথ ফিরে এসেছেন লণ্ডনে। এবারে মিঃ গ্লাডস্টোন-এর সঙ্গে আলাপ ও কথাবার্তা হয় তাঁর।

ডিসেম্বর
ফোর্ট উইলিয়ামের চাকরি ছাড়লেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

৭ ডিসেম্বর
বোড়াল গ্রামে রাজনারায়ণ বসুর বাবা নন্দকিশোরের মৃত্যু ৪৩ বছর বয়সে। ২১ জন সভ্যকে নিয়ে দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেবার পরের বছরে অর্থাৎ ১৮৪৪-এ নন্দকিশোর দীক্ষা নিয়েছিলেন ঐ ধর্মে।

৮ ডিসেম্বর
১৫০ টাকা মাইনেয় বারাসাত গভর্নমেন্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষকের চাকরি পেয়ে হুগলি থেকে চলে এলেন প্যারীচরণ সরকার।

১০ ডিসেম্বর
মুর্শিদাবাদে পুরাতাত্ত্বিক রামদাস সেন-এর জন্ম। বাবা, রামমোহন। বহরমপুরে থাকার সময় বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে গড়ে উঠবে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। পরে হয়ে যাবেন বঙ্গদর্শন-এর লেখক।

১৮ ডিসেম্বর
দ্বারকানাথ ঠাকুর রওনা হলেন পারী।

২০ ডিসেম্বর
দুবছরের মধ্যে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা ৫০০–য় পৌঁছলে ৭ পৌষ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখদের উদ্যোগে গোরিটি বা গৌরহাটির বাগানে মহোৎসব।

২৩ ডিসেম্বর
বর্ধমানের খণ্ডকোষে শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবী রাসবিহারী ঘোষ-এর জন্ম। বাবা, জগবন্ধু।

১৮৪৬

বছরের প্রধান ঘটনাবলী

সাতু সিংহ নামে পরিচিত নন্দলাল সিংহ-র প্রয়াণ। বিয়ে করেছিলেন আন্দুলের মথুরানাথ মল্লিকের মেয়েকে। একমাত্র পুত্র কালীপ্রসন্ন-র বয়স তখন মোটে ছয়।
শম্ভুনাথ পণ্ডিত, সতীর্থ ভবানীচরণ দত্তর সহযোগিতায়, বের করলেন বেকনেব প্রবন্ধাবলীর সটীক সংস্করণ। খুশি হয়ে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন শিক্ষক রিচার্ডসন।
বেরল রামজয় শর্মা-র 'বিধবা বিবাহ নিষেধ বিষয়ক ব্যবস্থা'।

> "বিধবার পুনর্বিবাহেব কথা প্রচার করে 'কোনো পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি' গবর্নমেণ্টে পাঠানোর জন্য এক ব্যবস্থাপত্র 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'-তে পাঠান। সোসাইটি-সম্পাদক ঐ ব্যবস্থাপত্রের 'যাথার্থ্য নির্ণয়ের' জন্য তা 'ধর্মসভা'য় পাঠিয়ে দেন। 'ধর্মসভা' তাব যে উত্তব দেয়, সাধারণের জন্য তার মর্মার্থ এই পুস্তিকাটিতে প্রকাশিত। এতে বিভিন্ন শাস্ত্র পর্যালোচনা করে বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা দেখিয়ে মন্তব্য কবা হয়েছে, 'যাঁহারা বিধবার বিবাহদি স্ত্রী ধর্ম বলিয়া ব্যবস্থা দেন, তাঁহারদিগেব শাস্ত্রার্থজ্ঞান নাই।' বিধবা বিবাহের অনির্দিষ্টকারিতার দীর্ঘ ফর্দ দিতেও লেখক ভুল করেন নি।"
>
> বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস/স্বপন বসু

আবদুল লতিফ খাঁ শেষ করলেন মাদ্রাসার পড়া। এর পর শুরু হবে তাঁর কর্মজীবন।
ঢাকায় গড়ে উঠল পূর্ববঙ্গীয় ব্রাহ্মসমাজ।
লালবিহারী দে-র ভাবনা, কী করে গড়া যায় নিজেদের জাতীয় চার্চ।
৬০ টাকা মাইনেয় হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়।
বছরের গোড়ায়, দেবেন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে এসে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিলেন রাজনারায়ণ বসু।

> "যে দিন প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়া (ইং ১৮৪৬ সালের প্রারম্ভে) ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করি, সে দিন আমি স্বগ্রামের দুই এক জন বয়স্ক ব্যক্তিদিগের সহিত তাহা করি। যে দিন আমরা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করি, সে দিন বিস্কুট ও সেরী আনাইয়া ঐ ধর্ম গ্রহণ করা হয়।

জাতিবিভেদ আমরা মানি না, উহা দেখাইবার জন্য ঐরূপ করা হয়। খানা খাওয়া ও মদ্য পান করা রীতির জের রামমোহন রায়ের সময় হইতে আমাদিগের সময় পর্যন্ত টানিয়াছিল, কিন্তু সকলেই যে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের দিন ঐরূপ করিতেন এমন নহে। আমি এই সময়ে অতি পরিমিত রূপে পান করিতাম। ... ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করাতে আমার কলেজের সমাধ্যায়ীরা আশ্চর্য হইয়াছিলেন। তাঁহারা আমাকে এক অদ্ভুত জীব মনে করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই সংশয়বাদী অথবা ধর্মের প্রতি উদাসীন ছিলেন। কলেজের উত্তম ছোকরা যে ব্রাহ্ম হইতে পারে, ইহা তাঁহাদিগের স্বপ্নের অগোচর ছিল। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়াই পরম শ্রদ্ধাস্পদ দেবেন্দ্রবাবুকে এক পত্র লিখি। তাহাতে আমাদিগের শাস্ত্র হইতে এমন এক গ্রন্থ সংকলন করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করি যাহার প্রথম ভাগে বেদের, দ্বিতীয় ভাগে স্মৃতির ও তৃতীয় ভাগে ইতিহাস পুরাণ ও তন্ত্রের বাছা বাছা শ্লোক সকল থাকিবে।"

রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত

উত্তরপাড়ায় উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় গড়ে উঠল। কাছাকাছি শ্রীরামপুর কলেজ আর তারই সংলগ্ন কলেজিয়েট স্কুল থাকলেও সেখানে খৃস্ট-ধর্ম-ঘেঁষা শিক্ষাপদ্ধতির জন্যে রিষড়ার ছাত্ররা পড়তে যেত ঐ উত্তরপাড়াতেই। তখনকার উল্লেখযোগ্য ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়, শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি বামনদাস-এর বাবা, বেণীমাধব ভট্টাচার্য, কালাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ দাঁ প্রমুখেরা।
লর্ড হার্ডিঞ্জ এলফিনস্টোনের লেখা 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' উপহার দিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

জানুয়ারি
মদনমোহন তর্কালঙ্কার যোগ দিলেন কৃষ্ণনগর কলেজে। জুন মাস পর্যন্ত থাকবেন সেখানে। তারপরই সংস্কৃত কলেজে।

১ জানুয়ারি
স্বদেশ থেকে কলকাতায় ফিরে রিচার্ডসন যোগ দিলেন কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে। বারাসাত গভর্নমেন্ট স্কুলের প্রতিষ্ঠা। হুগলি থেকে চলে এসে প্যারীচরণ সরকার যোগ দিলেন প্রধান শিক্ষক হিসেবে। তাঁর ঐকান্তিক উৎসাহে স্কুলের ক্রমোন্নতি। স্কুল উঠে যাবে নতুন বাড়িতে। তাঁর উদ্যোগেই বারাসাতে গড়ে উঠবে প্রথম কৃষি বিদ্যালয়, শিল্পবিদ্যালয় আর ছাত্রাবাস। বারাসাতের এই স্কুল হয়ে উঠবে বাংলাদেশের স্কুলের মধ্যে সেরা। 'নব্যভারতে' যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ রচনা করবেন এই বিদ্যালয়ের প্রশস্তি। আর জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট এলফিনস্টোন শিক্ষাসভার রিপোর্টে এই স্কুল সম্বন্ধে যা লিখবেন, সেও আর এক প্রশস্তি।

> "I must however bring to the particular notice of the council, unremitted exertion of the Headmaster Babu Peary Charan Sircar, to promote the welfare of the school. His whole attention is turned to its improvement. His unceasing endeavours to instil knowledge into the boys in the school, is only equalled by his great kindness to them out of the school. The pupils looked on him of a friend as well as an instructor."

৭ জানুয়ারি
নবীনচন্দ্রের চিঠিতে জানা যাচ্ছে দ্বারকানাথ বেশ ভালোই আছেন পারীতে। এরপরেই কোনো

একটা দিনে ভারতবিদ্যাবিশারদ ফ্রেডরিখ ম্যাকসমূলরের সঙ্গে ঘটবে দ্বারকানাথের ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার। ম্যাকসমূলর তখন ঋগ্বেদ সংকলন আর সম্পাদনার কাজে ব্যস্ত। তখনো বিশ্বখ্যাতি ঘটেনি তাঁর।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর 'আমার বাল্যকথা'য় রয়েছে ম্যাকসমূলর-এব নিজের কথা, দ্বারকানাথ সম্পর্কে।

> "আমি তখন কলেজ-ডি-ফ্রান্সে প্রোফেসার বারনুফের কাছে সংস্কৃত শিক্ষা করতাম, এবং যখন দেখলাম যে নবাগত ভদ্রলোকটি আমারই এই প্রোফেসারের কাছে পরিচয়-পত্র নিয়ে এসেছেন, তখন তাঁর সঙ্গে আলাপ হতে বেশি বিলম্ব হল না। প্রোফেসার বারনুফ একদিন আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং তারপর থেকে তাঁর সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা হল। তিনি হচ্ছেন তোমার পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর।
>
> দ্বারকানাথ সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত না হলেও সংস্কৃত সাহিত্যজ্ঞান তাঁর বেশ ছিল। প্রথম যখন তাঁকে আমি দেখি তিনি ইনস্টিট্যুট-ডি-ফ্রান্সে প্রোফেসার বারনুফেব সঙ্গে কথা কইছিলেন। প্রোফেসার তাঁকে তাঁব নিজেব ভাগবতপুরাণের উৎকৃষ্ট ফরাসী তর্জ্জমার বইখানি উপহার দিলেন। এক দিকে সংস্কৃত শ্লোকগুলি, অপর দিকে ফরাসী তর্জ্জমাগুলি ছাপান ছিল। দ্বাবকানাথ তাঁর সুগঠিত শ্যামল অঙ্গুলী ফরাসী তর্জ্জমাব পাতার উপর রেখে নিশ্বাস ফেলে বল্লেন, 'আহা। এইগুলি যদি আমি পড়তে পারতাম'; তাঁর স্বদেশের প্রাচীন ভাষা জানবার জন্যে তাঁর তেমন আগ্রহ ছিল না, যত ফরাসী ভাষার জন্য ছিল। যখন তিনি শুনলেন যে আমি সংস্কৃত ভাষা শিখবার জন্য কিরূপ আগ্রহান্বিত তখন আমার প্রতি তাঁর একটা আকর্ষণ হল। তিনি প্রায়ই আমাকে নিমন্ত্রণ করতেন এবং আমিও গিয়ে সারা সকালটা তাঁর কাছে প্রায়ই কাটিয়ে আসতাম। ভারতের নীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার অনেক কথা হত। তিনি অত্যন্ত সঙ্গীত প্রিয় ছিলেন এবং ইতালীয় ও ফরাসী সঙ্গীত খুব পচ্ছন্দ করতেন। তিনি গান কবতেন আর আমি সেই গানের সঙ্গে পিয়ানো বাজাতাম—।"

আমার বাল্যকথা/সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১ জানুয়ারি

কলকাতার জোড়াবাগান থেকে নাস্তিকদেব বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে বেবল পাক্ষিক 'নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা'। ১০ বছর চলার পরে মাসিক।

২৬ জানুয়ারি

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বের করলেন ত্রৈমাসিক 'বিদ্যাকল্পদ্রুম'। এব ইংরেজি নাম 'Encyclopedia Bengalensis'। বেরিয়েছিল মোট ১৩টি খণ্ড।

মার্চ

সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক বামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কারেব মৃত্যু। শিক্ষাবিভাগের সেক্রেটারি মৌয়াট সাহেব চাইলেন ঐ শূন্য পদে বিদ্যাসাগরকে। তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি জানালেন মার্শাল সাহেব। মার্শালের প্রস্তাবে সম্মতি জানাবেন বিদ্যাসাগব।

ঐকতান বাদন বিষয়ে বাংলা ভাষায় প্রথম বইয়ের লেখক সংগীতশাস্ত্রী, মাইকেলের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে নাম ভূমিকার অভিনেতা কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম কলকাতায়।

১ মার্চ

চিৎপুর রোডে রাধাকৃষ্ণ বসাকের বৈঠকখানায় শুরু হল 'হিন্দু হিতৈষী' অথবা 'হিন্দু হিতার্থী' বিদ্যালয়ের কাজ, প্রায় এক বছর চেষ্টাচরিত্রের পর। এর ইংরেজি নাম 'Hindu Charitable Institution'। বিদ্যালয়ের শুরু থেকেই ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রধান শিক্ষক। হিন্দু কলেজ থেকে বেরিয়ে রাজনারায়ণ বসু হলেন এর ইনসপেকটর। দুজন পরিদর্শক হলেন কাশীপ্রসাদ ঘোষ আর রমানাথ ঠাকুরের ছেলে নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বৃন্দাবনচন্দ্র বসু আর তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় ছিলেন শিক্ষকদের মধ্যে। পরে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অবনিবনার ফলে ভূদেব ছেড়ে দেবেন প্রধান শিক্ষকের কাজ।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'আত্মজীবনী'-তে লিখেছেন, এই বিদ্যালয় শুরু হওয়ার পর—

> "খৃষ্টান হইবার স্রোত মন্দীভূত হইল, একেবারে মিশনারিদিগের মস্তকে কুঠারাঘাত পড়িল।"

১৪ মার্চ

লণ্ডনের 'কোর্ট জার্নাল'-এর রিপোর্ট থেকে জানা যায় এই সময়ে পারী শহরে বেশ জমকালো পার্টি দিয়ে চলেছেন দ্বারকানাথ। 'কোর্ট জানাল' থেকে তার বিস্তৃত বিবরণ ছাপা হয়েছিল কলকাতার 'বেঙ্গল হরকরা'-য়। 'হরকরা'র মন্তব্য, সে-সব যেন আরব্য উপন্যাসের কাহিনী।

১৮ মার্চ

পারীতে তিনমাস কাটিয়ে লণ্ডনে ফিরে এসেছেন দ্বারকানাথ। প্রাণশক্তিতে ভরপুর।

১৯ মার্চ

নবীনচন্দ্র তাঁর চিঠিতে জানাচ্ছেন যে পূর্ণস্বাস্থ্য নিয়ে দ্বারকানাথ ইংরেজদের বাড়িতে খানা খেয়ে আর পার্টি করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

২ এপ্রিল

শিক্ষা সংসদ বিদ্যাসাগরকে নিযুক্ত করলে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক হিসেবে। এই নিয়োগের জন্যে বিদ্যাসাগরকে দেওয়া মার্শাল সাহেবের প্রশংসাপত্র—

"On the whole, I consider, that he unites in an unusual degree, extensive acquirements, intelligence, industry, good disposition and high respectability of character."

৬ এপ্রিল

৫০ টাকা মাইনের বিদ্যাসাগর যোগ দিলেন সংস্কৃত কলেজে।

৭ এপ্রিল

নবীনচন্দ্রের চিঠিতে সকলেরই সুস্বাস্থ্যের খবর।

১৩ এপ্রিল

সংস্কৃত কলেজের কাব্য ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের মৃত্যু। একটানা ২২ বছরের অধ্যাপনা এখানে। আজকের কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীরামদাসের মহাভারত, অনেক বদলিয়ে, তাঁরই গড়ে দেওয়া।

> "বিদ্যাসাগর নিজের ছাত্রাবস্থার কত গল্পই করিতেন। যখন তিনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন, তখন সাহিত্যের অধ্যাপনা কার্য জয়গোপাল তর্কালঙ্কার নির্বাহ করিতেন। ইনি অতি সুরসিক, সুলেখক, ভাবগ্রাহী ও সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন বটে কিন্তু পড়াশুনা বড় একটা তাঁহার কাছে কিছু হইত না। শ্লোকটা আবৃত্তি করিলেন; ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন, কিন্তু অর্দ্ধেক ব্যাখ্যা হইতে না হইতেই তাঁহার 'ভাব লাগিয়া' গেল, গলার স্বর গদ-গদ হইয়া উঠিল, 'আহা, হা, দেখ দেখি, কেমন লিখেছে'। এই বলিয়া তিনি কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, তাঁহার গণ্ডস্থল অশ্রুজলে প্লাবিত হইয়া গেল; সেদিনকার মত পড়া এই স্থানেই সমাপ্ত হইল। কিন্তু সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিতে তাঁহার একটি বিশেষ ক্ষমতা ছিল।..."
>
> পুরাতন প্রসঙ্গ/কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য

২০ এপ্রিল

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরিতে রাজশাহী চলে যেতে হচ্ছে, তাই হেয়ার স্মৃতিরক্ষা সভার সম্পাদকের পদ থেকে পদত্যাগ করলেন কিশোরীচাঁদ মিত্র। নতুন সম্পাদক হবেন, প্যাবীচাঁদ মিত্র।

২৯ এপ্রিল

নবীনচন্দ্র জানাচ্ছেন দ্বারকানাথ মাঝে মাঝেই বলছেন কলকাতা ফিবে যাওয়াব কথা।

১৯ মে

নবীনচন্দ্রের চিঠিতে অনেক রকমের খবর। দেউলিয়া হতে-চলা স্টকলারকে সাহায্য করছেন দ্বারকানাথ। পারীতে গাড়ি করে যাওয়ার সময় লুই ফিলিপের উপর গুলিচালনা। মহামান্য মহারানী ভিকটোরিয়া আঁতুড় ঘরে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছ'শো জন য়ুরোপীয় ছাত্রকে হারিয়ে দিয়েছে কলকাতা থেকে আসা দুটি মেডিকেল ছাত্র। তুলনামূলক অ্যানাটমিতে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক লাভ সূর্যকুমার চক্রবর্তীর। আর একজন পেয়েছেন রুপোর মেডেল সম্ভবত কেমিস্ট্রি কিংবা বোটানিতে। দ্বারকানাথ নিজের হাতে এই দিন চিঠি লিখছেন দেবেন্দ্রনাথকে। 'স্নেহের দেবেন্দর' সম্বোধনে। চিঠিতে বিষয়-সম্পত্তি নিয়েই আলোচনা।

জুন

সম্মিলিত উদার জাতীয় চার্চ গড়ার সংকল্পের কথা লালবিহারী দে জানাচ্ছেন জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরকে।

> I would construct the United National Church of Bengal on the broadest possible basis, so as to include a great variety of opinions."

১ জুন

হেয়ার স্মৃতিসভায় প্যারীচাঁদ মিত্র জানালেন ডেভিড হেয়ারের মূর্তি তৈরি হয়ে গেছে।

ডাঃ গুডিভ আর মিঃ জোশেফ হেয়ার দেখে খুশি। শিগগির জাহাজে করে এদেশে আনানো হবে। হেয়ারের জীবনচরিত লেখায় দেরি হওয়ার কারণ তাঁর জীবনের আদিপর্ব সম্বন্ধে তথ্যের অভাব। হেয়ার প্রাইজ ফাণ্ড বাবদ তাঁদের হাতে জমা পড়েছে ১.৬৩১।√.।

২ জুন

নবীনচন্দ্র চিঠিতে জানাচ্ছেন আগামী অক্টোবরে বিলেত ছাড়ার কথা ভাবছেন দ্বারকানাথ।

৫ জুন

সহকারী কর্মসচিব আর লাইব্রেরিয়ান হিসেবে রাজেন্দ্রলাল মিত্র যুক্ত হলেন এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে। তখন তাঁর বয়স ২৪। সোসাইটিতে তাঁর কাজ ছিল প্রুফ সংশোধন আর চিঠিপত্র লেখা। মাইনে ১০০ টাকা। গোড়ায় কর্তৃপক্ষের মনে সংশয় ছিল তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে। তাই ৬ মাসের জন্যে নিয়োগ, পরীক্ষামূলকভাবে। সোসাইটির কার্যবিবরণীতে লেখা—"The appointment be on trial for six months.."

কিন্তু নিজেব যোগ্যতাব জোরেই একটানা দশ বছর এই সোসাইটির বেতনভোগী কর্মচারী। ১৮৫৬-য ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশনের পরিচালক হয়ে এখান থেকে চলে গেলেও, সোসাইটির সঙ্গে ক্রমশই আরও দৃঢ় এবং গাঢ় হয়ে উঠবে তাঁর সম্পর্ক যে, পরে তিনিই হযে উঠেছিলেন এই সোসাইটির অন্যতম প্রাণপুরুষ।

১০ জুন

সুইজাবল্যাণ্ডে যাবার কথা ভেবেও সেটা স্থগিত বাখলেন দ্বারকানাথ।

১১ জুন

বেরল মুসলমান-পরিচালিত দ্বিতীয় সংবাদপত্র 'জগদুদ্দীপক ভাস্কর'। সাপ্তাহিক। বাংলা ছাড়া আবও চাবটে ভাষায় ছাপা হত লেখা। ইংরেজি, হিন্দী, ফার্সি, উর্দু বা হিন্দুস্থানী। পাঁচ কলমে পাঁচ ভাষা। ইংরেজিতে ঐ পত্রিকাব নাম ছিল 'ইণ্ডিয়ান সন'। পারস্য ভাষায় 'দফত বেওযাকেয়ার্ত'। বন্ধ হয়ে যায় দুমাস চলার পর।

মুসলমান-সম্পাদিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র ছিল 'সমাচার সভারাজেন্দ্র'। বাংলা আর ফার্সিতে ছাপানো সাপ্তাহিক। বেশিদিন চলেনি।

২০ জুন

বেরল ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নতুন সাপ্তাহিক পত্রিকা 'পাষণ্ডপীড়ন'। বেশি দিন চলেনি। কেন চলল না তার বৃত্তান্ত লিখে গেছেন ঈশ্বরচন্দ্র নিজেই।

> "১২৫৩ সালের আষাঢ় মাসের সপ্তম দিবসে প্রভাকর যন্ত্রে পাষণ্ডপীড়নের জন্ম হইল। ইহাতে পূর্ব্বে কেবল সর্বজন-মনোরঞ্জন প্রকৃষ্ট প্রবন্ধপুঞ্জ প্রকটিত হইত। পরে ৫৪ সালে কোনো বিশেষ হেতুতে পাষণ্ডপীড়ন, পাষণ্ড পীডণ করিয়া, আপনিই পাষণ্ড হস্তে পীড়িত হইলেন। অর্থাৎ সীতানাথ ঘোষ নামক জনৈক কৃতঘ্ন ব্যক্তি যাহার নামে এই পত্র প্রচারিত হয়, সেই অধার্মিক ঘোষ বিপক্ষের সহিত যোগদান করতঃ ঐ সালের ভাদ্র মাসে পাষণ্ডপীড়নের হেড চুরি করিয়া পলায়ন করিল, সুতরাং আমাদিগের বন্ধুগণ তৎপ্রকাশে বঞ্চিত হইলেন। ঐ ঘোষ উক্ত পত্র ভাস্করের করে দিয়া পাতরে আছড়াইয়া নষ্ট করিল।"

কারো কারো মতে সমাজকেও নষ্ট করে চলেছিল ঐ পত্রিকা।

"ভাস্কর" পত্রের সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ মহাশয় কর্তৃক প্রকাশিত 'রসরাজ' পত্রের সহিত কবিতাযুদ্ধ ও গালাগালি করা ঐ পাষণ্ড-পীড়নের প্রধান কার্য হইয়া উঠে। তখন বঙ্গীয় আসরে প্রতিনিয়ত যে কবির লড়াই চলিত, সাহিত্যক্ষেত্রে সেই কবির লড়াইকে অবতীর্ণ করা উক্ত পত্রদ্বয়েব উদ্দেশ্য ছিল। সে অভদ্র, ব্রীড়াজনক উক্তি-প্রত্যুক্তির বিষয় স্মরণ করিলে এখনও লজ্জা হয়।"

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ/শিবনাথ শাস্ত্রী

২৭ জুন

সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যশাস্ত্রসাধক জয়গোপাল তর্কালঙ্কাবেব জায়গায় নিযুক্ত হলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ৯০ টাকা বেতনে। সম্পাদক বসময় দত্ত চেয়েছিলেন বিদ্যাসাগবকে ঐ পদে। বিদ্যাসাগর তখন ৫০ টাকা মাইনেয ঐ কলেজেবই সহকারী সম্পাদক। তিনি নিজেই সহপাঠী ও বন্ধু মদনমোহনকে অনুরোধ জানান ঐ পদ গ্রহণ করতে।

৩০ জুন

ডাচেস অব ইনভেরনস-এব প্রাসাদে ডিনাব খাওযাব সময হঠাৎ দ্বারকানাথেব কাঁপুনি দিযে জ্বব। দ্বারকানাথ চলে এলেন তাঁব সেন্ট জর্জেস হোটেল। ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাঃ মার্টিন তাঁকে দেখছেন তখন। দু-তিন দিনের মধ্যে তেমন উন্নতি দেখতে না পেয়ে দ্বাবকানাথকে নিয়ে যাওযা হল সাসেকস-এব সমুদ্রতীরেব স্বাস্থ্যকেন্দ্র ওযার্দিঙ-এ।

২৪ জুলাই

হিন্দু আইন বিশেষজ্ঞ শাস্ত্রী গোপালচন্দ্র সবকাব-এব জন্ম বাঁকুড়াব ইন্দাস-এ। বাবা, শম্ভুনাথ।

২৭ জুলাই

এই তারিখে পর্যন্ত সমুদ্রতীরে থেকে দ্বাবকানাথ ফিরে এলেন নিজেব হোটেলে। লণ্ডনে ফেবার পব শরীরেব অবনতি ঘটতে থাকে।

১ অগাস্ট

'মর্নিং ক্রনিকল'-এর সংবাদ

"খুবই দুঃখের সঙ্গে আমরা অবগত হলাম যে বহুবিশিষ্ট বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর খুবই গুরুতর অসুখে আক্রান্ত হওযায তাঁর বন্ধুরা বেদনার্ত ও আতঙ্কিত।... যকৃতের দোষজনিত তাঁর পীড়ার আশঙ্কাজনক লক্ষণগুলি তিন দিন আগে প্রকাশ পায়। তাবপব থেকে তাঁর অবস্থা খুবই খাবাপের দিকে যেতে শুরু করেছে। ডাঃ চেম্বার্স ও লোয়ার গ্রসভেনর স্ট্রিটের ডাঃ মার্টিন সর্বক্ষণ বাবুর শয্যাপার্শ্বে রয়েছেন। গতকাল সন্ধ্যায় এই খ্যাতনামা চিকিৎসকদ্বয় বলেছেন যে গত দুদিনের তুলনায বাবু অনেকটা যেন ভালো বোধ করছেন।"

এই রিপোর্ট বেরোনোর দিনেই সন্ধে ৬টা ১৫ মিনিটে সেন্ট জর্জেস হোটেলে দ্বারকানাথের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ।

২ অগাস্ট
'টাইমস' লিখলে

'গত শনিবার রাজধানী লণ্ডন শহর ও তার আশপাশের বিস্তীর্ণ শহরতলী অঞ্চলের উপর দিয়ে বজ্র, বিদ্যুৎ, শিলাবৃষ্টি ও ধারাবর্ষণ-সহযোগে যে-প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেল, সে-রকম বিক্ষোভ গত বহু বৎসর দেখা যায়নি। বিকেল তিনটেয় শুরু হয়েছিল এই দুর্যোগ। দ্বারকানাথের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পনেরো মিনিট পরে সব শান্ত।"

অগাস্ট
বামমোহনের ছোটো ছেলে গড়েছিলেন 'সত্যসঞ্চারিণী' নামেব এক বেদান্ত সভা। সেখানকার মুখপত্র হিসেবেই বেরল 'সত্যসঞ্চারিণী পত্রিকা'। মাসিক। সম্পাদক ছিলেন হিন্দু কলেজের গণিতের ছাত্র শ্যামাচবণ বসু। তাঁর মৃত্যুর পরই, পরের বছরে বন্ধ ।

৩ অগাস্ট
লন্ডনের 'টাইমস' পত্রিকায় বেরল এক কলম জোড়া শোকবার্তা, দ্বারকানাথের মৃত্যুতে।

৪ অগাস্ট
দ্বারকানাথের মৃত্যু-সার্টিফিকেটে জানানো হল মৃত্যুর কারণ। "দক্ষিণ ফুসফুসেব জ্বর প্রদাহ।"

৫ অগাস্ট
সমাধিস্থ করা হল দ্বারকানাথের মরদেহকে কেলসল গ্রীনের একটি সমাধি কক্ষে।

৬ অগাস্ট
'টাইসম'-এর বিবরণে দ্বারকানাথের সমাধিস্থ হওয়ার খবর:

"দ্বারকানাথের পুত্রের ইচ্ছানুসারে তাঁকে সমাহিত করার সময় সাহায্য নেওয়া হয়নি কোনো ধর্মযাজকের। হয়নি কোনো অনুষ্ঠান। শবাধার নিয়ে শোকযাত্রা শুরু হয় সেণ্ট জর্জেস হোটেল থেকে সকাল সাড়ে দশটায়। শবদেহ-বাহক গাড়ির পিছনে ছিল মেজর হেন্ডারসনের গাড়ি, তার ভিতরে ছিলেন নগেন্দ্রনাথ, সম্ভবত দিল্লীর অধিবাসী জনৈক মোহনলাল, নবীনচন্দ্র। পরের গাড়িতে স্যর এডোয়ার্ড রায়ান, যিনি নগেন্দ্রনাথের অভিভাবক, মেজর হেন্ডারসন, যিনি দ্বারকানাথের ব্যবসার অংশীদার, ডাঃ র‍্যালি আর মিঃ ডি. জে. ম্যাককিলপ। অন্য একটা গাড়িতে ছিলেন অনারেবল ক্যাপটেন ডি. গোর, ক্যাপটেন হেন্ডারসন, মিঃ সি. প্লাউডেন আর ডাঃ গুডিভ। তার পরের গাড়িতে দ্বারকানাথের বন্ধুরা। এই সব গাড়ির পিছনে ছিল মোহনলালের নিজস্ব গাড়ি। তাতে ছিল তিন জন মেডিকেল ছাত্র। সবার পিছনে ছিল দ্বারকানাথের নিজের গাড়ি, যার ভিতরে ছিলেন দ্বারকানাথের বার্তাবাহক আর পরিচারকবৃন্দ।

"সমাধিক্ষেত্রে শবাধার নামিয়ে দেওয়ার পর শবযাত্রীরা ফিরে যাবার উদ্যোগ যখন করছিলেন, নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুরোধ করলেন সমাধিকক্ষের ছাদ বসাবার আগে কেউ যেন চলে না যান। বলা বাহুল্য সবাই তখন ফিরে আসেন। ছাদ বসাতে বেশ একটু সময় লাগল। অবশেষে একটি বিরাট প্রস্তরখণ্ড দিয়ে সমাধিকক্ষের মাথাটা ঢেকে দেওয়া হল। অতঃপর শবযাত্রীরা যে-যার গাড়ি চড়ে সমাধিক্ষেত্র ত্যাগ করলেন।

"পরলোকগতের পুত্র ভারতীয় ধরনে কালো রঙের কুর্তা-পাজামা পরিধান করেছিলেন।

মোহনলাল ও অন্যান্য ভারতীয়েরা সচরাচর যেমন পোশাক পরে থাকেন, তেমনি বর্ণাঢ্য দেশীয় পোশাকে এসেছিলেন।

"যে-শবাধাবে দেহাবশেষ রক্ষিত ছিল তার চেহারাটা খুবই জমকালো ছিল। সমস্ত শবাধার মহামূল্য সিল্ক ভেলভেট দিয়ে ঢাকা। শবাধারের গায়ে ছিল রুপোর ফুল, ঢাকনির উপরে ছিল দু-খানি রুপোর পাত— একটিতে বাংলা ভাষায় লেখা ছিল মৃতের নাম ও পরিচয়, অন্যটিতে তারই ইংরাজি অনুবাদ—

বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুব

মৃত্যু : ১ অগাস্ট ১৮৪৬, বযস - ৫১ বৎসর

"শোনা যায় পরলোকগতের সুন্দব মুখাকৃতি মৃত্যুর পর একটুও বিকৃতি হয়নি বলে যাবা দেহাবশেষ শবাধাবে স্থাপন করার জন্য সাজসজ্জা করতে এসেছিল, প্রথম প্রথম তাবা বিশ্বাসই কবতে পারেনি যে ওই দেহ থেকে আত্মা বিমুক্ত। সেই অবস্থায বাবুব মুখের একটি ছাঁচ নিয়ে বাখা হয়। অতঃপব শরীব থেকে হৃদযন্ত্রটিকে বেব করে রাখা হয়, ভারতে পাঠিয়ে দেবার জন্য—যাতে বাবুর পরিবারেব ধর্মবিশ্বাস অনুসারে এই দেহাবশেষের উপযুক্ত বকম ব্যবস্থা হতে পারে।"

দ্বারকানাথ ঠাকুর/কৃষ্ণ কৃপালনী

বাজনারাযণ বসু উপনিষদের ইংবেজি অনুবাদক হিসেবে যোগ দিলেন 'তত্ত্ববোধিনী সভা'-য়, মাসে ৬০ টাকা মাইনেয়। অনুবাদ কবেছিলন কঠ, ঈশ, কেন, মুণ্ডক আর শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ।

১৮ সেপ্টেম্বর

শুক্রবাব। বিকেল ৩টেয কলকাতায এসে পৌঁছল দ্বারকানাথের মৃত্যু সংবাদ। ঐ তারিখের 'Calcutta Star Extra ordinary' পত্রিকায দ্বারকানাথের মৃত্যু সংবাদেব সঙ্গে এও লেখা ছিল—

"The heart was taken from the body to be conveyed to India."

১৯ সেপ্টেম্বর

বিদ্যাসাগব শিক্ষা-সংসদ-এব কাছে পেশ কবলেন সংস্কৃত কলেজেব সংস্কার-পরিকল্পনা।

২০ সেপ্টেম্বর

সম্ভবত এই তাবিখেই দেবেন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছে থাকবে পিতার মৃত্যু সংবাদ। দেবেন্দ্রনাথ তখন ছিলেন গঙ্গাভ্রমণে। খবব পাওয়া মাত্র ঠাকুববাড়িব স্বরূপ খানসামা দ্রুতগামী নৌকোয় রওনা হয পাটুলিব দিকে।

১১ অক্টোবর

গঙ্গার তীরে দেবেন্দ্রনাথ দাহ করলেন পিতাব কুশপুত্তলিকা।

১৫ অক্টোবর

দাহের চার দিন পরে শ্রাদ্ধ।

১৭ অক্টোবর

ভাস্কর যন্ত্রালয় থেকে উমাকান্ত ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় বেবল 'সমাচার জ্ঞানদর্পণ' পত্রিকা। সাপ্তাহিক। ৩ বছর পরে বন্ধ।

১৯ অক্টোবর
বেঙ্গল হরকরা লিখলে

"তাঁর মৃত্যুতে নৈতিক দিক থেকে দেশের যে ক্ষতি হয়ে গেল, কয়েক প্রজন্ম পরে হয়তো তা পূরণ হতে পারে। কিন্তু এ দেশকে যাঁরা ভালোভাবে চেনেন, তাঁদের মতে 'তাঁর তুল্য ব্যক্তি' পুনরায় আবির্ভূত হবেন কি না সন্দেহ।"

২৪ অক্টোবর
বেঙ্গল হরকরা-য় বিরাট সম্পাদকীয়।

১৬ নভেম্বর
কাশীপ্রসাদ ঘোষ বের করলেন 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সিয়ার' নামের ইংরেজি সাপ্তাহিক। পুরোপুরি দেশীয়দের পরিচালনায় প্রথম ইংরেজি পত্রিকা এটিই। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' আর 'বেঙ্গলী'র প্রবর্তক-সম্পাদক গিরীশচন্দ্র ঘোষ, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল প্রমুখদের সাংবাদিকতার হাতে-খড়ি এই পত্রিকাতেই।

ডিসেম্বর
টাউন হলের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল দ্বারকানাথের স্মৃতিতে স্থায়ী তহবিল গড়ার প্রস্তাব। আলফ্রেড জাহাজে ডেভিড হেয়াবেব ৬ ফুট মূর্তি এসে পৌঁছল কলকাতায়।

২ ডিসেম্বর
টাউন হলে বিকেল ৪টেয় দ্বাবকানাথের মৃত্যুতে বিরাট শোকসভা। আহ্বাযক কলকাতার শেরিফ।

৬ ডিসেম্বব
শিক্ষক, ধর্মপ্রচারক আব বহুভাষাবিদ মহর্ষি নগেন্দ্রনাথ ভাদুড়ীর জন্ম হাওড়ার পায়বাটুলিতে। বাবা, পার্বতীচরণ।

১১ ডিসেম্বর
চুঁচুড়ার কদমতলায় সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবাবে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের জন্ম। বাবা, গঙ্গাচরণ।

১৮৪৭

বছরের প্রধান ঘটনাবলী

বেরলো বিদ্যাসাগবেব 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'। যদিও মৌলিক রচনা নয়, তবুও এটিই বিদ্যাসাগরেব লেখা প্রথম বই। তখন তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেব শিক্ষক। ছাত্রদের বাংলা বই পড়াতে গিয়ে দেখলেন, পাঠযোগ্য বইযের একান্তই অভাব। যেগুলো পড়ানো হয়, তা একদিকে যেমন দুর্বোধ্য, অন্যদিকে তেমনি আদিরসাত্মক। মার্শাল সাহেব তখন ঐ কলেজের সেক্রেটারি। তাঁবই উৎসাহে বিদ্যাসাগর বইটি লিখলেন হিন্দী 'বৈতাল পচীসী' অবলম্বনে। সাহিত্য-সাধক-চবিতমালায় এ-বইয়েব বিববণ প্রসঙ্গে জানাচ্ছে, মার্শাল মহোদয়েব আদেশে বইটিব দ্বিতীয় সংস্করণ বেবয় দু বছরেব মধ্যে। নতুন সংস্কবণেব ভূমিকায় বিদ্যাসাগব লিখলেন—

> "যৎকালে প্রথম প্রচাবিত হয়, আমাব এমন আশা ছিল না, বেতাল পঞ্চবিংশতি সর্বত্র পরিগৃহীত হইবেক। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে, বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলনকাবী ব্যক্তিমাত্রেই আদরপূর্বক গ্রহণ কবিযাছেন এবং এতদ্দেশীয় প্রায সমুদায় বিদ্যালযেই প্রচলিত হইয়াছে।"

বিদ্যাসাগব যতটা সহজ ভঙ্গিতে কথাগুলো লিখেছেন, আসল ঘটনা তাব চেয়ে ঢের বেশি জটিল। সম্প্রতি বেরনো স্বপন বসু-র 'সমকালে বিদ্যাসাগর' বইটি এখন আমাদেব জানিযে দিচ্ছে সেই জটিলতার ইতিবৃত্ত। বইটি বেরনোর পর কলেজ কর্তৃপক্ষ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যাযের কাছে জানতে চান এটিকে কলেজের পাঠ্যবই হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে কিনা। কৃষ্ণমোহনের মতামত বইটির স্বপক্ষে যায় নি। বিদ্যাসাগর নিজে উদ্যোগী হয়ে প্রশংসাপত্র জোগাড় করলেন শ্রীরামপুরের মিশনারি জন ক্লার্ক মার্শম্যানের কাছ থেকে। কলেজ বইটিকে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে মেনে নিল। এরপর মার্শালের অনুরোধে সরকারি কর্তৃপক্ষ চাইলেন বইটিকে এদেশের বিভিন্ন স্কুল-কলেজে ছড়িয়ে দিতে। কিন্তু প্রথম বাধা

এল হিন্দু কলেজ থেকে। হিন্দু কলেজের সেক্রেটারি রসময় দত্ত পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, অচল। কেননা—

> "it contained a collection of hackneyed and somewhat indecent fables quite unsuited for the purpose."

এরপর সরকারি কর্তৃপক্ষ জানতে চাইলেন স্বয়ং মার্শালের মতামত। মার্শাল উড়িয়ে দিলেন ভাষার জটিলতা আর আদিরসের অভিযোগ। তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত—

> "it may safely be put into the hands of those youths who can be trusted with the works of Shakespeare and Pope. to say nothing of Horace and Ovid."

সবকারি কর্তৃপক্ষ এরপব খানিকটা চাপ দিয়েই হিন্দু কলেজকে বাজী করালো বইটিকে পাঠ্য হিসেবে মেনে নিতে।

> "লক্ষ্য করবার বিষয, 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' সম্পর্কে সমকালের বাঙালী সমাজের বিরূপ ধারণাকে দূর কবার জন্য বিদ্যাসাগরকে বারবার বিদেশিদের শরণাপন্ন হতে হয়েছে। মার্শম্যান এবং মার্শালেব অকুণ্ঠ সহযোগিতা না পেলে এটি পাঠ্য পুস্তক হিসাবে সর্বত্র চালু হতে পাবত কিনা সন্দেহ। বিনা কাবণে বিদ্যাসাগর যে নিজের ঘরে মার্শালের প্রতিকৃতি রাখেননি, তা বোঝাই যাচ্ছে।
>
> পাঠ্য পুস্তক হিসেবে চালু হলেও, এই বইয়েব বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উঠেছিল, বিদ্যাসাগর সেগুলিকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করতে পাবেননি। দ্বিতীয় সংস্কবণের 'বিজ্ঞাপনে' তাই তিনি উল্লেখ করেন, 'যে যে স্থান কোনও অংশে অপরিশুদ্ধ ছিল, পবিশোধিত হইয়াছে এবং অশ্লীল বাক্য ও উপাখ্যানভাগ পরিত্যক্ত হইয়াছে।' তা হবার পর সরকার এটিকে জুনিয়র স্কলাবশিপ পরীক্ষার পাঠ্যতালিকাভুক্ত করেন। দ্বিতীয় সংস্করণে ভাষার জড়তা কাটিয়ে ওঠার জন্য দীর্ঘ সমাসবহুল পদ ত্যাগ করলেও, 'প্রাড়বিবাক', 'মলিম্লুচ', 'বৈযর্থ্য', 'মহানস' প্রভৃতি আভিধানিক শব্দের মায়া বিদ্যাসাগর ত্যাগ করতে পারেন নি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাই সংস্কৃত ঘেঁষা এই বইটির ভাষাকে 'বাংলা না বলে সংস্কৃতও বলা যেতে পারে' বলে মন্তব্য করেন।"

সমকালে বিদ্যাসাগর/স্বপন বসু

এই বছবেই বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারেব সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করলেন সংস্কৃত যন্ত্র নামে একটা ছাপাখানার। দুজনের কারুরই টাকা না থাকায় ৬০০ টাকা ধার করতে হয়েছিল আর-এক বন্ধু নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা শোধ করার সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছেন দেখে মার্শাল সাহেব পরামর্শ দিয়েছিলেন ভালো কাগজে ভালো অক্ষবে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' ছাপতে। ঐ বই তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্য। সেভাবে ছাপা হলে তিনি ঐ কলেজের জন্যে ১০০ কপি কিনে নিয়ে দেনা শোধ করার টাকাটা পাইয়ে দিতে পারেন সহজেই। বিদ্যাসাগব কৃষ্ণনগর রাজবাড়ি থেকে 'অন্নদামঙ্গল'-এর মূল পাণ্ডুলিপি আনিয়ে নিজের ছাপাখানা থেকে বের করেছিলেন ঐ বইয়ের নতুন সংস্করণ। পরে নিজের ছাপাখানার বইপত্র বিক্রির জন্যে খুলেছিলেন 'সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটারী' নামে একটা বইয়ের দোকানও।

স্বাধীনভাবে শিক্ষাদানের ইচ্ছেয় 'চন্দননগর সেমিনারী' নামে একটা ইংরেজি স্কুলের প্রতিষ্ঠা করলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, হিন্দু হিতার্থী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের চাকরি ছেড়ে দিয়ে। ১৮৪৭-৪৯-এর মধ্যে বেরবে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশাল কাজ 'বিদ্যাকল্পদ্রুম'-এর ষষ্ঠ থেকে ত্রয়োদশ খণ্ড।

এশিয়াটিক সোসাইটি স্থির করলে সরকারের কাছ থেকে পাওয়া সাহায্যের টাকায় বের করবে 'বিবলিওথিকা ইন্ডিকা' পর্যায়ে প্রাচীন সব গ্রন্থ।

কলকাতার বাইরে আর মিশনারি বা অন্য কোনো আধা-সরকারি উদ্যোগের বাইরে স্থানীয় মানুষের উদ্যোগে বাংলাদেশে প্রথম প্রকাশ্য বালিকা বিদ্যালয় গড়ে উঠল বারাসতে, প্রধানত প্যারীচরণ সরকারের নেতৃত্বে। অবশ্য আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছিলেন দুজন স্থানীয় শিক্ষিত সুপণ্ডিত মানুষের কাছে। কালীকৃষ্ণ আর তাঁর অগ্রজ নবীনকৃষ্ণ মিত্র।

> "ব্রাহ্মণ অধ্যাপক বহুল গণ্ডগ্রাম বারাসতে ঐ দেশাচার বিরুদ্ধ নব অনুষ্ঠানের জন্য প্যারীবাবু প্রমুখ ঐ বালিকা-বিদ্যালয়ের স্থাপনকর্ত্তাগণকে কত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিতে হইয়াছিল, কত লাঞ্ছনা-নিগ্রহ ভোগ করিতে হইযাছিল। প্যাবীবাবু, নবীনকৃষ্ণবাবু এবং বালিকা-বিদ্যালয়ের শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিগণ বারাসতে সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। এমন কি বারাসত-বিদ্যালযের তৎসাময়িক দ্বিতীয় শিক্ষক হরিদাসবাবুও প্যারীবাবুব বিপক্ষ দলে যোগদান কবিয়াছিলেন। পাঠকের যেন স্মরণ থাকে যে সময়ে স্ত্রীলোকে লেখাপড়া শিখিলে বিধবা হয়, জাতি যায় প্রভৃতি কুসংস্কার বঙ্গীয় পল্লীবাসিগণের অন্তবে বদ্ধমূল ছিল। এমন কি একজন সম্ভ্রান্ত ইংবাজ কর্ম্মচারী সস্ত্রীক বারাসতেব বালিকা বিদ্যালয় পবিদর্শনার্থ আসিয়া একটি দুগ্ধপোষ্যা বালিকাব চিবুকে হাত দিযা আদর কবাতে জাতিনাশ আশঙ্কা করিযা বারাসতবাসিগণ ঘোটমঙ্গল বসাইযাছিলেন।"

প্যারীচবণ সবকাব/নবকৃষ্ণ ঘোষ

বারাসতেব এই বালিকা-বিদ্যালয় নিজেব চোখে দেখতে এসেছিলেন বেথুন সাহেব। সম্ভবত এখান থেকেই প্রেরণা, দু বছর পরে কলকাতায় 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল' গডে তোলাব। বেথুনের মৃত্যুর পর নাম বদলিয়ে যা 'বেথুন স্কুল।'

১৮৪২-এ নিজের 'বিদ্যাদর্শন'-এ স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের পক্ষে লেখা এক প্রবন্ধে অক্ষয়কুমার দত্তের আবেদন ছিল—

> "স্ত্রীবিদ্যার উন্নতিকল্পে দেশ হিতৈষী জন-সমূহেব যুক্ত সাহায্য ভিন্ন অন্য কিছুই শুভকর বোধ করি না...।"

বারাসতেই সেই শুভকর উদ্যোগেব প্রথম বলিষ্ঠ সূচনা।

নিজেব বাড়িতে কেশবচন্দ্র সেন গড়লেন 'গুডউইল ফ্রাটার্নিটি' নামেব ধর্মীয সংস্থা। টিকে ছিল মাত্র দুবছর। কেশবচন্দ্র এখানে পাঠ কবে শোনাতেন বিভিন্ন দার্শনিক রচনা। পরে নিজে বক্তৃতা করতেন ইংরেজিতে।

চব্বিশ পরগনার রাহুতা গ্রামে বাংলা সাহিত্যেব উদ্ভট রসেব লেখক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম। বাবা, বিশ্বম্ভর।

গোপাল উড়ে ও দাশরথী রায়, সংগীত জগতের দুই দিকপালের মৃত্যু।

ইউনিযন ব্যাঙ্ক উঠে গেল। 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সিয়াবে' ছাপা হযেছিল এই নিযে গান।

রাইটার হিসেবে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগ দিলেন রিচার্ড টেম্পল।

নদীয়াব শান্তিপুরে রামনাথ তর্করত্নের মৃত্যু। বাবা, কালিদাস বিদ্যাবাগীশ।

'ডোয়ার্কিন' অ্যাণ্ড সন্স' নামের বিখ্যাত বাদ্যযন্ত্রের দোকানেব প্রতিষ্ঠাতা দ্বারকানাথ ঘোষ-এর জন্ম চব্বিশ পরগনার শুকদেবপুরে। ব্রাহ্ম না হযেও ব্রাহ্মসমাজে নিয়মিত যাতায়াত ছিল তাঁর। ছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর বন্ধু। বাবা, রামচন্দ্র।

অন্নদাপ্রসাদ বাগচীর সমসাময়িক প্রখ্যাত কাঠখোদাই শিল্পী ত্রৈলোক্যনাথ দেব-এর জন্ম বারুইপুরে। 'ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও' থেকে বেরনো সরস্বতীর ছবির অনুকরণে দ্বিজেন্দ্রনাথ

ঠাকুরের 'ভারতী' পত্রিকার প্রচ্ছদ তাঁরই খোদাই করে দেওয়া।
জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছেলে গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর দেবেন্দ্রনাথের বড়ো মেয়ে সৌদামিনী দেবীর জন্ম।

জানুয়ারি
সংস্কৃত কলেজে স্থাপন করা হল ডেভিড হেয়ারের মূর্তি।

৩১ জানুয়াবি
ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতা, 'সখা' নামের শিশু পত্রিকার সম্পাদক, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'-এব লেখক শিবনাথ শাস্ত্রীর জন্ম মজিলপুব চাংড়িপোতা গ্রামে মামার বাড়িতে। বাবা, হবানন্দ ভট্টাচার্য। মাতামহ হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন যুক্ত ছিলেন 'সংবাদ প্রভাকর'-এর সঙ্গে।

ফেব্রুয়াবি
'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সম্পাদকের পদ থেকে পদত্যাগ করলেন অক্ষয়কুমার দত্ত।

১০ ফেব্রুয়াবি
চট্টগ্রামের নোয়াপাড়ায় কবি নবীনচন্দ্র সেনের জন্ম। বাবা, গোপীমোহন।
এ মাসেব গোড়ার কোনো তারিখে বিদ্যাসাগর পদত্যাগ পেশ কবলেন সংস্কৃত কলেজের চাকবি থেকে, সেক্রেটারি রসময় দত্তের সঙ্গে সংঘাতের ফলে।

এপ্রিল
হাটখোলার দত্ত বংশের অভয়াচরণ দত্তের মেয়ে নিস্তারিণী দেবীর সঙ্গে রাজনাবায়ণ বসুব দ্বিতীয় বাবেব বিয়ে। প্রথমবারের বিয়ে হয়েছিল ১৮৪১-এ 'সেয়ালদহে'র রামমোহন মিত্রের মেয়ে প্রসন্নদেবীব সঙ্গে। রাজনারায়ণ তখন হিন্দু স্কুলের ছাত্র। বয়স ১৭।

> "কলেজ পরিত্যাগ করিবার পরই আমার প্রথমা স্ত্রী ও তৎপবে আমার পিতাঠাকুরের মৃত্যু হয়। আমার প্রথমা স্ত্রী জলে ডুবিয়া মরেন। তিনি পল্লীব বালিকাদিগেব সঙ্গে তাঁহার পিত্রালয়ের খিড়কীব পুষ্করিণীতে সাঁতাব শিক্ষা করিতেন। সাঁতাব দিতে দিতে তলিয়া যান।"
>
> আত্মচরিত

৫ এপ্রিল
সম্ভ্রান্ত সমাজপতি নন্দলাল বসুর জন্ম বাগবাজাব স্ট্রিটে।

১০ এপ্রিল
সংস্কৃত কলেজের ১৩ জন পণ্ডিত ও শিক্ষক সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ রসময় দত্ত আর শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারি মৌয়াট সাহেবের কাছে দুটো আলাদা আবেদন পত্র পাঠালেন যাতে তাড়াহুড়ো করে গৃহীত না হয় বিদ্যাসাগরের পদত্যাগপত্রটি। নিজের স্বার্থে না হলেও, বিদ্যালয়ের স্বার্থেই বিদ্যাসাগরকে তাঁদের প্রয়োজন। তাঁর অভাবে ঐ কলেজে অপূরণীয় ক্ষতি

হওয়ার সম্ভাবনা। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি এই কলেজের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় এমন সব সংস্কার ঘটিয়েছেন যা আগের চেয়ে অনেক বেশি দৃঢ়।

এই আবেদনপত্রের স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন—

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ভারতচন্দ্র শিরোমণি, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, রায়গোবিন্দ তর্করত্ন, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, যোগধ্যান মিশ্র, রসিকলাল সেন, শ্যামাচরণ সরকার।

২১ এপ্রিল

সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি রসময় দত্ত বিদ্যাসাগরকে চিঠি দিলেন তাঁর পদত্যাগের কারণগুলো বিশদ করে জানাতে ব'লে।

মে

হরিমোহন গোস্বামী বের করলেন 'হিন্দু ধর্ম চন্দ্রোদয়' পত্রিকা। ব্রাহ্মদের বিরুদ্ধে আক্রমণটাই প্রধান লক্ষ্য। চলেছিল মাত্র এক বছর।

৩ মে

রসময় দত্তের চিঠির জবাব পাঠালেন বিদ্যাসাগর।

> "সব সময় আমি আপনার অনুমতি বা অনুমোদনের অপেক্ষা করে হয়ত সব কাজ করতে পারি নি। তার কারণ, আপনার বাইরের কাজের ঝামেলা এত বেশি যে আপনি কলেজেই নিয়মিত আসতে পারেন না। বাধ্য হয়ে আমাকে তাই পরীক্ষকদের মতামতের উপর নির্ভর করে কাজ করতে হয়েছে, কিন্তু আপনি সেটা সুনজরে দেখেন নি। গত এক বছরের মধ্যে বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি আমি যথাসাধ্য পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছি, ছাত্রদের সুশিক্ষার জন্য।...তার জন্য কত পরিশ্রম যে আমাকে করতে হয়েছে তা হয়তো কিছুটা আপনি বুঝতে পারেন। বিদ্যালয়ের পণ্ডিতেরা সকলেই সেকথা জানেন, ছাত্ররাও জানে। দুঃখের বিষয়, এত সব ব্যাপার হয়েছে, অথচ আপনি সে সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন।...আমার ইচ্ছা ছিল পুজোর তিন সপ্তাহ ছুটির পরে কলেজ খুললেই নতুন শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা। আপনি প্রথমে পরিকল্পনাটি আগাগোড়া পড়ে একদিন আমাকে বলেন যে ওটা সংসদে পাঠাবার প্রয়োজন নেই, কারণ নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার ক্ষমতা আপনার আছে এবং প্রয়োজন বুঝলে আপনি নিজেই তা করবেন। পুজোর ছুটির পরে আমি যখন আপনাকে বললাম নতুন পাঠ্য বিষয় চালু করতে, তখন আপনি বললেন যে, কেবল ব্যাকরণশ্রেণীর পাঠ্য সম্বন্ধে আপনি নিজে দায়িত্ব নিতে পারেন, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা সংসদের অনুমতি ছাড়া কিছু করা সম্ভব হবে না। তারপর একদিন আপনি আমার পরিকল্পনার খসড়াটি হাতে করে এনে বললেন যে কোনো বিষয়ে, এমনকি ব্যাকরণ সম্বন্ধেও, সংসদের অনুমতি ছাড়া কিছু করা যাবে না, এবং সেইজন্য সংসদে আপনি কেবল ব্যাকরণের অংশটি আলাদা করে পাঠাতে চান। আমি তখন আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করি সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটি পাঠাবার জন্য, কিন্তু আপনি তা পাঠান নি। আমাকে আপনি বুঝিয়ে দেন যে এত দীর্ঘ রিপোর্ট সংসদ পড়বে না, অতএব খানিকটা অংশ পাঠানোই ভাল। অতঃপর ১৩ অক্টোবর (১৮৪৬) আপনি ব্যাকরণের অংশটি পাঠান, কিন্তু তার ভিতর থেকেও আমার প্রস্তাবিত তিনখানি পাঠ্যপুস্তক বাদ দিয়ে তাকে বিকলাঙ্গ করেন।..."

রসময় দত্ত জজিয়তির ফাঁকে ফাঁকে খানিকটা করে সময় দিতেন সংস্কৃত কলেজকে। রসময়

দত্তের কাছে কলেজের দায়িত্বটা ছিল নিছক একটা চাকরি। আর বিদ্যাসাগরের এই চাকরিটাই তাঁর আদর্শ শিক্ষায়তন গড়ে তোলার মাধ্যম। রসময় দত্তের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বা সংঘর্ষ ব্যক্তিগতের ঊর্ধ্বে একটি সুনির্দিষ্ট আদর্শকে কেন্দ্র করেই। রসময় দত্ত চান ক্ষমতার উপভোগ। বিদ্যাসাগর চান শিক্ষার উজ্জীবন। তাঁর মতো কর্মোন্মাদ মানুষ যে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কৃপাপ্রার্থী হয়ে যান্ত্রিক নিয়মের ঘানি টেনে চলবে না চোখ বুজিয়ে, রসময় দত্ত বিদ্যাসাগর-চরিত্রের সেই ব্যক্তিস্বরূপকে বুঝতে পারেন নি তখনো।

> "রসময়বাবু Small Cause Court-এর জজ ছিলেন; তিনি প্রত্যহ বেলা ৩টার সময় কলেজে আসিতেন ও ঘণ্টাখানেক সব কাগজ-পত্র ও ক্লাসগুলি দেখিতেন। তাঁহার সহকারী সম্পাদক ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়; তিনি সমস্ত দিনই কলেজে থাকিতেন। সেক্রেটারি হিসাবে রসময় বাবুর মাসিক বেতন ছিল একশত টাকা, বিদ্যাসাগর মহাশয় পাইতেন পঞ্চাশ টাকা মাত্র।"
>
> পুরাতন প্রসঙ্গ/কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য

২৮ মে

তত্ত্ববোধিনী সভা-র অধিবেশনে স্থির হল রামমোহন-প্রবর্তিত 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম'কে এখন থেকে সংক্ষেপে বলা হবে—'ব্রাহ্ম ধর্ম'। এরপর তিন বছর পরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখবেন 'ব্রাহ্মধর্ম' ও 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' নামের দু খানি বই।

১ জুন

মেডিকেল কলেজের থিয়েটার হলে হেয়ারের পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী সভা। সভাপতি, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। হেয়ারের জীবন নিয়ে আলোচনা, পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের।

২৩ জুন

আনন্দমোহন বসুর জন্ম ময়মনসিংহের জয়সিদ্ধি গ্রামে, বাবা, পদ্মলোচন।

৩ জুলাই

ডাঃ ম্যাকক্লিল্যাণ্ডের অধীনে বোটানিক্যাল গার্ডেনে মালীর ছেলেদেরও উদ্যান-বিদ্যা সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে গড়া হল আরো একটা স্কুল।

১৬ জুলাই

গৃহীত হল বিদ্যাসাগরের পদত্যাগ পত্র। তারানাথ তর্কবাচস্পতিকে কাজের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলেন তিনি। মাইনে পেতেন পঞ্চাশ টাকা। এরকম মাইনের একটা চাকরি কেউ ঝগড়া করে ছেড়ে দিতে পারে সত্যি সত্যি তা ছিল রসময় দত্তের অনুমানের বাইরে। তাই আড়ালে আবডালে বলতেন, 'বিদ্যাসাগর যে চাকরিটা ছেড়ে দিলে, এখন খাবে কি?'
বিদ্যাসাগরের কানে সে খবর পৌঁছলে তাঁর উত্তর, 'রসময় বাবুকে বোলো, বিদ্যাসাগর আলু পটল বেচে খাবে।'

অগাস্ট

উমাচরণ ভদ্র বের করলেন 'হিন্দু বন্ধু' নামের মাসিক পত্রিকা, খৃস্টধর্মের বিরুদ্ধাচরণে।
সংস্কৃত কলেজ থেকে ডেভিড হেয়ারের মূর্তি সরিয়ে আনা হল প্রেসিডেন্সি কলেজের মাঠে।

২৮ অকটোবর

অমৃতবাজার পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মতিলাল ঘোষ-এর জন্ম যশোহরের পালুয়া মাগুরা গ্রামে। বাবা, হরিনারায়ণ।

১ ডিসেম্বব

ক্যাপটেন রিচার্ডসন অধ্যক্ষ হলেন হুগলি কলেজের।

৩ ডিসেম্বর

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সারস্বত সমাজের যুগ্ম সম্পাদক, 'সাধনা'-র লেখক, শিক্ষক, সাহিত্যিক, 'ইণ্ডিয়ান মিরর' ইত্যাদি একাধিক পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণবিহারী সেন-এর জন্ম কলকাতায়। বাবা, প্যারীমোহন।

২৫ ডিসেম্বর

গভর্নর জেনারেল হার্ডিঞ্জ-এর স্মৃতি স্থাপনেব উদ্দেশ্যে টাউন হলে জনসভা।

> "তাহাতে টর্টন (Turton) হিউম (Hume) কলভিল (Colvile) প্রভৃতি কতিপয় সুবাগ্মী প্রসিদ্ধ ইংবাজ বারিস্টাব প্রস্তর নির্মিত মূর্তি প্রভৃতি স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনেব বিরোধী হইয়া দণ্ডায়মান হন। হার্ডিঞ্জ বাহাদুর এদেশে শিক্ষা বিস্তারেব বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন, এজন্য এদেশীয়গণ তাঁহার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ ঐ সভাতে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা যখন দেখিলেন যে উক্ত ইংরাজগণের প্রতিকূলতাবশতঃ প্রস্তাবটি নষ্ট হইবাব উপক্রম হইয়াছে, তখন তাঁহাবা এক সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। প্রথমে ইংবাজগণ হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যখন রামগোপালের প্রজ্বলিত অগ্নিময় তেজময় ও ওজস্বিনী ভাষা জাগিয়া উঠিল, তখন সকলেই মৌনাবলম্বন করিয়া শুনিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বামগোপালের অদ্ভুত বক্তৃতা-শক্তি সমগ্র সভাকে অভিভূত করিল; এবং অবশেষে অধিকাংশের মতে তাঁহারই প্রস্তাব গৃহীত হইল। তাহার ফল স্বরূপ হার্ডিঞ্জ বাহাদুরের অশ্বারোহী মূর্তি এখন গবর্নমেণ্ট হাউসের সম্মুখস্থ ময়দানে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই বক্তৃতা এরূপ ওজস্বিনী হইয়াছিল যে পবদিন ইংরাজদিগের মুখপত্র স্বরূপ প্রধান সংবাদপত্র লিখিল— "ভারতবর্ষে একজন ডিমস্থিনিস দেখা দিয়াছে, একজন বাঙ্গালি যুবক তিনজন সুদক্ষ ইংবাজ বারিস্টারকে ধরাশায়ী করিযাছে"।"

২৯ ডিসেম্বর

কাউকে কিছু না জানিয়ে লেডি সেইল নামের জাহাজে চেপে মাইকেল মধুসূদনের মাদ্রাজ যাত্রা। কারণ একাধিক। প্রথমত ছেলের আচরণে বিরক্ত বাবা বন্ধ করে দিয়েছিলেন আর্থিক সাহায্য। বাবার দেওয়া ১০০ টাকাতেই চলত না তাঁর। অতিরিক্ত খরচের টাকা গোপনে জোগাতেন মা। কখনো আবার নিজের পড়াশোনার বই বন্ধক রেখেও জোগাড় করেছেন তা। নিজেই বলতেন—"I was the neediest rascal in the Bishop's College: I used to pawn my books." দ্বিতীয়ত, হতে চেয়েছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। বাংলা গভর্নমেণ্টের তখনকার প্রধান সেক্রেটারি, পরে ছোটলাট, ফ্রেডারিক হ্যালিডের সঙ্গে দেখা করে জানিয়েছিলেন আবেদনও। কিন্তু ব্যাপারটা বেশ সময়সাপেক্ষ জেনে হতাশ হয়ে পড়েন তিনি। তখনই দ্রুত সিদ্ধান্ত মাদ্রাজ পাড়ির। পিছনে সহপাঠী কিছু মাদ্রাজী ছাত্রের উৎসাহ কাজ করেছে বলেই তাঁর জীবনীকারদের অনুমান।

১৮৪৮

তিন-চার বছর মেদিনীপুরে থাকার পর দুই ভাই সঞ্জীবচন্দ্র আর বঙ্কিমচন্দ্রকে ফিরে আসতে হল কাঁঠালপাড়ায়। জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা দেওয়া হল না সঞ্জীবচন্দ্রের। কাঁঠালপাড়ায় ফিবে আসার কারণ বাবা যাদবচন্দ্রের বদলি হওয়া। ফিরে আসার পর ঠিক হল যে, সামনের বছরে নতুন 'সেশন' খুললে হুগলি কলেজে ভর্তি করে দেওয়া হবে বঙ্কিমকে। আপাতত তাঁর পড়াশোনাব জন্যে রাখা হল একজন প্রাইভেট টিউটর।

কাঁঠালপাড়ায় তাঁর দিনযাপনের নানান টুকরো ছবি আমরা পেয়ে যাই পূর্ণচন্দ্রের 'বঙ্কিমের বাল্যশিক্ষা'-য়।

এখানে এসে শিখলেন অনেক সংস্কৃত শ্লোক আর বাংলা কবিতা। বড়দা শ্যামাচরণের বৈঠকখানায় সন্ধের পর জমায়েত হতেন বিস্তর লোক। তারই মধ্যে একজন ছিলেন সংস্কৃত-পণ্ডিত। প্রায়ই আবৃত্তি করতেন সংস্কৃত কবিতা। শুনতে ভালো লাগলেই বঙ্কিম কণ্ঠস্থ করে নিতেন সেটা। নিজে আবৃত্তি করতেন যেসব কবিতা, তা বেশির ভাগই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনা। তিনিই তখন বাংলাদেশের প্রধান কবি। বাড়িতে নিয়মিত আসত 'সংবাদ প্রভাকর' আর 'সংবাদ সাধুবঞ্জন'। প্রভাকর থেকেই পেয়ে যেতেন ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা।

বালক বয়স থেকেই বঙ্কিম ঈশ্বরচন্দ্রের ভক্ত পাঠক। তাঁর জন্মের ৭ বছর আগে, ১৮৩১-এর ১৮ জানুয়ারি, সাপ্তাহিক 'সংবাদ প্রভাকর'-এর আত্মপ্রকাশ। পরের বছরের জানুয়ারিতে প্রভাকর-এর সম্পাদক পদ ছেড়ে দিয়ে, নেপথ্য সম্পাদক থেকে, বের করলেন অন্য আর এক পত্রিকা 'সংবাদ রত্নাবলী'। কিন্তু খুব বেশি দিন যুক্ত ছিলেন না ঐ পত্রিকার সঙ্গে। ১৮৩৬-এর ১০ আগস্ট থেকে আবার বেরতে থাকবে প্রভাকর, তাঁরই সম্পাদনায়। এবার সাপ্তাহিকের বদলে বারত্রয়িক, অর্থাৎ সপ্তাহে তিনবার। বঙ্কিমের জন্মের পরের বছর, ১৮৩৯-এর ১৪ জুন থেকে 'সংবাদ প্রভাকর' দৈনিক পত্রিকা। মাঝখানে বের করেছিলেন 'পাষণ্ড পীড়ন'। পরে 'সংবাদ সাধুরঞ্জন'। প্রথম বারের 'প্রভাকর' প্রকাশের পিছনে, অর্থ আর উৎসাহ দুটো দিয়েই, প্রবল পৃষ্ঠপোষকতা ছিল পাথুরেঘাটার ঠাকুর পরিবারের যোগেন্দ্রমোহনের। ঈশ্বরচন্দ্র

তাঁর কাগজে জানিয়েওছিলেন সেকথা।

"বাবু যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সম্পূর্ণ সাহায্যক্রমে প্রথমে এই প্রভাকর পত্র প্রকটিত হয়। তখন আমাদিগের যন্ত্রালয় ছিল না, চোরাবাগানে এক মুদ্রাযন্ত্র ভাড়া করিয়া ছাপা হইত। ৩৮ সালের শ্রাবণ মাসে পূর্বোক্ত ঠাকুর বাবুদিগের বাটীতে স্বাধীনরূপে যন্ত্রালয় স্থাপিত করা যায়। তাহাতে ৩৯ সাল পর্য্যন্ত স্বাধীন যন্ত্রে অতি সম্ভ্রমের সহিত মুদ্রিত হইয়াছিল।"

যোগেন্দ্রমোহন ছাড়া প্রেরণা ছিল আরো একজনের। তিনি সংস্কৃত কলেজের অলংকারশাস্ত্রের অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ। ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে তাঁর ছিল নিবিড় বন্ধুত্ব। দুজনে লুকিয়ে শুনতে যেতেন কবিগান বা কবির লড়াই। সংবাদ প্রভাকর-এর দু-দফায় দু রকম 'মোটো' তাঁরই লিখে দেওয়া।

প্রথম বারে—

"সতাং মনস্তামরস প্রভাকরঃ
সদৈব সর্বেষু সমপ্রভাকরঃ" ইত্যাদি।

দ্বিতীয় দফায়—

"নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু ক্বচিদ্ভ্রামং-
ভ্রাম মতন্দ্রমীযদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ" ইত্যাদি।

বালক বঙ্কিম যখন প্রৌঢ়ত্বের দরজায়, আর সাহিত্যস্রষ্টা হিসেবে সর্বজনমান্য, তখন, ১৮৮৫-তে, নিজের হাতে তুলে নেবেন ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতা সংগ্রহ সম্পাদনার ভার। গুরুর জীবনকাহিনীর সূত্রে সেখানে অভ্রান্তরূপেই এসে যাবে প্রভাকর প্রসঙ্গ।

"বাঙ্গালা সাহিত্য এই প্রভাকর-এর নিকট বিশেষ ঋণী। মহাজন মরিয়া গেলে খাতক আর বড় তার নাম করে না। ঈশ্বর গুপ্ত গিয়াছেন। আমরা আর সে ঋণের কথা বড় মুখে আনি না। কিন্তু একদিন প্রভাকর বাঙ্গালা সাহিত্যের হর্তা-কর্তা-বিধাতা ছিলেন। প্রভাকর বাঙ্গালা রচনার রীতি অনেক পরিবর্ত্তন করিয়া যান।... ঈশ্বর গুপ্তের নিজের কীর্ত্তি ছাড়া প্রভাকরের শিক্ষানবিশদিগের একটা কীর্ত্তি আছে। দেশের অনেকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক প্রভাকরের শিক্ষানবিশ ছিলেন। বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় একজন। বাবু দীনবন্ধু মিত্র আর একজন। শুনিয়াছি বাবু মনোমোহন বসু আর একজন। ইহার জন্যও বাঙ্গালার সাহিত্য, প্রভাকরের নিকট ঋণী। আমি নিজে প্রভাকরের নিকট বিশেষ ঋণী। আমার প্রথম রচনাগুলি প্রভাকরে প্রকাশিত হয়।"

বাল্যকালে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা ছাড়াও আবৃত্তি করতেন আরও অনেকের কবিতা। যেমন ভারতচন্দ্র আর জয়দেব। ভারতচন্দ্রের 'বিঁনাইয়া বিনোদিনী বেণীর শোভায়, সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়', এটি বারবার আবৃত্তি করলেও, পূর্ণচন্দ্র জানান, ভারতচন্দ্রের রচনার খুব ভক্ত ছিলেন না তিনি। অনুরাগী ছিলেন তাঁর ছন্দেরই প্রধানত।

জয়দেব-এর 'ধীর সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী' আর এক প্রিয় কবিতা। পূর্ণচন্দ্র জানাচ্ছেন—

"কি বাল্যে, কি কৈশোরে, কি যৌবনে এই কবিতাটি তাঁহার মুখে শুনিতাম; যখন নিষ্কর্মা হইয়া বসিতেন, বাহিরের লোক কেহ ঘরে থাকিত না, তখন উহা আওড়াইতেন। ঐ কবিতাটি যে তাঁহার প্রিয় ছিল, তাহার স্মৃতি 'আনন্দমঠে' রাখিয়া গিয়াছেন।"

এ ছাড়াও আরও একটা গীত-এর খবর দিয়েছেন পূর্ণচন্দ্র।

"বাল্যকালে আপনি এই গীতটিতে মাতিয়াছিলেন। পরে আনন্দমঠের সন্তানদিগকেও

এই গীতে মাতাইয়াছিলেন। একদিন মাঘ মাসের রাত্রিশেষে এক বৈষ্ণব খঞ্জনী বাজাইয়া সদর রাস্তায় এই গান গাহিতেছিল, আমি তখন জাগ্রৎ—মধুরকণ্ঠে এই রাত্রে কে গীত গাহিতেছে শুনিয়া অগ্রজকে উঠাইলাম। অগ্রজ একটা জানলা খুলিয়া দিলে শুনিতে পাইলাম—হরে মুরারে মধুকৈটভারে, গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।"

ঈশ্বরচন্দ্র, ভারতচন্দ্র আর জয়দেব-এর কবিতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় বাল্যে। সময় অসময়-এর বাছবিচার না রেখেই নাকি চলত ঐ সব কবিতার আবৃত্তি। আবৃত্তি যেন তাঁর সত্তা-বিকাশের ভিন্ন এক মাধ্যম। যৌবনে পা দিয়ে আবৃত্তির জন্যে পেয়ে গেলেন কবিতার বদলে মহাকাব্য। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য'। পূর্ণচন্দ্রের সাক্ষ্য—

"বঙ্কিমচন্দ্র সুলেখক বলিয়া সাধারণে পরিচিত। কিন্তু তিনি যে একজন উৎকৃষ্ট পাঠক তাহা অনেকে জানেন না। অমিত্রাক্ষর ছন্দের নূতন সৃষ্টি হইলে উহার নামে আমাব গায়ে জ্বর আসিত। কিন্তু যেদিন বঙ্কিমচন্দ্রকে 'মেঘনাদবধ কাব্য' পাঠ করিতে শুনিলাম, সেইদিন হইতে আমি এই কাব্যের গোঁড়া হইলাম। ক্তবার উহা পড়িয়াছি তাহা ঠিক নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুকরণে পড়িতাম।"

মেঘনাদবধ বই হয়ে বেরোয় ১৮৬১-তে। বঙ্কিম তখন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকবিতে খুলনায়। আর সেখানে থাকবেন একটানা চারবছর। ১৮৬৫ থেকে ভায়েদের সঙ্গে মনোমালিন্যের শুরু, বাবার উইলকে কেন্দ্র করে। এই সময়ের মধ্যে কখন যে প্রাণখোলা পরিতৃপ্তিতে মেঘনাদবধ আবৃত্তি করার সুযোগ করে নিতেন তিনি, তা বেশ রহস্যেরই। তবু তাঁর এই মেঘনাদবধ আবৃত্তির সূত্রে আমরা যেন পেয়ে যাই অন্য এক রহস্য উদ্ধারের চাবিকাঠি। গোটা জীবনের লেখায় হয়তো তেমন বিশদ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন নি কাউকে। এ থেকে কী ভাবব আমরা? আমরা ঠিকঠাক মাপতে পারব তাঁর আন্তরিক কৃতজ্ঞতার ওজন? পারা যে কঠিন, মধুসূদনই তার দৃষ্টান্ত। এটা কি আমাদের বিস্ময়কে বাড়িয়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট নয় যে, কিছু টুকরো উল্লেখ আর একটি মাত্র ছোট্ট শ্রদ্ধাভারাতুর শোকোচ্ছ্বাস ছাড়া যিনি আর কিছুই লেখেননি মধুসূদনকে নিয়ে, সেই মধুসূদনের অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ রচনা তাঁর অবিরল আবৃত্তির বিষয় আর তা মুগ্ধতা জুগিয়ে চলেছে তাঁদেরও চেতনায় যাঁরা ইতিপূর্বে ছিলেন ঐ রচনার স্বাদ-গন্ধের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সন্দিগ্ধ। এ ছাড়াও আছে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের আরো নীরবতর ভঙ্গি। তাকে ছুঁতে হলে পাতা ওল্টাতে হবে তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা'-র। সে-উপন্যাসের প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদের শিরোদেশে রয়েছে স্বদেশ ও বিশ্বের সাহিত্য থেকে নানা উজ্জ্বল উদ্ধৃতি। আর সেখানে মধুসূদনের রচনা থেকে উদ্ধৃতির সংখ্যা—৬।

বঙ্কিম যখন হুগলি কলেজের ছাত্র হিসেবে ইংরেজিতে আগ্রহী হয়েও কলেজীয় পাঠ্যপুস্তকের বাইরে ভাটপাড়ায় সংস্কৃত অধ্যয়নে নিবিষ্ট, মধুসূদন তখন বাংলা ভুলে গিয়ে, ইংরেজির মাধ্যমেই খুঁজছেন আত্মপ্রকাশের ভাষা। শিশিরকুমার দাশ এই সময়ে মধুসূদনের বয়সের যে হিসেব দিয়েছেন তা কি ঠিক? লিখেছেন—

"When Bankim was studying Sanskrit in Bhatpara school, Madhusudan, then a youngman of thirty, was experimenting with English verse and had almost forgotten Bengali."

ইংরেজি কবিতায় মধুসূদনের 'একসপেরিমেণ্টের' শুরু ১৮৪২ নাগাদ। হিন্দু কলেজে পড়তে পড়তেই, আর বছরের শেষ দিকে কলেজ থেকে হঠাৎ উধাও হয়ে গিয়ে খৃস্টধর্ম গ্রহণের আগেই, 'জ্ঞানান্বেষণ', 'লিটেরারি গেজেট', 'লিটেরারি গ্লীনার'-এ ছাপা হয়ে গেছে তাঁর ইংরেজি কবিতা। ছাপা হয়েছে বিলেতের 'বেণ্টলেস ম্যাগাজিন' আর 'ব্লাকউডস ম্যাগাজিনে'।

মাদ্রাজে গেছেন ১৮৪৮-এ। সেখানে গিয়ে লিখবেন 'A Vision' আর 'ক্যাপটিভ লেডি'। তখনই তাঁর বয়স মোটে চব্বিশ।

বঙ্কিম আর মধুসূদনের মধ্যে মিল খোঁজা মিথ্যে। কিন্তু এঁদের না-মিলের মধ্যেও রয়ে গেছে একটা ছন্দের ছোঁয়া। সৃষ্টির ক্ষেত্রে মধুসূদন ইংরেজিতে শুরু করে অবশেষে ফিরেছিলেন বাংলায় আর সংস্কৃতে। বঙ্কিম শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলায় শুরু করে, ইংরেজি আর সংস্কৃতকে আয়ত্তে এনে, কবিতার ক্ষেত্রে বাংলাকে আদর্শ করেও, প্রথম উপন্যাস সৃষ্টির বেলায় বেছে নিলেন ইংরেজিকে। পরে প্রত্যাবর্তন ঘটবে বাংলায়।

আবার ফিরে যাওয়া যাক তাঁর বাল্যকালে। পূর্ণচন্দ্রের 'বঙ্কিমের বাল্যকথা'র তথ্য থেকেই জানতে পারি, বালকসুলভ খেলায় আদৌ কোনো আকর্ষণ ছিল না। তিনি ভালোবাসতেন শুধু তাস খেলাটাই। সমবয়সী কয়েকজনকে নিয়ে নিয়মিত খেলতেন একমাত্র এটাই। মেদিনীপুরেও খেলতেন। যখন হুগলি কলেজের ছাত্র তখনও খেলতেন। ষাঁড় গোরুকে ভীষণ ভয়। জানতেন না সাঁতার। শেখেন নি ঘোড়ায় চড়া।

> "কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইনিই বাল্যকালে একদিন ডাকাতির ভয় করেন নাই; কৈশোরে নদীবক্ষে ঝড়-তুফানের ভয় করিতেন না; আর যৌবনে গুলি ভরা পিস্তল গ্রাহ্য না করিয়া একজন সাহেবকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন।"

হুগলি কলেজে ভর্তি হওয়ার তাগিদে প্রাইভেট টিউটরের কাছে মন দিয়ে পড়াশোনার সঙ্গেও এই বয়সে উপভোগ করে চলেছেন বাড়ির উৎসব-পার্বণ। মেদিনীপুর থেকে ফেরা আর হুগলি কলেজে ভর্তি হওয়ার মাঝখানে এই বছরের দোলযাত্রাটির একটি চমৎকার ছবি আঁকা আছে 'বঙ্কিম জীবনী'তে। তা থেকেই জানতে পারা যায় দোলযাত্রার ধুমধামের খবর; নেড়াপোড়া, বাজি পোড়ানো, আর রাত্রের যাত্রা বা কীর্তনসহ। আর এই উৎসবের মধ্যে কীভাবে জুড়ে যেতেন বা ঘুরে ঘুরে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতেন বঙ্কিম, সেটাই আমাদের কাছে বেশি কৌতূহলের।

> "ফাল্গুনের পূর্ণিমা রাত্রি—মধুযামিনী—বঙ্কিমচন্দ্র চিরদিনই স্বভাবের সৌন্দর্য্য দেখিতে ভালবাসিতেন, আজ রাত্রে তাঁহার ভারী স্ফূর্তি,—কখনও অর্জুনা পুষ্করিণীর ধারে, কখনও গঙ্গাতীরে, কখনও বা এখানে ওখানে বেড়াইতেছেন—অবশেষে ঠাকুর বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর বাড়িতে লোকারণ্য, ভিড় ঠেলিয়া মন্দির মধ্যে তিনি প্রবেশ করিলেন। কীর্তন হইবে, চারিদিকে আলো জ্বলিতেছে। একস্থানে অনেকগুলি ভাটপাড়ার পণ্ডিত পৃথগাসনে বসিয়া আছেন। তন্মধ্যে হলধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ও ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিবামাত্র তিনি ডাকিয়া কাছে বসাইলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে বসিয়া বালক বঙ্কিমচন্দ্রকে শ্রীকৃষ্ণের অনেক কথা শুনাইতে লাগিলেন। এই উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে একটি প্রশ্ন করিলেন। প্রশ্নটি এই যে, যে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবার জন্য আপনি কষ্ট করিয়া আসিয়াছেন, যে শ্রীকৃষ্ণের নাম ইতর-ভদ্র মেয়ে পুরুষ সকলেই জপ করিতেছে, সেই শ্রীকৃষ্ণ কি ষোলশ গোপিনীর ভর্তা ছিলেন? তিনি গোপিনীদিগের বস্ত্রহরণ করিয়াছিলেন? বঙ্কিমচন্দ্র ইহার পূর্বে বাঙ্গলা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রশ্ন শুনিবামাত্র সমবেত পণ্ডিত ও ভদ্রলোকগণ স্তম্ভিত হইলেন। চূড়ামণি মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রকে আদর করিতে করিতে বলিলেন, এ প্রশ্নের উত্তর আমি তোমায় পরে দিব, এক্ষণে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেও তাহা বুঝিতে পারিবে না, তবে একমাত্র জানিয়া রাখ যে, শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ পুরুষ ও আদর্শ চরিত্র।

> এই প্রশ্নে কি প্রাচীন, কি যুবা সকলেই সে রাত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন, কেন না সকলেই শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত। তাঁহারা জানিতেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া লীলাখেলা করিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে সামান্য ঘটনা, সামান্য কথা বহুদিন ধরিয়া আন্দোলিত হইয়া থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই কথা লইয়া কিছুদিন বিস্তর আন্দোলন চলিয়াছিল। সেই জন্যই কথাটা স্মরণে আছে। আক্ষেপের বিষয়, বঙ্কিমচন্দ্রের পরম বন্ধু চূড়ামণি মহাশয় ইহার অল্পকাল পরেই স্বর্গারোহণ করিলেন।"

বঙ্কিম যখন এই প্রশ্নটা তুলেছিলেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র দশ। আলগাভাবে তাকালে মনে হতে পারে যে মেদিনীপুরের স্কুলে মাত্র চার বছরের পড়ুয়ার মুখ থেকে হঠাৎ ছিটকে বেরিয়ে-আসা এই প্রশ্নটা ধর্ম বিষয়ে পরিপূর্ণ অনভিজ্ঞ একটি বালকোচিত কৌতূহল মাত্র। সেটাই স্বাভাবিক। কারণ বালকমাত্রের প্রশ্নই ইতিহাসে সর্বযুগেই স্বীকৃত হয়েছে অনেকটা বাচালতারই উনিশ-বিশ হিসেবে। কিন্তু মানবসভ্যতার ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্তও অনেক, যেখানে বালক-বয়সী কারো কারো মুখের উচ্চারিত কোনো কোনো প্রশ্ন পেয়ে গেছে প্রশ্নকর্তার জীবনে পরবর্তী আত্মজিজ্ঞাসার আদি বীজের গরিমা। আর বঙ্কিমের ক্ষেত্রেও এই আচম্বিত জিজ্ঞাসা যে সত্যিই কতখানি আভ্যন্তরিক, তার প্রমাণ ছড়ানো রয়েছে তাঁরই তিনখানা বইয়ে, কৃষ্ণভাবনা অথবা কৃষ্ণবিচারই যেখানে একমাত্র উপলক্ষ। 'ধর্মতত্ত্ব', 'কৃষ্ণচরিত্র', আর 'শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা', এই তিনখানা বইয়ে, আমরা জানি, জীবনের শেষ দশটা বছরকে নিবেদিত করেছিলেন তিনি, বৃহত্তর ধর্মজিজ্ঞাসার উত্তরসন্ধানে। প্রখ্যাত গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর একটি সুচিন্তিত মন্তব্যের দিকে চোখ পাততে পারি এই মুহূর্তে।

> *"বঙ্কিমচন্দ্রকে যদি কোনো মনুষ্য বা দেবতা গ্রাস করে থাকেন তিনি শ্রীকৃষ্ণ।"*

শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচর্চা' নামের যে প্রবন্ধ থেকে এই উদ্ধৃতি, সেখানে তাঁর আলোচ্য বঙ্কিমের রক্তে-মাংসে-জড়ানো আস্তিক্যচিন্তা। আমরা এখন তাঁর জীবনের যে অধ্যায়ে, সেখানে তাঁর আস্তিক্য-নাস্তিক্য বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা আপাত-অবান্তর। তবুও যে কিছুটা গুরুত্ব দিয়েই এই প্রসঙ্গের উল্লেখ, তার পিছনের কারণটা এই নয় যে, অপরিণত বয়স থেকেই বঙ্কিম কতখানি কৃষ্ণজিজ্ঞাসায় ভারাতুর তা চিনিয়ে দেওয়া। আমাদের ঝুঁকে থাকা শুধুমাত্র প্রশ্নাতুরতার দিকেই। যা দেখছেন, যা শুনছেন, তাকে বিনা প্রশ্নে না-মেনে-নেওয়ার যে শুভবুদ্ধি, আমাদের অভিভূত তাকিয়ে থাকাটা সেই দিকে শুধু।

১৮৪৮

বছরের প্রধান ঘটনাবলী

বেরলো কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভূগোল বৃত্তান্ত'।
মার্শম্যানের 'Outline of History of Bengal'-এর অংশ বিশেষ অনুবাদ করে বিদ্যাসাগর বের করলেন 'বাঙ্গালার ইতিহাস'-২য় খণ্ড। মার্শম্যানের এই একটা ইংরেজি বই থেকেই বাংলা ভাষায় তৈরি হবে তিন খানা বই। প্রথম ভাগ অনুবাদ করবেন রামগতি ন্যায়রত্ন। তৃতীয় ভাগ অনুবাদ করবেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ১৯০৪-এ। এ ছাড়াও এই বইয়ের অনুবাদ করেছেন গোবিন্দ সেন তাঁর 'বাঙ্গালার ইতিহাস'-এ, ওয়েঙ্গার তাঁর 'বঙ্গদেশের পুরাবৃত্তে'।
ঢাকার ছোটো কাটরায় ব্যাপটিস্ট মিশনারিরা গড়ল প্রথম ছাপাখানা।
আইন পরীক্ষা পাস করে শম্ভুনাথ পণ্ডিত ফৌজদারী-উকিল।
দরিদ্রদের মধ্যে ত্রাণের কাজ চালাতে ইউরোপীয় আর দেশীয়দের নিয়ে গড়া হয় যে 'দি ডিস্‌ট্রিক্‌ট চ্যারিটেবল সোসাইটি', তার সাব-কমিটির সদস্য নির্বাচিত হলেন প্যারীচাঁদ মিত্র আর রামগোপাল ঘোষ।
বছরের গোড়ার দিকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হলেন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য।

> "তখন আমার বয়স আন্দাজ ৬/৭ বৎসর। বোধহয় ইংরাজি ১৮৪৭ সাল হইবে। আমি আমার দাদার সঙ্গে সংস্কৃত কলেজে যাইতাম। তিনি আমাকে একটা বেঞ্চিতে বসাইয়া রাখিতেন। এই রকম ২/৫ দিন যাইতে যাইতে একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে বলিলেন, 'আয় তোকে ইস্কুলে ভর্তি করে দি', তখন কোনও ছাত্রের বেতন দিবার পদ্ধতি ছিল না ; কাজেই ইস্কুলে ভর্তি হওয়ার প্রতিবন্ধক হইল না,..."
>
> পুরাতন প্রসঙ্গ/কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য

কেমব্রিজের কৃতী ছাত্র, বহুভাষাবিদ, হোম-আপিসের উকিল জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের আইনজ্ঞানে সন্তুষ্ট হয়ে বিলেতের কর্তৃপক্ষ তাঁকে ভারতবর্ষে পাঠালেন আইন সচিব

হিসেবে। এই বছরেই তিনি হয়ে যাবেন এডুকেশন কাউন্সিল বা শিক্ষা-পরিষদের সভাপতি। শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পড়ছিলেন ফ্রি চার্চ মিশন স্কুলে। সেখানকার চারজন ছাত্র খৃস্টধর্মে দীক্ষা নিলে শম্ভুচন্দ্রকে সেখান থেকে ছাড়িয়ে ভর্তি করে দেওয়া হল কাশীপুরে গৌরদাস বসাক -পরিচালিত এক স্কুলে। পরে সেখান থেকে গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে। সাবডিভিশন প্রথা চালু হলে কিশোরীচাঁদ মিত্র হয়ে গেলেন নাটোর সাবডিভিশনের পূর্ণক্ষমতাসম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেট।

১২ জানুয়ারি
লর্ড হার্ডিঞ্জের কাছ থেকে কার্যভার বুঝে নিলেন লর্ড ডালহৌসি।

১৫ জানুয়ারি
কার-ঠাকুর কোম্পানি উঠিয়ে দেওয়ার বিজ্ঞাপন বেরলো 'ক্যালকাটা গেজেট'-এ।

১৮ জানুয়ারি
মধুসূদন পৌছলেন মাদ্রাজে।

২০ ফেব্রুয়ারি
রক্ষণশীল হিন্দু নেতা, 'সমাচার চন্দ্রিকা'র সম্পাদক, বাংলা সাহিত্যে বিদ্রূপাত্মক রচনার প্রবর্তক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু। তাঁর লেখা দুটো মৌলিক উপাখ্যান— নববাবু বিলাস আর নববিবি বিলাস। সমাচার চন্দ্রিকা বেরিয়েছিল ১৮২২-এর ৫ মার্চ। এর ৩ মাস আগে বের করেছিলেন 'সম্বাদ কৌমুদী'। ১৮২৯ থেকে সমাচার চন্দ্রিকা বেরতে থাকে সপ্তাহে দুবার। ১৮৩০-এর ১৭ জানুয়ারি সনাতনপন্থী হিন্দুরা 'ধর্মসভা' গড়লে তিনিই হয়ে যান সম্পাদক। 'সমাচার চন্দ্রিকা' হয়ে দাঁড়ায় ধর্মসভা-র মুখপাত্র। তাঁর মৃত্যুর পর ছেলে রাজকৃষ্ণ কিছুদিনের জন্যে সম্পাদনা করেছিলেন ঐ পত্রিকা। ১৮৫২-য় পত্রিকার স্বত্ব কিনে নেন ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

মার্চ
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ঋগ্বেদের দেবেন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ বেরনোর শুরু।

৪ এপ্রিল
কার-ঠাকুর কোম্পানির উত্তমর্ণদের সভা, খুবই অন্তরঙ্গতার সঙ্গে বিবেচনা করা হল দ্বারকানাথের বিষয়-সম্পত্তির অবস্থা। ট্রাস্ট সম্পত্তি ছাড়া কলকাতার বাড়ি ছেড়ে দেওয়া হল দ্বারকানাথের ছেলেদের হাতে। ট্রাস্টি হিসেবে নিয়োগ করা হল রমানাথ ঠাকুর, মি: আর. সি. জেঙ্কিন্‌স, মি: এফ. আর. হ্যাম্পটনকে।

১ জুন
হিন্দু কলেজে হেয়ারের ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকীর সভা। সভাপতি, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলায় ভাষণ রাজনারায়ণ বসুর।

১৯ জুলাই

সদর আদালতে পরীক্ষা দেওয়ার আগে দাখিল করতে হত একটা সুপারিশ পত্র। শম্ভুনাথ পণ্ডিতের জন্যে প্রশংসাপত্র লিখে দিলেন সদর-আদালতের রেজিস্ট্রার কার্ক পেট্রিক।

৩১ জুলাই

রেবেকা টমসন ম্যাকটাভিশের সঙ্গে মাদ্রাজে মধুসূদনের বিয়ে।

> "রেবেকার সঙ্গে মাইকেলের প্রণয় কি ভাবে হয়েছিল, এখন সাধ্যসাধনা করেও তার খবর জোগাড় করা সম্ভব নয়। মাইকেল কৃষ্ণাঙ্গ। মাদ্রাজে অজ্ঞাতকুলশীল। অর্থহীন। তা সত্ত্বেও, রেবেকা যে মাইকেলেব প্রতি আকৃষ্ট হন, তার কৃতিত্ব কতটা রেবেকার, কতটা মাইকেলের, তা বলা সহজ নয়। এ ব্যাপারে প্রথম যৌবনে উপনীত অনাথ এবং আত্মীয় ও সহায়হীন রেবেকার কাঙাল ও নিঃসঙ্গ মন যতটা দায়ী, প্রতিভাদীপ্ত উচ্ছ্বসিত, সপ্রতিভ, তরুণ মাইকেলেব ব্যক্তিত্বও তার চেয়ে কম দায়ী ছিল বলে মনে হয় না। বস্তুত, মাইকেলের বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্ব দেখেও হয়তো বেবেকা তাঁব প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। মাইকেলের কবিতা এবং রোমান্টিক মনের পরিচয়ও তিনি নিশ্চয় পেয়েছিলেন। মাদ্রাজের পত্রপত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি যখন একজন উঠতি কবি হিসেবে নাম করেন, রেবেকা তখন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন নি, ততদিনে তাঁদেব বিষে হয়ে গেছে। নিঃসঙ্গ রেবেকা মাইকেলের মধ্যে এমন একটা আন্তরিকতা এবং আশ্রয়ের ভরসা পেয়েছিলেন, তাঁর কাছে যা অসামান্য বলে মনে হয়েছিল। সে জন্যে, তিনি হয়তো মাইকেলের গায়েব রং এবং আর্থিক দৈন্য দেখে ভয় পান নি। বিশেষ কবে কেনেট এবং মাইকেলের কাছে তিনি যখন জানতে পেরেছেন যে, আপাতত অরফ্যান অ্যাসাইলামের দরিদ্র আশ্যার হলেও তিনি 'কলকাতা সুপ্রীম কোর্টের অ্যাডভোকেট রাজনারায়ণ দত্তের' একমাত্র পুত্র।"

আশার ছলনে ভুলি/গোলাম মুবশিদ

বিযেব সময় স্বামী এবং স্ত্রী দু পক্ষই নিজেব পিতৃপরিচয়টা পরিষ্কার করে বলেন নি। বিয়ের আগে রেবেকা ছিলেন অরফ্যান অ্যাসাইলামে মাইকেলের ছাত্রী।

অগাস্ট

এই মাসের মাঝামাঝি বেথুন হয়ে গেলেন 'কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরির অধ্যক্ষ। এই লাইব্রেরিই পরে হয়ে উঠবে ন্যাশনাল লাইব্রেরি।

১৩ অগাস্ট

কলকাতার কৃষ্ণ সিং-এর গলির (এখন বেথুন বো) মামার বাড়িতে রমেশচন্দ্র দত্ত-র জন্ম। বাবা, ডেপুটি কালেক্টর ঈশানচন্দ্র।

২১ অগাস্ট

'সংবাদ প্রভাকর'-এ ইংরেজদের সাঁ সুসি থিয়েটারে 'ওথেলো' নাটকে নাম-ভূমিকায় বৈষ্ণবচরণ আঢ্যের অভিনয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা।

১০ নভেম্বর
কলকাতার তালতলায় দেশনেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম। বাবা, দুর্গাচরণ।

১৭ ডিসেম্বর
প্রখ্যাত আইনজীবী, কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সাহিত্যিক সারদাচরণ মিত্রের জন্ম হুগলির সেহালা-য়।

২০ ডিসেম্বর
পারিবারিক কারণে 'চন্দন নগর সেমিনারি' ছেড়ে সরকারি শিক্ষা বিভাগে চাকরি নিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়। এই তারিখ থেকে তিনি কলকাতা মাদ্রাসার দ্বিতীয় শিক্ষক।

১৮৪৯

বঙ্কিম কাঁঠালপাড়ায়। যাদবচন্দ্র তাঁর চাকরিস্থল চব্বিশ পরগনায়। অভিভাবকহীন বঙ্কিমের লাগামছাড়া জীবন তখন। মা ছাড়া গুরুজন নেই কেউ মাথার উপরে। দাদারা নিজেদের স্কুল আর পড়াশোনায় ব্যস্ত। এই ফাঁকে, হয়ে যাবে উপনয়নটা। পৌরোহিত্য করবেন নৈহাটির সদাশিব তর্কপঞ্চানন। এঁর সহোদরই হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পিতামহ শ্রীনাথ ভট্টাচার্য। হরপ্রসাদের বড়ো ভাই নন্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল বঙ্কিমের।

এই সময় থেকে হুগলি কলেজে যোগ দেওয়ার পর পর্যন্ত নিজের বাঁধনছেঁড়া জীবনযাপনের বেশ খানিকটা হদিশ দিয়ে দেন বঙ্কিম নিজেই :

> ১। "ক্লাসে কখন থাকিতাম না। ক্লাসের পড়াশোনা কখন ভাল লাগিত না—বড় অসহ্য বোধ হইত। কুসংসর্গটা ছেলেবেলায় বড় বেশী হয়েছিল। বাবা থাকতেন বিদেশে। মা সেকেলের উপর আরও একটু বেশী, কাজেই তাঁর কাছে শিক্ষা কিছু হয়নি। নীতি শিক্ষা কখন হয়নি। আমি যে লোকের ঘরে সিঁদ কেন শিখি নি বলা যায় না।"
>
> ২। "বাল্যে প্রকৃতি দেবীর ক্রোড়ে বসিয়া আমি যে শিক্ষালাভ করেছি, তাহাই অধিক প্রয়োজনীয় এবং এই শিক্ষাই উত্তরকালে অধিক উপকারে আসিয়াছিল।"

ক্লাসের পড়া পড়তেন না হয়তো, কিন্তু ঐ বয়সে অর্থাৎ হুগলি কলেজে যোগ দেবার পর যে স্কুলপাঠ্য বইপত্রের বাইরেও ছড়িয়ে গিয়েছিল তাঁর জানার ইচ্ছে, তাও জানা গেছে তাঁর নিজের জবানীতেই। জানিয়েছেন ১১ বছর বয়সে রোলিয়াস সাহেবের সমস্ত প্রাচীন ইতিহাস, হিউমের ইংল্যান্ডের ইতিহাস জাতীয় বইপত্র আদ্যন্ত পড়েছেন তিনি গভীর মনোযোগে। পড়া এবং না-পড়ার হিসেবনিকেশটা এখানে একটু জটিল। তাঁর ছাত্র জীবন সম্বন্ধে আরও খানিকটা বিস্তৃত খবরাখবর পাওয়ার সুযোগ থাকলে বুঝে নেওয়া সহজ হতো খানিকটা—কেন ছাত্র হিসেবে ক্লাসের পড়ায় যাঁর গভীর অনাগ্রহ সেই তিনিই বাইরের বইপত্রে, বিশেষ করে ইতিহাসে, নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে পারেন নিবিষ্ট অধ্যয়নে।

এবার উপনয়ন থেকে এক লাফে আমরা পৌঁছব তাঁর বিয়ে-য়। এখনো কিন্তু ভর্তি হননি

হুগলি কলেজে। না হওয়ার কারণ, কলেজের নতুন সেশান শুরু হতো ১ অক্টোবরে।

ফেব্রুয়ারি

বঙ্কিমের বয়স দশ বছর আট মাস। কাঁঠালপাড়ার কাছাকাছি নারায়ণপুর গ্রামের নবকুমার চক্রবর্তীর মেয়ে পাঁচ বছরের বালিকা মোহিনী দেবীর সঙ্গে বিয়ে। বয়সে বালিকা কিন্তু রূপবতী। বড়দা শ্যামাচরণ সেই রূপে মুগ্ধ হয়েই ঘটিয়েছিলেন এই বিয়ে। নারায়ণপুর ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রাম। এই গ্রামেই স্বোপার্জিত অর্থে শ্বশুরের বিষয়-আশয় কিনে নিয়ে রামমোহন চক্রবর্তীর বিপুল খ্যাতি-প্রতিপত্তি। নবকুমার এই রামমোহনের বড়ো ছেলে। 'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র' থেকে জানা যাচ্ছে—

"রামমোহন কুলীন নাতনী-জামাইকে অনেক যৌতুক দিয়েছিলেন বটে, তবে রায়বাহাদুরের ছেলের সঙ্গে বিবাহ হইবার প্রধান কারণই ছিল মেয়েটির অপরূপ সৌন্দর্য।"

তাঁর দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধে জানার উপকরণ জোটে যৎসামান্যই। সামান্য একটুকরো ছবি 'বঙ্কিম জীবনী'-তেই যা—

"বালিকাব যখন নয় বৎসর বয়স, তখন তিনি একদিন অনবধানপ্রযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্রের দুই একটি কবিতাব পাণ্ডুলিপি ছিঁড়িয়া পুতুলের শয্যা রচনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র যখন দেখিলেন, তাঁহার শোণিততুল্য পাণ্ডুলিপি এইরূপ দুর্দশাগ্রস্ত, তখন তিনি অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন—'তুমি আমার জামা কাপড় ছিঁড়িয়া পুতুলকে শোয়ালে না কেন?' সঙ্কুচিতা বালিকা উত্তর করিল, 'আমি কাগজগুলো আটা দিয়ে জুড়ে দিচ্ছি।' বঙ্কিম অবজ্ঞার সহিত বলিলেন, 'জোড়া কাগজ লইয়া আমি গলায় গাঁথিব? তুমি কি মনে কর, আমি আর লিখিতে পারি না? আজই লিখিব।' বঙ্কিম নির্জন কক্ষে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া লিখিতে বসিলেন। সেদিন রাত্রি এক প্রহর পূর্বে কেহ তাঁহার সাক্ষাৎ পায় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র যখন দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিলেন, তখন তাঁহার হাতে কাগজের তাড়া। অনুতপ্ত বালিকার অঙ্কে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, 'দেখ, লিখেছি কিনা'।"

আরও একটা প্রচলিত কাহিনীর কথা জানিয়েছেন গোপালচন্দ্র রায় তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র'-য়।

"হুগলী কলেজে পড়ার সময় বঙ্কিমচন্দ্র পর পর যে দুবার জুনিয়র ও সিনিয়র স্কলারশিপ পান, সেই টাকা দিয়ে নবীন যুবক বঙ্কিমচন্দ্র কিশোরী স্ত্রীকে কয়েকটা সোনার গয়না গড়িয়ে দিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের শ্বশুর ও পিতা উভয়েই ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা মোহিনী দেবীকে প্রচুর গয়না দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র নিজের স্কলারশিপের টাকা থেকে আরও কয়েকটা গয়না গড়িয়ে স্ত্রীকে দিয়েছিলেন।"

আরও কিছু তথ্য মেলে হেমেন্দ্রনাথের 'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র'-য়।

১১ বছরের স্বামী। ৫ বছরের স্ত্রী। একজন নিজের পুতুল খেলায় মগ্ন। অন্যজন কবিতায়। এরই মধ্যে কখন যেন চুপিসাড়ে বঙ্কিমের মনের ফাঁক-ফোঁকরে ঢুকে পড়েছে সেই রঙীন প্রজাপতি, যার অন্য নাম প্রণয়। আর প্রণয়েরই ছায়া-সহচরী— বিরহ। ঐ বয়সেই বিরহানলের ছ্যাঁকায় মন পুড়েছে বঙ্কিমের মোহিনী দেবী যখন বাপের বাড়িতে। তাই সংসারের চোখ এড়িয়ে গভীর রাতে নিয়মিত দেড় মাইল দূরের শ্বশুরবাড়িতে। 'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র'-য় তারই কৌতুক-মেশানো বৃত্তান্ত—

"পিতামহ পৌত্রী ছাড়িয়া থাকিতে কষ্ট পাইতেন, তাই প্রথমে বালিকা নারায়ণপুরেই অধিক থাকিতেন। বঙ্কিম কিন্তু বিরহ-ব্যথা বড় সহ্য করিতে পারিতেন না। প্রায় প্রতি রাত্রেই সকলে ঘুমাইলে 'দুছোট' লইয়া শ্বশুরবাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইতেন। মাঠের উপর দিয়া

কোনাকুনি রাস্তায় বাড়ীর পশ্চাদ্দিক হইতে শ্বশুরবাড়ীতে আসিয়া স্ত্রীর সহিত মিলিত হইতেন। এবং সেখানেই রাত্রিযাপন করিতেন। কিন্তু এমনই কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন যে, আবার ভোর রাত্রিতেই আসিয়া বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া পড়িতে বসিতেন। সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্কিমকে পড়িতে দেখিয়া শুইতে যাইতেন। আর ভোরে আসিয়াও পাঠনিমগ্ন দেখিতেন। আশ্চর্য হইয়া তিনি প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিতেন—"বঙ্কিম কি সারারাত জেগে পড়েছে?" কখনও কখনও এ কথার উত্তর দিত ভৃত্য।"

নিশ্চয় সে-উত্তর বানানো অথবা বঙ্কিমেরই শিখিয়ে দেওয়া। ভৃত্য সত্যঘটনা জানিয়ে বসলে নিশ্চয়ই গভীর রাতের অমন গোপন অভিসারে বাধা পড়ত অচিরাৎ। হয়তো পড়েও থাকবে কোনো সময়, কোনোভাবে জানাজানি হয়ে গিয়ে। তেমন কিছু অপ্রীতিকর ঘটুক বা না ঘটুক বালক বয়সের এই প্রণয়কে কিন্তু অস্বীকার করেন নি বঙ্কিম। ঔপন্যাসিক বঙ্কিম তাঁর ঐ বয়সের প্রণয়-অভিজ্ঞতাকে ছেলেমানুষির ছলে ছুঁড়ে দেননি বিস্মৃতির গর্তে-গহ্বরে। মনে তো রেখেছেনই আজীবন। আন্তরিক আমন্ত্রণে নিজের উপন্যাসের পাতায় পেতে দিয়েছেন বসবার অলংকৃত আসনও। 'চন্দ্রশেখব' উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদেব গোড়ায় দিকেই রয়েছে তাঁর আত্মকথনধর্মী অকপট সত্যভাষণ—

"এইরূপে ভালোবাসা জন্মিল। প্রণয় বলিতে হয় বল, না বলিতে হয়, না বল। ষোলো বৎসরের নায়ক—আট বৎসরের নায়িকা। বালকের ন্যায় কেহ ভালোবাসিতে জানে না।"

২৩ অক্টোবব

বঙ্কিমচন্দ্র ভর্তি হলেন হুগলি কলেজে। এই কলেজের আদি নাম 'দি কলেজ অফ মহম্মদ মহসীন'। প্রতিষ্ঠার তারিখ ১৮৩৬-এর ১ অগাস্ট। দাতা মহম্মদ মহসীন কোনো সন্তান-সন্ততি না থাকায় মৃত্যুব আগে উইল করে যান, তাঁর বিপুল সম্পত্তির আয় যেন সম্প্রদায়েব ধর্মীয় আর জনহিতকব কাজে খরচ করা হয়। এর জন্যে একটা ট্রাস্টিও গড়ে যান তিনি। ১৮৩১-এ মহসীন ফান্ডের সম্পত্তির পরিমাণ যখন সাত লক্ষ টাকা, তখন সরকার পক্ষ জেনারেল কমিটিকে রিপোর্ট দিতে বললে, এই টাকা কীভাবে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজে লাগানো যায়। জেনারেল কমিটি তাদের রিপোর্টে জানাল, দিল্লী আব আগ্রা কলেজের ধাঁচে গড়া যেতে পারে এমন একটা কলেজ, যা পুরোপুরি ইসলাম-ঘেঁষা না হয়ে হয়ে উঠবে ধর্মনিরপেক্ষ। এই প্রস্তাবকে কার্যকরী করে তুলতে স্থানীয় অফিসার আর শিক্ষিত মুসলমানদের নিয়ে গড়া হল একটা লোকাল কমিটি। জেনারেল কমিটি কলেজেব বাড়ি তৈরির জন্য ১,৪০,০০০ টাকা বরাদ্দ করে দেখলে, মহসীন ফান্ড থেকে সুদ হিসেবে, ইমামবড়া আর মাতওয়ালির খরচ বাদ দিয়েও বছরে থেকে যাচ্ছে ৫৪,০০০টাকা। লোকাল কমিটির সুপারিশ এল, কলেজটাতে খোলা হোক দুটো বিভাগ। ইংরেজি আর প্রাচ্য বিদ্যা।

পেরী কুইলার নামে একজন ফরাসী নাবিক ঘটনাচক্রে চুঁচুড়ায় এসে গঙ্গার ধাবে বানান একটা বিরাট বাড়ি। লোকে সে বাড়িকে বলতে পেরন সাহেবের বাড়ি। ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় 'কলিকাতা গেজেট'-এ বিজ্ঞাপন দেন, বাড়িটা বিক্রি করে দেওয়ার। তখন প্রাণকৃষ্ণ হালদার কিনে নেন। প্রাণকৃষ্ণ হালদার ছিলেন অসম্ভব বিলাসী আর অমিতব্যয়ী। তাঁর বাবুয়ানি নিয়ে গল্প আছে অনেক। পরিণামে একদিন সর্বস্বান্ত হতে হয় তাঁকে। তাঁর বাড়ি চলে যায় শীল পরিবারের হাতে। এই শীল পরিবারের বিশ্বম্ভর শীল-এর কাছ থেকে পাট্টা বন্দোবস্তে বাড়িটা ভাড়া নিয়েই শুরু হয় 'দি কলেজ অব মহম্মদ মহসীন'। কলেজ

পরিচালনার দায়িত্ব 'জেনারেল কমিটি' বা 'জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশনে'র হাতে, মেকলে তার সভাপতি। অন্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন এডওয়ার্ড রায়ান, রাধাকান্ত দেব, রসময় দত্ত প্রমুখেরা। শুরুতে এই কলেজের ছাত্রদের মাইনে দিতে হত না কোনো। এমন-কি কাগজ, কলম, কালি, খাতা আর পড়ার বইপত্রও বিনামূল্যে সরবরাহ করা হতো ছাত্রদের।

কিন্তু প্রতিষ্ঠার দিন থেকে এই কলেজকে ঘিরে সমস্যা-সংকটের ঘূর্ণী ঝড়। এই ঝড়ের উৎসে যেতে চাইলে নজর দিতে হবে এখানকার ছাত্রদের উপর। কলেজ খোলার তিন দিন পরেই দেখা গেল ইংরেজি বিভাগে ছাত্রের সংখ্যা ১.২০০। আর প্রাচ্য বিভাগে ৩০০। আবার অন্য দিকে বাৎসরিক পরীক্ষার সময় দেখা গেল ইংরেজি বিভাগে ১০১৩ জন ছাত্রের মধ্যে মাত্র ৩১ জন মুসলমান। ৯৪৮ জন হিন্দু। আর খৃস্টান ছাত্রের সংখ্যা ৩৪। প্রাচ্যবিভাগে ২১৯ জনের মধ্যে ১৩৮ জন মুসলমান, ৮১ জন হিন্দু। ক্রমে, বছরে বছরে কমতে থাকে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা। প্রথম ৬ বছরের ছাত্রসংখ্যার তুলনামূলক চেহারাটা হয়ে দাঁড়ায় এই রকম :

১৮৩৬
মুসলমান ছাত্র/১৬৯
হিন্দু ছাত্র/১০৬৮
১৮৩৭
মুসলমান ছাত্র/২৫১
হিন্দু ছাত্র/৭৫১
১৮৩৮
মুসলমান ছাত্র/২৩৮
হিন্দু ছাত্র/৬৫১
১৮৩৯
মুসলমান ছাত্র/২৭৩
হিন্দু ছাত্র/৬৫১
১৮৪০
মুসলমান ছাত্র/২৮৮
হিন্দু ছাত্র/৬৮১
১৮৪১
মুসলমান ছাত্র/৩২৭
হিন্দু ছাত্র/৬২১

স্বপন বসু-র 'হুগলি কলেজ ও মুসলমান সমাজের প্রতিক্রিয়া' প্রবন্ধ থেকে তুলে ধরা হল ছাত্র সংখ্যার এই তারতম্য। যোগ করলে দেখা যাচ্ছে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা যেখানে ১৫৪৬, হিন্দু ছাত্রের সেখানে ৪৪২৩।

ইংরেজি বিভাগের চেহারা আরো শোচনীয়। ১৮৪০-৪১-এ ইংরেজি সিনিয়র বিভাগে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা মোটে ৯। ১৮৪২-৪৩-এ ঐ সংখ্যা আরো কমে গিয়ে দাঁড়াবে শতকরা ২। ১৮৫২-য় ইংরেজি বিভাগে হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা যেখানে ৩৮৯, মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা সেখানে ৬। ১৮৫৬-য় ইংরেজি বিভাগে হিন্দু ছাত্র ৪৬২। মুসলমান ৮।

শুরু থেকেই এই কলেজে হিন্দু ছাত্রদের আধিপত্যে মুসলমান সমাজ অসন্তুষ্ট। এই কলেজেই ছিল অ্যাংলো-পারসিয়ান বিভাগ। সেখানে তবু কিছু ছাত্র ইংরেজি শিখত। কিন্তু ইংরেজি বিভাগ সম্পর্কে ছাত্র এবং অভিভাবক, দু পক্ষেরই দারুণ অনাগ্রহ। কেন এতখানি বিতৃষ্ণা তার একটা উত্তর দিয়েছিলেন মীর মশাররফ হোসেন, তাঁর 'আমার জীবনী'-তে।

"ইংরেজী পড়িলে পাপ তো আছেই। আর মরিবার সময় গিডিমিডি করিয়া মরিতে হইবে। আল্লাহ্ রসুলের নাম মুখে আসিবে না।...ইংরেজী পড়িলে একরূপ ছোটখাটো শয়তান হয়। দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করে। সরাব খায়। জবহা ঝটকার বিচার নাই। হালাল হারেমে প্রভেদ নাই।... নামাজ রোজায় ভক্তি করে না। আদব তমিজের ধার ধারে না।"

বিতৃষ্ণা থেকেই বিক্ষোভ। মহসীন-এর টাকায় ইংরেজি শিখবে কেন হিন্দু ছাত্ররা? ১৮৩৭-এ সরকারি নিস্পৃহতার প্রতিবাদে মুখর হুগলি ইমামবড়ার ম্যানেজার আর তখনকার মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় সম্ভ্রান্ত মানুষ কেরামত আলি। তাঁর স্বধর্মনিষ্ঠাকে কেউ ভেবেছেন পরধর্মবিদ্বেষীতা। কেউ ভেবেছেন সাম্প্রদায়িক বিভেদের উদ্‌বোধক। ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া-র মন্তব্য—

"We can spare Keramat Ali, but we cannot spare Hooghly College."

কলেজের বাইরে আন্দোলন। ভিতরে হিন্দু ছাত্রদের ভর্তির হিড়িক। ১৮৩৮-এ, বঙ্কিমের জন্মের বছরে সাদারল্যান্ডের জায়গায় অধ্যক্ষ ওয়াইজ চালু করলেন নতুন নিয়ম। সামান্য হলেও ফি দিতে হবে ছাত্রদের। এর ফলে দরিদ্র মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যায় ক্রমশ লাগল ভাঁটার টান।

১৮৪৬-এর জানুয়ারিতে 'কাউন্সিল অব এডুকেশন' তুলে দিল বিনা বেতনে পড়ানোর নিয়ম। কেবলমাত্র দরিদ্র ছাত্রদের জন্যেই বিনা-বেতন। আর ঐ বছর থেকেই কলেজের নতুন নাম, হুগলি কলেজ।

বঙ্কিম যখন ভর্তি হলেন এই কলেজে তখন তাঁর বয়স সাড়ে এগারো বছর। অন্য মতে এগারো বছর চার মাস। হুগলি কলেজে তখন ইংরেজি বিভাগের দুটো ভাগ, স্কুল আর কলেজ। স্কুল বিভাগেরও দুটো ডিভিশন, সিনিয়র আর জুনিয়র। জুনিয়রের মাস মাইনে দু টাকা। সিনিয়রের তিন টাকা। প্রত্যেক ডিভিশনের আবার অনেকগুলো শ্রেণী। সিনিয়র ডিভিশনে তিনটে। জুনিয়রে চারটে। প্রথম তিনটে শ্রেণীতে আবার দুটো করে সেকশন। বঙ্কিম ভর্তি হয়েছিলেন জুনিয়র শাখার প্রথম শ্রেণীর 'এ' সেকশনে। ঐ বছরে সঞ্জীবচন্দ্রও ভর্তি হয়েছিলেন হুগলি কলেজের উঁচু শ্রেণীতে।

স্কুলের প্রত্যেক সেকশন একজন শিক্ষকের দায়িত্বে। বাংলা ছাড়া আর সব বিষয়েই পড়াতেন তিনি। বঙ্কিমের বেলায়, প্রথম বছরে, ক্লাস-শিক্ষক ছিলেন নবীনচন্দ্র দাস, সাতাশ বছর বয়সে। ঐ কলেজেরই কৃতী ছাত্র। ১৮৪৬ থেকে ৪৮ এখানে প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন ক্যাপটেন রিচার্ডসন। নানা সময়ে অধ্যাপক হয়েছেন রেভারেন্ড লালবিহারী দে, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জেমস্ সাদারল্যান্ড, কুপার, কেলি, কর্পোরেল গ্রেভস, লিওজিনিস ক্লেন্ট, ডিক্রুজ, শ্রীনাথ পাল প্রমুখ। নানা সময়ে শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের তালিকায় ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া হরচন্দ্র ঘোষ, গঙ্গাচরণ সরকার, নরোত্তম মল্লিক, দিগম্বর বিশ্বাস, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র, বিচারপতি বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়, বিচারপতি আমীর আলি, গিরিশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, স্যার এস. এম. বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রমুখ। দ্বিজেন্দ্রলাল পড়েছেন ১৮৮২ থেকে ৮৩ পর্যন্ত। অক্ষয়চন্দ্র সরকার ১৮৬৩ থেকে ৬৭ পর্যন্ত।

হুগলি কলেজে ভর্তি হওয়ার আগে বঙ্কিমের জীবনযাপন-এর খানিকটা ছবি মেলে পূর্ণচন্দ্রের লেখা 'বাল্যকথা'-য়—

> "হুগলী কলেজে ভর্তি হইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে একজন Private Tutor সকালে ও সন্ধ্যার পর পড়াইয়া যাইত। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বালক, উপনয়ন হয় নাই। এই অবস্থায় তিনি মধ্যে মধ্যে ঐ পাঠশালায় উপস্থিত হইতেন। গুরুমশায় কায়স্থ সন্তান, বড় রাশভারি লোক। ছাত্রেরা তাঁহাকে যমের ন্যায় ভয় করিত। যখন তিনি ভূমিতে বেত আছড়াইয়া 'লেখ্ লেখ্ শুয়াররা' বলিয়া চিৎকার করিতেন, তখন ছাত্রেরা থরহরি কাঁপিতে থাকিত। বালক বঙ্কিম, এক একদিন বৈকালে এই পাঠশালায় উপস্থিত হইলে অভ্যর্থনাস্বরূপ গুরুমহাশয় হাসিয়া তাঁহার হস্তে বেত্‌গাছটি তুলিয়া দিতেন। বালক বঙ্কিম বেত লইয়া কোন কোন ছাত্রের নিকট তাহার পরীক্ষা করিতেন। ছাত্রেরা কেহ বা তাহার বয়োজ্যেষ্ঠ, কেহ সমবয়স্ক, কেহ বয়োকনিষ্ঠ। অধিকাংশ তাহার বয়োজ্যেষ্ঠ ছিল। এইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে দুই তিনজন বালকের নিকট দাঁড়াইয়া তাহাদের মাথার উপর বেত দুলাইয়া বলিতেন, 'মারি, মারি, আজ তোমরা কেন আমাদের বাড়ি তাস খেলিতে যাও নাই?' বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যকালে খেলার মধ্যে কেবল তাস খেলিতেন, দুই প্রহরের সময়ে ঐ কয়জন বালকের সহিত তাস খেলিতেন। বালকদিগের দৌড়াদৌড়ি এবং অন্যান্য খেলা— যাহাতে শরীরের পুষ্টি সাধন করে—তাহা খেলিতেন না। খেলিতে ভাল লাগিত না, সেই জন্য দুর্ব্বল ও ক্ষীণ দেহ ছিলেন।"

এই উদ্ধৃতির মধ্যে যে পাঠশালার উল্লেখ, তা ছিল বঙ্কিমের বাড়ির কাছেই। কিন্তু সে-পাঠশালায় কখনো পড়েনি নি তিনি। এই পাঠশালায় গুরুমশায়ের হাতের বেত নিয়ে ছাত্র-শাসন করার সময় একদিন, পৌষ কিংবা মাঘ মাসের এক সকালে, ঘটে গিয়েছিল একটা রোমাঞ্চকর ঘটনা। অনেক পরে তাঁর 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের এক জায়গায় লিখেছিলেন —"বাঙ্গালীর ছেলে মাত্রেই জুজুর নামে ভয় পায়, কিন্তু এক একটি এমন নষ্ট বালক আছে যে জুজু দেখতে চায়।" নষ্ট বালক না হয়েও বঙ্কিম জুজু দেখতে চেয়ে জুজুর মুখোমুখি হয়েছিলেন সেদিন।

ঐ পাঠশালায় বয়সে বড়ো ছাত্রদের মাথার উপরে বেত নাচিয়ে চলেছেন যখন, তখনই হঠাৎ তুমুল সোরগোল—গঙ্গার ঘাটে লেগেছে গোরার বহর। খবরটা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম জুড়ে আবালবৃদ্ধবনিতার ছুটোছুটি। পাঠশালার পণ্ডিতমশাইও তড়িঘড়ি চটি জুতোটা পায়ে গলিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে যোগ দিলেন পালানোয়। দুমদাম্ ফট ফট করে বন্ধ হতে লাগল গ্রামের বাড়ির দরজা-জানলা। একজন এক ঝুড়ি বেগুন নিয়ে যাচ্ছিল নৈহাটির বাজারে বেচতে। বঙ্কিমদের ঠাকুরবাড়ির সামনে ঝুড়ি ফেলে দিয়ে দৌড়। দেখতে দেখতে রাস্তা ঘাট হয়ে গেল ফাঁকা। গোরা সৈন্যকে ভয় পায় না কে! তখনকার কালে পশ্চিমাঞ্চল থেকে কুচকাওয়াজ করে গোরা সৈন্যরা যেত কলকাতায়। কিন্তু যারা অসুস্থ তারা নৌকোয়। যেতে যেতে ভোর হত যেখানে, গোরারা উঠত ডাঙায় প্রাতঃক্রিয়া সারতে। আর তখনই গ্রামে ঢুকে চালাত অবাধ অত্যাচার। বছর তিনেক আগে ঘটে গেছে তেমনি এক অত্যাচারের ঘটনা। সেই দগ্‌দগে্ স্মৃতিকে মনে রেখেই এই ঊর্ধ্বশ্বাস অথবা রুদ্ধশ্বাস পালানো। গ্রামের যখন সব দরজা বন্ধ, খোলা কেবল একটাই। সেটা বঙ্কিমের বাড়ির। কারণ বঙ্কিম বাইরে, দরজার কাছাকছি রাস্তায় বেত হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে। কিছুক্ষণ পরে একদল গোরা সৈন্য এসে দাঁড়াল তাঁর সামনে। নেড়েচেড়ে দেখল হাতের বেত। কথা বলল কী যেন সব। তারপর চলে গেল। আধঘণ্টা পরে গোরার বহর ছেড়ে দিল আবার। আবার জ্যান্ত হয়ে উঠল গ্রাম।

আর গ্রামের মানুষ অবাক হয়ে গেল বঙ্কিমের বুকের পাটা দেখে।
এরই কাছাকাছি সময়ে বঙ্কিম আরও একবার দেখিয়েছিলেন তাঁর সাহসের নমুনা। হঠাৎ একদিন খবর এল, একদল ডাকাত ডাকাতি করতে আসবে তাঁদের বাড়িতে। তখন আগাম খবর দিয়েই ডাকাতি করার রেওয়াজ। বাড়িতে তখন বাবা নেই। জেঠা, কাকা, পিসেদের মতো বয়স্করা সিদ্ধান্ত নিলেন, বাড়ির মেয়েরা আর ছেলেরা রাত কাটাবে প্রতিবেশীর বাড়িতে। শুনে বেঁকে বসলেন বঙ্কিম। না, বাড়ি ছেড়ে যাব না কোথাও। গুরুজনদের ধমক, তা হলে ডাকাত এসে মাথা কাটুক সকলের। বঙ্কিমের জবাব, কী করে কাটবে? আমাদের বাড়িতে এতগুলো লোক। তা ছাড়া পাড়ায় রয়েছে কত লাঠিয়াল। তাদের এনে বাড়িতে রাখুন, দেখি কী করে ডাকাতরা আমাদের কাটে। তাই কবা হল। লাঠিয়ালরা পাহাবা দিতে লাগল বাড়ি। ডাকাতবা এল বটে, কিন্তু এগোনোর সাহস না দেখিয়ে ফিরে গেল। এর পরই নাকি বাড়ির লোকজনের মুখে বঙ্কিমের নাম হয়ে যায় 'বাঁকা'। এই লাঠি অথবা লাঠিয়ালের স্মৃতি ভোলেন নি কখনো। যখন ঔপন্যাসিক, বিভিন্ন উপন্যাসেব মর্যাদার আসন পেতে দিয়েছেন লাঠিয়ালদের। 'চন্দ্রশেখর'-এর বামচরণ লাঠিবাজিতে মুর্শিদাবাদের ত্রাস। 'সীতারামে'ও তাদেব দুর্দান্ত দাপট। 'দেবী চৌধুবানী'-তে লাঠির মহিমা নিয়ে আক্ষেপ—

> "হায় লাঠি! তোমার দিন গিয়াছে। তুমি ছার বাঁশের বংশ বটে, কিন্তু শিক্ষিত হস্তে পড়িলে তুমি না পাবিতে, এমন কাজ নাই। তুমি কত তরবারি দুই টুকরা করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ, কত ঢাল, খাঁড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছ! হায়! বন্দুক আর সঙ্গীন তোমার প্রহারে যোদ্ধার হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে।...লাঠি! তুমি বাঙ্গালার আব্রু-পরদা রাখিতে, মান রাখিতে, ধন রাখিতে, ধান রাখিতে, জন রাখিতে, সবার মন বাখিতে।"

লাঠির কথা আছে তাঁর 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' রচনাযও।
হুগলি কলেজে যোগ দেওয়ার পর তাঁর জীবনযাপনেব বিবরণ 'বঙ্কিম-জীবনী'-ব পাতা থেকে—

> "বঙ্কিমচন্দ্রের কৈশোর বড় সুখে কাটিয়াছিল। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে, নিশীথে সকল সময়েই তিনি পুস্তক লইয়া বিভোর থাকিতেন। তিনি এক সময় পরিণত বয়সে জনৈক সহপাঠীর নিকট বলিয়াছিলেন, 'আমি পুস্তক পাঠে যত আনন্দ পাই, তত আনন্দ জগতে আর কিছুতেই পাই না।"
>
> যৌবনের শেষভাগে বহরমপুরে অবস্থানকালে তিনি মুন্সেফ নফরবাবুর নিকট বলিয়াছিলেন, 'পুস্তক লিখিয়া আমি যত আনন্দ পাই, তত আনন্দ আব কিছুতেই পাই না।'
>
> অপরাহ্ণটুকু বঙ্কিমচন্দ্র অন্য কাজের জন্য রাখিতেন। ছুটাছুটি অথবা ব্যায়াম করিতেন না। তিনি একটি বাগান করিয়াছিলেন; সেই বাগানে অপরাহ্ণ অতিবাহিত করিতেন। বাগানখানি বঙ্কিমচন্দ্র অতি সুন্দর করিয়া সাজাইয়াছিলেন। অর্জ্জুনার পাড়ের নীচে কয়েক বিঘা জমির উপর তিনি এক উদ্যান রচনা করিয়াছিলেন। উদ্যানের নাম ছিল ফুল-বাগান। উদ্যানের কিয়দংশ ফুলগাছ ছিল, অবশিষ্টাংশ ফলের গাছে সমাচ্ছাদিত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র হুগলি কলেজেব উদ্যান হইতে ভাল ভাল গাছ আনিয়া 'ফুল-বাগানে' স্বহস্তে রোপণ করিয়াছিলেন।
>
> এই বাগানের মধ্যে অর্জ্জুনা দিঘীর তটে তিনি একখানি সুন্দর গৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন। গৃহটি ইস্টকনির্মিত, লতাগুল্ম সমাচ্ছাদিত। যেখানে গৃহ ছিল, সেখানে এখন কয়েকখানি ইট পড়িয়া আছে, তদ্ব্যতীত সে মনোহর ফুল-বাগানের— সে চারুদর্শন উদ্যান-বাটীর কোনও চিহ্ন নাই।

আর চিহ্ন আছে 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ, বারুণী পুষ্করিণীর বর্ণনা যখন পড়ি তখনই অর্জ্জুনা দিঘীর কথা মনে পড়ে।...

কবিতা লিখিতেন গৃহে, কবিতা লিখিতেন ফুলবাগানে। লিখিবার কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না। যখন ইচ্ছা লিখিতেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই রাত্রি জাগিয়া লেখাপড়া করিতেন। শুনিয়াছি, সচরাচর তিনি রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্বে পুস্তক ফেলিয়া শয়ন করিতেন না।"

বঙ্কিম কাঁঠালপাড়া থেকে হুগলি কলেজে যেতেন ডিঙি নৌকোয়। এ সম্পর্কে পূর্ণচন্দ্রের বংশধরদের কাছ থেকে পাওয়া কিছু নতুন তথ্য আমরা জানতে পারি গোপালচন্দ্র রায়ের 'বঙ্কিমচন্দ্র' থেকে—

"বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ির দক্ষিণে সংলগ্ন আম-কাঁটালের বাগানের পাশেই ছিল মুক্তপুরের খাল। বাগানের জায়গায় পরবর্তীকালে রেলপথ বসলেও ঐ খাল সংকীর্ণ অবস্থায় আজও রয়েছে। এই খাল ধরে তিন চারশ হাত পশ্চিমে গেলেই গঙ্গা। গঙ্গা পার হয়ে চুঁচুড়ায় নদী তীর থেকে হাঁটাপথে অন্তত ১০ মিনিট গেলে হুগলি কলেজ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের বাগানের পাশে মুক্তপুরের খালে ডিঙ্গিতে চেপে স্কুলে যেতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা পুত্রদের স্কুলে যাতায়াতের জন্য একটি ডিঙ্গি বা ছোটো নৌকো কিনেছিলেন এবং ডিঙ্গি চালাবার জন্য মাইনে দিয়ে নৈহাটীর একজন দক্ষ মাঝিও রেখেছিলেন। স্কুল বসার আগে মাঝি বঙ্কিমচন্দ্রদের ওপারে পৌঁছে দিয়ে ডিঙ্গি নিয়ে চলে আসত। স্কুলের ছুটির আগে আবার নৌকো নিয়ে ওপারে যেতো বঙ্কিমচন্দ্রদের আনবার জন্যে।"

পূর্ণচন্দ্রের বর্ণনা অনুযায়ী সাঁতার না-জানা বঙ্কিম সম্পর্কেও গোপালবাবুর সন্দেহ। তাঁর অনুমান, তিনি সাঁতার জানতেন। আর সাঁতার-না-জানা ছেলেকে বাবা যাদবচন্দ্র বর্ষাকালের ভয়ংকর গঙ্গায়, জলপথে স্কুলে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না।

তিনি জানাচ্ছেন—

"বঙ্কিমচন্দ্রদের বাস্তুভিটাতেই বাড়ির একেবারে সংলগ্ন বেশ বড় যে দুটি পুকুর ছিল, তার একটি আজও আছে। তখন কাঁটালপাড়ায় কলের জল ছিল না। সকলে পুকুরের জলেই স্নান করতো। তাই গ্রামের অপর ছেলেদের মত বঙ্কিমচন্দ্রও বাড়ির পুকুরে ছেলেবেলায় সাঁতারকাটা শিখেছিলেন বলেই মনে হয়।"

সাঁতার হয়তো জানতেন তিনি। কিন্তু সাঁতার না-জানা বঙ্কিমকে নিয়ে এই সময় নানান কাহিনী। যার দুটি আছে 'বঙ্কিমজীবনী'তে। আর অন্যটি ১৩১৮ সালের 'ভারতী'-তে লিখেছিলেন হেমেন্দ্রকুমার রায় তাঁর 'বঙ্কিমযুগের কথা' নামের রচনায়। সেখানে ছিল সাঁতার-জানা বঙ্কিমের সাহসিকতার বর্ণনা। দু মাস পরে তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন নিজের ভুল। সুধীরকুমার মিত্রের 'হুগলী জেলার ইতিহাস' থেকে পেয়ে যাই হুগলির স্কুল-সম্পর্কিত আরো কিছু খবর।

ছুটি থাকত রবিবারে। শনিবার পুরো ক্লাস। কিন্তু শুক্রবারে অর্ধেক। গরমের সময় ক্লাস হতো সকাল থেকে। শিক্ষক আর ছাত্রেরা সকাল বেলাকার স্কুল চাইলেও ডাঃ রস-এর আদৌ মনঃপুত ছিল না সেটা।

১৮৫২-র মে মাসে হুগলি কলেজের অধ্যক্ষের রিপোর্ট—

"Dr. Ross the Medical Attendant of the College, considers morning school injurious to the health of the boys. They leave home, he says, in the morning without breaking their fast, and do not return till 11 o'clock or, some cases, till 12; which he considers too long to be without food."

তখন এই কলেজের বছর গণনা হত ১ অক্টোবর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। সেপ্টেম্বরেই

বৃত্তি পরীক্ষা আর-বাৎসরিক পরীক্ষা। শেষ হলে পুজোয় লম্বা ছুটি ৩০ দিনের, মহালয়ার দিন থেকে। গ্রীষ্মের ছুটির চল হয়নি তখনো।

এই পর্বের আলোচনায় বঙ্কিমের রুগণতার, আবার সেইসঙ্গে সাহসিকতারও, কিছু দৃষ্টান্ত জানা হয়ে গেল আমাদের। এ থেকে অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে যে, শারীরিকভাবে যতটা দুর্বল, মানসিকভাবে, ঘাটতি পুষিয়ে, তিনি যেন আত্মশক্তিতে ততটাই বলবান। আবছাভাবে এখানে মনে হতে পারে বুঝি বা টলস্টয় আর ডস্টয়ভস্কির যুগ্ম উপাদানেই গড়ে উঠেছে তাঁর চারিত্রিক স্থাপত্য। যদিও আপাতভাবে তাঁর প্রসঙ্গে টলস্টয়কে আমাদের ভাবনা খাপ খাইয়ে নিতে পারে যতটা, ডস্টয়ভস্কির 'Holly Sickness'-কে মানানসই মনে করতে পারে না ততখানি। অসুস্থ বঙ্কিম আমাদের কাছে যেন চির অপরিচিত। বঙ্কিম মানেই স্বাস্থ্যোজ্জ্বল এক বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্ব। যেহেতু গোনাগুনতি অল্প কয়েকটি ফোটোগ্রাফের মাধ্যমেই তাঁর সঙ্গে তাঁর পরবর্তীকালের চাক্ষুষ পরিচয়, ঐ ভ্রমের আসল কারণ সেটাই। আসলে মধ্য জীবন থেকে যতই এগিয়ে যাবেন তিনি শেষ জীবনের দিকে, নানাবিধ ব্যাধির আক্রমণ ও অসহযোগিতা তাঁকে ক্রমশই টেনে নিয়ে যাবে আরোগ্যহীন অস্তিত্ব-মথিত সেই তীব্রতর যন্ত্রণার দিকে, মৃত্যু যার নিকটতম আত্মীয়। অসুস্থতার কারণে চাকুরি জীবনে তিনমাসের জন্যে প্রথম ছুটি নেওয়া ১৮৭৪-এর শেষ দিকে। এর পরে একবার দীর্ঘ ন মাসের ছুটি নিতে হবে ঐ একই কারণে। নানা সময়ে নানান অসুখ তাঁর শরীরের ভিতরে খুঁড়তে থাকবে গর্ত-গহ্বর। অথচ ঐ সময়েই তাঁর সৃষ্টির নদীতে ভরা জোয়ারের ঢল। এর ফলেই বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে চায় ডস্টয়ভস্কির অসুস্থতা নিয়ে টমাস মান-এর মন্তব্য—

> "a product of over-flowing vitality, an explotion and excess of enormous health."

আর আরও একবার বিবেচনাধীন হয়ে ওঠে মেরেঝকভস্কির সেই সিদ্ধান্ত 'টলাস্টিয়ান হেলথ' আর 'ডস্টয়ভস্কিয়ান সিকনেস'কে যা মেলায় এক সূত্রে।

> "bore similar marks of creative might"

আর আপাতবিরোধ সত্ত্বেও কেউ কারো বিপরীত নয়, নয় প্রতিপক্ষ।

> "Contrary, but not remote, not alien."

১৮৪৯

এই বছরের ঘটনাবলী

বেথুন সাহেবের তৈরি একটা আইনের খসড়া এই বছরের সবচেয়ে বড়ো ঘটনা। বাংলাদেশে ইংরেজের গড়া আইন-আদালতের শুরু থেকেই চলে আসছে এই নিয়ম যে, এদেশে বসবাসকারী ইংরেজদের বিচার আর কোথাও হবে না সুপ্রীম কোর্ট ছাড়া। যদিও মফস্বলেও কোম্পানি বসিয়েছে ফৌজদারী আদালত, আসলে সেটা শুধু প্রজার জাতের জন্যে। রাজার জাতের পক্ষে তা অনুপযুক্ত। ফলে মফস্বলের রাজ-পুত্ররা মাপ পেয়ে আসছিল অন্যায়ের সাত-খুনেও। আর এই সুযোগটা পেয়ে গিয়ে অত্যাচারী নীলকর সাহেবদের হাতে যেন স্বর্গ। যতই অপবাধ ঘটাক-না কেন, বিচারের আইন তো প্রজাদের নাগালের বাইরে। আবার অন্যদিকে উৎপীড়িত প্রজাদের পক্ষেও সম্ভব ছিল না ন্যায় বিচারের আশায় কলকাতার সুপ্রীম কোর্টে ছুটে আসা। আসতে গেলে চাই অঢেল টাকা আর অনেক সময়। ফলে উৎপীড়নের আক্রমণ আর উৎপীড়িতের আর্তনাদ দুটোই ক্রমবর্ধমান।
বেথুন সাহেব চাইলেন এই অসাম্যের বিষবৃক্ষটাকে গোড়া থেকে কুপিয়ে কাটতে। দেশীয় আদালতে ইওরোপীয় বা ইংরেজ অপরাধীদের বিচার করার ক্ষমতা দিতে চেয়ে তৈরি করলেন একটা আইনের খসড়া। তাঁর সেই চারটে Draft Act ছিল এই রকম—

১। An Act for abolishing exemption from the Jurisdiction of the East India Company's Criminal Courts.

২। An Act declaring the law as to the privilege of Her Majesty's European Subjects.

৩। An Act for trial by Jury.

৪। An Act for the protection of Judicial Officers.

এই খসড়া-র শেষ বয়ানটি প্রমাণ করে দেয় অপরাধী রাজ-পুত্রদেব অত্যাচারের বহর। জুডিসিয়াল অফিসারদের নিরাপত্তার কথাটাও তাই জুড়ে দিতে হচ্ছে আইনের ভিতরে।

বেথুনের পেশ-করা এই আইনের খসড়া যখন গিয়ে পৌঁছল গভর্নর জেনারেলের ব্যবস্থাপক সভার টেবিলে, সেই মুহূর্ত থেকেই যেখানে যত ইংরেজ একে 'ব্ল্যাক অ্যাক্ট' বা 'কালা কানুন' নাম দিয়ে শুরু করে দিলে তুমুল আন্দোলন। ইংরেজদের স্বার্থরক্ষাটাই যে-সব সংবাদপত্রের মৌল দায়, তারা এই আন্দোলনের আগুনে ঘি জোগাতে লাগল রোজ। আর সেইসঙ্গে চলল কুৎসিত ভাষার কাদা-ছোঁড়া, অ্যাক্টের রচয়িতা আর সমর্থকদের দিকে। এমন-কি তারা ডেকে বসল একটা মহাসভাও, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে আবেদন জানানোর সিদ্ধান্ত নিতে। তার জন্যে তোলা হতে লাগল চাঁদা। দু-চার দিনের মধ্যেই তুলে ফেললে ৩৬ হাজার টাকা।

কলকাতার দেশীয় পাড়াও ফুঁসছে প্রতিবাদে। আর সে প্রতিবাদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক তখন রামগোপাল ঘোষ। শুধু প্রতিবাদের চিৎকারে কাজ হবে না বুঝে তিনি ছাপিয়ে বিলি করতে লাগলেন একটি পুস্তিকা। আইনের খুঁটিনাটি আলোচনাসহ সে পুস্তিকার নাম, 'A few Remarks on certain Draft Acts, commonly called Black Acts.' সেটা পড়ে কলকাতার ইংরেজ-মাতব্বরেরা অগ্নিশর্মা। কী করে শায়েস্তা করা যায় এই বেয়াড়া নেটিভটাকে? রামগোপাল তখন ছিলেন 'এগ্রি হর্টিকালচারাল সোসাইটি'র সহ সভাপতি। তৎক্ষণাৎ বিনা কারণে বিতাড়িত করা হল তাঁকে ঐ প্রতিষ্ঠান থেকে। পরে যিনি হবেন বাংলাদেশের লেফটেনান্ট গভর্নর, সেই সিসিল বিডন নাকি রামগোপাল ঘোষের এই অপমানের প্রতিবাদে পদত্যাগ করেছিলেন ঐ সোসাইটি থেকে।

> "অবশেষে আন্দোলনকারী ইংরাজগণের অভীষ্টই পূর্ণ হইল। ইংলন্ডের কর্তৃপক্ষের আদেশে কালা আইনগুলি ব্যবস্থাপক সভা হইতে অন্তর্হিত হইল। মফস্বলবাসী ইংরাজগণ আরও নিরঙ্কুশ হইয়া উঠিলেন। নীলকরদিগের অত্যাচারে শত শত প্রজার প্রাণ পিষিয়া যাইতে লাগিল।...
>
> কালা আইনের বিরোধী ইংরাজগণ জয়যুক্ত হইলেন; যে আন্দোলনের ঝড় উঠিয়াছিল তাহা থামিয়া গেল; মহামতি বীটন পরলোক গমন করিলেন; কিন্তু দেশীয় শিক্ষিতদলের মনে একটা গভীর অসন্তোষ থাকিয়া গেল।...
>
> এই সকল কারণে শিক্ষিত দলের মধ্যে রাজনীতির আন্দোলনের জন্যে সম্মিলিত হইবার বাসনা প্রবল হইল। তাঁহারা বুঝিলেন স্বদেশের হিতের জন্য সমবেত হওয়া আবশ্যক। সে সময়ে দেশীয় শিক্ষিত দলের মধ্যে দুইটি সভা ছিল; প্রথমটি দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত Bengal Landholder's Association বা বঙ্গদেশীয় জমিদার সভা। কলিকাতার অনেক ধনী ব্যক্তি ইহার সভ্য ছিলেন। কিন্তু দ্বারকানাথ বাবুর মৃত্যুর পর ইহা এক প্রকার মৃত্যুদশায় পড়িয়াছিল। দ্বিতীয় সভাটির উল্লেখ অগ্রেই কবিয়াছি, তাহা জর্জ টমসনের প্রতিষ্ঠিত নব্য-বঙ্গের 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি'। এইরূপ প্রশ্ন উঠিল, উভয় সভাকে মিলিত করা যায় কি না? রামগোপাল ঘোষ, দিগম্বর মিত্র প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তির উদ্যোগে ও উৎসাহে অবশেষে ঐ সম্মিলন কার্য সমাধা হইল। ১৮৫১ সালের ৩১ অক্টোবর এক সাধারণ সভা আহূত হইয়া, উক্ত উভয় সভা সম্মিলিত করিয়া বর্তমান 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' স্থাপিত হইল।"
>
> রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ

মাদ্রাজে, এই বছরের শেষ দিকে, মধুসূদন সম্পাদক হলেন অ্যাবেল সিমকিন্সের Eurasian সাপ্তাহিক পত্রিকার। এই পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে ছাপা হতে শুরু করে মধুসূদনের Rijia নাটক।

সম্ভবত ডাফ সাহেব ভাবছিলেন স্টকল্যান্ডে যাওয়ার কথা। লালবিহারী দে অনুরোধ জানান তাঁকে সঙ্গে নেওয়ার। ডাফ কোনো উত্তর না দেওয়ায় ক্ষুণ্ণ হলেন লালবিহারী। খৃস্টধর্ম আর দর্শন বিষয়ে আরও উন্নত শিক্ষার জন্যেই তাঁর ঐ আগ্রহ।

কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় প্রথম হলেন উমেশচন্দ্র দত্তগুপ্ত। ইংরেজিতে ৬০-এ ৪৭। তাই কৃষ্ণনগর কলেজে ঐ বছরটি খ্যাত হয়ে ওঠে 'উমেশ দত্ত ইয়ার' নামে।

চন্দননগরে শিল্পী বসন্তলাল মিত্রের জন্ম। বাবা প্রাণকৃষ্ণ গায়ক আর কবি।

১৮ বছর বয়সে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেন কানাইলাল দে সরকার। রসায়নে খ্যাতি তাঁর খুবই।

সুরেন্দ্রনাথ যুগের প্রখ্যাত বক্তা ও প্রতিবাদী নেতা লালমোহন ঘোষ-এর জন্ম নদীয়ার কৃষ্ণনগরে। বাবা, রামলোচন। কবি মনোমোহন ঘোষ, বড়দাদা।

বেরলো মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। প্রথম ভাগ কাউন্সিল অব এডুকেশনের বেথুন সাহেবকে উৎসর্গ করা।

> "অনেকেই অবগত আছেন, প্রথম পাঠোপযোগী পুস্তকের অসদ্ভাবে অস্মদ্দেশীয় শিশুগণের যথানিয়মে স্বদেশ ভাষাশিক্ষা সম্পন্ন হইতেছে না। আমি সেই অসদ্ভাব নিরাকরণ ও বিশেষতঃ বালিকাগণের শিক্ষা সংশোধন করিবার আশয়ে যে পুস্তক পরম্পরা প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এই কয়েকটি পত্রদ্বারা তাহার প্রাথমিক সূত্রপাত হইল।"

এই শিশুশিক্ষা প্রথম ভাগেই ছিল আজকের কালের অনেকেরই ছেলেবেলায় পড়া প্রিয় পদ্য—

> "পাখী সব করে সব রাতি পোহাইল
> কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল।"

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বয়স ৬ বছর। হাতে খড়ি গ্রামের পাঠশালায়। দু বছর পরে মারা যাবেন মা। মানুষ করবেন জেঠাইমা।

বর্ধমানের গঙ্গাটিকুরি গ্রামে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম। পঞ্চানন্দ আর পাঁচু ঠাকুর ছদ্মনামে তিনি বাংলা সাহিত্যকে মাতিয়ে তুলেছিলেন ব্যঙ্গাত্মক রচনায়। বাবা, বামাচরণ ছিলেন পূর্ণিয়ার উকিল।

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিহারীলাল গুপ্ত-র জন্ম কলকাতায়। বাবা, চন্দ্রশেখর।

১৬ জানুয়ারি

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড রাইটার ও কোষাধ্যক্ষ। এই চাকরি করতে করতে তিনি অতিরিক্ত ছাত্র হিসেবে পড়তেন ডাক্তারি। বিশেষ ভাবে ডাক্তারি পড়ার জন্যে এই তারিখে তাঁর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে পদত্যাগ।

২ ফেব্রুয়ারি

এই বছরের গোড়ায় বাঙালিদের মধ্যে প্রথম হিসেবে কাশীপ্রসাদ ঘোষ গড়লেন নিজের ইংরেজি হরফের ছাপাখানা। এই তারিখের 'সম্বাদ ভাস্কর' লিখলে—

> "আমরা আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি হিন্দু ইন্টেলিজেন্সিয়ার পত্রের পরযন্ত্র-যন্ত্রণা ভোগ পরিত্যাগ হইল, সম্পাদক মহাশয় স্বকীয় ব্যয়ে এক লৌহ যন্ত্র এবং অক্ষরাদি

ক্রয় করিয়াছেন। গত সোমবার অবধি সেই যন্ত্র হইতে হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সিয়ার প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে। এইক্ষণে দেশস্থ সব লোককে অনুরোধ করি যদি কেহ ইংরাজি ভাষায় পুস্তকাদি করেন তবে হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সিয়ার যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত করিতে পাঠাইবেন। বাঙ্গালিদিগের মধ্যে ইংরাজি ভাষায় সমাচার পত্রের জন্য আইরিন প্রেস আর নাই। শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ ঘোষ এই প্রথম পথ দেখাইলেন, অতএব দেশস্থ লোকেরা যথাবিহিত সহায়তা করিবেন।"

১৪ ফেব্রুয়ারি
মাদ্রাজ থেকে মধুসূদন গৌরদাস বসাককে জানাচ্ছেন বিয়ের খবর, এক নীলকর সাহেবের মেয়ে রেবেকা ম্যাকটাভিসকে।

মার্চ
ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় বেরলো 'সংবাদ বসসাগর' নামের সাপ্তাহিক পত্রিকা। কবি বঙ্গলাল গোড়া থেকেই যুক্ত ছিলেন এই পত্রিকার সঙ্গে। ক্ষেত্রমোহনের মৃত্যুর পর তিনিই সম্পাদক হলেন পত্রিকাটির নাম পালটে দিয়ে। নতুন নাম, 'সংবাদ সাগর'। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভাকবে লিখলেন—

> "আমাদিগেব স্নেহান্বিত সহযোগী বসসাগর সম্পাদক নূতন বৎসরেব শুভাগমনে বসসাগরকে বসহীন করিয়াছেন।... এই সাগর পূর্বে রসসাগর ছিল, এখন যশঃসাগব হউক।"

মার্চ
বাংলার ডেপুটি গভর্নর স্যার হার্বার্ট ম্যাডকের সৌজন্যে ২০০ টাকা মাইনেয় আলিপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হলেন আবদুল লতিফ খাঁ। এর আগে ছিলেন কলকাতা মাদ্রাসার ইঙ্গ-আরব্য বিভাগের শিক্ষক।

১ মার্চ
৫ হাজার টাকা জামিন দিয়ে, ৮০ টাকা মাইনেয় বিদ্যাসাগর পেয়ে গেলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড রাইটার আব কোষাধ্যক্ষের পদ।

১৯ মার্চ
এই তারিখের পরে কোনো একদিন পুস্তকাকাবে বেরোয মধুসূদনের ইংরেজি কবিতার বই 'The Captive Ladie, Visions of the Past. এর অনেক কবিতাই Disjecta Membra Poetae শিরোনামে বেরোয়। আর কবির ছদ্মনাম ছিল Timothy Pempoem esq. যখন বিভিন্ন পত্রিকায় কবিতাগুলো বেরচ্ছিল, মধুসূদন চেয়েছিলেন বইটি উৎসর্গ করবেন সহকর্মী যোশেফ রিচার্ড নেলারকে। কিন্তু তার বদলে করলেন অ্যাডভোকেট জেনারেল জর্জ নর্টনকে। কারণ তাঁর সাহায্যে ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার সম্ভাবনা বেশি। এই কবিতা পড়েই বেথুন তাঁকে অনুরোধ জানান মাতৃভাষার চর্চা করতে।

২২ মার্চ
চব্বিশ পরগনার বারুইপুরে, শিখরখালি গ্রামে শিল্পী অন্নদাপ্রসাদ বাগচীর জন্ম। বাবা, চন্দ্রকান্ত। মা, মৃন্ময়ী দেবী।

৬ এপ্রিল
সৈয়দ আমীর আলীর জন্ম।

৪ মে
জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পঞ্চম পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্ম।

৭ মে
কলকাতায় হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠাতা ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন। বারাসত বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করেই তাঁর মনের ভিতরে তীব্র ইচ্ছার আলোড়ন, কলকাতায় গড়তে হবে মেয়েদের লেখাপড়া শেখার জন্যে এমনি একটি বিদ্যালয়। প্রথমে এই স্কুলের নাম ছিল 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল'। যদিও 'সংবাদ প্রভাকর' লিখেছিল 'ভিকটোরিয়া বাংলা বিদ্যালয়'। দুদিন পরে ছাপা হয় 'ভিকটোরিয়া বালিকা বিদ্যালয়', জুন মাসের ৪ তারিখের কাগজে লেখেন কেবল 'বালিকা বিদ্যালয়'। আসলে এই স্কুলের নামকরণের সময় রানী ভিকটোরিয়া-র প্রসঙ্গ উঠেছিল একবার। সেটা মনোনীত হয়নি শেষ পর্যন্ত। প্রভাকর-সম্পাদক ভেবে নিয়েছিলেন, হয়েছে বুঝি। পরে নাম পাল্টে এই স্কুলই হয়ে যাবে 'বেথুন স্কুল'। প্রতিষ্ঠার দিনে বেথুন কোনো মিশনারি সাহেব বা দেশীয় গণ্যমান্যদের নিমন্ত্রণ করেন নি। যেমন, আমন্ত্রিত হননি রাধাকান্ত দেব, কালীকৃষ্ণ, আশুতোষ দেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর। কোনো রকম সরকারি সাহায্যও চাননি তিনি। উদবোধনী ভাষণে বেথুন বলেছিলেন—

> "কারও ধর্মে হস্তক্ষেপ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমি জানি, মেয়েদের উচ্চশিক্ষার কথা বললে অনেকে বিদ্রূপের হাসি হেসে থাকেন। তাঁদের ধারণা, মেয়েরা যে-শিক্ষা পাবে তা তাদের জীবনে কোন কাজেই লাগবে না। বাস্তবিক শিক্ষা যদি তাই দেওয়া হয়, তাহলে তাঁদের সঙ্গে আমিও সেই শিক্ষাকে বিদ্রূপ করব। কিন্তু শিক্ষা সম্বন্ধে আমার মতামত, যা আমি আগেও ব্যক্ত করেছি, আপনারা যদি তা লক্ষ্য করে থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই দেখেছেন যে আমি মাতৃভাষা শিক্ষাচর্চার উপরই জোর দিয়েছি বেশি। ইংরেজি শিক্ষার কথা বলেছি, ইংরেজি সাহিত্য অনেক উন্নত বলে। বাংলা দেশের ছেলেমেয়েরা ইংরেজি শিক্ষা করে নিজের মাতৃভাষার ও সাহিত্যের উন্নতি সাধন করবে, এই আমার ইচ্ছা। এই বিদ্যালয়ের মেয়েদের প্রথমে ভালো করে বাংলা শিক্ষা দেওয়া হবে, তারপর কিছু কিছু ইংরেজিও শেখানো হবে। এছাড়া সেলাই, অঙ্কন, হাতের কাজ, প্রভৃতি মেয়েদের যে বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় আছে, সেগুলিও শিক্ষা দেওয়া হবে।"

বিভিন্ন বাড়ি থেকে মেয়েদের আনার জন্যে বেথুন ব্যবস্থা করেছিলেন একটা ঘোড়ার গাড়ির। বিদ্যাসাগর সেই গাড়ির গায়ে খোদাই করে দিয়েছিলেন একটা শাস্ত্রবচন: 'কন্যাপবেৎ পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ'। স্কুল খোলা হলে প্রথম যে দুটি ছাত্রী ভর্তি হয় তারা বিদ্যাসাগরের অন্তরঙ্গ বন্ধু মদনমোহন তর্কালংকারের মেয়ে, ভুবনমালা আর কুন্দবালা। স্কুল শুরু হয় ২১ জন ছাত্রীকে নিয়ে। কয়েক বছর পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও তাঁর মেয়ে সৌদামিনী দেবীকে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন এই স্কুলে।

১২ মে
সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি বিভাগের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে যোগ দিলেন রাজনারায়ণ বসু,

৭০ টাকা মাইনেয়। তাঁর কৃতী ছাত্রীদের মধ্যে কয়েকজন— রামগতি ন্যায়রত্ন, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ আর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

১ জুন
হিন্দু কলেজে ডেভিড হেয়ারের সপ্তম মৃত্যুবার্ষিকী সভায় কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাপাঠ। সভাপতি, রামগোপাল ঘোষ। যথেষ্ট জনসমাগম। বিশিষ্ট ইংরেজদের মধ্যে উপস্থিত বেথুন, মৌয়াট আর মিঃ বেলফার। কৃষ্ণমোহনের লিখিত ভাষণে মুগ্ধ হয়ে বেথুনের প্রস্তাব, প্রবন্ধটিকে ছাপানোর।
এ বছরেও এই কমিটি থেকে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে ছাত্রদের কাছ থেকে রচনা চেয়ে।

> "হিন্দু স্ত্রী গণের বিদ্যাশিক্ষার কর্ত্তব্যতা বিষয়ে যে ছাত্র উত্তমরূপে আপনাভিপ্রায় লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেক তাহাকে ৭৫ টাকা পারিতোষিক দেওয়া যাইবেক।"

১ মে-র মধ্যে ঐ প্রবন্ধ সম্পাদক প্যারীচাঁদ মিত্রের কাছে পাঠানোর নির্দেশ। প্রবন্ধের পরীক্ষক ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ আর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রবন্ধ পাঠিয়েছিল সংস্কৃত আর হিন্দু কলেজের ৫ জন ছাত্র। এদের মধ্যে প্রথম হয়েছিলেন তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য। পুরস্কার মিলেছিল ৭৫ টাকা। পরের বছর এই রচনাটি বই বা পুস্তিকা হিসেবে ছাপা হয় 'ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা' নামে।

২৩ জুন
'সম্বাদ ভাস্কর' থেকে জানা গেল এই মাসে বেরিয়েছে 'সত্যধর্ম-প্রকাশিকা' মাসিক পত্র। সম্পাদক, শ্যামবাজারের গোবিন্দচন্দ্র দে।

জুলাই
'সম্বাদ রসরাজ'-এর সঙ্গে লড়াই চালানোর অভিপ্রায়ে বেরল 'সম্বাদ রসমুদগর' নামের পত্রিকা।

১৮ জুলাই
তিব্বতী ভাষা বিশারদ শরচ্চন্দ্র দাশ-এর জন্ম চট্টগ্রামের আলমপুরে। বাবা, দীনদয়াল ওবফে মাগনদাস।

অগাস্ট
বাজনারায়ণ মিত্রের সম্পাদনায় বেরল 'কৌস্তুভ কিরণ' নামের পাক্ষিক।

১৮ অগাস্ট
বেথুন সাহেবের অনুরোধকে অগ্রাহ্য করতে না পেরে মাতৃভাষার সমৃদ্ধির কথা মনে রেখে মধুসূদন বিভিন্ন ভাষা শেখায় নিজের মনোযোগের কথা জানাচ্ছেন চিঠিতে, গৌরদাস বসাককে—

> "...Perhaps you do not know that I devote several hours daily to Tamil. My life is more busy than that of a school boy. Here is my routine: 6 to 8 Hebrew. 8 to 12 school. 12-2 Greek. 2-5 Telegu and Sanskrit.

5-7 Latin. 7-10 English. Am I not preparing for the great object of embellishing the tongue of my fathers?"

২৩ অগাস্ট
হাওড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে যোগ দিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়। সরকারি রিপোর্টে এটাই ছিল তাঁর নিয়োগের তারিখ।

সেপ্টেম্বর
বাংলা ভাষায় প্রথম বাণিজ্য-সংক্রান্ত দৈনিক পত্রিকা বেরলো 'মহাজন দর্পণ' নামে। সম্পাদক, জয়কালী বসু।
দেবেন্দ্রনাথ বেরলেন আসাম ভ্রমণে। সহযাত্রী রাজনারায়ণ বসু। তাঁর অকপট বিবরণ—

"ইংরাজী ১৮৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দেবেন্দ্রবাবু ও আমি আসাম প্রদেশ দেখিবার জন্য Captain Hickely সাহেবের নেতৃত্বের অধীন 'যমুনা' নামক স্টিমারে আরোহণ করি, তখন আমার বয়ঃক্রম তেইশ বৎসর। আমরা গঙ্গাসাগর, তৎপর বড়-সুন্দরবন দিয়া, আসামাভিমুখে গমন করি।...

আমাদিগের প্রত্যেকের নিকট হইতে খাই-খরচ দরুন কাপ্তেন সাহেব ৪ টাকা করিয়া লইতেন কিন্তু পেট ভরিয়া খাইতে দিতেন না। এরূপ কাপ্তেন আমরা কখন দেখি নাই।...

আমার ধাতু বরাবর গাঢ় বাঙ্গালীতর। আমার কলেজে শিক্ষা উহার উপর পাশ্চাত্য সভ্যতা জোর করিয়া আরোপ করিয়াছিল মাত্র।...

আমি মধ্যে মধ্যে খানা ও মদ খাইতাম বটে, কিন্তু সচরাচর প্রত্যহ দুই বেলা মাছের ঝোল ভাত না খাইলে চলিত না। ক্রমাগত মদ ও খানা খাইলে শরীর অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিত। স্টিমারে কিরূপ জীবন যাপন করিতে হয়, তাহা পূর্ব্বে জানিলে সেইরূপ উপায় করা যাইত; অর্থাৎ ফুলেল তৈল ইত্যাদি সঙ্গে লইতাম। স্টিমারে রুক্ষ স্নান ও দিবসের মধ্যে তিনবার অর্থাৎ হাজরি টিফিন ও ডিনরে মাংস খাওয়াতে, ঢাকায় না পৌঁছিতে পৌঁছিতে তিন চারি দিবসের মধ্যে বিজাতীয় গরম হইয়া উঠিল; রাত্রিতে ঘুম হয় না। ঢাকায় যখন স্টীমার পৌঁছিল, তখন আমাকে ছাড়িয়া দিতে দেবেন্দ্রবাবুকে অনেক অনুনয়-বিনয় করিলাম। তিনি আমাকে ঢাকায় নামাইয়া দিলেন। আমি মাছের ঝোল খাইবার অভিলাষে আমার কলেজের সমাধ্যায়ী শ্রীযুক্ত ঈ. চ. মি.-র বাসায় আশ্রয় লইতে তদভিমুখে গমন করিলাম।"

আত্মচরিত

১৩ সেপ্টেম্বর
মানিকগঞ্জ মহকুমার মতু গ্রামে মামার বাড়িতে রজনীকান্ত গুপ্তের জন্ম। বাবা, কমলাকান্ত।

১৮ অক্টোবর
ভূদেব হাওড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন এই তারিখে।

২১ অক্টোবর
বর্ধমানের মাহাতা রামচন্দ্রপুর গ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে কবি রাজকৃষ্ণ রায়-এর জন্ম। আট বছর বয়সে পিতৃহীন।

২৭ অক্টোবর
খাগড়ায় সাহিত্যিক চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের জন্ম। বাবা, বীরেশ্বর। পিতামহ, রামচন্দ্র। কলকাতা আর মুর্শিদাবাদে ছিল রেশমের কুঠী।

.১ নভেম্বর
হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র গুরুচরণ সিং-এর খৃস্টধর্মে দীক্ষা। বিধর্মী অভিযোগে অতঃপর তাকে কলেজ থেকে বহিষ্কারের চেষ্টা।

১৪ নভেম্বর
চরিত্রহীনতার অভিযোগে রিচার্ডসনকে হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে অপসাবণের জন্যে বেথুনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাতে রমানাথ ঠাকুরেব সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সভা।

> "রিচার্ডসন ছাত্রদের এত প্রিয় ছিলেন যে, প্রথম শ্রেণীর কুড়িজন ছাত্র অধ্যক্ষ রিচার্ডসনকে কেন তাঁহাবা সম্বর্ধনা করিতে বিরত ছিলেন তাহাব কৈফিযৎ দিয়া সংবাদপত্রে একখানি পত্র লেখেন। ঐ ছাত্রগণকে ঐ বৎসর সবকারী বৃত্তি পরীক্ষা দিতে দেওয়া হয় নাই। উপরন্তু বেথুন ১৮৫০, ২৪ জানুয়ারীতে অনুষ্ঠিত কলিকাতা টাউন হলে কলেজের পুরস্কার বিতরণী সভায় নিয়মভঙ্গের জন্য তাহাদের অত্যন্ত ভর্ৎসনা করেন।"
>
> জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন/যোগেশচন্দ্র বাগল

২৩ নভেম্বর
গুরুচরণ সিং-কে কলেজ থেকে বহিষ্কারের আদেশপত্রে সই করেও বেথুন হিন্দু কলেজ কমিটির কাছে প্রশ্ন তুললেন হুগলি কলেজ বা প্রিন্স গোলাম মহম্মদেব বসাপাগলা স্কুলের মতো এখানেও খৃস্টান, মুসলমান আর হিন্দু ছাত্রেরা একসঙ্গে পড়তে পাববে না কেন? অধ্যক্ষ বাধাকান্ত দেব আব সম্পাদক রসময় দত্তের সঙ্গে এই প্রসঙ্গে তাঁব বাদানুবাদ।

ডিসেম্বর
বর্ধমান থেকে বেরলো দুটো পত্রিকা। 'সংবাদ বর্দ্ধমান জ্ঞানপ্রদায়িনী' আর 'বর্দ্ধমান চন্দ্রোদয়'। দুটোই সাপ্তাহিক। আর কলকাতা থেকে বেরলো নতুন এক পাক্ষিক 'সংবাদ রসবত্নাকর'।

২৯ ডিসেম্বর
বেথুনের প্রস্তাব-করা আইন-সংস্কার-এর বিরুদ্ধে ইংরেজদের জনসভা। একটা স্মারকলিপিও তৈরি হয় তাঁর বিরুদ্ধে।

১৮৫০

বঙ্কিম এখন বারোয়।

এই বয়সের বঙ্কিম আমাদের অনেকখানিই অপরিচিত। বারো বছরের রবীন্দ্রনাথকে আমরা যতখানি জেনে নিতে পারি তাঁর 'জীবনস্মৃতি'র আত্মকথন ছাড়াও আরও নানা অনুষঙ্গে, তেমন উপকরণ বঙ্কিমের ক্ষেত্রে নিতান্তই অপ্রতুল। হয়তো একেবারেই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে যেতেন তিনি যদি না ছোটো ভাই পূর্ণচন্দ্রের গল্প-কথায় খুঁজে পাওয়া যেত তাঁর ঐ বয়সের চলন-বলনের কিছু আভাস।

এ বুঝি ইতিহাসেরই এক পরিহাস যে, বাঙলার ইতিহাস নেই বলে যাঁর খেদ, নিজের জীবনেতিহাসের বেলায় সেই তিনিই রয়ে যাবেন চির-উদাসীন। আর আগ্রহী পাঠকের উষ্ণ ঔৎসুক্যকে জুড়িয়ে দেবেন এই বলে—

> "আমার জীবন অসার, তা লিখিয়া কি হইবে ? সকল কথা বলা সহজ নহে, জীবনে অনেক ভ্রম-প্রমাদ আছে, তা বলা বড় কঠিন, কাজেই জীবনী হইল না।"

ভ্রম ও প্রমাদকে রক্তমাংসের সঙ্গে একাকার করে দিয়ে যিনি বিরতিহীন গড়ে যাবেন বাংলা সাহিত্যের অজস্র উজ্জ্বল প্রাণময় চরিত্র, নিজের জীবনচরিতের বেলায় তেমন উন্মোচনকেই মনে হবে তাঁর প্রকাণ্ড কঠিন কাজ, এ এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। আরো বিস্ময়কর এই কারণে যে, বঙ্কিমের ক্রমবিকাশ ঘটবে যে সাংস্কৃতিক আবহে সেখানে জীবনী বা জীবনচরিত-চর্চা ক্রমশই দখল করে নেবে একটা বড়ো জায়গা। আর তারই অবধারিত প্রভাবে বাংলা সাহিত্যের একাধিক উপন্যাসের নামকরণেও জুড়ে যাবে 'চরিত' শব্দটি।

বাঙালির লেখা বাংলা গদ্যের প্রথম বই রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'। এরপর রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় লিখবেন 'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং'। বিদ্যাসাগর লিখবেন 'জীবন চরিত' আর 'বাসুদেব চরিত'। এ ছাড়া আছে—

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'ডমরু চরিত'।

যোগেন্দ্রনাথ বসুর 'চিনিবাস চরিতামৃত'।

বঙ্কিম তখনো জন্মাননি। তারও ১৩ বছর আগে অর্থাৎ ১৮২৫-এ 'বেঙ্গল হরকরা' কাগজে বেরনো বিজ্ঞাপন থেকে জানা গেছে কলকাতার বইয়ের দোকানে এসে পৌঁছনো একগুচ্ছ বইয়ের খবর। সে-সব বইয়ে জীবনচরিতেরই প্রাধান্য। আর এইসব অগণ্য জীবনচরিত ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর চেতনায় ছড়িয়ে দেবে এমনই লম্বা শিকড় যে, তাঁদের কলমে ক্রমাগত লেখা হতে থাকবে সমকালের শ্রেষ্ঠ মানুষদের জীবন কাহিনী, বক্তৃতায়, পত্রিকায় আর পুস্তকাকারে। ডেভিড হেয়ারের প্রয়াণের পর তাঁর প্রথম মৃত্যু-বার্ষিকী সভায় প্রস্তাব, হেয়ারের জীবনচরিত রচনার। লেখায় হাত দেন প্যারীচাঁদ মিত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যজীবনের ইতিহাস খুঁজে না পাওয়ায় আমরা যতখানি হতাশ, ঠিক সেই রকম প্রতিক্রিয়া কলকাতা থেকে বিলেতে খবর ছুটল হেয়ারের ভাই যোশেফ হেয়ারের কাছে রামমোহনের পালিত পুত্র রাজারামের মারফত। তথ্য চাই হেয়ারের কলকাতা-পূর্ব জীবনের। কিন্তু উত্তর এসে পৌঁছয়নি দু বছরেও। ১৮৫৪-য় দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন দ্বিতীয়বার পাড়ি দিতে চলেছেন বিলেতে, মনে রেখেছিলেন ঐ শূন্যস্থান পূরণের সমস্যাটি। বিলেতে পৌঁছে নিজেই উদ্যোগ নিয়েছিলেন তথ্য সংগ্রহে। কিন্তু তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে ফলাফল রয়ে গেল অজ্ঞাত।

কিশোরীচাঁদ মিত্রের কাছে দ্বারকানাথ ঠাকুর নতুন জাগা বাংলার 'Representative Man'। লিখতে বসলেন তাঁর জীবনী। আর তখনই, আনত শ্রদ্ধাসহকারেই জানিয়ে দিলেন "But Dwarkanath was not a perfect man, and I do not purpose to paint him as perfection". অর্থাৎ কিশোরীচাঁদ-এর দ্বারকানাথ ভ্রম-প্রমাদসহই এক স্মবণীয় মানুষ।

বসওয়েলের জনসন তখন পৌঁছে গেছে কলকাতায়। কলকাতায় জনসন-ভক্তের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তির পথে। বন্ধু গৌরদাস বসাককে লেখা মধুসূদনের এক চিঠিতে রয়েছে বসওয়েল বন্দনা।

> "The best biography is that from which we can know the outer as well as the inner man. There are two books, so far as my little reading goes, which do this— Boswell's life of Johnson, and Abul Fazl's Ayin-i-Akbari. We know Johnson and Akbar as we know any one living amongst us."

জনসন থেকেই জীবনী সাহিত্যের দুটো স্বতন্ত্র চেহারা। একদিকে 'Panegyric' অর্থাৎ স্তবস্তুতিময় প্রশস্তি। অন্যদিকে 'life', যেখানে দোষ-গুণ, পাপ-পুণ্য, আলো-অন্ধকার সমস্ত-কিছুকেই স্বাগত-সম্ভাষণ। এরপর আর বরণীয় জীবন বৃত্তান্ত রচনার সময় চরিত্রের অন্তর্গত ভ্রম-প্রমাদকে ভাসিয়ে দেওয়া হল না বিসর্জনের জলে। পাঠকও সম্ভবত পরিতুষ্ট চুনকামহীন একটা আস্ত মানুষকে পেয়ে।

বঙ্কিম এসব দেখছেন, শুনছেন, এবং পড়ছেনও। তবুও তাঁর ভ্রম-প্রমাদকে ভয় ? তবুও তাঁর মনে হল এই জাতীয় জীবন-উদঘাটন বড়ো কঠিন কাজ ? কঠিন মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথেরও। তাই 'জীবনস্মৃতি'র পাঠকদের খাসমহলের দরজার কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েই তাঁর আকস্মিক অন্তর্ধান। কেন অমন অসময়ের বিদায় ? ভ্রম-প্রমাদের গভীর কোনো পরিখার মুখোমুখি হওয়ার উদবেগে ? না। রবীন্দ্রনাথের বেলায় বড়ো হয়ে উঠেছিল পরবর্তী জীবনের সেইসব ভাঙাগড়া, জয় পরাজয়, সংঘাত সম্মিলন; যাদের আর এঁকে দেখানো যায় না ছবির মতো করে।

'জীবনস্মৃতি' পাঠক তবু তো ভুলতে পারে না-পাওয়ার শোকের অনেকখানি। ভাবতে পারে, যতখানি আঁকা যায় ছবির গড়নে, ততখানি তো এঁকে দিয়েছেন তবু। কিন্তু বঙ্কিম ?

ভ্রম-প্রমাদ কি আঁকচারা কেটে বসেছিল তাঁর আবাল্য জীবনের গায়েই ? সে তো অসম্ভব। তা হলে ততটুকু বা লিখলেন না কেন, যতটুকু ভ্রম-প্রমাদের সূচনা-সীমার এপারে ?

২

পূর্ণচন্দ্রের 'বঙ্কিমচন্দ্র ও কথক ঠাকুর' লেখাটির মধ্যেই দশ, এগারো, বা বারো বছরের বঙ্কিমের যৎসামান্য তথ্যচিত্র।

তখন কী রকম দেখতে বঙ্কিমকে ?

অনেক বালকের মধ্যে অসামান্য। "রূপবান বলিয়া নহে, তাহার মুখে কি এক অনির্বচনীয় ভাব ছিল"।

বয়স্ক বঙ্কিমের ফোটোগ্রাফ, তৈলচিত্র, ভাস্কর্য, বঙ্কিমকে নিয়ে তাঁর সমকালীনদের স্মৃতিচিত্রেব ভিতরে অক্ষরে-আঁকা প্রতিকৃতি অথবা অন্তঃপ্রকৃতি—সর্বত্রই তিনি গম্ভীর, ব্যক্তিত্ববান, পৌরুষদীপ্ত, চিন্তাশীল, আত্মমগ্ন, অহংকারী এবং স্বতন্ত্র। এর বাইরের কোনো বঙ্কিমের সঙ্গে যে আমাদের একেবারেই পরিচয় ঘটেনি তা নয়। ১৯৫০-এর পিছন দিকের বছরগুলোয় তাঁর বালক বয়সের নিঃসঙ্গতা, সংগীতপ্রিয়তা, প্রকৃতিপ্রেম, চাপল্য, বীরত্ব ইত্যাদির নানা টুকরো ছবির সঙ্গে চেনা পরিচয় ঘটে গেছে অবশ্যই। কিন্তু এই বিশেষ রচনাটিতে, বিবাহ-পরবর্তী বালক-বয়সী বঙ্কিমের যে ছবি, তার চরিত্র আলাদা। এই প্রথম তাঁর কৌতুকপ্রিয়তা, রহস্যালাপ, ঠাট্টা-বিদ্রূপের দিকে ঝোঁক, উদ্ভটকে বাস্তব করে তোলার কল্পনাশক্তি—আমাদের অভিজ্ঞতার কাছাকাছি। এ লেখায় ইতিপূর্বে অপরিচিত তাঁর কোনো দ্বিতীয় সত্তার আবরণ উন্মোচন যেন।

বসেছে কথকতার আসর, সময়াভাবে দূরদেশ থেকে যোগ্য কথকঠাকুরকে আনতে না পারায় জনৈক স্থানীয় কথকই সেদিন বেদীতে সমাসীন। পূর্ণচন্দ্রের কলমে কথক ঠাকুরের বর্ণনা—

> "শীর্ণ ও শুষ্ক শরীর, দেহের মধ্যে কোনো স্থানে সরু মোটা নাই; নাসিকাটি বড় লম্বা ও তাহার উপরের ফোঁটাটিও তদ্রূপ লম্বা, নাসিকার উভয় পার্শ্বে চক্ষু দুটি এত ক্ষুদ্র যে, দেখলে ডেঁয়ো পিঁপড়ে মনে হয়। মস্তক কেশহীন। কণ্ঠে তুলসীর মালা, গলায় একছড়া মালা, গাত্রে নামাবলী, সম্মুখে একখানি পুঁথি উহাতে যথেষ্ট চন্দনের চিহ্ন...। তাঁহার পশ্চাতে একটি তাকিয়া; কথকঠাকুর বক্তৃতা করিতে করিতে, ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে, এক একবার ঐ তাকিয়াতে ঠেস দিতেছেন। তাঁর হাত মুখ নাড়া বড় রহস্যজনক, বিশেষতঃ শ্বেত সুবৃহৎ দন্তগুলির জন্য আরও রহস্যজনক।"

কথকতার বেদীর বাঁদিকে কয়েকটি বালক। বঙ্কিমও তাঁদের সঙ্গে। বালকদের মধ্যে যারা বয়সে বড়ো, কথকতা শুনতে ভালো না লাগার বিস্বাদ থেকেই বঙ্কিম তাদের সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতায় মগ্ন। বঙ্কিম বলে যান, আর তারা লুটোপুটি খায় হাসিতে। পূর্ণচন্দ্র স্মৃতি থেকে উদ্ধার করেছেন সে রঙ্গ-রসিকতার কিছু ভগ্নাংশ।

বঙ্কিম—কথকঠাকুরের নাকটা বড় পেটুক।

একটি বালক—মানুষ পেটুক শুনিয়াছি; মানুষের নাক পেটুক, এমন তো কখনো শুনি নাই।

বঙ্কিম—আমি তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি শুন; কথকঠাকুরের নাকটা ঠোঁট ছাড়াইয়া গালের উপর উঁকি মারিতেছে। দেখিতেছ তো ?

বালক—হ্যাঁ।

বঙ্কিম—কেন বল দেখি ?

বালক—তা জানিব কেমন করে ?

বঙ্কিম—কথকঠাকুর যখন আহার করেন, তখন নাকটা গালের ভিতর হইতে আহারের দ্রব্যাদি চুরি করিয়া খায়। কথকঠাকুর উহা জানিতে পারেন না।

বালকদের উচ্চহাসি পৌঁছয় বয়স্কদের কানে। কেউ প্রশ্রয় দেন হাসতে হাসতে। কেউ বালক বঙ্কিমকে ছুঁড়ে দেন পাল্টা প্রশ্ন।—আচ্ছা, এখন তো কথকঠাকুর কিছু খাচ্ছেন না, তাহলে নাকটা কি খাবার লোভে মুখের ভেতর উঁকি মারছে ?

একটুও না-ঘাবড়িয়ে বঙ্কিমের উত্তর

—এখন নাক কথকঠাকুরকে খাওয়াইতেছে।

—কি ভাবে ?

—নাকের সরস নস্য কথকঠাকুরের গালের ভিতর ফোঁটা ফোঁটা ঢালিতেছে, আর তিনি মাথা নাড়িতে নাড়িতে খাইতে অস্বীকার করিতেছেন, আর মুহুর্মুহু গামছা দিয়া ঠোঁট মুছিতেছেন। কথকতার সময় কথকঠাকুরের আর সব-কিছুকে ছেড়ে দিয়ে বঙ্কিমের চোখ বেছে নিয়েছিল তাঁর নাকটাকেই। অতঃপর ঐ নাক নিয়েই তাঁর যা-কিছু কটাক্ষ। কিন্তু একদিনের রঙ্গ-রসিকতাতেই শেষ হয়ে যায় নি তার রেশ। কথকঠাকুরের ঐ নাক বঙ্কিমের স্মৃতিতে ছাপ ফেলেছিল বেশ পাকা রঙের। ঘটনার ১৪ বছর পরেও ভুলতে পারেন নি তাই। জীবনের প্রথম বাংলা উপন্যাস লিখছেন যখন, সেখানে খানিকটা কৌতুকরস আমদানীর প্রয়োজনেই গড়তে হল গজপতি বিদ্যাদিগগজ-এর চরিত্র। 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের একাদশ পরিচ্ছেদে বিদ্যাদিগগজ-এর বর্ণনা—

> "দিগ্‌গজ মহাশয় দৈর্ঘ্যে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাত হইবেন, প্রস্থে বড় জোর আধ হাত তিন আঙুল। পা দুইখানি কাঁকাল হইতে মাটি পর্যন্ত মাপিলে চৌদ্দ পুয়া চারি হাত হইবেক; প্রস্থে রলা কাষ্ঠের পরিমাণ। বর্ণ দোয়াতের কালি; বোধ হয়, অগ্নি কাষ্ঠভ্রমে পা দুখানি ভক্ষণ করিতে বসিয়াছিলেন, কিছুমাত্র রস না পাইয়া অর্দ্ধেক অঙ্গার করিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন। দিগ্‌গজ মহাশয় অধিক দৈর্ঘ্যবশতঃ একটু একটু কুঁজো, অবয়বের মধ্যে নাসিকা প্রবল, শরীরের মাংসাভাব সেইখানেই সংশোধন হইয়াছে। মাথাটি বেহারা-কামান..."

বাস্তব আর কল্পিত, দুই চরিত্রের মধ্যেকার মিলটা যে আকস্মিকতার উপহার নয়, তা এখন অস্পষ্টতাহীন।

কিন্তু এখানেই ফুরিয়ে যায়নি তাঁর ঐ বয়সের রহস্যপ্রিয়তার সবটুকু। বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি সহকারে কথকঠাকুরের সেদিনের গানে কিছুতেই মন বসাতে পারছিলেন না তিনি। আসর ছেড়ে উঠে যাওয়াও অসম্ভব, যেহেতু আসরটা বসেছে তাঁদেরই বাড়িতে আর আশেপাশে গুরুজন। অথচ ক্লান্তিকর আব দৃষ্টিকটু এই অনুষ্ঠান থেকে পেতেই হবে নিষ্কৃতি। কী করে সেটা সম্ভব ? ভাবতে ভাবতে তখুনি মাথায় খেলে গেল বুদ্ধি, বিরক্তি-উৎপাদককে উপভোগ্যতার ভিন্ন স্তরে উত্‌রিয়ে দিতে। নিজের কান দুটো বন্ধ করলেন দু হাতের দুই আঙুলে। সঙ্গে সঙ্গে পাশে-বসা পূর্ণচন্দ্রকেও একই নির্দেশ। পূর্ণচন্দ্র কান বন্ধ করলে

—গান শুনতে পাচ্ছিস ?

—একটু একটু পাচ্ছি।

—তাহলে আরও জোরে কান বন্ধ কর।

আরো জোরে কান বন্ধ করে কথক ঠাকুরের শব্দহীন বিচিত্র অঙ্গভঙ্গির দিকে তাকিয়ে পূর্ণচন্দ্রের চিৎকার করা হাসি। হাসি বঙ্কিমচন্দ্রেরও। সামনেই অগ্রজেরা। তাঁদের চোখ-রাঙানো

চাউনিতে দুজনেরই মাথা হেঁট লজ্জায়। তখনকার মতো মাথা হেঁট হলেও, দুষ্টুমিটা মাথা থেকে মুছে যায়নি তারপরও। পূর্ণচন্দ্রের সাক্ষ্যে, যৌবনেও বহাল ছিল ঐ অভ্যেস। গুরুগম্ভীর বঙ্কিমের অভ্যন্তরে কৈশোর কাল থেকেই লালিত হচ্ছিল দ্বিতীয় এক সত্তা, কলহাস্যপরায়ণতা দিয়ে যার শুরু, কশাঘাত পারদর্শিতায় যার শেষ। অর্থাৎ ঐ বারো বছর বয়সেই বঙ্কিমের চেতনায় বোনা হয়ে গেছে কমলাকান্তের বীজ।

সেপ্টেম্বর

প্রথম বছরের বাৎসরিক পরীক্ষায় সাধারণ পারদর্শিতার জন্যে হুগলি কলেজের স্কুল বিভাগের দুজন ছাত্রকে পুরস্কার। উমেশচন্দ্র শূর আর বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমের ইংরেজি শিক্ষক নবীনচন্দ্র দাস। নবীনচন্দ্র আর তাঁর ভাই যদুনাথ, দুজনেই ছিলেন এই কলেজেরই কৃতী ছাত্র। নবীনচন্দ্র এখানে মাইনে পেতেন ১০০ টাকা। পরের বছর হুগলি কলেজ ছেড়ে দিয়ে চলে যান বীরভূমের এক স্কুলের হেডমাস্টার হয়ে, ১৫০ টাকা মাইনেয়। পরে আরো নানা স্কুলে শিক্ষকতা করেছিলেন। এই শ্রেণীতে যা পড়তে হয়েছিল বঙ্কিমকে—

Literature : Azimghur Reader
2nd Poetical Reader
Pinnock's Catechism of English History
Grammar : Lennie's Grammar
(to 20th Rule of Syntax Writing)
Arithmetic : Extraction of the square root
Vulgar fraction
Geography : Stewart's Geography
(Europe, Asia, Africa)
Bengali : History of Bengal (বঙ্গেতিহাস)
Gynarnub (জ্ঞানার্ণব)

১৮৫০

বছরের প্রধান ঘটনাবলী

হাওড়া জেলাব আন্দুলের বিখ্যাত চৌধুরী বংশে কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর জন্ম। জ্যোতিরিন্দ্রনাথেব সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রে ঠাকুরবাড়ির আপনজন। বাবা অ্যাটর্নি মিহিবচন্দ্র চৌধুরী।

> "বাল্যকালে আমার কাব্যালোচনাব মস্ত একজন অনুকূল সুহৃদ জুটিযাছিল। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় জ্যোতিদাদার সহপাঠী বন্ধু ছিলেন। তিনি ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ.। সে সাহিত্যে তাঁহার যেমন ব্যুৎপত্তি তেমনি অনুবাগ ছিল। অপর পক্ষে বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণবপদকর্তা, কবিকঙ্কণ, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, হরু ঠাকুর, বাম বসু, নিধুবাবু, শ্রীধর কথক প্রভৃতির প্রতি তাঁহার অনুরাগের সীমা ছিল না। বাংলা কত উদ্ভট গানই তাঁহাব মুখস্থ ছিল। সে গান সুরে বেসুরে যেমন করিয়া পারেন, একেবারে মরিয়া হইয়া গাহিয়া যাইতেন।... গান এবং খণ্ডকাব্য লিখিতেও ইঁহার ক্ষিপ্রতা অসামান্য ছিল।... উদাসিনী নামে ইঁহার একখানি কাব্য তখনকার বঙ্গদর্শনে যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। ইঁহার অনেক গান লোককে গাহিতে শুনিয়াছি, কে যে তাহার রচয়িতা তাহা কেহ জানেও না।"

জীবনস্মৃতি/রবীন্দ্রনাথ

ডিরোজিয়ান শিবচন্দ্র দেব ডেপুটি কলেকটর-এর চাকরিতে বদলি হয়ে এলেন আলিপুরে। কিছুদিন পরেই ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা। প্রথমে নিজে, পরে গোটা পরিবার। এরপর একটানা ৪০ বছর ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ রূপায়ণেই নিয়োজিত রাখবেন নিজেকে।

জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে উত্তরপাড়ায় প্রতিষ্ঠা হল বালিকা বিদ্যালয়।

ঢাকার ব্রাহ্মণগাঁয়ে অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম। বিদেশ থেকে রসায়নবিদ্যার প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রথম হয়ে পুরস্কৃত হয়েছেন সর্বোচ্চ সম্মানে। দেশে ফিরে হায়দ্রাবাদের নিজামের আমন্ত্রণে সেখানকার শিক্ষাসংস্কারে ব্রতী। বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ, কবি

হারীন্দ্রনাথ তাঁর দুই ছেলে। কবি ও দেশনেত্রী সরোজিনী নাইডু মেয়ে।

মুর্শিদাবাদের মহুলা গ্রামে রামব্রহ্ম সান্যালের জন্ম। বাবা, বৈদ্যনাথ। বিশ্ববিখ্যাত উদ্ভিদ ও প্রাণীবিজ্ঞানী। ১৮৯৮-এ ইওরোপে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক জীববিজ্ঞানী সম্মেলনে তিনিই ছিলেন ভারতের প্রতিনিধি। কলকাতা পশুশালার তিনিই প্রথম তত্ত্বাবধায়ক।

বেরলো তারাশঙ্কর কবিরত্নের 'ভারতীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা'। ডেভিড হেয়ার স্মরণ সভায় পড়েছিলেন এই প্রবন্ধ। তাঁর স্মৃতি-রক্ষা কমিটিই এটি ছাপিয়ে দেয় পুস্তিকাকারে।

বেরলো মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা'র তৃতীয় ভাগ।

অক্ষয়কুমার দত্ত এই সময়ে 'সংবাদ প্রভাকর'-এর সঙ্গে যুক্ত। এই বছরের চৈত্রমাসে মেদিনীপুরে রাজনারায়ণ বসুকে তিনি যে চিঠিটি লিখেছিলেন, তা বেশ লক্ষণীয়।

> "প্রভাকর সম্পাদক আপনাকে একটি প্রার্থনা জানাইয়াছেন। মেদিনীপুরের সংবাদগুলি তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলে তিনি চরিতার্থ হইবেন এবং আপনার নিকট যাবজ্জীবন বাধিত থাকিবেন। ঝক্‌ড়া, মারামারি, ডাকাইতি, গৃহদাহ, চুরি, নরহত্যা প্রভৃতি যত প্রকার সর্বনাশের ব্যাপার আছে সকলই লিখিয়া দিবেন। বাস্তবিক দেখিবেন, লিখিতে হইলে মনুষ্যের অমঙ্গল সমাচারই অধিক লিখিতে হইবে। এই সকলই লোকের কার্য। এ লোকে আবার নিরবচ্ছিন্ন সুখের প্রত্যাশা!"

লঙ সাহেব যোগ দিলেন ঠাকুরপুকুরে সদ্য গড়ে-ওঠা ভার্নাকুলার প্রাইমারি স্কুলে। তার আগেই সেখানে খোলা হয়েছিল চার্চ সোসাইটির গির্জা। দুটোর দায়িত্ব লঙ সাহেবেরই উপর। এই বছরেই ঘটবে তাঁর দ্বিতীয় বারের বিয়ে ক্রিশ্চিয়ানা নামের এক ইংরেজ মহিলার সঙ্গে।

২৫ জানুয়ারি

বাগবাজারে বিখ্যাত অভিনেতা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফীর জন্ম। বাবা, শ্যামাচরণ।

২ ফেব্রুয়ারি

ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার জমিদার বাড়িতে সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরীর জন্ম।

মার্চ

ফ্রেনলজিক্যাল সোসাইটির উদ্যোগে বেরলো বাংলায় 'মনতত্ত্ব সারসংগ্রহ'।

২৯ মার্চ

'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল' স্থাপনের পর বড়লাট ডালহৌসিকে বেথুনের চিঠি। জানাচ্ছেন— বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দিন শহরব্যাপী প্রচণ্ড উত্তেজনার খবর। তিনি হিন্দু সমাজের নেতৃস্থানীয়দের আমন্ত্রণ জানাননি কারণ সেখান থেকেই আসছিল প্রচণ্ড বাধা। তিনি লক্ষ্য করেছেন, বাঙালি ছেলেদের মধ্যে যেমন, মেয়েদের মধ্যে তেমনি আগ্রহ শিক্ষার জন্যে। ইওরোপীয় মেয়েদের তুলনায় বাঙালি মেয়েদের মনে হয়েছে বুদ্ধিতে আরও তীক্ষ্ণ। ঐ চিঠিরই অন্যত্র ছিল তিনজন বাঙালির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা।

> "The Three Natives to whom I desire specially to record my gratitude for their assistance are Babu Ram Gopal Ghose, the well known merchant who was my principal adviser in the first instance and who procured me my first pupils, Babu Dukkina Ranjin Mookerjee, a Zemindar, who was previously unknown

to me, but who as soon as my design was published, introduced himself to me for the purpose of offering me the free gift of a site for the school, or five beegahas of land valued at 10.000 Rupees in the Native quarter of the town and Pundit Madan Mohan Turkalunkar, one of the pundits of Sanskrit College, who not only sent two daughters to the school, but has continued to attend it daily, to give gratuitous instruction to the children in Bengali, and has employed his leisure time in the compilation of a series of elementary Bengali Books expressly for their use."

এবপর, ঐ চিঠিতে, উত্তরপাড়া, বারাসত, নিধুদিয়া, সুখসাগর, যশোহর ইত্যাদি জায়গায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ।

"স্ত্রীশিক্ষার এই আন্দোলন বিনা বাধায় এগিয়ে চলেছে এমন কথা ভাবলে ভুল হবে। বরং ঘটছে উল্টোটাই, বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অল্প দু-চারজন যাঁরা এগিয়ে আসতে চাইছেন, স্থানীয় লোকজন প্রতি পদে বাধা দিচ্ছেন তাঁদের। এমনকি কুণ্ঠিত হচ্ছেন না ভয় দেখাতে বা নির্যাতন করতে। কলকাতায় এ সম্পর্কে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে বলেই মফস্বলের কর্মীদের অসুবিধা বুঝতে পারি। আমার কাছে অনেকে সাহায্য চেয়ে চিঠি লেখেন। শিক্ষা সংসদের সভাপতি বলেই অনেকের ধারণা, এ-ব্যাপারে আমি যথেষ্ট সাহায্য করতে পারি। সেজন্যেই আমার মনে হয়, এখন আব সবকারেব পক্ষে স্ত্রীশিক্ষাব ব্যাপারে উদাসীন থাকা উচিত নয়, সর্বপ্রকারে তাঁদের সাহায্য কবা উচিত।...আমি সেজন্য প্রস্তাব কবছি যে ভারত সরকারেব পক্ষ থেকে আপনি আমাদেব শিক্ষা-সংসদকে এই নির্দেশ দিন যে, স্ত্রীশিক্ষা তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব যেন আমরা গ্রহণ করি এবং বিভিন্ন স্থানের উৎসাহী ব্যক্তিদের বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সাহায্য কবি। এই নির্দেশ দিতে যদি ভারত সরকারের আপত্তি না থাকে তাহলে আমার মনে হয়, বাংলা-সরকারকে অনুরোধ করা যেতে পাবে, তাঁরা যেন স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটদের এ-বিষয়ে বিশেষ ভাবে অবহিত হতে আদেশ দেন। ম্যাজিস্ট্রেটেব কর্তব্য হবে, স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে যারা স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহী, তাঁদের পরোক্ষে সাহায্য কবা এবং যাঁবা নানাভাবে অত্যাচাব-উপদ্রব কবেন তাঁদের শাসন ও সংযত কবা।"

দর্শনশাস্ত্রের 'লাইব্রেবী' পরীক্ষায় একশো-য় একশো পেযে প্রথম হযে 'লাইব্রেরী স্বর্ণপদক' পেলেন উমেশ দত্তগুপ্ত। অধ্যক্ষ ক্যব সাহেব যখন লিখলেন 'Reports of the Public Instruction, in Bengal 1831-50', উমেশচন্দ্রের সেই প্রশ্নপত্রের উত্তব থেকে সেখানে উদ্ধৃত করেছিলেন অনেকখানি অংশ।

"সে সময়ে আর একটা পবীক্ষা ছিল, তাহাব নাম লাইব্রেবী-পরীক্ষা। সীনিযব পরীক্ষার জন্য যে সকল পুস্তক পাঠ কবিতে হইত, তদতিরিক্ত বহু গ্রন্থ লাইব্রেরী হইতে বাছাই করিয়া লইয়া আয়ত্ত কবিতে হইত। আমি দর্শনশাস্ত্রে লাইব্রেবী পবীক্ষা দিলাম; শতকবা এক শত নম্বর আদায় করিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিলাম; স্বর্ণপদক পাইলাম।

পুরাতন প্রসঙ্গ

৬ জানুয়ারি

কৃষ্ণনগর কলেজে পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে এলেন ড্রিঙ্কওয়াটাব বেথুন। সঙ্গে সিসিল বিডন আর মৌয়াট। সভাপতির ভাষণে বেথুনের মুখে উমেশচন্দ্রের কৃতিত্বের প্রশংসা।

১ এপ্রিল

ডালহৌসি তাঁর 'মিনিট'-এ স্বীকার করে নিলেন যে বেথুনের বক্তব্য যুক্তিসংগত। মঞ্জুর

করলেন তাঁর অনুরোধ। সেই সঙ্গে প্রস্তাব—এ-বিষয়ে এখুনি 'শিক্ষা-সংসদ' আর 'কোর্ট অব ডাইরেকটর্স'-কে বিষয়টা লিখে জানানো হোক।

১১ এপ্রিল
ডালহৌসি স্থানীয় সরকারকে নির্দেশ দিলেন শিক্ষাসমাজ আর জেলার কর্তৃপক্ষরা যেন বালিকা বিদ্যালয়ের দিকে বিশেষ নজর দেন।

৪ মে
বেরলো 'সত্যপ্রদীপ' সাপ্তাহিক পত্রিকা, শ্রীরামপুর থেকে।

২৫ মে
'সত্যপ্রদীপ'-এ বেরলো বিখ্যাত হরফ শিল্পী পঞ্চানন কর্মকার-এর দৌহিত্র শিল্পী কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকার-এর মৃত্যু সংবাদ।

> "পিতা ও মাতামহ অপেক্ষা কৃষ্ণচন্দ্র শিল্প-কর্মেতে অতি পটু, সীসার উপর অক্ষর ক্ষোদনে যেমন পারগ, তেমনি কাষ্ঠেও প্রতিবিম্ব ও স্বর্ণ বৌপ্যাদির অতি সূক্ষ্ম কর্ম ঘটিত অলংকার নির্মাণ করিতে পারগ।"

জুন
খিদিরপুর থেকে বেরল 'দূরবীক্ষণ' নামের মাসিক পত্রিকা।

১ জুন
সংস্কৃত কলেজে ডেভিড হেয়াবের অষ্টম-মৃত্যু-বার্ষিকী সভা। সভাপতি, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রধান আলোচক।

২৯ জুন
রাধাকান্ত দেব সম্পর্ক ছিন্ন কবলেন হিন্দুকলেজ থেকে। ১৮৪৮ থেকেই কলেজ কর্তৃপক্ষের মধ্যে অসন্তোষের শুরু, ঐ কলেজের শিক্ষক কৈলাসচন্দ্র বসুর খৃস্টধর্ম গ্রহণ করা নিয়ে। কলেজ কমিটির সভায় প্রসন্নকুমার ঠাকুর আর রাধাকান্ত দেব চেয়েছিলেন কৈলাসচন্দ্রকে শিক্ষকতাব পদ থেকে সরিয়ে দিতে। কিন্তু ভোটে অগ্রাহ্য হয়ে যায় সে প্রস্তাব। আবার ১৮৪৯-এ হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র গুরুচরণ সিংহ খৃস্টধর্মে দীক্ষা নিলে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কলেজ কমিটিকে সিদ্ধান্ত নিতে অনুরোধ জানান। দেশীয় আর ইয়োরোপীয় সব সদস্যই ছাত্রটিকে কলেজ থেকে অপসারণের পক্ষে মত দিলে, ছাত্রটি কলেজ ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু তারপরই কলেজ কমিটির প্রেসিডেণ্ট বেথুন সাহেবের সঙ্গে শুরু হয়ে যায় রাধাকান্ত দেব-এর বাদানুবাদ। পদত্যাগ তারই পরিণাম। এই তারিখে গৃহীত হয়েছিল তাঁর পদত্যাগ পত্র। অবশ্য তাঁর কৃতিত্বের প্রশংসা করে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল একটা।

জুলাই
চার্চ অব ইংলন্ডের মাসিক মুখপত্র 'সত্যার্ণব'-এর সম্পাদক হলেন রেভারেন্ড লং সাহেব।

ধর্মীয় পত্রিকা হলেও মুক্তবুদ্ধি আর যুক্তিবাদিতার সমর্থক লং জোর দিতেন স্বাধীন ভাবনাচিন্তার উপর।

২৬ জুলাই

যশোহরের নরেন্দ্রপুর গ্রামের অভয়াচরণ মুখোপাধ্যায় আর নিস্তারিণীদেবীর মেয়ে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিয়ে।

অগাস্ট

ঠনঠনেব 'সর্ব্বশুভকরী সভা' বের করলে ঐ নামের পত্রিকা। সম্পাদক হিসেবে মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের নাম থাকলেও, অনুমান করা হয় বিদ্যাসাগব আর মদনমোহন তর্কালঙ্কারই ছিলেন আসল উদ্যোক্তা।

> "ইনি (মদনমোহন) ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় 'সর্ব্বশুভকরী' নামে পত্রিকা বাহির করিলেন। এই পত্রিকাতে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে একটি প্রস্তাব তর্কালঙ্কার মহাশয লিখিয়াছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক ঐরূপ উৎকৃষ্ট প্রস্তাব অদ্যাপি বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। তর্কালঙ্কার মহাশয় বিল্বগ্রামের একজন ভট্টাচার্য হইয়া সমাজ-সংস্কার কার্যে যেরূপ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি সহস্র সাধুবাদের উপযুক্ত।"
>
> আত্মচরিত/রাজনারায়ণ বসু

> "হিন্দু কলেজের সিনিয়র ডিপার্টমেণ্টের ছাত্রগণ ঐক্য হইয়া সর্ব্বশুভকরী নামক মাসিক সংবাদপত্রিকা প্রকাশ করেন। উক্ত সংবাদপত্রের অধ্যক্ষ বাবু রাজকৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতি অনুরোধ কবিয়া, অগ্রজকে বলেন যে, "আমাদের এই নূতন কাগজে প্রথম কি লেখা উচিত, তাহা আপনি স্বয়ং লিখিযা দিন। প্রথম কাগজে আপনার রচনা প্রকাশ হইলে, কাগজের গৌরব হইবে, এবং সকলে সমাদর পূর্ব্বক কাগজ দেখিবে।" উহাদের অনুরোধের বশবর্তী হইয়া, তিনি প্রথমতঃ বাল্যবিবাহের দোষ কি, তাহা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত বলিয়া তৎকালীন কৃতবিদ্য লোকমাত্রেই সমাদরপূর্ব্বক সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা পাঠ করিতেন। পর মাসে মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ লিখেন।"
>
> বিদ্যাসাগর জীবনচরিত/শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন

৬ সেপ্টেম্বর

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যাযের সম্পাদনায় বেরলো 'সংবাদ সুধাংশু' সাপ্তাহিক পত্রিকা।

২৩ সেপ্টেম্বর

বর্ধমান থেকে বেরলো 'সংবাদ বর্দ্ধমান' সংবাদপত্র।

৫ নভেম্বর

বারো বছর চাকরির পর সংস্কৃত কলেজ থেকে ইস্তফা দিয়ে মদনমোহন তর্কালঙ্কার মুর্শিদাবাদে চলে গেলেন জজ-পণ্ডিত হয়ে।

৬ নভেম্বর

হেদুয়ার পশ্চিম দিকে, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হল বেথুন সাহেবের স্কুলের। স্কুলের জমির

জন্যে আধ বিঘে জায়গা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের দান। রামগোপাল ঘোষ তাঁকে উৎসাহিত করলে নগদ ১ হাজার টাকা ছাড়াও দক্ষিণারঞ্জন স্কুলকে উপহার দিয়েছিলেন ব্যক্তিগত পাঠাগার থেকে প্রায় ৫ হাজার টাকা দামের বই।

সম্পূর্ণ অপরিচিত দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের অযাচিত সাহায্য পেয়ে বেথুন মুগ্ধ। ভিত্তি স্থাপনের সময় তাঁর ভাষণের এক জায়গায় ছিল—

"It is due to Dakhina Ranjan Mookerjee, that his name should be held in perpetual remembrance in connexion with the foundation of this school."

স্কুলের ভিত্তি স্থাপনেব পর সেই দিনই উপস্থিত দেশী-বিদেশী সবাইকে নিজের বাড়িতে সান্ধ্যভোজ দিয়েছিলেন দক্ষিণারঞ্জন।

৭ নভেম্বর

'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়'-এ বেরলো তারাশঙ্কর শর্মা বা কবিরত্ন-র 'ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা'-র বই হয়ে বেরনোর বিজ্ঞাপন। এখানে পুরস্কারের পরিমাণ শত মুদ্রা।

"শ্রীযুত তারাশঙ্কর শর্মা পণ্ডিত মহাশয় ডেবিড হিয়ার সাহেবের স্মরণার্থ সভার দত্ত স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব রচনা করিয়া গত বৎসর শত মুদ্রা পারিতোষিক পাইয়াছেন এবং উক্ত সভা হইতে তাঁহার সেই রচনা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে...।"

প্রথম সংস্করণে ছাপানো হয়েছিল মাত্র ১০০ কপি। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' তাব জন্যে ক্ষোভ প্রকাশ না করে 'বিদ্যাতত্ত্ব' নাম দিয়ে তারাশঙ্করের গোটা রচনাটাই ছাপিয়ে দেয় ধারাবাহিক ভাবে। কেন ছাপানো হল তার যুক্তি হিসেবে লেখা হয়—

"আমরা বোধকরি উক্ত পণ্ডিত মহাশযের ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিলে দেশীয় মহাশয়দের অজ্ঞানতা দূর হইয়া যাইবেক অতএব অনুরোধ করি দেশীয় সকল ব্যক্তি উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের পুস্তক পাঠ করিয়া মর্মাবধারণ পুরঃসর তদুক্ত উপদেশ পালনে সত্বর হবেন।"

ডিসেম্বর

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রসময় দত্ত প্রমুখ চোদ্দজন সদস্যকে নিয়ে বেথুনের উদ্যোগে কলকাতায় গড়ে উঠল 'বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ' বা 'ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি'! ঐ সময়ে স্কুল বুক সোসাইটি থেকেও বেরত বাংলা ছাড়া ইংরেজি, ফারসি, ইত্যাদি নানা ভাষায়। এই নতুন সমাজ-এর উদ্দেশ্য সহজ সরল ভাষায় স্বল্পশিক্ষিতের জন্যে কেবল বাংলা ভাষাতেই অনুবাদ-বই বের করা। এখান থেকেই 'গার্হস্থ্য বাংলা পুস্তক সংগ্রহ' পর্যায়ে অনেক দরকারি বই প্রকাশিত হয়। পরে ১৮৬২-তে অবশ্য এই সমাজ জুড়ে গিয়েছিল স্কুল বুক সোসাইটির সঙ্গে।

"এই সোসাইটির ইতিহাস এখন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের বিষয়। এখানে শুধু একটা কথা বললেই যথেষ্ট হবে যে এই সোসাইটির আনুকূল্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' বার হয়েছিল এবং এই সোসাইটি কর্তৃক সহজ ভাষায় লেখা এবং সস্তা দামে প্রকাশ করা অনেক ভালো ভালো বই বেরিয়েছিল। এই সব বই একদা সদর অন্দরে সমানভাবে পঠিত ছিল। এখন আমরা ভুলে গেছি। যেমন 'রবিনসন ক্রুশো', 'ছোট কৈলাস ও বড় কৈলাস', 'সুশীলার উপাখ্যান' ইত্যাদি। এ বইয়ের কোন কোনটি পরে অন্য লেখক নিজের নামে ছাপিয়েছিলেন।"

বেথুন স্মারক গ্রন্থ/১৯৭৬/সুকুমার সেন

এর আরও একটা নাম ছিল 'ভার্নাকুলার লিটারেচার কমিটি'।

৪ ডিসেম্বর

শিক্ষা সংসদ-এর পক্ষ থেকে বিদ্যাসাগরের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল তাঁকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতার ক্ষমতা দিলে তিনি তা নিতে রাজি হবেন কিনা। এই তারিখে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের চাকরি ছেড়ে বিদ্যাসাগর আবার সংস্কৃত কলেজে ফিরে এলেন।

১৬ ডিসেম্বর

শিক্ষা সংসদের অনুরোধে বিদ্যাসাগর রচনা করলেন সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা সংস্কার পরিকল্পনা।

১৮ ডিসেম্বর

বেথুন স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা। 'সংবাদ সুধাংশু'-র খবর—

" Lady Gomm, Hon'ble Mrs. Lewis, and serveral other Ladies were present, and expressed themselves highly gratified with the progress of the people."

পুরস্কারও দেওয়া হয়েছিল ছাত্রীদের। 'সম্বাদ ভাস্কর'-এর মারফত রংপুর কুণ্ডীর জমিদার কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী এই পুরস্কারের জন্যে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ৫০ টাকা।

১৮৫১

বঙ্কিম পড়ছেন সিনিয়র বিভাগের তৃতীয় শ্রেণীর 'এ' সেকশনে। উমেশচন্দ্র শূরের সঙ্গে এবারও পুরস্কৃত হলেন সাধারণ পারদর্শিতার জন্যে। তাঁব ক্লাসের শিক্ষক, ঈশানচন্দ্রের ভাই মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। উমেশচন্দ্র তখন 'বি' সেকশনে। তাঁর শিক্ষক Ure সাহেব।

১৮৫১

বছরের প্রধান ঘটনাবলী

বছরেব গোড়ায বিশেষ কাজে মধুসূদন দত্ত মাদ্রাজ থেকে কলকাতায়। ছিলেন পুরোপুরি আত্মগোপন করে। দেখাসাক্ষাৎ একমাত্র বাবাব সঙ্গে। প্রিয় কোনো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে নয। মা মারা গেছেন তখন। তাঁর মাদ্রাজ পাড়ির তিন বছর পরেই তাঁর মৃত্যু।
খৃস্টধর্মের উপদেষ্টা হিসেবে তাঁর কাজের জাযগা বর্ধমান জেলার অম্বিকা কালনায চলে গেলেন লালবিহাবী দে।
লং সাহেবের উদ্যোগে এনসাইক্লোপিডিয়া প্রেস থেকে বেবলো তারাশঙ্কব তর্করত্নেব 'ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা'র দ্বিতীয সংস্কবণ। ছাপা হল ৭০০০ কপি।
ব্যঙ্গ-সাহিত্যের লেখক ও সমালোচক ঠাকুবদাস মুখোপাধ্যাযেব জন্ম খুলনাব সাবসায। বাবা, নবকুমার।
দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় কলকাতা ছেড়ে লক্ষ্ণৌ চলে গেলেন সপবিবাবে।
সুরেন্দ্র বাযের সহযোগী দেশপ্রেমিক অম্বিকাচরণ মজুমদারের জন্ম ফবিদপুরেব সেনদিয়া-য।
বেরলো অক্ষয়কুমার দত্ত-র 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতিব সম্বন্ধ বিচার'-এর প্রথম ভাগ।
ডায়মন্ড হাববাব থেকে প্রথম ঐতিহাসিক বিদ্যুৎ-সমাচার পাঠালেন শিবচন্দ্র নন্দী। কলকাতায় সেটা গ্রহণ করলেন ও' শানেসি, লর্ড ডালহৌসির সামনে। গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে মিঃ গোমেশের দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর পর উঠে গেল হুগলির ইনফ্যান্ট স্কুল। উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে স্কুলটা চালাতে চাইলেও সরকারি কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় বন্ধ।
'কলিকাতার ইতিবৃত্ত'-র লেখক প্রাণকৃষ্ণ দত্ত-র জন্ম বাগবাজারের মামার বাড়িতে।
শিক্ষাবিভাগের সম্পাদক ক্যাপটেন হেস-এর আমন্ত্রণে চট্টগ্রাম স্কুলে ১০০ টাকা মাইনের শিক্ষকের পদে উমেশচন্দ্র দত্তগুপ্ত। এই বছরেই হুগলির সাবজজ কেশবচন্দ্র রায়ের মেয়ের

সঙ্গে বিয়ে। কয়েক মাস পরেই তিনি চলে আসবেন কৃষ্ণনগর কলেজের জুনিয়র স্কুল বিভাগের প্রথম শিক্ষক হয়ে।
হুগলির নবগ্রামে অন্নদাপ্রসাদ বাগচীর সমসাময়িক শিল্পী নবকুমার বিশ্বাস-এর জন্ম। বাবা, গোবিন্দচন্দ্র।

২১ ফেব্রুয়ারি
রাজনারায়ণ বসু প্রধান শিক্ষকের পদে যোগ দিলেন মেদিনীপুর সরকারি কলেজে।

মার্চ
রুড়কির টমাসন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তি হলেন নীলমণি মিত্র, রেভারেন্ড ডাফ-এর অনুরোধ আর উত্তর-প্রদেশের গভর্নর হেনরি লরেন্সেব সুপারিশে। বাঙালিদেব মধ্যে তিনিই প্রথম পাস-করা সরকাবি খেতাবধারী ইঞ্জিনিয়াব।

৬ মার্চ
বর্ধমান জেলার সাতগাছিয়ায খ্যাতনামা প্রতিকৃতি-চিত্রকর বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম। বাবা, হরনাথ।

২০ মার্চ
বেথুন স্কুল গড়ে ওঠার পর রাধাকান্ত দেব বেথুনকে লিখছেন–

> "...আমি স্ত্রীশিক্ষার একজন প্রধান উদ্যোক্তা। জাতির নৈতিক চরিত্র ও সামাজিক সুখবৃদ্ধির পক্ষে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যে কত অধিক, তাহা এখন আর ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে হইবে না।"

এপ্রিল
বেরলো বিদ্যাসাগর-এব 'বোধোদয়'।

১ এপ্রিল
ময়মনসিংহের ফুলবাড়িতে দেশপ্রেমিক ব্রাহ্মনেতা শ্রীনাথ চন্দ-র জন্ম। বাবা, জগন্নাথ।

৮ এপ্রিল
শম্ভুনাথ পণ্ডিতকে বেথুনের চিঠি, স্কুল বুক সোসাইটি থেকে বেরনো 'পিয়াসর্ন সাহেবের বাক্যাবলী'-ব নতুন সংস্করণে আইন বিষয়ের বাংলা আর ইংরেজি প্রতিশব্দের একটা তালিকা তৈরি করে দিতে।

১৩ মে
পাথুরিয়াঘাটা থেকে 'জ্ঞানদর্শন' পাক্ষিক পত্রিকা বেরিয়েই বন্ধ।

২৫ মে
রাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে গড়ে উঠল 'পতিতোদ্ধার সভা', খৃস্টধর্মে দীক্ষা-নেওয়া হিন্দুদের উদ্ধারের জন্যে। এই তারিখেই প্রথম অধিবেশন। সভা বসত আমড়াতলার শিবচন্দ্র মল্লিকের বাড়িতে। বেশিদিন স্থায়ী হয়নি এই সভা।

জুন
মেদিনীপুর থেকে বেরলো প্রথম বাংলা মাসিকপত্র 'মেদিনীপুর ও হিজলি অধ্যক্ষ' দ্বিভাষিক। ইংরেজি নাম 'মিদনাপুর অ্যাণ্ড হিজলি গার্ডিয়ান'।
মেডিকেল কলেজে হেয়াবের নবম মৃত্যুবার্ষিকী সভা। সভাপতি, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রবন্ধ পাঠ শ্যামাচবণ মুখোপাধ্যায়ের।

৫ জুন
জামাইষষ্ঠীর সময 'জামাইষষ্ঠী' নামে দীনবন্ধু মিত্রের কবিতা বেরলো 'সংবাদ প্রভাকরে'।

৭ জুন
বেবলো 'সংবাদ জ্ঞানোদয়' সাপ্তাহিক।

জুলাই
সংস্কৃত কলেজেব প্রিন্সিপ্যাল হয়ে বিদ্যাসাগর কায়স্থ ছেলেদেরও সুযোগ করে দিলেন সেখানে পড়বার।

১০ জুলাই
প্রসন্নকুমার ঠাকুবের ছেলে, হিন্দু কলেজের ছাত্র, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুব দীক্ষা নিলেন খৃস্টধর্মে। দীক্ষা দিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে কৃষ্ণমোহনের জামাই হবেন জ্ঞানেন্দ্রমোহন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন প্রথম ভাবতীয় ব্যারিস্টার।

১৩ জুলাই
বর্ধমান ব্রাহ্মসমাজেব প্রতিষ্ঠা।

২৯ জুলাই
মধুসূদন দত্ত মাদ্রাজে 'হিন্দু ক্রনিকল' সাপ্তাহিক পত্রিকাব সম্পাদক। ১৮৫১-য় ছিল সাপ্তাহিক। ৫২-র ১ জুলাই থেকে হয়ে যাবে দ্বি-সাপ্তাহিক। কলকাতাব 'হবকরা' পত্রিকা মাঝে মাঝেই ঐ 'হিন্দু ক্রনিকল' থেকে ছাপাতেন ভালো ভালো প্রবন্ধেব নির্বাচিত অংশ। হবকরা-র প্রবন্ধ পড়ে গৌরদাস বসাক এই তারিখের চিঠিতে মধুসূদনকে লিখছেন—

> "My attention was drawn by the 'Hurkaru' to an extract made from a paper named 'Hindu Chronicle' which, it was said, is edited by you I was delighted to see that you have betaken yourself to the resources of 'the Forth Estate' by a very fair way to make yourself rich and reputed."

এই চিঠিতেই অনুবোধ ছিল 'হিন্দু ক্রনিকল' পত্রিকা পাঠানোর। মধুসূদন পত্রিকা পাঠিয়েছিলেন কিন্তু চিঠির উত্তর দেননি।
একই তারিখে লেখা আরও একটা চিঠির খবব রয়েছে মধুসূদনের জীবনীতে। কলকাতায় এসেও দেখা না-কবার দুঃখে গৌরদাস লিখেছিলেন প্রিয় বন্ধুকে—

> "I understood from Rev. Jaddunauth that sometime ago you paid a flying visit to Calcutta, and that after having finished your business returned to your favourite town I was extremely sorry to hear so, for, I thought I had every reason to expect that you would give me an opportunity to see you; and your

having neglected to do so, savoured something that I did not like much, for it exhibited your total want of feeling towards me..."

২ আগাস্ট

বন্ধ হয়ে গেল কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বাংলা সাপ্তাহিক 'সংবাদ সুধাংশু'। তবুও তিনি বিশ্বাস করতেন একদিন বঙ্গ ভাষাই হবে শিক্ষার বাহন।

৭ আগস্ট

বটতলায় তৈরি হল 'ডেভিড হেয়াব একাডেমী'।

১২ আগস্ট

জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন-এর মৃত্যু।

"...বেথুনের মৃত্যুর দিনটি, বারোই আগস্ট তারিখটি, বেথুন বিদ্যায়তনের পক্ষে এমন এক দিন, প্রতি বছরই যা স্মরণ করা হয় তাঁর পুণ্যস্মৃতিতে।... প্রতি বছরই সকালবেলায় স্কুলের উচ্চতম শ্রেণীর এবং কলেজের মেয়েরা একসঙ্গে যায় লোযাব সার্কুলার রোডে মহাত্মা বেথুনের সমাধিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতে। তিনটি মালা দিয়ে সাজানো হয় সমাধিটি— একটি মাথার দিকে, একটি পায়ের দিকে, এবং আরেকটি বুকেব উপব দেওযা হয় ক্রুশচিহ্ন এঁকে। দুপুর দুটোতে স্কুল ও কলেজের শিক্ষিকা ও বিদ্যার্থিনীরা এসে মিলিত হয় বিদ্যালয় ভবনের মাঝখানের প্রশস্ত হলটিতে। এই হলের মাঝখানে আছে বেথুনের মর্মরমূর্তি, তাকে কেন্দ্রে রেখে প্রতি বছর স্মৃতি উদ্‌যাপন ও শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। ফুল দিয়ে সমস্ত মূর্তিটি সাজানো হয়। হস্টেলের মেয়েবা মালা গাঁথে বাগানেরই ফুল দিয়ে। এক সময় সমস্ত হলঘরটিই খইয়ের মালা দিয়ে সাজানো হত। এখন খইয়েব মালা গাঁথা হয় না, কিন্তু অজস্র শাদা ফুল দিয়ে মালা দিযে বেথুনের মূর্তিকে প্রায় ঢেকে দেওয়া হয়।"

বেথুন স্মারক গ্রন্থ/বেথুন মহাবিদ্যায়তন প্রকাশন

১৪ আগস্ট

'সংবাদ প্রভাকব'-এ বেথুনের মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপক সম্পাদকীয়। অনুমান, এটি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তেরই রচনা।

"অমায়িক কারুণিক, প্রেমিক সুজন।
স্নেহ ক্ষেত্রে প্রেমবীজ, করিল বপন।।
মূলে তার যত্ন জল, হইলে সিঞ্চিত।
চারু তরু দৃশ্যমান, হইল কিঞ্চিৎ।।
পল্লব শাখায় তরু, হোলে বদ্ধমূল।
ফুটিল সৌরভযুক্ত করুণার ফুল।।
ফলিবে সুমিষ্ট ফল, লব আস্বাদন।
কৃতান্ত কীটের দন্তে, হইল নিধন।।

সেপ্টেম্বর

তারাশঙ্কর কবিরত্ন পাস করলেন সংস্কৃত কলেজ থেকে।

১৪ সেপ্টেম্বর

ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের বা ভারতবর্ষীয় সভা গড়ে ওঠার দেড় মাস আগে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উদ্যোগে গড়া হল 'ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন' বা 'দেশহিতার্থী সভা'।

অক্টোবর

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় বেরল 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'। বাংলা ভাষায় প্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকা। প্রথম বছরে পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল কোয়ার্টো ১৬। দ্বিতীয় বছব থেকে ২৪। রাজেন্দ্রলালের ভাষায় পত্রিকার উদ্দেশ্য–

> "...পরন্তু আমরা যে কেবল জ্যোতির্বিদ্যায় ও জীবসংস্থার বর্ণনায় নিযুক্ত থাকিব এমত নহে। পদার্থবিদ্যা, ভূগোলবিদ্যা, পুরাবৃত্ত, ইতিহাস, সাহিত্যালঙ্কাবাদি সকল শাস্ত্রের মর্ম আমাদিগেব সমরূপে উদ্দেশ্য; এই সকল বিষযেই আমরা যথাসাধ্য মনোনিবেশ করিব; এবং যাহাতে স্বদেশস্থ জনগণ অনায়াসে তত্তদ্বিষয়ের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন তাহা সম্যকরূপে চেষ্টা কবিব। যে কেহ দুই আনা পযসা দিয়া বিবিধার্থ সংগ্রহকে সমাদব কবিবেন তাঁহার ও তাঁহার পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে অনেকেব নিকট ঐ পত্র পারিষদের ন্যায় বহুকালাবধি উপস্থিত থাকিয়া শুদ্ধ-জ্ঞান ও প্রমোদজনক সদালাপ দ্বারা তাঁহাদের তুষ্টি জন্মাইবে; ফলতঃ পাঠক মহাশয়দিগের সন্তোষার্থে এক বৎসবকাল আমবা যথাসাধ্য পরিশ্রম করিতে সংকল্প করিলাম, পবে তাঁহাদের উৎসাহানুসারে এই পত্রিকার পবমায়ু নির্দিষ্ট হইবে।"

'সংবাদ প্রভাকব'-এ, ১২ সেপ্টেম্বর, এই পত্রিকার বিজ্ঞাপন–

> "পুরাবৃত্তেতিহাস, প্রাণিবিদ্যা শিক্ষা সাহিত্যাদি দ্যোতক মাসিক পত্র। বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের আনুকূল্যে উপরোক্ত নামক এক নূতন মাসিক পত্র আগামী আশ্বিন মাসাবধি প্রকটিত হইবেক। যাহাতে বঙ্গদেশস্থ জনগণেব জ্ঞানবৃদ্ধি হয় এমৎ সৎ ও আনন্দ-জনক প্রস্তাব সকল প্রচার করা উক্ত সমাজেব মুখ্য কল্প, এবং ইংরাজী ভাষায় 'পেনি মেগাজিন' নামক পত্রের অনুবর্ত্তিত এতৎপত্রে তদভিপ্রায় সিদ্ধার্থে অবিরত সম্যক চেষ্টা করা হইবেক, এবং তত্রত্য প্রস্তাবিত বস্তু সকলের বিশেষ পরিজ্ঞানার্থে তাহাতে নানাবিধ ছবি থাকিবেক।"

রবীন্দ্রনাথেব 'জীবনস্মৃতি'তে এই পত্রিকা-পাঠের খুশির খবর

> "রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' বলিয়া একটি ছবিওয়ালা মাসিকপত্র বাহিব করিতেন। তাহারি বাঁধানো এক ভাগ সেজদাদার আলমারিব মধ্যে ছিল। সেটি আমি সংগ্রহ কবিয়াছিলাম। বার বার করিয়া সেই বইখানা পড়িবার খুশি আজও আমাব মনে পড়ে। সেই বড়ো চৌকা বইটাকে বুকে লইয়া আমাদেব শোবার ঘরের তক্তাপোশের উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া নর্হাল তিমি মৎস্যের বিবরণ, কাজিব বিচারের কৌতুকজনক গল্প, কৃষ্ণকুমাবীর উপন্যাস পড়িতে পড়িতে কত ছুটির দিনেব মধ্যাহ্ন কাটিয়াছে।"

১১ অক্টোবর

'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়'-এ বেরলো 'সুকবি ভারতচন্দ্র রায়ের কৃত পুস্তক-চতুষ্টয় প্রকাশের ভূমিকা' নামেব প্রবন্ধ। অদ্বৈতচরণ আঢ্য চাইছিলেন ভারতচন্দ্রেব গ্রন্থাবলী ছাপাতে।

২৯ অক্টোবর

'ল্যান্ড হোল্ডার্স সোসাইটি' আর 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' একসঙ্গে জুড়ে গিয়ে জন্ম নিল 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'। সভাপতি, রাজা রাধাকান্ত দেব। সম্পাদক, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সহসভাপতি, রাজা কালীকৃষ্ণ দেব। সহ সম্পাদক, দিগম্বর মিত্র। কার্যকরী সদস্য–

রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, সত্যচরণ ঘোষাল, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, হরিমোহন সেন প্রমুখ।

> "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম উদ্বোধনী সভায় ইহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয় যে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদ দান সম্বন্ধে বিলাতের পার্লিয়ামেণ্টে বিচারবিতর্কের সময় যাহাতে ভারতের শাসন সংস্কার হয় এবং লোকের সুখ সমৃদ্ধির বৃদ্ধি হয় সে সম্বন্ধে আবেদন করা, এবং এই উদ্দেশ্যে ভারত ও ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের নিকট মাঝে মাঝে আবেদনপত্র প্রেরণ করা।..."

বাংলাদেশের ইতিহাস/ রমেশচন্দ্র মজুমদার

১০ নভেম্বর

সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাধ্যক্ষ কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের মৃত্যুতে বিদ্যাসাগর শিক্ষা-পরিষদের কাছে সুপারিশ করলেন ঐ পদটি তারাশঙ্কর কবিরত্নকে দেওয়ার জন্যে।

১২ নভেম্বর

তাবাশঙ্কর কবিরত্ন সংস্কৃত কলেজে যোগ দিলেন ৩০ টাকা মাইনেয়। বিদ্যাসাগরের প্রযত্নে গিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন সংস্কৃত কলেজে যোগ দিলেন ব্যাকরণ শ্রেণীর পঞ্চম অধ্যাপক হিসেবে। ছিলেন ৩৭ বছর ১১ মাস।

ডিসেম্বর

উত্তরপাড়া সরকারি স্কুলে ভর্তি হলেন শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়। তখন সেখানে প্রধান শিক্ষক রামতনু লাহিড়ী।

১১ ডিসেম্বর

বেথুন সাহেবের মৃত্যুর চার মাস পরে শিক্ষা পবিষদের সেক্রেটারি ডাঃ এফ. জে. মৌয়াট-এব ডাকে কলকাতার মেডিকেল কলেজের লেকচার থিয়েটারে, মৌয়াট-এর সভাপতিত্বে যে সভা, সেখানেই গড়ে উঠল 'বেথুন সোসাইটি'। সভাপতি, মৌয়াট। সম্পাদক, প্যারীচাঁদ মিত্র। কলকাতায় এই প্রথম একজন ব্যক্তির নামে সমিতি।

> "প্রারম্ভিক বক্তৃতায় ডাঃ মৌএট প্রস্তাবিত সোসাইটি বা সভা স্থাপনের আবশ্যকতা বিশেষভাবে বিবৃত করেন। কলিকাতায় তখন এসিয়াটিক সোসাইটি, কৃষি সমাজ বা এগ্রিকালচারাল সোসাইটি এবং এইরূপ আরও অনেক সভাসমিতি ছিল। কিন্তু সেসব বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এখানে সাধারণ শিক্ষিত জনের মেলামেশা এবং সাধারণ হিতকর বিষয়ের আলোচনাদি সম্ভব ছিল না। এজন্য ভিন্ন ধরনের, অথচ অনুরূপ দৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত প্রতিষ্ঠান থাকা প্রয়োজন। ডাঃ মৌএট দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইংলন্ড ও স্কটল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের এবং বড় বড় শহরের মানসিক উৎকর্ষমূলক প্রতিষ্ঠানাদির কথা উল্লেখ করেন। দেশীয়দের সামাজিক মেলামেশা, এমন কি আত্মীয়স্বজনের মধ্যেও যেরূপ সংকীর্ণ, তাহাতে এ প্রকার ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের প্রয়োজনীয়তা সমধিক। ইহার পর মৌএট প্রস্তাবিত সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেন যে, ধর্ম ও রাজনীতি ব্যতিরেকে সাহিত্য-বিজ্ঞানাদি যাবতীয় বিষয় এখানে আলোচনা করা যাবে। সভা পরিচালনার ব্যয় এক বছরের জন্য মৌএট বহন করিবেন বলিয়া ঘোষণা করেন।"

বেথুন সোসাইটি/যোগেশচন্দ্র বাগল

১৮৫২

কবি বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মপ্রকাশের বছর।
ছাপার অক্ষরে, সাময়িক পত্রিকায়, তাঁর প্রথম কবিতা বেরবে এই বছরের গোড়াতেই, ২৫ ফেব্রুয়ারি। বয়স তখন ১৪। অর্থাৎ কৈশোরকাল। কবিতা লেখার ঐতিহ্য-সম্মত বয়স এটাই তখন।
তাঁর প্রথম জীবনীকার ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-র গবেষণা থেকে আমরা জেনে যাই ভারতচন্দ্র কবিতার দোয়াতে কালি ভরেছিলেন ১৪-য়। সত্যপীরের দুটি ছোটো আকারের পাঁচালী লেখা শেষ হয়ে গেছে যখন, তখনও ১৫ পেরোয় নি তাঁর বয়স। ঠিক তেমনি বঙ্কিমচন্দ্র-বর্ণিত জীবনী জানিয়ে দেয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা লেখালেখির শুরুর বয়সটাকে। পাথুরেঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের বড়ো ছেলে যোগেন্দ্রমোহনের সঙ্গে নিবিড় সখ্যতার সূত্রেই, দুয়ে মিলে, কবিতার গলায় মাল্যদান তখনই, যখন তাঁর বয়সটা আটকে রয়েছে ১৫-র এপারে। আর তখনই 'মহেশ পাগলা' নামের জনৈক আত্মীয়ের সঙ্গে চলেছে মুখে মুখে কবিতা-যুদ্ধ।
রঙ্গলাল-এর কবিতায় হাতেখড়ির বয়স খুঁজতে অতিরিক্ত অনুসন্ধান অপ্রয়োজনীয়। 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এর ভূমিকায় নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন তার হিসেব। ১৪/১৫ বছর বয়সেই তাঁর 'পদ্য প্রকটন'-এর আরম্ভ বাংলা 'সমাচার' পত্রে।
তুলনায় একটু দেরিতেই মধুসূদনের আরম্ভ। ১৮৪২-এ হিন্দু কলেজে সিনিয়ার বিভাগের ছাত্র যখন, বয়স ১৮। তখনই 'জ্ঞানান্বেষণ', 'লিটেরারি গেজেট', 'লিটেরারি গ্লিনার'-এ ছাপা হয়ে চলেছে তাঁর কবিতা। কেবল ভাষাটা ভিন্ন। বাংলার বদলে ইংরেজি।
দীনবন্ধু মিত্রের কবিতা পড়েই বঙ্কিমচন্দ্রেরও আগ্রহে জোয়ার। দীনবন্ধু তখনও হিন্দু কলেজে ঢোকেন নি, পড়ছেন কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে, পরে যার নাম হবে হেয়ার স্কুল।
১৮৫০-এর মধ্যে শেষ হয়ে গেছে হেয়ার স্কুলের পড়া। বঙ্কিমচন্দ্র-রচিত দীনবন্ধু জীবনী

অনুযায়ী হেয়ার স্কুলে থাকতে থাকতেই কবিতা লেখার শুরু। এমন-কি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে পরিচয়। বয়সের হিসেবটা দাঁড়ায় ১৭।১৮-র মতো। বঙ্কিমের তুলনায় একটু বেশি। তবে বাঙালি কবিদের লেখালিখির শুরুর বয়সটাকে গড়পড়তা ১৪-য় চিহ্নিত করতে চেয়ে আমরা এখন স্মরণ করতে পারি রবীন্দ্রনাথকে। ঠিক কবে যে কবিতার পাতায় তাঁর আত্মউন্মোচনের প্রথম আঁচড়, সেটা অনেক জটিল হিসেবনিকেশে জড়ানো থাকলেও এটা প্রমাণ হয়ে গেছে যে ১২ বছরের আগেই হাত-পাকানোর শুরু। 'এক চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালকের রচিত' বলে 'বঙ্গদর্শন'-এ বেরনো তাঁর কবিতা আসলে ১২ বছরের রচনা।

এ তথ্য এখন আর অজানা নয় কারো যে, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, রঙ্গলাল আর অকাল-প্রয়াত দ্বারকানাথ অধিকারীরা ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের একান্ত প্রিয়ভাজন। কবিগুরু মেনে নিয়ে তাঁর আদর্শেই এঁরা অনুপ্রাণিত। লালিত তাঁরই উদার অনুগ্রহে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর গুরু-বন্দনায় অর্থাৎ ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনচরিতে যা জানান, সেখানে একমাত্র দীনবন্ধুই পেয়ে যান যোগ্যতম শিষ্যের সমাদর। অনুযোগ নয়, বঙ্কিমের অনুভব, গুরুর প্রদত্ত শিক্ষা অন্যেরা পরবর্তী পর্বে বিস্মৃত।

> "বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির রচনামধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। কেবল দীনবন্ধুতেই কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহাব চিহ্ন পাওয়া যায়।"

এটা ঠিকই, ঈশ্বচন্দ্রের শিক্ষা একটা প্রতীকী অর্থে বঙ্গলালে সংক্রামিত হয়ে থাকলেও তাঁর রসালো-ধারালো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, তাঁর কবিতায সমসাময়িক ঘটনাবলীর ক্রিযা-প্রতিক্রিয়াময় নিয়ত বিস্ফোরণ, প্রায় দিনলিপি অথবা ধারাবিবরণীর ধরনে প্রাত্যহিক অনুভব-অভিজ্ঞতাকে তৎক্ষণাৎ কবিতার দুন্দুভিতে বাজিয়ে দেওযার দায়বদ্ধতা, রঙ্গলালে স্থায়ী প্রভাব বিছোতে পারে নি তেমন। স্বদেশবৎসল ঈশ্বরচন্দ্র যতখানি বাঙালি তাঁর নিত্যনিয়মিত সমসাময়িকতা-সংলগ্নতায়, হয়তো বা বঙ্গলালের আংশিক চারণকবিসুলভ ভূমিকা ঠিক ততখানিই ভারতীয়, ঐতিহ্য-আশ্রয়ী স্বদেশপ্রেমেব আততিতে। ঈশ্বরচন্দ্রকে যদি ভেবে নেওয়া যায় স্বদেশেব পরাধীনতা অথবা স্বদেশী কর্মকাণ্ডে বিচলিত বিরক্ত এবং বিক্ষুব্ধ, রঙ্গলালকে মনে হবে স্বদেশের স্বাধীনতা-হীনতার বোধে আক্রান্ত। ঈশ্বরচন্দ্রের স্বদেশ সমগ্র বাংলাদেশ। রঙ্গলালের স্বদেশ সম্ভবত সমগ্র ভারতবর্ষ।

নিজের প্রসঙ্গে বঙ্কিম খুবই মিতবাক। কালক্রমে তিনিও, রঙ্গলালদের মতোই, বিস্মৃতির ঢালু খাদের দিকে গড়িয়ে দিয়েছিলেন কিনা গুরুর আদর্শ, তার সুস্পষ্ট স্বীকারোক্তি নেই গুরুর জীবনচরিতের কোনোখানে। আছে যা, তা খুবই সংক্ষিপ্ত মন্তব্য।

> "আমি নিজে প্রভাকরের নিকট বিশেষ ঋণী। আমার প্রথম রচনাগুলি প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। সে সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আমাকে বিশেষ উৎসাহ দান করিতেন।"

আমরা এখন বঙ্কিমের জীবনের সেই পর্বে যখন ঈশ্বরচন্দ্রের উৎসাহে শুরু হবে তাঁর কবি-প্রতিভার উন্মোচন।

২

বঙ্কিম এখনো হুগলি কলেজের ছাত্র।

কবিতার দিকে অত্যুৎসাহী উন্মীলন সত্ত্বেও এমন ধারণাকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না যে কলেজের পড়ায় শিথিলতা ঘটে চলেছে এর পরিণামে। বরং তাঁর পরিচিতদের স্মৃতিচারণায় এই আশঙ্কার বিপরীত ছবিটাই বেশি স্পষ্ট। অর্থাৎ ছাত্র হিসেবে নিজের পঠন-পাঠনে নিশ্ছিদ্র তাঁর মনোযোগ। নিয়মিত কলেজে যান নৌকোয় নদী ডিঙিয়ে। কলেজের আগে পরে তাঁকে

ঘিরে থাকে একটি একান্নবর্তী পরিবারের সমারোহময় পরিবেশ।
আবার অন্য দিকে, ছাত্রজীবনের পঠন-পাঠনের চাপ আর বিশাল একান্নবর্তী পরিবারের নিয়ত কলরব-মুখরিত পরিমণ্ডল যতই ঘিরে থাকুক তাঁর কৈশোরকালের আত্মউন্মোচনমুখী অবসরকে, কবি হয়ে ওঠার পক্ষে তাঁকে অফুরান সহযোগিতা জুগিয়ে চলেছে গৃহ-সংলগ্ন আর গ্রাম-সংলগ্ন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উন্মুক্ত আর অভ্যর্থনা-উন্মুখ পটভূমি। আর তারই সঙ্গে অচ্ছেদ্য হয়ে থেকেছে বঙ্কিমের ব্যক্তিগত সৌন্দর্য-তৃষ্ণা।
দেখা যাক, ছাত্রজীবনের সমান্তরালে তাঁব কবি-জীবনের উন্মেষ পর্বের চেহারাটাকে চিনে নিতে সংগ্রহ করতে পারা যায় কতখানি সহায়ক সম্বন্ধ-সূত্র। এ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ দর্শনের অভিজ্ঞতা দিয়ে আমাদের ঔৎসুক্যেব ফাঁকা থলিটাকে ভরিয়ে দিতে পাবেন মাত্র দুজন। প্রথম জন সন্দেহাতীতরূপে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র। পূর্ণচন্দ্রের বেশ-কয়েকটি লেখা না থাকলে শৈশব-কৈশোরের বঙ্কিমচন্দ্র চির-অচেনাই থেকে যেতেন ভবিষ্যতেব কাছে। দ্বিতীয জন. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। প্রথম জন ঘরের লোক। দ্বিতীয় জন, কাছেব প্রতিবেশী। এই দুজন ছাড়া আর কারো কাছ থেকে বঙ্কিমের বাল্যকালের আর বিশেষ করে তাঁব এই কবিতা-কল্লোলিত কৈশোরকালের চলচ্ছবি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই আব।
পূর্ণচন্দ্র থেকে কুড়িয়ে জড়ো করা যায়—

১। কীর্তন ও কথকতায় আগ্রহ

বঙ্কিম মগ্ন হয়ে কথকতাই শুনতেন না শুধু। কৌতুকেব চাউনিতে দেখতেন কথক ঠাকুবের মুখভঙ্গি আব অঙ্গভঙ্গি। আর দেখতে দেখতেই ছোটো ভাইকে বলতেন, কান বন্ধ কবে গান শুনতে। কান বন্ধ করে, গান বাদ দিয়ে 'মুদ্রাদোষ বিশিষ্ট' কথকেব হাত-মুখ-দাঁতের নানা বিচিত্র ভঙ্গির দৃশ্যে হেসে গড়াগড়ি খেতেন ছোটো ভাই। কথক ঠাকুরেব সঙ্গে বঙ্কিমের বাল্যকালের কৌতুকেব আরো নানা ছবি পূর্ণচন্দ্রের লেখায়।

কীর্তন প্রসঙ্গে—

> "দোলেব পূর্বরাত্রে আমাদেব ঠাকুর-বাড়িতে বড় ধম হইত। নেড়াপোড়া হইত। অনেক বাজি পুড়িত। রাত্রে যাত্রা অথবা কীর্তন হইত। এই উপলক্ষে অনেক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত হইতেন, ইতব লোকের তো কথাই ছিল না। মেদিনীপুব হইতে আসিবার পর প্রথম দোলযাত্রার এই দিন আমার বিশেষ স্মরণ আছে। ফাল্গুনের পূর্ণিমা বাত্রি—মধুযামিনী—বঙ্কিমচন্দ্র চিবদিনই স্বভাবের সৌন্দর্য দেখিতে ভালবাসিতেন, আজ রাত্রে তাঁহার ভারি স্ফূর্তি, কখনো অর্জুনা পুষ্করিণীর ধারে, কখনো গঙ্গাতীরে কখনো বা এখানে-ওখানে বেড়াইতেছেন— অবশেষে— ঠাকুরবাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরবাড়িতে লোকারণ্য। ভিড় ঠেলিয়া মন্দিরমধ্যে তিনি প্রবেশ করিলেন। কীর্তন হইবে, চারিদিকে আলো জ্বলিতেছে। একস্থানে অনেকগুলি ভাটপাড়ার পণ্ডিত পৃথগাসনে বসিযা আছে।..."

পূর্ণচন্দ্রের এই বর্ণনার আগেই রয়েছে 'হরে মুরারে মধুকৈটভারে' গানটির সম্পর্কে তাঁর মুগ্ধতার বিবরণ। এই গান তিনি গাইতেন অষ্টপ্রহর। পরে এই গানকেই সসম্মানে বসিয়ে দেবেন তাঁর 'আনন্দমঠ'-এ। কীর্তন সম্বন্ধে এই মুগ্ধবোধ বাল্যকাল ডিঙিয়ে আরো গাঢ় অনুভবে স্থায়ী হয়ে উঠবে তাঁর পরের জীবনপর্বে। এমন-কি হয়ে উঠবেন কীর্তন গানের সংগ্রাহক। সে-সংগ্রহের পিছনেও যে কতখানি নিবিড় আগ্রহ তার প্রমাণ মিলে যায় সংগৃহীত গানের সংখ্যায়। নিজের 'Bengali Literature' প্রবন্ধে জানিয়েও দিয়েছেন সে সংখ্যা। তিন

হাজারেরও বেশি। আর ঐ প্রবন্ধেই রয়েছে কীর্তনগানের ইতিহাস আর তার গীতিসুষমা সম্পর্কে নিজের অনুরাগী বিশ্লেষণ। আশ্চর্য, বঙ্কিম যখন সংগ্রহ করছিলেন গ্রামে-গঞ্জে ছড়ানো-ছিটোনো ঐ সব কীর্তন গান, তখনো কিন্তু বেরোয় নি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সংগ্রহ-করা 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়' আর বসন্তরঞ্জন রায়-এর সম্পাদনা-করা বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন'। দুটি বইই বেরবে একই বছরে।

২। গীত রচনা

বয়স তখন চোদ্দ-পনেরো। ভায়েদের সঙ্গে গিয়েছিলেন ফরাসডাঙার ভাসান দেখতে। ফেরার পথে সন্ধে। তখন

> "ভাগীরথীর পূর্বতীরে শ্মশানভূমিতে একটি শবদাহ হইতেছিল। নিকটে অনেকগুলি ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া; একটি স্ত্রীলোক উম্মত্ততার ন্যায় প্রজ্বলিত চিতাতে ঝাঁপ দিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু তাহার সঙ্গিনীগণ তাহাকে ধরিল। অবশেষে এই সদ্যবিধবা স্ত্রী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। বঙ্কিমচন্দ্রের চক্ষে জল আসিল, সকলেরই ঐরূপ হইল। নৌকাতে অবস্থিতি কালে বঙ্কিমচন্দ্র সদ্যঃ একটি গীত রচনা করিলেন। ঐ নৌকাতে এই লেখক ছিলেন, তাহাকে চুপি চুপি ঐ গানটি শুনাইলেন; কেননা, তাঁহাব অগ্রজেরা ঐ নৌকাতে ছিলেন। কিছুদিন পর ঐ গানটি মল্লার রাগিণীতে প্রচলিত ছিল। পরে লুপ্ত হইয়া যায়। গানটির প্রথমাংশ আমার মনে আছে আর নাই; যথা— হারালে পর পায় কি ফিরে মণি—কি ফণিনী, কি রমণী ?"

এটাই বঙ্কিমের গীত বচনার প্রথমোদ্যম কিনা জানিয়ে দিলেন না পূর্ণচন্দ্র। প্রথমোদ্যাম হোক বা না-হোক, গীত রচনার উদ্যম যে অব্যাহত থেকে যাবে আজীবন, তা আমাদের জানা হয়ে যায় তাঁর উপন্যাসের ভিতরে উঁকি দিযেই। উপন্যাসের নানা চরিত্রের মুখে নানা অঙ্গের নানান সুরের গান তুলে দিতে গিয়ে ভুলে যান নি স্বরচিত গানেব কলিকেও জায়গা পাইয়ে দিতে। এই প্রসঙ্গে এসে গেছে এমন-কি শেকসপীয়বের নামও। শ্যামলী চক্রবর্তী তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্প ও সঙ্গীতের জগৎ' বইটিতে জানিয়ে দিতে চেয়েছেন—

> "এ বিষয়ে শেক্‌স্‌পীয়রের সঙ্গে তাঁর মিল আছে। নিজেরই প্রয়োজন মতো, ছড়ানো ছিটোনো, যুগ-প্রচলিত গানের কিছু পংক্তি বেছে, একটু ভেঙে, বদলে মাঝে মাঝে গান গড়া শেক্‌সপীয়রেব এই টেক্‌নিক কখনো কখনো বঙ্কিমেও লক্ষণীয়।"

বঙ্কিমের লেখা একাধিক কীর্তন-ঘেঁষা গানকে নবপদাবলী আখ্যা দিয়ে শ্যামলী চক্রবর্তী-র প্রশ্ন, তাবা 'ভানুসিংহের পদাবলী'-র পূর্বসূরী হিসেবে সম্মানিত হতে পারে কিনা।

সংগীত বঙ্কিমের জীবনের রক্তস্পন্দনের সঙ্গে জড়ানো। তিরিশ বছর বয়সে আঠাশ বছরেব যদুভট্টকে মাসে পঞ্চাশ টাকা মাইনে দিয়ে সংগীতগুরু হিসেবে তাঁর নির্বাচন। শচীশচন্দ্রেব মতে—

> 'বঙ্কিমচন্দ্র সুকণ্ঠ ছিলেন না, কিন্তু তবলায় বোধ অনন্য সাধারণ ছিল। হারমনিয়ম যন্ত্রে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন'।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়' প্রবন্ধে, অনেকটা সিনেমার লং শটের ভঙ্গিতে, ঐ হারমনিয়মটিকে দেখতে পাই আবার। ঐ প্রবন্ধে রয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের পুব আর পশ্চিম দিকের ঘরের বর্ণনা। পশ্চিমের ঘরে খাট। পুবের ঘরে ফরাস পাতা, পশ্চিমের ঘরটা দিনের বেলায় শোয়ার। পুবের ঘরটা লেখাপড়ার। অল্প কিছু আপনজনেরই প্রবেশাধিকার শুধু সেখানে। আর গৃহসংলগ্ন দালানে যে দালান-জোড়া ফরাস পাতা তার উপরে তাকিয়া বালিশ ছাড়া আর যা তা একটি হারমনিয়ম। সময়ে সময়ে আরও নানা বাজনা।

লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর্বে পর্বে ক্রম-উন্মীলন ঘটবে তাঁর গীত-রসজ্ঞ মনের ও মননশীলতার। যদিও রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, অতুলপ্রসাদ বা দ্বিজেন্দ্রলালের মতো গীতিকার হিসেবে তাঁর স্বতন্ত্র সত্তার কোনো চূড়ান্ত বিকাশকে প্রত্যক্ষবৎ মনে হওয়ার মতো দৃষ্টান্ত জমা হয়ে নেই কোথাও, তবুও আমাদের বিস্ময়কে দীর্ঘায়ত করে তুলতে এও তো যথেষ্ট যে প্রথাসিদ্ধ অর্থে গীতিকার না হয়েও তাঁর উপন্যাসে উপন্যাসে গান হয়ে উঠবে অবশ্যম্ভাবী এবং অত্যাবশ্যক একটা উপকরণ। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সেখানে গানের উপস্থাপনা গানের গরজেই। অর্থাৎ পাঠকের চিত্তবিনোদনের স্বার্থে। না, কোনো মহৎ ঔপন্যাসিকই গানকে ব্যবহার করেন না সেভাবে। বঙ্কিমও করেন নি। গানকে দিয়েছেন অনেকটা যেন কাহিনীর সঙ্গে জুড়ে যাওয়া অন্যতম এক কুশীলবের মর্যাদা। গান সেখানে উপন্যাসের কালকে চেনায়। চেনায় চরিত্রদের ভিতরকার গড়ন। চেনায়, চরিত্রদের শিক্ষা-দীক্ষা সাংস্কৃতিক মান। চেনায়, তাদের অন্তর্সংঘাতের চরিত্র।

কিন্তু গান কি শুধু তাঁর উপন্যাসেই ? অন্য আর সব রচনায় তা কি গরহাজির ? নাকি সত্য এব বিপরীতটাই ? গান জানার, গান শোনার, গান বিচারের অভিজ্ঞতা বর্ষাব দীঘিব মতো এতটাই ভরাট তাঁর জীবনচর্যায় যে উপন্যাস ছাপিয়ে তার জলধারা উপচে পড়েছে অন্যান্য রচনার ডাঙা জমিতেও। তাঁর ইংরেজি এবং বাংলা প্রবন্ধে, তাঁর সমালোচনায়, তাঁর কমলাকান্তে গান-বিষয়ক ভাবনার অজস্র উদাহরণ নক্ষত্র-দীপ্তিতে ছড়ানো। তাঁর সমগ্র জীবন-পরিধিকে অভিন্ন আলিঙ্গনে জড়িয়ে থাকবে যে-গান, তারই বিস্ফারিত বিস্তার ঘটে যাবে সাহিত্যের সর্বস্তরে।

একটু আগে শ্যামলী চক্রবর্তীর বইটির কথা এসে গেছে, তা সত্যিই এক শ্রমসাধ্য গবেষণাগ্রন্থ। প্রথম ভাগে রয়েছে বঙ্কিমের শিল্পচিন্তার অথবা শিল্পদৃষ্টির পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয়। দ্বিতীয় ভাগে সংগীত। ভারতীয় সংগীতের এক বিশাল পটভূমিকায় এখানে ধাপে ধাপে আলোচিত হয়েছে তাঁর সংগীতমগ্নতার বহুবর্ণ বিকাশের ইতিহাস। স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকটি উপন্যাসকে নিয়েই তাঁব নিবিড় পর্যবেক্ষণ। বইটি সম্পর্কে পাঠকদের আগ্রহকে উসকে দিতেই সেখান থেকে কিছু সংক্ষিপ্ত সমাচার।

১। বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাসেই চরিত্র অনুযায়ী গানের নির্বাচন। গজপতি দিগগজেব গলায বিকট সুরে প্রচলিত বাংলা গানের আদল। আর সেই বিকটতাকে থামিযে দিয়ে বিমলাব গলায় স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠবে যে গান, সেখানে ভাষা অনুক্ত, সুরই প্রধান, হিন্দুস্থানী মার্গ সঙ্গীতের নিয়ম মেনে। দরবারী সংস্কৃতিতে লালিত বিমলার পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক।

২। দ্বিতীয় উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা'-য় মতিবিবি নাচে-গানে পারদর্শিনী।

৩। 'মৃণালিনী'-তে গানের সংখ্যা বারো। এই উপন্যাস রচনার সময়েই যদুভট্টের কাছে শিষ্যত্ব নেওয়া। বাংলার নিজস্ব লোকজ সংগীতের নানা ঘরানা শ্রদ্ধায স্মরণীয় হযে উঠেছে এই বারোটি গানে। চিনিয়ে দিলেন কীর্তন গানের মহাবৈভব।

৪। 'বিষবৃক্ষ'-র গানে বাবু-কালচার বা বাগান-বাড়ি কালচার-এর ছোঁযা, কাহিনী-কালের বাস্তবতার শরীরে বিশ্বাসযোগ্যতার রক্তমাংস জোগাতে।

৫। বিষবৃক্ষের গান নিছক মনোরঞ্জনের গান। কিন্তু 'চন্দ্রশেখর'-এর গান, বিশেষ করে যা শৈবলিনীর গাওয়া, মনস্তাত্ত্বিক মানচিত্র নির্মাণের ইঙ্গিত দিয়ে মোড়া। এ ছাড়া বাঈজী-সংস্কৃতির সংবাদ জ্ঞাপিত না হলে বাংলা গানের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন অসমাপ্ত থেকে যাবে ভেবে নিয়েই যেন ঐ উপন্যাসে মনিয়াবাঈ-এর গলায় 'সনদী' খিয়াল বা খেয়াল্।

৬। 'রজনী'-তে, রজনীর স্মৃতিচারণার সূত্রে উপন্যাসের শুরুতেই গানের একটিমাত্র কলির উল্লেখ ছাড়া গান নেই আর কোথাও। আছে যা, তা গান নিয়ে আলোচনা। টপ্পা-ঠুংরি খেয়াল, রঙীন গান। ভোগবাদী আর ঈশ্বরবিমুখ ইহসর্বস্ব সভ্যতার সঙ্গে মানানসই। কিন্তু ধ্রুপদ আত্মসমৃদ্ধি করণের গান। তাই নিয়ে বেদগায়ক সন্ন্যাসীর সঙ্গে এখানে নব্যপন্থী শচীন্দ্রের সংলাপ বিনিময়।

৭। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' ব্যভিচার-বিলাসী গোবিন্দলালের প্রমোদ ভবনে যে গানের আসর, সেখানে নান্দনিক সৌন্দর্য অনুপস্থিত। নন্দিত সুরের চেয়ে ওস্তাদের দাঁত খিঁচুনিটাই প্রকট। আছে প্রণয়ের পরিপ্রেক্ষিতকে সময়োচিত বাস্তবতার জল-হাওয়া জোগাতেই বঙ্কিম এখানে পরিকল্পিতভাবেই জোর দিয়েছেন অরুচিকর গায়নভঙ্গির উপর। আবার স্বেচ্ছাচারীর সংগীত-বিলাসিতার বিপরীতে টেনে এনেছেন বাংলার আবহমানের লোকজ সঙ্গীতের দৃষ্টান্ত।

৮। রাজসিংহ উপন্যাসে দরিয়া 'অতিশয় সুকণ্ঠ; সঙ্গীতে বড় পটু'। এ ছাড়া আছে মানিকলাল, যার গলায় পাঠক শুনতে পান উত্তর-মধ্য ভারতীয় লোকগান। রূপমতী গান বেঁধে পাঠান আদম খাঁকে। চঞ্চলকুমারী আর নির্মলকুমারীর মুখে বঙ্কিম তুলে দিয়েছেন পদ আর দোঁহা।

৯। 'আনন্দমঠে' ভবানন্দের গাওয়া গান 'বন্দেমাতরম' তো পরাধীন আর স্বাধীন দুই ভারতবর্ষেই পেয়ে গেছে সশ্রদ্ধ সম্মানের বেদী।

১০।'দেবী চৌধুরাণী'তে গানের বদলে বাদ্য। বাণীর বদলে বীণা।

১১। তাঁর সবশেষের উপন্যাস 'সীতারাম'-এ গান আর বাদ্য-র বদলে কেবল 'গম্ভীর স্তবমন্ত্র আর জয়োচ্চারী নামগান'।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসেরও, পথের ধারে ধারে নয়, তার অন্তর্ভুবনের উঠোন-দালান জুড়ে বিছোনো গানের সুরের আসনখানি। এমন-কি তাঁর একটি বিশেষ উপন্যাসের গঠনভঙ্গিকে কেউ কেউ ভাবতে পেরেছেন ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের কাঠামোয়। 'চতুরঙ্গ'। আর 'যোগাযোগ' হল সেই উপন্যাস যার নিরবচ্ছিন্ন দ্বান্দ্বিক মুহূর্তগুলোর অভ্যন্তরীণ জটজটিলতার সঙ্গে কোনো-না-কোনো সাঙ্গীতিক প্রসঙ্গ জুড়ে গিয়ে আমাদের অনুভবের তটভূমিকে ভিজিয়ে দেয় আরো তীব্র জলোচ্ছ্বাসে। ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের সমগ্র যাপিত জীবনের আদি অন্ত ছুঁয়ে গানের উথাল-পাথাল ঢেউ-এর নাচনের ইতিহাস আমাদের স্মৃতিতে তো নিয়তই খরস্রোতা।

অনুসন্ধিৎসার খিদে মেটাতে আমরা তাকাতে পারি বিশ্বসাহিত্যের আর-এক মহান ঔপন্যাসিকের দিকেও। টলস্টয় যখন কাজিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, তখনই পিয়ানোর শিক্ষার্থী। সুরের নেশা এমনভাবে ছেয়ে ফেলে তাঁর মনের দশদিগন্ত যে, যখন পিয়ানো নেই হাতের সামনে, তখনো তাঁর হাতের উৎকণ্ঠ আঙুলগুলো পিয়ানো বাজিয়ে যায় খাবার টেবিলে, বিছানার বালিশে। বাজানো ছাড়াও তিনি ঐ সময়ে লিখেছিলেন একটা 'Waltz'। এই 'Waltz' সম্বন্ধে তাঁর জীবনীকার হেনরি ট্রেয়োট-এর ফুটনোট—

> "He never forget it, and played it at Yasnaya Polyana in 1906. He himself admitted that he had only sketched out the melody, and one of the Zybin brothers did the arrangement."

পিটার্সবার্গ থেকে আনানো জার্মান পিয়ানিস্ট রুডল্ফ-এর কাছে তালিম নিতে নিতে এমনও ভেবেছেন তিনি যে, ভবিষ্যতে হয়ে উঠবেন জিনিয়াস রুডল্ফ-এর মতোই একজন

কমপোজার। সঙ্গীত নিয়ে তাঁর দু-দুটো প্রবন্ধ, 'ফাউন্ডেশন অব মিউজিক', আর 'রুলস ফর দা স্টাডি' রুডলফ-এর উৎসাহেই লেখা।

টলস্টয়ের জীবনে সঙ্গীতের ভূমিকা একই সঙ্গে জলের মতো উজ্জীবক, আবার আগুনের মতো বৈনাশিক। ১৮৫৬-র শেষ দিকে ছাড়লেন সামরিক বাহিনীর কাজ। নতুন বছরের প্রথম দিনটি কাটালেন বন্ধু স্তোলিগিন-এর অ্যাপার্টমেন্টে, কেবল বেঠোফেন শুনেই। এই বছরের ফেব্রুয়ারিতেই য়ুরোপ ভ্রমণে বেরিয়ে পৌঁছবেন প্যারিসে। সেখানকার সাংস্কৃতিক জল-হাওয়ায় নিশ্বাস নিতে নিতেই তিনি বুঝে যান ফরাসীরা ছাড়া আর কেউই বাজাতে পারে না বেঠোফেন। বেঠোফেনই তাঁর কাছে সুরের শেষ কথা। অথচ পরে, এই টলস্টয়ই একদিন নিজের অস্তিত্ব-দহনের এক রুধির-রক্তিম মুহূর্তে ঘোষণা করে বসবেন যে, বেঠোফেন-এর 'নাইন্থ সিমফনি'-র চেয়ে ভলগার বোটম্যানদের গান অনেক বেশি প্রশংসার যোগ্য। শুধু বেঠোফেনই নয়, সাহিত্য-শিল্পের সমস্ত কিছুকেই তখন তাঁর মনে হচ্ছে সভ্যতার পক্ষে ক্ষতিকারক। এরই পরে তাঁর 'ক্রুটজার সোনাটা' উপন্যাসে ঘটবে যে রক্তাক্ত ট্রাজেডি, তার নেপথ্য নায়ক হয়ে উঠবে সঙ্গীত।

৩। বঙ্কিমের প্রকৃতি মুগ্ধতা

অন্তর্জলি-যাত্রায় পিতামহী গঙ্গাতীরে। ঐ তিন সপ্তাহের প্রত্যেকটা দিনই ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতেন পিতামহীর পাশে, আকাশের দিকে তাকিয়ে। প্রথম দু-সপ্তাহ ছিল কৃষ্ণপক্ষ। শেষ সপ্তাহটি দেবীপক্ষ। সন্ধের পরের আকাশে তাই চাঁদ-তারার আলোর নানান রূপ।

> "...বঙ্কিমচন্দ্র একমনে ভাগীরথীতীরে সন্ধ্যার সৌন্দর্য দেখিতেন। অন্ধকার ধীরে ধীরে নদীবক্ষে বিচরণ করিতেছে। দেখিতে দেখিতে নদীবক্ষ গাঢ় অন্ধকারময় হইল, কিছুই দেখা যায় না, কেবল এ-পারের ও পারের নৌকাশ্রেণীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোগুলি মনুষ্য-জীবনের আশার ন্যায় একবার নিবিতেছে, একবার জ্বলিতেছে, আর দুই একখানি পানসী অন্ধকারে কলিকাতার দিকে বাহিয়া যাইতেছে, তাহাদের দাঁড়ের ছপ্‌ছপ্‌ শব্দ শুনা যাইতেছে। এই বাল্যস্মৃতি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার পুস্তকের স্থানে স্থানে অঙ্কিত করিয়াছেন।"

কলেজে যাওয়ার পথে পড়ত ভাগীরথীর উপছোনো জলে টলোমলো যে খাল, সেই সরু খালের ভিতর দিয়ে ছোট্ট ডিঙি নৌকোয় যাওয়ার সময় দুপাশের প্রকৃতির সঙ্গে যেন মিশে যেতে চাইতেন তিনি।

> "তাঁহার নৌকা খালে প্রবেশ করিলে, উহার উপরের পাতার ছাদ হইতে অসংখ্য পক্ষী উড়িত, চীৎকার করিত, আবার বসিত। খালের উভয় পার্শ্বে নিবিড় বন ছিল, তাহাতে নানাপ্রকার বনফুল ফুটিত। বর্ষার জলে গাছগুলি অর্ধনিমজ্জিত। নৌকা প্রবেশ করিবামাত্র উহার জলতাড়নে তাহার নানা বর্ণের ফুলের সহিত হেলিত, দুলিত, নাচিত। বালক কবি তাহাই দেখিতেন, হাসিতেন, ক্ষণকালের জন্য তাহারা তাঁহার সঙ্গী হইত।"

বর্ষাকাল। পূর্ণিমার রাত। তেরো-চোদ্দ বছরের বঙ্কিম সদরবাড়িতে এসে জাগিয়ে তুললে মাঝি আর দারোয়ানকে। বাড়ির কাউকে কিছু না জানিয়ে সেই মাঝ রাতে নৌকো ভাসল খালে। বাড়ি ফিরলেন দু ঘণ্টা পরে। তাঁর এই নৈশ ভ্রমণের সাক্ষী ছিলেন কেবল একজনই। ছোটো ভাই পূর্ণচন্দ্র। যেহেতু বঙ্কিমের ঘরেই তাঁর বিছানা। পূর্ণচন্দ্র পিছু নিয়েছিলেন খানিকটা। কিন্তু ধমক খেয়ে ফিরে আসতে হয়েছিল তাঁকে। এই নৈশভ্রমণের অভিজ্ঞতা অল্পদিনের মধ্যেই ছবি হয়ে ফুটে উঠেছিল 'ললিতা'-র প্রথম সর্গে।

৪। কবিতা পাঠে আগ্রহ

জয়দেব, ভারতচন্দ্র, মধুসূদন প্রমুখদের কবিতা নিয়তই আবৃত্তি করে শুনিয়ে যাওয়ার এক

আশ্চর্য অভ্যেস ছিল তাঁর। জয়দেব-এর 'ধীর সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী' বাল্যকাল ছাড়িয়ে যৌবনকাল পর্যন্ত এমনই প্রিয় ছিল তাঁর যে, হাতে তেমন কোনো কাজ আর কোনো বাইরের লোক না থাকলে, আউড়ে যেতেন ঐ শ্লোক। শেষ বয়সের 'আনন্দমঠ'-এও ঠাঁই পেয়ে গেছে ঐ শ্লোক। যেমন পেয়ে গেছে 'হরে মুরারে মধুকৈটভারে'। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সঙ্গে বঙ্কিমের ব্যক্তিগত পরিচয় ঘটেছে অনেক পরে। যখন তিনি এম. এ.-র ছাত্র। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের পরিবারে আসা-যাওয়া ছিল বাল্যকালে থেকেই। ধরণী কথকের গান শুনতে গিয়ে দূর থেকে দেখেছেন বঙ্কিমচন্দ্রদের চার ভাইকে। হরপ্রসাদের বর্ণনায় যদিও বেশি বয়সের বঙ্কিমের ছবিটাই পরিমাণে বেশি, তবুও তাঁর স্মৃতিচারণায় সুনির্দিষ্ট হয়ে ওঠে বঙ্কিম চরিত্রের তিনটি বিশেষ দিকের প্রতি প্রবণতা। এক, পড়াশোনায় অখণ্ড নিষ্ঠা। দুই, সঙ্গীতে আগ্রহ। তিন, ফুলের বাগানের দিকে মনোযোগ। একটু আগে তাঁরই রচনা থেকে আমরা পেয়েছিলাম পুবের ঘরের দালানে ফরাশের উপর রাখা হারমোনিয়ম-এর একটি স্থিরচিত্র। ঐ রচনারই শেষাংশে রয়েছে তাঁর বেশি বয়সের সঙ্গীত-চর্চার ভিন্নতর স্পন্দ্যমান তথ্যচিত্র।

> "বাঙ্গালায় তিনি কীর্তনের বড় অনুরাগী ছিলেন। একবার শুনিয়াছি, কীর্তনওয়ালাকে পেলা দিতে দিতে তিনি 'বঙ্গদর্শনে'র তহবিল খালি করিয়া দিয়াছিলেন। গানের উপর তাঁহার বেশ ঝোঁক ছিল। তিনি কয়েক বৎসর ধরিয়া যদুভট্টর নিকট গান শিখিতেন, একটি হারমোনিয়ম কিনিয়াছিলেন। বসিয়া বসিয়া তিনি তাহা বাজাইতেছেন, ইহাও দেখিয়াছি। কিন্তু তাঁহাকে দলনী বেগমের ন্যায় গুন্‌গুন্ করিয়া ছাড়া গলা ছাড়িয়া গাহিতে কখনো শুনি নাই।"

ফুল বা ফুলের বাগানের সঙ্গে জড়িয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কলমে বঙ্কিমের যে ছবি, সেখানে তাঁর কবি পরিচয়টার উপরই আলোকপাত।

> "...তিনি যে কবি, তাহার কোনো নিদর্শনই এখনো দিই নাই। সে নিদর্শনটি তাঁহার শুইবার ও বসিবার ঘরের দক্ষিণ দিকে দেখা যাইত। সে একটি ছোট্ট ফুলের বাগান, দু কাঠাও পুরা হইবে না। ঘর দুটি যত লম্বা, বাগানটিও ততখানি লম্বা, আড়েও প্রায় ঐরূপ। তিনদিকে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, সে পাঁচিলের আগায় একটি আলসে ও তাহার নিচে একটি বেঞ্চি। চারিদিকেই ঐরূপ। বাগানের ঠিক মাঝখানে একটি চৌকা গাঁথা, হাতখানেক উঁচা, তাহারো আবার মাঝখানে একটি ছোট চৌকা হাতখানেক উঁচা, তাহারো মাঝখানে আবার একটি চৌকা হাতখানেক উঁচা, চারিদিকেই যেন গ্যালারির মতো। এই সমস্ত গ্যালারিতে চারিদিকেই টব সাজান থাকিত। টবে নানারূপ রঙিন ফুল ও পাতার গাছ। বাগানে আর যেটুকু জমি ছিল, তাহাতে সুরকিব কাঁকর দিয়া রাস্তা করা। বাকি জমিতে যুঁই, জাতি, কুঁদ, মল্লিকা ও নবমল্লিকার গাছ। বর্ষাকালে ফুল ফুটিলে সব সাদা হইয়া যাইত, এবং বৈঠকখানাটি গন্ধে ভরপুর হইয়া যাইত। বঙ্কিমবাবু বাগানটিকে বড়ই ভালবাসিতেন। যতদিন তিনি বাড়ি থাকিতেন, বাগানটি খুব সাবধানে পরিষ্কার রাখিতেন এবং মাঝে মাঝে অবসর পাইলে আলসেটিতে হেলান দিয়া বেঞ্চির উপর বসিয়া ফুলের বাহার দেখিতেন।"

'বঙ্কিম জীবনী' জোগায় আরও একটু পরিপূরক তথ্য। অর্জুনা দীঘির পাড়ের নিচে কয়েক বিঘে জমিতে বঙ্কিম নিজের হাতে গড়ে তুলেছিলেন যে বাগান, তার নাম ছিল 'ফুল বাগান'। হুগলি কলেজ থেকে ফেরার সময় পছন্দমতো গাছও সঙ্গে থাকত অনেক সময়। কবিতা লিখতেন ঐ বাগানে বসে।

৩

যখন তিনি কবি, তখনো ছাত্র। বাবা যাদবচন্দ্র বদলি হয়ে গেছেন বর্ধমানে। বার বার ঠাঁই বদলালে পড়াশোনার ক্ষতির আশঙ্কায় ছেলেদের নিয়ে যান নি সঙ্গে। গত বছরের মতোই বঙ্কিম হুগলি কলেজে। কিন্তু গত বছরের মতো পুরস্কার পান নি এ বছরে। বাংলা পরীক্ষাব ফলাফল খারাপ সব ছাত্রেরই। এ বছরে বাংলার পরীক্ষক ছিলেন বিদ্যাসাগর। ছাত্রদের অকৃতকার্যতার দায় তাঁরই ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন কলেজের অধ্যক্ষ।

"...The Principal explained it, probably with perfect truth, as due to 'some bias in the mind of the Examiner in regard to what he considers a good vernacular style'. The examiner for that year was Iswarchandra Vidyasagar, who, as a product of the Sanskrit College had 'imbibed the notion that, that only is a good Bengali style in which there is a considerable infusion of high Sanskrit words."

– K. Zachariah / History of Hoogly College

এ উদ্ধৃতির ঠিক আগের লাইনে জ্যাকেরিয়া লিখেছিলেন—

"This result was surprising in view of the consistently high standard of Bengali at the College for many years."

তার খানিকটা আগে

"Hooghly College was thus one of the nurseries of Bengali literature."

এই উপসংহারে পৌঁছনোর আগে তিনি এক-এক করে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন এই কলেজের সেই সব কৃতী ছাত্রদের সঙ্গে বাংলাভাষায় যাঁদেব প্রতিভার প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা। যথা, দ্বারকানাথ মিত্র, হরচন্দ্র ঘোষ, গঙ্গাচবণ সরকার, অক্ষয়চন্দ্র সরকার। এরপরেই বঙ্কিম। বঙ্কিমের পুরস্কাব পাওয়াব ঘটনাও, 'প্রভাকর'-এ বেরনো কবিতার সূত্রে। তাহলে এ বছরেই কেন এমন ব্যতিক্রম? কেন কৃষ্ণনগর কলেজের থেকে বাংলায় হঠাৎ এমন নিম্নমান? অধ্যক্ষেব অভিযোগ অনুযায়ী এখানে অভিযুক্তের দু দিকে দুটো সম্প্রদায়। কলেজের দিক থেকে পরীক্ষক। পরীক্ষকেব দিক থেকে ছাত্রেরা। এ ছাড়াও এই অভিযোগে অন্য একটা না-বলা কথারও ইঙ্গিত মেলে যেন। যেন মনে হয়, হুগলি কলেজে তখন বাংলা শেখানো হচ্ছিল আদর্শ কোনো রীতিতে, অবশ্যই সংস্কৃতেব ভারী ভারী শব্দের অবাঞ্ছনীয় মিশেল ছাড়াই। আর, অন্যদিকে, বিদ্যাসাগর চাইছিলেন সেটাই। এই পরীক্ষার সমসময়ে, ঐ কলেজের অন্য ছাত্রদের না থাকলেও, বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা লেখার নমুনা আমাদের হাতেব নাগালেই, সংবাদ প্রভাকর-এ প্রকাশের সুবাদে। সেসব বিচ্ছিন্ন নমুনায় কোথাও নেই চলতি ভাষায় সহজপাঠ্য স্বাচ্ছন্দ্যের ছাপ। বরং অনুপ্রাস আর খটমট দুরূহ তৎসম বা সংস্কৃত-ঘেঁষা শব্দের ব্যবহাবে তা প্রায় অপাঠ্যই। Considerable infusion of high Sanskrit words-এরই আধিপত্য সেখানে। এটাই যখন বাস্তব, তাহলে অমন রচনাও বিদ্যাসাগরের মনোনযন পেল না কেন? তাঁর অপছন্দের উৎসটাই বা কোথায়?

এটা তলিয়ে দেখার মতো একটা বিষয়।

পরীক্ষক বিদ্যাসাগরের চাহিদা আর ছাত্র বঙ্কিমচন্দ্রদের জোগানের মাঝখানে যে সমকাল, তাকানো যাক তার আকার-অবয়বের দিকে। বঙ্কিম যখন হুগলি কলেজে পড়ছেন, তার আগে-পরে সারা দেশের স্কুল-কলেজেই বাংলা ভাষায় লেখাপড়া শেখাটা একটা ঘোরতর সমস্যা। এই সমস্যারও দুটো দিক। এক, যথেষ্ট পরিমাণ ভালো বই-এর অভাব। দুই, অভাব যোগ্য বাংলা শিক্ষকের।

রাজনারায়ণ বসু বঙ্কিমের থেকে ১২ বছরের বড়ো। ইয়ং বেঙ্গলী যুগের ঝোড়ো হাওয়া তাঁর ছাত্রজীবনের গায়ে। তিনি যখন হিন্দু কলেজে পড়ছেন, আত্মচরিতে জানিয়ে দিয়েছেন তার পাঠ্যপুস্তকের তালিকা। আর সে তালিকায় ইংরেজিরই জয়জয়কার।

হিন্দু কলেজে প্রথম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক।

১। বেকনের—'এসেজ'।

২। শেক্সপীয়রের—ম্যাকবেথ, লীয়র, ওথেলো, হ্যামলেট।

৩। মিল্টনের—প্যারাডাইস লস্ট, লিসিডাস, কোমাস, ল' এলেগ্রো, ই'ল পেনসেরসো, সনেটজ ইত্যাদি।

৪। পোপের—এসে অন ক্রিটিসিজম, রেপ অব দি লক, ইলয়সা টু আবেলার্ড, এলিজি অন দি ডেথ অব এ ইয়ং লেডি, প্রোলোগ টু দি স্যাটায়ার্স ইত্যাদি।

৫। ইয়ং-এর নাইট থটজ।

৬। গ্রে-র—পোয়েমজ।

পুরাবৃত্ত নিয়ে কোন বই থেকে প্রশ্ন আসবে তা ঠিক করা ছিল না। সারা বছরের ভিতরে পড়ে নিতে হত।

১। হিউমের—হিসট্রি অব ইংল্যাণ্ড (সম্পূর্ণ)

২। গিবনের—রোমান এম্পায়ার (সম্পূর্ণ)

৩। মিটফোর্ডের—হিস্ট্রি অফ গ্রীস।

৪। ফার্গুসনের—রোমান রিপাবলিকস।

৫। এলফিনস্টোনের—ইন্ডিয়া।

৬। রাসেলের—মডার্ন ইওরোপ।

সব মিলিয়ে ৩৬ ভল্যুম বই।

রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিতে বাংলা কোনো পাঠ্য বইয়ের নাম নেই। তবু বাংলা পাঠ্য-পুস্তকের দুরবস্থার খানিকটা ছবি আমরা পেয়ে যাই 'পুরাতন প্রসঙ্গ'-য়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের স্মৃতিচারণায়। কৃষ্ণকমল যখন সংস্কৃত কলেজে পড়ছেন, তখন স্কুলে ভর্তি হয়েই তাঁকে পড়তে হয়েছিল মুগ্ধবোধ। এবং পড়তে হয়েছিল চার-চারটে বছর ধরেই। এরপর রসময় দত্তকে সেক্রেটারি পদ থেকে সরিয়ে কাউন্সিল অব এডুকেশনের প্রেসিডেন্ট বেথুন সাহেব যখন বিদ্যাসাগরকে সেখানে বসিয়ে দিলেন প্রথম প্রিন্সিপ্যাল করে, ওলট-পালট হয়ে গেল অনেক নিয়মকানুনের।

১। শুধু ব্রাহ্মণ বৈদ্য পরিবারের ছেলেরা নয়, সংস্কৃত কলেজে পড়তে পারবে বর্ণনির্বিশেষে সব হিন্দু পরিবারের ছাত্রই।

২। আরম্ভ হল ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন নেওয়া।

৩। ব্যাকরণ পড়ানোর ধরন বদলে গেল। 'মুগ্ধবোধ' বাতিল করে তার জায়গায় এল 'উপক্রমণিকা'।

৪। বেশি করে পড়ানো হতে লাগল ইংরেজি, উপর ক্লাসে হয়ে গেল আবশ্যিক। আগে ইচ্ছে মতন পড়ত ছাত্ররা।

৫। উঠে গেল সংস্কৃতে গণিত পড়া। তার জায়গায় এল ইংরেজি।

"নূতন নিয়মে পড়ান হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের Education Despatch-এর ফলে, গবর্ণমেন্টের শিক্ষাবিভাগের ভাঙ্গাগড়া হইল। শিক্ষা-বিভাগের

একজন ডাইরেক্টর নিযুক্ত হইলেন। অনেক বাঙ্গালা ইস্কুল স্থাপিত হইল, ইস্কুলের ইনস্‌পেক্টরও নিযুক্ত হইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের প্রিন্সিপ্যাল রহিলেন, এবং স্কুলের পরিদর্শক হইলেন।... এই সময়ে ধীরে ধীরে বাঙ্গালীর মন বাঙ্গালা ভাষার দিকে আকৃষ্ট হইতেছিল। এখনকার বাঙ্গালা সাহিত্যের বনিয়াদ প্রস্তুত করা আরম্ভ হইল। প্রসন্নবাবু বাঙ্গালায় পাটিগণিত লিখিলেন।... সকলের অপেক্ষা অধিক লিখিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়—

১। জীবন চরিত — Chamber's Biography-র অনুবাদ ;

২। বাঙ্গালার ইতিহাস — Marshman-এর অনুবাদ ;

৩। মহাভারতের উপক্রমণিকা ;

৪। বোধোদয় ;

৫। ব্যাকরণ কৌমুদী ;

৬। ঋজুপাঠ।

৭। Expurgated রঘু, কুমার, ভারবী, মাঘ।"

এই বিবরণের সঙ্গে কৃষ্ণকমলের স্মৃতিচাবণা থেকে খুঁটে নিয়ে জুড়ে দেওয়া যেতে পারে অতিরিক্ত আরো কিছুটা তথ্য।

"এই সময়ে ধীরে ধীরে বাঙ্গালীর মন বাঙ্গালা ভাষার দিকে আকৃষ্ট হইতেছিল। এখনকার বাঙ্গালা সাহিত্যের বনিয়াদ প্রস্তুত করা আরম্ভ হইল। প্রসন্নবাবু বাঙ্গালায় পাটিগণিত লিখিলেন। আমার দাদা তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রসন্নবাবুর সংস্কৃত অঙ্কশাস্ত্র পড়া ছিল না, তাই তাঁহার পাটিগণিতের সমস্ত terminology (যথা— বর্গ, ঘন, বর্গমূল, ঘনমূল, করণী, ত্রৈরাশিক, ভগ্নাংশ, গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক, লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণীতক ইত্যাদি) আমার দাদা করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পাটিগণিতের প্রথম সংস্করণে তাঁহার প্রিয় ছাত্র রামকমল ভট্টাচার্যের নাম এই জন্য বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছিলেন। নবদ্বীপের তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় বাঙ্গালায় ভূগোল লিখিলেন, আজ পর্যন্ত তাঁহারই terminology প্রচলিত।"

বঙ্কিম যখন বি. এ. পবীক্ষা দেবেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, তখন তাঁর পাঠ্যপুস্তকেব দিকে তাকালেই টের পাওয়া যায়, বাংলা বইয়ের বৈচিত্র্যহীনতা আর সেইসঙ্গে ভালো বাংলা বইযের আকালটাও। যদি ধরে নেওযা যায যে 'ইয়ংবেঙ্গল' যুগের ছাত্রসমাজ আর পরবর্তীকালে তার নায়করা বাংলা ভাষা সম্পর্কে দেখিয়ে এসেছে প্রকাশ্য বিরাগ, তার অন্য আরো সব কার্যকারণের মধ্যে একটা কি হতে পারে না পাঠযোগ্য ভালো বাংলা বই আর বাংলা শেখানোব উপযুক্ত শিক্ষকের ঘোবতর অনটন ? রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত'-এ স্কুল-কলেজে পড়াশোনার কথা যেখানে, সেখানে বাংলা ছাড়া অন্য সব বিভাগের শিক্ষকদেব সম্বন্ধে রসালো বর্ণনা। কেবল বাংলার শিক্ষক সম্বন্ধে যে মন্তব্য, তা মর্মান্তিক।

"আমাদিগের কলেজে যিনি বাঙ্গলা পণ্ডিত ছিলেন, তিনি এক সময়ে রামকমল সেনের পাচক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আমরা রান্নার গল্প করিয়া সময় কাটাইতাম।"

এমন শিক্ষকের ভূমিকা পড়াশোনার ক্ষেত্রে হতে পারে কি রকম পরিণামদায়ী, তাও জানিয়ে দিয়েছেন রাজনারায়ণ।

"সুতরাং যখন আমরা কালেজ থেকে বেরুলেম, তখন আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় কিছু ব্যুৎপত্তি জন্মে নাই। সে সময়কার ছাত্রদিগের পক্ষে বাঙ্গালা ভাষা অতি ভীষণ পদার্থ ছিল।"

আর ইংরেজি ?

> "আমি কালেজে থাকিতে ইংরাজী কবিতা পড়িতাম না বলিয়া, তাহা গিলিতাম বলিলেই হয়, তাহা এমনই আগ্রহের সহিত পাঠ করিতাম।"

তখনকার স্কুল-কলেজে ইংরেজি শুধু পাঠ্য হিসেবেই প্রাধান্য পায়নি, রচনা প্রতিযোগিতা আর পুরস্কারের মাধ্যমে ইংরেজি সম্পর্কে ছাত্রদের মনে গেঁথে দেওয়া হয়েছে আকর্ষণের ভিন্নতম মাত্রা। ফলে হিন্দু কলেজ থেকে বেরনো ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীভুক্ত ছাত্রসমাজের মাতৃভাষা হয়েছিল ইংরেজিই।

'ইয়ং বেঙ্গল' তখনকার সমাজের স্থবিরতা ভেঙে দিতে চেয়েছিল এক ধরনের যুক্তি আর যথেচ্ছাচারের দাপটে। ইয়ং বেঙ্গল-এর কুশীলবেরা মাতৃভাষাকে দুয়োরানী সাজিয়ে সুয়োরানীর সোনার পালঙ্কে বসিয়েছিল ইংরেজিকে। এ-সব কথা যতই সত্যি হোক, ইয়ং বেঙ্গল-এর প্রায় একচ্ছত্র আধিপত্যের সময়েও বাঙালি সমাজে গোঁড়া ইংরেজিয়ানা আর গোঁড়া হিন্দুয়ানার পাশ কাটিয়ে চলমান ছিল অন্য এক ধরনেব সামাজিক শক্তি, যাদের সমস্ত আন্দোলিত কর্মসূচিই বাংলা ভাষাকে অবলম্বন ক'রে। আরও বিস্ময়কর ঘটনা, বাংলা ভাষা চর্চার এই আন্দোলনে অগ্রগণ্য অধিনায়কের ভূমিকা যাঁদের, তাঁরা সকলেই নাকি সংস্কৃতে অভিজ্ঞ।

> "সেকালে ইংরেজি শিক্ষায় উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙালি বুদ্ধিজীবীর দল বাংলা ভাষায় পত্রিকা প্রকাশ রীতিমত লজ্জার বিষয় মনে করতেন। 'ইয়ং বেঙ্গল' সম্প্রদায়ের 'রাগী যুবকেরা' অধিকাংশই ইংরেজি মুখপত্র প্রকাশ করে অধীত বিদ্যার গৌরব প্রকাশে ব্রতী হয়েছিলেন। কদাচিৎ বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করলেও তাকে ইংবেজির সঙ্গে যুক্ত কবে দ্বিভাষিক করে নিতেন (যেমন 'জ্ঞানান্বেষণ' অথবা 'বেঙ্গল স্পেকটেটর')। নির্ভেজাল বাংলা পত্রিকার ধারাটিকে যাঁরা কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন—তাঁরা কেউই ইংরেজি ভাষা বা সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন না। বরং আরবী, ফার্সীর সংস্কৃতে তাঁদের ব্যুৎপত্তি অধিক ছিল, যেমন 'সংবাদ কৌমুদী'র রামমোহন রায়। ইনি ২২ বছর বয়সে ইংরেজি শিখতে শুরু করেন, ২৮ বছর বয়সে শুদ্ধ ইংরেজি বলতে শেখেন কিন্তু কখনোই 'Complete command over the English language' অর্জন করেননি। (দ্র. কিশোরীচাঁদ মিত্র রচিত 'রামমোহন রায়' স্মৃতিপ্রবন্ধ এবং নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রচিত 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত')। 'সমাচার চন্দ্রিকা'-র ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সংবাদ প্রভাকরে'র ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, 'সংবাদ ভাস্করে'র গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয়কুমার দত্ত, 'সোমপ্রকাশে'ব দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। শেষোক্ত সংস্কৃত পণ্ডিতরাই বাংলা বিদ্যাচর্চার ধারাটিকে প্রবহমান রেখেছিলেন এবং লক্ষণীয় যে, এঁরা কেউই পাশ্চাত্য শিক্ষার পীঠস্থান হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন না। একমাত্র দেবেন্দ্রনাথ কিছুকালের জন্য হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন।"

মাতৃভাষা ও বঙ্কিমচন্দ্র/তপোবিজয় ঘোষ

তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তকে উপকরণ জোগাতে কথাগুলো হয়তো অনেকখানিই সত্যি। কিন্তু সত্য হিসেবে আংশিক। আর তথ্য হিসেবে অসম্পূর্ণ। সংস্কৃতের সঙ্গে ইংরেজিতেও যাঁদের সমান দখল, অথবা সংস্কৃত বিষয়ে যাঁদের খ্যাতি কোনো চূড়া স্পর্শ করার মতো উচ্চতা অর্জন করেনি কখনো, তাঁদেরও কেউ কেউ তখন মনোযোগ ছড়িয়েছিলেন বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি সাধনে।

রাজনারায়ণ বসুকে, তাঁর অতিরিক্ত ইংরেজি প্রীতির জন্যে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলতেন 'ইংরেজী খাঁ'। সেই রাজনারায়ণ জীবনেব প্রথম বাংলা বক্তৃতায় চমকে দিয়েছিলেন দেবেন্দ্রনাথকে। আবার উল্টোদিকে, দেবেন্দ্রনাথের অনুবোধের চাপেই তাঁর বাংলা বক্তৃতাব সূচনা। সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি বিভাগেব দ্বিতীয় শিক্ষক হয়ে যিনি বিদ্যাসাগর, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রমুখ পরবর্তীকালের কৃতী ছাত্রদের ইংরেজি শেখাতেন, সেই তিনিই আজীবন বাংলা ভাষাব উন্নতির জন্যে লিখে গেছেন, ভাষণ দিয়েছেন, বিতর্কে জড়িয়েছেন। তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

"রিচার্ডসনের তিনি প্রিয় ছাত্র, ইংরেজি বিদ্যাতেই বাল্যকাল হইতে তিনি মানুষ, কিন্তু তবু অনভ্যাসেব সমস্ত বাধা ঠেলিয়া ফেলিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেব মধ্যে পূর্ণ উৎসাহ ও শ্রদ্ধার বেগে তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন।"

'পুরাতন প্রসঙ্গ' মারফত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের স্মৃতিচারণার সূত্রে আমবা জানতে পাবি বিদ্যাসাগব রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্বন্ধে বলতেন—

"ও লোকটা ইংরেজিতে একজন ধনুর্দ্ধর পণ্ডিত, কহিতে লিখতে খুব মজবুত, কিন্তু সাহেবদের কাছে বোলে বেড়ায়—'ইংরেজী আমি যৎসামান্য জানি ; যদি কিছু আমাব জানাশুনা থাকে তা' সংস্কৃতশাস্ত্রে।' ইহাতে সাহেবেবা মনে ভাবেন—বাস্ বে, ইংরাজীতে এত সুপণ্ডিত হোযে যখন সে বিদ্যেকে যৎসামান্য বলে, তখন না জানি সংস্কৃততে এব কতই বিদ্যে আছে!"

সংস্কৃতেব সঙ্গে ইংরেজিতে যিনি সমান দক্ষ, সেই বাজেন্দ্রলাল মিত্র, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-র ৮ বছব পরে 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' বের কবতে উদ্যোগী হলেন যখন, ইংবেজিব বদলে তাব ভাষা হযে গেল পুরোপুরি বাংলাই।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে কী বলব আমরা ? হিন্দু, না খৃস্টান? তিনি তো ডিবোজিও-ব শিষ্যদের মধ্যে প্রধান। সংস্কৃত-র ধাবে কাছে নেই। ইংরেজিই বলতে গেলে মাতৃভাষা। প্রসন্নকুমার ঠাকুরেব 'Reformer' পত্রিকাব পালটা জবাব দিতে তিনিই বেব কবেছিলেন 'Inquirer' নামের ইংরেজি পত্রিকা। সেই তিনিও একদিন ঢললেন বাংলায়। বের করলেন গৌড়ীয় ভাষায় ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'বিদ্যাকল্পদ্রুম', অবিদ্যা আব ভ্রান্তিব দেশব্যাপী দুষ্ট শক্তির বজ্র আঁটুনি থেকে বঙ্গভূমির সমস্ত জাতিকে মুক্তি দিতে।

'বিদ্যাকল্পদ্রুম' বা ইংরেজি নামে 'এনসাইক্লোপিডিয়া বেঙ্গলেনসিস' বেরিয়েছিল ১৮৪৬-এ। এব চার বছব পরে আবো একটা পত্রিকা বের করেছিলেন কৃষ্ণমোহন। 'সংবাদ সুধাংশু'। সম্পাদক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন মাত্র ৬টি সংখ্যা বের কবতে ঐ সাপ্তাহিকেব। বেরিয়েছিল ১১টি। তারপরই বন্ধ। যদি খৃস্টধর্মের মহিমা বিস্তারেব দিকেই বেশি আগ্রহ, তবুও এই পত্রিকার ঘোষণাপত্রে ছিল বিশেষ ৬টি প্রকবণেব কথা।

১। সম্পাদকীয় উক্তি। ২। প্রেরিত পত্র। ৩। নতুন ২ গ্রন্থের বিবরণ। ৪। সাহিত্যাদি প্রকরণ। ৫। অতীত সপ্তাহের সমাচার। ৬। আগামী সপ্তাহের পঞ্জিকা।

পত্রিকাটির প্রসঙ্গে আরো কিছু কথা আলোচনা হয়েছে আগেই।

আবার পেশ করা যেতে পারে উল্টো একটা দৃষ্টান্তও। তপোবিজয়বাবু দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 'সোমপ্রকাশ'-এর উল্লেখ করেছেন। সেই দ্বারকানাথই কিন্তু ১৮৭৬-এ, সোমপ্রকাশকে করেছিলেন দ্বিভাষিক।

এ-সব ছাড়াও রয়ে যায় আরো কিছু প্রশ্ন। তপোবিজয়বাবু রামমোহনের ইংরেজি বিষয়ে যা বলেছেন তা কি অভ্রান্ত ? কী লেখা আছে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের রামমোহন জীবন চরিতে ?

> "সাতাশ আঠাশ বৎসর বয়সেও, তিনি সামান্য সামান্য বিষয়ে কোন প্রকারে ইংরেজী ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিতেন মাত্র। ইংরেজি রচনা প্রায় কিছুই পারিতেন না।"

রামমোহনের সাতাশ-আঠাশ মানে ইংরেজি সাল ১৮০১-০২। এরও ১১-১২ বছর পরে তিনি আসবেন কলকাতায়। কলকাতায় দু বছর কাটানোর পর নিজের লেখা 'বেদান্তসার'-এর ইংরেজি অনুবাদ করবেন তিনি। পরের বছর বন্ধু জন ডিগবি নিজের একটা আলাদা মুখবন্ধ লিখে রামমোহনের সেই বই বের করবেন ইংলন্ডে। নিজের মুখবন্ধে কী লিখেছিলেন ডিগবি ?

> "বাইশ বৎসর বয়সে তিনি প্রথমে ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করেন। কিন্তু মনোযোগপূর্ব্বক শিক্ষা না করাতে, পাঁচ বৎসর পরে, যখন আমার সহিত তাঁহার পরিচয় হইল, তখন সামান্য সামান্য বিষয়ে, তিনি ইংরেজীতে কথা বলিলে বোধগম্য হইত মাত্র। কিন্তু উক্ত ভাষা কিছুমাত্র শুদ্ধরূপে লিখিতে পারিতেন না। যে জিলায় আমি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সিবিল সর্‌ভিসে পাঁচ বৎসর কালেক্টর ছিলাম; তথায় তিনি, পরিশেষে দেওয়ান, অর্থাৎ করসংগ্রহ বিষয়ে প্রধান দেশীয় কর্মচারীরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আমার চিঠিপত্র সকল মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিয়া এবং ইয়োরোপীয় ভদ্রলোকদিগের সহিত পত্রাদি লিখিয়া ও আলাপ করিয়া তিনি ইংরেজী ভাষায় এ পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন যে, বিলক্ষণ শুদ্ধরূপে ইংরেজী বলিতে ও লিখিতে পারিতেন।"

এই উদ্ধৃতিটিও কিন্তু রয়েছে নগেন্দ্রনাথের বইটিতেই। 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠী বা ইংরেজি-অভিজ্ঞ বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজ বাংলা ভাষার দিকে কিভাবে তাকিয়েছে তখন, তার ছবিগুলোকে সামনে টেনে আনা যাক এখন।

'ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি' তার সূচনাপর্ব থেকেই প্রাধান্য দিতে চেয়েছিল বাংলা ভাষাকে। আগেই, ১৮৩৮-এর ঘটনাবলী প্রসঙ্গে, জেনেছি, একমাত্র টি. ডিকেন্স ছাড়া অন্য সমস্ত বক্তাই ভাষণ দিয়েছিলেন বাংলায়। সোসাইটির পক্ষ থেকে রামকমল সেন-এর ঘোষণা —"এই বৈঠকের তাবৎ ব্যাপার বঙ্গভাষাতে প্রকাশ করিতে আমাদের কল্প আছে।" নীলমণি মুখোপাধ্যায় 'এ বেঙ্গলী জমিদার'-এ এই প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> "Most of the proceedings except the observations made by Dickens were in Bengali. Some of the founders of the Society later on became finished speakers in English, but as yet they had not been able to overcome the diffidence in expressing themselves in that foreign language."

ডেভিড হেয়ারের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিরক্ষায় গড়া হয়েছিল একটা কমিটি। এই কমিটির উদ্যোগে তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভায়, সবাইকে চমকে দিয়েই, অক্ষয়কুমার দত্ত, পূর্বপ্রথা ভেঙে, বক্তৃতা দিলেন বাংলায়। অবাক হয়ে গেলেন তাঁরা, যাঁরা ভাবতেন বাংলা ভাষা শিক্ষিত মানুষের চিন্তা প্রকাশের ভাষা নয়। সেদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন 'ইন্ডিয়ান ফিল্ড'-এর সম্পাদক কিশোরীচাঁদ মিত্র। অক্ষয়কুমারের বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বলতে হল—

> "The Discourse we have just heard is very clever and interesting, and it is not the less so, because of its being a 'Bengali' one. I know... that there is a large number of our educated friends who can relish nothing that is Bengali, their

taste being diametrically opposed to all that is written in their own tongue. The most elevated thoughts and the most sublime sentiments, when embodied in it, become flat, stale, an unprofitable. But this prejudice is, I am diposed to think, fast wearing out, and the necessity and importance of cultivating the Bengali Language—the language of our country, the language of our infancy, the language in which our earliest ideas and associations are entwined—will ere long to recognised by all."

অক্ষয়কুমারের ঐ বক্তৃতার পর ডেভিড হেয়ার স্মৃতিরক্ষা কমিটিতে ইংরেজির সঙ্গে বাংলাও পেয়ে গেল সাদর অভ্যর্থনা। চতুর্থ বৎসরের সভায় কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, তার পরের দু বছরের মদনমোহন তর্কালঙ্কার আর রাজনারায়ণ বসু প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন বাংলাতেই। ১৮৪৯ থেকে ৫৬ এই আট বছরে বাংলায় বক্তৃতা হয়েছে পাঁচবার। তার মধ্যে দুটো প্রবন্ধের বিষয়ই ছিল বাংলা ভাষা। কৃষ্ণমোহনের বিষয়, 'কি উপায় অবলম্বন করিলে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি হইতে পারে'। কালীপ্রসন্ন সিংহের বিষয়, 'বাংলা ভাষার অনুশীলন'।

আর এই হেয়ার স্মৃতিরক্ষা সমিতি থেকেই এই সময়ে শুরু হল নতুন উদ্যোগ। প্রত্যেক বছর বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ রচনার জন্যে দেওয়া হবে পুরস্কার। পর পর পুরস্কৃত হয়েছিলেন যে দুজন তাঁরা হলেন তারাশঙ্কর শর্মা, আর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। সমাজের সর্বক্ষেত্রে বাংলা ভাষার চর্চাকে অপরিহার্য করে তোলার দিকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার সঙ্গে তখনকার সংবাদপত্রও সমানতালে এগিয়ে চলার দিকে উদ্যোগী। তবে সবাইকে ছাড়িয়ে যে দুটো পত্রিকার সবচেয়ে তেজস্বী ভূমিকা তার প্রথমটি অবশ্যই 'সংবাদ প্রভাকর'। দ্বিতীয়টি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'।

স্কুল-কলেজের পড়াশোনায় মাতৃভাষার চর্চার দাবিতে 'তত্ত্ববোধিনী' তখন নিয়মিত আক্রমণ করে চলেছে সরকারি কর্তৃপক্ষকে। এমন-কি বাদ দিচ্ছে না তাঁকেও যিনি এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অর্থাৎ বেথুন সাহেব। উদ্ধৃতি দীর্ঘ হওয়ার উদবেগে এখানে নামমাত্র নমুনা :

"স্বদেশীয় ভাষার অনুশীলন ব্যতিরেকে সাধারণরূপে বিদ্যা প্রচার হওয়া কখনই সম্ভাবিত নহে, ইহা এই পত্রিকায় বারম্বার প্রতিপন্ন করা গিয়াছে। সম্প্রতি এ বিষয়ে যে কোন কোন রাজ-সংক্রান্ত এবং বিশেষতঃ শিক্ষাসমাজ-সম্পর্কীয় প্রধান ব্যক্তির হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, ইহা অতি শুভ চিহ্ন। বীটন সাহেব পরম বিদ্যোৎসাহী, এবং ব্রিটেনের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া প্রধান প্রধান উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন; এতাদৃশ মহাশয় ব্যক্তির কথা সকলকেই প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তাঁহার ও মেডাক সাহেবের দৃষ্টান্ত দ্বারা এ প্রকার অনুভবও হয় যে, ক্রমে ক্রমে অনেকেরই এ বিষয়ে মনোযোগ হইতেছে, এবং ইংরাজি যে এদেশীয় লোকের স্বজাতীয় ভাষা হইবেক, এ অভিপ্রায় এইক্ষণে বিজ্ঞ-লোকদিকের স্বপ্ন-কল্পিত ব্যাপারের ন্যায় অলীক বোধ হইয়া আসিতেছে। পূর্বোক্ত পরোপকারী মহাশয়েরা ছাত্রদিগকে আপন ভাষাশিক্ষার যে পরামর্শ দিয়াছেন, ছাত্রদিগকে তদনুবর্ত্তী হওয়া অতি কর্ত্তব্য; কিন্তু তাহারা কি প্রকারে কৃতকার্য হইতে পারে, তাহার বিবেচনা করা উচিত। এবিষয়ে তাঁহাদিগের যেমন মহৎ অভিপ্রায়, গবর্ণমেণ্টের কার্য তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। গবর্ণমেণ্ট হইতে এ পর্যন্ত বাংলা ভাষা শিক্ষার কোন উপায় হইল না। সম্বাদ-পত্র সম্পাদকেরা যতই চীৎকার করুন, আর অন্য ব্যক্তিই বা ইহার কর্ত্তব্যতা পক্ষে যতই যুক্তি প্রদান করুন, কিছুতেই তাঁহারা সচেতন হযেন না, তাঁহারা বধির হইয়া রহিয়াছেন। এক্ষণে হিন্দু কালেজে বাঙ্গলা শিক্ষার নিয়ম আছে বটে কিন্তু সে নামমাত্র নিয়ম। তথায় পাঠ্যের শৃঙ্খলা নাই, উপযুক্ত শিক্ষক নাই, পাঠ্য গ্রন্থও নাই

> এবং কেহ তদ্বিষয়ে তত্ত্বাবধানও করেন না। বাঙ্গলা শিক্ষা করা আর না-করা একপ্রকার
> ছাত্রদিগেরই স্বেচ্ছাধীন।"

১৮৫০-৫১ সালে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' লিখছেন এ-সব কথা। কলেজ বা স্কুল আছে, কিন্তু পাঠ্য পুস্তক নেই, নেই পড়াবার উপযুক্ত শিক্ষক, নেই পাঠ্যবিধি, নেই তত্ত্বাবধায়ক। গোটা বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই এই এক ছবি। এমন সর্বব্যাপী নিরাশার পরিমণ্ডলেও কিন্তু আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই, হুগলি কলেজে বাংলা অথবা মাতৃভাষা শেখানোর সংবাদে। সংবাদটি জানান অক্ষয়চন্দ্র সরকার, যিনি নিজে ঐ কলেজের এক সময়ের ছাত্র।

> "হুগলী কলেজে মাতৃভাষা শিক্ষা ভালরূপই হইত। পিতৃদেবের (গঙ্গাচরণ সরকার) সময়েও হইত, আমাদের সময়েও হইত। আমাদের সময়েও যে ভালরূপ হইত, তাহার সাক্ষী ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন। মধ্যসময়ে যে হইত, তাহার সাক্ষী বঙ্কিমবাবু ছিলেন। প্রথম সময়ে যে হইত, তাহার সাক্ষী হুগলীর হরচন্দ্র ঘোষ ছিলেন।"

বঙ্কিমকে অন্যতম সাক্ষী মানার ফলে অক্ষয়চন্দ্রের এই বিবরণ বাস্তব ইতিহাসের বদলে কল্পিত রোমান্সের দিকেই টাল খেয়ে গেছে অনেকখানি। অক্ষয়চন্দ্র সম্ভবত ভুলটা করেছেন পরবর্তীকালের বঙ্কিমকে, যখন তিনি সত্যিই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সিংহাসনে সম্রাট, হুগলি কলেজের সময়ে পিছিয়ে নিয়ে গিয়ে। তাঁর ছাত্রাবস্থায় লেখা গদ্য ও পদ্যের যে-সব নমুনা আমরা ক্রমে দেখতে পাব তাতে এটা সুস্পষ্ট যে মাতৃভাষা তখনো তাঁর আয়ত্তের বাইরে।

হুগলি কলেজে ভালো বাংলা শেখানো হলে বঙ্কিমের ঐ সময়ের লেখালিখিতে কেন এমন জটিল আড়ষ্টতা, এ এক উত্তরহীন প্রশ্ন। আবার বঙ্কিম ও হুগলি কলেজের অন্যান্য ছাত্রদের সংস্কৃত-ঘেঁষা বাংলা গদ্যেও বিদ্যাসাগর ঠিক কোন জিনিসের অভাবে অসন্তুষ্ট, সেও উত্তর খোঁজার মতো এক প্রশ্ন।

তবে বিদ্যাসাগর যে অসন্তুষ্ট ছিলেন বা হচ্ছিলেন আর হুগলি কলেজ ছাড়াও অন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রের পরীক্ষক হিসেবেও তিনি যে ছাত্রদের ফেল করিয়েছেন প্রায় পাইকাবী হারে, সেটাও সত্যি। আরো আশ্চর্য এটাই যে, সে ঘটনাটাও ঘটেছিল এই একই বছরে অর্থাৎ ১৮৫২-তেই। এই বছবেব ২২ এপ্রিল কলকাতার বেশ-কয়েকটি সংবাদপত্রে বেরলো শিক্ষা বিভাগের সম্পাদক মৌয়াট-এর দেওয়া বিজ্ঞাপন। বাংলা ভাষার বিজ্ঞাপনে তাব চেহারাটা ছিল এই—

> "মেডিকেল কলেজেব উর্দ্দুভাষায় যে প্রণালীতে ও যতদূর পর্য্যন্ত চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া যায়, বাঙ্গালা ভাষাতে সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া যাইবেক।
>
> বাঙ্গালা ক্লাসে প্রথমতঃ পঞ্চাশ জন ছাত্র নিযুক্ত করা যাইবেক। তাঁহারা প্রত্যেকে ৫ পাঁচ টাকা মাসিক বৃত্তি পাইবেক। তদ্ভিন্ন যত লোক আপনার ব্যয় ধরিয়া অধ্যয়ন করিতে অভিলাষ করিবেন সকলকেই নিযুক্ত করা যাইবেক। ভদ্রজাতি হইলেই নিযুক্ত করা যাইবেক। তম্মধ্যে যাঁহাদের অধিক গুণ থাকিবেক তাঁহাদিগকে অগ্রে নিযুক্ত করা যাইবেক।
>
> মফঃস্বলের ছাত্রদিগের নিমিত্ত যথোপযুক্ত কতগুলি ছাত্রবৃত্তি স্বতন্ত্র রাখা যাইবেক। ছাত্রদিগকে বাঙ্গালা ভাষায় এনাটমি, মেটিরিয়া মেডিকা এবং মেটিরিয়া মেডিকাতে কিমিষ্ট্রির যে যে অংশ আবশ্যক এবং মেডিসিন ও সার্জারি, চিকিৎসা বিদ্যা সংক্রান্ত এই সকল বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যাইবেক।..."

এই বিজ্ঞাপন বেরনোর সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সংবাদপত্রে ঝমঝমিয়ে বেজে উঠবে নানান প্রশ্ন।

কেন ভদ্র জাতীয়দের জন্যে বিশেষ সুযোগ ? অন্ত্যজ জাতীয় লোকেরা কি বুদ্ধি ও বিবেচনান্বিত হয় না ? কিন্তু এসব প্রশ্নকে ছাড়িয়ে যেটাকে সবচেয়ে বড়ো করে তুলে ধরল 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়', সেটা ভাষাশিক্ষার সমস্যা। বাংলা ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে কিনা, পরীক্ষায় দেখা হবে সেটা। মফঃস্বলের পরীক্ষার্থীদের কাছে সেটা প্রত্যাশা করা অসম্ভব। 'সেখানে সুশিক্ষার্থ পাঠশালাই নাই গ্রাম্য গুরুমশায়ের নিকট অশুদ্ধ বর্ণ পরিচয়ে ও গণিতের প্রকরণের কিয়দংশ মাত্র শিক্ষা হয়'। তাহলে ? পরীক্ষায় বসল ৩০০ জন। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হল মাত্র ৩১ জন। পরীক্ষক বিদ্যাসাগর।

এই ফলাফল বেরনোর পর আবার আব-এক প্রস্থ দমকা হাওয়া, নানা প্রশ্নেব। সেখানে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র গলাতেই সব চেয়ে উদবিগ্নতা। সেখানেই পাল্টা প্রশ্ন—

> "কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি মেডিকেল কালেজে যে বাঙ্গালায় ইংরাজী চিকিৎসা বিদ্যার শিক্ষাদান হইবেক তাহাতে সংস্কৃতানুযায়ী বাঙ্গালা ভাষায় নৈপুণ্যের প্রয়োজন কি ? যে সকল ব্যক্তি বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দিবেন তাঁহারা সংস্কৃতানুযায়ী বাঙ্গালা ভাষায় কেমন নিপুণ ?"

রেভারেন্ড লং আঙুল দেখালেন বিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের ত্রুটির দিকে। আব 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া'র মন্তব্য অন্য। যারা পরীক্ষা দিতে এসেছিল তাবাই শুধু বাংলা ভাষায় অজ্ঞ ভাবলে ভুল হবে। ইংরেজি শিক্ষিত যুবকরাও কি মাতৃভাষায় স্বচ্ছন্দভাবে লিখতে সক্ষম ? ঐ পত্রিকার মতে, মিশনারি আর সংস্কৃত কলেজেব স্কুলগুলো ছাড়া কোথাও উপযুক্ত ভাবে শেখানো হয় না মাতৃভাষা।

এই সময়টায় সকলেই জোব দিচ্ছিলেন মাতৃভাষা শেখানোব উপব। অথচ তখনই মাতৃভাষায় লেখা দবকারী বইপত্রের ঘোরতর আকাল।

৪

২৫ ফেব্রুয়ারি

'সংবাদ প্রভাকর'-এ বেরলো বঙ্কিমের প্রথম কবিতা, নাম. পদ্য। তখনো বয়স ১৪ বছর পূর্ণ হয়নি। তেরো বছর আট মাস। কবিতার শিরোদেশে ছাপা হয়েছিল প্রভাকর-সম্পাদকের মন্তব্য—

> "হুগলী কালেজস্থ ছাত্রেব লিখিত পদ্য অবিকল নিম্নভাগে প্রকটিত হইল"

এখানে অবিকল শব্দটি আমাদের মনে কবিয়ে দিতে চায় যে, ঈশ্বরচন্দ্র যা হাতে পেতেন তাই-ই ছাপতেন না। বিশেষ কবিতার উপর চালাতেন সংশোধনের কলম। পরে বঙ্কিমেরই অন্য কবিতার প্রসঙ্গে আমরা শুনতে পাব তাঁর নিজেব স্বীকারোক্তি।

'পদ্য' কবিতার প্রথম কয়েক ছত্র—

> চন্দ্রাস্য সহাস্য করে, উষাকালে সতী।
> প্রিয়করে করি করে, কহে পতি প্রতি।।
> প্রিয়া প্রতি পতি তার করিছে উত্তর।
> চরণে চরণে দেয়, উত্তর সত্ত্বর।

কবিতার শেষে প্রভাকর সম্পাদক-এর মন্তব্য—

> "উক্ত ছাত্রের বয়স অত্যল্প। কিন্তু এই পদ্য অতি প্রধান কবির রচনার ন্যায় উত্তমরূপে রচিত হইয়াছে। এজন্য সকলেই তাঁহাকে সাধুবাদ করিবেন।"

পরে যিনি হয়ে উঠবেন তাঁর প্রধান বন্ধু, সেই দীনবন্ধু মিত্রই প্রথম কবিতা লেখেন 'সংবাদ প্রভাকর'-এ। ১৮৫১-র ৫ জুনে। পরে 'সংবাদ সাধুরঞ্জন'-এ বেরয় প্রথম কবিতা 'মানব চরিত্র'। সে কবিতা পড়ে বঙ্কিম মুগ্ধ। তারপরই 'সংবাদ প্রভাকর'-এ কবিতা পাঠানোর শুরু।

দীনবন্ধুকে নিয়ে তাঁর প্রবন্ধের এক জায়গায় নিজে উল্লেখও করেছেন সেই অভিজ্ঞতার—

"আমি যতদূর জানি, দীনবন্ধুর প্রথম রচনা 'মানব-চরিত্র' নামক একটি কবিতা। ঈশ্বর গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত 'সাধুরঞ্জন'-নামক সাপ্তাহিক পত্রে উহা প্রকাশিত হয়। অতি অল্পবয়সের লেখা, এজন্য ঐ কবিতায় অনুপ্রাসের অত্যন্ত আড়ম্বর। ইহাও, বোধ হয়, ঈশ্বর গুপ্তের প্রদত্ত শিক্ষার ফল। অন্যে ঐ কবিতা পাঠ করিয়া কিরূপ বোধ করিয়াছিলেন বলিতে পারি না, কিন্তু উহা আমাকে অত্যন্ত মোহিত করিয়াছিল। আমি ঐ কবিতা আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম এবং যতদিন সেই সংখ্যার সাধুরঞ্জনখানি জীর্ণগলিত না হইয়াছিল, ততদিন উহাকে ত্যাগ করি নাই। সে প্রায় সাতাইশ বৎসর হইল; এই কাল মধ্যে ঐ কবিতা আর কখন দেখি নাই; কিন্তু ঐ কবিতা আমাকে এমনই মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিল যে, অদ্যাপি তাহার কোন কোন অংশ স্মরণ করিয়া বলিতে পারি। পাঠকগণের ঐ কবিতা দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা নাই, কেননা, উহা কখন পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। অনেকেই দীনবন্ধুর প্রথম রচনার দুই এক পঙ্‌ক্তি শুনিলেও প্রীত হইতে পারেন; এজন্য স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া ঐ কবিতা হইতে দুই পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিলাম। উহার আরম্ভ এইরূপ—

মানব-চরিত্র-ক্ষেত্রে নেত্র নিক্ষেপিয়া
দুঃখানলে দহে দেহ, বিদরয়ে হিয়া।।

একটি কবিতা এই

যে দোষে সরস হয় সে জনে সরস।
যে দোষে বিরস হয় সে জনে বিরস।।

আর একটি

যে নয়নে রেণু অণু অসি অনুমান।
বায়সে হানিবে তায় তীক্ষ্ণ চঞ্চু-বাণ।।"

দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে স্মৃতি থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে সামান্য ভুল করেছিলেন তিনি। প্রথম স্তবকের আসল পাঠ—

মানব-চরিত্র-ক্ষেত্রে নেত্র নিক্ষেপিয়ে।
দুঃখানলে দহে দেহ বিদরয় হিয়ে।।

দ্বিতীয় স্তবক—

যে দোষে সরোষ হয় সে জনে বিরস।
যে দোষে সরস হয় সে জনে সরস।।

বঙ্কিমের লেখা 'পদ্য' কবিতার নীচে লেখক হিসেবে নাম ছিল—শ্রী ব. চ. চ.

এই প্রথম কবিতার পর থেকেই আমরা দেখতে পাব 'সংবাদ প্রভাকর'-এর পাতায় কবি হিসেবে বঙ্কিমের নিয়মিত আবির্ভাব। তাঁর কবি হয়ে-ওঠার সময়কার দিনযাপনের ছবি—

"বঙ্কিমবাবুর বাল্যাবস্থায় কাঁটালপাড়ার চাটুয্যেদের বাড়ির দক্ষিণে খাল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ খোলা মাঠ ছিল। তাহাতে আশে-পাশে দুই একটা ঝোপ থাকিলেও, বড় গাছের জঙ্গল একেবারেই ছিল না।... বঙ্কিমবাবুরই মুখে শুনিয়াছি, সেই ক্ষুদ্র প্রান্তরের শষ্পশয্যায় ঊর্ধ্বমুখে শয়ান থাকিতে, তিনি সকালে বিকালে ভালবাসিতেন। আর সেই যে প্রাণ ভরিয়া স্বভাবের শোভা-সন্দর্শন তাহাতেই তাঁহার কবিত্বশক্তির স্ফুরণ হইয়াছিল। সেই প্রভাতের

বালারুণচ্ছটা, সেই সান্ধ্য গগনের রক্তিম আভা, সেই ঢল ঢল দূর্ব্বাদলময় প্রান্তরের সবুজ লীলা, সেই চারিদিকের গাছপালার হরিৎ-সমন্বয়, মাথার উপর মেঘের সেই বর্ষব্যাপিনী লীলা-খেলা, নয়ন ভরিয়া, প্রাণ ভরিয়া দেখিবার সামগ্রী।... অতি বাল্যাবস্থা হইতেই এই সকল দেখিতেন, প্রাণ ভরিয়া ভোগ করিতেন, আর সঙ্গে সঙ্গে আত্মহারা হইতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র/অক্ষয়চন্দ্র সরকার

২৮ ফেব্রুয়ারি

সংবাদ প্রভাকর'-এ 'সমাচার দর্পণ'-এ আর-এক কবিতা 'বিরলে বাস'। বঙ্কিম এই কবিতাটি প্রথম পাঠিয়েছিলেন 'প্রভাকরে'-ই। কিন্তু ছাপা হয়নি। তখন সম্ভবত অভিমানবশতই একটি কড়া চিঠি লিখে থাকবেন প্রভাকর-সম্পাদককে। তারপরই পাঠান 'সমাচার দর্পণে'। দর্পণে ছাপা হল বটে, কিন্তু প্রচুব ভুলসহ। বঙ্কিম 'সমাচার দর্পণ'কে জানিয়েছিলেন চিঠিতে, সংশোধিত আকারে পুনরায় তা ছাপাব জন্যে। তা করা হয়নি ! ক্ষুব্ধ বঙ্কিমচন্দ্র এবপর 'প্রভাকর'-সম্পাদককে চিঠি লেখেন ভুল আর সংশোধন দেখিয়ে।

১০ মার্চ

'সংবাদ প্রভাকরে' ছেপে বেরলো বঙ্কিমেব চিঠি, 'সমাচার দর্পণে' বেরনো 'বিবলে বাস' কবিতার ছাপার ভুল আর সংশোধন সহ।

"শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু। যথাবিহিত সম্মানপূরঃসর নিবেদন-মেতৎ অত্র অকিঞ্চণ মূঢ়তা প্রযুক্ত তল্লিখিত পত্রে প্রেরিত পত্রাদি অপ্রকাশ বিষয়ে কিঞ্চিৎ রূঢ় ভাষা প্রয়োগ হইয়াছিল, এইক্ষণে কৃতাপরাধী দয়াবীর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে। পত্র প্রকাশেই সন্তুষ্ট থাকিবেক।

সংপ্রতি সমাচার দর্পণ সম্পাদক মহাশয় আমার বিস্তর হানি করিয়াছেন। মহাশয়ের আশ্রয়ে তদ্বিপক্ষে লেখনী ধারণ করিতেছি অনুকম্পা সম্পাদনে আশ্রয় প্রদান করিবেন অর্থাৎ নিম্নলিখিত বিষয় প্রভাকরে প্রকটনে পরম বাধিত করিবেন।

দর্পণ

"দর্পণ পারাহারা হইলে" কোন বস্তুর প্রতিবিম্ব সুন্দররূপে দৃষ্ট হয় না।"

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অস্মনাম ইত্যঙ্কিত মৎকরণক অনুবাদিত বিষয় ৪৪ সংখ্যক দর্পণে প্রকটিত হইয়াছিল। সম্পাদক সাহেবের সংশোধনের গুণেই হউক বা মুদ্রাঙ্কনের দোষেই হউক, সেই অনুবাদের উলটা শ্রী হইয়াছে, তাহা পাঠমাত্র দন্তে কপাট লাগিবেক, অন্য পাঠ থাকিবেক না।

দর্পণের ৩৫২ পৃষ্ঠায় চতুর্থ স্তম্ভে তাহার প্রথম চরণ নিম্ন প্রকার হইয়াছে। বিষয়ে রিক্ত হয়া স্নিগ্ধ কুঞ্জবনে।

সম্পাদক মহাশয় আপনী ও পাঠকগণ সুপণ্ডিত বটেন, ইহার অর্থ কি বলিতে পারি না, আপনারা কহিবেন যে ইহা প্রকৃত Nonsense। আরো ত্রয়োদশ অক্ষরে পয়ার কখনো শুনিয়াছেন ? আমি প্রথম চরণে লিখিয়াছিলাম

বিষয়ে বিরক্ত হয়ে স্নিগ্ধ কুঞ্জবনে।

কিসে কি হইয়াছে, দেব গঠিতে বানর হইয়াছে !

আবার নবম পংক্তিতে

অভিমানেতে জম্মে, যে প্রশংসা বায়।

ত্রয়োদশাক্ষরে পয়ার। আরো honour অর্থ কি অভিমান। এবং অভিমানে কি প্রশংসা জম্মায় ? আমি লিখিয়াছিলাম

তুচ্ছমান হতে জম্মে, যে প্রশংসা বায়।

ভাল। ভাল।

অন্যান্য সামান্য দোষের তালিকা ৪ পংক্তিতে 'মহাপ্রেম' পরিবর্তে 'নিত্যপ্রেম' হইবেক। ১০ পংক্তিতে 'মলয়াতে' 'মলয়জে' হইবেক। ১১ পংক্তিতে পুষ্প পরিবর্তে 'পুষ্পে' হইবেক।

অতএব দর্পণ সম্পাদককে অনুরোধ করি যে আগত সংখ্যায় ভ্রম সংশোধন করিবেন এবং ভবিষ্যতে এই প্রকার না হয় এমত...বেন। ইতি।"

এই চিঠিকেই কেউ কেউ সম্মানিত করতে চান বঙ্কিমের প্রথম গদ্য রচনার নিদর্শন হিসেবে। আসলে কবিতাটি উইলিয়ম ড্রামণ্ডের এক ইংরেজি কবিতার অনুবাদ। রিচার্ডসন-এর 'Selections from the British Poets' থেকে নেওয়া। কিন্তু এ বই পাঠ্য ছিল না হুগলি কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে। ছিল আরো উঁচু শ্রেণীতে। ১৮৪০। রিচার্ডসন তখন হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ। পাঠ্য পুস্তকের সমস্যা মেটাতে এই সংকলনটি তৈরি করেছিলেন তিনি। বেরিয়েছিল একই সঙ্গে কলকাতা আর লন্ডন থেকে। আর একই সঙ্গে কলকাতা আর লন্ডনের স্কুলে এটি হয়ে উঠেছিল ছাত্রপাঠ্য একটি মূল্যবান সংকলন। চসার থেকে শুরু করে সমকালীন সমস্ত প্রতিষ্ঠিত কবিরাই সে সংকলনে উপস্থিত। কিন্তু এর মধ্যেও রহস্য রয়ে গেছে অনেকখানি। সমস্ত ইংরেজ কবিদের মধ্যে, ইংরেজ কবি হিসেবেই হাজির ছিলেন একজন বাঙালি কবি। কাশীপ্রসাদ ঘোষ। তাঁর লেখা যে কবিতাকে সাদরে জায়গা করে দিয়েছিলেন রিচার্ডসন, তার নাম 'বোটম্যান'স সঙ টু গঙ্গা'। রিচার্ডসনের মনে হয়েছিল ঐ কবিতা যে-কোনো সার্থক ইংরেজি কবিতার সমকক্ষ। কাশীপ্রসাদ সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত পরিচিতি লিখতে গিয়ে তাঁর গর্বিত সম্ভাষণ—

> "Let some of these narrow-minded persons who are in the habit of looking down upon the natives of India with an arrogant and vulgar contempt read this little poem with attention and ask themselves if they could write better verses not in a foreign language, but even in their own."

১৮৪০-এর অনেক আগে, ১৮৩২-এ রিচার্ডসন বের করেছিলেন আরো একটা ইংরেজি লেখার সংকলন, গদ্য-পদ্য মিলিয়ে। নাম, 'দি ওরিয়েন্ট পার্ল'। সে সংকলনেও জায়গা পেয়েছিলেন একমাত্র যে ভারতীয় অথবা বাঙালি কবি, তিনি কাশীপ্রসাদ ঘোষ। কাশীপ্রসাদের যে কবিতা ছাপা হয়েছিলেন সেখানে, তার নাম 'দা স্টর্ম অ্যান্ড দা রেন'। রিচার্ডসনের সঙ্গে কাশীপ্রসাদের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের আর-এক দৃষ্টান্ত, তাঁর 'A Treatise on Flowers and Flower garden'-এর শেষাংশে দেশীয় ফুলের যে তালিকা, সেটা কাশীপ্রসাদেরই করে দেওয়া। এই তথ্যের সঙ্গে আমরা যদি জুড়ে দিই আরো কিছু খবর তাহলে হয়তো আজকের বিস্মৃতপ্রায় কাশীপ্রসাদকে তাঁর সমসময়ের প্রেক্ষিতে চিনে নেওয়া সহজ হয়ে উঠবে কিছুটা।

যে-সব ইংরেজ মহিলা শিল্পী কলকাতাকে নিয়ে ছবি আঁকার জন্যে খ্যাত, এমা রবার্টস তাঁদের একজন। এমা এক সময়ে কাশীপ্রসাদের একটা ছোট্ট জীবনী লিখেছিলেন ইংরেজিতে। তার অংশবিশেষ—

> "ইংরাজী সাহিত্য রসাস্বাদনে কাশীপ্রসাদের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল এবং তিনি এই সময়েই কলিকাতার সাময়িক পত্রাদির অন্যতম প্রসিদ্ধ লেখক হন। তিনি বাঙ্গলায় সঙ্গীতাদি রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অধিকাংশ রচনাই ইংরাজী ভাষায় লিখিত। তাঁহার ইংরাজী রচনাদি এরূপ ওজস্বিতা প্রসাদগুণ ও স্বচ্ছন্দগতি বিশিষ্ট যে বিদেশীয় ভাষার কবিতা

রচনা কিরূপ দুরূহ তাহা যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার রচনা দেখিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইবেন। কলিকাতার সাময়িক পত্রাদি এই তরুণ কবির লেখার যে উচ্চপ্রশংসা করেন তাহার ফলে 'শায়ের' নামক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়।... ইংলণ্ডেও এই গ্রন্থের খুব আদর হইয়াছে।... 'নাবিকগণেব গঙ্গাস্তোত্র' নামক ক্ষুদ্র কবিতাটি এরূপ সুন্দর প্রাচ্যভাব সম্পদে সমৃদ্ধ যে, এই তরুণ কবির কাব্যের পরিচয় দিবাব জন্য অনেকেই তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন।"

'নাবিকগণের গঙ্গাস্তোত্র' উদ্ধৃত হয়েছে ইংলন্ডের অনেক সাময়িক পত্রে। ১৮৩৫-এ 'ফিশাবস ড্রইং রুম Soproh Book' নামের ছবির বইয়ে ইংলন্ডের খ্যাতনামাদেব সঙ্গে ছাপা হয়েছিল 'ইণ্ডিয়ান বার্ড' কাশীপ্রসাদের ছবি। কুমারী জে. ড্রেমণ্ড-রে স্টিল এনগ্রেভিং-এ কাশীপ্রসাদের ছবি ছিল। তখনকাব আরো নানা ইংবেজি বইয়ে, যেমন. কম্যান্ডাব রবার্ট এলিয়ট-এব 'Views in India. China. and on the Shores of the Red Sea'-নামেব বইযেও ছাপা হয়েছিল তাঁর ছবি।

মাইকেল মধুসূদন হিন্দু কলেজেব ছাত্র ছিলেন ১৮৪৩ পর্যন্ত। তাব অর্থ. তিন বছব এই সংকলনটির সঙ্গে পবিচিত ছিলেন তিনি। সুতরাং অনুমান কবে নিতে পাবা যায যে ঐ সংকলনে কাশীপ্রসাদ ঘোষেব ইংবেজি কবিতাব একটা প্রবল প্রভাব পড়ে থাকবে তাঁব চেতনায! যদিও কাশীপ্রসাদ তাঁর সহপাঠী ছিলেন না কখনোই। কাশীপ্রসাদের হিন্দু কলেজে পড়া শেষ হয়ে যায ১৮২৮-এ। ইংরেজি ভাষাব বচনায আর ইংবেজি কবিতায তাঁব দক্ষতা যেহেতু তখন প্রবাদতুল্য, মধুসূদন নিশ্চযই খবব পেযেছিলেন সে-সবেব। নিশ্চয শুনে থাকবেন, বিচার্ডসনেব কাছ থেকে সম্মান-সমাদব পাওযাব অনেক আগেই আবো বিখ্যাত ইংরেজ পণ্ডিত, ভারততত্ত্ববিদ, হিন্দু কলেজেব পবিদর্শক হওযার সুবাদে টের পেযেছিলেন ইংবেজি লেখায় কাশীপ্রসাদেব অসামান্য দক্ষতা। তিনি হোবেস হেম্যান উইলসন। আব এই উইলসনেব জোগানো প্রেরণাতেই কাশীপ্রসাদ লিখেছিলেন জীবনেব প্রথম কবিতা। আর ইতিহাসের এমনই কৌতুক যে কাশীপ্রসাদদেব খিদিবপুবেব বাড়িটাই একসমযে কিনে নিযেছিলেন মধুসূদনেব পিতা মুন্সী বাজনাবাযণ। যে বাড়িতে ভূমিষ্ঠ হযে কাশীপ্রসাদ ইংরেজি কবিতা বচনায নিজেব খ্যাতিকে পৌঁছে দিলেন স্বদেশ ছাড়িযে বিদেশেব প্রাঙ্গণে. অতঃপব সেইখানেই মধুসূদনেব কৈশোব-যৌবনেব বিকাশ।

বঙ্কিম প্রসঙ্গে ফিবি। ক্লাসেব বইয়েব বাইবেব পড়ায বঙ্কিমেব আগ্রহ ছিল কতখানি প্রবল, সে তথ্য আমাদেব অনেকটাই জানিযে দেন 'বঙ্কিম জীবনী'-র লেখক।

"তিনি নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকের গণ্ডীর মধ্যে থাকিতে পারিতেন না। যখন বিদ্যালয়ে Keightly. Elphinstone-এব ইতিহাস পড়ান হইতেছে, তখন তিনি Hume. Macauly-র ইতিহাস পড়িতেছেন, যখন ক্লাসে Rule of Three শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তখন তিনি Discount কষিতেছেন। এইরূপে 'তিনি সকল বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন।' ...স্কুলেব নির্দিষ্ট পুস্তকাবলীব মধ্যে মন আবদ্ধ বাখিতে বঙ্কিমচন্দ্র কিছুতেই সমর্থ হইতেন না; তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণা তাঁহাকে আকুল কবিয়া তুলিত। হুগলি কলেজেব সুবৃহৎ লাইব্রেবি মন্থন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস, জীবনী, সাহিত্য, কাব্য পাঠ কবিতে লাগিলেন। স্কুলপাঠ্য কোথায় পড়িয়া রহিল; গৃহে বা বিদ্যালয়ে সে সকল পুস্তকের পানে ক্ষণেকের জন্যেও চাহিয়া দেখিতেন না। তবে যখন বাৎসবিক পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিত, তখন বঙ্কিমচন্দ্র পাঠ্য পুস্তক ঝাড়িয়া গুছাইয়া পড়িতে আবম্ভ করিতেন। পরীক্ষাব ফল প্রকাশিত হইলে সচরাচর দেখা যাইত, বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম স্থান অধিকাব করিয়াছেন।"

হুগলি কলেজে বঙ্কিমের আমলে যে বিশাল লাইব্রেরি ছিল, তা ঠিকই। কিন্তু তার বিশদ ইতিহাস জানার উপায় নেই তেমন। বইয়ের সংখ্যা জানা যাচ্ছে প্রভৃত পরিমাণ কিন্তু বইয়ের নাম বা বিষয় নিখোঁজ। আসলে শুরু থেকেই এই লাইব্রেরি বিশৃঙ্খলার খপ্পরে। পরিচালক মণ্ডলীর সদিচ্ছা সত্ত্বেও, নানা কারণে একে সুসংগঠিত করা যায় নি তেমন। প্রথম কারণ, যোগ্য লাইব্রেরিয়ান-এব অভাব। এক সময়ের সুদক্ষ অধ্যক্ষ কে. জ্যাকেরিয়ার লেখা 'হিসট্রি অব হুগলি কলেজ'-এর যে একশো বছরের (১৮৩৬-১৯৩৬) ইতিহাস, সেখানে লাইব্রেরি নিয়ে যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা তার প্রথমেই এসে গেছে লাইব্রেরিয়ান-এর প্রসঙ্গ।

"Till 1848 Vernieux was Librarian. Then he resigned and set up as a professional conjuror: but when his "Hopes of making money by magic" failed, he wished to withdraw the resignation, which was not permitted. Chandicharan Shome, an old student, was appointed Librarian out of forty-five candidates. He died, however, before the end of the year and his place was filled by Jogessur Ghosh. On his appointment as a teacher in the school, Okhoy Chundur Burmochary teacher of the Regulation class, became librarian. He was dismissed in 1858 and S Vogel, son of old writting master, was selected "

হুগলি মহসিন কলেজের সার্ধ শতবার্ষিকী উপলক্ষে বেবনো স্মাবক গ্রন্থে রয়েছে সরস্বতী মিশ্রের লেখা একটি ছোট্ট প্রবন্ধ 'কলেজ গ্রন্থাগার দেড়শো বছর পেরিয়ে'। সেখান থেকে পাওয়া যায় লাইব্রেরি গড়ে ওঠাব সূচনাপর্বের খববাখবর।

কলেজ শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই অধ্যক্ষ ওয়াইজ সরকারেব কাছে পেশ করেছিলেন প্রস্তাব, সমৃদ্ধ কবে তুলতে চাই লাইব্রেরিকে। সরকাব সম্মত। বই সংগ্রহের ভার দেওয়া হল সাদাবল্যান্ডকে। ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই দান করলেন নিজেদের বইপত্র। এক বছব পবে, ১৮৩৭-এ, অধ্যক্ষ ওয়াইজ-এর সদিচ্ছায় কলেজ লাইব্রেরিকে উন্মুক্ত করে দেওয়া হল জনসাধারণের জন্যে। লাইব্রেরি খুলে বাখাব ব্যবস্থা করা হল, কাজেব দিনে, সকাল নটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত। এমন-কি যারা ছাত্র নয কলেজের, তাবাও পেতে লাগল বই পড়ার সুযোগ, চার আনা থেকে এক টাকার মাসিক চাঁদাব বিনিমযে। পরে জনসাধাবণের সুবিধের জন্যে সোম, বুধ আর শুক্রবার সন্ধে সাতটা থেকে বাত নটা পর্যন্ত খুলে রাখা হতে লাগল লাইব্রেবি। ১৮৪০-এ জেনারেল কমিটি আরো দু ঘণ্টা বাড়িয়ে দিলেন লাইব্রেরি খুলে রাখার সময়সীমা। সেইসঙ্গে আরো একটা সিদ্ধান্ত। লাইব্রেরির বই থেকে যে-সব ছাত্র প্রমাণ কবতে পাববে তাদেব অতিবিক্ত জ্ঞান, মেডেল দিযে পুবস্কৃত কবা হবে তাদের। ১৮৫০-এ নিযমটাকে বদলে কবে দেওয়া হল যে, প্রত্যেক বছব একটা বিষয় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে। লাইব্রেবিব বই থেকে ছাত্ররা যে কতখানি শিক্ষা নিয়েছে, তার পরীক্ষা নেওয়া হবে।

কত বই ছিল তখন লাইব্রেরিতে ? বানানো হয়েছিল কি তার কোনো ক্যাটলগ? জ্যাকেরিয়ার লেখা ইতিহাসে মাৎস্যন্যাযের ছবিটাই স্পষ্ট।

"As we have seen, a catalogue of the English Library had been prepared in 1843: but no correct list of the losses and additions was made till 1848. In 1850 a fresh catalogue was compiled by the librarian under the superintendence of Professor Thwaytes. The catalogue of 1843 had contained 2,355 volumes, that of 1850 had 3,479. But there was great carelessness in the administration of the library. Stock was not taken even when librarians changed. The result was that in 1857 it was discovered that every thing was in confusion. Books on different subjects were mixed together; volume of the same set were scattered: and a great many books, to the value of over Rs. 900, could not be traced. The

librarian was suspended and afterward dismissed and his salary for three months was forfeited."

তা সত্ত্বেও লাইব্রেরি বাড়ছিল, খানিকটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েই। আগের চেয়ে কমে এসেছে উপহারের সংখ্যা। তবে মৌয়াট, কাউন্সিলের সেক্রেটারি, ১৮৪৯-এ, উপহার দিয়েছিলেন বেশ দরকারী কিছু বই। তা ছাড়া কাউন্সিল আর 'ডিপার্টমেন্ট' নিয়মিত পাঠাত সরকারি প্রকাশনার বই বা কাগজ। নগদ টাকাতেই কেনা হত বেশির ভাগ বই। কখনো আবার সেকেন্ড হ্যান্ড বইও কেনা হয়েছে সস্তা দামে। ১৮৫০-এ জনৈক রাসেলের কাছ থেকে সেভাবেই কেনা হয়েছিল ১৮৩৬-৫০ পর্যন্ত 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া'-র সেট, বিউইকস-এর 'ব্রিটিশ বার্ডস', 'ক্যালকাটা জার্নাল অব ন্যাচুরাল হিসট্রি'র ৬টা ভল্যুম, আর শুরু থেকে ১৮৫০ পর্যন্ত 'ইলাসট্রেটেড লন্ডন নিউজে'র সেট। যদিও বইপত্র ঠিকমতো গুছিয়ে রাখার জায়গার সমস্যাটা সব সময়েই প্রকট।

১৮৫৩ থেকে শুরু হল নতুন নিয়ম। কলেজ শুরুর এক ঘন্টা আগে থেকেই অর্থাৎ সকাল ৯টা থেকেই খুলে দেওয়া হত লাইব্রেরির দরজা। ১৮৫৪-৫৫-য় ১৪৮০টা বই পড়তে নিয়ে গেছে লোকে। ১৮৫৯ থেকে নিয়মকানুনের কড়াকড়ি। ডাইরেকটারের অনুমতি ছাড়া বই পড়তে নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ। আর ছাত্রদের জন্যে চালু হল ৬ টাকা জমা দিয়ে বই নিয়ে যাওয়ার নিয়ম। তারপর, জ্যাকেরিয়ার মন্তব্য—

"The fatal idea was gaining ground that the first principle of library administration was that books should be kept safe than that they should be read."

বঙ্কিমের সময়ে লাইব্রেরির উল্লেখযোগ্য বই-এর তেমন কোনো তালিকার খোঁজ মেলে না এখানে। পড়ুয়া বঙ্কিম সম্পর্কে আরো অনেক খবর পাই নানা জনের কাছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়' প্রবন্ধে জানান কাব্যের উপরই সবচেয়ে বেশি ঝোঁক ছিল তাঁর। কিন্তু কাব্যের চেয়ে বেশি শখ ইতিহাসের দিকে। খুব মন দিয়ে পড়তেন ইওরোপের ইতিহাস। প্রায়ই বলতেন ফ্লোরেন্সের মেদিচিদের কথা। রেনেসাঁসের ইতিহাসটা গভীরভাবে জানা ছিল বলেই সেই নবজাগরণের রক্ত-সঞ্চারের স্বপ্ন দেখতেন বাংলার শরীরে। বাংলার ইতিহাস লেখার আগ্রহের উৎসও ঐখানে। পূর্ণচন্দ্র যখন কলেজে পড়ছেন তখন ছাত্ররা অধ্যাপকের দেওয়া একটা জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে পারল না কিছুতেই। তখনই অধ্যাপকের মুখে শোনা গিয়েছিল বঙ্কিম প্রশস্তি—

"বঙ্কিমচন্দ্র হইলে এ প্রতিজ্ঞাপূরণ আর আমাকে দেখাইতে হইত না।"

যখন ছাত্র, তখনই অঙ্কে তিনি পারদর্শী। জ্যোতির্বিজ্ঞান বা অ্যাস্ট্রলজিতে আগ্রহী। পূর্ণচন্দ্র যখন হুগলি কলেজের ছাত্র তখন কোনো একজন শিক্ষকের মুখে শুনেছেন, দ্বারকানাথ মিত্র ছাড়া বঙ্কিমের সমকক্ষ প্রতিভাবান ছাত্র কেউ কখনো আসেনি ঐ কলেজে।

"মেধাশক্তিতে দ্বারকানাথ শ্রেষ্ঠতর ছিলেন, তীক্ষ্ণবুদ্ধিতে বঙ্কিমচন্দ্র দ্বারকানাথ মিত্রের উপর যাইতেন।"

বই পড়ার আকণ্ঠ ক্ষুধা থেকেই তিনি পড়ে থাকবেন রিচার্ডসনের সংকলনটি। আর তারই ভিতর থেকে অনুবাদের জন্যে বেছে নেবেন উইলিয়ম ড্রামন্ডের একটি কবিতা। সে-অনুবাদের দিকে তাকানোর আগে আমাদের জানতে ইচ্ছে করবে আর কোন কোন ইংরেজ কবি হাজির ছিলেন ঐ সংকলনে। সংকলনের উপনামে লেখা ছিল 'ফ্রম দি টাইম অব চসার টু দা প্রেজেন্ট ডে'। প্রেজেন্ট ডে-র অর্থ সংকলনটির প্রকাশকাল। অর্থাৎ ১৮৪০।

"১৮৪০ সালে রিচার্ডসন একটি সাহিত্য সংকলন প্রকাশ করেন। এটি তিনি প্রকাশ করেছিলেন মেকলির অনুরোধ। Selections from the British Poets নামে এই বিশাল গ্রন্থ একদিকে তাঁর ছাত্রদের সাহিত্যিক রুচি গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল, অন্য দিকে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল চসার থেকে আরম্ভ করে তরুণ টেনিসন (তখন তাঁর বয়স ৩১), ডিরোজিও থেকে আরম্ভ করে রিচার্ডসন, এমন কি, কাশীপ্রসাদ ঘোষ পর্যন্ত একেবারে সমসাময়িক কবিদের সঙ্গে।... এই সংকলনে ৩০টি কলম ব্যাপী শেকস্‌পীয়রের পুরো নাটক ছিল পাঁচটি, একটিব অংশবিশেষ। মিলটনের রচনারও একটা প্রধান অংশ অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এই সংকলনে।... হোমার, ভার্জিল, দান্তে, ত্যাসোঁ, শিলার, এবং গ্যেটেসহ বহু ইউরোপীয় কবিব (গ্রীক, ল্যাটিন, ইটালিয়ান, ফ্রেঞ্চ, জর্মান, স্প্যানিশ, পর্তুগীজ এবং ডাচ ভাষা থেকে অনূদিত) রচনাও ছিল এই সংকলনে। এই সংকলনের আর-একটি অত্যন্ত, মূল্যবান অংশ হল নির্বাচিত কবিদেব পবিচয় এবং তাঁদেব সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য নিযে সংক্ষিপ্ত আলোচনা।"

আশার ছলনে ভুলি/গোলাম মুরশিদ

টেনিসন যখন আছেন, তখন ওয়র্ডসওয়ার্থ, শেলী, কীটস, বায়রন তো থাকবেনই। বঙ্কিম যখন সংকলনটি পড়েছিলেন, তখন এঁদেব কবিতা আস্বাদনের সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে গেছেন এঁদেব কবি-কৃতিত্বের পরিচয। অথচ অনুবাদ করাব সময়ে এঁরা কেউই আকৃষ্ট কবল না তাঁকে। আকৃষ্ট কবল এমন একজন যাঁব উল্লেখ তাঁর পববর্তীকালের কোনো রচনায় খুঁজে পাওযা যাবে না কখনো। তাব চেযেও বিস্ময, কবিতা হিসেবেও মনে আঁচড় কাটাব মতো নয এমন কিছু।

ড্রামন্ডের মূল কবিতা :

Thrice happy he who by some shady grove
Far from the clamorous world, doth live his own.
Though solitary, who is not alone,
But doth converse with that eternal love.
O how more sweet is birds' harmonious moan
Or the hoarse sobbing of the widow's dove.
Than those smooth whispering near prince's throne,
Which good make doubtful, do the evile approve !
O! how more sweet is zephyr's wholesome breath,
And sighs embalm'd, which newborn flower's unfold
Than that applause vain honour doth bequeath !
How sweet are streams to poison drank in gold !
The world is full of horrors, troubles, flight :
Woods' harmless shade have only true delight

বঙ্কিমেব অনুবাদ :

বিষয়ে বিরক্ত হযে, স্নিগ্ধ কুঞ্জবনে।
যেই জন বাস কবে সুখী সেই জনে।।
সেই নির্জন বটে কিন্তু একা নয়।
নিত্য প্রেম সঙ্গে কথা নিত্য নিত্য কয়।
কত মত কানাকানি বাজার গোচরে।
ভালকে অবজ্ঞা যাহে মন্দে শ্রদ্ধা করে।।

তাহাতে সুমিষ্ট মিষ্ট পক্ষির বিলাপ।
বিয়োগিনী পক্ষিণীর কঠোর সন্তাপ।।
তুচ্ছ মান হতে জম্মে, যে প্রশংসা বায়।
তাহা হতে মলয়জে মিষ্ট বলা যায়।।
আর মিষ্ট নবপুষ্পে সুগন্ধি পবন।
ধন বিষ হতে মিষ্ট নদীর জীবন।।
চাতুরী আশঙ্কা দুঃখে পূর্ণিত সংসার।
সত্য সুখ বনে, শুদ্ধ ছায়া সহকাব।।

ব্রিলিয়ান্ট-এর বাংলা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, দেদীপ্যমান। ছাত্র হিসেবে বঙ্কিম তখন তাই। পাঠ্যপুস্তকেব বাইবে কবিতা আব ইতিহাসেব বইপত্রে চলেছে ডব-সাতাব। অবসব যাপনেব জন্যে নিজেব হাতে বাগান বানিয়েছেন। তার জন্যে হুগলি কলেজ থেকেও গাছ নিযে আসছেন কখনো কখনো। চাবপাশেব পবিবেশের মধ্যে কোথাও নেই এমন বেসুবো কোনো কিছু যাতে বনবাসী হওযাব ইচ্ছেটা আকুলতা ছড়াবে মনে। তদুপবি বিবাহিত। নাবালিকা হলেও, এমন-কি ছোটোখাটো বিবাদ-বিসম্বাদ সত্ত্বেও বিবাহিতা বালিকাটি পছন্দসই। তাহলে ? এব উত্তব সন্ধানে আমাদেব কি ছুটতে হবে ফ্রযেড সাহেবেব কাছে ? তাহলে কি-সত্যিই মনেব ভিতবে ডিম পেড়েছে বিবহ-বিধুবতা ? যাকে চাই সে চোখেব আড়ালে, বাড়ানো হাতের সীমানাব ওপাবে, তাব ফলেই কি যৌবনাসন্ন কবিব চেতনায শূন্যতাব এমন শোচনীয সংক্রমণ ? হতে পাবে। তারও সম্ভাবনা ষোলোআনা।

"পিতামহ পৌত্রী ছাড়িয়া থাকিতে বড কষ্ট পাইতেন, তাই প্রথমে বালিকা নাবায়ণপুবেই অধিক থাকিতেন। বঙ্কিম কিন্তু বিবহ-ব্যথা বড সহ্য কবিতে পাবিতেন না। প্রায প্রতি বাত্রেই সকলে ঘুমাইলে 'দু ছোট' লইয়া শ্বশুববাডী আসিযা উপস্থিত হইতেন। মাঠেব উপব দিয়া কোনাকুনি বাস্তায বাডীব পশ্চাদ্দিক হইতে শ্বশুববাডীতে আসিযা স্ত্রীব সহিত মিলিত হইতেন। এবং সেখানেই বাত্রিযাপন কবিতেন। কিন্তু এমনই কর্তব্যপবাযণ ছিলেন যে, আবাব ভোববাত্রিতেই আসিযা বাডীতে উপস্থিত হইযা পডিতে বসিতেন। সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্কিমকে পডিতে দেখিযা শুইতে যাইতেন। আব ভোবে আসিযাও পাঠনিমগ্ন দেখিতেন। আশ্চর্য হইয়া তিনি প্রাযই জিজ্ঞাসা কবিতেন—'বঙ্কিম কি সাবা বাত জেগে পড়েছে ?' কখনো কখনো এ কথাব উত্তব দিত ভৃত্য। বঙ্কিমেব মানস-নেত্র হইতে যে এই বাল্যস্মৃতি জীবনেব কোনো অবস্থাযই বিলুপ্ত হয নাই, পাঠক এই গ্রন্থে বহু স্থানে তাহাব নিদর্শন পাইবেন।"

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র/হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

এমন সংগোপন নৈশ অভিসাব বিঘ্নিত হতে পাবে নানা কাবণে। নিজের বাড়িতে ধবা পড়ে যাওয়া। শ্বশুববাড়িব সলজ্জ নিষেধ। প্রকৃতিব প্রতিকূলতা, যথা খবা, গ্রীষ্ম কিংবা ঘন বর্ষাও, বিবেচনাধীন এখানে। প্রিয়া অথবা পত্নীব থেকে দূরত্বই কি তাহলে বাড়িযে দিযেছিল তাঁব মনেব মধ্যে একধবনেব বৈবাগ্যেব একতাবা? তাই, বিশ্ববিখ্যাতদের বাতিল ? আব নিজেকে দেখতে পাওয়ার ঝকঝকে আযনা পেয়ে গিয়ে ড্রামন্ডকেই পছন্দেব মালাদান? ড্রামন্ডেব—

"Thrice happy he who by some shady grove
Far from the clamorous world, doth live his own.

অথবা

"The world is full of horrors, troubles flight
Wood's harmless shade have only true delight."

এ-সব অনুভবকেই ভাষান্তরে পুনঃপ্রচারের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন, তাই মনের সন্তাপ জুড়োনোর এক ধরনের প্রক্রিয়া ? তাঁর চেতনার এই সময়কাব বৃষ্টি-বাদল নিয়ে ভাবাভাবির সময় আমাদের এও মনে রাখতে হবে যে, এই অনুবাদের পরে তিনি যে কবিতা লিখবেন —তার নাম হবে 'জীবন ও সৌন্দর্য অনিত্য'। আর সেই পদ্যের আগে লিখবেন যে 'গদ্য' নামের ছোট্ট একটি বচনা, সেখানে শ্মশান-বৈরাগ্যের পক্ষে ওকালতিটা আরো মারাত্মক।
সাবান-জলের বুদবুদ হয়ে ঘুরপাক খেয়ে চলেছে অজস্র প্রশ্ন। তার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন এটাই যে, বিচার্ডসনের সংকলনের কোন কবির দিকে তাকানোটা সব চেয়ে সংগত অথবা স্বাভাবিক ছিল বঙ্কিমেব পক্ষে ? এর একটা সম্ভাব্য উত্তর বেছে নিতে হলে এখনকার এই ১৪ বছরের বঙ্কিমকে ছেড়ে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে আরো ১৪টা বছর। অর্থাৎ ১৮৬৬-তে। ওই বছবেই বেরোবে তাঁব 'কপালকুণ্ডলা'। 'কপালকুণ্ডলা'ব মূল আখ্যানকে পাশে সরিয়ে তাকানো যাক ওই উপন্যাসেব প্রত্যেক খণ্ডেব প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদে ব্যবহৃত উদ্ধৃতির দিকে। হঠাৎ মনে হতে পাবে রিচার্ডসনেব মতোই এও যেন বিশ্বসাহিত্যেব সেরা ফসলের এক সম্মোহক সংকলন। বিভিন্ন খণ্ড মিলিয়ে বইটিতে পরিচ্ছেদের সংখ্যা ৩০টি। সেখানে স্বদেশ এবং বিশ্ব মিলিয়ে হাজিব-থাকা লেখক ও লেখকের রচনা থেকে উদ্ধৃতির সংখ্যা এই রকম—

শেক্সপীয়র থেকে ৬টি
বায়বন থেকে ৩টি
ওয়ার্ডসওযার্থ থেকে ১টি
মধুসূদন থেকে ৬টি
কীটস থেকে ১টি
দীনবন্ধু মিত্র থেকে ১টি
শ্রীহর্ষেব রত্নাবলী থেকে ২টি
উদ্ধবদূত কাব্য থেকে ২টি
বিদ্যাপতি থেকে ১টি
আর কালিদাস থেকে ৭টি

স্বদেশেব কবিদের বাদ দিলে বিশ্বসাহিত্যেব যে দুজনের এখানে সবচেয়ে সম্মানিত উপস্থিতি, তার একজন শেকসপীয়ব, অন্য জন বায়রন। সমগ্র বঙ্কিম রচনাবলীকে মন্থন কবলে যে দুটি অমৃত পাত্র উঠে আসবে অবশেষে, তা এই দুজনেবই রচনা। এঁদের কথাই তাঁর কলমে, তাঁর যুক্তিবিন্যাসে, তাঁব কাব্যবিচাবে, তাঁব আবেগ-স্বনিত উপলব্ধির ঘোষণায় অজস্রবার। আরো আশ্চর্য যে, কেবল বঙ্কিমই এঁদের কথা বলেন নি। যাঁবা বঙ্কিমকে নিয়ে ভেবেছেন, লিখেছেন, প্রশংসাপত্র সাজিয়েছেন, এই দুই ভিন্ন ভাষার কিংবা ইংরেজি ভাষার কবিদেরই শরণাপন্ন হতে হয়েছে বারে বারে। শেক্সপীয়র যে আসবেই সে অনুমান সুকঠিন নয় তেমন। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে তো বলেই ছিলেন একবার—

"কপালকুণ্ডলা লেখার সময় শেক্সপীয়র বড় পড়িতাম।"

কেবল কপালকুণ্ডলা নয় শেকসপীয়র-পাঠের আচ্ছন্ন অভিভূতির আস্ত শতদলটি তার সহস্র-দল বিছিয়ে ছড়িয়ে মিশিয়ে রয়েছে তাঁর সমগ্র রচনাবলীর স্তরে স্তরে, ভাঁজে ভাঁজে, প্রকাশ্যে এবং অগোচরে। যে বাঙালি-ইংরেজের আত্ম-মৈথুনতার আত্মঘাতী উপদ্রবে এদেশের বিবেকবান বুদ্ধিজীবীরা দূর অতীত থেকে আজও তিতিবিরক্ত, সেই নীরদচন্দ্র চৌধুরীর এমনতরো মন্তব্যও কিন্তু পেয়ে যায় আমাদের সমর্থন যে, বাংলা সাহিত্যে রমণী আর প্রেম এই দুটোই বঙ্কিমের কৃতিত্বময় অবদান আর পিছনে রয়েছে শেকসপীয়রের প্রবল

প্রভাব। কিন্তু শেকসপীয়ব ছাড়াও যে থেকে গেছেন আরো একজন বিশ্বখ্যাত বিদেশী কবি সে-কথা তেমন খেয়াল করা হয় নি বলেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর একটি বিশেষ প্রবন্ধ পড়তে গিয়ে চমকে উঠতে হয় তাঁর ঘন-বুনোটের যুক্তি পরম্পরায়। প্রবন্ধটির নাম, 'বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি'। প্রবন্ধের প্রারম্ভে বঙ্কিমেব উপর প্রভাবশীল হওয়ার যোগ্য কবিদের একটা দীর্ঘ তালিকা গড়ে তোলেন তিনি। তাবপবই নিজস্ব যুক্তিব ডাস্টারে, স্কুলেব ব্ল্যাকবোর্ডের অপ্রয়োজনীয় লেখালেখি মোছার ভঙ্গিতে, ক্রমাগত মুছে যেতে থাকেন তাঁদেব। মিলটন, চসার, স্পেনসাব, শেলী, টেনিসন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ তো গেছেনই। মুছে যান এমন-কি শেকসপীয়বও।

> "বঙ্গীয় যুবক যে-সমস্ত বাশি বাশি গ্রন্থ পাঠ কবেন তাহাব মধ্যে শেক্‌সপীযবই সর্বপ্রধান। কিন্তু বোধ হয় তাঁহাব চরিত্র নির্মাণে শেকসপীযবেব কোনো হাত নাই। কাবণ শেক্‌সপীযরের উদ্দেশ্য কেবল 'to please', তাঁহাব সৎলোকও যেমন সুন্দর, অসৎও তেমনি সুন্দর। এই দুই প্রকার চরিত্র পাঠ করিয়া যে-সকল ভাবেব উদয হয় তাহা পবস্পবকে কেন্‌সেল (cancel) কবিয়া দেয।"

তাহলে থাকছে কে শেষ পর্যন্ত?

> "বাকি বাযবন, তিনি পীড়িতেব বন্ধু, পীড়কের শত্রু, প্রণযেব আধাব, যৌবন মূর্তিমান, মহা-তেজস্বী, সর্বদা চঞ্চল, আলস্যেব, জনসমাজেব অত্যাচাবে একান্ত চটা। যৌবনেব মন আকর্ষণে যা-কিছু চাই বাযবনেব সব আছে। সুতবাং ইংবেজি সাহিত্যে এক বাযবনই বঙ্গীয যুবকের চবিত্র নির্মাণে অংশী।"

বিদেশ থেকে এলেন বায়রন। আর স্বদেশেব থেকে নির্বাচিত হলেন একমাত্র কালিদাস : ভারবি, মাঘ, নৈষধ, বাণভট্ট, শ্রীহর্ষ, দণ্ডী, বিদ্যাপতিকে সবিযে।

> "বঙ্কিমবাবুর এক হাতে কালিদাস আব-এক হাতে বাযবন কিন্তু কালিদাসেব আধিপত্য তাঁহাব উপব অধিক।"

শেষ পর্যন্ত, স্বদেশী-বিদেশী দুই কবিব অভিঘাতেব যোগফলটা পৌঁছল কোথায?

> "বঙ্কিমবাবুব পুস্তকেব পবহিতব্রত যদিও বাযবনেব পবহিতব্রত অপেক্ষা কোনো অংশে ন্যূন কিন্তু উহা তাঁহাব পুস্তকে অধিকাংশ স্থলেই শুদ্ধ স্বদেশানুবাগেই পর্যবসিত। এইজন্য আমবা তাঁহাব পুস্তকেব উদ্দেশ্য স্বদেশানুবাগই বলিলাম।
> উপসংহাবকালে সংক্ষেপে বলি, বঙ্কিমবাবুব উদ্দেশ্য স্বদেশানুবাগ ও সামাজিক সুখ, কালিদাসেব ভূতানুবাগ ও সামাজিক সুখ, বায়বনেব মনুষ্যানুবাগ (humanitarianism) ও সামাজিক নিযম লঙ্ঘনেব সুখ।"

এই প্রবন্ধটি নিয়ে হবপ্রসাদ শুনিযেছেন ছোট্ট একটি ঘটনাও। বঙ্কিম তখন চুঁচুড়ায়। হরপ্রসাদ ছিলেন লক্ষ্ণৌ-এ। একবার দেখা করতে এলেন তাঁর সঙ্গে, লক্ষ্ণৌ থেকে ফিবে। নানা কথার শেষে হরপ্রসাদের প্রশ্ন, লক্ষ্ণৌ থেকে পাঠানো প্রবন্ধগুলো পড়েছেন কিনা। বঙ্কিমেব উত্তব :

> "তুমি যেটির কথা মনে করিয়া বলিতেছ, সেটি কোনো জর্মান পণ্ডিতের লেখা বলিয়া মনে হয়।"

এই বঙ্কিমই পরে প্রবন্ধে-প্রবন্ধে, সমালোচনায়-আলোচনায় বাব বার ব্যবহার করবেন বায়রনকে। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে হরদেব ঘোষালের চিঠিতেও বায়রন পেয়ে যাবেন এক ঝলক বসবার জাযগা। বাযরন এসে যাবেন বঙ্গদর্শনে অক্ষয়কুমার সরকারেব 'শিক্ষানবীশের পদ'-এর সমালোচনায়। 'শকুন্তলা মিরান্দা এবং দেসদিমনা' প্রবন্ধে, 'অবকাশবঞ্জিনী কাব্য' বা 'পলাশীর যুদ্ধ'-র আলোচনাতেও বাদ পডবেন না বাযরন। বাদ পডবেন না বঙ্গদর্শন বন্ধ

করে দেওয়া উপলক্ষে 'বঙ্গদর্শনের বিদায়' সম্পাদকীয়তে। তাঁর সারা জীবনের লেখালিখিতে দ্বিতীয় বার উইলিয়াম ড্রামন্ডের দেখা মিলল না আর। এক রাতের অচেনা অতিথির মতো রাত কাটিয়ে যাওয়ার পরই বিস্মৃত। আর বায়রন যেন বাড়ির নিকটতম আত্মীয়। আসা-যাওয়া অবারিত। অথচ জীবনের প্রথম কবিতা অনুবাদের সময় তিনিই রয়ে গেলেন অগোচরে।

একই সঙ্গে যোদ্ধা আর প্রেমিক হয়ে-ওঠা তাঁর নয়া চরিত্রদের গড়নে, বায়রনকে খুঁজে পাওয়া খুব একটা কঠিন খাটুনি নয় হয়তো-বা। কিন্তু বঙ্কিম নিজে কোনোভাবেই জানিয়ে গেলেন না তার ইশারা-ইঙ্গিত এতটুকুও।

বঙ্কিম-পাঠ এইভাবেই পদে পদে অথবা ধাপে ধাপে মুখোমুখি করে দেয বিস্ময়কব সব বৈপবীত্যের। আর এইখানেই তাঁকে আবিষ্কারের আনন্দ।

প্রথমবার লেখা ছাপানোর তিক্ত অভিজ্ঞতাব পর সমাচার দর্পণ-এ আর কখনো কবিতা পাঠাননি বঙ্কিম। আব 'সমাচাব দর্পণ'ও এর এক বছর পবে উঠে যায। প্রথম আত্মপ্রকাশ, ১৮১৮-র ২৩ মে। প্রথম বাংলা মাসিকপত্র হয়ে বেবয 'দিগদর্শন'। একমাস পবেই শ্রীবামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে জে. সি. মার্শম্যান-এব সম্পাদনায় বেবলো এই সমাচাব দর্পণ। বেবত প্রত্যেক শনিবার। প্রথম তিন সপ্তাহ বিলি করা হযেছিল বিনামূল্যে। ১৮২৯ থেকে, কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সুবাদে ইংরেজি ভাষাব চর্চাব প্রাবল্যকে মনে বেখেই, সমাচার দর্পণ হয়ে যায দ্বিভাষিক। ১৮৩২ থেকে সাপ্তাহিকের বদলে হযে যায অর্ধসাপ্তাহিক, অর্থাৎ বেরত সপ্তাহে দুবার। ১৮৩৪ থেকে আবাব সাপ্তাহিক। এব পবেব ঘটনাবলী জানানো হয়েছে আগেই।

বঙ্কিমের কবিতা বেরতে থাকে যে 'সংবাদ প্রভাকর'-এ তা মাঝখানে চাব বছব বন্ধ থেকে আত্মপ্রকাশ করে আবার। তবে এবাবে সাপ্তাহিক হিসেবে নয়, বাবত্রয়িক হিসেবে। অর্থাৎ সপ্তাহে তিনবাব।

বঙ্কিমের জন্মের এক বছব আগে দৈনিক সংবাদপত্র রূপে সংবাদ প্রভাকব-এব আত্মপ্রকাশ।

২৩ এপ্রিল

'সংবাদ প্রভাকব'-এ বেরলো বঙ্কিমের বচনা, 'গদ্য'। লেখক হিসেবে নাম ছিল 'ছাত্র হইতে প্রাপ্ত।' 'গদ্য'ই প্রভাকর-এ বেরনো বঙ্কিমের প্রথম রচনা।

> "গগন মণ্ডলে বিরাজিতা কাদম্বিনী উপরে কম্পায়মানা শম্পা সঙ্কাশ ক্ষণিক জীবনের অতিশয প্রিয হওত মূঢ় মানবমণ্ডলী অহরহ বিষয় বিষার্ণবে নিমজ্জিত বহিয়াছে, পরমেশ প্রেম পরিহার পুবঃসব প্রতিক্ষণ প্রমদা প্রেমে প্রমত্ত বহিয়াছে। অম্বুবিম্বুপম জীবনে চন্দ্রার্ক সদৃশ চিরস্থায়ী জ্ঞানে বিবিধ আনন্দোৎসব করিতেছে, কিন্তু ভ্রমেও ভাবনা করেনা যে সে সব উৎসব শব হইলে কি হইবে এবং পরম নিধি প্রিয় পিতা পরাৎপবের প্রতি প্রীতি প্রভাবের অভাব কবে, বিবেচনা কবে না যে তাঁহাব সমীপে উত্তবকালে কি উত্তর করিবে কদাপিও মূঢ় মানবমণ্ডলী মনোমধ্যে মুহূর্তেকও বিবেচনা কবে না যে তাহার কি অনিত্য পদার্থ প্রযত্ন পুরঃসর প্রতিপালন করিতেছে এখন যে দেহে ধূলিকণা পতনে পাষাণ প্রহার প্রায় বোধ হয়, আশু সেই দেহ শ্বসমূহের করাল পদাঘাতে বিদীর্ণ হইবেক, এখন যাহার রাজীব রাজী বিরাজিত শয্যাতেও নিদ্রা হয় না, জীবনান্তে সে ধূলি কর্দম অস্থিকণাকীর্ণ লক্ষ লক্ষ রক্ষো, যক্ষ, ভূত প্রেতাদির বাসস্থান শ্মশানে চিরনিদ্রিত হইবেক।"

রচনার শেষে সম্পাদকের মন্তব্য—

"ইহাব লিপিনৈপুণ্য জন্য সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু যেন অভিধানের উপব অধিক নির্ভব না কবেন এবং অক্ষরগুলীন স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।"

রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমের এই সময়েব গদ্য সম্বন্ধে, তাঁব 'বাংলা ভাষা পবিচয়'-এব এক জায়গায় লিখেছিলেন—

"ঈশ্বরগুপ্তের আমলে বঙ্কিমের কলমে যে গদ্য দেখা দিয়েছিল তাতে যতটা ছিল পিণ্ডতা, আকৃতি ততটা ছিল না। যেন ময়দা নিয়ে তাল পাকানো হয়েছে, লুচি বেলা হয় নি।"

২৫ মে

দীনবন্ধু মিত্রেব দ্বিতীয়বারেব 'জামাই ষষ্ঠী' কবিতা বেবলো 'সংবাদ প্রভাকব'-এ। অনেক পবে দীনবন্ধু প্রসঙ্গে বঙ্কিম লিখেছিলেন—

"তিনি দুই বৎসব, জামাই ষষ্ঠীব সময়ে, 'জামাইষষ্ঠী' নামে দুইটি কবিতা লেখেন। এই দুইটি কবিতা বিশেষ প্রশংসিত এবং আগ্রহাতিশয্যেব সহিত পঠিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় বৎসবেব 'জামাইষষ্ঠী' যে সংখ্যাক প্রভাকবে প্রকাশিত হয়, তাহা পুনর্মুদ্রিত কবিতে হইয়াছিল... হাস্যবসে দীনবন্ধুব অদ্বিতীয় ক্ষমতা ছিল। 'জামাইষষ্ঠী'তে হাস্যবস প্রধান।"

২৮ মে

'সংবাদ প্রভাকব'-এ বেবলো বঙ্কিমেব কবিতা, 'জীবন ও সৌন্দর্য্য অনিত্য'।' এ কবিতা সম্পর্কে ছিল না কোনো সম্পাদকীয় মন্তব্য। কবিতার শুরুব কয়েকটি পঙক্তি—

যামিনী যামেক যায়, সেবিতে শীতল বায়,
সঙ্গে কবি ললনায়, বসময় বসিয়া।
বসি নিশাকব কবে, ধবিয়ে প্রেয়সীকবে,
প্রেম আলাপন কবে, সবসেতে বসিয়া।

৩ জুলাই

'সংবাদ প্রভাকব'-এ বেবলো দ্বাবকানাথ অধিকাবীব প্রথম কবিতা 'তত্ত্বপ্রকবণ'। এক বছর পরে এই দ্বাবকানাথেব সঙ্গেই জমে উঠবে বঙ্কিমেব আব দীনবন্ধু মিত্রেব 'কালেজীয় কবিতাযুদ্ধ।'

১০ জুলাই

'সংবাদ প্রভাকর'-এ বেবলো বঙ্কিমের 'বর্ষাঋতু' নামেব গদ্য বচনা। তখনো তিনি আযত্ত কবে উঠতে পাবেননি নিজস্ব ভাষাশৈলী। ঐ বচনাব শুরুব অংশবিশেষ—

"স্বনাথ শশধর বিরহিণী বিঘোর তমসাম্বরাবৃতা গভীরা নিশীথিনী সঙ্কাশ নিবিড় জলধবমাল গগনমণ্ডলে নিয়ত নিরীক্ষণ করিতেছি। মন্মথোন্মথিত জনবাজী হৃদয় বিদাবক ঘোরঘন নির্ঘোষ নিনাদ শ্রবণে চমকিত চিত্ত চাপল্য প্রাপ্ত হইতেছে। নিবিড় নীলাঙ্গিনি যমুনাপুলিনে শ্রীরাধা চাতকী নীরদ কদম্ববিহারী শ্যাম শবীরোপবি তরলিত বিকচ বিমল বনমালা তুলিয়া নীলজলধরোপরি শম্পা কম্পায়মানা হইতেছে, কর্ণকুহর-বিদারক ভীষয়াশনি নিনাদে ভুবন চমকিত হইতেছে, কাদম্বিনী বর্ষিত বারি বিন্দু বিশালবেগে ধরাতলে পতিত

এর ঠিক একদিন আগে, ৯ জুলাই 'সংবাদ প্রভাকর'-এ 'সৎপ্রবন্ধ' নামের একটা গদ্যরচনা বেবিযেছিল। লেখকের নামের জায়গায়—'কস্যাচিৎ হুগলী কালেজাস্থ ছাত্র'। সে রচনা বঙ্কিমচন্দ্রেবই কিনা, তা এখনো স্থির করা যায়নি।

২১ জুলাই
'সংবাদ প্রভাকব'-এ বেরলো বঙ্কিমের কবিতা 'বর্ষায় মানভঞ্জন'। ত্রিপদী ছন্দে নায়ক-নাযিকার কথোপকথন। কবিতার শুরুব খানিকটা—

নায়কেব উক্তি
ত্রিপদী

বিধুমুখি কবে মান, কিরূপে দেখালে প্রাণ
হেরিতেছি অপরূপ ভাব।
বরষাব আবির্ভাবে, প্রফুল্ল সরস ভাবে
বহিয়াছে সকল স্বভাব।
বন উপবন চয, বসময সমুদয়
রসপূর্ণ যত জীবগণ।
কিন্তু কি আশ্চর্য কব, এ সবার মাঝে তব
কেন প্রিয়ে বিবস বদন।

কবিতাব শেষে সম্পাদকেব দীর্ঘ মন্তব্য—

"এই পদ্য সর্বপ্রকারেই উত্তম হইযাছে, আমরা সানন্দে প্রকাশ কবিতেছি এতৎপাঠে সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন, এই স্থলে কবিভ্রাতাদিগকে অনুবোধ কবি তাঁহাবা ভগ্নোদ্যম না হইয়া ক্রমশ রচনাকল্পে অনুরাগী হইবেন এবং উত্তম উত্তম বিষয সকল মনোনীত করিয়া লইবেন আর তাঁহারদিগেব বচিত কবিতার যে যে পদ সংশোধিত হয় তাহাব প্রতি বিশেষ দৃষ্টি বাখিবেন, অপিচ যদি ইংরাজী হইতে কোনো কোনো পদ্যেব অনুবাদ কারণে নিতান্তই অভিলাষ করেন তবে এমত সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন যাহার মর্ম্মার্থ সহজে প্রকাশ পাইতে পারে, ইংবাজীভাষানভিজ্ঞ জনেবা তাহা পাঠ মাত্রেই সুখী হইতে পাবেন এবং ইংলণ্ডীয় কবির সেই কবিতার শবীবে যেন গুরুতর আঘাত না হয। আমরা এইরূপ অনুবাদিত পদ্য এত অধিক প্রাপ্ত হই যাহা কেবল দোষে পরিপূর্ণ। তৎসমুদয কোনোমতেই শোধিত হইতে পাবে না। অতএব লেখকেবা যদি এ বিষয়ে বৃথা পরিশ্রমে বিরত হইয়া মনেব ভাবে পদ্য লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন তবে কত সুখের ব্যাপার হয়। তাহাতে অনর্থক সময় নষ্ট হয় না অথচ বহুল উপকাব সম্ভাবনা। বিলাতী কবিতার ভাবভঙ্গী অভিপ্রায়াদি এদেশের সহিত সংপূর্ণরূপে বিপবীত সুতরাং তাহার তাৎপর্য রক্ষা করিয়া বঙ্গভাষায় কবিতা রচনা বড় সহজ নহে, প্রায় হয় না বলিলেই হয় এ কারণ যাঁহার যাঁহার রচনা অপ্রকাশিত থাকে তাঁহারা ক্ষুব্ধ হইবেন না, যে লেখার সর্বাঙ্গ অপকৃষ্ট তাহাই অগ্রাহ্য করা হয়, নচেৎ আমরা বহু যত্নে সংশোধন করিয়া প্রকটন করণে ত্রুটি করি না। যাহা হউক অধুনা হিন্দু, হুগলি, কৃষ্ণনগর কলেজ ও অন্যান্য বিদ্যালয়ের কোন কোন সুপাত্র ছাত্র গদ্য পদ্য উভয় বিষয়েই আমাদিগকে পরিতুষ্ট করিতেছেন।"

অক্টোবর
বঙ্কিমচন্দ্র হুগলি কলেজে উঠলেন প্রথম শ্রেণীর 'বি' সেকশনে। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে

কয়েকজন— জে গ্রেভস, ডাবলিউ ব্রেন্যাণ্ড, ডি ফোগো, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জে. জে. বীনল্যাণ্ড। তখন হেডমাস্টার, জে. গ্রেভস। পড়াতেন লিটাবেচাব আব হিস্ট্রি। সেকেন্ড মাস্টার, ডাবলিউ ব্রেন্যান্ড। পড়াতেন ম্যাথামেটিকস আব জিওগ্রাফি। এই বছরেই যাদবচন্দ্র বদলি হয়ে যান বর্ধমানে। 'সঞ্জীবনী সুধা'-য় এই সময়কে নিয়ে বঙ্কিমের নিজের স্মৃতিচাবণ—

> "এই সময়ে পিতৃদেব বিদেশে [বর্ধমানে], আমাদিগেব সর্বজ্যেষ্ঠ সহোদরও চাকবি উপলক্ষে বিদেশে [ব্যারাকপুবে]। মধ্যম সঞ্জীবচন্দ্র বালক হইলেও কর্ত্তা—Lord of himself, that heritage of woe! কাজেই কতকগুলা বিদ্যানুশীলনবিমুখ ক্রীড়াকৌতুকপবায়ণ বালক— ঠিক বালক নহে, বযঃপ্রাপ্ত যুবা, আসিয়া তাঁহাকে ঘেবিযা বসিল।...একদিন হেড মাষ্টাব গ্রেবস সাহেব আসিযা কোন্ দিন কোন্ ক্লাসের পবীক্ষা হইবে, তাহা বলিযা দিযা গেলেন। সঞ্জীবচন্দ্র কালেজ হইতে বাড়ী আসিযা স্থির কবিলেন, এ দুইদিন বাডী থাকিয়া ভাল কবিযা পড়াশুনা কবা যাউক, কালেজে যাইব না, পবীক্ষার দিন যাইব। তাহাই কবিলেন কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁহাদিগেব ক্লাসেব পবীক্ষাব দিন বদল হইল— অবধাবিত দিবসের পূর্ব্বদিন পবীক্ষা হইবে স্থিব হইল। আমি সে সন্ধান জানিতে পাবিযা, অগ্রজকে তাহা জানাইলাম। বুঝিলাম যে, তিনি পবীক্ষা দিতে কালেজে যাইবেন। কিন্তু পবীক্ষাব দিন কালেজে যাইবার সময দেখিলাম, তিনি উপবিলিখিত বানব সম্প্রদাযেব মধ্যে একজনেব সঙ্গে সতবঞ্চ খেলিতেছিলেন। বিদ্যাব মধ্যে এইটি তাহাবা অনুশীলন কবিত, এবং সঞ্জীবচন্দ্রকে এ বিদ্যা দান কবিযাছিল। আমি তখন পবীক্ষাব কথাটা সঞ্জীবচন্দ্রকে স্মরণ করাইযা দিলাম। কিন্তু বানব সম্প্রদায সেখানে দলে ভাবী ছিল; তাহাবা বাদানুবাদ কবিযা প্রতিপন্ন করিল যে, আমি অতিশয দুষ্ট বালক; কেননা লেখাপড়াব ভান কবিয়া থাকি, এবং কখন কখন গোইন্দাগিরি কবিযা বানব সম্প্রদাযের কীর্ত্তিকলাপ মাতৃদেবীর শ্রীচবণে নিবেদন কবি। কাজেই ইহাই সম্ভব যে, আমি গল্পটা বচনা কবিযা বলিযাছি। সবলচিত্ত সঞ্জীবচন্দ্র তাহাই বিশ্বাস কবিলেন। পবীক্ষা দিতে গেলেন না। তৎকালে প্রচলিত নিয়মানুসাবে কাজেই উন্নততব শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন না। ইহাতে এমন ভগ্নোৎসাহ হইলেন যে, তৎক্ষণাৎ কালেজ পবিত্যাগ কবিলেন, কাহাবও কথা শুনিলেন না।
> তখন পিতাঠাকুব বর্দ্ধমানে ডেপুটি কালেক্টব। তখন বেল হয নাই, বর্দ্ধমান দূবদেশ। এ সংবাদ যথাকালে তাঁহাব কাছে পৌঁছিল। তাঁহাব বিজ্ঞতা অসাধাবণ ছিল, তিনি এই সংবাদ পাইয়াই পুত্রকে আপনাব নিকট লইযা গেলেন। তাঁহার স্বভাবচবিত্র বিলক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ কবিযা বুঝিলেন যে, ইহাকে তাড়না কবিযা আবাব কালেজে পাঠাইলে এখন কিছু হইবে না, যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইযা বিদ্যোপার্জন কবিবে, তখন সুফল ফলিবে।"

শেষ হল বঙ্কিমেব কবিতা-চর্চাব উদবোধনী বছবটি।

পরের বছরে তিনি শুধু কবিতাই লিখবেন না, জড়িয়ে পড়বেন এক অপ্রত্যাশিত কবিতা যুদ্ধেও। বঙ্কিমের কবি হয়ে ওঠার ইতিহাসকে মনে রাখতে গিযে এই বছবে ছোট্ট একটা ধাঁধার সামনে এসে দাঁড়াই যেন। সংবাদ প্রভাকব-এ বঙ্কিমেব আগে দীনবন্ধুব আত্মপ্রকাশ কবি হিসেবে। আবার দীনবন্ধুরও অনেক আগে রঙ্গলালেব। ১৮৪৭ থেকে রঙ্গলাল ঐ পত্রিকার লেখক। যদিও এখানে কবে কবে এবং সংখ্যায় কটি কবিতা লিখেছেন তিনি তা জানা হয়ে ওঠেনি এখনো। তথাপি অতিরিক্ত যা জানা তা হল বাল্যকাল থেকেই কবি-গান রচনার দিকে আগ্রহ আর কবি-গান রচনায় দক্ষতাব সূত্রেই তিনি অর্জন করে নিতে

পেরেছিলেন প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের আন্তরিক অনুরাগ। অথচ ঠিক যে সময়টিতে বঙ্কিম, দীনবন্ধুরা সংবাদ প্রভাকর-এর পাতায় হয়ে উঠছেন জনপ্রিয়, রঙ্গলাল তখন পুরোপুরি গরহাজির।

এই বছবে বঙ্গলালকে বিশেষ কবে মনে পড়ার কারণটাও কম রহস্যময নয়, যেহেতু এই বছরেই বঙ্গলাল হাত লাগাচ্ছেন তাঁর ঐতিহাসিক মর্যাদায ধন্য বিখ্যাত বচনা 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এ, বাংলা কবিতার এক ধরনেব স্থিতিশীলতাকে যা আবর্তময় কবে তুলবে তাঁব প্রথম বীবত্বব্যঞ্জক সম্ভাষণে। যদিও পবাধীনতার ভস্ম আর স্বাধীনতার আগুনে দীপ্ত ঐ কাহিনী-কাব্যটি শেষ করতে তাঁব লেগে যাবে আবো ৬টি বছর।

১৮৫২

এই বছরের প্রধান ঘটনাবলী

কলকাতাব কলুটোলায দেবেন্দ্রনাথ মল্লিকেব জন্ম। বাবা, অদ্বৈতচবণ। মাতামহ, মতিলাল শীল।
প্রখ্যাত শিল্পী, রাজস্থানে জযপুব আর্ট স্কুলেব প্রথম ভারতীয অধ্যক্ষ উপেন্দ্রনাথ সেন-এর জন্ম কলকাতাব কলুটোলায। বাবা, বামকমল সেন-এব বড়ো ছেলে হবিমোহন। মা, মনোমোহিনী দেবী।
ইওবোপে পিএইচ. ডি.-তে সম্মানিত প্রথম ভাবতীয বহুভাষাবিদ অধ্যাপক নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যাযেব জন্ম ঢাকা-ব পশ্চিমপাড়ায়। বাবা, কাশীকান্ত।
ভারতবিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ অঘোবনাথ চক্রবর্তীব জন্ম চব্বিশ পবগনাব বাজপুরে। ১৯১১-য সম্রাট পঞ্চম জর্জেব দিল্লী-দববাবে সঙ্গীত পবিবেশন কবেছিলেন তিনি। কাশীব পণ্ডিতেবা তাঁকে উপাধি দিযেছিলেন 'সঙ্গীতরত্নাকব'।
হিমালয পর্বতে পৃথিবীব সর্বোচ্চ শিখব আবিষ্কাব কবলেন বাধানাথ শিকদাব।
কিশোবীচাঁদ মিত্র নাটোব থেকে বদলি হলেন জাহানাবাদে। সেখানে তখন ডাকাতি আব নানান অন্যায উপদ্রবের বাড়াবাড়ি। সবকাবি কাজেব বাইবে, নাটোবেব মতো, জাহানাবাদেও নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিলেন কিশোবীচাঁদ নতুন-গড়া স্কুল নিযে। ঐ সমযে তাঁব অসামান্য কর্মদক্ষতা দেখে বর্ধমানেব মহারাজা ৩০০ টাকা মাইনেব চাকবি দিতে চেযেছিলেন তাঁকে। বাজী হননি কিশোবীচাঁদ।
এই বছর থেকে বাংলা ভাষায চিকিৎসাবিদ্যা শেখানোর শুরু, ছাত্র সংখ্যা বাড়লেও, প্রকট হয়ে উঠছিল পাঠ্য-বই এব অভাব।
ক্রাইস্ট চার্চ কলেজ থেকে অবসব নিযে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় শিবপুরের বিশপস কলেজের অধ্যাপক। বাস করছেন শিবপুরেই।

ইয়ং বেঙ্গলের নেতৃস্থানীয়দের একজন হরচন্দ্র ঘোষ। চাকরি পেয়ে গেলেন কলকাতা পুলিশ কোর্টে জুনিয়র ম্যাজিস্ট্রেটের।

বাংলা কবিতার দিক থেকে এ বছরটি বেশ স্মরণীয়। শুধু একাধিক কবিতার বই বেরনোর জন্যে নয়, কবিতা-বিষয়ে তুমুল তর্ক-বিতর্কও তার আরও একটা কারণ।

মহেন্দ্রনাথ রায়ের সম্পাদনায় বেরবে দুখণ্ডের 'কুসুমাবলী', বাংলার স্কুল-কলেজের পাঠ্যবই হিসেবে। প্রথম খণ্ডে ভারতচন্দ্রের সম্পূর্ণ অন্নদামঙ্গল আর গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী-র তৃতীয় অধ্যায় থেকে কিছু বিচ্ছিন্ন কবিতাংশ। দ্বিতীয় খণ্ডে কবিকঙ্কণ, কবিরঞ্জন, রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দব, বাসবদত্তা, আর অদ্ভুত বামাযণ থেকে নির্বাচিত অংশ। যেহেতু ছাত্রপাঠ্য বই, তাই 'কুসুমাবলী'-তে শ্রেষ্ঠ কবিদের রচনা থেকেও বাদ দেওয়া হযেছিল অশ্লীল অথবা বীভৎস রসেব বর্ণনার অংশ।

বেবলো দুটো মৌলিক নাটক। যোগেশচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' আর তারাচরণ শিকদাবের 'ভদ্রার্জুন'।

'সঞ্জীবনী'-সম্পাদক দেশনেতা কৃষ্ণকুমাব মিত্রের জন্ম ময়মনসিংহের বাঘিল গ্রামে। বাবা, গুরুচরণ নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে গড়েছিলেন সশস্ত্র প্রতিরোধ।

ভাবতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগ দিলেন অ্যাশলি ইডেন। রাজসাহীর সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মজীবনের শুরু।

বেবলো নতুন চাবটে পত্রিকা। শ্রীবামপুব থেকে মাসিক 'জ্ঞানারুণোদয়', সম্পাদক কালিদাস মৈত্র আব যদুনাথ চট্টোপাধ্যায। এক বছব বেবিয়েই বন্ধ। পরে বেবলেও চলেনি। কবি ও নাট্যকাব মনোমোহন বসু বের করেছিলেন অর্ধ-সাপ্তাহিক 'সংবাদ বিভাকর'। এরও পরমায়ু ছিল মাত্র এক বছব। শ্রীরামপুর থেকে বেরিয়েছিল 'সংবাদ শশধর' সাপ্তাহিক। এক বছরও পূর্তি হয়নি এব। 'বিশ্ববিলোচন' চলেছিল চাব-পাঁচ মাস।

রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুরে নতুন করে প্রতিষ্ঠা কবলেন ব্রাহ্মসমাজেব। গোডার দিকে উপাসনাব জন্যে বাড়ি না পাওয়ায় আবগারি সেবেস্তদার শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসাবাড়িতেই কাজ চালানো হত কোনো রকমে। পরে উঠে এল স্কুল বাড়িতে। কখনো বা বাজনারায়ণের বাড়িতেই। ১৮৪৬-এ কোন্নগরের শিবচন্দ্র দেব যে এখানে প্রথম ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা আমরা জেনেছি। শিবচন্দ্র মেদিনীপুব থেকে বদলি হযে গেলে ঐ সমাজ উঠে যাওয়ার মতো দশা হয়। রাজনাবায়ণের হাতে সমাজেব পুনর্গঠনের খবব পেয়ে আহ্লাদিত দেবেন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে চিঠি লিখেছিলেন বাজনারায়ণকে।

জানুয়ারি

বিদ্যাসাগরের সম্পাদনায় বেরলো হিন্দী 'বেতাল পচ্চীসী'।

৮ জানুয়ারি

বেথুন সোসাইটির দ্বিতীয় অধিবেশন মেডিকেল কলেজের থিয়েটারে। সভাপতি, মৌয়াট। শুরুতেই নির্বাচিত হল সভা-চালানোর নিয়ম-কানুন। ঠিক হল, সভার অধিবেশন বসবে প্রত্যেক মাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবারে। নতুন সদস্য হতে হলে চাই আগের অধিবেশনে যোগ-দেওয়া দুজন সদস্যের প্রস্তাব ও সমর্থন। ইংরেজি ছাড়াও সভায় বাংলা আর উর্দুতে প্রবন্ধ পড়া বা বক্তৃতা দেওয়া চলবে। সভার কাজ চালাবেন একজন সভাপতি ও সম্পাদক। তা

ছাড়া থাকবে 'গ্রন্থসভা' বা 'কমিটি অব পেপার্স'। পাঠ-কবা প্রবন্ধের স্বত্ব ঐ গ্রন্থসভাব। অন্য কোথাও ছাপাতে অনুমতি নিতে হবে ঐ সভা থেকে। সভার বাৎসবিক অধিবেশন বসবে প্রত্যেক বছরের জানুযারি মাসে। সদস্য পদের জন্যে তখনই নতুন করে নির্বাচন।
এই দিনেব সভায় গড়া হল যে 'কমিটি অব পেপার্স', তাতে থাকলেন মেজব জি.টি. মার্শাল, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। আগেব অধিবেশনেব ঘোষণা অনুযায়ী প্রবন্ধ পাঠ কবলেন সূর্যকুমাব গুডিব চক্রবর্তী। নাম, 'অন দি স্যানিটারি ইমপ্রুভমেণ্ট অব ক্যালকাটা', এই প্রবন্ধেব মধ্যে এদেশীয মানুষজনের পোশাক-পবিচ্ছদ নিয়ে মন্তব্য সম্পর্কে বিতর্ক চলে কিছুক্ষণ। সভা শেষ হওযার আগে সভাপতি জানিয়ে দিলেন পবেব অধিবেশনে সংস্কৃত কবিতা নিযে আলোচনা কববেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায।

২৫ মার্চ
ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদাযেব যুবকেরা বিধবা বিবাহ নিযে চিন্তাভাবনা কবছে জেনে 'সংবাদ প্রভাকব'-এ তাঁদেব সাফল্য কামনা।

> "কয়জন জ্ঞানীবাবু ভ্রমনিদ্রা হত
> বিধবাব বিযে দিতে, হযেছেন বত।
> মন খুলে আশীর্বাদ কবিতেছি সবে।
> বাবুদের অভিলাষ, পবিপূর্ণ হবে।"

৮ এপ্রিল
বেথুন সোসাইটির সদস্য হলেন হাওড়া থেকে ভূদেব মুখোপাধ্যায়, হুগলি কলেজ থেকে এম গ্রেগবি, চন্দননগব থেকে শ্যামাচবণ ঘোষ, আব ঢাকা থেকে গৌবচাঁদ বসাক, গিবীশচন্দ্র ঘোষ, ডাবলিউ ক্লার্ক, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, আব ব্রজসুন্দব মিত্র। সভায ঠিক হল ঢাকাব বেথুন সোসাইটি শাখাব নাম হবে 'ব্রাঞ্চ বেথুন সোসাইটি'। আনুষ্ঠানিক আলোচনার শেষে 'বাংলা কবিতা' বিষযে হবচন্দ্র দত্তেব প্রবন্ধ পাঠ। পাঠ-শেষে মহেন্দ্রনাথ সোম-এব আলোচনা। এবপব কবিতা বিষযে প্রবন্ধ পাঠ নবীনচন্দ্র পালিতের। আলোচনায অংশ নিলেন কৈলাসচন্দ্র বসু প্রমুখ কয়েকজন। আলোচনায় সকলেই একমত শেষ পর্যন্ত, বাংলা কবিতাব অর্বাচিনতা, অশ্লীলতা, অনুন্নততা, আব উচ্চভাব ধাবণেব অক্ষমতা বিষযে। জনৈক বক্তার অভিমত

> "বাঙালীবা বহুকাল পর্য্যন্ত পবাধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকায তাহাদিগেব মধ্যে প্রকৃত কবি কেহই জন্মগ্রহণ কবে নাই।"

আলোচনা থামছে না দেখে সভাপতি জানিযে দিলেন পবেব অধিবেশনেব জন্যে স্থগিত বাখা হল আলোচনা।

১২ এপ্রিল
সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হওয়ার পরই ঐ কলেজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিব জন্যে ২৬ প্যাবাব নোটস তৈরি করলেন বিদ্যাসাগর, শিক্ষা-সংসদে পেশ কবতে।

১৬ এপ্রিল
রুস্তমজী কাওয়াসজীর মৃত্যু।

২২ এপ্রিল
মেডিকেল কলেজে বাংলা ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে শিক্ষা বিভাগের সম্পাদক মৌয়াট সংবাদপত্রে যে বিজ্ঞাপন দিলেন, সেখানে ছাত্রভর্তির যোগ্যতা হিসেবে আবশ্যিক ঘোষণা করা হল কোনো বাংলা স্কুলে নির্দিষ্ট বিষয়ে পড়াশোনায় যোগ্যতা অর্জনের প্রমাণপত্র।

৪ মে
হৃষীকেশ লাহাব জন্ম। আদি নিবাস হুগলির চুঁচড়ায়। বাবা, মহারাজা দুর্গাচরণ।

১৩ মে
বেথুন সোসাইটির আগের অধিবেশনে জানানো হয়েছিল 'ম্যাকবেথ' নিয়ে আজকের অধিবেশনে প্রবন্ধ পডবেন ঢাকা কলেজেব অধ্যক্ষ মি: লিউইস। পড়েও ছিলেন। কিন্তু আগের অধিবেশনে বক্তার নাম বা আলোচ্য বিষয় ঘোষণা করা হয়নি এমন একজনই স্মরণীয় করে তুলবেন এই অধিবেশনকে। তিনি বঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায। সম্ভবত আগের অধিবেশনে উপস্থিত থেকে বাংলা কবিতা সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তার বিরূপ আব বিদ্রূপাত্মক মন্তব্যই উত্তেজিত অথবা উদবোধিত কবে থাকবে তাঁকে, সভাপতিব বিশেষ অনুমতি নিয়ে একটি স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ কববেন তিনি। নির্দিষ্ট পবিকল্পনাব বাইবে আকস্মিক অনুমোদন বলেই হযতো সোসাইটিব প্রথম বছবেব বার্ষিক বিবরণে উল্লেখ নেই রঙ্গলালেব প্রবন্ধ পাঠেব। না থাকলেও ঘটনাটা পেযে গেছে এক ঐতিহাসিক তাৎপর্য।

> "বাংলা সাহিত্য তথা বাংলা কবিতা সম্বন্ধে উপরোক্ত অপবাদ যে তথ্যানুগ বা যুক্তিসহ নহে, কবি বঙ্গলাল এই প্রবন্ধে বাংলা কবিতা হইতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত কবিযা এবং পাশাপাশি ইংবেজি কবিতাব কোনও কোনও অংশ বসাইয়া তুলনামূলক আলোচনাব দ্বাবা তাহা বুঝাইয়া দেন। হবচন্দ্র দত্ত, নবীনচন্দ্র পালিত এবং কৈলাসচন্দ্র বসুব কতকগুলি মন্তব্যেব তিনি তীব্র প্রতিবাদ করিযাছিলেন।"
>
> বেথুন সোসাইটি/যোগেশচন্দ্র বাগল

> "কৈলাসচন্দ্রের বক্তৃতা বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্যের অনুরাগী মাত্রেরই মনে গভীর ক্ষোভেব সৃষ্টি কবিল। একজন উহাব প্রতিবাদ কবিতে উঠলেন, কিন্তু রাত্রি ১১টা বাজিযা যাওযায সভাপতি মহাশয প্রস্তাব করিলেন যে পরবর্তী মাসিক অধিবেশনে উহার আলোচনা করা যাইবে।
>
> প্রাচীন কবিদিগেব জীবনচবিত ও পদাবলীব অক্লান্ত সঙ্কলযিতা ঈশ্ববচন্দ্র গুপ্তেব প্রিযশিষ্য রঙ্গলাল প্রাচীন কবিগণেব অত্যন্ত গুণপক্ষপাতী ছিলেন এবং তিনি বাঙ্গালা কাব্যেব নিন্দুকগণেব অযুক্তি নিবারণ নিমিত্ত সযত্নে একটি প্রস্তাব রচনা কবিলেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দেব ১৩ মে মেডিকেল কলেজ গৃহে রাত্রি ৮টার সময় বেথুন সভার যে অধিবেশন হয তাহাতে সভাব অন্যান্য কার্যের পর বঙ্গলাল তাঁহার 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' পাঠ করিলেন। প্রবন্ধটি কিছু দীর্ঘ হইয়াছিল। কিন্তু 'বেঙ্গল হরকরাব' সংবাদদাতাব পত্রে প্রতীত হয় যে উহা সকলে অতীব আগ্রহেব সহিত শ্রবণ করিয়াছিলেন। রাত্রি অধিক হওয়ায় রঙ্গলালের প্রবন্ধের বিশেষ কোনো আলোচনা হয় নাই, সভাপতি ডাক্তার মৌয়েট সভাভঙ্গ করিয়া দেন।"
>
> রঙ্গলাল/মন্মথনাথ ঘোষ

রঙ্গলালের ঐ প্রবন্ধের উপসংহার

"অতএব হে সভাস্থ মহোদয়গণ, হে দেশীয় ভ্রাতৃবর্গ, বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা কবিতার বন্ধুবর্গ, আপনারা আর কাল বিলম্ব করিবেন না, বাঙ্গালা কবিতাহার যাহাতে সভ্যকণ্ঠে স্থান প্রাপ্ত হয়েন, এমত উদ্যোগ করুন। উর্ব্বরা ভূমি আছে, বীজ আছে, কেবল কৃষকের আবশ্যক।"

১১ জুন

নীতিশিক্ষা বিষয়ে স্কুলের ছাত্রদের পাঠ্য হিসেবে বেবলো গৌবীশঙ্কব ভট্টাচার্যেব 'নীতিবত্ন'।

১৫ জুন

কবি মনোমোহন বসুব সম্পাদনায় বেরলো 'সংবাদ বিভাকব' নামেব অর্ধসাপ্তাহিক পত্রিকা। বন্ধ হয়ে যায এক বছর পবে। কবি মনোমোহন ছিলেন ঈশ্বরগুপ্তের শিষ্য। তাঁর শুরুব দিকের কবিতা বেরিয়েছিল 'সংবাদ প্রভাকবে'-ই। কবিতা লিখেছেন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-তেও।

৩০ জুন

বাংলাব ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব বিদ্যাসাগরের পেশ-কবা সংস্কৃত কলেজের উন্নযনের বিষয় প্রস্তাব পাঠিযে দিলেন শিক্ষা সংসদে, মনোনযনেব জন্যে সঙ্গে জুড়ে দিলেন নিজেব মন্তব্য—

"It is the result of several consultations I have held with the Principal and I lay it before the council as deserving, in my humble judgement of very careful consideration."

জুলাই

আবদুল লতিফ খাঁ বাংলা বিহার উডিষ্যার 'জাস্টিস অব পীস'।

জনসাধাবণেব জন্যে খুলে দেওয়া হল মেদিনীপুবেব পাবলিক লাইব্রেবি। প্রতিষ্ঠাতা মি. হেনরি ভিনসেন্ট বেলি। তাঁব নামেই পাঠাগারের নামকবণ 'বেলি হল পাবলিক লাইব্রেবি'। নিজের অজস্র বই উপহার দিযেছিলেন তিনি এখানে। প্রথম বছবে বইযেব সংখ্যা ৯৬৩। লাইব্রেরি গডে তোলার পিছনে প্রধান উদ্যাক্তা বাজনাবাযণ বসু। এখন তাঁরই নামে ঐ লাইব্রেরি।

আগস্ট

মেডিকেল কলেজে পডবাব বই নেই। লেকচারই ছাত্রদেব একমাত্র ভবসা। সংবাদ প্রভাকব দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন শিক্ষা-সংসদেব।

২৩ আগস্ট

হাওড়া জেলার সাঁতরাগাছিতে আর. জি. কর নামে খ্যাত চিকিৎসক রাধাগোবিন্দ কর-এব জন্ম। বাবা দুর্গাদাস।

২০ সেপ্টেম্বর

সরকারি নির্দেশে বারাসত কৃষি স্কুলের জন্যে নিযুক্ত করা হল তিনজন মালী, ছাত্রদের কৃষি আর উদ্যান বিষয়ে ব্যবহারিক শিক্ষা দিতে।

অকটোবর

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাসভবনে গড়ে উঠল 'আত্মীয় সভা'; অক্ষয়কুমার দত্ত, রাখালদাস হালদাব আব অনঙ্গমোহন মিত্রের সহযোগিতায়। সভাপতি, দেবেন্দ্রনাথ। সম্পাদক, অক্ষযকুমার দত্ত। শুরুতে উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক সমস্যার আলোচনা। পরে ঢুকে পড়ে ব্রাহ্মধর্ম।

> "ওদিকে অক্ষয়কুমার দত্ত একটা 'আত্মীয় সভা' বাহির করিলেন, তাহাতে হাত তুলিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে মীমাংসা হইত। যথা একজন বলিলেন 'ঈশ্বর আনন্দ-স্বরূপ' কিনা ?' যাহার যাহাব আনন্দস্বরূপে বিশ্বাস আছে, তাহারা হাত উঠাইল। এইরূপ অধিকাংশের মতে ঈশ্বরেব স্বরূপেব সত্যাসত্য নির্দ্ধাবিত হইত।"

আত্মজীবনী/ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

> "একদিন সভার কার্য্যারম্ভ হইলে দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ঈশ্বর সর্বশক্তিমান।" অক্ষযবাবু বলিলেন, "সর্বশক্তিমান নয়। বিচিত্র শক্তিমান।" তিনি বলেন, "কি ? ঈশ্ববের মহিমা ও সর্বশক্তিমত্তা বিষয়ে আমরা এখনও সন্দিহান ?" এই সকল কারণে নানাপ্রকার গণ্ডগোল উপস্থিত হওযাব জন্য আত্মীযসভা উঠিযা যায়।"

অক্ষয চবিত/নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস

নভেম্বর

বাবাসতের জেলা স্কুলের সঙ্গে খোলা হল কৃষি স্কুল।

ডিসেম্বব

'সঞ্জীবনী' পত্রিকাব সম্পাদক, স্বদেশী যুগেব অন্যতম বিপ্লবী নেতা কৃষ্ণকুমাব মিত্রেব জন্ম মযমনসিংহেব বাঘিল-এ। বাবা গুরুচরণ নীলকর সাহেবদেব বিরুদ্ধে নিজের গ্রামে গড়ে তুলেছিলেন সশস্ত্র প্রতিবোধ।

২১ ডিসেম্বব

হিন্দু কলজে ভর্তি হযেছে একজন খৃস্টান ছাত্র। 'সংবাদ প্রভাকব'-এ উদবেগ, এরপব হযতো মিশনাবিবাও যোগ দেবে শিক্ষক হিসেবে। আর শুরু হয়ে যাবে বাইবেল পাঠ। হিন্দু সম্প্রদাযকে সতর্ক থাকাব জন্যে তাই 'প্রভাকব'-এ নির্দেশ।

১৮৫৩

যাদবচন্দ্র বর্ধমান থেকে বদলি হয়ে হুগলিতে।

বঙ্কিম গত বছরের মতোই হুগলি কলেজেব একজন দীপ্তিমান ছাত্র। কলেজেব পডাশোনাব বাইবে তাঁর কবিতা চর্চাব অমল-ধবল পালে লেগেছে গত বছবেব চেয়ে আবো হু হু হাওযা। গত বছরের হিসেবকে ডিঙিয়ে যাবে এ বছবে বেবনো কবিতাব সংখ্যা। গত বছরে ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ২১ জুলাইযের মধ্যে বেবনো কবিতাব সংখ্যা ছিল ৩। গদ্যের সংখ্যা ২। এ বছরে সে সংখ্যা পৌঁছে যাবে ১১-য। এব মধ্যে ৯টি বেরবে 'সংবাদ প্রভাকব'-এ। মাত্র ২টি 'সংবাদ সাধুবঞ্জন'-এ। সাধুরঞ্জনও ঈশ্বব গুপ্তেব পত্রিকা। গত বছবেব মতো এ-বছরেব কবিতাতেও স্বামী-স্ত্রীরূপী নাযক-নাযিকাব পারস্পবিক কথোপকথনেবই প্রাধান্য। বেশ কযেকটি কবিতার নামকবণেই সে স্পষ্ট।

১। হেমন্তবর্ণনাছলে স্ত্রীব সহিত পতিব কথোপকথন।
২। শিশির বর্ণনাছলে স্ত্রী-পতিব কথোপকথন।
৩। বর্ষা বর্ণনাছলে দম্পতিব রসালাপ।
৪। শরদ্বর্ণনাছলে দম্পতির কথোপকথন।
৫। বসন্ত বর্ণনাছলে দম্পতির কথোপকথন।

নামকরণে স্পষ্ট নয়, কিন্তু কবিতা এগিযেছে পতি-পত্নীব কথোপকথনের উচ্ছল প্রবাহ ঠেলে, এমন একটা কবিতার নাম— দূবদেশ গমনের বিদায়।

তিন বছর পেরিযে গেছে বঙ্কিমের বিবাহিত জীবনের বয়স। নাবী শরীরের আস্বাদনে আপ্লুত হওয়ার বয়সে পৌঁছে গেছেন তিনি। তাই কবিতাতেও তার প্রলম্বিত প্রভাব। যেন প্রিয়তমা নারীর সঙ্গে মুখোমুখি কথোপকথনে না মেতে কোনোভাবেই জুড়োতে পারছেন না নিজের সদ্যলব্ধ অনুভব -অভিজ্ঞতার তাপ। আর সে-সব কবিতায় নারীর শরীর বিকীর্ণ করে চলেছে লাবণ্যের সপ্তরশ্মি যেন।

এই ভাবেই শুরু। এর অনেক পরে.যখন কবিতাকে ছেড়ে গদ্যকেই বেছে নেবেন আত্মপ্রকাশের যোগ্যতর মাধ্যমরূপে, গদ্যে লিখে চলবেন উপন্যাসের পর উপন্যাস, নারীরাই পেয়ে যাবে মনোযোগের সিংহভাগ। এমন-কি এভাবে বললেও মিথ্যে বলা হবে না যে, তাঁব পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টির অর্ধেকেটাই রূপবতী রমণীদের দখলে।

ইচ্ছে কবলে এভাবেও সাজিয়ে নিতে পারি তাঁর সৃজন ক্রিয়াকে—

সারাজীবনে যা-কিছু লিখেছেন, তার অর্ধেকের বিষয় ভালোবাসা। বাকি অর্ধেক ধর্ম, সমাজ, এবং ইতিহাস ইত্যাদি।

ভালোবাসা নিয়ে যা-কিছু লিখেছেন তাব অর্ধেকটা জুডে নারী। বাকিটা সমাজ, সংসার, সংঘাত ইত্যাদি।

নারীদেব নিয়ে যা-কিছু লিখেছেন, তার অর্ধেকটা জুড়ে আছে তাদেব রূপ, বাকিটা হৃদয়. হৃদযেব নদ-নদী. জল-জলস্তম্ভ আব জোয়ার-ভাঁটা।

অর্থাৎ এক কথায দাঁড়াল, রূপবতী রমণীরাই তাঁর সৃষ্টিব অর্ধেক। তাঁর অধিকাংশ রচনার চাবকোণা দেযালের ভিতরে লুকিয়ে থাকে একটা গোপন দবজা আব সেই দরজা ঠেলে নিঃশব্দ চবণে যে-কোনো মুহূর্তে আমাদেব সামনে হাজিব হয়ে যায় নারী, নাবীর রূপ, নাবীর প্রসঙ্গ, নাবীব উপমা, নারীব জীবন-যৌবন ও মৃত্যু। হঠাৎ মনে হতে পারে এখানে বুঝি শূন্য থেকে পেডে আনা হল কোনো অজ্ঞাতপ্রায় তথ্য। সেটা সত্যি নয। অনেক দিনেবই পুবোনো জানা এটা। প্রমাণ চাইলে হাতের সামনেই রবীন্দ্রনাথ। সেই কবে নিজেব এক বম্য-প্রবন্ধে লিখে গেছেন—

> "বাংলা সাহিত্যে দেখা যায় নায়িকারই প্রাধান্য। কুন্দনন্দিনী, এবং সূর্যমুখীর নিকট নগেন্দ্র ম্লান হইয়া আছে, রোহিণী এবং ভ্রমরের নিকট গোবিন্দলাল অদৃশ্যপ্রায়, জ্যোতির্ময়ী কপালকুণ্ডলাব পার্শ্বে নবকুমার ক্ষীণতম উপগ্রহের ন্যায। বঙ্গ সাহিত্যে পুরুষ মহাদেবেব ন্যায নিশ্চলভাবে ধূলিশযান এবং রমণী তাহাব বক্ষেব উপর জাগ্রত জীবন্তভাবে বিবাজমান।"

আবার এই ববীন্দ্রনাথই যখন শৈশবের স্মৃতিচারণায়. তখন জানতে পাবি বঙ্গদর্শনে বেবোনো বঙ্কিমেব উপন্যাস কেমন করে শিক্ষিত বাঙালি পরিবারের চোখ থেকে কেড়ে নিয়েছে দুপুববেলাব ঘুম। আসলে কাড়ছে কে ? উপন্যাস ? না তার বিশেষ কোনো চবিত্র ? তাবও উত্তব দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

> "সূর্যমুখী আর কুন্দনন্দিনী আপন লোকেব মতো আনাগোনা কবছে ঘরে ঘরে।"

সম্ভবত সেই ট্রাডিশনে ছেদ পডে নি এখনো। এখনো বাংলাব ঘবে ঘবে তাঁর নারী-চরিত্রেরাই আপন লোক। পুরষেরা পবিচিত আত্মীয। পুরুষ-চবিত্রদের জন্যে আমরা খুলে রেখেছি বুদ্ধিব বৈঠকখানা। নারী-চরিত্রদের জন্যে অকপট অথবা অ-কপাট অন্দবমহল। মজা এটাই যে. শুধু পাঠক সমাজের গণ্ডিতেই আটকানো নয় তাঁব নারী-চরিত্রদের আদর-আপ্যায়ন। বঙ্কিম সাহিত্য নিয়ে এতাবৎ গুরুগম্ভীর যত আলোচনা-সমালোচনা-সমীক্ষা, সেখানেও পুরুষরা পার্শ্বচরিত্র, প্রধান ভূমিকায় নারীরা। সেখানে পুরুষদেব জন্যে ব্যাখ্যা, আর নারীদেব জন্যে বন্দনা গান। হাতের সামনে সুলভ অজস্র বইয়ের যে-কোনো একটা টেনে নিয়ে পাতা ওলটাই যদি মিলে যাবে এর সমর্থন। প্রমথনাথ বিশী-র 'বাংলা সাহিত্যের নরনারী'। সেখানে আলোচিত হয়েছে, বঙ্কিমের সাতটি চরিত্র। সেই সাতের পাঁচটাই নারী। পুরুষ মোটে দুটি। তারাও আবার জাতে-ওঠা জবরদস্ত চরিত্র নয় কোনো। একজন কমলাকান্ত। অপরজন, মুচিরাম গুড়।

আমরা এখন তাকাতে পারি তাঁর নারী-প্রীতির ভিন্ন একটা দিকেও। তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা ১৪। তার মধ্যে ৭টার নামই উপন্যাসের নায়িকাদের নামে। ওই সাতের মধ্যে ব্যতিক্রম শুধু একটি। দুর্গেশনন্দিনী। এটা নাম নয়। কিন্তু নায়িকা-চরিত্রেরই বিশেষণ। এমন-কি উপন্যাস রচনায় তাঁর সর্বপ্রথম যে-উদ্যম, যা তিনি মাতৃভাষার বদলে লিখেছিলেন ইংরেজিতে, সেই 'রাজমোহনস ওয়াইফ'-ও বুঝিয়ে দেয় যে আসলে, ওই আদি উপন্যাসেই নারী চরিত্রের উন্মোচনই ছিল তাঁর মৌল অভিপ্রায়। আর নামকরণের মধ্যে দিয়ে সেটার দিকেই তাঁর ইঙ্গিত। বঙ্কিমচন্দ্র নবনারীর প্রণয়কে আলিঙ্গনে জড়িয়েই লিখে চলেছেন কবিতার পর কবিতা। বেরোচ্ছে প্রধানত সংবাদ প্রভাকর-এ। এই বছরে অর্থাৎ ১৯৫৩-র জানুয়ারিতে বেরলো 'হেমন্ত বর্ণনাছলে স্ত্রীর সহিত পতির কথোপকথন'। সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তখন উঠতি অথবা উদীয়মান তরুণদের 'ফ্রেন্ড ফিলজফার অ্যান্ড গাইড'। অন্যভাবে বেত্রহস্ত শিক্ষকও। তাই কবিতা ছাপার পর তরুণতর কবিদের উৎসাহ জোগাতে, ভুল শুধরিয়ে দিতে, পথনির্দেশ বাতলে দিতে, ছাপা কবিতার নীচে ছাপিয়ে দিতেন নিজের মন্তব্য। এবারে অল্প কথায় লিখছেন— 'উৎকৃষ্ট।'

১০ জানুয়ারি

'সংবাদ প্রভাকর'-এ বেরলো বঙ্কিমের কবিতা 'হেমন্ত বর্ণনাছলে স্ত্রীর সহিত পতির কথোপকথন।'

পতি

লঘু ত্রিপদী

রাখ রাখ প্রিয়ে, বসনে ঢাকিয়ে,
জলদ চাঁচর চয়।
দেখে জলধর, ভয়ে শশধর,
হুতাশেতে ম্লান হয়।।

পতির দীর্ঘ গৌরচন্দ্রিকার পর নারীর প্রশ্ন

যে ছিল তখন, খর বিলক্ষণ,
যখন শারদ দিবা।
এ যে দিনপতি, তেজে ক্ষীণ অতি,
তাহার কারণ কিবা।।

পতির উত্তর

দ্বাদশ তপন, বিহরি গগন,
বিতরিত খর কর।
কিন্তু খসি পরে, দশ দিবাকরে
গেল তব নখোপর।।

প্রশ্ন আর উত্তরের উচ্ছল অনর্গল প্রবাহ। নারীর প্রশ্নে প্রকৃতির রূপান্তর নিয়ে কৌতূহল। পতিব উত্তরে নারী-প্রকৃতিই যাবতীয় বিবর্তনের উৎস ও মোহানা।
কবিতার শেষে সম্পাদকের মন্তব্য ছিল—'উৎকৃষ্ট'।

৫ ফেব্রুয়াবি
'সংবাদ প্রভাকর'-এ বেরলো বঙ্কিমের কবিতা 'শিশির বর্ণনাছলে, স্ত্রী-পতির কথোপকথন।' অনেকটা আগের কবিতারই পুনরাবৃত্তি। একই ক্লান্তিকর প্রশ্নের ক্লান্তিকর উত্তব।
কবিতার শেষে সম্পাদকের মন্তব্য—

> "বঙ্কিমচন্দ্রের বিবচিত কবিতাব সুবঙ্কিম ভাব কৌশল সকল অতিশয় সন্তোষজনক, ইনি রূপক বর্ণনাস্থলে নায়ক-নাযিকাব কথোপকথন ছলে যে-সমস্ত প্রগাঢ় ভাব ব্যক্ত কবেন তদ্দৃষ্টে সুপণ্ডিত ভাবুক মাত্রেই প্রীত হইয়া থাকেন। ইনি অতি তরুণ বয়সে অতি প্রাচীন সুবসিক জনের ন্যায় মন হইতে অতি আশ্চর্য নূতন ভাবসকল উদ্ভূত কবিতেছেন। এ অংশে ইঁহার প্রশংসা বর্ণনে বর্ণাবলী বলহীনক, ফলে এই স্থলে একটি অনুরোধ এই যে, বঙ্কিম পদ্য রচনায আব সমুদয বঙ্কিম করুন, তাহা যশের জন্যই হইবে, কিন্তু ভাবগুলীর প্রকাশার্থ যেন বঙ্কিম ভাষা ব্যবহাব না করেন, যত ললিত শব্দে পদ বিন্যাস কবিতে পারিবেন ততই উত্তম হইবেক। এবং এবে, কবয়ে, ছেনু, গেনু ইত্যাদি প্রাচীন কবিগণের প্রিয় শব্দগুলীর পরিহাব করিতে পাবিলে আরো ভালো হয। অপিচ প্রতিনিযতই আদি রসের সেবা না করিয়া এক একবাব অন্য রসের উপাসনা করা কর্ত্তব্য হইতেছে, তাঁহার পদ্য অস্মাদির অন্তঃকরণ প্রেমাভিষিক্ত কবিযা থাকে এজন্য অবিলম্বে আদ্য ছাড়িয়া অপর কোন রসেব এক প্রবন্ধ প্রেবণ কবিবেন।"

'সংবাদ প্রভাকর' যে তখনকার উঠতি কবিদের পাঠশালা আর ঈশ্বর গুপ্ত যে পাঠশালার স্নেহভাবাতুর অথচ বেত্র-হস্ত পণ্ডিত, উপরের টীকা তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। যদি এমন মনে কবা হয় যে, নিজেব হাতে ছাপাখানা আর পত্রিকা পেয়ে গিযেই দূববর্তী ছাত্রদেব নিযে খুলতে পেবেছিলেন এমন পাঠশালা. তাতে সত্য থাকবে হযতো কিছুটা, কিন্তু আংশিক সত্য। ঈশ্ববগুপ্তেব আগে ছাপাখানা ছিল, পত্রিকা ছিল, পত্রিকা-সম্পাদকেব ছিল কবিতায অনুরাগ।ছিল না যা, তা একটা নবীন কবি বা লেখক সমাজেকে নেতৃত্ব দানের সদিচ্ছা অথবা সংকল্প। কিন্তু তাঁব কবিতাময় অস্তিত্বের ক্রিয়া-পবিধি শুধু এইটুকু উদ্যমের মধ্যেই আটকে থাকাব মতো সংক্ষিপ্ত নয় বলেই আমরা দেখতে পাব, ঠিক এর বিপরীত দিকেও তাঁর সমান আগ্রহ আব শ্রম। অর্থাৎ প্রয়াত, লুপ্ত প্রাচীন কবি ব্যক্তিত্বের পুনরাবিষ্কারেব দায়টাও চাপিয়ে নিয়েছিলেন নিজেব কর্তব্যপরাযণ কাঁধে। প্রাচীন কবিদের জাগরণের সমান্তরালে নবীন কবিদের নির্মাণ, এই ছিল দ্বিমুখী কর্মধারা। সম্ভবত এও ছিল তাঁর গভীর প্রত্যাশা যে, নবীন কবিবা হয়ে উঠুক তাঁদেব সমসমযের ভাষ্যকার, শুধুমাত্র নারীদেহ নিয়ে বিগলিত প্রেমের কবিতার কৃতী লেখক হয়ে ওঠার বদলে। তেমন অভীপ্সা না থাকলে বঙ্কিমের কবিতার নীচে অমন সম্পাদকীয় মন্তব্য থাকার কথা নয়। ঐ মন্তব্যের শেষে যে প্রবন্ধের উল্লেখ, তা কিন্তু আজকেব অর্থের প্রবন্ধ নয়। তখন কবিতাও সম্বোধিত হত প্রবন্ধ নামে।

১৭ ফেব্রুয়ারি

ঈশ্বর গুপ্তের অনুরোধ অথবা নির্দেশনামার পরও, সেদিকে কান না পেতেই বঙ্কিম আবার লিখলেন তাঁর সেই আগের ঘরানারই কবিতা 'দূরদেশ গমনের বিদায়'। এখানেও পতি-পত্নীর কথোপকথন। এখানেও সেই আদি রসের সেবা। পুনরুক্তিময় ফেনানো আবেগ।

পতি

ললিত

একবার দেখি আর, দেখি দেখি এইবার,
দেখি ফিরে বিধুমুখ, দেখি আঁখি ভরি লো।
আজিকার নিশীভোরে লয়ে যাবে কোথা মোরে,
কতদিন তোমা বিনে রহিব কি করি লো।

ইত্যাদি

স্ত্রী

ত্রিপদী

কেন আরে বিভাবরি, পোহাইল মরি মরি,
পোহাইল দিবারে যাতনা।
কেন যে যামিনীভাগে, স্বপ্নে জানিবার আগে,
কেন কেন মরণ হলো না।

ইত্যাদি।

সম্পাদক মন্তব্যহীন।

মার্চ

হেড মাস্টার হিসেবে হুগলি কলেজ থেকে ঢাকায় বদলি হয়ে গেলেন ব্রেনান্ড সাহেব। তাঁর কাজ কিছুদিন ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আর ক্লারমণ্ট সাহেব। পরের বছরে ব্রেনান্ডের জায়গায় যোগ দেবেন ডি ফ্রুগু। অবশ্য শারীরিক অক্ষমতার জন্যে কাজ করতে পারবেন না বেশিদিন।

১৪ মার্চ

'সংবাদ প্রভাকর'-এ ঐতিহাসিক কবিতা প্রতিযোগিতার সূচনা, দীনবন্ধু মিত্রের কবিতা দিয়ে। কবিতার নাম 'বিজয় কামিনী' সে দীর্ঘ কবিতার শুরুর কয়েকটি পঙক্তি—

কাঞ্চননগরাধিপ রাজা সদাশয়।
বিজয় নামেতে তাঁর একই তনয়।।
অপরূপ রূপ তাঁর সুগুণ অশেষ।
ধর্মশীল নীতিবেত্তা, নাহি পাপ লেশ।।
বেড়েছে বয়স তবু নাহি করে বিয়ে।
সকলে বিনতি করে বিয়ের লাগিয়ে।।

প্রতিযোগিতা শুরুর আগে এখানে কোনো পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছিল কিনা জানা যায়নি। তবে এই তারিখে প্রতিযোগিতার সূচনা করে প্রভাকর-সম্পাদক লিখেছিলেন—

"হিন্দু কালেজের সুপাত্র, ছাত্র শ্রীযুত দীনবন্ধু মিত্র, হুগলি কালেজের ছাত্র শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণনগর কালেজের ছাত্র শ্রীযুত দ্বারকানাথ অধিকারী, এই ছাত্রত্রয়ের বিরচিত গদ্যপদ্য পরিপূরিত তিনটি প্রবন্ধ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, এই সকল রচনা কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ও সংশোধন না করিয়া অবিকল প্রকাশ করণে প্রবৃত্ত হইলাম। আমাদিগের সহযোগিগণ এবং গুণগ্রাহক গ্রাহক ও পাঠকগণ বিশেষাভিনিবেশ পূর্ব্বক দৃষ্টি করিয়া যাঁহার রচনা যেরূপে ও যেভাবে উৎকৃষ্ট বোধ হইবেক, তাঁহাকে সেইরূপে সেইভাবে পুরস্কৃত করিবেন। আমবা এ বিষয়ে অগ্রে কোন কথাই উল্লেখ করিব না। সদ্বিদ্বান সজ্জন সমূহের বিবেচনার্থে অর্পণ করিলাম, ইহাতে কোন মহাশয় কিরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন তাহা জ্ঞাত হইয়া পরিশেষে স্বাভিমত প্রকাশে উৎসুক হইব। হিন্দু কালেজ সকল কালেজের প্রধান, সুতরাং এই কালেজের পাঠার্থি প্রণিত প্রবন্ধ প্রথমেই প্রকাশ করা কর্ত্তব্যবোধে মিত্র মিত্রেব পদ্য অদ্য সানন্দচিত্তে পত্রস্থ কবিতেছি, সকলে অনুকম্পাপূর্ব্বক নয়নান্তপাত করুন।"

১৫ মার্চ

দীনবন্ধুব ঐ একই কবিতাব পববর্তী অংশ বেবলো 'সংবাদ প্রভাকর'-এ।

১৬ মার্চ

'সংবাদ প্রভাকব'-এ বেবলো দ্বারকানাথ অধিকাবীব গদ্যে-পদ্যে মেশানো বচনা—'সত্যবতী‹ সহিত পাপিনীব বিবাদ'। আরম্ভেব কয়েকটি পঙক্তি—

"পূর্ব্বকালে বিশ্বপুবে বিশ্বেশ্বব নামে এক পবম কারুণিক ও ন্যায়বান অধীশ্বব ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছাবতী নাম্নী পবম রূপবতী এক মহিষী ছিল, তদীয় গর্ভে বাজাব এক কন্যা ও এক পুত্র জন্মে। রাজার কুমাব ও কুমাবী বদন-সুধাকব সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হওত দুহিতার নাম সত্যবতী ও পুত্রের নাম ধর্মরাজ বাখিলেন।"

রচনাব আরম্ভে ছিল প্রভাকব-সম্পাদক-এর মন্তব্য—

"অদ্য কৃষ্ণনগর কালেজের সুশিক্ষিত ছাত্র শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ অধিকারীব প্রণীত গদ্য পদ্য পরিপূরিত প্রবন্ধ প্রকাশারম্ভ হইল, পাঠক মহাশয়েরা মনোযোগ পূর্ব্বক দৃষ্টি করুন।"

১৭ মার্চ

'সংবাদ প্রভাকর'-এ বেবলো দ্বারকানাথ অধিকারীর আগের দিনের বচনার পরবর্তী অংশ। আরম্ভেব কযেকটি পঙক্তি—

পাপিনীর উক্তি

দীর্ঘ ত্রিপদী

কে তুমি কাহার নাবী, বদন করিয়া ভাবি,
বসি আছ নিজ অভিমানে।
আমার পতির ভরে, দেবতা কিন্নর মরে,
আসিতে না পারে এইখানে।।
মাথা হেঁট করি রহ, ডাকিলে না কথা কহ,
ভাবে বুঝি নাহি চিনো মোরে।
ঘুচাইব অভিমান, কেটে লযে নাক কান,
বিদায় করিয়া দিব তোরে।।"

১৮ মার্চ

প্রতিযোগিতার শেষ কবিতা হিসেবে 'সংবাদ প্রভাকর'-এ বেবলো বঙ্কিমের কবিতা 'কামিনীর প্রতি উক্তি'। এ কবিতার আরও একটা নাম 'তোমাতে লো ষড়ঋতু'। ভবতোষ দত্ত তাঁর 'ঈশ্বরগুপ্তের জীবন চরিত ও কবিত্ব'-য় অনুমান কবছেন দীনবন্ধুব একটি কবিতাব ছায়াপাত ঘটেছে এখানে।

"লক্ষ্য করিবার বিষয় দীনবন্ধুর কবিতা 'দম্পতী প্রণয়'-এব জায়গায় বিজয বলছে

রূপসী রমণী হোলে মনে ধন্য মানে।

ষড়ঋতু দেখে কেহ, কামিনী বযানে।।

এতে অনুমান হয বঙ্কিমচন্দ্রেব কবিতাটি দীনবন্ধু আগেই দেখেছিলেন। এটাও সত্য যে দীনবন্ধু তখন কলকাতায, আব বঙ্কিম নৈহাটিতে। দুজনেব সাক্ষাৎ-পবিচয় তাহলে এই সময থেকেই।"

বঙ্কিমেব নিজেব কথা অবশ্য অন্যবকম

"দীনবন্ধু হেযাব স্কুল হইতে হিন্দু কলেজে যান এবং তথায় ছাত্রবৃত্তি গ্রহণ কবিযা কয় বৎসব অধ্যযন কবেন। তিনি কলেজেব একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিযা গণ্য ছিলেন। দীনবন্ধুব পাঠ্যাবস্থাব কথা আমি বিশেষ জানি না, তৎকালে তাঁহাব সঙ্গে আমাব সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না।"

'দম্পতী প্রণয' আব 'বিজয কামিনী' একই কবিতা, এই কবিতা প্রসঙ্গে বঙ্কিম—

"দীনবন্ধু প্রভাকবে 'বিজয কামিনী' নামে ক্ষুদ্র উপাখ্যান কাব্য প্রকাশ কবিযাছিলেন। নাযকেব নাম বিজয়, নাযিকাব নাম কামিনী। তাহাব, বোধ হয, দশবাব বৎসব পবে 'নবীন তপস্বিনী' লিখিত হয। 'নবীন তপস্বিনী'-র নাযকেব নাম বিজয, নাযিকাও কামিনী। চবিত্রগত, উপাখ্যান কাব্য ও নাটকেব নাযক-নাযিকাব মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই। এই ক্ষুদ্র উপাখ্যান-কাব্যখানি সুন্দর হইয়াছিল।"

বঙ্কিমের কবিতার শুরুর কয়েকটি পঙক্তি—

অপরূপ দেখি একি শবীবে তোমাব।
এক ঠাই ষড়ঋতু কবিছে বিহাব।।
নিদাঘ, বরষা আর শবদ হেমন্ত।
নিবখি শিশিব আর দুবন্ত বসন্ত।।

৩০মার্চ

'সংবাদ প্রভাকর'-এ বেবলো বঙ্কিমের কবিতা 'চন্দ্রদূত'। প্রথম কযেকটি পঙক্তি—

দ্বিযাম যামিনী যায় আ মবি কি শোভা তায,
নিবখি নির্মল নদীতীবে।
নিরমল নীলকাশ সীমা বিনা সুপ্রকাশ
মাঝে হেবি মধুব শশিরে।

কবিতার শেষে সম্পাদকের মন্তব্য ছিল না কোনো।

এপ্রিল

এই বছর থেকে পালটে যায় স্কুলেব সেসন। ১ মে থেকে শুরু। ৩০ এপ্রিলে শেষ। তাই এ বছরের এপ্রিলেই পরীক্ষা দিতে হয়েছিল বঙ্কিমকে।

৬ এপ্রিল

তিন কবির কবিতা ছাপিয়ে প্রভাকর-সম্পাদক মতামত চেয়েছিলেন পাঠক সমাজেব কাছে। সেই সূত্রে পাওয়া প্রথম চিঠি ছাপা হল এই তারিখে। পত্রলেখক নিজের নামের জায়গায় লিখেছিলেন— 'আমি প্রবাসি প্রভাকর পাঠক'। সে দীর্ঘ চিঠিব অংশবিশেষ—

> "...আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে কৃষ্ণনগব কালেজের ছাত্র-বাবুর রচনার অভিপ্রায় অতি সুন্দব, কারণ তাঁহার বচনাব মধ্যে সত্যবতী ও পাপিণীর কথোপকথন উপলক্ষে অনেক সদুপদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং বাস্তবিক ভারতবর্ষে এইক্ষণে যে প্রকার পাপাচার হইতেছে তিনি তদুপলক্ষে ছলক্রমে তাহা বর্ণনা করিযা সাধারণের হৃদযঙ্গম করিবার চেষ্টা কবিযাছেন এবং অবশ্য বলিতে হইবেক তাঁহাব বচনার আদ্যন্তের শৃঙ্খলাও তিনি উত্তমরূপে বক্ষা কবিযাছেন।... হিন্দু কালেজেব ছাত্র শ্রীযুত বাবু দীনবন্ধু মিত্র ও হুগলি কালেজের ছাত্র শ্রীযুত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ইঁহাবা উভযেই আদ্যবসেব কবিতা বর্ণনা করিযাছেন, মিত্রবাবুব বচনাব লালিত্যের কথা কি কহিব, অতি আশ্চর্য্য মধুর রচনা হইযাছে এবং আদ্যবস বর্ণনায যে সকল তাৎপর্য্য আবশ্যক কবে তাহা তিনি সুন্দবভাবে বক্ষা কবিযাছেন, আদ্যবস কবিতাব মধ্যে অতি কোমল রস, ইহাতে কদাপি গুরুতব শব্দের ভাব সহ্য হয় না এবং যেমত কোন লজ্জাশীলা কুলকামিনী তাহাব আপন সৌন্দর্য্য প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়া শতগুণে তাহাব গৌবব বৃদ্ধি কবে এবং লজ্জাহীনা বাববিলাসিনী কামিনী আপন সৌন্দর্য্য ব্যক্ত কবিতে গিযা তাহার গৌরব নষ্ট কবে ও জনসমাজে নিন্দিতা হয সেইরূপ আদ্যবসেব কবিতাব ভাব যত প্রচ্ছন্নভাবে থাকে ততই বমণীয় হয।... বঙ্কিমবাবুব কবিতাব ছটা বিলক্ষণ হইয়াছে, এক স্ত্রী অঙ্গে ষড ঋতু বর্ণন বড সামান্য ব্যাপাব নহে, ইহাতে বিলক্ষণ কবিতা প্রকাশ পাইযাছে এবং শব্দবিন্যাসও মন্দ হয নাই,..."

১১ এপ্রিল বিশ্বম্ভব দাসবসু-ব চিঠি বেবলো 'প্রভাকব'-এ। এই পত্রিকারই লেখক। কবিতা ছাপা হয়েছে মাঝে মাঝে।

> "হিন্দু কালেজীয় সুশিক্ষিত ছাত্র শ্রী দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়েব প্রণীত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এমন বোধ হয় যে উক্ত মহাশয মনস্তত্ত্ব শাস্ত্রে সুশিক্ষিত হইয়াছেন, কারণ স্বীয প্রবন্ধ মধ্যে মনের রূপ বর্ণনাচ্ছলে ঐ বিদ্যাব বাহুল্য পবিচয দিযাছেন, সুতবাং তাঁহার ভাষাও মনস্তত্ত্ববিদ্যাব ন্যায আমাব পক্ষে সহজ নহে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে বসোল্লেখ করিযা আপনার বসিকতা ও কবিতা শক্তি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ কবিযাছেন তাহার সন্দেহ নাই।
>
> হুগলি কালেজস্থ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত পদ্য পাঠে তাহার সুকোমল ভাব সন্দর্শন কবিযা বোধ হয যে উক্ত ব্যক্তি যদ্যপি আমারদিগের সুসময়ে ভারতভূমিতে জন্ম গ্রহণ কবিতেন তবে তিনি সুকবি কবিকঙ্কণ কিংবা রায় গুণাকবেব ন্যায অত্যল্পকালের মধ্যেই গুণাকব হইয়া উঠিতেন, কিন্তু এসময়েও তিনি সকলেব আদরণীয় হইতে পারেন, যদ্যপি ভাষাপক্ষে আপনাব নামের গুণ না প্রকাশ করেন, অতএব আমার অভিপ্রায় এই যে তাঁহার ভাবসকল উত্তম বটে, কিন্তু তাঁহার ভাষা কোনমতেই তেমন নহে। এক সন্দেহ এই যে তিনি কালিদাস প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের প্রকাশিত ভাবসকল হবণ কবিযা স্বজাতীয় ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, তথাচ তাহাকে কবিত্ব বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

কৃষ্ণনগর কালেজস্থ ছাত্র শ্রীদ্বারকানাথ অধিকারি বিরচিত গদ্য-পদ্য পরিপূরিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া হর্ষসাগরে মগ্ন হইলাম, তিনি আপনার অসাধারণ কবিতা শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন ও অতি সরল ভাষায় আপনার মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাহা একবার মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছেন তিনি মরণকাল পর্য্যন্তও তাহা বিস্মরণ হইতে পারিবেন না, অধিকারি মহাশয়ের কবিতা তাঁহার অন্তঃকরণ মধ্যে মুদ্রাক্ষরের ন্যায় চিরকাল মুদ্রাঙ্কিত থাকিবেক তাহার সন্দেহ নাই, আর অধিকারি মহাশয় যে সংপূর্ণ রূপে কবিতা শক্তির অধিকারী হইয়াছেন তাহা তাঁহার কবিতা পাঠ করিয়া ক্ষণকাল বিবেচনা করিলেই অবধারিত হইতে পারে, কারণ তিনি অতি সুন্দর কৌশলে ও সহজ ভাষায় স্বদেশের দুরবস্থা স্বজাতিদিগের সম্মুখে প্রকাশ করিয়াছেন, অতএব তাঁহাকে সর্ব্বমতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিতে হইবেক তাহার সন্দেহ নাই।"

১২ এপ্রিল

এবার ঐ কবিতা-প্রতিযোগিতা নিয়ে নিজেই কথা বলতে এগিয়ে এলেন প্রভাকর-সম্পাদক।

"হিন্দু কালেজ, হুগলি কালেজ এবং কৃষ্ণনগর কালেজের ছাত্র সকল গদ্য পদ্য রচনায় বিশিষ্টরূপে মনোযোগি হওয়াতে আমরা অত্যন্ত সুখি হইয়াছি, তাঁহারদিগের রচিত বিষয় সকল সর্ব্বদাই উৎসাহপূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া থাকি। তৎপাঠে অনেকেই সন্তুষ্ট হয়েন, মধ্যে তিন কালেজের তিনজন ছাত্রের তিনটি প্রবন্ধ যাহা গত ২ চৈত্র অবধি ৬ চৈত্র পর্য্যন্ত পাঁচ দিবসের প্রভাকরে প্রকটিত হইয়াছে, বোধ করি তাহা পাঠক মাত্রেরই মনোরঞ্জন হইয়া থাকিবে, কারণ তরুণবয়স্ক ছাত্রদিগের দ্বারা এ সময়ে এতদপেক্ষা রচনার অধিক পারিপাট্যের আর কি প্রত্যাশা করা যাইতে পারে ? ঐ বালকেরা যদ্রূপ লিপিনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছে অনেক সম্পাদকের দ্বারা তদ্রূপ হয় কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে।"

১৪ এপ্রিল

'সংবাদ প্রভাকর'-এ বেরলো কুণ্ডী, রঙ্গপুরের জমিদার কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী-র চিঠি। সে-চিঠির শেষাংশ—

"যাহা হউক, আমি এই স্থলে প্রফুল্লচিত্তে প্রকাশ করিতেছি, হিন্দু কালেজের বিদ্যার্থি শ্রীযুত দীনবন্ধু মিত্রের বিরচিত কবিতার ভাব অতি উৎকৃষ্ট। কৃষ্ণনগর কালেজের পাঠার্থি শ্রীযুত দ্বারকানাথ অধিকারির গদ্য পদ্য প্রসাদগুণ বিলক্ষণ আছে এবং ভাষাও অতি কোমল, সুতরাং সর্ব্বতোভাবেই শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। বর্তমানকালের নানা ঘটনা লেখাই কবিদের উচিত কর্ম্ম। হুগলি কালেজের ছাত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পদ্য অতি উত্তম বটে; কিন্তু ভাব কিছুই নতুন নহে। ঋতুসংহার প্রভৃতি গ্রন্থ দর্শন করিলেই জানিতে পারিবেন, তখন তাঁহাকে প্রশংসা করিতে হইবেক। পরন্তু আমি যে বিষয়ে প্রীত হইয়াছি, সেই বিষয়ে প্রেমপাত্র ছাত্রকে প্রেমপূরিত অনুরাগ সহযোগে যথাসম্ভব পারিতোষিক প্রদানের কল্পনা করিয়াছি, তাহা অবিলম্বেই মহাশয়ের কাছে প্রেরিত হইবে।"

ঐ সংখ্যাতেই প্রভাকর-সম্পাদকের মন্তব্য—

"সর্ব্বপ্রিয় বিদ্যানুরাগি সুকবি রায়চৌধুরী মহাশয়ের পত্র সন্তোষপূর্ণ কৃতজ্ঞচিত্তে প্রকটনপূর্ব্বক উল্লেখ করিতেছি যে, ইনি জগদীশ্বরের যথার্থ করুণা ও প্রসন্নতা লাভ

করিয়াছেন। কাবণ, ইনি যেমন নানাবিধ সৎপ্রবন্ধ রচনাদ্বারা মনের সার্থকতা করিতেছেন, সেইরূপ আবার বহুপ্রকার সৎকর্ম্মে সদ্ব্যয় ও সৎপাত্রে দান দ্বারা ধনের সার্থকতা করিতেছেন। কলিকাতা হইতে রঙ্গপুর প্রায় একমাসের পথ হইবে। কালীচন্দ্রবাবু তথা হইতে এখানকাব সমাচারপত্র, বিদ্যালয় এবং আর আর দেশহিতজনক ব্যাপারে যথাসাধ্য সাহায্য করণে ক্রটি করেন না বিশেষত বিদ্যাঘটিত বিবিধ ব্যাপাবে অচল অনুবাগ দৃষ্টি করত আমরা নিয়তই পরম তুষ্টিলাভ করিতেছি।

হে যুবক লেখকগণ। তোমবা এই সময়ে কালীচন্দ্রবাবুকে ধন্যবাদ প্রদান কর। তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হও। এবং অভিমানকে সর্ব্বপ্রকারে খর্ব্ব করত গদ্য পদ্য রচনায় যথাযোগ্য যত্ন কব। তোমবা এ বিষয়ে যত পারদর্শিতা প্রকাশ কবিবে ততই দেশহিতার্থি সজ্জন সমাজে পুবস্কৃত হইবে।"

কালীচন্দ্র বাযচৌধুবী একই সঙ্গে দেশপ্রেমিক আব কবি। বংপুব জমিদাব বাডিব ছেলে। মফঃস্বলে ছাপাখানাব প্রতিষ্ঠা, আর সেখান থেকেই 'বংপুর বার্তাবহ' নামের সাপ্তাহিক পত্রিকাব প্রকাশ তাঁরই উদ্যোগে-আগ্রহে। যে-বছবে, 'পাষণ্ড পীড়ন' বন্ধ হয়ে যাওযার পব, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বের কবলেন নতুন সাপ্তাহিক 'সংবাদ সাধুরঞ্জন', সেই বছবেব অর্থাৎ ১৮৪৭-এব আগস্টেই রংপুব থেকে বেবোয় ঐ পত্রিকা। সম্পাদক ছিলেন, গুরুচরণ বায, তাঁব মৃত্যুব পব সম্পাদক নীলাম্বব মুখোপাধ্যায। সিপাহী বিদ্রোহেব সময লর্ড ক্যানিং-এব মুদ্রাযন্ত্র-বিষযক আইনেব বেডাজালে জডিযে বন্ধ হযে যায ঐ পত্রিকা, ঠিক দশ বছব পূর্তিব বছবে। ১৮৫৭-ব ১৭ অগাস্টেব 'সংবাদ প্রভাকব'-এ খবর—

"ছাপাযন্ত্রেব স্বাধীনতা নাশক আইন প্রচার হইবায় রঙ্গপুর বার্তাবহ পত্র উঠিয়া যায।"

শাস্ত্রবিরোধী ভেবে নিযে বংপুবে যখন স্ত্রীশিক্ষাব বিরুদ্ধেই বইছে প্রবল হাওযা 'বংপুব বার্তাবহ' তখন স্ত্রীশিক্ষার প্রচারে উদ্যোগী। গোপালপুবে যখন প্রথম খোলা হল বালিকা বিদ্যালয়, কালীচন্দ্রেব পবিবাবের শিক্ষিকা মেযেই শিক্ষকতাব দাযিত্ব নিযেছিল সেখানে। বালিকাদেব জন্যে পাঠ্যপুস্তক প্রথম লেখানো হল সেখানে। কালীচন্দ্র বিজ্ঞাপন দিযে আব পুবস্কাব ঘোষণা কবে লিখিযেছিলেন 'পাতিব্রত্য' নিয়ে রচনা। পঞ্চাশ টাকা পুবস্কাব পেযেছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক রামনাবাযণ তর্করত্ন। সংবাদ প্রভাকরে বেরিয়েছিল তাঁর লেখা একাধিক গান। অনেকগুলো বই-এবও লেখক তিনি। গীতমালা, পেমাবসাষ্টক ছাড়াও 'কাব্যসেবধি' নামে কাব্যতত্ত্বের একটা বইযেও হাত দিযেছিলেন বলে জানা যায়। তার উপক্রমণিকা ছাপা হয়েছিল 'সংবাদ প্রভাকব'-এ। কিন্তু বইটা শেষ পর্যন্ত বেরয়নি বলেই অনুমান।

বাংলাদেশে কালীচন্দ্র বায়চৌধুরীর সমাজচেতনা অথবা সাহিত্য-চেতনা স্মবণীয হয়ে আছে আবও বড়ো একটা কাবণে। পঞ্চাশটাকা পুবস্কার ঘোষণা করে তিনিই 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটক লিখিয়েছিলেন ঐ রামনারায়ণ তর্করত্নকে দিয়েই। রামনারায়ণের ঐ নাটকই বাংলা ভাষায় প্রথম মৌলিক নাটক।

২৮ এপ্রিল

'সংবাদ প্রভাকর'-এ বেরলো বঙ্কিমের কবিতা 'বসন্তের নিকট বিদায়'। আরম্ভের কয়েকটি পঙ্ক্তি—

হা বসন্ত মনোহর, হা মোহন রূপধর
হা রে হৃদি বিচঞ্চলকর।
লইয়ে রূপের ভাব, কেন কর পরিহার,
এ মহী মণ্ডল মনোহর।

সম্পাদক মন্তব্যহীন।

২৫ মে

'সংবাদ প্রভাকর'-এ বেরলো দীনবন্ধু মিত্রের কবিতা, 'সত্যের মহিমায় পাপের পরাজয়'। এর আগের কোনো একদিনে বেরিয়েছিল দ্বারকানাথ অধিকারীর সেই কবিতা, যা দিয়ে 'সংবাদ প্রভাকর'-এ 'কালেজীয় কবিতা যুদ্ধ'-র সূচনা। সূচনাকারী যে দ্বারকানাথই, তা স্বীকার করে নিয়েছেন তিনিই, 'কালেজীয় কবিতা যুদ্ধের সন্ধিপত্রে'।

"এই ঘৃণিত বিবাদের সত্রপাত আমা হইতেই হয়, এজন্য আমি ইহাতে সম্পূর্ণ দোষী তাহা স্বীকার করিয়া উক্ত কবি ভ্রাতাদের বিশেষত মিত্র মিত্রের নিকট মার্জ্জনা প্রার্থনা করিতেছি।"

কালেজীয় কবিতা যুদ্ধ সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী, তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজে'—

"তখন প্রভাকরে উত্তর-প্রত্যুত্তরে কবিতা লেখা যুবক লেখকদিগের একটা মহা উৎসাহের ব্যাপার ছিল। এই সকল বাকযুদ্ধ কালেজীয় কবিতা যুদ্ধ নামে গ্রথিত হইয়াছে।"

দীনবন্ধুর কবিতার আরম্ভের কয়েকটি পঙ্ক্তি—

দীর্ঘ ত্রিপদী

দিবস হইল শেষ,
নাহি কোথা রুদ্রলেশ,
দিবাকর বসিবেন পাটে।
হেন কালে সরোবরে,
শোভা হেরে মনোহরে,
মহিলারা জল লয় ঘাটে।।
বিমল কমল হাসে,
আর রাজহংস ভাসে,
পাশে পাশে প্রিয়া হংসী যায়।
ষটপদ মনোসুখে,
পদ্মিনীর মধুমুখে,
চুম্বনেতে মকরন্দ খায়।।

২৭ মে
বঙ্কিম লিখলেন 'বিচিত্র নাটক'।
(তিন মিত্রের কথোপকথন)

প্রথম মিত্র

কি বিষাদে মুখখানি, হাসি-ভরা নাই।
বেনা-বনে বোসে কেন, উঠ উঠ ভাই।

দ্বিতীয় মিত্র

দেখিয়া দেশের গতি, কেঁদে মবি মনে।
সে দুখে বসিয়া আছি, বিরস বদনে।।

তৃতীয় মিত্র

সখা বে বচন ধব, মিছা দুখ পরিহর
নিজসুখে সুখী হও ভাই।

জুন
বেবলো দ্বাবকানাথেব কবিতা (আংশিক)।

১৪ জুন
কালীচন্দ্র বাযচৌধুবীব পাঠানো পুবস্কারেব টাকা এসে পৌঁছে গেছে প্রভাকব-সম্পাদকের কাছে। সেইসঙ্গে ঐ রংপুবেরই তুষভাণ্ডারেব জমিদার রমণীমোহন বায়চৌধুরীর কাছ থেকে এসেছে সমান পরিমাণ টাকা। প্রভাকব-সম্পাদক জানাচ্ছেন—

> "রঙ্গপুবের অন্তঃপাতি তুষভাণ্ডারের সুবিখ্যাত বিদ্যানুরাগী যুবক জমিদাব বাবু রমণীমোহন বাযচৌধুরী মহাশয উত্তম গদ্য পদ্য বচনা জন্য কৃষ্ণনগর কালেজেব ছাত্র দ্বারকানাথ অধিকারিকে ১৫৲; হিন্দু কালেজের ছাত্র দীনবন্ধু মিত্রকে ১০৲ এবং হুগলি কালেজের ছাত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যাযকে ১০ টাকা পারিতোষিক প্রদানার্থ আমারদিগের হস্তে মুদ্রা অর্পণ করিয়াছেন। ঐ জিলাব কুণ্ডি পবগনাব ঐ ঐ বাবু কালীচন্দ্র রাযচৌধুরী মহাশয় ঐ ছাত্রত্রয়কে ঐ ঐ।"

২৫ জুলাই
বেরলো দ্বারকানাথ অধিকারীব লেখা, 'সরস্বতীর খেদ ও দ্বিতীয় বরপুত্রের সহিত কথোপকথন। আরম্ভের অংশবিশেষ—

দীর্ঘ ত্রিপদী

পুত্রে করি বর দান দেবী নিজ বাসে যান
তথা তাঁর মায়ার উদয়।
আকুল হইয়া অতি আপন সখার প্রতি
কহিছেন করিয়া বিনয়।।

এই দীর্ঘ কবিতাতেই 'শহুরে কবি', 'বুনো কবি' এই দুটো বিদ্রুপাত্মক সংজ্ঞার ব্যবহাব। শহুরে কবি, দীনবন্ধু। বুনো কবি, রচয়িতা নিজেই।

৯ অগাস্ট

'সংবাদ প্রভাকর'-এ দীনবন্ধুর কবিতা. 'চোকে আঙুল দিয়া বুঝাইযে দিই'।

আরম্ভেব গদ্যাংশ—

"নির্ম্মলবর্ণা সবলতা দেবীর পবিত্র ক্রোড়ে শযনপবাযণ হইয়া তদীয প্রাণাধিক প্রাণপুত্র সবল কবি স্তন্যপানে সুমধুব নম্রতারূপ পযঃ পান কবিযা মাতৃগুণ প্রদর্শনপূর্ব্বক সাধাবণেব মনোরঞ্জন কবিযা আসিতেছিলেন। কিন্তু নবনিচযেব সুখ্যাতি শশাঙ্ক সম্যক নিষ্কলঙ্ক হয না। একদা সবলতা সুকুমাব কুমাবকে গৃহে বাখিযা দিবসত্রয জন্য তীর্থ পর্যটনে গমন কবিলে তাঁহাব সপত্নী হিংসা দেবী অবসবক্রমে সেই স্থানে আগমন কবিযা সবল শিশুব সবল বসনায গবল দান করিলেন, যেহেতু একপে উভয পবেব অনিষ্ট এবং বালকেব অমঙ্গল হওনেব সম্ভাবনা।..."

কবিতাংশেব আরম্ভ—

হিংসা

বজনী হইল ঘোব,
নাড়ী ছেঁড়া ধন মোব,
এখনো এলনা কেন ঘবে।
পোড়া জন্ম কুলনাবী,
বাহিব হইতে নাবি,
না পাবি ডাকিতে উচ্চৈঃস্ববে।

৯ সেপ্টেম্বব

বেবলো দ্বাবকানাথেব গদ্য-পদ্য মেশানো বচনা, 'অসভ্য ও তদীয পালক পুত্রের বৃত্তান্ত'। আবম্ভেব অংশবিশেষ—

পযাব

প্রবল প্রতাপশালী, অসভ্য রাজন।
সসাগরা ধরা নিজে, করিল্ শাসন।।
তাহার সখের ছিল দুই পাট-রাণী।
অবিদ্যা একের নাম, দ্বিতীয়া দুর্ব্বাণী।।
পতির হইল প্রিয়ে, দ্বিতীয়া কামিনী।
মনের হরিষে থাকে, দিবস যামিনী।।"

গদ্যাংশেব আরম্ভ—

> "এইরূপ দুর্ব্বাণী রানীকে জননী আর অসভ্যকে জনক সম্বোধন করিয়া কবিবর তাহাদিগের পরম স্নেহাস্পদ ও সমস্ত ঘরের সোহাগ হইয়া বসিল। অসভ্য রাজা স্বীয় প্রাণপণে সুশিক্ষিত করিয়া আপনার ভার লাঘবের নিমিত্ত তৎপ্রতি রাজকার্য পর্য্যালোচনার ভার সমর্পণ করিল। এইসময়ে সভ্য নামক এক রাজা একদল সৈন্যের সহিত আগমন করত বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়া ক্রমে ক্রমে আপনার জয় পদবী বিস্তার করিতে লাগিলেন..."

এই কবিতায়, শহুবে আব বুনো ছাড়া আবও এক কবিকে আসরে টেনে আনলেন তিনি, চট্টো কবি।

কবিতাব যেখানে শেষ সেখানে সবাসবি 'হে মিত্র' সম্বোধনে অনেকখানি ব্যক্তিগত আবেদনময় গদ্য। দীনবন্ধুর দিকে তাকিযেই এই অংশটি লেখা।

> "হে মিত্র, বাবম্বার এরূপ বিচিত্র করিয়া আর স্বীয় কলেজের সুখ্যাতি বিস্তার করিবেন না, ঈশ্ববেব পবম পবিত্র প্রেমলাভ বিষয়ে যত্নবান হউন। আমি আপনাব রাজ্য যে অভিপ্রাযে আক্রমণ কবিয়াছিলাম, তাহাব তাৎপর্য গ্রহণ কবিতে না পারিয়া আপনি স্বীয় বচনা মধ্যে কতকগুলী কটুবাক্য প্রয়োগ কবিয়াছেন, সে ভালই, রাহু সূর্যদেবকে গ্রাস করিলে তাহার মানের হানি হয় না, বরং রাহুকে সকলে ঘৃণা কবে। আপনি অসভ্যতা বিষযে উত্তমরূপ সুশিক্ষিত হইয়াছেন, ও বিষযে আপনাব সহিত সংগ্রাম কবা মাদৃশ লোকের উপযুক্ত নহে, অতএব বিনীতভাবে নিবেদন সাম্প্রতি আর ঈদৃশ দুর্ব্বাক্যবাণ প্রহার করিবেন না, আমি বিশেষরূপে জ্বালাতন হইযাছি, ভাবিয়া দেখুন ইহাতে উভয়েবই মূঢ়তা প্রকাশ ব্যতীত অন্য গৌরব নাই, যদি পুনবায় আপনি এ বিষযে প্রবৃত্ত হযেন, আমি তাহাব উত্তর প্রদান না কবিয়া কেবল করুণাকর ঈশ্ববের নিকট এইমাত্র কহিব, যথা 'নীচ যদি উচ্চভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে'।"

১৭ সেপ্টেম্বর

'বর্ষা বর্ণনাচ্ছলে দম্পতীব বসালাপ' নামে প্রভাকবে যে কবিতা বেরলো বঙ্কিমের, তার সঙ্গে 'কালেজীয় কবিতা যুদ্ধ'-র সম্পর্ক নেই কোনো। কবিতা যুদ্ধে অংশ নেবেন আবো দশ দিন পরে। এই কবিতাব আবম্ভেব খানিকটা—

দেখি কি হে ভযঙ্কব গবজিযে গব গর
ব্যাপিল গগনে নবঘনে।
নবনীল নিরুপম অর্দ্ধ তপস্বিনীসম
দুলিছে দামিনী ক্ষণে ক্ষণে।

২৭ সেপ্টেম্বর

কবিতা যুদ্ধে অংশ নিয়ে বঙ্কিমের দীর্ঘ কবিতা। নাম—

কালেজীয় কবিতায় মাবামারি *

বিষম 'বিচিত্র নাটক'

অর্থাৎ

কবিদের মজলিস এবং ঐ নাটক দর্শন।

পাদটীকায় স্টার চিহ্নের ব্যাখ্যা—

"শুনিতে পাই প্রভাকরে নাকি দুটো বীব আসিযা বড যুদ্ধ আরম্ভ কবিযাছে। একটা না কি আবার আশে পাশে কামড় মাবিতে আরম্ভ কবিযাছে, বেশ আমিও এইবাব এই সময সাহেবদের সেলাম ঠুকিযা যাই কিন্তু নিজে বীর নহি, যুদ্ধ কবিব না, চডটা চাপডটা মারামারিই ভাল।"

এই কবিতা বেবনোর আগে তিন পক্ষে চাপান-উতোব চলেছে এইভাবে— দীনবন্ধু দ্বাবকানাথকে বলছেন

কোথা যাও কবি ভাই, ভাবিতে ভাবিতে।
আমরা পেবেছি কিন্তু, তোমায চিনিতে।।
ব্যানা বনে বাস তব, বুনো কবি নাম।
বিলাতী তালেব গাছ, ভাব দেখে থাম।।

আবাব বঙ্কিম তাঁর কবিতায দ্বাবকানাথের মুখে তুলেছিলেন এই বকম সংলাপ—

অনিত্য সকল সুখ, নিত্য কাবে বলি।
সকল সংসার সুখ, স্বপন কেবলি।

দীনবন্ধুব মুখে তুলে দিলেন তাই নিযে ঠাট্টা—

এখন হে জানিলাম, স্বপ্নে কত সুখ।
এস মিত্র স্বপ্নে মোবা, ঘুচাইব সুখ।

দ্বাবকানাথ তাঁব 'সবস্বতীব খেদ' কবিতাব এক জাযগায কথা বলাচ্ছেন সবস্বতীব সঙ্গে দীনবন্ধুর। সেখানে দীনবন্ধুব সংলাপ—

কবি মিত্র বলে আর, কহিযা কি কবি
ইচ্ছে হয জননী গো, বিষ খেযে মবি।
বুনো কবি নাম ধবে, বেনাবনে বাস
আমাব কবিতা বত্নে, কবে উপহাস।

ক্রমশ দেখা যায দীনবন্ধুব উপবই দ্বাবকানাথেব বাগটা বেশি।

বঙ্কিম তাব এবাবেব কবিতায, অথবা নাটকে, তিন কবি অর্থাৎ বুনো কবি, মিত্র কবি, চট্টো কবি ছাড়াও চবিত্রলিপিতে জুড়ে দিলেন আবও কিছু কুশীলব, যেমন বিদ্যা, কুবিদ্যা আব কবি ঈশ্বব।

সে-কবিতাব শেষাংশেব কথোপকথন, কুবিদ্যাব প্রস্থানেব পব—

বিদ্যা

কেন বাছা তোবা সবে, কলহ কবহ।
ভাই ভাই ভাবে সদা, ভাই ভাই বহ।।
সকলে একত্রে মোবে, আবাধনা কব।
সকলেই উপদেশ, দেন অধীশ্বব।।
সদাই সদ্ভাবে তবে, কেন না চলহ।
কি কাবণে কব সবে, কেবল কলহ।।

মিত্র
তাই আমি কতবার, বুঝায়ে লিখেছি।
তার ফল গালাগালি, কেবল দেখেছি।।

অধিকারী
আমি তো দিইনে গালি, ওদের দুজনে।
শুধু কবিশ্রেষ্ঠ আমি, জেনে মনে মনে।।
করিলাম অপরূপ, স্বপন রচনা।
জগতেরে জানাবারে, নিজ গুণপনা।।

বিদ্যা
কিসে তুমি শ্রেষ্ঠ কবি, নিজ মনে লাগে।
কবিতা কাহাকে বলে, বল দেখি আগে।।

অধিকাবী
যে জন মিলায শব্দ, সুকোমল ভাষে।
সেই তো সুকবি বলি, আপনা প্রকাশে।।

বিদ্যা
তা নয় কবিতা বাছা, তা নয তা নয়।
রামাযণ পোড়ে কত, সুকবি না হয়।।
মুগ্ধ যদি, প্রকৃতির, মোহন বদন।
যেই মনোমত ভাবে, কবে দরশন।।
সুখ দুখ বিপু রসে, হৃদয় মাঝাব।
প্রকৃতির মোহসনে, জন্মে যে বিকার।।
যেই ভাষে সেই ভাব, স্বরূপ প্রকাশে।
যে ভাষে আপনা সনে, হৃদয় সম্ভাষে।।
যথার্থ কবিতা সেই, সদা মোহময়।
শুধু বাম রাম বলা, কবিতা তো নয়।।
কিন্তু রাম নাম তুমি, ছাড়িবে না দেখি।
বতে প করিয়ে কবি, কয় যত ঢেঁকি।।
সত্য কবিতায় রাগী, যতন বিশেষ।
কবি ঈশ্বরের ঠাঁই, কহ উপদেশ।।

এমন কি হতে পারে, কবিতা প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার পাওয়ার পরিণামেই দ্বারকানাথের উপর দীনবন্ধু আর বঙ্কিমের যৌথ আক্রমণ? কিন্তু আক্রমণ তো নয়। একে তো বলতে হয় প্রতি-আক্রমণ, যদি মেনে নিতে হয় দ্বারকানাথের স্বীকারোক্তি।

৩ অক্টোবর

'সংবাদ সাধুরঞ্জন'-এ বেরবে বঙ্কিমের কবিতা 'শরদ্বর্ণনচ্ছলে দম্পতীব কথোপকথন'।

২৪ অকটোবর

ঐ 'সংবাদ সাধুরঞ্জন'-এই বঙ্কিমের আর-এক কবিতা 'বসন্ত বর্ণনাচ্ছলে দম্পতীর কথোপকথন'।

সাহিত্য সংসদ থেকে বেরনো বঙ্কিম রচনাবলীতে কবিতা দুটো ছাপা হয়নি। এর পরেও কবিতা লিখবেন তিনি। কিন্তু ছাপাতে দেবেন না কোনো পত্রিকায়।

নভেম্বর

হুগলি কলেজ থেকে বদলি হয়ে কৃষ্ণনগর কলেজে চলে গেলেন ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁব জায়গায় এলেন জে. সি. বীনল্যাণ্ড। কৃষ্ণনগর কলেজের পড়াশোনার ধরন-ধাবণ নিয়ে অনেক কথা শুনিয়ে গেছেন উমেশচন্দ্র দত্ত। 'পুরাতন প্রসঙ্গ' থেকে তার খানিকটা—

> "কলেজে রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট দিন কতক 'Paradise Lost' পড়িয়াছিলাম। তাঁহার পড়াইবার ধরন ছিল এক বকমের। কেতাবের ভাষা ব্যাখ্যা করার দিকে তাঁহাব আদৌ লক্ষ্য ছিল না। কোনও একটা text অবলম্বন করিয়া তিনি বক্তৃতা দিয়া যাইতেন। যা হাতে ছেলেরা সুচরিত্র হইয়া উঠে, সেইরূপ উপদেশ তিনি দিতেন। তাঁহাব অধ্যাপনায় তখন free thinking-এর ভাব খুব প্রকাশ পাইত।...রামতনু বাবুর ভাই শ্রীপ্রসাদবাবু ইংরাজি reading পড়িতেন খুব ভাল ; তিনি কলেজে কাপ্তেন রিচার্ডসনের আবৃত্তি শুনিতে যাইতেন। রামতনুবাবু যখন আমাদের শিক্ষক হইয়া আসিলেন, তখন প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন রচফোর্ট (Rochfort); হেডমাষ্টার ছিলেন হ্যারিসন (Harrison); গণিতের অধ্যাপক ছিলেন ব্রাডবেরি (Bradbury); সেক্ষপীয়র পড়াইতেন বীনল্যান্ড সাহেব ; একটি শ্লোকে ছেলেরা অধিকাংশ শিক্ষকের নাম লিপিবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল—
>
> সেক্ষপীয়র পড়াতে বীন্ল্যাণ্ড।
> বীট্সনের নাই জ্ঞান কাণ্ড।।
> বীন্ল্যাণ্ডেব লম্বা দাড়ি।
> তা'র নীচে রামতনু লাহিড়ী।।
> রামতনু লহিড়ী সদাশয়।
> তা'র নীচে দয়াল রায়।।
> দয়াল রায়ের নাড়ী পট্কা।
> তার নীচে গুরো হট্কা।।"

ছাত্রদের বানানো ছড়ায় ঈশানচন্দ্রও আছেন, যখন তিনি বহবমপুর কলেজেব প্রধান শিক্ষক।—

> Hard সাহেব Head of ।
> তার নীচে কেরানডফ।।
> কেরানডফের ভালো চেন
> তার নীচে বাবু ঈশেন।
> ঈশানবাবু দেখতে সিঙ্গী।
> তার নীচে গেগ্রী ফিরিঙ্গি।।

হুগলি কলেজের এই ঈশানচন্দ্র সম্বন্ধেই বঙ্কিমের যা-কিছু শ্রদ্ধা।

> "আমি আপন চেষ্টায় যা কিছু শিখেছি। ছেলেবেলা থেকে কোন শিক্ষকের কাছে কিছু শিখিনি। হুগলী কলেজে একটু আধটু শিখেছিলাম ঈশানবাবুর কাছে।"

হুগলি কলেজের জন্ম মুহূর্ত থেকে ঈশানচন্দ্র এই কলেজের সঙ্গে জড়িয়ে। সম্পর্ক ছিঁড়েছে, আবার জোড়াও লেগেছে অল্প পরেই। হুগলি কলেজের শুরুতে ছিলেন তৃতীয় শিক্ষক। 'সমাচার দর্পণ' লিখেছিল ১৮৩৬-এর ১৬ জুলাইয়ে—

> "প্রায় তিনমাস হইল উক্ত শ্রীযুক্ত পরমোপযুক্ত ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সোমাদ্দাব সুবিচক্ষণ, সজ্জন, স্বধর্মপরায়ণ মহাশয় দ্বয়ের অধ্যয়নাকূল্যার্থে এতৎ পাঠশালাব শিক্ষক পদাভিষিক্ত করিয়া এতৎস্থলে প্রেরণ করিয়াছেন তাহাতে তদবধি ইঁহাদের বিচক্ষণতা ও স্বধর্ম্মপরায়ণতা ও পরিশ্রমের আতিশয্যতা শ্রবণে এতদ্দেশীয় গণ্যমান্য মহাশয়েবা স্বয়ং বালকগণের তত্তৎ সন্নিধানে সমর্পণ কবাতে, অধুনা পঞ্চবিংশতি জন ছাত্রেরও অধিক সমাগম হইয়াছে।"

ঈশানচন্দ্র প্রসঙ্গে 'দি ইংলিশম্যান'—

> "He was then entrusted with the founding of the Hoogly College, Mohammed Mohosin's Institution, which has made much progress as to be, at present, fit to be considered one of the pillars on which the fabric of the University of this Presidency now rests. He successfully completed an examination for teachership with European candidates, and obtained promotion to the chair of the headmaster, a position never before filled by any of our countrymen."

এই ঈশানচন্দ্রকে যে হুগলি কলেজ ছেড়ে বহরমপুরে চলে যেতে হয়েছিল, তার পিছনে ছিল ইংবেজ-শিক্ষকদেব ষড়যন্ত্র। ১৮৫০-এ 'দা হিন্দু ইনটেলিজেন্সার'-এ হুগলি কলেজেব প্রধান শিক্ষক গ্রেভস আর অধ্যাপক ব্রেন্যান্ড সম্বন্ধে ছাপা হয় বেশ আক্রমণাত্মক অভিযোগ। ইংরেজ শিক্ষকেরা ধরে নিল, এর পিছনে রয়েছে ঈশানচন্দ্রের উস্কানি। তাদের এই অনুমানেব কাবণ, ঠিক সময়ে ঠিকমতো পদোন্নতি না-ঘটার জন্যে ঈশানচন্দ্র আব তাঁব ছোটোভাই মহেশচন্দ্র কিছুটা হতাশ এবং ক্ষুব্ধ। ১৮৫৮-য় ব্যাপারটা চূড়ান্ত সীমায পৌঁছে গেল, যখন হুগলি কলেজের সেকেন্ড ক্লাসের ছাত্ররা তাদের শিক্ষক Mr. Ure-এর সঙ্গে অশোভন আচবণ করে বসল। ইংরেজ মহল তো চটলই। এমন-কি অধ্যক্ষ কার সাহেব সমস্ত দোষটা চাপিযে দিলে ঈশানন্দ্রের উপর। তারপরই তাঁকে বহরমপুরে বদলি করে দেওয়াব সুপাবিশ। বহবমপুরে পাঁচ বছর কাটিয়ে ১৮৬৪-র গোড়ায় আবার ফিরে এসেছিলেন হুগলি কলেজে, প্রধান শিক্ষক হয়ে। ১৮৭২-এর জানুয়ারি পর্যন্ত সেখানেই। তারপর অবসর। আর সে জাযগায় এলেন বেভারেন্ড লালবিহারী দে।

১৮৫০-এর আগেই ঈশানচন্দ্র আর Thwaytes -এব উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এই কলেজকে নিযে 'Historical Register of the College' লিখবার। তাঁরা লিখেওছিলেন। কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক, তা বই হয়ে ছাপা হয়নি। ফলে হুগলি কলেজের আদি পর্বের ইতিহাস রয়ে গেল অপ্রকাশিতই।

ঈশানচন্দ্র লিখতেনও নানা কাগজে। লিখতে জানতেন তিনটে ভাষায়। ইংরেজি, বাংলা আর ফরাসি। লিখতেন ইন্ডিয়ান মিরর, ইন্ডিয়ান খৃশ্চান হেরান্ড, রেইস অ্যান্ড রায়ত, ইণ্ডিয়ান নেশন, হিন্দু পেট্রিয়ট, স্টেটসম্যান, ইংলিশম্যান, পাইওনিয়ার, বেঙ্গলী, বেঙ্গল হরকরা, সংবাদ প্রভাকর আর ফরাসি ভাষার কাগজ 'লা—পাতি'-তে। 'বেঙ্গল হরকরা'-তেই

বেরিয়েছিল তাঁর প্রবন্ধগুচ্ছ — The spirit of Native Press'। লিখতেন ছদ্মনামে। আবার অনেক লেখাই স্বাক্ষরহীন।

"He devoted his whole time to literary persuits and was largely connected with the press being a regular contributor to some of the dailies of his time under the 'nom de plume' of 'Zorin'.

বঙ্কিম কিন্তু কোনোদিন ঈশানচন্দ্রকে ইংরেজির শিক্ষক হিসেবে পাননি। ১৮৫৩-র নভেম্বরে চলে গিয়েছিলেন কৃষ্ণনগর কলেজে। আবার ফিরে এসেছিলেন যখন ১৮৫৬-র জানুয়ারিতে, তারপর মাত্র ৬ মাস ছিলেন ঐ কলেজে।

প্রধানত ইংরেজির অধ্যাপক হলেও, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, বিজ্ঞান জাতীয় বিষয়েও শিক্ষক হিসেবে প্রমাণ দিয়েছেন তাঁর অসামান্য দক্ষতার। শিক্ষা বিভাগের রিপোর্টে তাঁর সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। যুবরাজ এডওয়ার্ড যখন কলকাতায়, ঈশানচন্দ্রের অধ্যাপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে বিস্ময় তাঁর দুচোখে। 'রেইস অ্যান্ড রায়ত' লিখেছিল তাঁর সম্পর্কে—

"He was one of the Bengalee who before the Universities were established distinguished themselves by their proficiency in the English Language. As an old Calcutta Reviewer, he wrote English like an accomplished Englishman."

অক্ষয়চন্দ্র সরকার-এর 'বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম গদ্য রচনা' প্রবন্ধে ঈশানচন্দ্র সম্পর্কে বঙ্কিমের মন্তব্যের বিরোধিতা।

"বঙ্কিমের কোনো কোনো চরিত লেখক বলিতেছেন যে, হুগলি কলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হইতেই বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজি শিক্ষা করেন। আমি বলি, না। কেন বলি না তাহা বুঝাইতে গেলে কেবল খুঁটিনাটিতেই আমার প্রবন্ধ পুরিয়া যাইবে। সে তো ভালো হইবে না, 'চরিত' লেখক নিজেই বলিতেছেন,—বঙ্কিমবাবু ৫৭ সালে বি. এ. পরীক্ষা দেন, আর ঈশানবাবু ১৮৬৪ সালে হুগলি কলেজের হেডমাষ্টার পদে নিযুক্ত হন। তবে ঈশানবাবুর কাছে বঙ্কিম শিখিলেন কবে?"

পুরোপুরি স্মৃতির উপর নির্ভর করতে গিয়েই অক্ষয়চন্দ্রের লেখায় এমন ভ্রান্তি। লেখার আগে হুগলি কলেজের ইতিহাসটা জেনে নিলে পা পড়ত না ভুল মন্তব্যের গর্তে। হুগলি কলেজিয়েট স্কুল, যাকে বলা হয়েছে—

"An institution which functioned as part of Hooghly College সেখানে হেড মাষ্টারের যে তালিকা তা এই রকম

J H Cooper - Aug 1836 to July 1840
M Rochfort - July 1840 to July 1844
Eshan Chandra Banerjee (offg) Aug 1844 to Oct 1844
J Graves Nov 1844 to April 1856
Eshan Chandra Banerjee (offg) April 1856 to June 1856
W Brennand (offg.) June 1856 to Oct 1856
Eshan Chandra Banerjee (offg) Oct 1856 to Nov 1856

১৭ নভেম্বর

'কালেজীয় কবিতা যুদ্ধ' শেষ হওয়ার মুখে। দীনবন্ধু লিখলেন এই যুদ্ধের শেষ কবিতা, 'হাতে হাতে পাপের ফল'। দীর্ঘ রচনা। তাই বেরলো দু সংখ্যায়। শুরুর অংশ—

"এদেশের পাপাচার করিলে বিচার।
পরিতাপ তাপে হয় হৃদয় বিকার।।
বিধিবৈধ বিধি যাহা হয় অনুমান।
তাহার আবার দোষে না হয় বিধান।।

শিশুকালে পরিণয় হোলে সম্পাদন।
কতরূপ ঘটে মন্দ, কে করে গণন।।
আরো তায় বিদ্যাহীন হয় যদি নারী।
অনিষ্ট উদয় কত বলিতে না পারি।।"

পয়ার অংশের পর ত্রিপদী—

কিছুদিন তারপর।
স্মর-শরে স্বর স্বর,
থরথর কলেবর কাঁপে।
একে সরস্বতী বাম,
তাহাতে উদয় কাম,
পাপোদয় দ্বিগুণ প্রতাপে।।

ত্রিপদীর পর আবার পয়ার।

এই তারিখে ঠিক কতখানি অংশ বেরিয়েছিল, তা জানার উপায় নেই।

১৮ নভেম্বর

প্রভাকর-এ বেবলো দীনবন্ধুর 'হাতে হাতে পাপের ফল' কবিতার শেষাংশ। পয়ার শেষ হতে চলেছে। তারই মধ্যে দুলাইন সংস্কৃত শ্লোক—

আত্মছিদ্রং না জানাসি পরচ্ছিদ্রানুসারিণী।
জারস্যার্থে পতিং হত্বা জলে তিষ্ঠতি নগ্নিকা।।

এরপর আবার দুলাইন পয়ার। তারপর শেষ পর্যন্ত টানা গদ্য। গদ্যাংশটা সরাসরি বুনো কবি অর্থাৎ দ্বারকানাথকে সম্বোধন করে—

"আমাদের বুনো কবিটি প্রায় চঞ্চলার মত চপল। আপনার দোষে অন্ধ কি পরের দোষে তাঁহার চারটি চক্ষু, বিবাদ কখন একজনে সম্ভবে না, এক হস্তে কখন তালি বাজে না, প্রস্তরের সহিত ইস্পাতের সংযোগ ব্যতীত কখন অনল উৎপত্তি হয় না। আমার যত দোষ তিনি তাহা গত পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার দোষ আছে কিনা আমি বলিতে চাহিনা, যথার্থ বিচারকগণের নিকট কিছুই অবিদিত থাকিবেক না।

কবিবর এরূপ কলহ কবিতে আমাকে নিরস্ত হইতে লিখিয়াছেন, সুখের বিষয় বটে, কিন্তু তিনি কি জানেন না যে আমি অনেক দিন বিবাদ বাড়বানলে সরলতা সলিল সেচন করিযাছি, তাঁহার তো উপদেশ দেওয়া নয়, উপদেশ ছলে মনের ঝাল মিটান, গালাগালির সহিত উপদেশ প্রদান কবা কিরূপ সভ্যতা তাহা আমরা 'অসভ্য' কিরূপে বুঝিতে পারিব।...

আপনার অল্প বয়সে এত আত্মাভিমান কেন, ইহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না। তুমি কি বিবেচনা করিয়াছ তুমি সূর্য আমি রাহু,আপনার কি নিশ্চয় বোধ হইয়াছে, আমি নীচ আপনি সুবোধ, মহাশয় কি যথার্থ জানিয়াছেন মাদৃশ লোকেরা আপনার যোগ্য নয়। এ সকল জাগ্রদবস্থায় স্বপ্নে আপনার দৃঢ় প্রত্যয় হইয়া থাকিবে নতুবা সাধারণ পত্রে প্রকাশ করিতেন না। যদ্যপি 'নীচের' কথা হাস্য করিয়া না উড়ান তবে মহাকবি কালিদাসের অভিমান-শূন্যতার বিষয় শ্রবণ করুন, তিনি রঘুবংশের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন, যেমন বামন উন্নত পুরুষ-প্রাপ্য ফল গ্রহণাভিলাষে বাহু প্রসারণ করিয়া উপহাসাস্পদ হয়, সেইরূপ অক্ষম আমি কবিতা কীর্ত্তিলাভে অভিলাষী হইয়াছি, উপহাসাস্পদ হইব। দ্বারি বাবু আর একটি অনুরোধ, এই শ্লোকটি পড়িবেন।

দিব্যং চ্যূতফলং প্রাপ্য ন গর্ব্বং যাতি কোকিলঃ।
পীত্বা কর্দ্দমপানীয়ং ভেক মকমকায়তে।।
সুন্দর রসাল পেয়ে কোকিলের কুল।
কখন না হয় তারা গর্ব্বেতে আকুল।।
ভেকের স্বভাব দেখ ভাবিয়ে অন্তরে।
কাদা জল খেয়ে গর্ব্বে মক মক করে।।

তোমাকে আর শুনাইতে চাহি না কারণ অধিকক্ষণ 'নীচের' কথা শুনিলে আপনার গৌরবের হ্রাসতা হইতে পারে...

যাহা হউক, তাঁহার গালাগালি মনে না করিয়া তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিলাম, কারণ গালাগালির সহিত উপদেশ থাকিলে উপদেশের মহত্ত্ব যায় না, চৌরে যদ্যপি চুরি করিতে নিষেধ করে, তবে কি এ নিষেধ প্রামাণ্য করা উচিত হয় না, নীচ লোকে যদ্যপি মুদ্রা দান করে তবে কি মুদ্রার মূল্য কম হয়? নারিকেলের মালস্থ অমৃত পান করিলেও অমর হওয়া যায়। এই সকল বিবেচনা করিয়া তাঁহার গালাগালির উত্তর না দিয়া তাঁহার সদুপদেশ অবলম্বন করিলাম, কারণ তাঁহার মন্দ কথায় রাগান্ধ হইয়া যদ্যপি সৎকথা না শুনি তবে Shakespeare আমাকে বলিবেন 'You are one of those, that will not serve God, if the devil bid you"

এই রচনার পরই যুদ্ধ শেষ। এর পরে সন্ধিপত্র। আর সে সন্ধিপত্র দ্বারকানাথের লেখা। বেরবে পরের বছরের শুরুতে।

হুগলি কলেজে পড়ছেন যখন তখনই, কলেজের পড়ার বাইরে, বঙ্কিম মন দিয়ে শিখতেন আর-একটা জিনিস, সেটা সংস্কৃত। হুগলি কলেজে সংস্কৃত শেখানো হতো না। আরও সঠিক বলতে গেলে সংস্কৃত তখনকার কোনো স্কুল-কলেজেই ছিল না পাঠ্যসূচীর তালিকায়। ব্যতিক্রম, সংস্কৃত কলেজই শুধু। ১৮৫৭-য় কলকাতায় গড়া হল বিশ্ববিদ্যালয়। বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে যেভাবে পড়ানো হয় গ্রীক ল্যাটিন জাতীয় প্রাচীন ভাষা, এখানেও সেইভাবে সমাদর জানানো হবে সংস্কৃতকে। এর ৭ বছর পরের নতুন আইনে হুগলি কলেজে তৈরি হয় একজন সহকারী সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ, ১৫০ টাকা মাইনেয়। প্রথমে একমাস অস্থায়ীভাবে এই পদে ছিলেন গোবিন্দচন্দ্র শিরোমণি। পরে স্থায়ী অধ্যাপক হয়ে যোগ দেন গোপালচন্দ্র গুপ্ত। সেই ইয়ং বেঙ্গলের যুগ থেকে, ইংরেজির উপরই ছাত্র সমাজের নাড়ীর টান। সংস্কৃত বিরোধিতা নয়, এই সংস্কৃত-বিমুখতার পিছনে ছিল অবশ্যই ঐতিহাসিক একটা পরিমণ্ডল। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়বে নতুন কালের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে রাজা রামমোহনের সুপারিশ। কলকাতায় যখন 'সংস্কৃত কলেজ' গড়ার পরিকল্পনা চলেছে তখনই তিনি লর্ড আমহার্স্টকে লেখা চিঠিতে জানিয়েছিলেন—

"...এদেশীয়দিগকে অজ্ঞতার অন্ধকারে রাখা যদি গবর্ণমেণ্টের আকাঙ্ক্ষা ও নীতি হয়, তাহা হইলে প্রাচীন সংস্কৃত ভাষাতে শিক্ষা দেওয়ার ন্যায় তাহার উৎকৃষ্টতর উপায় আর নাই। তৎপরিবর্তে এদেশীয়দিগের উন্নতিবিধান যখন গবর্ণমেণ্টের লক্ষ্য, তখন শিক্ষা বিষয়ে উন্নত ও উদারনীতি অবলম্বন করা আবশ্যক, যদ্দ্বারা অপরাপর বিষয়ের সহিত গণিত, জড় ও জীববিজ্ঞান, রসায়নতত্ত্ব, শারীর-স্থান বিদ্যা ও অপরাপর প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানাদির শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। যে অর্থে এখন প্রস্তাবিত কার্যে ব্যয় করিবার অভিপ্রায় করা হইয়াছে তদ্দ্বারা ইউরোপে-শিক্ষিত কতিপয় প্রভাবশালী ও জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলে ও ইংরাজি শিক্ষার একটি কলেজ স্থাপন করিলে ও তৎসঙ্গে

পুস্তকালয়, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি, প্রয়োজনীয় পদার্থ সকল দিলেই পূর্বোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।"

নিজে সংস্কৃত ভাষায় আর প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়েও, কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের বিরোধিতা করে ইংরেজি শিক্ষার কলেজ গড়ার জন্যে সুপারিশ করেছিলেন একটা পিছিয়ে-থাকা দেশকে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন-সদিচ্ছা থেকেই। রামমোহন তাঁর এই ইংরেজি চিঠিটি লিখেছিলেন ১৮২৩-এর ডিসেম্বরে। আর রামমোহনের ব্যক্তিগত প্রতিবাদ সত্ত্বেও কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ গড়ে উঠেছিল এর পরের বছরেই। তাতেও সমস্যা মেটেনি। কারণ ততদিনে এদেশের বুদ্ধিজীবী সমাজ ভাগাভাগি হয়ে গেছে দুদিকে, শিক্ষার পদ্ধতি-প্রকরণ নিয়ে। একদল সংস্কৃতের পক্ষে। অন্যদল ইংরেজির। ভাগ হয়ে গেছে ইংরেজ রাজ-সম্প্রদায়ও। তাদের যে পক্ষ সংস্কৃতের দিকে তারা, Orientalists, অর্থাৎ সংস্কৃতপন্থী। অন্যপক্ষ Anglicists, অর্থাৎ ইংরেজিপন্থী।

এখানে মনে রাখতে হবে আরও একটা কথা। ইংরেজি শিক্ষাকে ইংরেজ শাসকেরা চাপিয়ে দিতে চায়নি আমাদের ঘাড়ে। ভারতবর্ষে তাদের শাসন আর শোষণের শিকড়টাকে শক্ত আর সুদূরপ্রসারী করে তুলতে চেয়ে তারা উৎসাহ জোগাতে চেয়েছিল আরবি, ফারসি আর সংস্কৃতের চর্চাকেই। এমন-কি এদেশের আচার-ব্যবহার, ঐতিহ্য, সামাজিক সংস্কার, সতীদাহ, বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ, এসবের কোনোটার উপরই তারা ব্যবহার করতে চায়নি নিজেদের ক্ষমতা অথবা সিদ্ধান্ত। কলকাতায় ইংরেজি শিক্ষার পীঠস্থান হিসেবে তৈরি হল যে হিন্দু কলেজ, যে হিন্দু কলেজ থেকে জন্ম নিল পরবর্তীকালের বিপ্লবী ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী, সেও কিন্তু বাঙালী বুদ্ধিজীবী আর বেসরকারি ইংরেজদের ব্যক্তিগত আগ্রহে। ১৮১৬-র ১৪ মে হিন্দু কলেজ গড়ার অভিপ্রায়ে সমবেত হয়েছিলেন কলকাতার ৫০ জনের বেশি ধনী, মানী, আর সম্ভ্রান্ত হিন্দু প্রধানেরা। আরও আশ্চর্য, তার ভিতরে কয়েকজন ছিলেন খ্যাতনামা সংস্কৃত পণ্ডিতও। আর ঐ সভাতেই প্রতিশ্রুত অর্থের পরিমাণ পৌঁছে গিয়েছিল ৫০ হাজার টাকায়। আরবি-ফারসির প্রদীপে তেল এসেছে ফুরিয়ে। সংস্কৃত আর জোগাতে পারছে না যথাযথ আলো, সামাজিক উত্তরণের এই সন্ধিক্ষণের অন্ধকারে। এখন প্রয়োজন ইংরেজি ভাষার সঙ্গে নিবিড় সৌহার্দ। তা নইলে আত্মোন্নয়ন, বিত্ত অর্জন, সামাজিক মর্যাদা অর্জন, আধুনিক বিদ্যা অর্জন, অসম্ভব। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর চাপ থেকেই ১৯৩৫-এ ইংরেজ সরকার বাধ্য হল তাদের নতুন শিক্ষানীতি ঘোষণায়। ফারসিকে সরিয়ে রাজভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেল ইংরেজি। মেকলে, গভর্নর জেনারেলের আইন সভার সদস্য, এদেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনে নায়কোচিত ভূমিকা যাঁর, তাঁর শিক্ষা-বিষয়ের ঐতিহাসিক 'মিনিট' পেশ করলেন ১৮৩৫-এর ফেব্রুয়ারিতে। জানালেন—

> **'We shall see the strongest reason to think that, of all foreign tongues, the English tongue is that which would be the most useful to our native subjects.'**

এই সেই মেকলে, যাঁর উদ্ধত কণ্ঠস্বরে শোনা গেছে এদেশের প্রাচীন ভাষা সম্পর্কে নিতান্তই শ্রদ্ধাহীন কটূক্তি, তাঁর ঐ 'মিনিটে'ই।

> **"I have no knowledge of either Sanskrit or Arabic. But I have done what I could to form a correct estimate of their values. I have read translation of most**

celebrated Sanskrit works... Who could deny that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India."

আবার এই সেই মেকলে যিনি তাঁর শিক্ষানীতি ঘোষণার সময় মনে মনে স্বপ্ন দেখেছিলেন আসন্ন-সম্ভব এক মধ্যশ্রেণীর উদ্ভব, যাদেব ভূমিকা হয়ে উঠবে শাসক আর শাসিতের মধ্যে বিশ্বস্ত 'interpreter'-এর। তারা হয়ে উঠবে, তাঁর ভাষায়—

"Indian in colour and blood. English in taste. in opinions. in morals. and in intellect."

মেকলের এই ভবিষ্যৎবাণী আমাদেব দেশের জল-হাওয়ায় শেষ পর্যন্ত কী চেহারা পেয়েছিল, তাব বিশ্লেষণে একালের একজন বুদ্ধিজীবী—

"লক্ষ্য কবার বিষয় যে, মেকলে রাজনীতিগত ভাবে ইংবেজ শাসনের অনুগত একটি শিক্ষিত শ্রেণীব অভ্যুদয় যেমন আকাঙ্ক্ষা কবেছেন, তেমনি বুদ্ধিবৃত্তি ও নৈতিকতাব প্রশ্নে তাদেব উন্নতমানেব কথাও ভেবেছেন। ইংবেজি শিক্ষার কুফল বশতঃ এদেশে অল্পবিদ্যা সম্বল চাকুবীলোভী, বেতন গ্রহণপটু ইতবরুচি বিশিষ্ট যে বাবু-শ্রেণীব আবির্ভাব ঘটেছিল এবং এখনও যাবা বর্তমান আছে—তাবা মেকলেব আকাঙ্ক্ষিত শিক্ষিত শ্রেণী নয়। ববং বলা যায়, ইয়ং বেঙ্গল দলভুক্ত তাবাচাঁদ চক্রবর্তী, রাধানাথ শিকদাব, দক্ষিণাবঞ্জন মুখোপাধ্যায়, বামগোপাল ঘোষ, কিশোরীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত প্রমুখ এবং পরবর্তী স্তবেব বঙ্কিমচন্দ্র-সুবেন্দ্রনাথ-উমেশচন্দ্র-বমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখই ছিলেন মেকলেব শিক্ষাব্যবস্থাব আদর্শ পুরুষ—যাঁবা একদিকে শাসক-শাসিতেব মধ্যে 'interpreter'-এব কাজ করেছিলেন ও 'taste' এবং 'intellect'-এব প্রশ্নে অনেকাংশে পাশ্চাত্যধর্মী হয়েছিলেন। কিন্তু এঁদেব সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। ববং ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, হিন্দু কলেজ অথবা পববর্তী স্তরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ অথবা অনুত্তীর্ণ অসংখ্য বঙ্গীয় যুবক যে ইংবেজি শিক্ষা লাভ কবেছিল, তাব দ্বাবা এক ধবনের বিকৃত মানসিকতা ব্যতীত আব কিছুই অর্জন কবেনি। তাদেব না ছিল 'moral' না কোনো 'intellect'। এই ধবনেব অর্ধশিক্ষিত বাঙালী নামক অদ্ভুত জন্তুতে দেশ পবিপূর্ণ হয়েছিল। মধুসূদনেব নবকুমাব (একেই কি বলে সভ্যতা?) ও দীনবন্ধুব নিমচাঁদ (সধবার একাদশী) এদেবই তৎকালীন সার্থক প্রতিনিধি।"

মাতৃভাষা ও বঙ্কিমচন্দ্র/তপোবিজয় ঘোষ

তখনকাব ছাত্রসমাজে ইংবেজির দিকে কিরকম প্রবল আগ্রহ, তাব অন্যতম প্রধান প্রমাণ হিসেবে খাড়া কবা যেতে পাবে ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে। গোঁড়া সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেব পবিবাব ও পবিবেশে জন্মেও, বাবাব ইচ্ছাব বিরুদ্ধে ক্রন্দনময় বিদ্রোহ ঘোষণা কবে তিনি ভর্তি হয়েছিলেন হিন্দু কলেজে, ইংবেজি শেখাবই আকুল আগ্রহে।

অন্যভাবে, বিদ্যাসাগবও আর-এক উদাহবণ। ছেলেকে, কলকাতায় এনে, শিক্ষিত করবেন কোন মাধ্যমে, সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধান্বিত ছিলেন গোড়ায়। বেশ-কিছুদিন ঘবোয়া আলোচনা চলে অন্তরঙ্গদের সঙ্গে। বলা বাহুল্য, সেখানেও দুটি দল। যাবা ইংবেজিব পক্ষে, তাদেব মন্তব্য—ওকে যদি ডেভিড হেয়াবের স্কুলে ভর্তি কবে দাও, তাহলে পেয়ে যাবে মাইনে না দেওয়ার সুবিধে। সেখানে ভালো রেজাল্ট করলে বিনা বেতনে ভর্তি হয়ে যেতে পারবে হিন্দু কলেজে। হিন্দু কলেজে পড়ে ইংরেজিতে পাকাপোক্ত হয়ে গেলে সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, বিশেষত চাকরি-বাকরির ব্যাপারে।

সংস্কৃতপন্থীদের পরামর্শ—বামুনের ঘবের ছেলে, টোলে সংস্কৃত শিখে, নিজে টোলচতুষ্পাঠী খুলে পাঁচজনকে বিদ্যাদান করবে, এটাই তো নিয়ম।

বাবা ঠাকুরদাসও, শেষোক্তদের সঙ্গে একমত। বলেছিলেন—

"ঈশ্বর লেখাপড়া শিখে, উপার্জ্জনক্ষম হযে, আমার দুঃখ ঘোচাবে, তার জন্য আমি তাকে কলকাতায় আনিনি। আমার ইচ্ছা, ঈশ্বর সংস্কৃতশাস্ত্রে কৃতবিদ্য হয়ে দেশে গিয়ে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে, স্বাধীনভাবে অধ্যাপনা করবে, তাহলেই আমার সব আকাঙ্ক্ষা মিটবে।"

ন বছর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র ভর্তি হয়েছিলেন সংস্কৃত কলেজে, ১৮২৭-এ সেখানেও শুরু হয় ইংরেজি শেখানো। ১৮৩৫-এ তুলে দেওয়া ইংরেজি পড়া। ১৮৩৯-এ সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা ইংরেজি বিভাগ চালু করার জন্যে আবেদন জানায় শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারির কাছে।

"ন্যায়শাস্ত্রাধ্যায়িনাং ছাত্রানাং

আমাদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ কেবল সংস্কৃত পাঠশালাতেই ইংবাজি ভাষাধ্যয়নের রীতি উঠিয়া গিয়াছে কিন্তু মাদর্শাতে উক্ত ভাষাধ্যয়ন ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে ইহাতে কেবল আমাদিগেরই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবেক নতুবা যে রাজা এতদ্দেশে ইংরাজি বিদ্যাবৃদ্ধ্যর্থে যত্নপূর্ব্বক বহুতর ধন ব্যয় করিয়া বিদ্যালয় সংস্থাপন করিতেছেন তাঁহারা যে কেবল এতম্মহানগরস্থ প্রধান বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগেব উক্ত ভাষাভ্যাসবিষয়ে অমনোযোগ হইযাছে ইহা কোনরূপেই সম্ভব নহে। অতএব এইক্ষণে প্রার্থনা যে অনুগ্রহ পূর্ব্বক রীত্যনুসাবে আমারদিগের ইংরাজি ভাষাভ্যাসের অনুমতি প্রকাশ হয় তাহা হইলে ক্রমে রাজকীয় কার্য ও শিল্পাদি বিদ্যা জানিয়া লৌকিক কার্যনির্বাহে সমর্থ হইতে পারি—লিপিরিয়ং জ্যৈষ্ঠস্যাষ্টদিবসীয়া—"

এই আবেদনপত্রে সই করেছিলেন বিদ্যাসাগরও, ইংরেজি শিক্ষার আগ্রহে। বঙ্কিমচন্দ্রের বাবা যাদবচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্রের বাবা ঠাকুরদাসের বিপরীত। তিনি নিজে ইংরেজি শিক্ষার অনুরক্ত। ছেলেকে চেয়েছিলেন সেভাবেই মানুষ করতে। ছেলেবেলায়, আগেই জেনেছি আমরা, ভালো লাগা সংস্কৃত শ্লোক মুখস্থ করে নেওয়ার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল বঙ্কিমের। তাঁর মুখে 'গোপীভর্তুবিরহবিধুরা' শ্লোকের আবৃত্তি শুনে ছিলেন ভাটপাড়ার বুধশ্রেষ্ঠ মহামহোপাধ্যায় হলধর তর্কচূড়ামণি। তাঁকে বলা হত 'দ্বিতীয় বৃহস্পতি'। বঙ্কিমের গলার শ্লোকোচ্চাবণ শুনে অভিভূত তিনি যাদবচন্দ্রকে জানিয়েছিলেন যে স্বেচ্ছায় বঙ্কিমের সংস্কৃত শেখার ভার নিতে তিনি প্রস্তুত। যাদবচন্দ্র রাজী হননি। তাই ছেলেবেলা থেকেই বঙ্কিমের লেখাপড়া ইংবেজি স্কুলে। ইংরেজি সম্পর্কে অধিকতব আগ্রহ সত্ত্বেও, হুগলি কলেজে পড়ার সময়ই, বঙ্কিমের নিজের গবজে সংস্কৃত শেখায় মন দেওয়া সম্বন্ধেও কিছু তথ্য খুঁজে পাই আমরা।

১। "১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে যে সময়ে হুগলী কলেজে একজন প্রধান ছাত্র বলিয়া গণ্য, ইনি তৎকালে গ্রাম্য চতুষ্পাঠীতে কোনো এক অধ্যাপকের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, প্রত্যহ বৈকালে পুঁথি বগলে করিয়া চতুষ্পাঠীতে গমনপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতেন। এক বৎসর মধ্যে ইনি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, রঘুবংশ, ভট্টিকাব্য, মেঘদূত, উদ্ধবদূত প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। এই অল্প সময় অধ্যয়ন করিয়াই ইনি সংস্কৃত ভাষায় ও সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে ইনি ইংরেজির ন্যায় সংস্কৃত ভাষাতেও কৃতবিদ্য।"

নবার্ষিকী / দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়

২। "তিনি কলেজ হইতে বাহির হইয়া ভাটপাড়ার শ্রীরাম শিরোমণি মহাশয়ের নিকট রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, শকুন্তলা পড়িয়াছিলেন। ভালো শাব্দিক হইলেও শিরোমণি

মহাশয়ের কাব্য বুঝিবার ক্ষমতা খুব ছিল। আমি তাঁহার নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের শেষ অংশ ও জয়কৃষ্ণের সারমঞ্জরী পড়িয়াছিলাম।"

বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায় / হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

মোটামুটিভাবে এইসব তথ্য আমাদের জানা থাকলেও তাঁর টোল জীবনের উপর বিশদ আলোচনা হয়নি তেমন। এ সম্পর্কে একটি বিস্তৃত তথ্যাবলী প্রথম আমাদেব কাছে পৌঁছে দিয়েছেন শ্যামলী চক্রবর্তী, তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্রের সংস্কৃত শিক্ষায টোল ও তাঁর গুরু' নামেব প্রবন্ধে। নীচের তথ্যসম্ভার প্রধানত তাঁর ঐ প্রবন্ধ অবলম্বনেই।

নৈহাটি-কাঁঠালপাড়ার প্রতিবেশী গ্রাম ভাটপাড়া। নবদ্বীপ-কে বলা হত 'বাংলার অক্সফোর্ড'। আর সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের সমাবেশে এই ভাটপাড়া 'দ্বিতীয় অক্সফোর্ড' হিসেবে সম্মানিত। সেখানেই বঙ্কিমচন্দ্র ছুটে যেতেন সংস্কৃত শেখার বিপুল আগ্রহে এমন একজনের কাছে যাঁকে হরপ্রসাদ বলেছেন শ্রীবাম শিরোমণি, দ্বাবকানাথ বলেছেন 'কোনা এক অধ্যাপক' আর পূর্ণচন্দ্র বলেছেন শ্রীবামন্যায়বাগীশ।

আসল মানুষটি হলেন জযরাম ন্যায়ভূষণ। ন্যাযশাস্ত্রেব পণ্ডিত। কিন্তু নিজেব টোলে পড়াতেন ব্যাকবণ।

> "গ্রামে তখন ব্যাকবণ পড়াইবার লোক বিরল হইয়া যাওয়ায এই ফলী নৈয়ায়িক স্বজনগণেব অনুরোধে ব্যাকরণের চতুষ্পাঠী কবেন ও তাহা পড়াইতে থাকেন। কি প্রতিভা। কি মেধা। সমগ্র অমরকোষ স্মৃতি পথে। ব্যাকরণাধ্যাপনায এক নবযুগ প্রবর্ত্তিত হইল।... শুধু কি ব্যাকরণ, সঙ্গে সঙ্গে কাব্যচর্চা বেশ সজোবে চলিতে লাগিল। ন্যায়ভূষণ মহাশয় কাব্যের মধ্যে নিজে পড়িয়াছিলেন ভট্টি ও নৈষধ। তখনকাব কালে 'রঘুপতি কাবং তদপিচ পাঠ্যং' কালিদাসের উপর এই শ্লেষোক্তি চলিতেছে। ন্যায়ভূষণ মহাশয় কিন্তু কালিদাস ও অন্যান্য কবিদিগকে চিনিয়াছিলেন। সকল কাব্যেরই সমধিক পাঠনা আরম্ভ হইল। তিনি স্বপ্রতিভাবলে সকল কাব্যই আযত্ত করিয়া ফেলিযাছিলেন। কাব্যপাঠ এই সময় হইতেই ভাটপাড়ায় চলিত হয়।"

শ্রীকমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ

বঙ্কিম তাঁর কাছে প্রধানত যা শিখতেন তা ব্যাকবণ। তাঁর শিক্ষাকাল ছিল চোদ্দ থেকে আঠারো এই পাঁচ বছর। ভাটপাড়ার নৈয়াযিক সমাজে কালিদাস তখন অনাদৃত। কিন্তু বঙ্কিম কালিদাসে মজলেন তাঁব এই মহাপ্রতিভাধব শিক্ষকেব কাছেই। তখনকার কালে কাব্য পড়ানোর রীতিতে শব্দার্থ আর ব্যাকবণেব চুলচেবা বিচারটাই আসল, কবিতার বসাস্বাদ গৌণ। সৌভাগ্যক্রমে বঙ্কিমেব শিক্ষাগুরু ছিলেন ব্যতিক্রম। নিজে যথার্থ কাব্যবসিক, তাই খাঁটি কাব্য-অধ্যাপকও। কবিদের তিনি চিনতেন বলেই, চিনিযেও দিতে পারতেন ছাত্রদের, প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায়।

জযবাম ন্যায়ভূষণের অধ্যাপনা জীবন ১২৮৭-তে শুরু হয়ে পরের ৮২ বছর পর্যন্ত ব্যাপ্ত। আর এই দীর্ঘ সময়ে তাঁর কাছে শিক্ষানবিশী করে খ্যাত হয়েছেন অসংখ্য কৃতী বাঙালী। বঙ্কিমের সমসময়ে পড়তে যেতেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। সে কথা জানতে পারি হরপ্রসাদ-শিষ্য শ্রীজীবন্যায়তীর্থের স্মৃতিচারণায়–

> "তিনি (হরপ্রসাদ) তাঁহার বাল্যকালে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত আসিয়া পণ্ডিত প্রবর জয়বামন্যায়ভূষণেব নিকট সংস্কৃত পাঠ গ্রহণ করিতেন। জয়রামন্যায়ভূষণ এমন একজন পণ্ডিত ছিলেন যে তিনি সমগ্র কাব্য বিনা টীকার সাহায্যে অনায়াসে পড়াইতে পারিতেন। তাঁহার ছাত্র সম্প্রদায় বহু বিস্তৃত ছিল।"

তাঁর অন্য কৃতী ছাত্রদের কয়েকজন হলেন রাখালদাস ন্যায়রত্ন, তারাচাঁদ বিদ্যাবত্ন, পঞ্চানন তর্করত্ন।

ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে বঙ্কিম পরিচিত হচ্ছেন পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে। সংস্কৃতের মাধ্যমে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য দর্শন আর ধর্মশাস্ত্রে। পরে এই বঙ্কিম যখন বাংলা সাহিত্যের একেবারে কেন্দ্রভূমিতে এসে দাঁড়াবেন নায়কোচিত ভূমিকায়, তখন দেখা যাবে এই টোলের পাঠ তাঁর সমস্ত সংলাপকে জুগিয়ে চলেছে ব্যাপ্ত এক বোধ আর বীরোচিত এক মহিমা। টোল, টোলের অধ্যাপক, টোলের পাঠক্রম তাঁর চেতনার পরতে পরতে খোদাই হয়ে যাবে এমন গভীরতর রেখায় যে, পরবর্তী জীবনেব সাহিত্য-চর্চার স্তরে স্তরে আমরা দেখতে পেয়ে যাব তার প্রভাবের প্রতিপত্তি, প্রতিফলনেব বহুবর্ণময় বশ্মি। প্রবন্ধে প্রবন্ধে ঘটবে সংস্কৃত শাস্ত্র এবং সাহিত্যেব উদ্ধৃতি, ব্যাখ্যা আব নতুন অর্থান্তর। শাস্ত্র বিষযক তর্কে-বিতর্কে, যেমন হেস্টি সাহেবেব সঙ্গে অগ্নিবর্ণ সংগ্রামে, সংস্কৃত শাস্ত্রভাণ্ডারকে শস্ত্রাগার বানিয়ে নিয়েই নিজেব তূণীরকে সাজিযে নেবেন তীক্ষ্ণধাব তীবে। এ-সব হযতোবা অনেকখানিই স্বাভাবিক। অপ্রত্যাশিতেব বিস্ময নাড়া দেয না ততখানি। কিন্তু যখন উপন্যাসেব ভিন্ন জমিতেও দেখতে পাব তিনি বুনে চলছেন টোল-জীবনেব অভিজ্ঞতা এবং স্মৃতিব বীজ এবং বৃক্ষ, তখন আর বিস্ময়েই থেমে থাকে না আমাদেব আলোড়িত অনুভব, অধিকতব সম্ভ্রমী দৃষ্টিতে আমবা তাকাতে শিখি ঐ অনন্তমূল শিক্ষা-পর্বেব দিকে।

বাংলা ভাষায লেখা জীবনেব প্রথম উপন্যাসেই এসে গেল চতুষ্পাঠীর প্রসঙ্গ, বিদ্যাদিগগজ-এর সূত্রে। আব শশীশেখব ভট্টাচার্যেব সূত্রে এসে গেলেন এমন একজন অধ্যাপক, যিনি সর্ববিৎ দণ্ডীব বিদ্যায খ্যাত। যাঁব কাছে অধ্যয়নেব পবিণামে শশীশেখর হয়ে উঠলেন দর্শনাদিতে অত্যন্ত সুপটু আব জ্যোতিষে অদ্বিতীয় মহামহোপাধ্যায। 'চন্দ্রশেখর' সীতারাম' -এ টোল হাজিব মহাগৌরবে। 'দেবীচৌধুবাণী' আর 'আনন্দমঠে', টোলই নয় শুধু, টোলেব পাঠ্যসূচীবও পরিচয়।

শ্যামলী চক্রবর্তী তাঁর এই প্রবন্ধেব শুরুতে সংস্কৃত চর্চার বিকাশে টোল-চতুষ্পাঠীব ভূমিকাব কথা বলতে গিযে মন্তব্য কবেছেন—

> "এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবক্তা রামমোহনেব দৃঢ় ধারণা ছিল সংস্কৃত চর্চা দেশের শিক্ষানীতি হিসেবে বজায় রাখার অর্থ দেশবাসীকে অজ্ঞতার চিরঅন্ধকারে রাখা।"

এ-বকম জলবৎ সিদ্ধান্ত রামমোহনকে আধখানা করে দেখানোব চেষ্টা। সম্পূর্ণ রামমোহন এর বিপরীত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রসঙ্গে যখন প্রশস্তি রচনা করেন এই বলে যে—

> "বামমোহন বায় যে পশ্চিমের ভাবকে আত্মসাৎ করিতে পাবিযাছিলেন তাহাব প্রধান কাবণ পশ্চিম তাঁহাকে অভিভূত করে নাই, তাঁহাব আপনাব দিকে দুর্বলতা ছিল না। তিনি নিজের প্রতিষ্ঠাভূমির উপর দাঁড়াইয়া বাহিরের সামগ্রী আহবণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য কোথায়, তাহা তাঁহার অগোচর ছিল না। এবং তাহাকে তিনি নিজস্ব করিয়াছিলেন। এইজন্যই যেখান হইতে যাহা পাইযাছেন তাহা বিচার করিবার নিক্তি ও মানদণ্ড তাঁহার হাতে ছিল; কোনো মূল্য না বুঝিয়া তিনি মুগ্ধের মতো আপনাকে বিলাইয়া দিয়া অঞ্জলি পূরণ কবেন নাই।"

তা অক্ষবে অক্ষরে সত্যিই।

আমাদের মনে রাখা দরকার, তিনিই বাংলা ভাষায় গদ্য রীতির জনক। মনে রাখা দরকার, তিনিই প্রবর্তক বাংলা আর ফারসি ভাষায় সাংবাদিকতার। মনে রাখা দরকার, তিনি কখনোই

ভোলেন নি মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের অপরিহার্যতা। তাঁর নিজের হাতে গড়া 'আত্মীয় সভা'-র অন্য নানাবিধ কার্যক্রমের মধ্যে একটা ছিল ইংরেজি থেকে শুধু সাহিত্যিক নয়, বৈজ্ঞানিক রচনারও বাংলা অনুবাদের প্রকাশ। তাঁর প্রতিষ্ঠা করা 'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা সভা'-র সদস্যদের প্রতিজ্ঞা ছিল কেবলমাত্র বাংলা ভাষায় ভাব প্রকাশের। 'স্কুল বুক সোসাইটি'র জন্যে তিনিই লিখেছিলেন বাংলাভাষায় পাঠ্যপুস্তক, 'ভূগোল' আর 'খগোল'। প্রবল দেশাভিমানী রামমোহন নিজের দেশের সংস্কৃতি-সম্পদ সম্পর্কে গর্বিত ছিলেন জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তে। ভারতবর্ষ থেকে অজ্ঞতার জীর্ণ আবর্জনাকে পুড়িয়ে ফেলাই ছিল তাঁর আজীবনের ব্রত।

১৮৫৩

বছরের প্রধান ঘটনাবলী

প্রখ্যাত অভিনেতা, বাংলা নাট্য-আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক রাধামাধব কর-এর জন্ম হাওড়াব সাঁতরাগাছিতে। বড়ো ভাই বাধাগোবিন্দ কর বা আর. জি. কর এদেশের খ্যাতনামা ডাক্তার। ডাক্তার বাবা দুর্গাদাস।

বছবের গোড়ায় বিধবা-বিবাহের সমর্থনে তিনটে সভা। প্রথমটিতে উপস্থিতির সংখ্যা ৮০। দ্বিতীয়টিতে ১০০। তৃতীযটিতে বসবাব জায়গা দেওয়া গেল না সবাইকে।

মেকলের লেখা ক্লাইভ-জীবনী অবলম্বনে বেরবে হরচন্দ্র দত্তের 'লর্ড' ক্লাইব চবিত্র'। তাঁর মতে ক্লাইভ—'মনুষ্য জাতির উপকারি ব্যক্তিদিগের মধ্যে একজন প্রধান' আর ভারতবাসীর প্রধান হিতৈষী।

বেরলো 'সংবাদ প্রভাকব'-এর বিশেষ মাসিক সংস্করণ। সেখানে থাকত—

> "সর্ব্বাগ্রে জগদীশ্বরের মহিমা বর্ণনা, নীতি কাব্য ও বিখ্যাত মহাত্মাদিগের জীবনবৃত্তান্ত প্রভৃতি গদ্য পদ্য পরিপূরিত উত্তম প্রবন্ধ এবং সর্ব্বশেষে মাসের সমুদয় ঘটনা অর্থাৎ মাসিক সংবাদের সাবমর্ম।"

এ ছাড়াও এই মাসিক পত্রিকার অন্য একটা বিশেষত্ব ছিল প্রাচীন কবিদের অপ্রকাশিত রচনা এবং জীবনকাহিনী সংগ্রহ করে ছাপানোয়। তাঁর জীবিতকাল পর্যন্ত বেরিয়েছিল যে-সব কবির জীবনচরিত—

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু), রাম (মোহন) বসু, নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী, কেষ্টা মুচী, লালু নন্দলাল, গোজলা গুঁই, হরু ঠাকুর, রাসু, নৃসিংহ, আর লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস।

কেশবচন্দ্র সেন হিন্দু কলেজের স্কুল বিভাগের সর্বোচ্চ শ্রেণীতে। বছরের গোড়া থেকেই হিন্দু কলেজে গণ্ডগোল। কলেজ চলে এল পুরোপুরি সরকারি আওতায়। খানিকটা ভাঁটা

পড়ল অধ্যক্ষ-সভার নেতৃত্বে। সভা প্রতিবাদ জানাল সরকারি হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে। কাজ হল না। হিন্দু সমাজের বেশ-কিছু মাথা মাতব্বর পাল্টা সিদ্ধান্ত নিলেন ভিন্ন কলেজ গড়াব। বীরসিংহ গ্রামে অবৈতনিক স্কুল খুললেন বিদ্যাসাগর।

পাঠশালার পড়া শেষ করে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কলকাতায় এসে ভর্তি হলেন লন্ডন মিশনারি সোসাইটির স্কুলে। থাকতেন ভবানীপুরে, জাঠতুতো ভাই অম্বিকাচরণের কাছে। বেরলো হরচন্দ্র ঘোষ-এর 'ভানুমতী চিত্তবিলাস', শেক্সপীযরের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' অবলম্বনে। বইটিতে ছিল দুটি ভূমিকা, ইংরেজি আর বাংলায়। বাংলা ভূমিকা–

> "এতদ্দেশীয় বালকবৃন্দের জ্ঞান বৃদ্ধ্যর্থ উৎসাহান্বিত ইংলণ্ডীয় কোন বিচক্ষণ মহাজনের পরামর্শক্রমে আমি 'সেকস্পিযর' নামক ইংলণ্ডীয় মহাকবির স্বনাম প্রসিদ্ধ মহানাটক 'মার্চেন্ট-অফ-ভিনিস' ইত্যভিধেয় অপূর্ব্ব স্বাদের আনুপূর্ব্বিক অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু ঐ কাব্যের অনেকানেক স্থানের ভাব দেশীয় ভাষার ভাবের সহিত ঐক্য হয় না দেখিযা কতিপয় প্রাচীন মহাশয় উল্লেখিত কাব্যের আখ্যানের মর্ম্ম মাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক আমূলাৎ দেশীয় প্রণালীতে রচনা করিতে যুক্তি দান করেন। আমি উক্ত উক্তি যুক্তিযুক্ত বোধে তদনুসারে 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' নাটক গদ্য পদ্যে রচনা করিলাম।..."

মাত্র তেরো বছর বযসে বাংলা ভাষা অনুশীলনের জন্যে কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রতিষ্ঠা করলেন 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'-র। কালীপ্রসন্ন ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে এই সভার সম্পাদক হয়েছেন উমেশচন্দ্র মল্লিক, ক্ষেত্রনাথ বসু, রাধানাথ বিদ্যারত্ন। সভ্য ছিলেন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, প্যারীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল প্রমুখ। সভায় পাঠ ও আলোচনা হত জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ। অধিবেশন বসত সাধারণত শনিবারে। খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের সংবর্ধনাজ্ঞাপনও ছিল এই সভার কাজ।

> "আমার যখন ১৫।১৬ বৎসর বয়স, তখন কালীপ্রসন্ন সিংহের সহিত আমার প্রথম আলাপ হয।... তাঁহার বাড়ীর দোতালায় একটি Debating Club ছিল, আমি সেই সভার সভ্য হইয়াছিলাম। সেই স্থানে কৃষ্ণদাস পালের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয। এখনও আমার বেশ মনে আছে, যেদিন কৃষ্ণদাস পাল commerce সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন; ইংরাজিতে তাঁহার সেই বক্তৃতা শুনিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম।... আমিও প্রবন্ধ পাঠ করিতাম, কিন্তু বাঙ্গালায। আমি ছেলে মানুষ বলিযাই হৌক বা আর কোনও কারণেই হৌক, প্রবন্ধগুলির জন্য আমি প্রশংসা পাইতাম। একদিন আমার একটি প্রবন্ধের আলোচনা হইতেছিল— কি বিষয়ে সে প্রবন্ধ রচিত হইয়াছিল, এখন আমার স্মরণ নাই, বোধ হয় বিধবা-বিবাহের উপর — এমন সময় একজন সভ্য বলিয়া উঠিলেন, ছেলে মানুষের প্রশংসা করে রাত কাটান যাবে না কি ?"

পুরাতন প্রসঙ্গ / কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য

> "আমি গত শনিবাসরীয় যামিনী যোগে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'-য় গমন করিয়াছিলাম।... ন্যূনাধিক দুই শত ভদ্র সন্তান ঐ সভায় বিদ্যমান ছিলেন, কালীপ্রসন্নবাবু প্রসন্ন বদনে সমাদর পূর্ব্বক তাঁহারদিগকে সম্বোধন করিয়া অকুণ্ঠ সুকণ্ঠ স্বরে বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকার গ্রাহক মহাশয় দিগের পত্র সকল পাঠ করিলেন, কানপুর দিনাজপুর বগুড়া বালেশ্বরাদি নানা স্থানীয় গুণগ্রাহক গ্রাহক মহাশয়েরা বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা গ্রহণার্থ পত্র লিখিযাছেন।· শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় ঐ সকল পত্র পাঠ করিয়া মূল প্রস্তাব অর্থাৎ বাণিজ্য বিষয়ে কি ২ উপকার, সংক্ষেপে তাহার বিবরণ ব্যক্ত করিলেন তৎপরে সভা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ শর্ম্মা মল্লিখিত বিস্তারিতরূপে ঐ সকল বিষয় ব্যক্ত করেন অনন্তর কালীপ্রসন্নবাবু ঈষদ্‌হাস্য প্রসন্ন বদনে বলিলেন সভ্য ও দর্শক মহাশয়দিগের মধ্যে

প্রস্তাবিত বিষয়ে যে ভাষায় যিনি যাহা বলিতে পারেন বক্তৃতা করুন তাহাতে আমরা আহ্লাদিত হইয়া সভার কার্য ও উন্নতি ইত্যাদি বিষয়ে যথাসাধ্য যৎকিঞ্চিৎ বলিয়াছি অনুভব করি সর্ব্বসাধারণ লোকেরা বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকাতেই তাহা দেখিতে পাইবেন।"

সমাচার সুধাবর্ষণ / প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ

দু খানা বই বেরলো অক্ষয়কুমার দত্ত-র। 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার'-এর দ্বিতীয় ভাগ। 'চারুপাঠ'-এব প্রথম ভাগ। চারুপাঠ প্রথম ভাগেব বিজ্ঞাপন—

"এই গ্রন্থ যে নানা ইঙ্গরেজি পুস্তক হইতে সঙ্কলিত, ইহা বলা বাহুল্য যে সকল প্রস্তাব ইহাতে সংগৃহীত হইল, তাহার অধিকাংশ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে এবং একটি প্রস্তাব প্রভাকব পত্রে প্রথম প্রকটিত হয়। অবশিষ্ট কযেকটি বিষয় নূতন রচিত হইয়াছে।"

বেরলো বিদ্যাসাগবেব 'ব্যাকবণ কৌমুদী'-র প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, আর তাঁরই সম্পাদনায় 'কিরাতার্জুনীয়ম'। এই বছর থেকে ৫৮-ব মধ্যে তাঁর সম্পাদনায় বেবেবে 'সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ'। পূর্ণচন্দ্রোদয় প্রেস থেকে বেরলো 'শব্দাম্বুধি'। মুক্তাবাম বিদ্যাবাগীশ প্রমুখ পণ্ডিতদের সাহায্য নিয়ে বইটিব জন্য তথ্য সংগ্রহ কবেছিলেন 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদযে'ব সম্পাদক।

শম্ভুনাথ পণ্ডিত হযে গেলেন জুনিযব সবকাবি উকীল।

খিদিরপুবে থাকাব সময ১৫ বছরের হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে উচ্চশিক্ষাব জন্যে হিন্দু কলেজে ভর্তি কবিযে দিলেন প্রসন্নকুমার সর্বাধিকাবী। তিনি তখন হিন্দু কলেজেব জুনিযর স্কুলেব শিক্ষক। হেমচন্দ্র ভর্তি হলেন সিনিযব স্কুল বিভাগেব দ্বিতীয় শ্রেণীতে।

"পাঠশালায সামান্য বাঙ্গালা ও শুভঙ্কবী শিক্ষা কবিযা যখন হেমচন্দ্র কৈশোরে পদার্পণ কবিলেন, তখন মাতামহ বাজচন্দ্র ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইযাছে যে, হেমচন্দ্রেব পিতা কৈলাসচন্দ্র বিশেষ কোন কার্য কবিতেন না এবং শ্বশুরেব উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর কবিযাছিলেন। এক্ষণে পরিবারের আর্থিক অবস্থা নিতান্ত অসচ্ছল হইল। এই সমযে পবোপকাবী পণ্ডিত প্রবব প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, পাঠ্যাবস্থায অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন কবিয়া হিন্দু কলেজেব অধ্যাপকের পদ গ্রহণ কবিয়াছিলেন। শিক্ষাপরিষদেব সভাপতি পুণ্যস্মৃতি ডিঙ্কওযাটাব বেথুন এবং শিক্ষাবিভাগের সকল অধ্যাপক প্রসন্নকুমারকে স্নেহ কবিতেন। প্রসন্নকুমাব পূর্ব্বে খিদিরপুরে বাস করিতেন। হেমচন্দ্রের জননী আনন্দময়ী একদিন প্রসন্নকুমাবেব সহিত সাক্ষাৎ করিযা তাঁহাব দুঃখ দুর্দশাব কথা জ্ঞাপন করিলেন এবং 'সাহেবদিগকে বলিযা' হেমচন্দ্রেব জন্য একটি ১৫। ২০ টাকাব চাকুবীব চেষ্টা করিতে অনুরোধ কবিলেন। প্রসন্নকুমার বালক হেমচন্দ্রব সুগঠিত দেহ ও আযতলোচনের প্রতি দৃষ্টিপাত কবিযা, তাঁহাকে উত্তমরূপে শিক্ষিত করিতে পবামর্শ দিলেন।... হেমচন্দ্র অসামান্য অধ্যবসায় ও পরিশ্রম সহকাবে মনীষী প্রসন্নকুমারের নিকট নানা বিষয় অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।... অতি অল্পকালেব মধ্যে হেমচন্দ্র পাঠে এত উন্নতি দেখাইলেন যে প্রসন্নকুমাব তাঁহাকে উচ্চতর শিক্ষাব জন্য হিন্দুকলেজ-সংশ্লিষ্ট স্কুলে সিনিয়র ডিপার্টমেণ্টে একেবারে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন। বোধহয প্রথমে প্রসন্নকুমারই হেমচন্দ্রের শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করিতেন। হেমচন্দ্রের সতীর্থ শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন যে পরে বোধ হয় হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ মিষ্টার সাটক্লিফ হেমচন্দ্রের বিদ্যানুরাগ ও দারিদ্র্যের কথা অবগত হইয়া দয়াপরবশ হইয়া স্বযং তাঁহার স্কুলের বেতন দিতেন।"

হেমচন্দ্র / মন্মথনাথ ঘোষ

হেমচন্দ্র যখন হিন্দু কলেজে ঢুকলেন ছাত্র হিসেবে, তখন ঐ শিক্ষকদেব নাম, পদ আব মাইনেরও একটা তালিকা পেয়ে যাচ্ছি মন্মথনাথের 'হেমচন্দ্র' থেকে।

কলেজ বিভাগ

প্রিন্সিপ্যাল/জে. সাটক্লিফ/৬০০ টাকা
ইংরেজি সাহিত্যের সহঃ অধ্যাপক/ আর. হ্যাণ্ড/৩০০ টাকা
সার্ভেয়িং শিক্ষক/জে.রো/১০৬।। ১০ ৯০ টাকা
ব্যবস্থাশাস্ত্রের অধ্যাপক/ডবলিউ থিওবোল্ড/৩০০ টাকা
সাহিত্যেব অধ্যাপক/ডবলিউ গ্রেপেল/২৫০ টাকা

সিনিয়র স্কুল বিভাগ

প্রধান শিক্ষক/আর. জোন্স/৫০০ টাকা
দ্বিতীয় শিক্ষক/সি. টি. ভন/২০০ টাকা
ইংবেজির শিক্ষক /জে.বি. গ্রিসেনথোয়েট/২০০ টাকা
বাংলা সাহিত্যের শিক্ষক/বামচন্দ্র মিত্র/২০০ টাকা
প্রধান পণ্ডিত/পীতাম্বর শর্মা/৩৫ টাকা
দ্বিতীয় পণ্ডিত/ গৌবীচবণ শর্মা/২০ টাকা

বিশেষ কবে সাহিত্যে বিশেষ দক্ষতা দেখিয়ে হেমচন্দ্র উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন দ্বিতীয় শ্রেণীব বার্ষিক পবীক্ষায়।

জানুয়াবি

আবদুল লতিফ খাঁ হয়ে গেলেন চব্বিশপবগনায় তৈবি নতুন মহকুমা কালাবোয়া-ব শাসক। সেইসঙ্গে কালেকটর। এখানে কাজ কবাব সময়ই দবিদ্র প্রজাদেব উপব নীলকবদেব অত্যাচাবেব খবব পৌঁছে দেন সবকারেব কাছে। শাসনকালে তাঁব দক্ষতা দেখে পবে তাঁকে কবে দেওয়া হবে হুগলিব জাহানবাদ সাবডিভিশনেব শাসক।

৬ জানুযাবি

বেবলো 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকা, বড়বাজাবেব কলাকাব গলি থেকে। ইংবেজি সাপ্তাহিক। উদ্দেশ্য—

"যথাযথভাবে ও সাহসেব সঙ্গে দেশেব স্বার্থবক্ষাব চেষ্টা এবং সেই সঙ্গে সামাজিক ও বাজনৈতিক দিক থেকে দেশেব পক্ষে হানিকব বিষযগুলিব নিরপেক্ষভাবে স্বরূপ উদ্‌ঘাটন।"

"হিন্দু পেট্রিয়ট প্রকাশকালে বঙ্গদেশে দেশীয পবিচালিত একমাত্র সংবাদপত্র ছিল কাশীপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সিয়াব'। সমগ্র ভাবতে 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সিয়াব' ব্যতীত দেশীয পরিচালিত আব দুটি মাত্র ইংবেজি সংবাদপত্র ছিল মাদ্রাজ বাইজিং স্টাব (Madras Rising Star) ও হিন্দু হাববিঙ্গার (Hindu Herbinger)। শেষোক্তটি বোম্বাই থেকে প্রকাশিত হত।... হিন্দু পেট্রিয়ট প্রকাশের সময় এর বযস ছিল সাত বৎসব। সেদিক থেকে এটি তখন সুপ্রতিষ্ঠিত তবে হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সিযাব কাগজটি নবজাগ্রত বাঙালী সমাজের আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কবতে পারেনি।... এই পবিপ্রেক্ষিতে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে শাসন-ব্যবস্থায় পরিবর্তন যখন আসন্ন, তখন দেশবাসীব আশা-আকাঙ্ক্ষাকে

রূপদান করতে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' কাগজের আবির্ভাব খুব প্রয়োজন ছিল।... প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এটি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, তবে প্রচার সংখ্যা খুবই সীমিত ছিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে ইংরেজি ভাষায় শিক্ষিত দেশীয় ব্যক্তির সংখ্যা অতি অল্প ছিল।"

সাংবাদিক কেশরী হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়/
গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

রামগোপাল সান্যাল-এর 'হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনী'-তে অনেক তথ্য 'হিন্দু পেট্রিয়ট' নিয়ে।

খুব অল্প বয়স থেকেই নাকি হরিশচন্দ্র খবরের কাগজের পাঠক ও লেখক। 'হিন্দু পেট্রিয়টে' যোগ দেবার আগে লিখতেন তখনকার প্রায় সমস্ত ইংরেজি কাগজে। ফিনিকস, হবকরা, ইংলিশম্যান ছাড়াও নিয়মিত লেখক ছিলেন হিন্দু ইটেলিজেন্সিয়ার-এর। হিন্দু পেট্রিয়টে যোগ দিয়েছিলেন নিজেই সমস্ত কিছু লিখবার দায়িত্ব নিয়ে। বিনা পারিশ্রমিকে প্রত্যেক সপ্তাহে লিখতেন বাতদিন জেগে। গ্রাহক ছিল খুবই কম। ১০০ থেকে ১৫০। দাম দু আনা। ক'বছর টেনে-হিঁচড়ে চলবার পর পত্রিকার মালিক মধুসূদন রায় নিজের শারীরিক অসুস্থতার জন্যে ঐ কাগজ বিক্রি করে দিতে চাইলে অনেক কষ্টেসৃষ্টে তাঁর হাত থেকে হিন্দু পেট্রিয়টের মালিকানা কিনে নিযে ম্যানেজাব করে দেন দাদা হারান বাবুকে। এরপর ঐ কাগজ বেরতে শুরু করে ভবানীপুর থেকে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি, তবুও অন্য কোনো পক্ষেব আর্থিক সাহায্য নিতে বাজী হতেন না হবিশচন্দ্র। 'স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে, পবপ্রত্যাশী হওয়া ভাল নয়'। কিন্তু কাগজের ছাপা খারাপ হতে থাকে ক্রমশ, খারাপ হযে-যাওয়া অক্ষরের জন্যে। পাইকপাড়ার বাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ অর্থ সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। হবিশচন্দ্র নেননি। শেষ পর্যন্ত যা নিয়েছিলেন তা ঐ প্রতাপচন্দ্রেব কিনে দেওয়া নতুন হরফ।

এইটুকুতেই হিন্দু পেট্রিয়ট সম্বন্ধে সব তথ্য শেষ নয়। পরে ক্রমাগত সম্পাদক বদল হয়েছে এই কাগজেব। ক্রমে একান্ত ব্যক্তিগত এই কাগজ একদিন হয়ে গেল একটা বিশেষ গোষ্ঠী বা সংস্থার মুখপত্র। তার ইতিহাস—

"১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে পত্রিকার স্বত্বাধিকারী মধুসূদন রায় অসুস্থতা নিবন্ধন উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গমনকালে মুদ্রাযন্ত্রসহ পত্রিকার স্বত্ব বিক্রয় করতে মনস্থ করেন। মিলিটারি অ্যাকাউন্টস্ বিভাগে গিরিশচন্দ্রের [গিরিশচন্দ্র ঘোষ] সহকর্মী হরিশ্চন্দ্র মুদ্রাযন্ত্রসহ পত্রিকাখানি তাঁর ভ্রাতা হারানচন্দ্রের নামে বেনামীতে কিনে নেন এবং তিনি ও গিরিশচন্দ্র উক্ত পত্রখানি পরিচালিত করেন। লর্ড ড্যাল্‌হাউসির পররাজ্যগ্রাসিনী নীতির বিরুদ্ধে, সিপাই-যুদ্ধের সময় বৈরনির্যাতন-আক্রান্তচিত্ত ইংরেজের প্রতিহিংসা গ্রহণের বিরুদ্ধে এবং লর্ড ক্যানিং-এর উদারনীতির স্বপক্ষে, সর্বোপরি নীলকরদের অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে দুইটি শক্তিশালী লেখনী নিয়োজিত হয়েছিল। হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর শোকাকুলা জননী ও নিরাশ্রয়া সহধর্মিণীর সাহায্যার্থ গিরিশচন্দ্র পত্রিকার সম্পাদনাভার গ্রহণ করেন এবং শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কার্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। হরিশ্চন্দ্রের পরিবারের সাহায্যার্থে এই সময়ে পরহিতব্রত কালীপ্রসন্ন সিংহ পত্রিকাখানির স্বত্ব কিনে নেন। কিছুদিন পরে গিরিশচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্র এর সম্পাদনা ত্যাগ করলে কালীপ্রসন্ন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাতে এর পরিচালনাভার ন্যস্ত করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্রমান্বয়ে কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং দ্বারকানাথ মিত্রের দ্বারা কয়েক সংখ্যা সম্পাদনা

করিয়ে দেখলেন, সংবাদপত্র সম্পাদনে অনভ্যস্ত ব্যক্তির দ্বারা প্রকাশে পত্রিকাটির গৌরব হ্রাস পাচ্ছে। অবশেষে তিনি নবীনকৃষ্ণ বসু, কৈলাশচন্দ্র বসু ও কৃষ্ণদাস পাল এই তিনজন সুলেখকের উপর সম্পাদনভার প্রদান করেন। এইভাবে কিছুদিন সম্পাদিত হলে পত্রিকাখানি অবশেষে কৃষ্ণদাসের অধীনে এসে পড়লো। কৃষ্ণদাস তখন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সহকারী সম্পাদক; সভার কোনো নিজস্ব মুখপত্র ছিল না। তিনি সভাব কয়েকজন প্রধান সভ্যের দ্বারা কালীপ্রসন্নকে অনুরোধ করলেন যে, কাগজখানিব পরিচালনভার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছ থেকে গ্রহণ ক'রে তাঁদের উপব অর্পিত হোক। কালীপ্রসন্ন প্রথমে অসম্মত হলেও পরে এই প্রস্তাবে সম্মত হন এবং মালিকানা পরিত্যাগ করে রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রমানাথ ঠাকুর, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং বাজেন্দ্রলাল মিত্রেকে ট্রাস্টী নিযুক্ত ক'রে তাঁদেব উপর *Hindoo Patriot* পবিচালনার সমস্ত ভাব অর্পণ করলেন।"

বাজেন্দ্রলাল মিত্র/অলোক রায়

১৯ জানুয়ারি

কলেজ ছাড়ার পবই দীনবন্ধু মিত্র শিক্ষকতাব চাকরি করেছিলেন কিছুদিন হিন্দু কলেজে। এই তারিখে পাস কবেছিলেন শিক্ষকতাব পরীক্ষায়।

২৩ জানুয়ারি

বেরলো বামনারায়ণ তর্কবত্নের 'পতিব্রতোপাখ্যান'।

বংপুর কুণ্ডী পরগনার জমিদাব কালীচন্দ্র বায় চৌধুবী বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিযে 'পতিব্রতোপাখ্যান' বিষযে সবচেযে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের বচযিতাকে ৫০ টাকা পুবস্কাব ঘোষণা কবেন। বিজ্ঞাপনে ছিল–

> "স্ত্রীজাতি স্বপতির মতাবলম্বিনী হইয়া, দেহযাত্রা নির্ব্বাহকবণে, দম্পতী প্রীতিবর্দ্ধন হওতঃ সৃষ্টিপ্রবাহের প্রতি প্রতিবন্ধকতা ছেদনপূর্ব্বক কি নিগূঢ় ইষ্টফলোৎপ্রাপ্তি হইতে পাবে ? তদন্যথাতেই বা কি অনিষ্টতা অথবা শান্তির ব্যাঘাত জম্মে ? বিবিধ প্রমাণ ও বিবিধ সদ্যুক্তির দ্বারা প্রবন্ধ মধ্যে ইহাই প্রতিপন্ন কবা প্রশ্নকর্ত্তাব মূলভিপ্রেত ? রচক মহাশয়েবা আগত আষাঢ় মাস হইতে না হইতে স্ব স্ব রচিত প্রবন্ধ রীতিমত প্রেরণ কবিবেন।"

পুবস্কাব পেলেন রামনারায়ণ তর্করত্নই। পরে কালীচন্দ্র ১৫০ টাকা খবচ কবে ছাপিয়ে দিয়েছিলেন সে প্রবন্ধ বই হিসেবে।

১০ ফেব্রুয়ারি

'সংবাদ প্রভাকর' জানাল 'ডেবিড হেয়াব একাডেমী'-র ছাত্রদের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' অভিনয়ের প্রস্তুতির খবর। পিছনে মলঙ্গাব বাজেন্দ্র দত্ত-ব উৎসাহ। বাংলাদেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের উদ্যোগ একেবারেই নতুন।

১৬ ফেব্রুয়ারি

'সংবাদ প্রভাকর' লিখল–

> "অদ্য রজনীতে 'ডেবিড হেয়ার একাডমি'র ছাত্রেরা স্কুল বাটীতে ইংরাজী থিয়েটাব অর্থাৎ নাটক করিবেক, তজ্জন্য যথানিয়মে সুশিক্ষিত হইয়া নাট্যশালা নির্ম্মাণ করিয়াছে।"

২৭ ফেব্রুয়ারি

'সংবাদ প্রভাকর'-এর খবর–

"গত গুরুবার সন্ধ্যার পরে 'হেয়ার একাডমি' নামক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ পুনর্ব্বার ইংলণ্ডীয় মহাকবি সেকসপিয়ার সাহেব প্রণীত প্রসিদ্ধ গ্রন্থের মারচেণ্ট অব ভিনিস নাটকের অনুরূপ দেখাইয়া বহু লোককে সন্তুষ্ট করিয়াছেন। ঐ সময়ে বিদ্যালয় গৃহে প্রায় ৬০০।৭০০ এতদ্দেশীয় বিদ্যানুরাগি, কৃতবিদ্য ও ধনাঢ্য লোক এবং সম্ভ্রান্ত সাহেব ও বিবিগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই উক্ত ছাত্রগণের নিকট যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন... বিচারাগারের অনুরূপ শোভা দর্শন ও তাহার প্রশ্ন, বক্তৃতাদি শ্রবণ করিয়া অনেকে হেয়াব একাডিমিকে সাঙ্গসসি থিয়েটর বোধ করিয়াছিলেন।"

চট্টগ্রামের আলামপুরে কবি-গুণাকর নবীনচন্দ্র দাসের জন্ম, বাবা মগন দাস।

২৮ ফেব্রুয়ারি

'বেঙ্গল হবকবা'-ব খববে জানা গেল কলকাতা-মাদ্রাসার ইংবেজির অধ্যক্ষ মিঃ ক্লিঙ্গার ছিলেন হেয়াব আকাদেমি-ব ছাত্রদের অভিনয়ে শিক্ষক।

১২ মার্চ

বেথুন সোসাইটি-তে বিদ্যাসাগরের প্রবন্ধ পাঠেব খবর জানাল 'সংবাদ প্রভাকর'।

"বীটন সভার মাসিক বৈঠকে শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগব মহাশয় সংস্কৃত বিদ্যাব গৌরব প্রতিভা সন্দীপনমূলক বঙ্গভাষায় যে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন্ তাহা সর্ব্বাংশে উত্তম হইয়াছে, তাহাতে তিনি লিপিনৈপুণ্য ও সংস্কৃত বিদ্যায় বিপুল ব্যুৎপন্ন প্রদর্শনে ক্রটি করেন নাই, যে সকল মহাশযেবা সভায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহাবা সকলেই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সাধুবাদ প্রদান কবিযাছেন।"

২৮ মার্চ

শম্ভুনাথ পণ্ডিত জুনিয়র গভর্নমেন্ট প্লিডাব। সবচেয়ে যোগ্য ভেবে তাঁকে সবাসবি নির্বাচন কবেন জে. আব. কলভিন, উত্তব পশ্চিম-প্রদেশের লেফটেনান্ট গভর্নব।

৭ এপ্রিল

'বেঙ্গল হবকবা'-ব খববে জানা গেল হেয়াব আকাদেমির দৃষ্টান্তে উদবুদ্ধ হযে ওবিয়েন্টাল সেমিনাবিব ছাত্রবাও চাঁদা তুলে আটশো টাকা জোগাড় কবে একটা নাট্যশালা গড়ে তুলেছে শেকসপিযরের নাটক অভিনয কববে বলে।

১৭ এপ্রিল

বসরাজ অমৃতলাল বসুর জন্ম, ৮৮ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটেব মামার বাড়িতে। বাবা কৈলাসচন্দ্র। মা, ভুবনমোহিনী। নিজের লেখা কবিতায় নিজের শৈশবের বর্ণনা–

"শ্যামবাজারেতে জন্ম মাতুল-আবাসে।
দাদার কুটীর দীন শ'বাজার পাশে।।
হারায়ে পৈত্রিক হর্ম্ম ধন জন নাম।
এই স্থানে অল্পদিন পেয়েছেন ধাম।।

এ বাড়ী ও বাড়ী ওঠে আনন্দের রোল।
শুনেছি মাসেককাল বাজিয়াছে ঢোল।।
পৌত্র পেয়ে পিতামহ অর্থশোক ভুলে।
দেছেন ঢুলিরে দান গাত্রবস্ত্র খুলে।।

কবিতাব দাদা, পিতামহ গঙ্গানাবায়ণ। অমৃতলালের জন্মের বছর, ভিন্নমতে, ১৮৫২-য়।

মে

দেবেন্দ্রনাথ নিজেই তত্ত্ববোধিনী সভা-ব সম্পাদক। এতদিন সম্পাদক ছিলেন বমানাথ ঠাকুবের ছেলে নৃপেন্দ্রনাথ।

২ মে

হীবা বুলবুল একজন পশ্চিমি গণিকা। হিন্দু কলেজে ভর্তি হল তাব ছেলে। তাবপরই বাধল কলেজের ম্যানেজিং কমিটিব লডাই এডুকেশন কাউন্সিলের সঙ্গে। কাউন্সিল ছাত্রটিকে পডতে দিতে চায, গণিকাব সন্তান হওয়া সত্ত্বেও। বিদ্যাসাগব বলেছিলেন—"মা দুশ্চরিত্রা হইতে পাবে, কিন্তু পুত্র কি দোষ কবিল যে সে বিদ্যালযে পডিতে পাইবে না ? মাতার দোষে নিবপবাধ পুত্রেব শাস্তি হওয়া উচিত নয়।" কমিটির জেদ, বহিষ্কাব করতে হবে ছাত্রটিকে। শেষ পর্যন্ত হিন্দু কলেজের কমিটি থেকে বেবিয়ে এলেন অনেকেই। ওযেলিংটন স্কোয়ারেব বিখ্যাত দত্ত পরিবারের ছেলে বাজেন্দ্র দত্ত-র নেতৃত্বে চিৎপুবের সিঁদুবিয়া পটির বামগোপাল মল্লিকেব বাডিতে গড়া হল নতুন কলেজ, হিন্দু মেট্রোপলিটান নাম দিযে। পবিচালনা কমিটিব সভাপতি, বাধাকান্ত দেব। প্রধান পৃষ্ঠপোষক, মতিলাল শীল। কমিটিব প্রধান সদস্যরা হলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব, বাজেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ। প্রধান সমর্থক হবিমোহন সেন। নিজের ছেলে কেশবচন্দ্রকে হিন্দু কলেজ থেকে ছাডিযে ভর্তি কবে দিযেছিলেন এখানেই। কলেজের উন্নতিব জন্যে রানী বাসমণিব দান দশ হাজাব টাকা। কলেজেব অধ্যক্ষ ক্যাপটেন বিচার্ডসন। আর বাংলাব অধ্যাপক বামনাবাযণ তর্কবত্ন, সদ্য সংস্কৃত কলেজ থেকে পাস ক'রে।

৩ মে

মন্মথনাথ ঘোষ-এব 'সেকালেব কৃতী বাঙালী'-ব মধ্যে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যাযকে নিযে যে প্রবন্ধ, সেখানে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজেব প্রতিষ্ঠা দিবস এই তাবিখে।

> "গভর্ণমেণ্ট হিন্দু কলেজেব কর্তৃত্বভাব স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া ইচ্ছামত পরিচালন করিতে আবম্ভ করিলে হিন্দু নেতাবা জাতীয় কর্তৃত্বাধীনে একটি মহাবিদ্যালয স্থাপনেব সংকল্প কবেন। অক্রুব দত্ত বংশীয বাজেন্দ্র দত্ত এই বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তিনি তৎকালে বণিক সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ কবিয়াছিলেন এবং পাণ্ডিত্যেব জন্যও প্রসিদ্ধিলাভ কবিযাছিলেন। তাঁহার গার্হস্থ্য পাঠাগাবের ন্যায লাইব্রেরী কলিকাতায় অতি অল্পই ছিল। আমি সেই লাইব্রেরীর ধ্বংসাবশেষ দেখিয়াছি। মতিলাল শীলের একটি ফ্রী স্কুল ছিল। উহাব জন্য শীল মহাশয যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতেন। রাজেন্দ্রবাবু উক্ত বিদ্যালয প্রস্তাবিত কলেজেব অন্তর্ভুক্ত কবিয়া তাঁহার নিকট হইতে মাসিক ৪০০ টাকা সাহায্যেব ব্যবস্থা করিয়া লন। তিনি স্বয়ং বিদ্যালয়ের ব্যয নির্ব্বাহার্থ অনেক টাকা দিতেন।
> ৩রা মে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ নাম দিয়া এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি স্যার জেমস্ কলভিনের সমক্ষে বড়বাজারে সিঁদুবিযাপটীতে এই বিদ্যালয়ের দ্বার প্রথম উন্মুক্ত হয়।"

এ ছাড়াও মন্মথনাথের ঐ প্রবন্ধে পাওয়া যায় কলেজ সংক্রান্ত আরও কিছু তথ্য। এখানে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দেওয়ার কিছুকাল আগে হিন্দু কলেজ থেকে কর্মচ্যুত হয়েছিলেন রিচার্ডসন। তাঁর চরিত্রদোষের দৃষ্টান্তকে বরদাস্ত করতে পারেন নি শিক্ষাপরিষদের সভাপতি বেথুন সাহেব। রাজেন্দ্রনাথ সেই বিচার্ডসনকেই টেনে আনলেন নিজের কলেজে ৪০০ টাকা মাইনেয়। এ ছাড়া অন্যান্য শিক্ষক–

ইংরেজি সহিত্যের অধ্যাপক— ক্যাপটেন পামার। বিখ্যাত ইংরেজ ব্যবসায়ী জন পামারের ছেলে।

দর্শনের অধ্যাপক– 'মর্নিং ক্রনিকল'-এর সম্পাদক ক্যাপটেন হ্যারিস।

ইতিহাসের অধ্যাপক– 'ফ্রি-মেসন্স ফ্রেণ্ড'-এব সম্পাদক উইলিয়াম কার্কপেট্রিক।

গণিতের— উইলিয়মে মাষ্টার্স।

স্কুল বিভাগের প্রধান শিক্ষক– ভিলা নওজারেথ।

পরবর্তীকালে খ্যাতনামা, এই কলেজের ছাত্রেরা–
শম্ভুচন্দ্র পাল, কৃষ্ণদাস পাল, কেশবচন্দ্র সেন, প্রথম বাঙালি চীফ জাস্টিস বমেশচন্দ্র মিত্র, 'ইণ্ডিয়ান মিবব'-এর সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন, শীলস ফ্রী কলেজেব প্রিন্সিপ্যাল যদুনাথ ঘোষ। শ্রেষ্ঠ ইংরেজি প্রবন্ধের জন্যে লরেন্স পীল পুবস্কার পাওয়া নীলমণি দে, জয়গোবিন্দ লাহা প্রমুখ।

হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ উঠলেও হিন্দু কলেজকে নিযে মেটেনি হিন্দু সমাজের সমস্যা। তাঁরা দাবি তোলেন যেহেতু হিন্দু সম্প্রদায়ের টাকায তৈরি হয়েছিল এই কলেজ, হিন্দু সমাজেব হাত থেকে তার কর্তৃত্ব চলে গেলে তাদের টাকা ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। হিন্দু সমাজ থেকে নানাভাবে প্রতিবাদ উঠলে সরকার এডুকেশন কাউন্সিলের সেক্রেটারিকে চিঠি লিখে জানতে চাইলেন তাঁদের বক্তব্য। উত্তর এল ৬ মাস পরে।

> "নূতন নিয়ম কিছুই করা হয় নাই, পূর্ব্ব নিয়মানুরূপ কার্য্য হইতেছে, বেশ্যাপুত্র যে নিযুক্ত হইয়াছিল তাহা আমারদিগের জ্ঞাতসারে হয় নাই, যখন তাহাকে বারাঙ্গনা সুত জানিতে পারিলাম তখনই বিদায় কবিযা দিলাম, এবং খ্রীষ্টান ও মুসলমান বালক নিযুক্ত করণের বিষয় এজুইকেশন কৌন্সিলেব বিবেচনাধীনে রহিয়াছে, অদ্যপি সে বিষয় নিষ্পন্ন করান যায় নাই।..."

এই বিতর্কের পরিণামেই দু বছর পরে হিন্দু কলেজ ভেঙে জন্ম হবে প্রেসিডেন্সি কলেজের।

জুন
বিদ্যাসাগরের সম্পাদনায় বেরলো কালিদাস-এব 'রঘুবংশম'।

১৪ জুন
'সংবাদ প্রভাকর'-এর খবর–

> "ঁনন্দলাল সিংহ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ বঙ্গভাষার অনুশীলন জন্য এক সভা করিয়াছেন।"

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্বাস, এই সভাই 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'। মন্মথনাথ ঘোষ-এর মতে ১৮৫৬-য় স্থাপনা। আবার ১৮৫৬-র ১ফেব্রুয়ারি প্রভাকর-এ জানানো হয়েছে–

> "৭ মাঘ শনিবার যামিনী ৭ ঘণ্টার সময়ে বিদ্যোৎসাহিনী সভার সাম্বৎসরিক সভা নির্ব্বাহিত হইয়াছে।... এই সভার বয়ঃক্রম একবৎসর হইল।"

অথচ ১৮৬১-তে বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে মাইকেল মধুসূদনকে যে মানপত্র দেওয়া হয় সেখানে বলা হয়েছে–

"প্রায় ছয় বর্ষ অতীত হইল বিদ্যোৎসাহিনী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে।" কালীপ্রসন্ন-গবেষক পরেশচন্দ্র দাস-এব সিদ্ধান্ত, ১৮৫৩-র জ্যৈষ্ঠমাসে যে-সভা গড়ে উঠেছিল তার নাম 'বিদ্যোৎসাহিনী' সভা ছিল না। সেটা ছিল এক ধরনের ডিবেটিং ক্লাব। 'বিদ্যোৎসাহিনী' নামকরণ হয়েছে ১৮৫৫-য়।

'ডিবেটিং ক্লাব'-এর কথাটা তুলেছেন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যও।

> "আমাব যখন ১৫।১৬ বৎসর বয়স, তখন কালীপ্রসন্ন সিংহেব সহিত আমার প্রথম আলাপ হয। প্রথম পবিচয ঠিক কেমন করিযা কোন সময়ে হয, তাহা এখন আমাব স্মবণ নাই। তাঁহাব বাড়ীব দোতালায একটি Debating Club ছিল, আমি সেই সভার সভ্য হইযাছিলাম। সেই স্থানে কৃষ্ণদাস পালেব সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয। এখনও আমাব বেশ মনে আছে, সেদিন কৃষ্ণদাস পাল Commerce সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা কবেন; ইংরাজীতে তাঁহার সেই বক্তৃতা শুনিযা আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম।... আমিও প্রবন্ধ পাঠ কবিতাম, কিন্তু বাঙ্গালায। আমি ছেলে মানুষ বলিযাই হৌক বা আর কোনও কাবণেই হৌক, প্রবন্ধগুলিব জন্য আমি প্রশংসা পাইতাম।... কালী সিংহ সভাব নাম দিযাছিলেন 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'; দুষ্ট লোকে তাহাব নামকবণ কবিল 'মদ্যোৎসাহিনী সভা'। তিনি সভাব patron গোছ ছিলেন। কখনও কোনও প্রবন্ধ পাঠ কবিয়াছিলেন কিনা মনে পড়ে না। মধ্যে মধ্যে সভ্যদিগেব ভোজনাদিব ব্যবস্থা হইত; আমি কিন্তু কখনও আহারাদিতে যোগদান করি নাই।"

পবেশ দাস কৃষ্ণকমলেব এই স্মৃতিচাবণায খুঁজে পেযেছেন কিছু ভ্রান্তি। কালীপ্রসন্ন যে patron গোছ-এব চেয়ে বেশি কিছু ছিলেন মনে কবিয়ে দিযেছেন সেটা। ছিলেন সভার সম্পাদক। আব ঐ সভায নানা সমযেই পাঠ কবেছেন একাধিক প্রবন্ধ। পবে, 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' বেরনোর পব ছাপাও হযেছে সে-সব। ১৮৫৬-ব ১৫ মার্চ-এর প্রভাকব-এ বেবনো সংবাদ উদ্ধৃত কবে দেখিযেছেন তাঁব "বঙ্গদেশে কুরীতি' বিষযক প্রবন্ধ পাঠেব কথা।

জুলাই

দ্বাবিকানাথ বায বেব কবলেন মাসিক 'সুলভ পত্রিকা'। এই পত্রিকাব মলাটেব চার কোণে ছাপা হত নীচেব চাবটি পঙক্তি–

> বাল্যকাল হবিলে হে ক্রীড়াব প্রসঙ্গে।
> যৌবন হবিলে সদা মদগর্ব্ব রঙ্গে।
> বার্দ্ধক্য হবিলে বৃথা চিন্তার তবঙ্গে।
> প্রণয করিবে কবে জ্ঞানরত্ন সঙ্গে।

৪ জুলাই

শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী 'ছদ্মনামে লেখা 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা'-ব কবি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যাযেব জন্ম বর্ধমানের বুড়ার গ্রামে। বাবা, ঠাকুরদাস।

১৬ জুলাই

শিক্ষা পবিষদকে লেখা দীর্ঘ চিঠিতে বিদ্যাসাগর জানালেন—সংস্কৃত কলেজের ইংরেজি

বিভাগকে ভালো করে চালাতে গেলে কমপক্ষে, পাঁচজন শিক্ষকের দরকার। কাজ হয়েছিল আবেদনে। অল্প সময়ের মধ্যেই ইংরেজি অধ্যাপক হয়ে প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী আর গণিতের অধ্যাপক হয়ে শ্রীনাথ দাস-এর যোগদান। মাইনে মাসে একশো টাকা। সংস্কৃতে অঙ্ক শেখানোর বেওয়াজ তুলে দিলেন বিদ্যাসাগর। তাব বদলে এল ইংরেজি। ইংরেজি হয়ে উঠল অবশ্য-পাঠ্য বিষয়ের একটি।

২৯ জুলাই

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিব সনদেব শেষ নবীকবণ উপলক্ষে টাউন হলে কলকাতাব বাঙালি নাগবিকদেব জনসভা। রামগোপাল ঘোষ সেখানে প্রচণ্ডভাবে দাবি তুললেন সিভিল সার্ভিস পবীক্ষায় ভাবতীযদেব সুযোগ দিতে। বোর্ড অব কণ্ট্রোলেব সভাপতি চালর্স উড ঐ সময়ে ছকে দিযেছিলেন সিভিল সার্ভিস পবীক্ষার নিয়মকানুন। এখন থেকে ইংলণ্ডে প্রতিযোগিতামূলক পবীক্ষাব মাধ্যমেই ভারতবর্ষেব জন্যে নির্বাচন করা হবে বাজকর্মচারী। পড়াশোনা আব পবীক্ষার জায়গা লণ্ডনেব হাইলেবেবি কলেজ। রামগোপাল ঘোষেব প্রশ্ন —বিদেশেব অপবিচিত আবহাওযায আত্মীয়পরিজনহীন পবিবেশে নিজেদের ছেলেকে পাঠাতে চাইবেন এদেশেব কজন অভিভাবক ? তা ছাড়া সংবাদপত্র থেকে তিনি জেনেছেন সামবিক বিভাগেব এক কলেজে ভর্তির সুযোগ পাবে কেবল তাবাই যাবা জন্মসূত্রে ব্রিটেনের।

> "এর থেকে খোলাখুলিভাবে জানিয়ে দেওয়া ভাল যে ভাবতবর্ষকে শাসন করা হবে শাসিতদেব মঙ্গলেব জন্যে নয়, শাসকদেব মঙ্গলেব জন্যেই। তাহলে ঘুচিযে দেওযা হোক সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। মুছে ফেলা হোক বাজনৈতিক সুযোগ সুবিধে আর অর্জিত অধিকারেব চিহ্নগুলো। সারা দেশে নিষিদ্ধ করা হোক জনসভা। জানিয়ে দেওয়া হোক যে হাত আবেদনপত্র লিখবে, ছিন্ন করা হবে সেই হাত।"

অবশ্য এর পরেই জর্জ টমসনের আদর্শে দীক্ষিত বামগোপাল ঘোষ বলবেন—ঈশ্বরেব আশীর্বাদে ভাবতবর্ষে এখন যে ইংবেজ সবকার, তার পক্ষে এ-জাতীয অন্যায় আচবণ অসম্ভব।

আইন আদালতে ভাবতীযদের সমানাধিকাবের ভিত্তিতে তিনিই লিখেছিলেন—'A few remarks on certain Draft Acts, commonly called Black Acts'। এর মধ্যে নীলকব সাহেবদেব অত্যাচাবেব বিরুদ্ধে নিন্দে থাকায তাঁকে খোযাতে হয এগ্রি-হর্টিকালচাবাল সোসাইটির সহ-সভাপতিব পদ।

জুলাই-আগস্ট

শিক্ষা-সংসদের আমন্ত্রণে কলকাতায় এলেন বাবাণসী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ব্যালাণ্টাইন। সঙ্গে একজন পণ্ডিত। এরপর সংস্কৃত কলেজ দেখে-শুনে তিনি পেশ করবেন তাঁব সুদীর্ঘ বিপোর্ট, যার মুল কথা— কলেজে সংস্কৃত আর ইংবেজি দুটোই পড়ানোর ফলে, দুই ভাষার শিক্ষাব মধ্যে কোথায় মিল-গবমিল তা বুঝে নিতে কষ্ট হয় ছাত্রদের। এটা সন্তোষজনক নয়। সুতরাং নির্দিষ্ট পাঠের বাইরে আরও কিছু পাঠ্য বই-এর প্রচলন প্রয়োজন।

শিক্ষা সংসদ নিজেরা মুখ না খুলে ব্যালাণ্টাইনকে ডেকে পাঠিয়েছিল বিদ্যাসাগরেব চরিত্রের একরোখামিকে ভয় করেই। ডেকে পাঠানোর আসল কারণ গত বছরের ১২ এপ্রিলে ছোটলাট হ্যালিডে-ব কাছে পাঠানো তাঁর দীর্ঘ পরিকল্পনা, সংস্কৃত কলেজেব শিক্ষাব্যবস্থার

পরিবর্তন চেয়ে। হ্যালিডে সেটি পড়ে, সঙ্গে নিজের একটি নোট জুড়ে, পাঠিয়ে দিযেছিলেন শিক্ষা-সংসদেব কাছে। শিক্ষা-সংসদই নিজেদেব দায়-দায়িত্ব এড়াতে ডেকে পাঠিয়েছিলেন ব্যালান্টাইনকে।

১০ আগস্ট

শিক্ষা পরিষদ-এর সদস্য জে. আব. কলভিন আর আরো কয়েকজন মুসলমান ছাত্রদের ইংরেজি শেখানোর সমস্যার সমাধানেব জন্যে পবামর্শ চাইলেন আবদুল লতিফ খাঁব কাছে। অতঃপর তাঁর প্রস্তাব মেনেই কলকাতা মাদ্রাসায় খোলা হবে নতুন 'ইঙ্গ-পাবস্য' বিভাগ। লতিফ খাঁ নিজেও ঘোষণা কবেছিলেন ১০০ টাকার পুরস্কাব। ইংবেজি শিক্ষাব সুফল নিযে ফাবসিতে লেখা শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধেব জন্যে। এই তাবিখে 'কলকাতা গেজেট'-এ পুবস্কাব ঘোষণা কবে বিজ্ঞাপন।

১৮ আগস্ট

ডাবলউ. সি. ব্যাকিযাব-এব মৃত্যু। কলকাতাব ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন দীর্ঘ পঞ্চাশ বছব। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠাব সূচনা পর্বে কমিটির অন্যতম সদস্য। দর্জিপাড়ায় তাঁব নামে স্কোযার।

২৯ আগস্ট

শিক্ষা-সংসদ বিদ্যাসাগরেব কাছে পাঠিযে দিলেন ব্যালান্টাইনেব বিপোর্ট।

৭ সেপ্টেম্বব

বিদ্যাসাগব ব্যালান্টাইনের মতামতেব বিস্তৃত সমালোচনা করে নিজেব সুস্পষ্ট মতামত লিখে পাঠালেন সংসদের কাছে। ব্যালান্টাইন-এব সঙ্গে তাঁব কোন কোন বিষযে মতপার্থক্য তা জানাতে গিয়ে ব্যালান্টাইন-সমালোচনাব সূত্রেই হিন্দুদর্শন আব ভাবতীয শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদেব সম্পর্কেও জানিযে দিলেন নিজেব বিরুদ্ধ মত। যেমন, হিন্দু দর্শনে এমন সব অংশ আছে যাব মধ্যে সাব পদার্থ নেই, আব তা অন্য ভাষায প্রকাশ করাটা সেই কাবণেই কঠিন। কিংবা, আবব খলিফাদের চেযেও ভাবতীয পণ্ডিতদেব গোঁড়ামি অনেক বেশি। তাঁদেব বিশ্বাস, ঋষিদেব শাস্ত্রবচন মানেই অভ্রান্ত। কাজ কবাব অখণ্ড স্বাধীনতা চেযে ঐ প্রতিবেদনে জানালেন

> "অবশেষে আমি সবিনযে শুধু এইটুকুই নিবেদন কবতে চাই যে আমাকে যদি আমার নিজেব পদ্ধতি অনুযাযী কাজ কবতে দেওয়া হয, তাহলে সংসদেব কাছে এইটুকু আমি বেশ জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে সংস্কৃত কলেজ কেবল যে বিশুদ্ধ সংস্কৃত শিক্ষাব আদর্শ পীঠস্থান হবে তাই নয়, মাতৃভাষা চর্চাবও প্রধান কেন্দ্র হযে উঠবে। এমন একদল ভবিষ্যতের শিক্ষক তৈবি হবে এখান থেকে, যাঁবা দেশেব জনসাধারণেব মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেব প্রসারের পথ সুগম করবেন।"

এই সরকারি বিপোর্টেব বাইরে ব্যক্তিগতভাবেও একটা আধা-সরকারি চিঠি লিখেছিলেন শিক্ষা-সংসদের সেক্রেটারি ডঃ মৌয়াটকে।

> "ডঃ ব্যালান্টাইনেব রিপোর্ট সম্পর্কে শিক্ষা-সংসদের নির্দেশ আমি ধীবভাবে বিবেচনা কবে দেখেছি। যদি এই নির্দেশগুলি আমাকে বর্ণে বর্ণে পালন করতে হয, তা হলে সংসদের সম্মতিক্রমে সম্প্রতি আমি নিজের যে পাঠ্যসূচী কলেজে চালু করেছি, তাতে হস্তক্ষেপ করা হবে আমার ধারণা। তার ফলে কলেজে আমার নিজের মর্য্যাদাই যে ক্ষুণ্ন

হবে তাই নয়, আমার শিক্ষার কাজে ব্যাঘাত ঘটবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতাও অনেক খানি কমে যাবে।...

আমাদের সংস্কৃতশিক্ষা দিতে দিন, প্রধানতঃ বাংলাভাষার উন্নতির জন্যে। তার সঙ্গে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান আয়ত্ত করার সুযোগ দিন। এই সুযোগ পেলে আমি নিশ্চিত হয়ে আপনাকে বলতে পারি যে সংসদের উৎসাহ ও সমর্থন থাকলে, আমি কয়েকবছরের মধ্যে এমন একদল শিক্ষিত যুবক তৈরি করে দিতে পারব, যারা নিজেদের রচনা ও শিক্ষার দ্বারা দেশের জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিদ্যা প্রসারে, আপনাদের প্রাচ্য-বিদ্যার অথবা শুধু ইংবেজী বিদ্যার পণ্ডিতদের চেয়ে, অনেক বেশি সাহায্য করতে পারবে।"

অনুবাদ : বিনয় ঘোষ

বিদ্যাসাগবকে এবপব স্বাধীনভাবে কাজ কবার সুযোগ কবে দিয়ে বিদ্যাসাগব-ব্যালান্টাইন বিবোধেব সাময়িক মীমাংসা ঘটানো হলেও, কারো কারো মনে পাকা আঁচড় কেটে থাকবে একধবনেব চাপা ক্ষোভ। কেননা, এবপব থেকেই অন্যভাবে নানান চাপ তৈবি হতে থাকবে তাঁব উপব।

২৬ সেপ্টেম্বব

ওবিয়েন্টাল সেমিনারি-ব ছাত্রবা গড়ে তুলল ওবিয়েন্টাল থিয়েটাব। অভিনীত হল শেকসপীয়রেব 'ওথেলো'।

"ওরিয়েণ্টাল-এর আদর্শে কযেক বৎসব ধবিয়া নানাস্থানে ইংরেজিতে শেকসপীযরের নাটকগুলি অভিনীত হইতে লাগিল। কিন্তু ইংবেজি ভাষায় অভিনয় হওযায় জনসাধাবণ নাটকীয় বসাস্বাদনে বঞ্চিত হইত। অভিনযোপযোগী সে সময় বাঙ্গালা নাটক ছিল না। 'বিল্বমঙ্গল' ও 'ভদ্রার্জুন' নামক দুই একখানি নাটক ছিল। তাহাতে আবার দৃশ্যবিভাগ বা প্রবেশ প্রস্থানও লিখিত ছিল না, ভাষাও মার্জিত নহে।"

গিরিশচন্দ্র/অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

৫ অকটোবব

'ওরিয়েণ্টাল থিয়েটাব'-এ দ্বিতীয় বার 'ওথেলা'-ব অভিনয়।

২২ অকটোবর

হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে 'মাতৃভাষায় শিক্ষায প্রয়োজনীযতা' বিষয়ে রামনারাযণ তর্কবত্নের দেওয়া ভাষণ ছেপে বেরলো পুস্তিকা হয়ে।

"তোমবা যেমন মনযোগ পূর্ব্বক ইংরাজী শিখিবে, বাঙ্গালাও সেইরূপ শিক্ষা করিবে, বাঙ্গালার প্রতি কদাচ অনাস্থা করিবে না; বাঙ্গালা এতদ্দেশীয় মাতৃভাষা, সুতরাং এই মাতৃভাষাব প্রতি ভক্তি রাখা নিতান্ত আবশ্যক।"

২৯ অকটোবর

বর্ধমান জেলার বেরু গ্রামে বাংলা ভাষায় উদ্ভিদ আর কৃষিবিদ্যা চর্চার অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ গিরিশচন্দ্র বসুর জন্ম, বাবা, জানকীপ্রসাদ।

রাধাকান্ত দেব-এর বাড়িতে সভা। বিধবাবিবাহকে হিন্দু শাস্ত্রসম্মত হিসেবে মেনে নেওয়া হল সেখানে। পরে সমর্থনকারীদের অনেকেই হয়ে উঠবেন এর ঘোরতর বিরোধী।

৩০ অকটোবর

বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনতত্ত্বে অনুপ্রাণিত হয়ে একদিন 'অনুশীলন সমিতি' নামে বাংলাদেশে প্রথম রাজনৈতিক গুপ্ত সমিতি করবেন যিনি সেই প্রমথনাথ মিত্রের জন্ম চব্বিশ পবগনাব নৈহাটিতে। পি. মিত্র নামেই ছিল তাঁর জন-পরিচয়।

৯ নভেম্বর

বেরলো গৌরীশঙ্কব ভট্টাচার্যেব 'ভূগোলসাব'।
'পৃথিবীব আকাব ও বিববণাদি নিরূপক নানা গ্রন্থ হইতে সংক্ষেপে সংগ্রহ।'

১ ডিসেম্বর

কুমার দেবেন্দ্র মল্লিকের একমাত্র পুত্র নগেন্দ্র মল্লিকেব জন্ম।
'সংবাদ প্রভাকব'-এ বিজ্ঞাপন দিয়ে বিদ্যাসাগব জানিয়ে দিলেন যে তাঁব প্রেস হেদুয়াব ৪৪/৬ বাড়ি থেকে উঠে যাচ্ছে ৪২ দুর্গাচবণ মিত্র স্ট্রিটে।

৬ ডিসেম্বর

প্রাচ্যবিদ্যাবিদ মহামহোপাধ্যায হবপ্রসাদ শাস্ত্রীব জন্ম নৈহাটিব বিখ্যাত ভট্টাচার্য বংশে। বাবা, বামকমল ন্যায়রত্ন। অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক হিসেবে খ্যাত তাঁব প্রপিতামহ মাণিকা তর্কভূষণ পলাশীর যুদ্ধেব অল্পদিন আগে বা পবে যশোহর জেলার কুমিবা গ্রাম ছেড়ে চলে আসেন নৈহাটিতে।

২২ ডিসেম্বর

বাঁকুড়াব জযবামবাটিতে শ্রীশ্রী মা সাবদামণিব জন্ম। বাবা, বামচন্দ্র মুখোপাধ্যায। স্বামী, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।

২৬ ডিসেম্বর

লালা হাজারিলালের মৃত্যু।

১৮৫৪

বঙ্কিমচন্দ্র নয, কবি বঙ্কিমচন্দ্রেব জীবনে যেন স্বেচ্ছা-নির্বাসনেব বছব এটি। গত বছরে 'সংবাদ প্রভাকর'-এ শুধু কবিতা লিখেই নয, কালেজীয কবিতা যুদ্ধেব উত্তেজক খেলায় অংশ নিয়ে নিজেকে মাতিয়ে রেখেছিলেন টগবগে আবেগে। আমাদেব প্রত্যাশাকে সেটাই উন্মুখ করে তুলেছিল এই বকম একটা বোধে যে প্রভাকব-এব পাতায এবপর আমরা প্রত্যক্ষ করব তাঁব কবিতার ভিন্নতব শাখাপ্রশাখাময বিস্তার, ক্রমাগত নতুন নতুন পাপড়ি-ছড়ানো বিকাশ। মনে হয়েছিল, কালেজীয কবিতা যুদ্ধেব উত্তেজনা নিভে গেলে, তাঁর কবিতায় বেজে উঠবে সৃজনের নতুনতর ছন্দ তাল। কিন্তু দৃশ্য হিসেবে যা আমাদের অবলোকনকে ছুঁয়ে বইল, তা এর বিপরীতটাই। জোয়াব জলের উপব তবতরিয়ে ছুটে চলেছিল যে পাল-তোলা নৌকোটা, তাকেই দেখা গেল, অভিমুখ বদলিয়ে, অভিযানকে সমাপ্তিহীনতাব দিকে ঠেলে দিয়ে, হঠাৎ বাঁক নিয়েছে শুকনো ডাঙায নোঙব নামাতে।

এই ৫৪-য়, বছবেব গোড়াতেই কালেজীয কবিতা যুদ্ধের আগুন নিভে ছাই হয়ে গেলেও, গোটা বছবে একটিও কবিতা ছাপা হবে না বঙ্কিমের। এমন-কি কোনো কবিতা নয় দীনবন্ধুবও। তবুও, দু-বছর পবে, ১৮৫৬-য দীনবন্ধু-ব 'বিধবা বিবাহ' নামের একটা কবিতা বেরবে 'সংবাদ প্রভাকর'-এ। কিন্তু বঙ্কিমের আর একটিও নয়। বঙ্কিম ও দীনবন্ধু দুজনেই তখন কলেজের ছাত্র। বঙ্কিম হুগলি কলেজের। দীনবন্ধু হিন্দু কলেজের। এই বছরই তিনি সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা দেবেন। উত্তীর্ণও হবেন ৩০ টাকা বৃত্তি পেয়ে। বঙ্কিমকে প্রস্তুত হতে হচ্ছে তখন জুনিয়র স্কলাবশিপ পরীক্ষার জন্যে। ১৮৫৫-তেই দীনবন্ধু ছাত্রজীবনেব উপর সমাপ্তি-রেখা টেনে দিয়ে যোগ দেবেন সরকাবি চাকরিতে। বঙ্কিমেব দিক থেকে চাকরি তখনো অনেক দূরে। দুজনের জীবনে দু-রকমের প্রস্তুতিপাঠ চলেছে তখন। বঙ্কিমের ক্ষেত্রে আসন্ন পরীক্ষার জন্যে। দীনবন্ধুর ক্ষেত্রে জীবিকার্জনের জন্যে। আবাব ঐ জীবিকা-জীবনই হয়ে উঠবে তেজস্বী নাট্যকাররূপে তাঁর আকস্মিক আত্মপ্রকাশের প্রস্তুতিপর্বের কাল। আপাতদৃষ্টিতে হিসেবটা এই রকমই। কিন্তু পরে ১৮৫৬-য় বেরনো বঙ্কিমের 'ললিতা, পুরাকালিক গল্প। তথা মানস' নামের

প্রথম কবিতার বই বেরনোর সূত্রে আমরা যা জানাব. তা বুঝিয়ে দেবে যে আদৌ যখন তাঁর কোনো কবিতা ছাপা হচ্ছে না পত্রিকায়, তখনও কবিতা-মন্দ্রিত তিনি লিখে চলেছেন কবিতা। তাহলে কি ১৮৫৪-য়. স্কুলের পরীক্ষার বাইরে আরেক প্রস্তুতিপর্ব চলছিল তাঁর জীবনের ঐ পর্বে? আর সে কি নিজের ঈষৎ-অস্পষ্ট কবি-মূর্তির আদলটাকে পরিণত অবয়বে পৌঁছিয়ে দিতে ? আর সেই কারণেই কি আত্মপ্রকাশের মঞ্চে তাঁর সাময়িক অনুপস্থিতি ? অতএব ঘটনাচক্রে নয়, ভিন্নতর ঘটনা সংগঠনের সংকল্পে ১৮৫৪-য কবি বঙ্কিম আর কবি দীনবন্ধু নীরব। কিন্তু অন্যেরা ? কী করছেন রঙ্গলাল ? অথবা মধুসূদন ?

বঙ্গলালও, আশ্চর্য. প্রকাশ্য মঞ্চ ছেড়ে তখন গ্রীনরুমে। সম্পাদক হিসেবে ১৮৪৯-য় জড়িয়ে গিয়েছিলেন 'সংবাদ সাগর' নামের যে সাপ্তাহিক পত্রিকার সঙ্গে. ৫৩-য বন্ধ হয়ে গেছে সেটা। ১৮৫৬-য় অবশ্য আবার তাঁকে সম্পাদনায় জড়িয়ে পড়তে দেখা যাবে 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ'-র সঙ্গে। এই বছরে. অর্থাৎ ৫৬-য়. 'সংবাদ প্রভাকর'-এ বেরবে তাঁর কবিতা 'প্রভাত', দীর্ঘ দু-বছরের নিঃশব্দ বিরতির পর। কিন্তু ৫৪/৫৫ দুটো বছরই তাঁর সাহিত্যজীবন থেকে যাবে অনুর্বরতায় মোড়া। ৫২-য হাত লাগিয়েছিলেন টডের বিস্তৃত রাজস্থান ইতিবৃত্ত থেকে ভীমসিংহ আর পদ্মিনীর কাহিনীটুকুকে ছেঁকে নিয়ে 'পদ্মিনীর উপাখ্যান' নামের এপিকধর্মী কবিতা রচনায়। সে কাজে তাঁর প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন রাজা সত্যচরণ ঘোষাল। ১৮৫৫-র মাঝামাঝি তাঁর মৃত্যু হলে শোকার্ত রঙ্গলাল বন্ধ করে দেন সে লেখা। আবার হাত লাগাবেন ৫৭-য। 'পদ্মিনীর উপাখ্যান' বই হয়ে বেরবে পরের বছর। এ থেকেই অনুমেয়, ১৯৫৪ থেকে বঙ্গলালের জীবনেও চলেছে একটা গোপন প্রস্তুতিপর্ব, 'পদ্মিনীর উপাখ্যান' রচনার মধ্যে দিয়ে বাংলা কবিতার বদ্ধ জলাধারে দূর সমুদ্রের দুরন্ত কলধ্বনি পৌঁছিয়ে দিতে।

এখানে উঠতে পারে সংগত একটা প্রশ্ন। বঙ্গলাল পরিচিত ছিলেন একদিকে ঈশ্বরচন্দ্র অন্য দিকে তাঁর বিপরীত বলয়ের মধুসূদনের সঙ্গে। আর এও আমাদের স্বীকার্য হতে বাধা নেই যে ঈশ্বরচন্দ্রের যুগটা হঠাৎ এক লাফে পৌঁছে যায় নি মধুসূদনের যুগান্তকারী অধ্যায়ে। মাঝখানের দীর্ঘ ফাঁকটাকে জুড়ে দেওয়ার যে সেতু, সেটা বঙ্গলালেরই হাতে গড়া। প্রশ্নটা এই, বঙ্গলালের 'পদ্মিনীর উপাখ্যান' নির্বাচনের পিছনে কি কোনোভাবে প্রেরণার ভূমিকা নিয়ে থাকতে পারে মধুসূদনের 'ক্যাপটিভ লেডি' ? ১৮৪৯-এ বইটি মাদ্রাজে ছেপে বেরনোর পর কলকাতায় সাড়া তুলতে পারে নি তেমন। তবুও অনুরাগী বন্ধুরা, তাঁর সাহায্যার্থেই অশেষ কষ্টে-সৃষ্টে বিক্রয় করতে পেরেছিল মাত্র ৫০।৬০টি কপি। ব্যক্তিগত ভাবে না কিনলেও, বঙ্গলালের পক্ষে ঐ বইটি পড়ে নেওয়ার ইচ্ছে-আগ্রহ যতটা স্বাভাবিক, সংগ্রহ করার সুযোগ-সুবিধেটাও ততখানি সুলভ। 'ক্যাপটিভ লেডি'র পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তা আর পদ্মিনী উপাখ্যানের ভীমসিংহ-পদ্মিনী— এই দুই যুগলই মধ্যযুগের ইতিহাসকে আলোকিত করে রেখেছে তাদের রক্ত-বর্ণ ডিঙোনো প্রণয়ের বিশুদ্ধ বিষাদে।

তাহলে কি গোটা ১৮৫৪-টাই একটা প্রস্তুতিপর্বের বছর ? মনে হচ্ছে এর উত্তরে হ্যাঁ বলাটা নাও শোনাতে পারে খুব একটা দুঃসাহসিক উচ্চারণ। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'-এ বঙ্গসমাজের পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন ১৮৫৬ থেকে ১৮৬১ পর্যন্ত সময়টাকে।

"এই কালের মধ্যে বিধবা বিবাহের আন্দোলন, ইণ্ডিয়ান মিউটিনী, নীলের হাঙ্গামা, হরিশের আবির্ভাব, সোমপ্রকাশের অভ্যুদয়, দেশীয় নাট্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তিরোভাব, ও মধুসূদনের আবির্ভাব, কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ ও ব্রাহ্মসমাজে নবশক্তির সঞ্চার প্রভৃতি ঘটনা ঘটিয়াছিল।"

১৮৫৬-য় বিধবা বিবাহ নিয়ে তীব্রতর হয়ে উঠবে যে আন্দোলন, তার শুভসূচনা কিন্তু এই বছরেই। বিধবা বিবাহ নিয়ে তাঁর প্রথম বইটি এই বছরেই লিখবেন বিদ্যাসাগর। দু বছর পবে দাউ দাউ জ্বলে উঠবে যে মশাল, বাঙালি সমাজ দীর্ঘ সময় জুড়ে উত্তপ্ত হয়ে থাকবে যার অগ্নিচ্ছটায়, তারই জন্ম-বীজ রোপিত হল গ্রন্থাকারে।

এই বছরেই দুভাগ হযে যাবে হিন্দু কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজের জন্ম হবে যা থেকে। প্রেসিডেন্সি উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র হয়ে ওঠাব সঙ্গে সঙ্গেই দাবি উঠবে কলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনেব। অন্যদিকে সংস্কৃত কলেজ থেকে উঠে যাবে আগের বিধিনিষেধ, ব্রাহ্মণ বৈদ্য ছাড়াও অন্য হিন্দু পবিবারের ছেলেদেব জন্যেও খুলে দেওয়া হবে দরজা। প্রস্তাব উঠবে, সারা দেশে ১৫০টা মডেল স্কুল গড়াব । দায়িত্ব পড়বে বিদ্যাসাগরের উপরই। আর এই মডেল স্কুল গড়ার অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি বুঝলেন ভিন্নতব পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা। নিজে তো কলম ধরবেনই, শিক্ষাক্ষেত্রে সহকর্মী অনেককেই উদবুদ্ধ করবেন শিশুপাঠ্য বই লেখানোয়।

এ বছরেই তৈবি হবে 'শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী সভা'। বলতে গেলে এদেশে শিল্পচর্চার শুভ সূচনা ঘটবে এই প্রতিষ্ঠানের প্রভাবেই। হাতে কলমে ছবি আঁকার ক্লাসেব এই প্রথম শুরু। সমাজ, শিক্ষা, শিল্প এই তিন স্তরেই পরবর্তী বছরগুলোয ঘটবে যে ব্যাপ্ত বিকাশ, তার প্রস্তুতিপর্বেব বছব হিসেবে ১৮৫৪-কে চিহ্নিত করলে ভ্রান্তিবিলাস মনে হওয়াব কারণ নেই কোনো।

৩১ জানুয়াবি

গত বছরে ঝমঝমিয়ে বেজে-ওঠা কালেজীয় কবিতা যুদ্ধের উপর যবনিকা টেনে দিলেন দ্বাবকানাথ অধিকারী নিজেই, 'সংবাদ প্রভাকর'-এ সন্ধিপত্র ছাপিয়ে।

"পবমেশ্বব কি করুণাকর। তিনি আমাদিগকে পরাধীন করিয়াও সর্ব্বপ্রকারে স্বাধীন রাখিযাছেন। অস্মদাদির কর্ম্ম সকল পরীক্ষা করিতে অন্যেব সাপেক্ষ করে না। আমরা আপনারাই তত্ত্ববিষয়েব সুবিচার কবিতে পারি, ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির অনুগামী হইয়া কোন সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে স্বতই আমাদিগের মন সন্তোষরূপ স্নিগ্ধ সলিলে প্লাবিত হয। কিন্তু রিপুগণের পবামর্শ ক্রমে কোন লোক বিনিন্দিত গর্হিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে যদি আপাততঃ অসুখ বোধ না হয তথাপি কিয়ৎকাল পরেই দুঃখরূপ প্রদীপ্ত দাবানলে শরীর কানন দগ্ধ করিতে থাকে। বর্ত্তমান কালেজীয় কবিতা যুদ্ধ এই শেষোক্ত বিষয়ের প্রকৃত প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে। আমি রাগান্ধ হইয়া প্রথমতঃ পবিত্র মিত্রদ্বয়ের সহিত বাক্-বিরোধে প্রবৃত্ত হইয়া অনুতাপে দগ্ধ হইতেছি, এই ঘৃণিত বিবাদের সূত্রপাত আমা হইতেই হয়, এজন্য আমি ইহাতে সংপূর্ণ দোষী তাহা স্বীকার করিয়া উক্ত কবি ভ্রাতা দ্বয়ের বিশেষতঃ মিত্র মিত্রের নিকট মার্জ্জনা প্রার্থনা করিতেছি। মিত্র বাবু লিখিয়াছেন এক হাতে কখনই তালি বাজে না, ইহাতেই বোধ হইতেছে যে তিনিও আপন দোষ জানিতে পারিয়াছেন। আমি ভ্রমেও একবার আপনাকে প্রধান বলিয়া গণ্য করি নাই, বরং ক্ষণকালের নিকট মদীয় মনঃপ্রদেশের মধ্যে দ্বেষের প্রতিভা মাত্র প্রবেশ করিতে পারে নাই। আমি কি কারণে দ্বেষ করিব ইহা বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে অবশ্যই জানিতে পারিবেন। দীনবন্ধু বাবু আমার শেষ লিখিত স্বপ্নটাকে যখন বিচার বিরুদ্ধ

বিবেচনা করিলেন তখন কি মিত্রভাবে তাহার ভ্রম সংশোধন করিতে পারিতেন না? মহাশয় যদিও প্রধান তথাপি লোকের নিকট আত্মগুণ শ্লাঘা করিয়া বলা কি উচিত? আমি আপনাদিগের সহিত আলাপ করিবার জন্য প্রথম প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলাম কিন্তু আলাপ করিতে গিয়া অদৃষ্ট ক্রমে বিষমতর বিলাপ উপস্থিত হইল।

চাহিয়া অমৃতফল, পাইলাম হলাহল,
খুঁজিয়া সকল রত্ননিধি।।

মহাশয় প্রথম কবিতায় লিখিয়াছেন

আঁখি মুদে ভাব গিয়া আপনার স্থানে।
কেন চেয়ে কানা হও বিভাকর পানে।।
স্বপনের বিবরণ বুঝিয়াছি সার।
দিও না দ্বেষের ফুট নয়নেও আর।।
নিজ গুণে নিজ আভা না হোলো প্রবল।
পর আভা ঢাকা দিলে কি হইবে বল।।

হা দীনু বাবু। ইহাতে কাহাকে আত্মাভিমানী বুঝায়, আমি কি আত্মাভা প্রকাশ করিতে অক্ষম হইয়া আপনাদিগের বিমলকর সমূহ প্রকাশ বিষয়ে প্রতিবন্ধক হইয়াছিলাম না দ্বেষাদ্বেষি করিয়া নিন্দাবাদ করিয়াছিলাম? এ সকল বিচার আপনারাই করুন। মহাশয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রিকায় যে সকল গালাগালি দিয়াছেন তাহা এখানে উদ্ধৃত করিলাম না। কারণ সে সমস্ত কথা রসনাগ্রে আনা অনুচিত, বিশেষ মহাশয়ের দোষ দর্শাইয়া ভর্ৎসনা করা আমার অভিলাষ নহে। বিবাদ উপস্থিত হইলে উভয় পক্ষেরই অনিষ্ট হইয়া থাকে। অতএব পূর্ব্বকৃত দোষ সকল মার্জ্জনা করিয়া সাম্প্রতি নামের গুণ ব্যক্ত করিলে পরম পরিতুষ্ট হই। আমারদিগের হুগলি কালেজীয় নবীন সুকবি শ্রীযুত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট এ বিষয়ে আমি সংপূর্ণ অপরাধী নই। তিনি স্বীয় মনঃকল্পিত দোষে আপনাকে কলঙ্কিত বোধ করিয়া মধ্যে একবার হানা দিয়া নানারূপ কটু কহিয়া গিয়াছেন। প্রথমে বোধ ছিল বঙ্কিমবাবু যুদ্ধবিষয়ে বিশেষ পারদর্শী নন। কিন্তু সে দিবসের বিক্রম দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে বিশারদ বলিয়াছেন। এ দেশে অনেকেই কহিয়া থাকেন "যে গরুটা দুধ দেয় সে চোট মারিলেও সহ্য হয়"। বঙ্কিমবাবু সুকবি, বিশেষ সুবোধ, তাঁহার কথায় রাগ করিবার বিষয় কি? যদিও গালাগালি বিষয়ে কবিভ্রাতার নিকট সংপূর্ণ অপরাধী নই তথাপি তিনি আমার অন্যান্য দোষ পাইয়া থাকিবেন। যাহা হউক, তাঁহার নিকটেও ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, এবং বোধ করি তিনি অবশ্যই আমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন। আমরা কবিতা বিষয়ে তিনজনেই একজনের শিষ্য। ইহাতে পরস্পর কলহ করা কোন ক্রমেই উচিত নহে, বরং অন্য কাহারো সহিত বিবাদ উপস্থিত হইলে তিনমনে ঐক্য হইয়া তাহার নিরাকরণ করা কর্ত্তব্য। যাহা হউক, আমি আপনাদিগের মিত্রতা লাভের নিমিত্ত নিতান্ত অভিলাষী হইয়া অদ্য এই সন্ধিপত্র প্রেরণ করিতেছি, মহাশয়েরা কৃপা বিতরণ পূর্ব্বক এ দীন অপরাধীর দোষ সকল মার্জ্জনা করত প্রস্তাবিত বিষয়ে সম্মত হইয়া পরমবাধিত করিবেন, সুকবি মহোদয়েরা দুর্গন্ধ পঙ্ক পরিহার পূর্ব্বক তজ্জনিত পঙ্কজ লইয়াই আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকেন। আপনারা উভয়েই সুকবি। অতএব মল্লিখিত পঙ্কস্বরূপ দুর্গন্ধ দোষ সকল পরিহার পূর্ব্বক অবশ্যই সদুপদেশ রূপ সরোরুহ গ্রহণ করিবেন।

শ্রী দ্বারকানাথ অধিকারী
কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র।"

কালেজীয় কবিতা যুদ্ধের তিন নায়কের দুজন বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয়। একমাত্র দ্বারকানাথই

হারিয়ে গেছেন প্রায় চির-বিস্মৃতিতে। তাঁর সম্পর্কে যেটুকু জানতে পারি এখন তা বঙ্কিমচন্দ্রের 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব' বইয়ের সম্পাদক ভবতোষ দত্ত-র আগ্রহী অনুসন্ধানের পরিণামেই। তাঁর সম্পাদিত ঐ বইয়ের 'পরিশিষ্ট' অংশে দ্বারকানাথ সম্বন্ধে সংগৃহীত তথ্য অবলম্বনেই এখানে সাজিয়ে দেওয়া হল তাঁর আংশিক জীবন-চিত্র। 'সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান'-এও তাঁর সম্পর্কে জানানো হয় নি ঈষৎ বিশদ কিছু।

দ্বারকানাথের জন্ম নদীয়া জেলার আলমডাঙ্গা থেকে চার মাইল উত্তর-পূর্বে গোস্বামী-দুর্গাপুর গ্রামে। বংশপরিচয় অজ্ঞাত। পড়াশোনা কৃষ্ণনগর কলেজে। ভর্তি হওয়ার বছর জানা যায় নি। ১৮৫৩-৫৪য় পেয়েছিলেন জুনিয়র স্কলারশিপ। ১৮৫২-র ৩ জুলাই থেকে 'সংবাদ প্রভাকর'-এ কবিতা লেখার শুরু। ১৮৫৪-র ১৬ অগাস্টে শেষ কবিতা বেরয় ঐ পত্রিকাতেই। নাম, 'বঙ্গভাষার সহিত ইংরাজী ভাষায় কথোপকথন'। ১৮৫৫-য় বেরয় তাঁর প্রথম আর একমাত্র কবিতার বই 'সুধীরঞ্জন'। বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছিল বা দ্বারকানাথ লিখেছিলেন—

> "অস্মদ্দেশে বালকবৃন্দের পাঠোপযুক্ত নীতিগর্ভ কাব্য পুস্তকের অসদ্ভাবে আমার কয়েকজন পরমবন্ধু একখানি পুস্তক প্রস্তুত করিতে আমাকে অনুরোধ করেন। আমি তাঁহাদিগের আদেশানুরূপ এবং স্বদেশ-মঙ্গলের একান্ত ইচ্ছানুবর্ত্তী হইয়া কতিপয় গদ্য পদ্য পরিপূরিত 'সুধীরঞ্জন' নামক এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি সাধ্যানুসারে রচনা করিয়াছি, কিন্তু ইহাতে কতদূর পর্যান্ত কৃতকার্য হইব তাহা পাঠকপুঞ্জের বিবেচনাধীন। এই পুস্তক সর্ব্বসাধারণের সম্যক পাঠোপযোগি করণাশয়ে ইহাতে নীতিবোধ সৎ প্রবন্ধ সকল প্রকটন পূর্ব্বক নানাছলে উপদেশ বাক্য বিন্যস্ত করিলাম। ইহাতে যে সকল বিষয় লিখিত হইল তম্মধ্যে কয়েকটা প্রবন্ধ পূর্ব্বে প্রভাকর-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।
>
> পাঠক মহাশয়েরা গ্রন্থকারের নাম দেখিয়াই ঘৃণাপ্রকাশ পূর্ব্বক পুস্তকখানি পরিত্যাগ করিবেন না, অনুগ্রহ করিয়া একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিবেন, তাহা হইলেই পরিশ্রম ও যত্নের সার্থকতা বিবেচনা করিব। যদিও ইহার রচনা মন্দ হউক এবং স্থানে স্থানে ভাবের অপারিপাট্য থাকুক ফলত আমার অভিপ্রায় কখনই মন্দ নহে, বিশেষ এই আমার প্রথম উদ্যম। আমি গ্রন্থকারের পদবীতে আর কখনই পদার্পণ করি নাই সুতরাং এ বিষয়ে কৃতকার্য হইব তাহা কোনক্রমেই ভরসা করিতে পারি না, তবে আমার মধ্যে এই যে মহানুভব ব্যক্তিব্যূহ দুর্গন্ধ পঙ্ক পরিহার পূর্ব্বক তজ্জনিত পঙ্ক লইয়াই আমোদ প্রকাশ করিয়া থাকেন, পাঠক মহাশয়েরা মল্লিখিত পঙ্কের ন্যায় দোষ কদম্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবশ্যাই অভিপ্রায় রূপ পঙ্কেরুহ গ্রহণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিবেন। এই স্থলে অবশ্য কর্ত্তব্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পাঠ করত মুদ্রিত করিতে আমাকে অনুমতি দিয়াছেন।"

দ্বারকানাথ পুরোপুরি সময়-সচেতন কবি। তাই তাঁর কবিতার বিষয় হয়ে উঠতে পারে বঙ্গভাষা জননী বনাম ইংরেজি ভাষা জননীর বাকযুদ্ধের বিষয়ও। কিংবা কৃষ্ণনগর কলেজের রোদন ও হিন্দু কলেজের সহিত কথোপকথন। অসম্ভব সংবেদনশীল মন। তাই সময়ের যে-কোনো ঝাপটাতেই সেখানে স্পন্দন। এ-সব কথোপকথন-ধর্মী কবিতার সংলাপ অবশ্যই কাল্পনিক। কিন্তু অন্তর্ভুক্ত বা উল্লিখিত চরিত্রেরা সবাই বাস্তবের।

দাম্ভিক ইংরেজি ভাষা জননীর পরিহাসের প্রত্যুত্তরে বঙ্গভাষা জননী যখন ফেটে পড়েন ক্রোধে, তাঁর যুক্তির সূত্রে তখন উন্মোচিত হন যে-সব ব্যক্তি, তাঁরা সকলেই বাংলাভাষার স্মরণীয় স্থপতি।

"কি ভয় দেখাও তুমি আর বারবার।
চাঁদে কি করিবে প্রিয় প্রভাকর যার।।
বিশেষত বারি বিনে কিছু নাই ডর।
একাকী ঈশ্বর মত বিদ্যার সাগর।।
কালে না পারিবে কিছু করিতে আমার।
পেয়েছি কপালগুণে অক্ষয়কুমার।"

উত্তরে ইংরেজি ভাষা জননীর আপত্তি—

"কিন্তু ইহাদেব মাঝে কেহ কবি নয়।
কোথা পাবে মনোহর ভাব সমুদয়।।"

তখনই বঙ্গভাষা জননীব গর্বিত জবাব—

"সুকবি সুন্দব মম মদনমোহন।
পড়িলে কবিতা তার মুগ্ধ হয মন।।
প্রাণেব ঈশ্বব গুপ্ত প্রভাকব কর।
ধবিয়াছে কিবা দৈবশক্তি মনোহর।।

এ কবিতায যেমন সমস্যাব কেন্দ্রে সাহিত্য, তেমনি কৃষ্ণনগর কলেজ বনাম হিন্দু কলেজ নিয়ে যে কবিতা, সেখানে মিলবে শিক্ষা সমস্যা নিয়ে তাঁব ঐকান্তিক উদবেগ। এই বিশেষ কবিতা লেখাব সময়ে বাংলাদেশে সম্ভ্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বলতে চারটে কলেজ। হিন্দু, হুগলি, ঢাকা আব কৃষ্ণনগর। দ্বাবকানাথ এই শেষোক্ত কলেজেব ছাত্র। কোন বছবে ভর্তি, জানা যায নি। তবে জুনিয়ব স্কলাবশিপ পেয়েছিলেন ১৮৫৩/৫৪-য। স্কলাবশিপ পাওযা ছাত্রদেব মধ্যে তাঁব স্থান পঞ্চমে। বিভিন্ন বিষয়ে পাওযা নম্বর—

Grammar	—	29
History	—	24
Mathematics	—	$34^1/_2$
Geography	—	$29^1/_2$
Translation	—	28
Literature	—	22.5
Viva Voce	—	40
সব মিলিযে		207.5।

ঐ বছবেই বঙ্কিমচন্দ্র হুগলি কলেজে জুনিযব স্কলাবশিপ পবীক্ষায পেয়েছিলেন 275.5। হিন্দু আব কৃষ্ণনগব এই দুই কলেজকে নিযে কবিতা লেখাব পিছনে ছিল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার তাপ ও চাপ। কৃষ্ণনগর কলেজ তাব গড়ে ওঠাব আদি পর্ব থেকেই হাজারো বাধাবিঘ্নেব মুখোমুখি। শিক্ষা বিভাগ একবাব ঠিক করলে হিন্দু আর হুগলি কলেজেব জন্যে তৈরি হবে উচ্চমানের প্রশ্নপত্র। ঢাকা আর কৃষ্ণনগবেব জন্যে নিম্নমানের। স্যাব সিসিল বীডন তখন গভর্নমেন্টেব সেক্রেটাবি। এ-সিদ্ধান্তে সায় দিতে পাবলেন না তিনি। আর শেষ পর্যন্ত তাঁরই প্রতিবাদে ঘুচল প্রশ্নপত্রের ভেদাভেদ। ১৮৪৮-এ চার কলেজেই এক প্রশ্নপত্র। আব যে কলেজ সম্পর্কে সরকাবি অনীহা, সেখান থেকেই কৃতী ছাত্র হিসেবে অভ্যুদয ঘটল উমেশচন্দ্র দত্তের। উমেশচন্দ্র ছাড়াও ঐ কবিতায় স্বাভাবিকভাবেই এসে গেছে আবও কিছু কৃতী ছাত্রের নাম। অম্বিকাচরণ ঘোষ, নীলকমল ভাদুড়ী, ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায। ১৮৪৯-এ অম্বিকাচরণ পঞ্চম, সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায়। আশ্চর্য এই যে, তিনজনের জীবনেরই

পরিসমাপ্তি অকালমৃত্যুতে।

এ-সবের পর কৃষ্ণনগর কলেজের আর-এক কৃতী ছাত্র আইন বিষয়ের লেকচার শোনার সুবিধে পেতে চলে আসে হিন্দু কলেজে। এই কবিতার মধ্যে সেই অমূল্যচরণও উপস্থিত। কৃষ্ণনগর কলেজ দিদি হিন্দু কলেজের কাছে জানাচ্ছে সস্নেহ আবেদন—

"সান্ত্বনা করিতে মাত্র ছিল একজন।
প্রাণের অধিক প্রিয় অমূল্যরতন।।
কিন্তু অভাগিনী মার দেখিয়া সঙ্কট।
সম্প্রতি গিয়াছে দিদি তোমার নিকট।।
দেখো যেন সে আমার ক্লেশ নাহি পায়।
প্রাণাধিক যদিও সে অকৃতজ্ঞ মায়।।"

হিন্দু কলেজের মমতাময় উত্তর—

"বিশেষত তোর পুত্র মোর পুত্র এক।
কিছুই প্রভেদ নাই নাম ব্যতিরেক।।
তোমারে ছাড়িয়া যারা মোর কাছে যাবে।
মায়ের সমান স্নেহ অবশ্যই পাবে।।

দ্বারকানাথের একাধিক কবিতা যেন তখনকার সময়ের সামাজিক দলিল। তাঁর জন্ম আর মৃত্যুর বছর এখন অনির্ধারিত। তাঁর মৃত্যু সাল সম্পর্কে অনুমান ১৮৫৫ থেকে ৫৮। অন্যতম প্রিয় ছাত্র দ্বারকানাথের মৃত্যুতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা—'শোকোচ্ছ্বাস'।

"অধিকারি কিছুদিন থাকিলে জীবিত।
হইত অশেষরূপে জগতের হিত।।
জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থগুলি করিয়া প্রকাশ।
পূরাইত আপনার যত অভিলাষ।।
নাটকের প্রথাপথ করিলে প্রচার।
পাঠকের হত তায় কত উপকার।।
যে করিত কতরূপ কৌশল সাধন।
অকালে কালের করে সে হলো পতন।।

দ্বারকানাথের ছেলে নীলরতন। ১৮৭১-এ দ্বিতীয়বার ছাপিয়েছিলেন বাবার ঐ বই। আর বঙ্গদর্শন যখন বেরুচ্ছে সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায়, সেখানে এই সমালোচনা—

"...বহুকালের পর আবার সুধীরঞ্জন প্রকাশ পাইয়াছে। গ্রন্থকর্তার পুত্র লিখিয়াছেন যে, 'আমার স্বর্গীয় পিতার এক অতুল কীর্তি বিলুপ্ত হয় দেখিয়া উহা দ্বিতীয়বার মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।' এখানে পিতৃভক্তি অতি প্রবল, সমালোচনার আর স্থান নাই। ঈশ্বর গুপ্তের সময় দ্বারকানাথ বাবু সবল কবি বলিয়া যশোলাভ করিয়াছিলেন, বালকেরা তাহার কবিতা পড়িতে ভালবাসিত। এখন ভাল বাসিবে কিনা, আমরা নিশ্চয় অনুভব করিতে পারিতেছি না।"

ঈশ্বর গুপ্তের জীবনচরিতে বঙ্কিমের নিজের কথা—

"যাহার কিছু রচনাশক্তি আছে, এমন সকল যুবককে তিনি বিশেষ উৎসাহ দিতেন তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কবিতা রচনার জন্য দীনবন্ধুকে, দ্বারকানাথ অধিকারীকে এবং আমাকে তিনি একবার প্রাইজ দেওয়াইয়া ছিলেন। দ্বারকানাথ অধিকারী কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র —তিনিই প্রথম প্রাইজ পান। তাঁহার রচনা প্রণালীটা কতকটা ঈশ্বরগুপ্তের মত ছিল

সরল স্বচ্ছ— দেশী কথায়, দেশী ভাব তিনি ব্যক্ত করিতেন। অল্প বয়েসেই তাঁহার মৃত্যু হয়। জীবিত থাকিলে বোধ হয় তিনি একজন উৎকৃষ্ট কবি হইতেন।"

২০ ফেব্রুয়ারি

হুগলি কলেজের অধ্যক্ষ 'কাউন্সিল অব এডুকেশন'-এর সেক্রেটারিকে চিঠিতে জানাচ্ছেন প্রভাকর-এ বেরনো বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতার জন্যে পুরস্কার পাওয়ার খবর।

From
The Principal of the College of Mohammad Mohsin

To
The Secretary to the Council of Education Fort William
Dated Hooghly the 20th Fey 1854

Sir
I have the honour to report for information of the Council of Education that I have received twenty rupees to be awarded to Bunkim Chunder Chatterjee, a pupil of the first class of the Senior school, for some good poetical compositions in Bengalee The poetical compositions appeared in the Provakur Newspaper The prize of twenty rupees was awarded by Baboos Ramony Mohun Ray and Kally Churn Ray Choudhuari Zemindars of Rangpur and was sent through Baboo Isser Chunder Goopto the Editor of the above named Journal

I have the honour to be
Sir
Your most obed Servant
P I Kerr/ Principal

এপ্রিল

আগে 'সেসন শুরু হত 'অকটোবর থেকে সেপ্টেম্বর'-এ'। নতুন নিয়মে সেটা বদলিয়ে হয়ে গেল মে থেকে এপ্রিল। তাই ১৮৫৩-র জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা দিলেন বঙ্কিম ১৮৫৪-য়। পরীক্ষার্থীর মোট সংখ্যায় ছিল ৭৩ জন, হুগলি কলেজ ও তার অধীন স্কুলগুলো মিলিয়ে। তার মধ্যে 'বি সেকশন' থেকে ৩৫ জন। সবাইকে পিছনে রেখে বঙ্কিমই হলেন প্রথম। পরীক্ষার বিষয় ছিল সাতটি। বঙ্কিম তার ছ'টিতে পেয়েছিলেন সর্বোচ্চ নাম্বার। সে ছ'টি বিষয়, ব্যাকরণ, ইতিহাস, গণিত, ভূগোল, সাহিত্য আর মৌখিক পরীক্ষা। যে বিষয়টিতে দ্বিতীয়, সেটা অনুবাদ।

বঙ্কিমের সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর 'বি' সেকশনে পড়তেন ৩৫ জন ছাত্র, তাদের বয়সের গড় ১৭, বঙ্কিমের বয়স তখন ষোলো। ঐ পরীক্ষায় দ্বিতীয় হয়েছিলেন যাদবচন্দ্র রায়।

বৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্য তালিকা—

Prose/ Selections from Goldsmith's Essays Cal. ed
Poetry/ Selections from Pope, Prior and Akenside
Poetical Reader. No III pt. II (last ed.)
History/ Keightley's History of England, Vol I
Grammar/Crombie, Part II
Geography and Map Drawing
Mathematics/Euclid Books VI and XI
Algebra to the end of simple equations

Arithmetic
Bengali/ বেতালপঞ্চবিংশতি (2nd ed.)
Bengali Grammer.

এ বছর আরও নতুন কিছু যোগ হয় অতিরিক্ত পাঠ্য হিসেবে, পবীক্ষা পাঁচ মাস পিছিয়ে যাওয়ার জন্যে।

Prose/Moral Tales, Encyclopaedia, Bengalensis, No. X
Poetry/ Poetical Reader, Part 1, No III (Cal.ed)
Crombie's Etymology & Syntax, Part 1.

বাংলা পাঠে 'বেতালপঞ্চবিংশতি'-ব সঙ্গে যোগ কবা হয 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'ব ১০ থেকে ১৬ সংখ্যা।

জুনিয়ব স্কলাবশিপ পবীক্ষায উত্তীর্ণ হযে বঙ্কিম বৃত্তি পেলেন মাসে আট টাকা। উঠলেন কলেজ বিভাগেব চতুর্থ শ্রেণী বা ফার্স্ট ইযাবে।

তখনকার পাঠ্য—

English/ Addison (pp. 1-382) as far as no 265
Pope, as contained in Richardson's Selections
Moral Philosophy/ Abercrombie's Moral Feelings.
History/ Keightley's History of England, Vol.II
Physical Geography/ Hughe's Physical Geography, pp. 1-99
Mathematics/ Euclid I-VII & XI (upto 21st proposition)
Algebra & Plane Trigonometry
Surveying & Plan Drawing
Bengali/Translation আব Grammer ছাড়া অন্য কোনো নির্দিষ্ট বই নয।

এই সমযে অধ্যক্ষ ক্যব সাহেব সপ্তাহে দুদিন পডাতেন 'লিটারেচর'। বাকি সময হেড মাস্টাব জে. গ্রেভস। ইতিহাসও পড়াতেন তিনি। ম্যাথামেটিকস পডাতেন আর থোযেটস, ডি. ফোগো. ই. লজ।

৪ নভেম্বর

অবসর নেওযাব আগে, ৫৯-৬০ বছর বয়সে হুগলি কলেজেব সুপারিণ্টেণ্ডিং পণ্ডিত অভয়াচবণ তর্কপঞ্চাননেব মৃত্যু। কলেজ বিভাগে বাংলা পড়াতেন তিনি। কলেজ বিভাগে উঠে বঙ্কিম মাত্র পাঁচ মাস বাংলা শেখাব সুযোগ পেযেছিলেন এঁব কাছে।

বঙ্কিমেব সমযে মোট যে ছ'জন পণ্ডিত বাংলা শেখাতেন, অভয়াচরণ ছাডা বাকি পাঁচজনেব দু'জন হলেন

গোবিন্দচন্দ্র শিরোমণি।
ভগবচ্চন্দ্র রায়।

এঁবা পডাতেন সিনিয়ব ডিভিসনে।

যে দুজনের কাছে বঙ্কিম পড়েন নি—

গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত বিশারদ
গোপালচন্দ্র বিদ্যানিধি।

বঙ্কিমের প্রথম শিক্ষক ছিলেন

কাশীনাথ তর্কভূষণ।

১৮৫৪

বছরের প্রধান ঘটনাবলী.

মেট্রোপলিটান কলেজ উঠে যাওযায কেশবচন্দ্র সেন আবাব ফিবে এলেন হিন্দু কলেজে। কিন্তু ছাত্র হিসেবে আগের মতো দেদীপ্যমান নন আব। ইংবেজি, ইতিহাস, পাশ্চাত্য দর্শন, বসায়নশাস্ত্রে ভালো। কিন্তু অঙ্কে কাঁচা।

বেবলো কালীপ্রসন্ন সিংহেব নাটক. 'বাবু'।

কলকাতা থেকে বেবলো ফাবসি ভাষাব সংবাদপত্র 'দূববীণ'। পরিচালনায কালীপ্রসন্ন সিংহ-ব সাহায্য।

বেবলো নীলমণি বসাকের 'বত্রিশ সিংহাসন'।

এশিযাটিক সোসাইটি লাইব্রেবিব গ্রন্থতালিকা তৈবি কবলেন বাজেন্দ্রলাল মিত্র।

পিনক সাহেব সংক্ষিপ্ত সংস্করণ করেছিলেন গোল্ডস্মিথের 'হিসট্রি অব বোম'। পূর্ণচন্দ্রোদয প্রেস থেকে ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যাযেব অনুবাদে সেটাই বেরলো 'বোমীয ইতিহাস' নামে। এই প্রেস থেকেই আবো বেবল "আঢ্যেব ডিকসেনাবি'। সম্পূর্ণ নাম— 'এ ডিকসেনাবি অফ দা ইংলিস ল্যাংগুযেজ উইথ ইংলিস ডেফিনেশন অ্যাণ্ড এ বেঙ্গলি ইণ্টাবপ্রিটেশনস'। সম্পাদক, অদ্বৈতচরণ আঢ্য।

শ্রীরামপুরের কালিদাস মৈত্র বাংলা ভাষায় লিখলেন 'বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষীয় বেলওয়ে।'

বেরলো বিদ্যাসাগরের 'ব্যাকরণ কৌমুদী'-র তৃতীয় ভাগ আর 'শকুন্তলা'।

ছোটলাট হ্যালিডের তৎপরতায় কিশোবীচাঁদ মিত্র হযে গেলেন কলকাতাব ম্যাজিস্ট্রেট।

কবি ও দেশপ্রেমিক আনন্দচন্দ্র মিত্রের জন্ম ঢাকায বজ্রযোগিনীতে। বাবা, বঙ্গচন্দ্র।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বাবা ভগবানচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে ময়মনসিংহে প্রতিষ্ঠিত হল ব্রাহ্মসমাজ। ময়মনসিংহ.জিলা স্কুল আব স্থানীয় মনোরঞ্জিকা ক্লাব ছিল ব্রাহ্মদেব ঘাঁটি।

বছরেব শেষদিকে বেরলো রামনাবায়ণ তর্কবত্নের নাটক 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব'। এবারেও সেই রংপুরের কুন্তি পবগনার জমিদার কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, ঐ নামে একটা মনোহর

নাটক চেয়ে। ৫০ টাকা পুরস্কার। রামনারায়ণেরটাই নির্বাচিত। 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সমালোচনা—

"পূর্ব্বে বঙ্গভাষায় কয়েকখানি নাটক প্রকটিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা যথার্থ নাটক নহে। তাহাতে অনেক পদ্যাদি আছে, এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ সমীচীন ও সুসম্পন্ন এবং সুপাঠ্য বটে ; কিন্তু সাহিত্যকারেরা যাদৃশ গুণপ্রযুক্ত নাটককে 'দৃশ্যকাব্য' বলিয়া বর্ণনা করেন, তাহার অত্যল্পমাত্র তাহাতে বর্ত্তমান দেখা যায়।
প্রস্তাবিত নাটক খানিতে রূপকের অনেক ধর্ম্ম রক্ষিত হইয়াছে; তাহার আখ্যায়িকা একানুগামিনী বটে, ইহার অভিপ্রায় উত্তম, ও ভাব ও পবিশুদ্ধ। গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত সাহিত্যালঙ্কার-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, এবং কাব্যরচনায় তৎপর। তিনি সমীচীন-যত্নে এই নাটকখানি রচনা করিয়াছিলেন ; এবং সহৃদয় পাঠকগণ যে কেহ ইহা পাঠ করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন, যে তাঁহার প্রযত্ন ব্যর্থ হয় নাই।"

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের স্মৃতিকথায়—

"বোধ হয় ইংরাজি খুব ভাল ভাল comedy অপেক্ষা কোনও অংশে ইহা মন্দ নহে।"

বেরলো তারাশঙ্কর কবিরত্নের 'কাদম্বরী'। বিজ্ঞাপন—

"সংস্কৃত ভাষায় কাদম্বরী নামে যে মনোহর গদ্যগ্রন্থ প্রসিদ্ধ আছে তাহা অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক লিখিত হইল। ইহা ঐ গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে। গল্পটি মাত্র অবিকল পরিগৃহীত হইয়াছে। বর্ণনার অনেক অংশ পরিত্যাগ করা গিয়াছে।"

গঙ্গাচরণ সরকার-এর 'বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা বিষয়ে বক্তৃতা' নামের পুস্তিকায় 'কাদম্বরী' প্রসঙ্গ—

"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেতাল পঞ্চবিংশতি ও জীবন চরিতের পর পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য মহাশয়ের কাদম্বরী সাহিত্য সংসারে দর্শন দিল। কাদম্বরী তো কাদম্বরী। ভাষাকে যেন ক্ষণকালের জন্য মাতাইয়া তুলিল। যেমন শব্দের ঘটা, তেমনি সমাসের ঘটা, তেমনি উপমার আড়ম্বর। বাঙ্গালার জনসোনিয়ান ভাষা, বাঙ্গালার গদ্যছন্দে কাব্যের উচ্ছ্বাস।"

বেরলো অক্ষয়কুমার দত্ত-র 'চারুপাঠ'-এর দ্বিতীয় ভাগ।
পদোন্নতি হয়ে হরচন্দ্র ঘোষ কলকাতার ছোটো আদালতের জজ।

জানুয়ারি

বিদ্যাসাগর সদস্য হলেন বোর্ড অব একজামিনার্সের।
'ভারত-সুহৃদ' সাপ্তাহিক আর 'নব্যভারত' মাসিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সাহিত্যিক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর জন্ম ফরিদপুরের উলপুরে। বাবা, রামচন্দ্র।

১২ জানুয়ারি

বেথুন সোসাইটির দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন। সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা আর প্রথম সভাপতি ডাঃ এফ. জে. মৌয়েট এই বছরেই অবসর নেওয়ায় তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে একটা প্রস্তাব নেয় সভা। নতুন অধ্যক্ষ-সভা তৈরি হয়—
সভাপতি, হজসন প্রাট
সহ-সভাপতি, কর্নেল গুডউইন আর ডাঃ সূর্যকুমার গুডিব চক্রবর্তী।
সম্পাদক, রামচন্দ্র মিত্র, আর এইচ. উড্রো।
গ্রন্থসভার সদস্য, বিদ্যাসাগর আর প্যারীচাঁদ মিত্র
চাঁদা সংগ্রাহক, হরমোহন চট্টোপাধ্যায়

১৩ জানুয়ারি
ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন।

২১ জানুয়ারি
হিন্দু কলেজের ম্যানেজিং কমিটির শেষ বৈঠক।

২৪ জানুয়ারি
লর্ড ডালহৌসি সরকারিভাবে জানিয়ে দিলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ বন্ধ।

২৮ জানুয়ারি
মাত্র চারদিন আগে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হলেও, জুনিয়র সিভিলিয়ানদের পরীক্ষা নেওয়ার জন্যে তৈরি হল 'বোর্ড অব একজামিনার'। সেইসঙ্গে নিয়মাবলী ও গঠনতন্ত্র।

মার্চ
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা নিয়ে দেবেন্দ্রনাথের ক্রুদ্ধ চিঠি রাজনারায়ণ বসুকে—

"ক্রমাগত তোমার পত্র পাইয়া সন্তোষ লাভ করিতেছি। বিশেষতঃ গতবারের মেদিনীপুরের ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা পাইয়া এবং আমার বান্ধবমণ্ডলীর মধ্যে তাহা পাঠ করিয়া সুখী হইয়াছি। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, তত্ত্ববোধিনী সভায় গ্রন্থাধ্যক্ষেরা ইহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশযোগ্য বোধ করিলেন না। কতকগুলান নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে। ইহাদিগকে এ পদ হইতে বহিষ্কৃত না করিয়া দিলে আর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সুবিধা নাই।"

২ মার্চ
বেথুন সোসাইটিতে, সোসাইটির সহ-সভাপতি কর্নেল গুডউইনের বক্তৃতা— "Union of Science, Industry and Art." ঐ বক্তৃতার মধ্যেই তিনি জানিয়ে দিলেন কলকাতায় বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে একটা চারু ও কারুকলা চর্চার কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা। এর কিছুদিন পরেই, মার্চেই, বেথুন সোসাইটির সভাপতি হজসন প্রাটের বাড়িতে বৈঠক। সভাপতি, ভারত সরকারের রাজস্ব সচিব মিঃ অ্যালেন। সেই বৈঠকেই 'Society for the promotion of Industrial Art' বা 'শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী সভা'-র প্রতিষ্ঠা। সভাপতি নিয়ে দুটো মত। 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র'-র প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্ট অংশে বিনয় ঘোষ জানাচ্ছেন, সভাপতি সিসিল বীডন। যোগেশচন্দ্র বাগল 'বেথুন সোসাইটি'-তে জানাচ্ছেন, সভাপতি কর্নেল গুডউইন স্বয়ং। সম্পাদক, হজসন প্রাট আর রাজেন্দ্রলাল মিত্র। কার্যনির্বাহক সমিতিতে—রেভারেণ্ড লং, উইলয়ম মর্জি, কিশোরীচাঁদ মিত্র, প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রমুখেরা। এই সমিতির উদ্যোগে এর পর গড়ে উঠবে 'দি ক্যালকাটা স্কুল অব ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আর্টস' নামের শিল্প বিদ্যালয়। এখানে শেখানো হত কাঠের কাজ, মাটির কাজ, চিত্রাঙ্কন, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, লিথোগ্রাফি আর ফোটোগ্রাফি। কলকাতার প্রথম শিল্প বিদ্যালয় এটিই। পরে সরকারি হস্তক্ষেপে এই শিল্প বিদ্যালয়ই হয়ে উঠবে 'গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্ট'।
'ওরিয়েন্টাল থিয়েটার'-এ 'মার্চেন্ট অব ভেনিস'-এর অভিনয়।

১১ মার্চ
প্যারীচাঁদ মিত্র নির্বাচিত হলেন 'এগ্রিকালচারাল ও হর্টিকালচারাল সোসাইটি'-র অস্থায়ী সম্পাদক।

১৭ মার্চ
'ওরিয়েন্টাল থিয়েটার'-এ 'মার্চেন্ট অব ভেনিস'-এর দ্বিতীয়বারের অভিনয়। পোর্শিয়ার ভূমিকায় ইংরেজ মহিলা মিসেস গ্রীগ।

২৪ মার্চ
শিক্ষা পবিষদেব সদস্য হিসেবে হ্যালিডে সাহেব বাংলা শিক্ষা বিষযে নিজেব মতামত জানিযে বেব কবলেন একটি মিনিট। পিছনে অনেকখানি সাহায্য ছিল বিদ্যাসাগবেব।

২৯ মার্চ
ভাবতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয স্থাপনেব প্রস্তাব কবলেন বামগোপাল ঘোষ।

৩০ মার্চ
বেথুন সোসাইটির বিশেষ সভা. সোসাইটিব প্রতিষ্ঠাতা আর প্রথম সভাপতি ডাঃ মৌয়াটকে বিদায সংবর্ধনা জানাতে। এপ্রিলে তিনি চলে যাবেন বিলেতে। সোসাইটিব পক্ষ থেকে তাঁকে উপহাব দেওয়া হয মানপত্রেব সঙ্গে একটা সুন্দব দোযাতদানি।

এপ্রিল
সংস্কৃত কলেজে জুনিযব বৃত্তি পরীক্ষায প্রথম হযে আট টাকা বৃত্তি পেলেন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য।

৬ এপ্রিল
হজসন প্রাট আর বাজেন্দ্রলাল মিত্র দুই সম্পাদকেব স্বাক্ষরে প্রস্তাবিত শিল্প বিদ্যালয় সম্পর্কে বিলি কবা হল একটা উদ্দেশ্য পত্র।

মে
'সংবাদ প্রভাকব'-এর লেখা থেকে জানা গেল শিল্পবিদ্যালযেব জন্যে বাজা প্রতাপনারায়ণ সিংহ ছেড়ে দিয়েছেন তাঁব চিৎপুর রোডের বাড়ি।
বাংলাদেশে তৈবি হল ছোটলাট-এব পদ। প্রথম ছোটলাট, ফ্রেডারিক জে. হ্যালিডে।

৩ মে
জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় শেকসপিয়রের 'জুলিয়াস সিজার'। ওরিয়েন্টাল থিয়েটার-এর পর কলকাতায় নবীনচন্দ্র বসুব ভাইপো প্যারীমোহন বসুর হাতে গড়া এই থিয়েটার।

৫ মে
'সংবাদ প্রভাকর'-এ 'জুলিয়াস সিজার' অভিনয় নিয়ে আলোচনা—

"গত বুধবার সন্ধ্যার পবে জোড়াসাঁকো নিবাসী গুণরাশি শ্রীযুত বাবু প্যারীমোহন বসু

মহাশয়ের ভবনে এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য হিন্দু যুবকগণ মহাকবি সেক্সপিয়ার প্রণীত নাটকের জুলিয়াস সিজরের মৃত্যুবিষযক নাট্যকাণ্ডের পঞ্চম প্রকরণ যাহা খেদোক্তি প্রণযোক্তি স্বদেশপ্রীতি ইত্যাদি নানা রসে মিশ্রিত, তত্তাবৎ অতি উত্তমরূপে প্রদর্শন পূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপে সুখ্যাতি সংগ্রহ করিয়াছেন, প্যারীমোহন বাবুর ভবন আলোকাধার ছবি ও অন্যান্য মনোহর নয়ন-প্রফুল্লকর দ্রব্যাদির দ্বারা বিশেষ রমণীয় হইয়াছিল, বিশেষতঃ নাট্যশালার শোভা বর্ণনা করা যায না, উক্ত হৃদযবিদীর্ণকর নাট্যকাণ্ড প্রদর্শন করাইবার নিমিত্ত যে বারে বারে যে যে দ্রব্যাদির আবশ্যক সেই বারে সেই সেই দ্রব্যাদির দ্বারা তাহা শোভিত হইয়াছিল। ঐ নাটক দর্শনার্থ প্রায় ৪০০ শত অতি সম্ভ্রান্ত লোকের সমাগম হয়, ইংরাজ ও বিবি অনেক আসিযাছিলেন, যদ্যপি ঝড় বৃষ্টি না হইত তবে দর্শকের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি হইত, বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু জুলিয়াস সিজারের বেশ ধারণ পূর্ব্বক যথার্থ নাটকের বর্ণনানুরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, বাবু কৃষ্ণধন দত্ত সারকম ব্রুটসের মূর্ত্তি গ্রহণ করিযা আপন কার্য সাধনের সামান্য পারদর্শিতা প্রকাশ করেন নাই, বাবু যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় কেসিযাসের রূপ ধারণ করিযা ব্রুটসের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিযাছেন তাহাতে তাঁহার সুশিক্ষার বিলক্ষণ প্রকাশ হইযাছে.... অতএব আমরা নাট্যশালার অধ্যক্ষদিগের নিকটে প্রার্থনা করি টিকিটের মূল্য ন্যূন করিয়া ঐ নাট্যকাণ্ড পুনর্ব্বার সাধারণকে দেখাইবেন।"

২০ মে

মতিলাল শীল-এর মৃত্যু।

২১ মে

দেশের কোথায কোথায মডেল স্কুল গড়া হবে তা নির্বাচনের ভার বিদ্যাসাগরের উপরই চাপিয়ে দিলেন হ্যালিডে সাহেব। নিজের 'মিনিট'-এ তাঁর মন্তব্য ছিল—

> "আমি জানি, মাথার উপর যদি কোনো ইয়োরোপীয় পরিদর্শক বা কর্তা না থাকেন, তাহলে দেশীয় পরিদর্শকদের কাজকর্মের উপর খুব বেশী আস্থা রাখা যায না। কিন্তু পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা একজন অসামান্য ব্যক্তি, এবং তিনি এ-বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ ও কর্মশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। আমাদের এই মডেল স্কুলের 'একস্‌পেরিমেন্টের' ভার তাঁর উপর দেওয়া হয়েছে দেখলে আমি খুব আনন্দিত হব। একস্‌পেরিমেন্টের ফলাফল কি হয় তা দেখবার জন্য তিনি অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব, এবং আমি সত্যই মনে করি এ-কাজে তিনি সফল হবেন।"

শিক্ষা সংসদ-এর সদস্যদের কেউ কেউ, যেমন রামগোপাল ঘোষ আর জেমস কোলভিল প্রমুখেরা, বিদ্যাসাগরের কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে পুরোপুরি শ্রদ্ধাশীল থেকেও হ্যালিডে-র প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন এই কারণে যে, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের গুরুদাযিত্ব পালন করে নতুন গড়ে তোলা মডেল স্কুলের পরিদর্শকের কাজ চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। সেইসঙ্গে তাঁরা এও জানান যে পাঠ্যবই, শিক্ষক, স্কুলের স্থান নির্বাচন, শিক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারণ জাতীয় বিষযে তাঁর উপদেশই হবে সবচেয়ে মূল্যবান।

জুন

সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের জন্যে ধার্য হল মাসে একটাকা মাইনে। জন্মদিন থেকে এই কলেজ ছিল অবৈতনিক।

১১ জুন
এই তারিখ পর্যন্ত দেশের নানা অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে বিদ্যাসাগর স্থান নির্বাচন করলেন মডেল স্কুল গড়ার।
বেরলো গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের নীতিশিক্ষা বিষয়ে পড়ানোর জন্যে 'নীতিরত্ন'।

২৩ জুন
ভারতবিখ্যাত শিল্পপতি স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম চব্বিশ পরগনার ভাবলায়। তাঁরই তত্ত্বাবধানে মার্টিন কোম্পানির রেলপথ আর ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল-এর সৌধ।

২৮ জুন
পরীক্ষামূলকভাবে বাংলাদেশে প্রথম রেলগাড়ি চলল হাওড়া থেকে হুগলির পাণ্ডুয়া পর্যন্ত। ১৮৪৩-এ, লর্ড ডালহৌসির সময়ে মিঃ রোনাল্ড স্টিফেনসন সরকারের কাছে প্রথম আবেদন জানান এদেশে রেলপথ গড়ার জন্যে। ১৮৫০-এ সরকার পরীক্ষামূলকভাবে হাওড়া থেকে রানীগঞ্জ পর্যন্ত রেল-চলাচলের অনুমতি দেয়। ১৮৫৪-র জুন মাসের গোড়ায় বিলেত থেকে কলকাতায় পৌঁছয় রেলগাড়ির প্রথম ইঞ্জিন—'ফেয়ারি কুইন'।

জুলাই
প্রস্তাবিত শিল্পবিদ্যালয়ের কাজ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় 'সংবাদ প্রভাকর'-এ ক্ষোভ, শিল্পবিদ্যালয় যে এদেশের ধনবৃদ্ধির আর উন্নতির একান্ত সহায়ক তা জানিয়ে।

৩ জুলাই
বিদ্যাসাগর তাঁর শিক্ষা-বিষয়ক রিপোর্ট জমা দিলেন ছোটলাট হ্যালিডের কাছে।

৬ জুলাই
কিশোরীচাঁদ মিত্রের ম্যাজিস্ট্রেট হওয়া নিয়ে 'সংবাদ প্রভাকর' লিখলে—

> "আমরা পূর্ব্বে ইংলিশম্যান-পত্রদৃষ্টে লিখিয়াছিলাম, আমাদিগের সুবিজ্ঞতম রাজনীতিজ্ঞ কার্য্যতৎপর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র ৬০০ টাকা মাসিক বেতনে কলিকাতা পুলিশের কনিষ্ঠ ম্যাজিস্ট্রেট-পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, এইক্ষণে আবার উক্ত পত্রেই দৃষ্ট হইল ঐ পদের বেতন কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই, বাবু হরচন্দ্র ঘোষ যে ৮০০ টাকা বেতন পাইতেন, কিশোরীচাঁদ মিত্র তাহাই পাইবেন।"

১৯ জুলাই
'বোর্ড অব কন্ট্রোল'-এর সভাপতি স্যার চার্লস উড ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে পাঠালেন তাঁর বিখ্যাত 'ডেসপ্যাচ,' এদেশের শিক্ষার ইতিহাসে যাকে দেওয়া হয়ে থাকে ঐতিহাসিক সনদের সম্মান। সংক্ষেপে ঐ 'ডেসপ্যাচে'র সুপারিশ—

১। শিক্ষা সংক্রান্ত কাজকর্ম পরিচালনার জন্যে গড়া দরকার স্বতন্ত্র একটা বিভাগ।
২। প্রত্যেক প্রেসিডেন্সি টাউনে গড়তে হবে একটা করে বিশ্ববিদ্যালয়।
৩। সব রকম স্কুলের জন্যেই শিক্ষণ-বিষয়ে ট্রেনিং দেওয়া দরকার শিক্ষকদের। তার জন্যে গড়তে হবে প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান।

৪। বর্তমানে যে সব কলেজ আর হাই স্কুল রয়েছে, উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই বাড়াতে হবে তাদের সংখ্যাও।

৫। গড়তে হবে অনেক নতুন মধ্য-বিদ্যালয়।

৬। প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে বাংলা পাঠশালার মতো প্রতিষ্ঠানের উপর দিতে হবে আরো মনোযোগ।

৭। স্কুল-কলেজের উন্নতির জন্যে ব্যবস্থা করতে হবে সরকারি 'গ্রান্ট'-এর।

আগস্ট

এন. এন. ঘোষ নামে খ্যাত সাংবাদিক, শিক্ষাব্রতী আর স্বদেশপ্রেমিক নগেন্দ্রনাথ ঘোষের জন্ম পূর্ববঙ্গের বগুড়ায়। বাবা, ভগবতীচরণ।

৫ আগস্ট

বাগবাজারের বিখ্যাত বসু বংশের বেণীমাধব বসুর মেয়ের সঙ্গে কালীপ্রসন্ন সিংহের বিয়ে।

৯ আগস্ট

'শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী সভা'-র বিজ্ঞাপন বেরলো 'সংবাদ প্রভাকর'-এ।

১১ আগস্ট

হাওড়া থেকে হুগলি পর্যন্ত রেলগাড়ি চলল শেষ পরীক্ষা হিসেবে। এঞ্জিনের প্রধান সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন মিঃ হজসন। এবারের যাত্রায় তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন একদল ইংরেজ সাংবাদিককে। তারা দেখেছেন গাড়ি কোনো জায়গায় হেলেনি, দোলেনি বা ঝাঁকুনি দেয়নি। দেখেছেন লাইনের দুধারে দাঁড়িয়ে দেশীয় মানুষজন সেলাম জানাচ্ছে এই অগ্নিরথকে। সাংবাদিকদের রিপোর্ট ছাপা হয় 'বেঙ্গল হরকরা' আর 'ইন্ডিয়া গেজেট'-এ।

> "সেই রিপোর্টে বলা হয়। সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে গাড়ি হাওড়া স্টেশন ছাড়ে ও হুগলি স্টেশনে পৌঁছয় ১০টা ১ মিনিটে, যাবার সময় লাগে : হাওড়া থেকে বালী স্টেশন ৫ / মাইল—১১ মিনিট। বালী থেকে শ্রীরামপুর স্টেশন ৬ / মাইল—১৪ মিনিট। শ্রীরামপুর থেকে চন্দননগর স্টেশন ৮ / মাইল—২০ মিনিট। চন্দননগর থেকে চুঁচুড়া স্টেশন ৩ মাইল —৮ মিনিট। (এই স্টেশনকে রেলের টাইম টেবিলে হুগলি স্টেশন বলে উল্লেখ করা হয়েছে)। হাওড়া থেকে চুঁচুড়া পর্যন্ত ২৩ / মাইল—গাড়ির চলতি সময় ৫৩ মিনিট। তাহলে গাড়ির গতি ছিল ঘণ্টায় ২৬.৩২ মাইল। এই কটা স্টেশনে স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াবার মোট সময় ৩৮ মিনিট। হাওড়া থেকে চুঁচুড়া পর্যন্ত যেতে দাঁড়ানোর সময় নিয়ে মোট সময় লেগেছিল ৯১ মিনিট।

কলিকাতা দর্পণ/ রাধারমণ মিত্র

এই ভ্রমণের সময়েই সাংবাদিকরা বুঝেছিলেন কলকাতা আর হাওড়ার মধ্যে পুল হওয়া দরকার একটা, নইলে রেল ধরতে খুবই কষ্ট হবে মানুষের। বিশেষ করে বর্ষাকালে।

১২ আগস্ট

'রেকর্ডার' ছদ্মনাম নিয়ে 'সিটিজেন' পত্রিকায় সম্ভবত কোনো ইওরোপীয় ভদ্রলোক চিঠি ছাপিয়ে প্রথম শ্রেণীর রেলভাড়াকে ৪টাকার জায়গায় ৩টাকা করতে অনুরোধ জানালে।

এরপর সত্যিই ভাড়াটা হয়ে যায় ৩টাকা।

এই তারিখে রেল কোম্পানির পক্ষ থেকে বেরল স্টিফেনসন-এর বিজ্ঞপ্তি। জানা গেল, আগামী ১৫ তারিখ থেকে হাওড়া থেকে হুগলি পর্যন্ত ট্রেন যাতায়াত করবে। এখন থামবে বালী, শ্রীরামপুর, আর চন্দননগর স্টেশনে। ১ সেপ্টেম্বর থেকে যাবে পাণ্ডুয়া পর্যন্ত। থামবে সব স্টেশনেই। যারা কম ভাড়ায় মাসিক টিকিট চান, তাদের স্টেশনে দরখাস্ত করতে হবে ফর্মের জন্যে। তবে এখনো মাসিক টিকিটের ভাড়া যেহেতু ঠিক হয়নি, তাই ১ জানুয়ারির আগে তা দেওয়া যাবে না।

১৫ আগস্ট

হাওড়া স্টেশন থেকে এদিন ট্রেন ছাড়ে নির্ধারিত সময়ের দু ঘণ্টা আগে, সাড়ে আটটায়। হুগলিতে পৌঁছয় ১০টা ১ মিনিটে। প্রায় তিন হাজার লোক দরখাস্ত করেছিল যাত্রী হতে। ট্রেনে ছিল ৩টে প্রথম শ্রেণীর, ২টো দ্বিতীয় শ্রেণীর, আর ৩টে তৃতীয় শ্রেণীর কামরা আর গার্ডের জন্যে একটা ব্রেকভ্যান। প্রথম শ্রেণীর ভাড়া ৩টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীর ১ টাকা, তৃতীয় শ্রেণীর ৭ আনা।

১৬ আগস্ট

এদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ভাবনা থেকেই দুই বন্ধু রাধানাথ শিকদার আর প্যারীচাঁদ মিত্র বের করলেন 'মাসিক পত্রিকা'। বিজ্ঞাপন—

> "এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদের জন্যে ছাপা হইতেছে : যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব ও সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন। কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই। প্রতি মাসে এক নম্বর প্রকাশ হইবেক, তাহার মূল্য এক আনা মাত্র।"

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' আর বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'—এই দুয়ের মাঝখানে 'মাসিক পত্রিকা'-র প্রভাব স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ আর সুদূরপ্রসারী। এই পত্রিকা একই সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে গেল দুটো আন্দোলনের। একটায় বদলানোর চেষ্টা অন্ধ সংস্কারের শিকলে বাঁধা বাংলা নারীসমাজের বাঁচার ধরন, আরেকটায় কঠিন সংস্কৃতের শিকলে বাঁধা বাংলা ভাষার খুঁড়িয়ে হাঁটার ধরন।

> "স্ত্রীলোকদিগের জন্য লিখিব বলিয়া পণ করিয়া লেখাও, বোধ হয়, সেই প্রথম। ইহার পূর্বে বাংলা ছিল, বাংলা গদ্য ছিল—কিন্তু সেগুলি সাধুভাষা বা পণ্ডিতি ভাষায় লেখা। চলিত ভাষা থেকে যত দূরে থাকা যায়, ততই ভাষার গৌরব হইবে, পণ্ডিত মহাশয়দের এই ধারণাই ছিল। সে ভাষা স্ত্রীলোকের কথা দূরে থাকুক, অনেক পুরুষের পক্ষে বোঝা কঠিন ছিল। আমি বাল্যকালে এক বৃদ্ধকে তারাশঙ্করের 'কাদম্বরী'-র তর্জমা পড়িয়া বলিতে শুনিয়াছিলাম —আহা ! তারাশঙ্কর কী চমৎকার ভাষাই লিখিয়াছে ! অভিধান ভিন্ন এক বর্ণও বোঝা যায় না। এই তো লেখার গাম্ভীর্য।
>
> যখন ভাষার প্রতি লোকের এইরূপ ভাব, তখন চলিত ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করা খুব সাহসের কাজ, খুব দূরদৃষ্টিরও কাজ।"

প্যারীচাঁদ মিত্র/হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

'মাসিক পত্রিকা'য় বেরনো 'আলালের ঘরের দুলাল' যখন বই হয়ে বেরলো তখন সেখানে লেখকের নাম ছিল টেকচাঁদ ঠাকুর। এ যে কার নাম বা ছদ্মনাম তা তখন অনেকেই জানত না। হরপ্রসাদের এই প্রবন্ধ থেকেই আমরা জানতে পারি ঐ নামের সম্ভাব্য উৎস।

"বাবু প্যারীচাঁদ যখন মেটকাফ হলের সেক্রেটারি ও পবলিক লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান, সেই সময় আসাম দেশ হইতে একজন বড়োলোক কলিকাতায় বেড়াইতে আসেন— তাঁহার নাম ছিল টেকচন্দ্র ফুকন। তিনি কলিকাতার বড়ো বড়ো বাঙালিদিগের সঙ্গে খুব মিশিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইতেই বোধ হয়, টেকচাঁদ ঠাকুরের উৎপত্তি।"

এই তারিখ থেকে শুরু হয়ে গেল 'শিল্প বিদ্যোৎসাহিনী সভা'-র উদ্যোগে কলকাতার প্রথম শিল্প বিদ্যালয়ের ক্লাস। 'সংবাদ প্রভাকর'-এর খবর—

"শিল্প বিদ্যাগারের কার্য অতি সুনিয়মে নির্বাহ হইতেছে। তথাকার সেক্রেটারী শ্রীযুত হজসন প্রাট সাহেব ও অন্যান্য অধ্যক্ষেরা এরূপ নিয়ম করিয়াছেন যে চিত্রবিদ্যার শিক্ষার শ্রেণীতে ৫০ জন ও মৃত প্রতিমূর্তি প্রস্তুত করণ বিদ্যা শিক্ষার শ্রেণী ৪৫ জন আপাতত গ্রহণ করিবেন, কিন্তু ঐ সংখ্যা প্রথম দিবসেই পরিপূর্ণ হওয়াতে প্রতিদিবস বহু ব্যক্তি তথায় গমন করত হতাশ হইয়া প্রত্যাগত হইতেছে, কর্মাধ্যক্ষেরা যদ্যপি নূতন ছাত্র নিয়োগ করেন তবে ৪।৫ দিবসের মধ্যেই ছাত্রসংখ্যা ৫০০ হইতে পারে। অধুনা অধিক শিক্ষক নাই, এ কারণ অধ্যক্ষেরা তাহাতে বিরত হইয়া সুবিবেচনার কাজ করিয়াছেন।..."

সেপ্টেম্বর/অক্টোবর

কবি প্রসন্নময়ী দেবীর জন্ম।

১৯ সেপ্টেম্বর

কোম্পানির ডিরেক্টররা সম্মতি জানালেন হিন্দু কলেজের নীতি ও নাম পরিবর্তনের প্রস্তাবে।

১ অক্টোবর

প্রথম ডাকটিকিটের চলন ভারতবর্ষে।

৩১ অক্টোবর

নদীয়ার গোস্বামী দুর্গাপুরে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম।

১০ নভেম্বর

বহুভাষাবিদ, রবীন্দ্রনাথের প্রিয়তম বন্ধু প্রিয়নাথ সেন-এর জন্ম। বাবা, মহেন্দ্রনাথ।

১১ নভেম্বর

কোর্ট অব ওয়ার্ডস-এর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের জমিদারদের নাবালক ছেলেদের উন্নত শিক্ষা দেবার জন্যে পাস হল একটা 'অ্যাক্ট', ৮ থেকে ১৪ বছর বয়সী ছেলেদের রাখা হবে একটা স্বতন্ত্র বাড়িতে।

ডিসেম্বর

সংস্কৃত কলেজে যে-কোনো সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের ছেলের পক্ষে ভর্তি হওয়ার অবাধ অনুমতি ঘোষণা করলেন বিদ্যাসাগর। এর আগে ব্রাহ্মণ আর বৈদ্য পরিবারের ছেলেরাই শুধু সুযোগ পেত ভর্তি হওয়ার।

১৫ ডিসেম্বর

বাংলাদেশের সামাজিক উন্নতি সাধনের জন্যে কাশীপুরে ম্যাজিস্ট্রেট কিশোরীচাঁদ মিত্রের বাড়িতে 'Association of Friends for the Promotion of Social Improvement' অথবা 'সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ সমিতি'-র জন্ম। ঐদিনের সভায় সভাপতি, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কার্যনির্বাহক সমিতি গড়া হল—

সভাপতি— দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সদস্য— রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, প্যারীচাঁদ মিত্র, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর দেব, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র, দিগম্বর মিত্র, যাদবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গৌরদাস বসাক, অক্ষয়কুমার দত্ত ও কিশোরীচাঁদ মিত্র।

সম্পাদক— কিশোরীচাদ মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত।

এই সভাই প্রথম বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাপক সভার কাছে পাঠায় আবেদন পত্র। তা ছাড়াও গঙ্গাসাগর প্রথার উচ্ছেদ, স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার, চড়ক পুজোর সঙ্গে জুড়ে থাকা নিষ্ঠুর সব প্রথার উচ্ছেদের জন্যেও চালায় আন্দোলন।

কিশোরীচাদ মিত্রর প্রস্তাব—

> "স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্তন, হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ বাল্যবিবাহ বর্জন, এবং বহুবিবাহ প্রচলন-রোধের নিমিত্ত সমিতির শক্তি বিশেষ ভাবে প্রয়োগ করা হউক।"

১৬ ডিসেম্বর

ছোটলাট হওয়ার পর হ্যালিডে সাহেব তাঁর শিক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাব অনুমোদনের জন্যে পাঠিয়ে দিলেন বড়লাটের কাছে।

১৯ ডিসেম্বর

স্ত্রী যোগমায়া দেবী, দুই ছেলে গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ আর দুই মেয়ে কাদম্বিনী ও কুমুদিনীকে রেখে মাত্র ৩৪ বছর বয়সে দ্বারকানাথ ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র গিরীন্দ্রনাথের মৃত্যু।

২৩ ডিসেম্বর

ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পাঠ করলেন লিখিত ইংরেজি প্রবন্ধ 'ব্রাহ্মসমাজ, উহার বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ আশা'।

৩০ ডিসেম্বর

বর্ধমানের মেমারি-র কাছে ইলসবা গ্রামে, মাতুলালয়ে প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর জন্ম। নিজের গ্রাম দামোদরের তীরে বেড়গ্রামে। বাবা, মাধবচন্দ্র।

১৮৫৫

---

২৫ জানুয়ারি

অভয়াচরণ তর্ক পঞ্চাননের মৃত্যুর পর তার জায়গায় নিযুক্ত হলেন গোবিন্দচন্দ্র শিরোমণি। স্কুল বিভাগে বঙ্কিম এর কাছে পড়েছিলেন দেড় বছর। ইনি কুমারহট্টের গঙ্গাধর তর্কবাগীশের ছেলে।

এপ্রিল

Senior Scholarship Examination দিলেন বঙ্কিম। পেলেন শীর্ষস্থান। আবার বৃত্তি, মাসে আট টাকা। পরীক্ষার ফলাফল

Literature Proper—39 (70)

Moral Philosophy & Political Economy—43 (60)

History—56½ (70)

Pure Mathematics—49.5 (100)

Mixed Mathematics—34 (100)

English Essay—30 (50)

Translation—24 (50)

Total—276

১৮৫৫

বছরের প্রধান ঘটনাবলী

বেরলো ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'কবিবর ˘ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত'।
ভূমিকা—

"পূর্ব্বে কযেকজন কবির জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ কবিয়া গত মাসের প্রথম দিবসের প্রভাকরে বিশ্ববিখ্যাত মহাকবি ˘ভাবতচন্দ্র রায় গুণাকরেব জীবনচরিত উদিত করিযাছি, এবং অদ্য সেই বিষয স্বতন্ত্ররূপে উদ্ধৃত কবিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলাম। এতম্মধ্যে উক্ত মহাশয়েব প্রণীত অনেকগুলিন অপ্রকাশিত উৎকৃষ্ট পদ প্রকটিত হইয়াছে,— সেই সকল কবিতা এপর্য্যন্ত কাহারো নেত্র কর্ণেব গোচর হয় নাই, তাহার মধ্যে সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দি, ও পারস্য ভাষাব চমৎকার চমৎকার কবিতা আছে, যিনি অভিনিবেশ পূর্ব্বক তৎপ্রতি দৃষ্টিক্ষেপ কবিবেন। তিনিই আশ্চর্যে অভিভূত হইবেন, তিনিই ভারতচন্দ্রের অসাধারণ ক্ষমতা ও পাণ্ডিত্যের বিষয়েব প্রচুর প্রতিষ্ঠা করিতে থাকিবেন। অপিচ আমরা এই গ্রন্থে অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দরের কযেকটি কঠিনতর ভাব-ভূষিত গূঢ়ার্থ ঘটিত কবিতা টীকা সহিত প্রকটন করিযাছি, তাহাতে সকলের মনে সন্তোষের সঞ্চার হইতে পারিবেক।"

বাঙালি কবির প্রথম জীবনী বলতে এটাই। তবে বঙ্কিমচন্দ্র এই বইটিকেই চিহ্নিত করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের প্রথম বই হিসেবে। তা ঠিক নয়।
ঈশ্বরচন্দ্রের প্রথম বই 'কালীকীর্ত্তন', ১৮৩৩-এ বেরনো।
ভারতচন্দ্র নিয়ে লিখতে গেলে ঈশ্বরচন্দ্রের এ বইটি অপরিহার্য। দীর্ঘ শ্রম, নিষ্ঠা আর শ্রদ্ধার ফসল এই বই। তবুও তিনি সমালোচনার উর্ধ্বে নন।

"ভারতচন্দ্রের কাব্যের তিনি প্রকৃতমর্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। ভারতচন্দ্রের যে সুমার্জিত গাঢ়বন্ধ ভাষা, শিক্ষিত রসবোধ, বিদ্বৎসুলভ বৈদগ্ধ্য ও স্বল্পাক্ষর প্রকাশভঙ্গি, তাহার অন্তর্লোকে প্রকাশ করিবার মত শিক্ষা, ভাব ও কল্পনা ঈশ্বর গুপ্তের বা তাঁহার

সমকালীন গীত রচয়িতাদের ছিল না। সেই জন্য ভারতচন্দ্রের নিখুঁত ক্লাসিকাল বাণীভঙ্গি পরবর্তী যুগে স্থায়িত্বলাভ করিল না।"

সুশীল কুমার দে/
ভবতোষ দত্ত-র 'কবিজীবনী'-র ভূমিকা

ঈশ্বরচন্দ্রের এই বই বেরনোর সময় পর্যন্ত এদেশে ভারতচন্দ্র-চর্চার হিসেব—

১৮১৬। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য বের করেছিলেন 'অন্নদামঙ্গল'-এর সচিত্র সংস্করণ। এই বই দিয়েই বাংলাদেশে বই-ব্যাবসার আর সচিত্র পুস্তকের সূচনা।

১৮২৯। লিটেরারি গেজেট-এ কাশীপ্রসাদ ঘোষ-এর বাংলা কবিতা নিয়ে আলোচনায় ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'-এর প্রশংসা। লেখার মধ্যে ছিল ভারতচন্দ্রের কবিতার আংশিক অনুবাদ। কাশীপ্রসাদকেই এখনো পর্যন্ত ধরে নেওয়া হয় বাঙালিদের মধ্যে ভারতচন্দ্রের প্রথম আলোচক আর আংশিক ইংরেজি অনুবাদক।

১৮৩৩। রাধামোহন সেন বের করেছিলেন 'অন্নদামঙ্গল', ভারতচন্দ্রের অশুদ্ধতাকে পদ্য-ছন্দের টীকায় সংশোধিত ক'রে। সুকুমার সেন-এর মতে, তিনিই 'ভারতচন্দ্রের প্রথম ক্রিটিক'। মদনমোহন গোস্বামীর মতে রাধামোহনের ঐ পদ্য-টিপ্পনীই 'ভারতচন্দ্রের সর্ব্বপ্রথম সমালোচনা'।

১৮৪৭। কৃষ্ণনগর রাজবাড়ি থেকে মূল পুঁথি আনিয়ে বিদ্যাসাগর নিজের ছাপাখানা থেকে বের করলেন পরিশোধিত 'অন্নদামঙ্গল'।

১৮৫০। 'ক্যালকাটা রিভিউ'-এ 'পপুলার লিটারেচর অব বেঙ্গল' নামের ইংরেজি প্রবন্ধে পাদরি ওয়েঙ্গারের ভারতচন্দ্রকে নিয়ে আলোচনা।

১৮৫২। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়'-এর বিজ্ঞাপনে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, চোরপঞ্চাশিক, বিদ্যাসুন্দর আর মানসিংহ এই চারখানা বইকে সংশোধন করে ক্ষুদ্র হরফে আর উত্তম কাগজে বের করার খবর।

বেথুন সোসাইটির অধিবেশনে হরচন্দ্র দত্ত, কৈলাসচন্দ্র বসু আর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা বিষয়ে বিতর্ক। রঙ্গলাল পাঠ করেছিলেন তাঁর ঐতিহাসিক রচনা 'বাংলা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ'। রঙ্গলালের আক্রমণ কৈলাসচন্দ্র বসুকে। আর সমর্থন ভারতচন্দ্রকে। ঐ বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিলেন ভারতচন্দ্রই। কর্ণওয়ালিস স্কোয়ার বা হেদুয়ায় ফ্রী চার্চের ধর্মযাজক হলেন লালবিহারী দে। এরপরেই ডাফ সাহেবের সঙ্গে সংঘাত। খৃস্টান ধর্মযাজকদের মধ্যেও ছিল চামড়ার সাদা কালো রঙ নিয়ে সংকীর্ণ ভাগাভাগির বোধ। সেই কারণে দেশীয় যাজকেরা কখনোই ঠাঁই পাবে না ইওরোপীয় যাজকদের উপরে। চার্চগুলোর উচ্চতম পরিচালক কমিটির নাম, মিশন কাউন্সিল। সেখানে ভারতীয়দের মাথা গলানোর সুযোগ নেই কোনো। লালবিহারী ডাফের একান্ত অনুরাগী ভক্ত হয়েও এ নিয়ে প্রতিবাদ জানাতে কুণ্ঠিত হলেন না তাঁর কাছে। তাতেও যখন কিছু ঘটল না, ডাফ সাহেব অনড় রয়ে গেলেন নিজেদের সিদ্ধান্তে, লালবিহারী সরাসরি তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন স্কটল্যান্ডের সর্বোচ্চ কমিটি 'ফরেন মিশন কমিটি'-র কাছে। ডাফ সাহেবের ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতেও দমেন নি তিনি।

বেরলো গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য-র 'মহাভারত'-এর ২য় খণ্ড।

হিন্দু স্কুল থেকে জুনিয়র-বৃত্তি পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান পেয়ে ১০ টাকা বৃত্তি পেলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

নীলরত্ন হালদারের মৃত্যু।

> "বাবু নীলরত্ন হালদার বঙ্গদূত সম্পাদক ছিলেন। ইনি নানা ভাষায় পণ্ডিত ও সুকবি ও সঙ্গীত শাস্ত্রে বিশারদ ছিলেন, এবং অতি সুপুরুষ ছিলেন। ইনি চুঁচুড়া নিবাসী প্রসিদ্ধ বাবু, বাবু নীলমণি হালদার মহাশয়ের পুত্র। তৎকালে তাঁহার পিতার ন্যায় কেহ বাবু ছিল না। বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের পর টবেন্স সাহেবের আমলে নীলরত্ন বাবু সল্ট বোর্ডের দেওয়ান ছিলেন।"
>
> রাজনারায়ণ বসু/সেকাল আর একাল

বেরলো অক্ষয়কুমার দত্ত-র 'বাষ্পীয় রথারোহীদিগের প্রতি উপদেশ'। এই বছরে আরো বেরবে তাঁর 'ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন বিষয়ক প্রস্তাব। ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে দেওয়া ৫টি বক্তৃতার শেষেরটি নিয়েই এই পুস্তিকা।

রসরাজ অমৃতলাল বসুর বাবা কৈলাসচন্দ্র বিশ্বম্ভর মৈত্রের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুলের।

অদ্বৈতচরণ আঢ্য বের করলেন 'সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্র' নামের সাময়িকপত্র।

মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ-এর সাহায্য নিয়ে বেরবে অদ্বৈতচরণ আঢ্যের বাংলা অনুবাদে বেদব্যাস-এর 'শ্রীমদ্ভাগবত'।

অমব সিংহ-ব লেখা 'অমরকোষ' নামের সংস্কৃত অভিধান বেরবে পূর্ণচন্দ্রোদয় প্রেস থেকে।

শ্রীরামপুরের কালিদাস মৈত্র ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ বিষয়ে প্রথম বই লিখলেন বাংলায়- 'ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ বা তড়িৎ বার্তাবহ প্রকরণ'।

বছরের গোড়ার দিকে সমাজোন্নতিবিধায়িনী সুহৃদ সমিতির পক্ষ থেকে বহুবিবাহ প্রথা নিবারণের জন্যে আবেদনপত্র পাঠানো হয় সরকারের কাছে।

এই বছবে বাংলাদেশেব কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রের তুলনামূলক চেহারা—

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	হিন্দুছাত্র	মুসলমান ছাত্র
সংস্কৃত কলেজ	১৮৯	x
হিন্দু কলেজ	৫১৬	x
কলকাতা মাদ্রাসা	x	১৫২
কলকাতা স্কুল সোসাইটির স্কুল	৪৬৯	x
মেডিকেল কলেজ	৫৬	৩
হুগলি কলেজ	৫৯৮	২০৮
হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুল	২৫২	৪৮
মেদিনীপুর স্কুল	১৩৬	৪
ঢাকা কলেজ	৩০১	২৪
কুমিল্লা স্কুল	১১৯	১৮
চট্টগ্রাম স্কুল	৭২	১৪
সিলেট স্কুল	৪৫	৩
যশোর স্কুল	৯৬	৪

স্বদেশপ্রেমিক, শিল্পপতি ও ব্যারিস্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর জন্ম যশোহরের চন্দনপ্রতাপ গ্রামে। বাবা, গোবিন্দচন্দ্র। সাঁওতাল বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক মানসিং মাঝির জন্ম।

রানী রাসমণির প্রতিষ্ঠা-করা দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির পুরোহিত নিযুক্ত হলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।

জানুয়ারি
বেরলো বিদ্যাসাগরের 'বিধবা বিবাহ্ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' নামের পুস্তিকা। বেরবার আগে এই নামে একটা প্রবন্ধও লিখেছিলেন 'তত্ত্ববোধিনী'-তে। বেরনোর সঙ্গে এমন চাহিদা যে শেষ পর্যন্ত ছাপতে হল ১৫ হাজার কপি। একে বাংলা সাহিত্যের বিরল ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করে 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর মন্তব্য—

"From the moment it issued from the press. it created a sensation which extended itself to the very corners of the country. It stirred Bengalee society to its very depths."

তবে বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত তৈরি করল 'সংবাদ প্রভাকর'। দফায় দফায় সংবর্ধনা জানিয়ে চলল বইটিকে।
'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' তাঁদের ফাল্গুন সংখ্যায় বিদ্যাসাগরের গোটা পুস্তিকা ছাপিয়ে দিলে আবার। আর চৈত্র সংখ্যায় জানালে নিজেদের যুক্তিসিদ্ধ সমর্থন।
ইংরেজি 'দি মর্নিং ক্রনিকল' লিখলে যে বাংলায় লেখা পুস্তিকা সম্বন্ধে তাঁদের মন্তব্য কবা সাধ্যের বাইরে হলেও, হিন্দুরা নিজেরাই যখন সাহসের সঙ্গে এগিয়ে আসতে চাইছেন বিধবা বিবাহের পক্ষে, তখন কারোরই নীরব থাকাটা উচিত নয়। বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টাব জন্যে সংবাদ-এর সঙ্গে সে লেখায় তাঁর লিখন-শৈলীরও প্রশংসা। সমর্থন জানাল আরো একটি ইংরেজি পত্রিকা 'দি সিটিজেন'। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বা আপত্তি উঠল কাশীপ্রসাদ ঘোষ-এর 'হিন্দু ইনটেলিজেন্সিয়ার'-এ। পরাশর-এর উদ্ধৃতিকে আমল দিতে চাইলেন না তিনি।

"পবাশব-এর বচন কোনোদিনই হিন্দুরা গ্রহণ করেনি এবং অদূর ভবিষ্যতে করবে এমন কোনো সম্ভাবনা নেই।... তর্কের খাতিরে যদি ধরে নিই, হিন্দুশাস্ত্রে বিধবা বিবাহের সমর্থন আছে, তাহলেও পরাশর সংহিতা রচিত হবার পাঁচ হাজার বছরের মধ্যে এমন ঘটনা ঘটেনি, পূর্ববর্তী তিন যুগেও ঘটেছে বলে আমাদের জানা নেই।"

'হিন্দু পেট্রিয়ট' ক্ষোভ প্রকাশ করলে 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সিয়ার'-এর লেখার সম্পর্কে। এরপরে সম্পূর্ণ ভিন্ন মনোভঙ্গি নিয়ে মঞ্চে এসে দাঁড়াবেন রাধাকান্ত দেব। বিদ্যাসাগরের পুস্তিকা সম্বন্ধে 'দি মর্নিং ক্রনিকল'-এর মাধ্যমে জানালেন।

"Want of true reasoning, profound reflection, just observation and faithful version of the passages cited from Parasara"

রাধাকান্ত দেব বসতে চাইলেন পণ্ডিতমণ্ডলীকে নিয়ে।
অন্যদিকে ধুম পড়ে গেল বিদ্যাসাগরের পুস্তিকার জবাব দিতে পুস্তিকা প্রকাশের। এই বছরের মার্চ মাসের মধ্যেই বেরবে ৭। ৮ খানা বই। আর সারা বছরের হিসেবে তার সংখ্যা দাঁড়াবে ৩০।
কয়েকজন লেখকের নাম—
শশীজীবন ও রামজীবন ভট্টাচার্য, কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী আর ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন। এঁরা কাশীপুরের।
প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়, ভবানীপুরের।
শ্যামনাথ রায়চৌধুরী, পলতার।
গঙ্গাধর দে, বর্ধমানের, এঁর প্রতিবাদ পুস্তিকা নাকি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এমনই যে, বিক্রি হয়ে যায় হাজার কপি।
পদ্মলোচন ন্যায়রত্ন 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া অত্যন্ত অনুচিত এতদ্বিষয়ক প্রমাণ সমূহ'

নামের ১১২ পৃষ্ঠার এই বইটি তিনি লিখেছিলেন বর্ধমানের মহারাজার আদেশে।
গুরু ও শিষ্যের কথোপকথনের ভঙ্গিতে 'ধর্মাধর্ম প্রকাশিকা সভা'-র সহকারী সম্পাদক দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন লিখলেন 'বিধবাবিবাহবাদ'।
পীতাম্বর সেন কবিরত্নের বই 'বিধবাবিবাহ নিষেধঃ'।
এ ছাড়া বেরলো আরো কিছু বই যেখানে শাস্ত্রবিচারের যুক্তিময়তাকে এড়িয়ে ব্যক্তিগত আক্রমণ বা কটূক্তিটাই প্রধান।
এখানে অনেকের মধ্যে রুচিহীনতার বিচারে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার মাত্র একজন। তিনি, 'নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা'-র সম্পাদক নন্দকুমার কবিরত্ন। তাঁর সৌজন্যহীন কুৎসিত আক্রমণের প্রতিবাদে সংবাদ প্রভাকরকে শেষ পর্যন্ত লিখতে হয়েছিল—

> "কুৎসিত বচন রচনা করা ও পরকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য শব্দ প্রয়োগ করা যদি শিষ্টাচারের এই লক্ষণ হয়, তবে তিনিই শিষ্ট এবং আমরা অভদ্র।"

১৬ জানুয়ারি
ভাওয়ালের জয়দেবপুরে স্বভাবকবি গোবিন্দচন্দ্র দাস-এর জন্ম।
মধুসূদনের বাবা রাজনারায়ণ দত্ত-র মৃত্যু। মধুসূদন এ খবর জানতে পারেননি দীর্ঘদিন। তাঁর প্রিয় বন্ধুরাও, বহুদিন কোনো চিঠিপত্র না পেয়ে ভেবে নিয়েছিল মধুসূদনও মৃত।

৮ ফেব্রুয়ারি
'সংবাদ প্রভাকর' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত পুস্তিকাকে সংবর্ধনা জানিয়ে লিখলে, ঐ পুস্তক পাঠ করা হিন্দুমাত্রেরই পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়।

৯ ফেব্রুয়ারি
'সংবাদ প্রভাকর' আবার লিখল—

> "পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহের কর্ত্তব্যতা বিষয়ে যে পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অতি উত্তম হইয়াছে, ঐরূপ পুস্তকসকল প্রকাশপূর্ব্বক বিধবা মহিলাগণের বিবাহ বিষয়ে সাধারণের উৎসাহ বৃদ্ধি করা অতি আবশ্যক বলিতে হইবেক।"

১০ ফেব্রুয়ারি
'সংবাদ প্রভাকর'-এ বিদ্যাসাগরের ঐ পুস্তিকাকে সমর্থন জানিয়ে আবার লেখা হল যে, ওখানে প্রযোগ করা হয়েছে অকাট্য সব যুক্তি।
শহরে ছড়িয়েছিল জনরব, বিধবাবিবাহ কতখানি শাস্ত্রসম্মত তা বিচারের জন্যে পণ্ডিত- মণ্ডলীকে নিয়ে রাধাকান্ত দেব-এর বাড়িতে বসবে একটি সভা। 'প্রভাকর'-এর মন্তব্য—

> "ঐ সভায় অনেক বিচক্ষণ পণ্ডিতগণের আগমন হইবেক, এবং অনুমান করি বিদ্যাসাগর মহাশয়ও ঐ সভায় উপস্থিত থাকিবেন, দেখা যাউক, তিনি কতদূর কৃতকার্য হয়েন।"

১১ ফেব্রুয়ারি

প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন-অধ্যাপকেব পদ গ্রহণের অনুবোধ জানিয়ে শম্ভুনাথ পণ্ডিতকে শিক্ষা পরিষদ-এব সম্পাদকের চিঠি। এই কলেজে আইন বিভাগ শুরু হলে আইন-অধ্যাপক ছিলেন বিচক্ষণ ব্যারিস্টার থিওবোল্ড। তিনি অসুস্থ হয়ে স্বদেশে চলে গেলে শম্ভুনাথকেই মনে হয় ঐ পদের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত। ৪০০ টাকা মাইনেয শম্ভুনাথ এই অধ্যাপকেব পদে ছিলেন মোট দুবছর। কলেজে আইন বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন যেসব, তা ছাত্রদের মধ্যে বিলি করা হত বিনামূল্যে।

১২ ফেব্রুযারি

'মাসিক পত্রিকা'-র ৭ম সংখ্যা থেকে ধাবাবাহিকভাবে বেবতে শুরু কবল 'আলালেব ঘরেব দুলাল'।

১৫ ফেব্রুয়ারি

একবছব বন্ধ থাকাব পর ওবিযেন্টাল থিয়েটারে শেক্‌সপীযবেব 'চতুর্থ হেনবী'ব অভিনয। সঙ্গে হেনবি মেরিডিথ পার্কারেব 'আমাটোব' প্রহসন।

২২ ফেব্রুয়াবি

ওবিযেন্টাল থিযেটাবেব 'চতুর্থ হেনবী'র সমালোচনা কবতে গিযে 'হিন্দু পেট্রিযট' এক বছর এই নাট্যশালা বন্ধ থাকাব কাবণ জানাতে গিযে লিখলে, যাঁবা বুলবুলির লড়াই আব নাচনেওযালিব পিছনে টাকা ঢালতে পারেন নাটকের মত বিশুদ্ধ আর উন্নত স্তবেব সংস্কৃতিচর্চাকে সাহায্য কবতে তাঁবা পবাঙ্মুখ বলেই নাট্যশালাব এই দুর্দশা, সেইসঙ্গে বোম্বাইযেব গ্রান্ট থিযেটাবে দেশীয ভাষায নাটকেব দৃষ্টান্ত টেনে 'হিন্দু পেট্রিযট' ওবিযেন্টাল থিযেটাবেব কর্মকর্তাদেব অনুবোধ জানালে বাংলা নাটকেব অভিনযের জন্যে।

২ মার্চ

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীব সহপাঠী, বঙ্কিমচন্দ্রেব বন্ধু, বামকৃষ্ণদেবের স্নেহধন্য অধীবলাল সেনেব জন্ম কলকাতায় সুবর্ণবণিক পবিবারে। বাবা, রামগোপাল।

৬ মার্চ

কৌলীন্য প্রথা আইন কবে বদ করার জন্যে প্রসন্নকুমাব ঠাকুব একটা আইনেব খসড়া পেশ কবলেন আইনসভায়।

এপ্রিল

বেবলো বিদ্যাসাগরের 'বর্ণ পরিচয়'-এর প্রথম ভাগ।

১২ এপ্রিল

'সংবাদ প্রভাকর'-এর জন্মতিথি উপলক্ষে প্রভাকর আপিসে উৎসব, বহু সাহিত্যসেবী আর বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে।

২০ এপ্রিল

'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'-র মুখপত্র হয়ে বেরলো মাসিক 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'। প্রত্যেক সংখ্যার দাম এক আনা। বিনামূল্যে বিলি করা হত সভ্যদের। প্রধানত ছাপা হত সেই সব রচনাই যা পাঠ কবা হত বিদ্যোৎসাহিনী সভায়। প্রথম দুটো সংখ্যার বিষয়ের মধ্যে ছিল—সভ্যতার বিষয়, চাঞ্চল্য, বাল্যবিবাহ, কৌলীন্য আর বিজাতীয় রাজগণের অধীনে ভারতবর্ষের অবস্থা।

মে

১৪।১৫ জন সম্ভ্রান্ত হিন্দু মহিলার সভা, বিধবা বিবাহকে স্বাগত জানিয়ে। 'মর্নিং ক্রনিকল'-এর মন্তব্য—সম্ভ্রান্ত হিন্দু মহিলার একটা বড়ো অংশ বিধবা বিবাহ বিধিবদ্ধ হবার অপেক্ষায় অধীরভাবে অপেক্ষা করছে আর আশীর্বাদ জানাচ্ছে বিদ্যাসাগরকে এ-বিষয়ে অগ্রণীর ভূমিকা নেওয়ার জন্যে।

১ মে

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা ছাড়াও বিদ্যাসাগরকে দক্ষিণ বাংলার স্কুল-কলেজের সহকারী ইনস্‌পেকটর নিযুক্ত করলেন হ্যালিডে সাহেব। তার জন্যে পেতেন অতিরিক্ত আরো দুশো টাকা।

৬ মে

কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হল মুসলমান সমাজের প্রথম যৌথ প্রতিষ্ঠান 'আঞ্জুমন ইসলামী' বা 'মহামেডান এসোসিয়েশন'। বাংলাদেশেই নয় শুধু, ভারতবর্ষেও এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান এই প্রথম। প্রধান উদ্যোক্তা, মোহাম্মদ মোজাহার। তাঁর তালতলার বাড়িতেই প্রথম সভা এই তারিখে। শহরের অভিজাত আর গণ্যমান্য মুসলমানদের উপস্থিতিতে গড়া হয় নীচের কার্যনির্বাহক সমিতি—

সভাপতি, কাজী ফজলুর রহমান, কাজী অল-কুজ্জাত।

সহ-সভাপতি, কাজী আবদুল বারি, কাজী—কলকাতা সদর আদালত।

সম্পাদক, মোহাম্মদ মজহার, ও মোহাম্মদ আবদুর রউফ।

সদস্য, মোহম্মদ ওয়াজিহ, আব্দুস সামাদ, আবদুল লতিফ, আবদুল জব্বার, ফজলুল করিম, গোলাম ইসহাক, রহমত আলী, আহম্মদ, জোওয়াদ, আবদুল হামিদ, ও গোলাম ইয়াহিয়া।

প্রতিষ্ঠার ২৩ দিন পরে 'সোমপ্রকাশ' লিখলে—

"নগরবাসি সদ্বিদ্বান ও সম্ভ্রান্ত যবনেরা স্বজাতির হিত বর্দ্ধনার্থে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপন

করিয়াছেন, তাহার বিবরণ আমরা ইংরাজী পত্রে পাঠ করিয়া যে প্রকার সন্তুষ্ট হইয়াছি, তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করিতে পারি না। ইংরাজ ও বাঙালির মধ্যে বহুবিধ সভা স্থাপিত থাকাতে অনেক বিষয়ে তাঁহাদিগের উপকার হইতেছে ও ইংরাজ জাতির সহিত হিন্দু জাতির সদ্ভাবের ক্রমশঃ আধিক্য হইয়া আসিতেছে এবং হিন্দু মণ্ডলীর মধ্যে একতা বন্ধনের সূত্র সঞ্চারিত হইয়াছে; কিন্তু কি পরিতাপ। যবন জাতির মধ্যে একাল পর্য্যন্ত কোনো প্রকার সভা স্থাপিত হয় নাই, গবর্ণমেণ্ট যাহা ইচ্ছা তাহা করুন, তাঁহাদিগের কার্যবিষয়ে যবন-জাতি কোন কথাই উল্লেখ করেন না, ইহাতে সভ্য লোকেরা ভারতবর্ষবাসি যবনগণকে অসভ্য বলেন।... এদেশে অল্প যবন বাস করে না, কোন কোন প্রদেশে হিন্দু ও অন্যান্য জাতি অপেক্ষা যবনের সংখ্যা অধিক, অতএব তাহাদিগের মঙ্গলোদ্দেশে কোন প্রকার সভা না থাকাতে আমবা অতিশয় দুঃখিত ছিলাম; অধুনা নগরবাসি সম্ভ্রান্ত ও সদ্বিদ্বান যবনেরা আমাদের দুঃখ নিবারণ করিলেন। এইক্ষণে আমবা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি এই নবীনা সভা চিরস্থায়ী হউক এবং নগরীর ও অন্যান্য স্থানের যবনগণে তাহার প্রতি বিহিত সাহায্য ও উৎসাহ প্রদানপূর্ব্বক স্বজাতির সম্মান বৃদ্ধি করুন।"

এই সভা কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৮৬৩-তে মহামেডান লিটেবারি সোসাইটি গড়ে ওঠার আগেই বন্ধ হয়ে যায়। ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় শাখা গড়ে উঠেছিল এই সভাব। ১৮৫৩-য় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নতুন করে সনদ পাওয়ার কথা। 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' এদেশের ইংরেজদের আইন আর শাসন ব্যবস্থা ক্ষেত্রে নিজেদেব দাবি-দাওয়া পেশ করলে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে। সেখানে প্রস্তাব ছিল ভাবতবর্ষের জন্যে একটা স্বতন্ত্র বিধান পরিষদের, যেখানে থাকবে ভারতীয় প্রতিনিধি। পার্লামেন্টে আপত্তি তুললেন স্যার হ্যালিডে। এমন কোন ভারতীয় প্রতিনিধি আছেন, হিন্দু আর মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে সমান গ্রহণযোগ্য যিনি ? লর্ড এডেনবরা হ্যালিডের মতে সায় দিয়ে বললেন, আইন প্রণয়নের জন্যে হিন্দু আব মুসলমানদেব দুটো আলাদা পরামর্শ সমিতি গড়া উচিত। এইখানেই 'মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন' গড়ে ওঠার পটভূমি। অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘোষিত হলেও, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিলই।

"আঞ্জুমান ইসলামী' সরকারের আশীর্বাদপুষ্ট ছিল বলে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনেব' মতো আঞ্জুমান ইসলামীও 'সিপাহী বিদ্রোহ' সমর্থন করেনি, বরং উভয় প্রতিষ্ঠানই পৃথক পৃথক সভা ক'রে এর নিন্দা করে। 'সিপাহী বিদ্রোহ' দমন শেষ হলে 'আঞ্জুমান ইসলামী' ১৮৫৮ সালের ১৪ নভেম্বর রানী ভিক্টোরিয়াকে 'অভিনন্দন বাণী' প্রেবণ করে। সরকারের আনুগত্যলাভ এর মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল। আঞ্জুমানের কর্মসূচীতেও এর স্পষ্ট উল্লেখ ছিল, "No measures should on any occasion be adopted that might in any measure appear inimical to British Government." নব্য শিক্ষিত হিন্দুগণ চাকুরিব ক্ষেত্রে উচ্চ সরকারি পদে দেশীয়দের নিয়োগের জন্য আন্দোলন করেছিলেন। হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্রগণ তারাচাঁদ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ১৮৪৩ সালের ১৮ এপ্রিল এবং রামগোপাল ঘোষের উদ্যোগে ১৮৫৩ সালে ঐ বিষয়ে প্রকাশ্য সভায় মিলিত হন। মুসলমানগণ ইংরাজী শিক্ষায় পশ্চাৎপদ ছিলেন। এ আন্দোলন তাঁদের স্বার্থের পরিপন্থী ছিল বলে তাঁরা এসব সভায় যোগদান করেন নি, বরং পরিস্থিতির উপর সম্পূর্ণ দৃষ্টি রেখে আঞ্জুমানের সংগঠন সূচীতে অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, "It precludes all idea

of any union with Hindoo Association. which altogether repudiates the principle." এরূপ অবস্থায় ব্রিটিশ সরকারের অনুগ্রহই একমাত্র ভরসা ছিল। হিন্দুদের সহিত ব্রিটিশ-বিরোধী কোন আন্দোলনে যোগদান করা তাঁদের পক্ষে আত্মঘাতী হবে।"

উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা/
ডকটর ওয়াকিল আহমদ

১২ মে
চব্বিশ পরগনার গৈপুবে ভূতত্ত্ববিদ প্রমথনাথ বসুর জন্ম। বাবা, তাবাপ্রসন্ন।

১৫ মে
১০০ টাকা মাইনেয দ্বাবকানাথ বিদ্যাভূষণ হয়ে গেলেন সংস্কৃত কলেজেব প্রিন্সিপ্যালেব সহকাবী।

জুন
বেরলো বিদ্যাসাগব-এব 'বর্ণপবিচয়'-এর দ্বিতীয় ভাগ।
দক্ষিণবঙ্গ সহকারী স্কুল ইনসপেকটর হওয়াব পব বিদ্যাসাগর তারাশঙ্কব কবিরত্নকে নির্বাচিত করলেন নদীয়ার ইনসপেকটর।

১৫ জুন
হিন্দু কলেজ ভেঙে হিন্দু স্কুল আর প্রেসিডেন্সি কলেজ।
তারাশঙ্কব কবিরত্নের জায়গায় সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাধ্যক্ষ হলেন জগন্মোহন শর্মা।

৩০ জুন
মহাজনদেব নিরবচ্ছিন্ন শোষণের বিরুদ্ধে চুকু মুর্মুব চার ছেলে সিধু (সিদুঁ) কানু, চাঁদ আব ভৈরবেব নেতৃত্বে বিদ্রোহের ডাক, দশ হাজার সাঁওতালের উপস্থিতিতে। নিজেদের অস্তিত্ব বক্ষার দায়ে লক্ষাধিক সাঁওতাল সৈন্য নিয়ে কলকাতার দিকে তাদের অভিযান।

"প্রথমে জমিদার ও মহাজন গোষ্ঠীর শোষণ-উৎপীড়নের প্রতিকারের জন্যই এই অভিযান চালিত হইয়াছিল। কিন্তু জমিদার মহাজন গোষ্ঠী এবং পুলিশ এই অভিযাত্রী বাহিনীর উপর আক্রমণ করিলে সাঁওতাল বিদ্রোহ পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ হইয়া যায়। প্রায় দুই বৎসর কাল এই বিদ্রোহ চলিয়াছিল। এই দুই বৎসরে কয়েকটি বৃটিশ সৈন্য বাহিনী সাঁওতালদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং সমগ্র সাঁওতাল পরগণা এমন কি পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের কতিপয় অঞ্চলও বৃটিশ শাসন হইতে মুক্ত হয়। অবশেষে বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী ও জমিদার মহাজনগণ তাহাদের সমগ্র ধনবল ও জনবল এবং সামরিক শক্তি সমবেত করিয়া এই বিদ্রোহ দমন করিতে সক্ষম হয়।"

ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস/
সুপ্রকাশ রায়

২ জুলাই

শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষের কাছে বিদ্যাসাগর সুপারিশ করলেন অক্ষয়কুমার দত্তের নাম, নর্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদের জন্যে।

> "পীড়া এবং অন্য কোন কারণবশতঃ অক্ষয়বাবু তখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও ব্রাহ্মসমাজেব নিকট হইতে বিদায় গ্রহণেচ্ছুক হন। এ অবস্থায় যখন বিদ্যাসাগব মহাশয় তাঁহাকে প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণের কথা বলিলেন, তখন অত্যন্ত আনন্দের সহিত বলিলেন, 'তা হলে তো বাঁচি।'"

অক্ষয় চবিত/নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস

১২ জুলাই

সাঁওতাল বিদ্রোহের নাযক ও সৈন্যেরা প্রথমে অবরোধ পবে দখল কবে নিলে পাকুড়।

১৬ জুলাই

পীর পৈতিব কাছে ক্যাপ্টেন ব্যারোজ ৫ ঘণ্টা যুদ্ধ করে বিদ্রোহী সাঁওতাল বাহিনীব কাছে পবাজিত হযে নৌকাযোগে পালিযে গেলেন কহলগাঁও-এব দিকে। বহবমপুব, গোড্ডা, ভাগলপুব, জামতাবা. বানীগঞ্জ, দেওঘব. সাহেবগঞ্জ. সিউড়ী জুড়ে তখন বিদ্রোহ দমনের তৎপবতায় লালমুখো সাহেব-শাসকবা হয়ে উঠলেন মারমুখো।

১৭ জুলাই

কলকাতায গড়া হল নর্ম্যাল স্কুল। উদ্দেশ্য, পাঠশালায পড়ানোব উপযুক্ত শিক্ষক তৈবি কবা। এখানে উঁচু ক্লাসেব ছাত্রদেব পড়াতেন অক্ষযকুমাব দত্ত। নিচু ক্লাসে মদনমোহন বাচস্পতি। নিজস্ব বাড়ি না থাকায সংস্কৃত কলেজেই বসত নর্ম্যাল স্কুলেব ক্লাস, সকালেব দু ঘণ্টাব।

১৯ জুলাই

ভাগলপুরেব কমিশনার মিঃ ব্রাউন বিদ্রোহী সাঁওতাল সৈন্যদেব আত্মসমর্পণ করাব আহ্বান প্রচার করে, ১ থেকে ১০ হাজাব টাকা পর্যন্ত পুবস্কার ঘোষণা কবলেন বিদ্রোহী নেতাদের ধরিযে দেবার পুরস্কার। অবশ্য এতেও সাড়া মিলবে না তেমন। মিঃ ব্রাউন এবার শরণাপন্ন হবেন বিভেদনীতির, বিদ্রোহীদের সংঘবদ্ধতাকে চুরমার কবে দিতে।

সাধারণভাবে কলকাতার শিক্ষিত সমাজ এই বিদ্রোহেব বিরুদ্ধে অসমর্থন বা বিদ্বেষ জানালেও 'হিন্দু পেট্রিযট'-এর সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভিন্ন সজাগ-সচেতন দৃষ্টিতে সমর্থন জানিয়েছিলেন এই বিদ্রোহকে। সাহেব-শাসকবা চটবে জেনেও এই তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' লিখেছিলেন—

> "শান্তিপ্রিয় ও সৎ স্বভাবযুক্ত এই সাঁওতাল জাতি যে এইভাবে বিদ্রোহ করেছে, তার যথেষ্ট কারণ আছে।... শোনা গিয়েছে যে এদের জোর করে রেলপথ তৈরিব কাজে খাটানো হয়েছে। এদের ক্ষোভের আর একটা কারণ এদের মেয়েদের সতীত্ব হানি। সাধ্যাতিরিক্ত খাজনা এদের কাছ থেকে বলপূর্ব্বক আদায় করা হয়েছে। এই ধরনের অভিযোগগুলি যে স্থানীয় শাসকদের অজ্ঞাত ছিল তা নয়, কিন্তু তারা এ ব্যাপাবে উদাসীন থেকেছে, এখন বিদ্রোহ জেগে ওঠায় এঁদেব হুঁস এসেছে।... নদীযা বিভাগের কমিশনারকে দিয়ে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা অনুমোদন যোগ্য। আমবা আশা কবব যে যাদের

প্রতিনিয়ত অত্যাচার ও অমার্জনীয় নিষ্ঠুরতার আঘাতে একটি শান্তিপ্রিয় জাতিকে বিদ্রোহী করে তোলার জন্য দায়ী তাদের শাস্তি দেওয়া হবে, শাস্তি এদেরই প্রাপ্য, বিদ্রোহীদের নয়।... সাঁওতালেরা তাদের 'ঠাকুরদের' (নেতাদের) রাজা বানাতে এই বিদ্রোহ করেছে এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। নিজেদের বনজঙ্গল ও উপত্যকার মধ্যেই এদের চিন্তাধারা সীমাবদ্ধ, এরা রাজত্ব লাভের কথা ভাবে না। এরা শুধু চায় অরণ্যভূমি ও উপত্যকার মধ্যে থেকে গৃহ-সুখ। দাম্পত্যজীবন যাপন, ও ইচ্ছামত পরিশ্রম। এরা যা চায় না তা হল আদায়কারীদের জুলুম এবং জমিদার ও ইউরোপীয় দুর্বৃত্তদের অত্যাচার। ডিসরেলির 'সিবিল' উপন্যাসে বর্ণিত খনি শ্রমিকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সঙ্গে এই সাঁওতাল হাঙ্গামার তুলনা করা যেতে পারে, এটা তার বেশি কিছু নয়।"

২৫ জুলাই

অ-সাঁওতালদের কাছে উপজাতীয় সাঁওতালদের বিদ্রোহে যোগ না দেওয়ার জন্যে শাসক পক্ষের উপদেশ, আদেশ আর ভীতি প্রদর্শন।

২৭ জুলাই

বিদ্রোহী সাঁওতাল বাহিনীতে কামার, কুমোর, তিলি, তামুলি, তাঁতি, গোয়ালা, সদগোপদের যোগদান। বাঁশকুলি আর বৃন্দাবনীর কাছে বিশাল বিদ্রোহী বাহিনীর কাছে ব্রিটিশ সৈন্যদের পরাজয়। ১৩ জন সৈন্য সহ ক্যাপটেন টৌলসিন-এর মৃত্যু।

৩০ জুলাই

'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সিয়ার'-এর সম্পাদক কাশীপ্রসাদ ঘোষ তাঁর সম্পাদকীয় লিখলেন, সাঁওতাল বিদ্রোহ কোনো সংগঠিত রাজনৈতিক অপরাধ নয়, অত্যাচারিতের জাগরণ।

আগস্ট

বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ অথচ ভয়ার্ত ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এরপর এই মাসের মাঝামাঝি একটি ঘোষণা পাঠালেন প্রশাসকদের কাছে। সে ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দুজনের। স্পেশাল কমিশনার এ. সি. বিডওয়েল আর বাংলা সরকারের সচিব ডাবলিউ গ্রে-র। ঘোষণায় ছিল বিদ্রোহীদের কেউ নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করতে চাইলে ক্ষমা দেখানো হয় যেন। কিন্তু ঘটল না তেমন ঘটনা।

"বরং বিদ্রোহীরা আরও তীব্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল বৃটিশ ও তার সহায়ক জমিদার, মহাজনদের ঘাঁটিগুলোর উপর। লিটিপাড়া, তুপে, গোড্ডা ও পাকুড়ের মহাজন হত্যার পর পলশার রেল কণ্ট্রাকটর দুশ্চরিত্র টমাস এবং ঔরঙ্গাবাদের নীল কুঠির নিষ্ঠুর হেনস্‌কে তার দুই পুত্র সহ হত্যা করল বিদ্রোহীরা।

জয়, জয় আর জয়, এই অনায়াস জয়ই বুঝি কিন্তু অসতর্ক করেছিল বিদ্রোহী বাহিনীকে। তাই মহেশপুরের যুদ্ধে দিশেহারা হয়ে পড়ল বিদ্রোহী বাহিনী। বৃটিশ সৈন্যের আঘাতে প্রায় ১০০ জন নিহত হল। আহত হয়ে পালিয়ে গেল সিধু-সহ বেশ কয়েকজন বিদ্রোহী নেতা।

- মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ টুগুড বিদ্রোহীদের পশ্চাদ্ধাবন করে ভাগনাডিহি পর্যন্ত এসে গোটা গ্রামটাকে জ্বালিয়ে দেন। কিন্তু সিধু, কানু চাঁদ বা ভৈরবের কোন সন্ধান পান না।"

শহীদ সিধু মুর্মুর জবানবন্দী/অর্ণব মজুমদার/
শারদীয় রান্নার ১৪০০

২০ আগস্ট
৫০০ সৈন্য নিয়ে মেজর শাকবার্গ-এর তূলাবাদ অভিযান। ঘণ্টা পাঁচেক চলার পর ঘটিয়ারি গ্রামে বিশ্রাম নেবার সময় মুনিয়া মাঝি নামে একজন এসে সাহেবকে জানায় এই গ্রামেই সিধু রয়েছে আহত হয়ে। তখুনি দলবল পাঠিয়ে সিধু-কে গ্রেপ্তার।

৩১ আগস্ট
শ্যামাচরণ সেন-এর 'সমাচার সুধাবর্ষণ'-এ সাঁওতাল বিদ্রোহের বিরোধিতা করে লেখা কবিতাব অংশবিশেষ—

"পশুসম সাঁওতাল কথা মিথ্যা নয়,
কিন্তু তারা বাহুবলে দেশ করে জয়।
অস্ত্রাঘাতে কত লোক করেছে সংহাব,
লুটীয়াছে কত ধন সংখ্যা নাহি তার।
অনলেতে বহু দেশ করে ভস্মময়,
বাঙ্গালার মধ্যে যেন লঙ্কাকাণ্ড হয়।
সাহেবেবা বিবি লয়ে করে পলায়ন,
সপত্নীসহিত কত হয়েছে নিধন।
বিক্রমবিশাল যদি শ্বেতকান্তিগণ,
তবে কেন অত্যাচার না হয় বাবণ।"

২২ সেপ্টেম্বর
সিধু ধরা পড়ার পর থেমে এসেছে বিদ্রোহের ঝাঁজ। শ্যামাচরণ সেন-এর 'সমাচার সুধাবর্ষণ' এই বিদ্রোহের কার্যকারণ খুঁজতে গিয়ে মুখোমুখি হল আসল তথ্যের। যথা—
রেলকর্মীদের অত্যাচার, তাদের একগুণে দশগুণ খাটানো, আর উপযুক্ত বেতন না দেওয়া।

"তাহারা চুক্তিমত উপযুক্ত বেতন চাহিল, রেলরোড কর্মচারীগণ তাহারদিগকে মারিয়া ধরিয়া বাহির করিয়া দিলেন এবং কেহ ২ যুবাকালাবস্থিতা সন্তাল কান্তাদিগকে বলাৎকার করিলেন ইহাতেই দক্ষিণাংশেব সন্তালদল জাতক্রোধ হইয়া দলবদ্ধ হইল, এই এক কারণ।"

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' বা গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের 'সম্বাদ ভাস্কর', কেউই তখন সহানুভূতির চোখে তাকায় নি এই বিদ্রোহের দিকে।

৪ অকটোবর
বিধবা বিবাহ আইন পাস করানোর জন্যে সরকারের উপর চাপ তৈরি করতে বিদ্যাসাগর ৯৮৭ জনের স্বাক্ষরসহ এক আবেদন পত্র পাঠালেন ভারত সরকারের বিবেচনাব জন্যে। আবেদনপত্রের প্রথম সই উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের। শেষ সই বিদ্যাসাগরের। অন্যান্য স্বাক্ষরদাতাদের মধ্যে ছিলেন তারানাথ তর্কবাচস্পতি, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, অযোধ্যানাথ পাকড়াশি, গোবিন্দচন্দ্র সেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামচন্দ্র বসু, রাধামাধব মিত্র, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, সূর্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, কেদারনাথ দত্ত, রাজীবলোচন শর্মা, রাজনারায়ণ বসু, হরচন্দ্র দত্ত প্রমুখেরা।

১৭ নভেম্বর
ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করার জন্যে বিধবা বিবাহ আইনের একটা খসড়া বানালেন ঐ সভার অন্যতম সদস্য জে. পি. গ্রান্ট। একে সমর্থন জানালেন স্যার জেমস কলভিল আর পি. ডাবলিউ. লিগেট।

যখন আইনের খসড়া রচনা চলেছে, তখনও আইনের পক্ষে বিপক্ষে অজস্র আবেদনপত্র জমা পড়ছে সরকারি দপ্তরে। সমর্থন জানিয়ে

১। কৃষ্ণনগর অধিবাসীদের আবেদন। ১.১২.১৮৫৫
২। কলকাতা মিশনারি কনফারেন্সের আবেদন। ৭.১২.১৮৫৫
৩। বারাসতের অধিবাসীদের আবেদন। ৭.১২.১৮৫৫
৪। কলকাতা অধিবাসীদের আবেদন।
৫। পুনা অধিবাসীদের আবেদন। ৭.১১.১৮৫৫

১ ডিসেম্বর
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মাদ্রাজ যাচ্ছেন জেনে গৌরদাস বসাক তাঁর হাতে তুলে দিলেন মধুসূদনকে লেখা চিঠি। সে চিঠিতে রাজনারায়ণ দত্তের মৃত্যুসংবাদ ছাড়াও ছিল আত্মীয়দের বিষয়-সম্পত্তি গ্রাস করার চক্রান্তের কথা। কৃষ্ণমোহনকে গৌরদাসের অনুরোধ, যেভাবেই হোক মধুসূদনকে খুঁজে কলকাতায় ফিরিয়ে আনতে। কৃষ্ণমোহন চলে যাওয়ার অল্প কদিন পরেই গৌরদাসের হাতে পড়বে কলকাতার 'হরকরা' কাগজে মাদ্রাজে 'স্পেকটেটর' থেকে উদ্ধৃত করা দুটো প্রবন্ধ। পড়ামাত্রই গৌরদাস বুঝে যাবেন কে এদের রচয়িতা। প্রবন্ধ দুটি নিয়েই গৌরদাস দৌড়োবেন খিদিরপুরে, রঙ্গলাল আর গণেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখাতে। কারণ, তাঁদেরও ধারণা ছিল মধুসূদন পরলোকগত।

৫ ডিসেম্বর
৪ মাস বিচার-প্রহসনের পর নিজামত আদালত ভাগলপুরের কমিশনারকে জানাল সিধুর ফাঁসির হুকুমের খবর।

৭ ডিসেম্বর
সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক পদে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণকে নিয়োগ করতে বিদ্যাসাগর সুপারিশ করলেন ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন-এর কাছে।

১৪ ডিসেম্বর
'সংবাদ প্রভাকর'-এ কালীপ্রসন্ন সিংহ-র দু বছর আগে বেরনো 'বাবু' নাটকের পুনর্মুদ্রণের বিজ্ঞাপন।

২০ ডিসেম্বর
মধুসূদন চিঠি লিখছেন গৌরদাসকে। জানাচ্ছেন কলকাতায় আসার ইচ্ছে আর আর্থিক দুরবস্থার খবর। পৈত্রিক সম্পত্তির উপর আত্মীয়দের থাবা বিস্তারে বিরক্ত। গৌরদাস আবার বিপত্নীক হয়েছেন জেনে সমবেদনা, মাদ্রাজ শহরের একমাত্র দৈনিক 'স্পেকটেটর'-এর সহ সম্পাদক হয়েছেন জানাচ্ছেন। চিঠিতে রেবেকা সম্বন্ধে উল্লেখ নেই কোনো। না থাকার কারণ ইতিমধ্যে ঘটে গেছে বিচ্ছেদ। মধুসূদন স্ত্রী হিসেবে বেছে নিয়েছেন যে ফরাসি মহিলাকে তার নাম এমিলিয়া হেনরিয়েটা সোফিয়া।

২৭ ডিসেম্বর
বহু বিবাহ প্রথা বন্ধের জন্যে ভারত সরকারের কাছে বিদ্যাসাগরের আবেদন। বর্ধমানের মহারাজা এই আবেদনপত্রের অন্যতম স্বাক্ষরকারী।

১৮৫৬

বঙ্কিম আঠারোয়।
এই সেই বিখ্যাত আঠারো, যার উজ্জ্বল উল্লেখের প্রথম উদভাসন রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'-র পাতায়, পরে সুকান্ত ভট্টাচার্যের এক স্মরণীয় কবিতায়। সুকান্তর কবিতায় দপদপিয়ে উঠেছে যা, সে তারই আপসহীন আত্মশক্তির ঘোষণা। আর রবীন্দ্রনাথের একটি মাত্র বাক্যে আমরা অনুভব করি তাঁর আত্মআবিষ্কারের বিস্ময়।
এই সেই আঠারো, যে বয়সে বেরিয়েছিল ডিরোজিও-র প্রথম কবিতার বই 'দি হার্প অব ইন্ডিয়া', তাঁর ভারত-ভালোবাসার মন্ত্রধ্বনিতে মন্দ্রিত যার পদাবলী।
এই আঠারোয়, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনায় বঙ্কিমের জীবন অনেকখানি নিভৃত। রবীন্দ্রনাথের মতো তাঁর জীবন-যাপন মিশে যায়নি ঘর ও বাইরের বহু স্রোতময় জলকল্লোলে। বিধিনিষেধের বেড়া খাড়া হয়ে নেই কোনোখানে, তবুও বঙ্কিমের জীবন-পরিধি সীমাবদ্ধ। নিজের বাড়ি, নিজের গ্রাম, নিজের বিদ্যালয়ের এলাকা আর গ্রাম-সংলগ্ন অদূরবর্তী অঞ্চলের বাইরে তেমন কোথাও যাতায়াত নেই তাঁর। তেমন কোনো সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ ঘটে নি তখনও। নৈহাটি থেকে কলকাতার দূরত্ব মাইলের হিসেবে নগণ্য। কিন্তু সভ্যতা ও সংস্কৃতির সৃজনশীলতার দ্বন্দ্বে-আনন্দে নিয়ত স্পন্দমান কলকাতা ভিন্ন অর্থে নৈহাটি থেকে তখন অনেক দূরের। বঙ্কিম তার আংশিক স্বাদ পেতেন নির্দিষ্ট কিছু পত্র-পত্রিকার মাধ্যমেই প্রধানত। অন্যদিকে কলকাতা তথা সারা বাংলার সংস্কৃতি জগৎ পত্র-পত্রিকার মাধ্যমেই পেয়েছে তাঁর প্রতিভার আংশিক পরিচয়।
"মজা এই তখন আমারই বয়স আঠারো ছিল তা নয়, আমার আশপাশের সকলেরই বয়স যেন আঠারো ছিল।" এমন উচ্চারণ সেই কারণেই বঙ্কিমের পক্ষে অসম্ভব।
তবুও বঙ্কিম আঠারোয়। তবুও বঙ্কিম আঠারো বছরের নিজস্ব অহংকার ও আত্মসচেতনায় সুপরিণত। এই আঠারোতেই তাই বেরলো তাঁর প্রথম কবিতার বই। পত্র-পত্রিকায় লিখে কবি হতে চেয়েছিলেন কয়েক বছর আগে। এই স্পর্ধিত আঠারোয় অনেকটা যেন নিজেকেই

তিনি স্বীকৃতি জানালেন কবি হিসেবে, গ্রন্থাকারে সে-সব কবিতাকে ছাপিয়ে। বইয়ের নাম—

'ললিতা। পুরাকালিক গল্প। তথা মানস'।

রচনাকাল ১৮৫৩। পৃষ্ঠা সংখ্যা—৪১।

এই বইয়ের জন্যে লিখেছিলেন একটা বিজ্ঞাপনও।

> "সুকাব্যালোচক মাত্রেরই অত্র কবিতাদ্বয় পাঠে প্রতীতি জন্মিবক যে ইহা বঙ্গীয় কাব্য রচনা রীতি পরিবর্তনের এক পরীক্ষা বলিলে বলা যায়। তাহাতে গ্রন্থকার কতদূর সুত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহা পাঠক মহাশয়েরা বিচার করিবেন।
>
> তিন বৎসর পূর্বে এই গ্রন্থ রচনাকালে গ্রন্থকার জানিতে পারেন নাই যে তিনি নতুন পদ্ধতির পরীক্ষা পদবীরূঢ় হইয়াছেন, এবং তৎকালে স্বীয়মানস মাত্র রঞ্জনাভিলাষজনিত এই কাব্যদ্বয়কে সাধারণ সমীপবর্তী করিবার কোন কল্পনা ছিল না কিন্তু কতিপয় সুরসজ্ঞ বন্ধুর মনোনীত হইবার তাহাদিগের অনুরোধানুসারে এক্ষণে জনসমাজে প্রকাশিত হইল। গ্রন্থকার স্বকর্ম্মার্জিত ফলভোগের অস্বীকার নহেন, কিন্তু অপেক্ষাকৃত নবীন বয়সের অজ্ঞতা ও অবিবেচনাজনিত তাবৎ লিপিদোষের এক্ষণে দণ্ড লইতে প্রস্তুত নহেন।"

এই বিজ্ঞাপনের ভাষাতেও আমরা পড়ে নিতে পারি তাঁর আঠারো বছর বয়সের গর্বিত আত্মপ্রকাশের ভঙ্গি, বিনয়-সম্ভাষণের ছদ্মবেশে মোড়া। নিজের রচনা সম্পর্কে তিনি নিজেই জানিয়ে দিচ্ছেন যে বাংলা কবিতায় রীতি অথবা ঋতু পরিবর্তনের এক নতুন পরীক্ষা চলেছে এখানে। জানিযে দিচ্ছেন রসজ্ঞ বন্ধুদের কাছে এ-সব কবিতা প্রকাশের আগেই পেয়ে গেছে প্রশংসিত মনোনয়ন।

আত্মঘোষণায় সবচেয়ে উচ্চকণ্ঠ কবি হিসেবে প্রথম যাঁকে চিহ্নিত করতে পারি আমরা, তিনি মধুসূদন দত্ত। আশ্চর্য এই, হিন্দু কলেজের ছাত্র মধুসূদনও তখন ঠিক আঠারোয় যখন গৌরদাস বসাককে চিঠিতে লিখেছিলেন—

> "Oh! how should I like to see you write my 'life', if I happen to be a great poet, which I am almost sure I shall be, if I can go to England."

কিন্তু ইংলন্ড তখনো অনেক দূরের আকাশ জেনেই হয়তো বা কলকাতা থেকে বিদেশের পত্রিকায় কবিতা পাঠানোর সময় গুটিয়ে বাখতেন নিজের আত্মবিশ্বাস কিংবা আত্মঅহংকারের পেখম। ১৮৪২-এ বেন্টলে'জ মিসেলেনির সম্পাদককে লেখা চিঠিতে ছিল কোন্ ধরনের বিনয়-সম্ভাষণ তা আগেই পড়া হয়ে গেছে আমাদের।

মধুসূদনের বাংলা ভাষার কবি হয়ে ওঠার অনেক আগেই কিন্তু মধুসূদন-ধর্মী আত্মঘোষণার প্রথম প্রকাশ যে বঙ্কিমচন্দ্রের কণ্ঠেই, তা হয়তো আমাদের নজর এড়িয়ে যায় তাঁর বিনয়ী সম্ভাষণের কৌশলে।

২

বঙ্কিমের কবিতা বাংলা সাহিত্যের আলোচনার আসরে উপেক্ষিত। গদ্যের মহান শিল্পী হিসেবে প্রবল সমারোহে সম্মানিত করতে গিয়েই প্রভূত উপঢৌকনের আড়ালে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁর সাহিত্যচর্চার শিক্ষানবিশি পর্বের ছন্দের ফসল। অথচ বঙ্কিম সম্পর্কে কবি সম্বোধন সর্বত্র। একাধিক বই আর প্রবন্ধে তাঁর নামের আগে এই 'কবি' বিশেষণটির সাম্মানিক প্রয়োগে প্রলুব্ধ হয়ে যতবার ঝুঁকে পড়া সে-সব রচনার অক্ষরমালার উপর, কবি বঙ্কিমের

বদলে আমাদের চোখে পড়ে কেবল ঔপন্যাসিক বা গদ্যের বঙ্কিমেরই কবিত্ব সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি। কিন্তু যেখানে প্রসঙ্গ কবিতা, সেখানে হয় নীরবতা, নয় মিত-মন্তব্য। তাঁর সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আভূমিপ্রণত শ্রদ্ধা সম্পর্কে আমরা সকলেই সচেতন। ব্যক্তিগত বঙ্কিম আর স্রষ্টা বঙ্কিম, দুইয়ের সম্পর্কে তিনি যে যোগ্যতম কথক, তা তর্কাতীত। 'বঙ্গীয় যুবক ও তিনজন কবি' তাঁর একাধিক বঙ্কিম-বিষয়ক প্রবন্ধের একটি। এই বিস্ময়কর প্রবন্ধটি, তার মেধাবী পর্যালোচনার চূড়ান্ত পরিণামে পৌঁছে আমাদের জানিয়ে দেয় যে, তখনকার সংবেদনশীল বাঙালি যুবসমাজ নিজেদের চিন্তা-চেতনাকে উর্বর করে তোলার ঐকান্তিক আগ্রহে যে তিনজন কবির কাছে শিক্ষার্থী, তাঁরা হলেন কালিদাস, বায়রন আর বঙ্কিম। প্রবন্ধটি যখন লেখা, বঙ্কিম তখনো জীবিত। ঐ প্রবন্ধে, তাঁব যুক্তি বিস্তারের বিচক্ষণতায বিস্মিত হয়েছিলেন বঙ্কিম নিজেও। বাঙালি লেখকের পক্ষে এ জাতীয় অভাবনীয় বিশ্লেষণধর্মী রচনা তাঁর চোখেও ঠেকেছিল যেন অসম্ভব। তাই হরপ্রসাদের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক আলোচনায় তাঁকে বলতে হয়েছিল —"তুমি যেটির কথা মনে করিয়া বলিতেছে, সেটি কোনো জার্মান পণ্ডিতের লেখা বলিয়া মনে হয়।"

এমন হরপ্রসাদও যখন, প্রথমে সাবিত্রী লাইব্রেরির অধিবেশনে পাঠ ক'রে পরে 'বঙ্গদর্শন'-এ ছাপালেন তাঁর 'বাংলা সাহিত্য, বর্তমান শতাব্দীর', সেখানে কবি হিসেবে উল্লিখিত হল না বঙ্কিমের নাম, তাঁর সমসাময়িক কবিদের পাশাপাশি। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল, নবীনচন্দ্রের পরেই, ঐ প্রবন্ধে এল ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তেব ছাত্রদের প্রসঙ্গ, হরপ্রসাদ লিখলেন—'ইঁহাদের পর দীনবন্ধু, ইনি ঈশ্বর গুপ্তেব ছাত্র। ঈশ্বর গুপ্তের হাতে তৈয়ারি।'

এরপরেই বঙ্কিমচন্দ্রের নাম। না, কবি হিসেবে নয়। দীনবন্ধু যেমন সেখানে নাট্যকার হিসেবেই সংবর্ধিত, বঙ্কিম তেমনি ঔপন্যাসিক হিসেবে। কবি বঙ্কিম রয়ে গেলেন স্মরণীয়তার সীমার ওপারে।

তাঁর 'বঙ্কিম বরণ' বইয়ে কবি মোহিতলাল মজুমদার যখন একটা বিশেষ প্রবন্ধের নামকরণ করেন 'বঙ্কিমচন্দ্রের কবি জীবন', প্রত্যাশা লাফিয়ে ওঠে এই ভেবে যে এখানে অন্তত মিলবেই কবি বঙ্কিমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ কোনো সাক্ষাৎকার। কিন্তু শুরু থেকে শেষ, সবটা জুড়ে প্রধানত ঔপন্যাসিক অথবা গদ্যের বঙ্কিমেরই স্তবগাথা। কবি বঙ্কিম যে পুরোপুরি অনুপস্থিত, তা নয়। কিন্তু যেটুকু হাজির, সে যেন ছায়া, যেন ছুঁয়ে-যাওয়া মাত্র। আর সেটুকুও যে হাজির সেও তাঁর ঔপন্যাসিক-সত্তার আদি বীজটাকে চিনিয়ে দিতে।

> "অতিশয় অল্প বয়সে বচিত তাঁহার কবিতাগুলিতে যে একটি কল্পনা বা রস-প্রেরণার উন্মেষ দেখা যায় তাহাও যৌন-আকর্ষণমূলক। তাহাতে অকালপক্কতার লক্ষণ আছে, সেই সকল কবিতার কৃত্রিম অলঙ্কার-বাহুল্যের মধ্যেও বালক কবির যে একটি বিশিষ্ট প্রকৃতিব পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সেকালে কেহ লক্ষ্য করে নাই। উত্তরকালে সেই ধরনের কাব্যচর্চা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া নবযুগের নব্য কাব্যশিল্পের শ্রেষ্ঠ শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের. যে দিকটিকে তাঁহারা কবি-কল্পনার মুখ্য উজ্জীবনরূপে আশ্রয় করিয়াছিলেন, এই কবিতাগুলির মধ্যে তাহার সুস্পষ্ট অঙ্কুর রহিয়াছে। নায়িকারূপিণী নারীর প্রতি এই যে আসক্তি, ইহা তাঁহার জীবন-দর্শনের মূলসূত্ররূপে উপন্যাসগুলির সৃষ্টি-কল্পনায় অনুসৃত হইয়া আছে। নারীই তাঁহার কল্পনাবিশ্বের বাস্তব ভিত্তি, ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া পুরুষের নিয়তিচক্র কত অভাবনীয় অদৃষ্টপথে আবর্তিত হইয়াছে !"

এ দুটি দৃষ্টান্ত থেকে যদি এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর চেষ্টা করা হয় যে, কবি বঙ্কিমের অস্তিত্ব বাংলা সাহিত্যের বা বঙ্কিমের আলোচনায় অস্বীকৃতই মোটামুটি, সেও হবে এক ভুল ধারণাকে প্রশ্রয় দেওয়া। বঙ্কিমের কবিতা নিয়ে নয়, কবি বঙ্কিমকে নিয়ে সংক্ষিপ্ত এবং বিক্ষিপ্ত মতামতের অনেক স্ফুলিঙ্গই সংগ্রহ করা সম্ভব, এ-বই সে-বই থেকে। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার দিকেই তাকানো যাক সবার আগে। তাঁর কৈশোর কালের কবিতা সম্পর্কে সেখানে সিদ্ধান্ত—

> "এই কালের রচনা হইতে ভবিষ্যৎ বঙ্কিমচন্দ্রের সম্ভাবনা আবিষ্কার করা দুরূহ; পয়ারে বা ত্রিপদীতে ঈশ্বর গুপ্তের ব্যর্থ অনুকরণ, রচনা স্থানে স্থানে অস্পষ্ট এবং স্থানে স্থানে স্পষ্টতঃ অশ্লীলতা-দোষদুষ্ট। যে প্রতিভা একদিন সমগ্র বাংলাদেশকে বিস্মিত ও চমকিত করিয়াছিল, তাহার কোনো আভাস এগুলিতে পাওয়া যায় না। তবে একজন চতুর্দশ বা পঞ্চদশবর্ষীয় বালকেব পক্ষে এই ধরনেব রচনা যে বিস্ময়কর, তাহাতেও সন্দেহ নাই; আর কিছু না থাকুক, এগুলিতে অকালপক্কতাব নিদর্শন আছে।"

অকালপক্ক অভিধাটি সম্ভবত মোহিতলাল থেকে ধার করা। কিন্তু মোহিতলাল এই অশ্লীলতা-দুষ্ট কবিতাবলির মধ্যেই আবিষ্কাব কবেছিলেন তাঁব পরবর্তী-পর্বের মহাযাত্রার যে পদধ্বনি, এখানে তাব প্রতি স্বীকৃতি নেই কোনো। উঠেছে ঈশ্বব গুপ্তের ব্যর্থ অনুকবণের অভিযোগও, পয়াবে বা ত্রিপদীতে। এ অভিযোগও ঈষৎ অস্পষ্টতা-দোষদুষ্ট। বঙ্কিম অনুকরণ করেছিলেন কোনটা ? ঈশ্বরচন্দ্রেব পযাব আব ত্রিপদী ছন্দ ? না পযাব আর ত্রিপদীতে ঈশ্বরচন্দ্রের কাব্য-ভাবনা ? পযাব, ত্রিপদীতে ঈশ্বরচন্দ্রেব ব্যক্তিগত মালিকানার শীলমোহরের ছাপ পড়াব কথা নয়। সুতবাং এখানে অনুকবণেব অভিযোগ অবান্তব। তা হলে কি অনুকবণ তাঁব পয়াব, ত্রিপদীতে লেখা কাব্যবিষযেব ? আমবা কি বঙ্কিমের লেখা এমন কবিতা পড়েছি, যা ঈশ্বরচন্দ্রেব কবিতাব বিষযেব সুরটাকে ছুঁইয়ে দেয আমাদের কানে ? আবাব এ তথ্যও তো আমাদেব অজানা নয় যে গুরু ঈশ্ববচন্দ্র শিষ্যের কবিতার নিচে ফুটনোটে একাধিকবাব লিখে দিযেছেন নানা নির্দেশ অথবা নিষেধ। কখনো তা ভাষা সম্পর্কে। কখনো প্রতিনিয়তই আদি রসের সেবা না-করা সম্পর্কে। কিন্তু বঙ্কিম কান পাতেন নি। কান পেতে কখনোই ঘাড ঘোবান নি সমসাময়িক বিষয বা ঘটনাবলির দিকে। গুরুব অনুসবণে. এবং গুরুর জীবিতকালে মাতেন নি সামাজিক প্রসঙ্গেব সমালোচনায়, গুরুব মতো বক্রোক্তি-বিদ্রূপে। সাময়িক ঘটনাব চাপ দীনবন্ধুকে টলিযেছে। দ্বাবকানাথও ঝুঁকেছেন সেদিকে। তাঁব 'সুধীরঞ্জন'-এ উক্তি-প্রত্যুক্তির ধবনে, পয়াবে আব ত্রিপদীতে. এমন কিছু কবিতা আছে যেখানে সমসাময়িক কাল এবং বিষয় এবং ব্যক্তি তিনটেই হাজিব। বঙ্কিমেও, ব্যক্তি এসেছে। কিন্তু তাঁরা হয় পুরাণেব, নয় ইতিহাসের। অর্থাৎ অতীতেব মানুষ, সমসাময়িক নয়। বঙ্কিমেও, দেশের দুববস্থা, অধঃপতন, বাঙালির সত্তা, বাঙলার দুর্গোৎসব ইত্যাদি বিষয়ের কবিতায় ফুটেছে নানা খেদোক্তি, বিরক্তি, বিদ্রূপ। কিন্তু সে সবই তাঁর পরিণত বয়সের কবিতায়; যখন তিনি বঙ্গদর্শনের সম্পাদক। তাতে নেই ঈশ্বরচন্দ্রের মতো খরশান ধার, বা আক্রমণের দাপট, নেই গাণ্ডীবের টঙ্কার। ঢিমে-ঢালা ছন্দে আব অতিকথনে সবটাই মিয়োনো। গুরুর প্রভাব শিরোধার্য হয়ে থাকলে এই জাতীয় সাময়িক প্রসঙ্গেব কবিতা যেমন বাড়ত সংখ্যায়, তেমনি বাড়ত তাঁর ভিতরকার রাগের ঝাঁজ।

শিবনাথ শাস্ত্রীও তাঁর বিখ্যাত রামতনু-বিষয়ক বইয়ে অতি ক্ষুদ্র একটি পরিচ্ছেদ উপঢৌকন দিয়েছেন বঙ্কিমকে নিয়ে। স্বভাবত সেখানেও এসে গেছে কবিতা নিয়ে কথা।

"তিনি যৌবনের প্রারম্ভে ঈশ্বর গুপ্ত মহাশয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া পদ্য রচনাতে সিদ্ধহস্ততা লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু মধুসূদনের দীপ্ত প্রভাতে আপনাকে পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, সে পথ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু তিনি শুভক্ষণে গদ্য রচনাতে লেখনী নিয়োগ করিলেন।"

এ যুক্তির কোনো শিকড় নেই। ১৮৫৬-য় বেরনো বঙ্কিমের কবিতাব বইয়েব বেশির ভাগ কবিতাই লেখা হয়ে গেছে ১৮৫৩-য়। এর চার বছর আগে, ১৮৪৯-এ, মাদ্রাজ থেকে বেরিয়েছে মদুসূদনের যে কবিতার বই, তা বাংলা ভাষায় লেখা নয়। বেবয নি বাংলাদেশ থেকেও। তা ছাড়াও মাদ্রাজ থেকে বেরনো 'ক্যাপটিভ লেডি' তাঁর জন্মমুহূর্তে সেখানকার বুদ্ধিজীবী মহলে খানিকটা সাড়া তুললেও, কলকাতায় পৌঁছয় নি তাব ঢেউ। লেখালেখিও হয নি তেমন এখানকার কাগজেপত্রে। বাংলাভাষায় লেখা মধুসূদনের প্রথম কবিতার বই 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' বেরিয়েছিল ১৮৬০-এ। পবের বছর 'মেঘনাদবধ কাব্য'। বঙ্কিম তা আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন পবিজনদেব। বঙ্কিমের কবিতা লেখা না-লেখাব সঙ্গে মধুসূদনেব উজ্জ্বল আবির্ভাব একেবারেই সম্পর্কহীন তাই।

এ ছাড়াও কেউ কেউ ছড়িয়েছেন এমন ধারণা যে প্রথম বই বেবনোব পব কবিতা লেখা পুবোপুবি ছেড়েই দিয়েছিলেন তিনি।

"১৮৫৬ খৃস্টাব্দে 'ললিতা মানস' প্রকাশিত হওযাব পর বঙ্কিমচন্দ্র তথাকথিত কাব্যচর্চা একদম ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন। উপন্যাসের মাঝে মাঝে তিনি দুই একটি ছড়া অথবা সঙ্গীত সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, অথবা বঙ্গদর্শনে ক্বচিৎ কখনো দুই একটি গাথা অথবা ব্যঙ্গবসাত্মক কবিতা লিখিয়াছেন—পববর্তীকালে ছন্দোবদ্ধ সবস্বতীর সহিত তাঁহার এই মাত্র সম্পর্ক ছিল।"

বঙ্কিমচন্দ্র/সাহিত্য সাধক চবিতমালা।

এখানে কেবল 'বঙ্গদর্শন'-এরই নাম। নাম নেই 'প্রচার' অথবা 'ভ্রমর'-এব। উল্লেখ নেই গদ্য কবিতাব। তাঁব গদ্য কবিতা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা কবা হবে তাঁব 'গদ্য পদ্য বা কবিতা পুস্তক' প্রকাশেব সময়ে। তাঁর এই প্রথম কবিতাব বই থেকে কিছু নমুনা উদ্ধৃত করাব আগে শুনে নেওয়া যাক 'বঙ্কিম-জীবনী'-তে 'ললিতা' কবিতার যে জন্ম-ইতিহাস। ললিতা একটি ভৌতিক কাহিনী। ভৌতিক অথবা অলৌকিকেব সম্পর্কে তাঁব মনে একটা তীব্র আকর্ষণ থেকেই গেছে আজীবন, প্রখব যুক্তিবাদী মননশীলতাকে পাশ কাটিযে।

"বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যকালে একদিন সন্ধ্যাব সময খালেব ধাব হইতে কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম পথ বহিয়া গৃহে ফিরিতেছিলেন। তখন আকাশ নিবিড় মেঘে সমাচ্ছন্ন। গৃহে পৌঁছিবাব পূর্বেই ঝড উঠিল... এই স্তব্ধ বনে অন্ধকারে বঙ্কিমচন্দ্রেব মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকিবে। ঝড বৃষ্টিব ভয় নয, ভূতেব ভয। তেইশ বৎসব বযসে বঙ্কিমচন্দ্রকে কাঁথিতে ভূতেব অনুসবণ কবিতে দেখিয়াছি। এই ভয বাল্যকালে কিছু বেশি থাকাই সম্ভব। বঙ্কিমচন্দ্র এই জনশূন্য দুর্গম পথে যাইতে যাইতে প্রকৃতিব যে ভাব চারিদিকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহাব কিয়দংশ ললিতায অঙ্কিত করিযাছেন। ললিতা কাব্যটিকে দ্বিতীযবাব মুদ্রিত করিবার সময় বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে ভৌতিক গল্প বলিয়া নির্দেশ কবিযাছেন। এই অন্ধকারাবৃত নির্জন পথে ভৌতিক বিভীষিকায় অনেকেরই হৃদয় বিচলিত হয, কিন্তু কয়জনের ভয়কম্পিতচিত্ত হইতে ললিতার সৃষ্টি হয়? অনেকেই কাপালিক সন্দর্শন করিয়াছেন, কিন্তু কয়জন কপালকুণ্ডলা লিখিযাছেন?"

অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'ললিতা' প্রসঙ্গে ভৌতিক বিশেষণ আর বঙ্কিম প্রসঙ্গে ভূত-ভয়-গ্রস্ততার বিরোধী।

"... তিনি nervous ছিলেন বলিয়া যে ভূতভয়গ্রস্ত ছিলেন এমন বলিলে মিথ্যা বলা হইবে। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে 'ললিতা' প্রকাশিত হয়। একখণ্ড আমার আছে। তাহাতে ভৌতিক গল্প, এমন কোনো কথা নাই। ২২ বৎসর পরে বঙ্কিমবাবু যখন প্রবীণ, তখন ঐটির পুনর্মুদ্রণ করেন। অনেক স্থলে খোল নলচে—দুই বদলাইয়া দেন। তাহাতেই ছাপা আছে —'ললিতা ভৌতিক গল্প।' এই ভৌতিক কথা লইয়া, কোনো ভূতের ব্যাপারের সহিত গল্পের সম্পর্ক আছে, বুঝান হইয়াছে।

"ঐরূপ বুঝান ভুল। প্রথম কথা, ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে যখন 'ললিতা' ছাপান হয়. তখন 'ভৌতিক গল্প' নাম ছিল না; 'পুরাকালিক গল্প' নাম ছিল। তাহার পর বঙ্কিমবাবুর বাল্যাবস্থায়, কাঁটালপাড়ায় চাটুয্যেদের বাড়ির দক্ষিণে খাল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ খোলা মাঠ ছিল। তাহাতে আশে-পাশে দুই-একটা ঝোপ থাকিলেও বড় গাছের জঙ্গল একেবারেই ছিল না। আমি অবশ্য সে সময়ের কথার সাক্ষী নই। তবে বঙ্কিমবাবুর মুখে শুনিয়াছি, তিনি সকালে বিকালে সেই ক্ষুদ্র প্রান্তরের শষ্প শয্যায় উর্দ্ধমুখে শয়ান থাকিতে ভালবাসিতেন। আর সেই যে প্রাণ-ভরিয়া স্বভাবের শোভাসন্দর্শন, তাহাতেই তাঁহার কবিত্বশক্তির স্ফূরণ হইয়াছিল।... বঙ্কিমবাবু বয়সকালে কিঞ্চিৎ Colour blind বা রং কানা হইলেও অতি বাল্যাবস্থা হইতেই এই সকল দেখিতেন, প্রাণ ভরিয়া ভোগ করিতেন, আর সঙ্গে সঙ্গে আত্মহারা হইতেন।"

বঙ্কিমের প্রথম গদ্য রচনা

অক্ষয়চন্দ্রে এই এক নতুন সংবাদ—বঙ্কিমচন্দ্রও বয়সকালে হয়ে উঠেছিলেন রং-কানা। এখন রং-কানা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে গবেষণার ধূম। আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, রবীন্দ্রনাথের চোখের উপর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অস্ত্রোপচারের পর দেশী-বিদেশী গবেষকবৃন্দ বঙ্কিমের মতো আরো একটি প্রতিভাবান রুগীকে পেয়ে গিয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠবেন নিজেদের কৃতিত্ব প্রকাশের সৌভাগ্যে। 'ললিতা' আর 'মানস'-এর আরম্ভেব কিছুটা অংশ শোনা যাক এখন। 'ললিতা'র প্রথম সর্গ থেকে

মহারণ্যে অন্ধকার, গভীর নিশায়
নির্মল আকাশ নীলে, শশী ভেসে যায়।।
কাননের পাতা ছাদ, নাচে শশিকরে।
পবন দোলায় তারে সুমধুর স্বরে।।
নীচে তার অন্ধকারে, আছে ক্ষুদ্র নদী।
অন্ধকার মহাস্তব্ধ, বহে নিরবধি।।
ভীম তরুশাখা যথা পড়িয়াছে জলে.
কলকল করি বারি সুরবে উছলে।।
আঁধারে অস্পষ্ট দেখি, যেন বা স্বপন !
কলিকাস্তবকময় ক্ষুদ্র তরুগণ।।

দ্বিতীয় সর্গ থেকে—

মরি প্রেম যার মনে, সে কি চায় রাজ্যধনে,
প্রিয় সুখ ত্রিসংসার ত্যায়।
হৃদে তার যে রতন, আলো করে ত্রিভুবন,
অন্য মণি নিবায় বিভায়।।

এক মোহে সদা মত্ত, না জানে আপনি মর্ত্ত্য,
যাহা! দেখে তাই প্রেমাকুল।
রবি শশী তারাকাশ, পয়োদ পবনশ্বাস,
সাগর শিখর বনফুল।।
যেন লক্ষ বিদ্যাধরে, সদা কর্ণে গান করে,
কি মধুর শব্দহীন ভাষা।
হেরিয়ে সামান্য কলি, নয়ন সলিলে গলি
উছলে অনন্ত ভালবাসা।।

'মানস'-এর আরম্ভের অংশ

হা ধরণি ধর কি বে হৃদয়মণ্ডলে,
ধর কি কোথাও মম, মনোমত স্থলে ?
কি আছে সংসাবে আব বাঁধিবারে মোরে!
যে কালে কেটেছে কাল ভরসার ডোরে।।
মনে করি কাঁদিব না বব অহংকাবে।
আপন নয়ন তবু ঝরে ধারে ধারে।।
গোপনে কাঁদিবে প্রাণ সকলি আঁধাব।
জীবন একই স্রোতে চলিবে আমার।।

১৩৫৩-ব পর 'সংবাদ প্রভাকব' বা 'সাধুবঞ্জন'-এ আর কোনো কবিতা বেরোয় নি বঙ্কিমের। অথচ এই সময়েই লিখেছেন এই কবিতার বইয়ের লেখাগুলো। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, কবিতাগুলো ছাপাতে দেননি কেন ? বিশেষত যেখানে ঈশ্বর গুপ্তেব মতো পৃষ্ঠপোষক তরুণ আর প্রতিশ্রুতিবান কবিদের জন্যে খুলেই রেখেছেন তাঁর কাগজের দরাজ দরজা। তদুপরি বঙ্কিম তাঁর স্নেহভাজন প্রথম থেকেই। বঙ্কিম কবিতা পাঠিয়েছেন, ততখানি মনঃপূত হয়নি। না হওয়ার প্রসঙ্গে কবিতাব নীচে ছাপিয়ে দিয়েছেন নিজেব মন্তব্য। তবুও ছেপেছেন সে-কবিতা। সুতরাং কবিতা লিখেও না-পাঠানোর সংগত কাবণ অনুমান কবা খুবই কঠিন! গোয়েন্দাগিরি চালালে, হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে দুটি সম্ভাব্য কাবণ।
এক, বঙ্কিমের অভিমান।
দুই, বঙ্কিমের অহংকাব।
অভিমানের কারণ মিলে যাবে সামান্য অনুসন্ধানেই। 'সংবাদ প্রভাকর'-এব কবিতা প্রতিযোগিতায় তিনি শেষ পর্যন্ত পুরস্কৃত হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু পুরস্কার দাতাদ্বয় আব তাঁর পাঠকবৃন্দ কেউই তাঁকে স্বীকৃতি জানায় নি তেমন ক্ষমতাবানের। প্রত্যেকের বিচারেই তাঁর স্থান তৃতীয় সারিতে। অনেকটা 'কনসোলেশন'-এর ভঙ্গিতেই তাঁর এই পুরস্কার পাওয়া। সংবাদপত্রে, ছাপার অক্ষরে, নিজের অক্ষমতাব এই দৃষ্টান্ত থেকেই সংবাদপত্রের পাতায় নিজের আত্মপ্রকাশ সম্বন্ধে তাঁর ভিতরে এই সময় থেকেই জেগে উঠতে থাকবে এক ধরনের কুণ্ঠা। যদিও কবিতা প্রতিযোগিতার রায় বেরনোর পরেও তিনি অংশ নিয়েছেন 'কালেজীয় কবিতা যুদ্ধে' কিন্তু সেখানেও লড়াই শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল দ্বিমুখী, দ্বারকানাথ বনাম দীনবন্ধু। দ্বারকানাথের সন্ধিপত্রে বঙ্কিম অভিযুক্ত কিন্তু আক্রান্ত দীনবন্ধুই। এই সন্ধিপত্র বেরনোর পর বঙ্কিমের আর কোনো কবিতা বেরোয়নি 'সংবাদ প্রভাকরে'। শেষ কবিতা বেরনোর তারিখ ১৮৫৩-র ১৭ সেপ্টেম্বর। আর সন্ধিপত্র বেরনোর তারিখ ১৮৫৪-র ৩১ জানুয়ারি।

দ্বিতীয় অনুমান হিসেবে অহংকারের উল্লেখ। এখানে অহংকারের অর্থ, আমি অন্যের থেকে স্বতন্ত্র, এই বোধ।

বালক রবীন্দ্রনাথের প্রথম বঙ্কিম-দর্শনের অভিজ্ঞতার কৌতুকময় বিবরণ জানা আছে আমাদের। প্রথম এক ঝলক দেখাতেই তিনি চিনে নিয়েছিলেন সম্পূর্ণ মানুষটিকে।

> "দেখিবামাত্রই যেন তাঁহাকে সকলেব হইতে স্বতন্ত্র এবং আত্মসমাহিত বলিয়া বোধ হইল। আর-সকলে জনতার অংশ কেবল তিনি যেন একাকী একজন।"

এই স্বাতন্ত্র্যবোধ অথবা অহংকার বঙ্কিমেব উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। এই পবিবার সম্পর্কে অহংকাবেব ব্যাজস্তুতি নানা সময়ে কানে এসেছে আমাদের। অন্যদেব বিষয়ে অল্পস্বল্প। বঙ্কিমেব সম্পর্কে বেশি, যেহেতু পবিবারের মধ্যে তিনিই ছাড়িয়ে গেছেন সবাইকে প্রতিভায়, পরিচিতিতে। বঙ্কিম যে বালক বয়স থেকেই অহংকারী আব আত্মসচেতন তাব প্রমাণ আমবা পেয়েছি মলেট সাহেবেব টি-পার্টিব ঘটনায়, মেদিনীপুবে স্কুল জীবনেব শুরু যখন। বয়স বাড়াব সঙ্গে সঙ্গে প্রখর হয়েছে এই বোধ।

> "বঙ্কিমচন্দ্র ববাববই একটু স্বাতন্ত্র্যধর্মী, বাশভাবি প্রকৃতিব লোক ছিলেন, আপন স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য লইয়া জনতা হইতে ত দূবে থাকতেনই, সাহিত্যিক মজলিসেও আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় বাখিয়া চলিতেন। এই কাবণে দাম্ভিক বলিয়া তিনি নিন্দাভাজনও হইযাছেন।"

সাহিত্য সাধক চরিত্রমালা/বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শুনতে চাইলে এ-বকম বিববণ সংগ্রহ কবা যেতে পারে আরো, তাঁর মুগ্ধ ভক্ত সম্প্রদায়ের স্মৃতিচাবণা অথবা শ্রদ্ধান্বিত আলোচনা থেকেও।

১। "বঙ্কিমবাবু প্রথম বয়সে কিঞ্চিৎ গর্বিত ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। প্রথম বয়সে কেবল বঙ্কিমবাবুর নহে, তাঁহার জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতৃগণেবও অহংকাবের অপবাদ ছিল। গর্বিত হইলেও বঙ্কিম দাম্ভিক ছিলেন না। তিনি যে তাঁহাব চারিদিকের জনসাধাবণ হইতে বিদ্যা বুদ্ধি প্রতিভাবলে কতদূব উন্নত তাহা তিনি জানিতেন। এই আত্মগরিমা-জ্ঞানের সঙ্গে তাঁহার মেজাজের স্বাভাবিক রুক্ষতাও কিঞ্চিৎ মিশ্রিত হইয়া থাকিবে। তিনি সহজেই চটিয়া যাইতেন...।"

বঙ্কিমচন্দ্র/ অক্ষযকুমাব দত্তগুপ্ত

২। "আমার বহরমপুবে যাওয়াব কিছু দিন পরে, বঙ্কিম বাবু বহরমপুবে যান। ...তৎকালিক বঙ্কিম-চবিত্র চিহ্নিত কবিতে গিয়া, তাঁহার অহংকারেব কথা না বলা, ঘোরতর বিড়ম্বনা। বঙ্কিমবাবু আমাদেব সমাজে সাহিত্যে গোলাপ ফুল। গোলাপেব কেবল পাপড়িব বঙ দেখিবে, মিঠা-মিঠা সৌবভ দেখিবে, ঢল-ঢল রূপ দেখিবে; গোলাপেব বৃন্তে যে কাঁটা আছে, তাহা কি দেখিতে নাই ? গোলাপেব কাঁটা আছে বলিয়া কি গোলাপের মর্যাদা কম ?...অত কথা বুঝি আর না বুঝি, এই বুঝি যে, বঙ্কিমকে অহংকারী বলিলে তাঁহার মর্যাদা হানি করা হয় না। কোনো সত্য কথাতে, কাহারো হানি করা হয় না।; বিশেষ বঙ্কিম অহংকারী ছিলেন বলিয়া, তিনি দাম্ভিক ছিলেন, এমন্ কথা বলিতেছি না।"

বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন/অক্ষয়চন্দ্র সরকার

এবকম টুকরো মন্তব্য যে কেবল প্রত্যক্ষদর্শীর মুখেই শোনা যাবে তা নয়, শোনা যাবে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের মুখেও। 'বঙ্গদর্শন'-এর পুনঃপ্রচার নিয়ে কথা হচ্ছে একদিন, তাঁরই বাড়িতে।

> "তখন স্থির হইল, সঞ্জীববাবু উভয় সম্পাদক ও কার্য্যাধ্যক্ষ হইবেন, এবং এ ভাবে 'বঙ্গদর্শন' পুনঃ প্রচারিত হইবে। তখন বঙ্কিমবাবু বলিলেন—'একটি কথা। শিবনাথ শাস্ত্রীকে কখনও বঙ্গদর্শনে লিখিতে দিবে না বল।"

আমরা সকলে বিস্মিত হইলাম। আমি বলিলাম—

"আপনি এত লোকের মাথায় লঙ্কাব হাঁড়ি ঝাড়িলেন। আব শিবনাথ শাস্ত্রী আপনার 'সুন্দবী-সুন্দর' কবিতার অনুকরণে একটি বিদ্রূপাত্মক কবিতা লিখিয়াছিল বলিয়া কি তাহাব প্রতি এত ক্রোধ উচিত ?" তিনি বলিযাছিলেন—"বিদ্রূপেব জন্য নহে। সে উহা maliciously (অসরল ভাবে) কবিযাছিল।" অক্ষযবাবু বলিলেন—"চাটুজ্যেদের অহংকার দেশে একটা প্রবাদেব মত দাঁড়াইয়াছে।"

আমিও হাসিতে হাসিতে বর্ধমানে সঞ্জীববাবু সম্বন্ধে সে ধারণাব কথা বলিলাম। বঙ্কিমবাবু বলিলেন—

"নবীন। কথাটা ঠিক। এই অহংকারটুকু না থাকিলে মরিয়া যাইতাম।"

বঙ্কিমচন্দ্র/নবীনচন্দ্র সেন

অনর্গল কবিতা লিখেও পত্রিকায অপ্রকাশিত বেখে তিনবছব পবে গ্রন্থাকাবে তাদেব প্রকাশ কবাব ভিতবে বঙ্কিমেব অন্তঃশীল অহংকারেব ভাষাটা ছিল হযতো এই রকম—

প্রত্যহেব সংবাদপত্রে পাশ-ফেল-এব পবীক্ষা দিতে আমি অনিচ্ছুক। আব অন্যেব সার্টিফিকেটে খ্যাত হতেও চাই না কবি হিসেবে। আপন কবি প্রতিভাব উর্ব্বর উন্মোচনেই আমি কবি, অন্তত আমার নিজের কাছে। অতঃপব কাব্য গ্রন্থেই উৎকীর্ণ থাকুক আমাব প্রতিভার পবিচয।

এই কবিতাব বই-এব যে বিজ্ঞাপন লিখেছিলেন বঙ্কিম, সমালোচনা হযেছিল তাবও। লিখেছিলেন অক্ষযচন্দ্র সবকাব।

"১৮৫৬ সালেব বঙ্কিমবাবুব বিজ্ঞাপন-পাঠে মনে হয, এই গদ্যসম্পৎ বঙ্কিমবাবু একান্ত উপেক্ষা কবিয়াছিলেন। ...সমস্ত লেখাটি পড়িলেই মনে হয, সাগরী যুগেব বঙ্গ এই লেখায একটুও প্রতিফলিত হয নাই। সেই অপূর্ব প্রসাদগুণেব প্রভাব এই বিজ্ঞাপনে প্রকাশ পায় নাই। মনে হয়, গ্রন্থকাব সেই গদ্যেব প্রভাব তখন অনুভব করেন নাই —প্রত্যুত সেই গদ্য একান্তই উপেক্ষা কবিয়াছেন।"

সাগবী অর্থে বিদ্যাসাগরী। ১৮৫৬ সালেব মধ্যেই, ব্যাকবণাদি বাদে, বেবিযে গেছে সাহিত্য-রসাশ্রিত বিদ্যাসাগবেব এই সমস্ত বই—

১৮৪৭—বেতালপঞ্চবিংশতি

১৮৪৮—বাঙ্গালাব ইতিহাস, ২য় ভাগ

১৮৪৯—জীবনচরিত

১৮৫১—বোধোদয

১৮৫৪—শকুন্তলা

১৮৫৫—বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষযক প্রস্তাব।

১৮৫৫—ঐ, দ্বিতীয় পুস্তক

১৮৫৬—কথামালা। চরিতাবলী।

বিদ্যাসাগব আব অক্ষয়কুমাব দত্ত, এই দুজনই তখন বাংলা গদ্যের আদর্শ লেখক। বঙ্কিম যখন যথার্থ গদ্যকার হয়ে উঠবেন, তার কিছু আগে থেকেই অবশ্য বিদ্যাসাগবী ভাষাব বিরুদ্ধে বঙ্কিম-কটাক্ষের শুরু। বিশেষ কবে 'মাসিক পত্রিকা'-য় 'আলালের ঘবেব দুলাল' বেবনোব পর থেকে। কিন্তু তাব আগে বিদ্যাসাগরী গদ্য সম্বন্ধে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদেব শ্রদ্ধাভাবাপন্নতাব দৃষ্টান্ত মিলবে বামগতি ন্যায়রত্নেব প্রশস্তি-বচনে—

"বর্ণ পরিচয়, কথামালা, বোধোদয়, চবিতাবলী প্রভৃতি শিশুদিগের পাঠোপযোগী কয়েকখানি পুস্তক বিদ্যাসাগরের নিতান্ত সরল রচনার উদাহরণস্থল। ইহাতে স্পষ্টই প্রকাশ

হইতেছে যে, বিদ্যাসাগর কি সরল, কি মধুর, কি ওজস্বিনী—যেরূপ রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহাতেই কৃতকার্য হইয়াছেন তাঁহার সর্ববিধ রচনাই লোকে সাতিশয় সমাদরপূর্বক গ্রহণ করিয়াছে এবং সেই সেই পুস্তককে আদর্শ স্বরূপ স্থির করিয়া রাখিয়াছে। বিদ্যাসাগরের 'বিধবা বিবাহ' ও 'বহুবিবাহ বিচার' নামক পুস্তকদ্বয় সারগর্ভ যুক্তিসমেত রচনার নিকষস্থল। বাঙ্গালা ভাষায়, শাস্ত্রীয় বিচার করা এবং সেই বিচার সরল ভাষা সহযোগে সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিতে দেওয়া, এ উভয়ই কঠিন ব্যাপার। বিদ্যাসাগর যে কিরূপ পাণ্ডিত্য সহকারে—ও কিরূপ সুন্দর প্রণালীতে সেই বিষয়ের সমাধান করিয়াছেন, তাহা সেই সেই গ্রন্থ একবার অধ্যয়ন না করিলে কোনমতেই হৃদয়ঙ্গম হইবার নহে।"

বঙ্কিমকে নিয়ে এইখানেই জড়িয়ে পড়তে হয় ধাঁধায়। বঙ্কিম তাঁর ছাত্রজীবনে নিবিষ্ট পড়ুয়া হিসেবে খ্যাত। তাঁর পঠন-পাঠনের ভূগোল দশদিক পরিব্যাপ্ত। স্কুলপাঠ্য গ্রন্থাবলীর বাইরেও দেশি বিদেশী নানা বিষয়ে একনিষ্ঠ তাঁর অনুরাগ। অক্ষয়চন্দ্র সরকার জানিয়েছেন ইংরেজি সাহিত্যপাঠে গভীর আগ্রহের খবর। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ইতিহাসের। আর বঙ্কিম নিজে জানিয়েছেন সংস্কৃত পণ্ডিতদের লেখা বাংলা রচনা সম্পর্কে ঘোরতর বিতৃষ্ণার সংবাদ। এতখানি ব্যাপ্ত সচেতনতাও কেন যে বঙ্কিমের ছাত্রজীবনের গদ্য এবং পদ্যেও রশ্মিপাত ঘটাতে পারল না স্বাচ্ছন্দ্যময় কোনো স্বাতন্ত্র্যের, ধাঁধা সেটাই।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর একটি ইংরেজি প্রবন্ধের নাম, 'The Late Bankim Chandra Chatterji'। বেরিয়েছিল ক্যালকাটা য়ুনিভার্সিটি ম্যাগাজিনে (১মে ১৮৯৪)। সে রচনাটি এখন 'হরপ্রসাদ রচনা সংগ্রহ'-র দ্বিতীয় খণ্ডেব অন্তর্গত। সেখানেই রয়েছে—

"His early poems in English. his articles in the *Calcuttta Review*. even his English novels are now forgotten."

ইংরেজিতেও কবিতা লিখেছিলেন বঙ্কিম ? স্বনামে ? কিন্তু কোন কাগজে ? তা কি উদ্ধাব করা সম্ভব ?

৩

চতুর্দিকের আবেগবিরলতা যখন খাড়াই দেওয়ালের মতো স্পষ্ট, তখনই আমাদের চমকে উঠতে হয় তাঁর কবিতা বিষয়ে দু-দুটো উদ্দীপক রচনার দুর্লভ স্বাদে। প্রথমটি বেরিয়েছিল ১৯৬৯-এর মে সংখ্যা 'পরিচয়ে'। দ্বিতীয়টি বেরিয়েছে বঙ্কিমের ১৫০তম জন্মবার্ষিকীর সময়ে 'পুবশ্রী' পত্রিকায়। পরিচয়ের প্রবন্ধ তাঁব গদ্য কবিতা নিয়ে। এখন তা থেকে যাবে আমাদের আলোচনা-এলাকার বাইরে। দ্বিতীয় প্রবন্ধটির দিকেই আমরা তাকাব অস্থির আগ্রহে। দুটি প্রবন্ধই একজনের রচনা। নির্মলনারায়ণ গুপ্ত। বঙ্কিমের 'মানস' নামের দীর্ঘ কবিতাটির দিকে ভিন্ন চোখে তাকাতে উৎসাহ জুগিয়েছেন তিনি। স্বচ্ছন্দ সাহসিকতায় 'মানস'-কে তুলনার তুলাদণ্ডে চাপাতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের 'মানসসুন্দরী'-র সঙ্গে।

"১৮৫৩ সালে রচিত এই 'মানস' কবিতাটি কি জাতের কবিতা ? বিস্ময়কর শোনালেও, বঙ্কিমের 'মানস' জীবন ও বিশ্বপ্রকৃতিকে সামনে রেখে কবির মানস প্রতিক্রিয়াকে ব্যক্ত করছে, ঠিক যেমন ব্যক্ত হয়েছে আট বছর পরে রচিত মধুসূদনের 'আত্মবিলাপ' কবিতায় অথবা চার দশক পরে রচিত রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী কাব্যের অন্তর্গত 'মানসসুন্দরী' ও 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতায়। প্রকাশের সূক্ষ্ম চারুত্বে বালক রবীন্দ্রনাথ বালক বঙ্কিম থেকে অনেকটা এগিয়ে ছিলেন, যৌবনকালে পরিণত কবিত্বের সোনার ফসল তিনি

কালদেবতাব 'সোনার তরী'-তে তুলে দিয়েছিলেন। 'মানস'-এর কবি ও 'মানসী' 'সোনার তরী'-র কবির মধ্যে শক্তির দিক দিয়া কোনো তুলনা চলে না। কিন্তু জীবন ও বিশ্বপ্রকৃতিকে বিহারীলাল-প্রভাবিত রবীন্দ্রনাথ যে দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন, বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী'-র প্রায় দুই দশক আগে বঙ্কিমচন্দ্রের 'মানস' কবিতায় প্রায় সেই ধরনের 'অ্যাপ্রোচ' আমাদের মুগ্ধ করে বৈকি।"

বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল'-এই রবীন্দ্রনাথ প্রথম শুনেছিলেন বাংলা কবিতায় কবির নিজের সুর। এ-সুর যে তার আগে কোথাও বাজে নি কখনো, এমন নয়। রবীন্দ্রনাথও জানতেন 'তৎসময়ে আর তৎপূর্বে মাইকেলের চতুর্দশপদীতে কবিব আত্মনিবেদন কখনো কখনো প্রকাশ পাইয়া থাকিবে।' কিন্তু সেইসঙ্গে তিনি বিশ্বাস করতেন চতুর্দশপদীর আঁটোসাঁটো কাঠামোয় কবির স্বতঃস্ফূর্ত আত্মকথন স্বভাবতই হয়ে উঠতে চায় সংহত-কঠিন, বেদনার গীতোচ্ছ্বাস ফুলে ফেঁপে ওঠার স্ফূর্তি পায় না তেমন। সনেটের স্থাপত্যধর্মীতার চেয়ে তাই তাঁর মনে হয়েছিল লিরিক-এর পক্ষে পযাব ও ত্রিপদীব মুক্তগতি জলযানেই সিদ্ধির সীমান্তবর্তী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। মধুসূদনও তা জানতেন। তাই মেঘনাদবধ লিখতে লিখতেই বাজনারায়ণ বসুকে জানিয়েছিলেন—মেঘনাদ শেষ কবেই বিদায় জানাবেন 'হিবোইক পোয়েট্রি'-কে। কেননা—

> "There is the wide field of Romantic and Lyric poetry before me. I think I have a tendency in the Lyrical way."

'আশার ছলনে ভুলি' কিংবা 'রেখো মা দাসেরে মনে' চতুর্দশপদী নয়। তাঁর এই 'আত্মবিলাপ'কে গীতিকবিতার ক্ষেত্রে অগ্রণীর স্বীকৃতি না জানানোয় ছন্দ-গুরু প্রবোধচন্দ্র সেন অভিযোগের তর্জনী তুলতে দ্বিধা করেন নি রবীন্দ্রনাথের দিকে। মধুসূদনকে স্বীকার করে নিলে তাঁরও অগ্রণী হিসেবে বঙ্কিমও কি পেতে পারেন না সমাদৃত অভ্যর্থনা, এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই নির্মলনাবায়ণ গুপ্তের সাহসী আলোচনার বিস্তার। তুলনামূলক ভঙ্গিতে সেখানে রবীন্দ্রনাথের 'মানসসুন্দরী' আব বঙ্কিমের 'মানস' থেকে নির্বাচিত অংশ পাশাপাশি সাজানো। ববীন্দ্রনাথ—

> "হেরিব অদূরে পদ্মা, উচ্চতটতলে
> শ্রান্ত রূপসীর মতো বিস্তীর্ণ অঞ্চলে
> প্রসারিয়া তনুখানি, সায়াহ্ন-আলোকে
> শুয়ে আছে; অন্ধকাব নেমে আসে চোখে
> চোখের পাতাব মতো; সন্ধ্যাতাবা ধীরে
> সন্তর্পণে করে পদার্পণ, নদীতীরে
> অরণ্য-শিয়রে; যামিনী শয়ন তাব
> দেয় বিছাইয়া, একখানি অন্ধকার
> অনন্ত ভুবনে।"

বঙ্কিম—

> "দেখিব দ্বীপের শোভা মোহিত নয়নে।
> বিপিন বারিধি নীল বিশাল গগনে।।...
> নিরখিব নীরধারে, ভীষণ ভূধর।
> ফুলায়ে বিশাল বক্ষ জলধি উপর।।...
> কর্কশ সানুতে তার বিহারি বিজনে।
> আ মরি এসব কবে হেরিব নয়নে।।

মোহে মন মজাইবে প্রকৃতি মোহিনী।
জীবন যাইবে যেন স্বপনে যামিনী।।"

ধাপে ধাপে তুলনার এইসব খোয়াই ডিঙিয়েই প্রবন্ধকার পৌঁছে যান উপপাদ্যের প্রান্তিকে—

"সুতরাং একথা অনস্বীকার্য যে আধুনিক লিরিক কবিতায় প্রাণ প্রতিমা, সৌন্দর্যাভিসারী কবির মর্মের মোহিনী মানসসুন্দরী, সোনাব তরীতে ভাসমান কবিচিত্তে উদ্ভাসিত হবার অনেক আগে আবেক কবিমানসে উঁকি দিয়ে গিয়েছিলেন। বঙ্কিম প্রতিভা আপন পরিণতি ও বিকাশের পথ খুঁজে পেয়েছিল গদ্য সাহিত্যে। এই কারণে কবি বঙ্কিমের অপরিণত বযসের রচনায় কি ধবনের সম্ভাবনা স্ফুটনোম্মুখ হয়েছিল, তা এ পর্যন্ত কেউ খতিয়ে দেখেননি। উপবেব আলোচনায় আমরা দেখলাম বাংলা সাহিত্যেব আঙিনায় আধুনিক লিরিক কাব্যধারার আবির্ভাবে-ভগীরথের শঙ্খটি ছিল বঙ্কিমের হাতে। কালবিচাবে তাঁর এই 'অগ্রণীত্বেব অধিকার' অবশ্য স্বীকাব কবতে হবে।"

রবীন্দ্রনাথ কবি হযে উঠেছিলেন ধাপে ধাপে, শ্লথ ও পতনোন্মুখ পদসঞ্চারে। কিন্তু গদ্যে আরম্ভের দুঃসাহসিক লগ্ন থেকেই সবল, সবল ও স্বতন্ত্র। বঙ্কিমকে গদ্যকার হতে হল ধাপে ধাপে, শ্লথ ও পতনোন্মুখ পদসঞ্চাবে। পদ্যেব বঙ্কিম সীমাবদ্ধতাব মধ্যেও নিজস্ব জীবনবোধে স্বচ্ছন্দ, নিশানা-সচেতন। তথাপি দ্বিধাগ্রস্ত। এই দ্বিধাগ্রস্ততাই তাঁব কবিতাকে অর্জুনেব বীরবেশের বদলে পবিয়ে দিল বৃহন্নলার ছদ্মবেশ। কবিতাতেও অনেকখানি এগিয়ে চলাব সম্ভাবনাকে তিনি নিজেই থামিয়ে দিলেন বার বার, কখনো আত্মসংশয়ে, কখনো সুহৃদ সমাজেব পরামর্শে, কখনো পাঠকগোষ্ঠীব শীতল প্রতিক্রিয়ায়। বিষয়টি আবো স্বচ্ছতব হয়ে উঠবে তাঁর 'কবিতা পুস্তক' বেরনোর পব। এ-প্রসঙ্গে আমরা আপাতত পূর্ণচ্ছেদ টানতে পাবি এলিযট থেকে ধার-করা একটি উক্তিতে, যা 'পো'-র সম্পর্কে কথিত—"Poe is indeed a stumbling block for the judicial critic"।

১০ জানুয়ারি

গণিতেব অধ্যাপক লজ সাহেব বদলি হয়ে গেলে ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আবার ফিবে এলেন হুগলি কলেজে।

এপ্রিল

হুগলি কলেজ থেকে সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা দিল ১৩ জন ছাত্র। বৃত্তি পেলেন একা বঙ্কিমচন্দ্রই, 'highest proficiency in all the subject' দেখিয়ে। বৃত্তি দু-বছরের জন্যে মাসে ২০ টাকা। উঠলেন থার্ড ইয়ারে বা দ্বিতীয় শ্রেণীতে।

বঙ্কিমের পাওয়া নম্বর

Literature—55
History—82
Mathematics—67.5
Natural Philosophy—74.3
Translation—76
Total—354.80

২৮ জুন

গ্রীষ্মের ছুটির পর মাত্র এক মাস হুগলি কলেজে পড়ে ট্রান্সফারের আবেদন জানালেন অধ্যক্ষের কাছে। কলেজের অস্থায়ী অধ্যাপক তখন থোয়েট সাহেব। তাঁর মন্তব্য—"Bunkim Chunder is a youth of good character and acquirements."

বঙ্কিম যখন হুগলি কলেজ ছাড়ছেন, তখন ঐ কলেজের ইংরেজি বিভাগে ক্রমশই কমে আসছে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা। ১৮৫২-য় ইংরেজি বিভাগে হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা ৩৮৯। মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ৬। ১৮৫৬-য় ৩০ এপ্রিলে হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা ৪৫৫। মুসলমান ছাত্র ৭। পরের বছরের ৩১ মে-তে এই সংখ্যা দাঁড়াবে– হিন্দু ছাত্র ৪৬২। মুসলমান ছাত্র ৮। এতগুলো বছরে মুসলমান ছাত্রদের জন্যে একটাই সুবিধে, সেটা মাইনেয়। এবার ক্রমশই দানা বেঁধে উঠতে থাকবে এই অভিযোগ মহসীন ফান্ডের টাকায় কেন ইংরেজি শিখবে হিন্দু ছাত্ররা। আরো কয়েক বছর পরে আবদুল লতিফ খাঁ এগিয়ে আসবেন এই অব্যবস্থা বা অনিয়মের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে।

৩০ জুন

'সংবাদ প্রভাকর'-এ 'ললিতা ও মানস' এর বিজ্ঞাপন—

> "উক্ত উভয় পুস্তক পয়ারাদি বিভিন্ন ছন্দে মৎকর্ত্তৃক বিরচিত হইয়া সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে। যাঁহার প্রয়োজন হয়, প্রভাকর যন্ত্রালয়ে অথবা পটলডাঙার ৮৬নং নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরীতে তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন। ওই পুস্তকদ্বয় একত্রে বাঁধানো হইয়াছে। মূল্য ছয় আনা।
>
> শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়"

১২ জুলাই

আইন পড়ার জন্যে হুগলি কলেজ থেকে ট্রান্সফার দিয়ে বঙ্কিম ভরতি হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। হুগলি কলেজে আইন বিভাগ ছিল না। অন্যদিকে ওই বছরেই প্রেসিডেন্সি কলেজে খোলা হয়েছিল আইন বিভাগ।

এ-আলোচনায় লাইটহাউসের আলোর মতো ঘুরে ঘুরে আসবে বিশ্বসাহিত্যের যে মহাপ্রতিভার প্রসঙ্গ, সেই টলস্টয়কেও কারো কারো মনে পড়ে যেতে পারে এই মুহূর্তে। কাজানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র যখন তিনি, বহু ভাষায় বিশ্বসাহিত্যের নিমগ্ন পাঠকও যখন, তখনই ১৮৪৫-এর অগাস্টের মাঝামাঝি আচমকা নিয়ে বসলেন সিদ্ধান্ত—ডিপার্টমেন্ট অব ওরিয়েন্টাল ল্যাংগুয়েজ থেকে ট্রান্সফার নিয়ে ভরতি হবেন ল ডিপার্টমেন্টে। কেন এই অদল-বদল ? উত্তর মিলবে তাঁরই নিজের কথায়—

> "I personally find this science more easy and natural to apply to our private lives than any other, and I am consequently very pleased with the change."

বঙ্কিম হঠাৎ 'ল' পড়তে চাইলেন কেন ? চাকরির ব্যাপারে নিশ্চিত হতে ? 'ল' পড়া থাকলে ওই সময়ে আদালতে জজ-পণ্ডিতের চাকরি পাওয়াটা সুনিশ্চিত ছিল বলে ?

৪৯ থেকে ৫৬, ৭ বছর হুগলি কলেজে কাটিয়েছিলেন বঙ্কিম। কলেজ ছাড়ার অনেক পরে বিখ্যাত। কলেজের ইতিহাসে তখন তাঁর জন্যে সম্মানিত আসন। কে. জ্যাকেরিয়ার 'হিসট্রি অব হুগলি কলেজ'-এ বঙ্কিমের আগে সাহিত্যকর্মী হিসেবে যে দুই কৃতী ছাত্রের নাম, তার প্রথম জন হরচন্দ্র ঘোষ, দ্বিতীয় জন গঙ্গাচরণ সরকার। বঙ্কিমের প্রসঙ্গ এর পরেই—

"Hurro Chunder Ghose and Ganga Churn Sircar were both thrown into shade by another student of the College. Bunkim Chunder Chatterjee. At College he was easily the best man of his year. In 1854 he was first in the Junior Scholarship Examination with 275.5 marks. while the second obtained only 229.5. He outdistanced his fellows again in the Senior Scholarship Examination. In 1856 he. like Dwarkanath joined the Presidency College to study Law and he was one of the first graduates of the new University. As early as 1854 his Bengali writings drew public attention We read that Romony Mohan Roy and Kalli Churn Ray Chowdhury. Zemindars of Rungpore. gave twenty rupees to Bunkim who was then a pupil of the first class of the senior school. 'for some good poetical compositions which appeared in the Probakar newspaper'."

জ্যাকেরিয়ার এই ইতিহাসের সময় পরিধি ১৮৩৬ থেকে ১৯৩৬। সময়ের পরিসীমার মধ্যেই হুগলি কলেজের বিশিষ্ট ছাত্রটির রূপান্তর বাংলা সাহিত্যের সম্রাট-সুলভ এক ব্যক্তিত্বে। চাকুরিসূত্রেও নানা সময়ে হুগলিব নানা অঞ্চল হয়ে উঠবে তাঁর সাময়িক বসবাসের ঠিকানা। তখন কি কোনো এক সময়, স্মৃতির টানে, প্রদক্ষিণ করে গেছেন এই কলেজ ? তখন কি কলেজ কর্তৃপক্ষ নিজেদেব কলেজের মুখোজ্জ্বলকারী এই ছাত্রটিকে আমন্ত্রিত এবং সংবর্ধিত করেছিলেন কোনো সময় ? বঙ্কিমকে স্মরণ করার আরো দুটি সুবর্ণ মুহূর্তকে কি কাজে লাগিয়েছিল এই কলেজ ? ১৯৩৬-এ হুগলি কলেজের শতবর্ষ। ১৯৩৮-এ বঙ্কিমচন্দ্রের শতবর্ষ। বঙ্কিম শতবর্ষে চুঁচুড়া আর চন্দননগরের অনুষ্ঠানসূচির খবর জানা। কিন্তু হুগলি কলেজে ? কোনোভাবেই কি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের উদ্যোগ ঘটে নি সেখানে ?

হুগলি কলেজের শতবার্ষিক উৎসবে যে অন্যান্য কৃতী ছাত্রদের সঙ্গে বন্দিত হবেন বঙ্কিম, নিতান্তই স্বাভাবিক সেটা। উৎসবের শুরু ২৮ নভেম্বর-এর দুপুরে। সেদিনই বাংলার গভর্নর স্যার জন আন্ডারসনকে দিয়ে প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন কলেজের প্রাক্তন প্রথিতযশা শিক্ষক ও ছাত্রদের, যার মধ্যে বঙ্কিম একজন। উৎসবের তৃতীয় দিনে সাহিত্য সভা, কলেজের প্রাক্তন ছাত্র-সাহিত্যিকদের স্মরণে।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আর হরচন্দ্র ঘোষ। আলোচক, চারুচন্দ্র রায়।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। আলোচক, রামপদ মজুমদার। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

হুগলি কলেজ ও বঙ্কিমচন্দ্র। হবিহর শেঠ। মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। হরিহর শেঠ-এর ভাষণের শেষাংশ—

"বঙ্গ সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও নবশ্রী ধারণের সঙ্গে এই কলেজের ওতপ্রোত সম্বন্ধ। এখান হইতে শত শত কৃতী সন্তান বাহির হইয়া দেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন ইহাই গৌরবের কথা। তথাপি বলিতে পারা যায়, যদি এখান হইতে মাত্র বঙ্কিমচন্দ্র সৃষ্ট হইয়াই কলেজের কাজ বন্ধ হইত, তাহা হইলেও ইহা তাঁহার মহিমায় চিরদিন মহিমামণ্ডিত হইয়া থাকিত।"

বঙ্কিম প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র।

কাঁঠালপাড়া থেকে প্রেসিডেন্সিতে পড়তে যাওয়ার অনেক অসুবিধে। তাই বাড়ি ভাড়া করা হল, কলকাতায়। বঙ্কিম জীবনীকার জানাচ্ছেন—

"যাদবচন্দ্র তখন চাকরী হইতে সবেমাত্র অবসর গ্রহণ করিয়া কাঁটালপাড়ায় বাস করিতেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে বাসা করিয়া কলকাতায় থাকিতে হইল। তখন ইষ্টার্ণ-বেঙ্গল রেলপথ নির্মিত হয় নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথ তিন বৎসর আগে খুলিয়াছে। কিন্তু হুগলী

ঘুরিয়া কলকাতায় প্রত্যহ যাতায়াত সুবিধাজনক নয়। কাজেই বঙ্কিমচন্দ্রকে মাতাপিতা ছাড়িয়া কলকাতায় একা গিয়া থাকিতে হইল। সঙ্গে ভৃত্য ও পাচক; সঞ্জীবচন্দ্র মাঝে মাঝে গিয়া থাকিতেন।"

এর পরেই—

"তখন কলিকাতার অবস্থা ভয়ানক। বিদ্রোহানল চারিদিকে প্রজ্বলিত।..."

নিশ্চয়ই বলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই যে, তথ্য হিসেবে এটি নির্ভরযোগ্য নয় আদৌ। যাদবচন্দ্রের নিজের লেখা জীবনী থেকেই আমরা জানতে পারি তিনি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছিলেন ১৮৫৭-য়। বঙ্কিম যখন ভরতি হয়েছেন প্রেসিডেন্সিতে, তখনো পাঁচ মাস বাকি বছর শেষ হয়ে ১৮৫৭-য় পৌঁছতে। আর কলকাতার অবস্থা আদৌ ভয়ানক হয়ে ওঠে নি তখনো। কলকাতা কেন, ভারতবর্ষের কোনা সুদূরতম প্রান্তেও প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে নি বিদ্রোহানল। সেটা ঘটতে শুরু করবে ১৮৫৭-র মার্চ থেকে। সম্ভবত স্মৃতির প্রতারণাতেই 'বঙ্কিম জীবনী'কার তাঁর 'প্রসিডেন্সী কালেজে" নামের অধ্যায়ের আগে 'হুগলী কালেজে" অধ্যায়েও টেনে এনেছেন সিপাহি বিদ্রোহের ঘটনা। লিখেছেন—

"মিউটিনী বা সিপাহীবিদ্রোহের সময়ের একটা কথা বলিব। বঙ্কিমচন্দ্র তখনও শেষ পরীক্ষা দিয়া হুগলী কলেজ ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার বয়স তখন ঊনবিংশতি বর্ষ মাত্র। সেই সময় সমগ্র ভারতবর্ষ অশান্ত। 'বিদ্রোহ-বহ্নি বারাকপুর ও বহরমপুরে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। মাদ্রাজ ও অযোধ্যা সমিধ সংগ্রহ করিতেছে, দিল্লী মশাল জ্বালিতেছে, কানপুর চাপাটি পাঠাইয়া শিশু ও রমণীর জন্য চিতা সজ্জিত করিতেছে।...

যখন সিপাহী-বিদ্রোহ চারিদিকে জ্বলিয়া উঠিল, তখন চুঁচুড়ায় Martial Law জারি হইল।..."

'বঙ্কিম জীবনী'কারেব এই ভুল সংশোধিত হয় নি সর্বাধুনিক সংস্করণের 'প্রাসঙ্গিক তথ্য' অংশে, এবং অন্য কোনো বঙ্কিম জীবনীতেও।

এবপর 'বঙ্কিম জীবনী'কাব আমাদের শুনিয়েছেন বঙ্কিমেব সাহসিকতাব কিছু দৃষ্টান্ত, ঐ মার্শাল-ল-এর সময়েই।

কাঁঠালপাড়া থেকে বঙ্কিমের ছোটোভাই পূর্ণচন্দ্রকে নিয়ে চুঁচুড়াব কোনো এক ধনাঢ্য ব্যক্তির বাড়িতে চলেছেন থিয়েটার দেখতে। নৌকো থেকে নামলেন ব্যাবাকেব ঘাটে। তাবই গায়ে একটা বড়ো বাড়িতে থাকে একদল হাইল্যান্ডাব সেনা। বঙ্কিম যখন গঙ্গার ধার দিয়ে যে-পথে হাঁটছেন, তারই কাছাকাছি ঘাসের উপবে বসে কয়েকজন ইংরাজ সৈনিক, তাদের কুকুরসহ। একটা কুকুর পূর্ণচন্দ্রের পিছু নিলে তিনি ভীত হয়ে পড়েন।

"কুকুরের প্রভু নিকটেই ছিলেন। তিনি দেখিলেন, রহস্য মন্দ নয়। তিনি তাঁহার চতুষ্পদ জীবটিকে আরও উৎসাহিত করিবার মানসে নানাবিধ শব্দ ও চীৎকার করিতে লাগিলেন; কুকুর প্রোৎসাহিত হইয়া পূর্ণবাবুর সমীপস্থ হইল। তিনি উপায় নাই দেখিয়া একটা থামের উপর লাফাইয়া উঠিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে কিছু লক্ষ্য করেন নাই, তিনি সাহেবদিগের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া গঙ্গা পানে চাহিয়াছিলেন। যখন লক্ষ্য করিলেন, তখন পূর্ণবাবু থামের উপর, কুকুর লম্ফোদ্যত। ক্রোধে বঙ্কিমচন্দ্রের বদনমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। তিনি সাহেবদের লক্ষ্য করিয়া সক্রোধে বলিলেন, "Fine sport indeed! Don't you feel ashamed?"

বঙ্কিমচন্দ্র এত তেজের সহিত এমন সুন্দর কথা বলিয়াছিলেন যে,

"সাহেবরা লজ্জিত হইয়া কুকুরকে অবিলম্বে ডাকিয়া লইয়াছিলেন।"

ঐ দিনই এব পরের ঘটনা থিয়েটার দেখে ফেরার সময়। তখনও বঙ্কিম গোরা সৈন্যের উদ্যত বন্দুকেব সামনে এগিয়ে গিয়ে নিজের সত্যভাষণে বাঁচিয়েছিলেন কাঁঠালপাড়ার একদল মানুষকে।

এ দুটি ঘটনা ১৮৫৭-য় ঘটতেও পারে, যদি ধবে নেওয়া যায যে প্রেসিডেন্সিতে ভরতি হওযার অনেক পরেব কোনো সময়ে বঙ্কিম চুঁচুড়ায় গিযেছিলেন থিয়েটার দেখতে। কিন্তু বঙ্কিমের হুগলি কলেজে পড়ার সময় এ-ঘটনা অসম্ভব।

কেন অসম্ভব তা জানাব পক্ষে আমাদের সবচেয়ে বেশি সহাযতা করে যে বইটি, তা 'এ বেঙ্গলি জমিদাব', নীলমণি মুখোপাধ্যায়ের লেখা। আসলে এটি উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়েব জীবনী। ঐ বইটিতে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায বয়েছে, যাব নাম 'দি মিউটিনি'। নীচেব তথ্যগুলো সেখান থেকেই সংগ্রহ করা। এ-সব তথ্যের কিঞ্চিৎ পুনবাবৃত্তি ঘটবে ১৮৫৭-র ঘটনাবলিতেও।

১৮৫৭-র ১৪ জুন ছিল ববিবাব। বিদ্রোহী সিপাইরা আক্রমণ কবতে পারে কলকাতা, এমন সম্ভাবনা তখন এমনই 'প্যানিকি' কবে তুলেছিল কলকাতাব সমস্ত শ্রেণীব মানুষকে যে নিজেদেব বাড়িঘব ছেড়ে ধনী-দবিদ্র নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষ ফোর্ট উইলিয়মে আব গঙ্গাব জাহাজে। কলকাতাব ইতিহাসে এই বিশেষ ববিবাবটিব নাম হয়ে যায 'প্যানিক সানডে'। এই প্যানিক সানডে-ব চাবদিন পরে, ১৮ জুন-এ, উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণর উদ্যোগে স্থানীয় জমিদার তালুকদার আর অন্যান্য অধিবাসীরা সই করল একটি আবেদনপত্রে। আবেদনপত্রটি পাঠানো হল হুগলির ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। আবেদনপত্রেব বিষয, নিরাপত্তাব অভাব আব নিবাপত্তা বক্ষার পক্ষে সুপবামর্শ। বলা বাহুল্য, সে আবেদনপত্রের শুরুতে ইংরেজ সরকারেব সম্পর্কে গভীব কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, বিদ্রোহী সিপাইদেব দমন করার কৃতিত্বে। প্রেসিডেন্সি ডিভিসনেব সৈন্যদেব নিবস্ত্র করার ফলে আবেদনকারীবা যে যথেষ্ট স্বস্তি উপভোগ করছেন তাও জ্ঞাপিত হল আবেদনেব শুরুতে।

তাহলে সমস্যাটা কোথায়? নিরাপত্তাব সম্বন্ধে দুশ্চিন্তাব উৎসটা কোনখানে! এইখানেই আবেদনপত্রটির আসল বক্তব্য। সিপাইরা নিরস্ত্র ঠিকই, কিন্তু তারা তো এখুনি ফিরে যেতে পারছে না তাদের নিজের নিজের এলাকায়। তারা থেমে যাবে এইখানেই। অর্থাৎ বাংলাদেশে। জীবিকার্জনেব কোনো উপায় নেই তাদেব। ফলে তাবা স্থানীয অধিবাসীদের উপর উপদ্রব চালাতে বাধ্য। অনুমান করা যাচ্ছে, অচিরাৎ তাবা হয়ে উঠবে 'a constant source of danger.' পুলিশের যতটুকু বন্দোবস্ত রয়েছে এখন, সম্ভাব্য বিপদ থেকে বাঁচানোর পক্ষে যথেষ্ট নয় তা। বিদ্রোহীদের সংখ্যা তার চেযে বেশি হওযার সম্ভাবনা।

> "The number of disbanded and disarmed soldiers was increasing daily; so were the chances of violence. The Zamindar's retainers, with father, son or brother among the rebels, might desert and join the sepoys when the time came for action. At this juncture it would be unwise to rely on them. All this, said the petitioners, rendered the life and property of the people unsafe."
>
> A Bengal Zamindar/Nilmani Mukherjee

এরপরই আবেদনপত্রের সুপরামর্শ।

> "Having thus stated the problem the petitioners offered two suggestions. First, they requested that a company of European infantry be stationed at Serampore. From that point patrolling parties might be sent to deal with the deserters who

had crossed over to the western side of the river and to prevent further such crossing. Much more interesting was the second suggestion which, in effect, put forward a plan for raising a local militia or police battalian of five hundred men, one each in the districts of Hoogly and Burdwan These battalians were to be recruited from amongst the so-called classes of people known for their physical strength and courage the Aguris, Goalas, Bagdis and Doms These purely Bengali battalians were placed under a European officer taken from respectable ranks. The applicant zaminder promised to find suitable men for enlistment. Proper military organization and discipline were necessary to make this local militia really efficient Such units might have to be maintained for some years even after the suppression of the revolt to keep the anti-social elements in check "

এব পবও আছে দীর্ঘ ইতিহাস, যা এখানে আপাতত অপ্রাসঙ্গিক। জড়ো-কবা এ-সব তথ্য থেকে আমবা এখন নিশ্চয়ই অনুমান কবে নিতে পাবব যে, বঙ্কিমচন্দ্র যখন হুগলি কলেজেব ছাত্র তখন চুঁচুড়ায় গোবা সৈন্যেব টহল আর 'মার্শাল ল' কতখানি অবাস্তব।

প্রেসিডেন্সি কলেজে আইনের ক্লাসে ভবতি হওযাব প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সঞ্জীবচন্দ্রকেও টেনে এনেছিলেন সেখানে। সে ঘটনাব স্বীকৃতি বযেছে 'সঞ্জীবনী সুধা'ব ভূমিকায। বাবা যাদবচন্দ্র তখন সঞ্জীবচন্দ্রকে পাইযে দিযেছিলেন সামান্য কেবানিগিবিব চাকবি, বর্ধমান কমিশনারের আপিসে।

"তিনি যে একটি ক্ষুদ্র কেবানিগিবি কবিতেন, ইহা আমাব অসহ্য হইত। তখন নূতন প্রেসিডেন্সি কলেজ খুলিযাছিল; তাহাব law class তখন নূতন। আমি তাহাতে প্রবিষ্ট হইযাছিলাম। তখন যে কেহ তাহাতে প্রবিষ্ট হইতে পারিত। আমি অগ্রজকে পবামর্শ দিযা, কেবানিগিবি পবিত্যাগ কবাইযা ল ক্লাসে প্রবিষ্ট করাইলাম। আমি শেষ পর্যন্ত বইলাম না; দুই বৎসর পড়িয়া চাকবি কবিতে গেলাম। তিনি শেষ পর্যন্ত বইলেন, কিন্তু পড়াশোনায আর মনোযোগ কবিলেন না। পবীক্ষায় সুফল বিধাতা তাঁহাব অদৃষ্টে লেখেন নাই।"

২৮ জুলাই

'সংবাদ প্রভাকব'-এ বেবলো বঙ্কিমেব 'ললিতা ও মানস'-এব সমালোচনা, ঈশ্বব গুপ্তেব কলমে—

"হুগলি কালেজেব সুপাত্র ছাত্র শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায বঙ্গভাষায যেরূপ সুলেখক ও সুকবি তাহা প্রভাকব পাঠক মহাশয়দিগেব মধ্যে অনেকেই বিশিষ্টরূপে জ্ঞাত আছেন। তাঁহাব লিখিত অনেক কবিতা এতৎপত্রে প্রকাশ পাইয়াছে, বিশেষতঃ হিন্দু কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ এবং হুগলি কলেজের ছাত্রদিগেব কবিতা বিষযক সংগ্রাম সমযে তিনি একজন মহাবলী সেনাপতি ছিলেন, সম্প্রতি বঙ্কিমবাবু 'ললিতা ও মানস' নামে একখানা পুস্তক রচনাপূর্বক মুদ্রাঙ্কন করিয়া আমাদিগের নিকট পাঠাইযাছেন আমরা তাহা পাঠ করতঃ পবম পুলকিত হইলাম, যেহেতু এই ক্ষুদ্র পুস্তকে বিলক্ষণ কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইয়াছে, লেখক মহাশয় স্থানে স্থানে যে সমস্ত সদ্ভাব করিয়াছেন তাহাও উত্তম হইয়াছে, আমরা পাঠক মহাশয়দিগের পাঠার্থ ঐ পুস্তক হইতে এক স্থানেব লেখা নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিলাম।..."

এই আলোচনায় বঙ্কিমের কবিতার চেয়ে বেশি উজ্জ্বলতা পেয়ে যায় যা, তা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের উদার আর অকৃপণ সেই বাৎসল্যবোধ, কবিমাত্রের উপরেই যাব স্নেহ-বিহ্বল বিকীরণ।

১৮৫৬

বছরের প্রধান ঘটনাবলী

বিধবা বিবাহ আর বহু বিবাহ। একটার পক্ষে, আরেকটার বিপক্ষে বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে যে আন্দোলন, এ বছরটা যেন তারই ঝড়-ঝাপটায় কম্পমান। বিদ্যাসাগরের পক্ষে প্রবল জনমত। কিন্তু বিরোধীপক্ষকেও বলা যাবে না দুর্বল। বাংলাদেশ, এমন-কি তাকে ছাড়িয়েও ভারতবর্ষের নানা প্রান্ত থেকে ভারত সরকারের কাছে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসছে আবেদন পত্র, পক্ষে এবং বিপক্ষে। যদিও শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়ে উঠবে প্রগতিপন্থীরাই অর্থাৎ যাঁরা বিদ্যাসাগরপন্থী।

বিধবাবিবাহের পক্ষে এ বছরে সরকারি দপ্তরে জমা পড়া বিভিন্ন আবেদন পত্রের তালিকা।

১। কৈলাসচন্দ্র দত্ত প্রমুখদের আবেদন। ১. ১২. ১৮৫৬।
২। শান্তিপুরের ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষালের আবেদন। ৯.২. ১৮৫৬।
৩। কৃষ্ণনগরের রাজা আর শান্তিপুরের জমিদার তালুকদারদের আবেদন।
৪। ধুলিয়ানের অধিবাসীদের আবেদন। ১২.২.১৮৫৬
৫। চট্টগ্রামের অধিবাসীদের আবেদন। ১৫.২. ১৮৫৬
৬। মুর্শিদাবাদ অধিবাসীদের আবেদন। ২১. ২. ১৮৫৬
৭। রাজনারায়ণ বসু ও মেদিনীপুরের অন্যান্য অধিবাসীদের আবেদন। ২৯.৩.১৮৫৬
৮। হুগলির অধিবাসীদের আবেদন। ৮. ৪. ১৮৫৬
৯। বাঁকুড়া ও বর্ধমানের অধিবাসীদের আবেদন। ১৫. ৪. ১৮৫৬
১০। বারাসতের অধিবাসীদের আবেদন।
১১। রংপুরের অধিবাসীদের আবেদন।
১২। বোলপুরের অধিবাসীদের আবেদন।
১৩। ঢাকা অধিবাসীদের আবেদন। ২৪. ৭. ১৮৫৬

১৪। ভিন্টরের মারাঠা প্রধান ও অন্যান্যদের আবেদন। ১২. ১. ১৮৫৬
১৫। সেকেন্দ্রাবাদ অধিবাসীদের আবেদন।
১৬। রত্নগিরির অধিবাসীদের আবেদন।
১৭। ভারতবর্ষের দেশীয় কিছু প্রজার আবেদন।
১৮। আহমদ নগরের অধিবাসীদের আবেদন।

বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধতায়

১। রংপুরবাসীদের আবেদন
২। রাধাকান্ত দেব-এর প্রথম স্বাক্ষর নিয়ে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজেব পক্ষ থেকে ৮৪ জনের আবেদন।
৩। বাংলার ১৫৭৪ জন অধিবাসীর আবেদন।
৪। মুর্শিদাবাদের ২১০ জন অধিবাসীর আবেদন।
৫। ময়মনসিংহের অধিবাসীদের আবেদন।
৬। কলকাতা আব তার কাছাকাছি অঞ্চলের ৭৮৪ জন পশ্চিমা অধিবাসীর আবেদন।
৭। বাংলার অধিবাসীদের আবেদন।
৮। চট্টগ্রামের ৩৩৭ জন অধিবাসীর আবেদন।
৯। ঢাকা থেকে দুটি আবেদন।
১০। পাবনা থেকে ১২২৮ জন অধিবাসীর আবেদন।
১১। বাংলার অধিবাসীদের আবেদন!
১২। সিলেক্ট কমিটিতে সংশোধিত বিলের বিরুদ্ধতা কবে কলকাতা আর নিম্নবঙ্গেব ৬১৭ জন-এর আবেদন। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন রাধাকান্ত দেব, কালীকৃষ্ণ দেব, অপূর্বকৃষ্ণ দেব, কমলকৃষ্ণ দেবেবা।
১৩। ত্রিপুরা থেকে ৩২০ জন-এব আবেদন।
১৪। পুনার অধিবাসীদেব আবেদন।
১৫। পুনার ব্রাহ্মণদের আবেদন। ১৫. ৪. ১৮৫৬
১৬। ধাওযারের অধিবাসীদেব আবেদন।
১৭। সাতারার অধিবাসীদের আবেদন।
১৮। বোম্বাইয়ের কসবা-ফুলিয়নের অধিবাসীদের আবেদন।
১৯। আমেদাবাদের অধিবাসীদেব পক্ষ থেকে দুটি আবেদন।
২০। বোম্বাইয়ের থানা অধিবাসীদের আবেদন। ১৭. ৭. ১৮৫৬
২১। সুরাটের অধিবাসীদের আবেদন। ২৫. ৭. ৫৬

বিক্রমপুরের পশ্চিমপাড়ায় 'দি টেরর অব পাঞ্জাব' নামে খ্যাত নির্ভীক সাংবাদিক শীতলকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম, বাবা, কাশীকান্ত। ছিলেন ঢাকার 'ইষ্ট' আর লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সাংবাদিক। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে সম্মান জানিয়েছেন প্রথম শ্রেণীর সাংবাদিক হিসেবে, তাঁর নির্ভীকতা, বিষয়বস্তুর গভীরে প্রবেশ করার ক্ষমতা, চূড়ান্ত সততা আর স্বদেশপ্রেমের জন্যে।

বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ থেকে বেরলো রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন-র 'পাল বর্জিনিয়া ইতিহাস'। এই বছরে বেরবে আরও একটা বই 'গোপাল কামিনী'।

ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল হলেন আর্ল ক্যানিং।

ববিশালে প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী অশ্বিনীকুমার দত্তেব জন্ম। বরিশালে ব্রজমোহন কলেজ আর ইনস্টিটিউট গড়া আর যাত্রাব গাযক মুকুন্দ দাসকে স্বদেশী যাত্রায় উদবুদ্ধ করা তাঁর নানান উদ্যোগের মধ্যে প্রধান কয়েকটি।

ঢাকা থেকে বেরলো পূর্ববঙ্গের প্রথম ইংবেজি সংবাদপত্র 'ঢাকা নিউজ'। মালিক ইংরেজ নীলকর আর জমিদারেরা। সেই কাবণেই একে অনেক সময়ে বলা হয়েছে 'প্ল্যান্টার্স জার্নাল'।

প্রধানত ইংরেজি শেখানোর উদ্দেশ্যেই শিবনাথ শাস্ত্রীকে কলকাতায় নিয়ে এলেন বাবা হরানন্দ। বিদ্যাসাগর তখন সংস্কৃত কলেজেব অধ্যক্ষ। হবানন্দ তাঁর স্নেহভাজন। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, মামা। তিনি সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যবিভাগেব অধ্যাপক। এই বছরের মাঝামাঝি শিবনাথ শাস্ত্রী ভর্তি হযে গেলেন ঐ কলেজে।

বেবলো অক্ষযকুমাব দত্ত-র 'ধর্মনীতি'। এই বছরেই তাঁব অন্য বই 'পদার্থবিদ্যা'। 'পদার্থবিদ্যা' লিখতে গিযে বৈজ্ঞানিক পবিভাষাব অভাবের দিকে তাঁর সচেতনতা। রাজনারায়ণ বসু লিখছেন :

> "পদার্থবিদ্যা সমাপ্ত হইলে আপনার অভিপ্রায়ানুসারে যন্ত্র বিষয়ক একখানি গ্রন্থ লিখিবার মানস থাকিল। কিন্তু ভাই, একে নূতন ভাষাব শব্দ সঙ্কলন কবিয়া লিখিতে হয়, তাহাতে, বিদ্যাসাধ্য যত তাহা আপনাব জানা অবিদিত নাই, যেরূপ বলবীর্য বিহীন প্রকৃতি, তাহাতে এ সকল বিষযে কোন মতেই সাহস করা যায় না।"

বেরলো দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 'নীতিসাব'-এর প্রথম ও দ্বিতীয ভাগ।

বেরলো বামনাবায়ণ তর্করত্নের 'বেণীসংহাব' নাটক। 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' সমালোচনা—

> "কবি না হইলে কাব্যেব অনুবাদ করা অতিশয় দুরূহ। কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাট্যকাবের সে গুণের অভাব নাই; তিনি সর্ব্বত্র কাব্যরস রক্ষা কবিয়া অভিনযোপযুক্ত চলিত ভাষায় পবিপাটীরূপে বেণীসংহাব অনুবাদিত কবিয়াছেন।"

বিদ্যাসাগবেব নেতৃত্বে শুরু হল বহুবিবাহ বিবোধী আন্দোলন। কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে জনমত তৈরির সূচনা বামমোহন থেকে। পরে ইযং বেঙ্গল গোষ্ঠীও তাঁদের পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জানাতে থাকে বিরুদ্ধ মতামত। একাধিক প্রবন্ধ বেরোয় 'জ্ঞানান্বেষণ' আব 'এনকোয়ারাব'-এ। সমালোচনা বেরতে থাকে অক্ষযকুমাব দত্তের 'বিদ্যাদর্শন' ছাড়াও বাংলা ইংরেজি নানা সংবাদপত্রেও। বেথুন সোসাইটিতে কৌলীন্য প্রথার সমালোচনা করে প্রবন্ধ পাঠ করলেন হবচন্দ্র দত্ত। গত বছবের গোড়ায় কিশোরীচাঁদ এগিয়ে এলেন সমস্ত বিবোধীকে নিযে একটা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের চেহাবা দিতে। 'বন্ধুবর্গ সমবায' সভার পক্ষ থেকে এর পবই আইন কবে বহুবিবাহ বন্ধের জন্যে এক আবেদনপত্র পাঠানো হল ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভাব কাছে। গত বছবের শেষ দিকে বিদ্যাসাগর নিজে একটি আবেদন পাঠিয়েছিলেন ভারতসবকারের কাছে, বহু বিবাহ প্রথা উঠিযে দেওয়ার জন্যে আইন বানানোর অনুরোধ জানিয়ে।

এই বছবে জানুয়ারি থেকে জুলাই-এর মধ্যে বাংলাদেশের নানা অঞ্চল থেকে জমা পড়ে আর ও যে-সব আবেদনপত্র, সেখানে সব মিলিয়ে স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা প্রায় ২৫ হাজারের মতো। আর সে-সব আবেদনের স্বাক্ষরকারীরা সমাজের সর্বস্তরের। বর্ধমান, নদীয়া নাটোরের বাজা-মহারাজাদের সঙ্গে কলকাতা হুগলি, মেদিনীপুর, যশোহর, রাজশাহী, কাশিমবাজার, বরানগরের সাধারণ নাগরিকেরাও মিলে মিশে একাকার। অবশ্য রক্ষণশীল হিন্দুদের পক্ষে থেকেও অব্যাহত ছিল পাল্টা আন্দোলন।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র এশিয়াটিক সোসাইটির জন্যে তৈরি করলেন বই আর মানচিত্রের তালিকা। সেইসঙ্গে সোসাইটির পত্রিকার প্রথম থেকে চোদ্দ খণ্ডের নির্ঘণ্ট। বছরের শুরুতে কলকাতায় গড়ে উঠল 'ফোটোগ্রাফিক সোসাইটি'। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ঐ সভার সদস্য ও কোষাধ্যক্ষ। কবি তরু দত্তের জন্ম কলকাতার রামবাগানের বিখ্যাত দত্ত পরিবারে। বাবা, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত।

বরিশাল গভর্নমেন্ট স্কুলে ভর্তি হলেন চণ্ডীচরণ সেন।

সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড়ো মেয়ে সৌদামিনী দেবীর বিয়ে।

জানুয়ারি

নদীয়া, বর্ধমান, হুগলি আর মেদিনীপুর এই চারটে জেলায় পাঁচটা করে স্কুল গড়ে দিলেন বিদ্যাসাগর।

এই মাসের শেষ দিকে 'বেন্টিঙ্ক' জাহাজে চেপে মাদ্রাজ থেকে কলকাতার দিকে পা বাড়াবেন মধুসূদন।

৯ জানুয়ারি

প্রস্তাবিত বিধবা-বিবাহ আইনেব দ্বিতীয় বার বিবেচনা বা পাঠ।

১৪ জানুয়ারি

বিদ্যাসাগর মেদিনীপুরে গড়লেন একটা মডেল স্কুল।

১৯ জানুয়ারি

বিধবা বিবাহ আইনের খসড়া পাণ্ডুলিপি সিলেক্ট কমিটির কাছে পেশ। কমিটিতে ছিলেন জেমস কলভিল, এলিয়ট, পি. ডাবলিউ. লিগেট আর জে. পি. গ্রান্ট।

ফেব্রুয়ারি

বেরলো বিদ্যাসাগরের 'কথামালা'।

১ ফেব্রুয়ারি

৪৪ জনের স্বাক্ষরসহ সরকারের কাছে একটি আবেদন পত্র পাঠালেন কৈলাসচন্দ্র দত্ত। সেখানে অনুরোধ, প্রস্তাবিত বিধবাবিবাহ আইনে যোগ করা হোক এই নতুন ধারা যে, কোনো বিধবাবিবাহ-ই আইনসংগত হিসেবে গণ্য হবে না যদি না তা রেজিস্ট্রি করা হয় কোনো সরকারি কর্মচারীর সামনে।

২ ফেব্রুয়ারি

সকালে কলকাতায় পৌঁছলেন মধুসূদন। উঠলেন বিশপ কলেজে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে। খবর পেয়ে গৌরদাস চলে এলেন সেখানে। বন্ধুরা মিলে ভাবতে লাগলেন কী করে কলকাতায় স্থায়ীভাবে রাখা যায় তাঁকে। প্রস্তাব এল, কিশোরীচাঁদ মিত্রের অধীনে কলকাতা পুলিশ আদালতে হেড ক্লার্কের চাকরির। মধুসূদন না বললেন না।

৭ ফেব্রুয়ারি
৩৭৫ জনের স্বাক্ষরসহ ইয়ং বেঙ্গল-এর পক্ষ থেকে সরকারের কাছে পাঠানো হল বিধবাবিবাহ আইনের জন্যে একটি সংশোধন পত্র। সেখানে ছিল দুটি অঙ্গীকার পত্রের নমুনা। Declaration Aআর B বিধবাবিবাহ পদ্ধতির মধ্যে যদি নিয়ম-শৃঙ্খলা না থাকে তাহলে পরে আদালতও করে উঠতে পারবে না এর ন্যায়সংগত বিচার। বিয়ের ছমাস-এর মধ্যে রেজিস্ট্রি করাতে হবে ঐ অঙ্গীকারপত্র। এবং দু পক্ষকেই মেনে চলতে হবে ঐ চুক্তি।

১২ ফেব্রুয়ারি
রাজেন্দ্রলাল মিত্র ছেড়ে দিলেন এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারিক-এর অবৈতনিক পদ।

১৩ ফেব্রুয়ারি
বিধবা বিবাহ আইন যাতে পাস না হয় তার জন্যে প্রথম প্রতিবাদ এল ১ হাজার জনের স্বাক্ষর নিয়ে। স্বাক্ষরদাতাদের মধ্যে ছিলেন নদীয়া, ত্রিবেণী, ভাটপাড়া, বাঁশবেড়িয়া আর কলকাতার স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক আর অধিবাসীরা।

১৫ ফেব্রুয়ারি
বিধবা বিবাহের পক্ষে আবেদন পত্র পাঠালেন চট্টগ্রামের হিন্দু বাসিন্দারা।

২১ ফেব্রুয়ারি
বিধবাবিবাহের পক্ষে আবেদন পেশ করলেন মুর্শিদাবাদের সার্কেল-পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রমুখেরা।

মার্চ
৩৫ বছর বয়সে উদয়চরণ আঢ্যের মৃত্যু।
চিৎপুরে রাজা নরসিংহের বাগানে সরকারি উদ্যোগে গড়া হল 'ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন', অপ্রাপ্তবয়স্ক জমিদারের ছেলেদের শিক্ষাদানের জন্যে। অধ্যক্ষ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ-এর স্মৃতিচারণায়—

> "সেই আলালের ঘরের দুলালদিগকে মানুষ করিয়া তোলা কিরূপ কষ্টসাধ্য তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সেজন্য রাজেন্দ্রলালকে কঠোর ব্যবস্থা করিতে হইত। প্রত্যেক ছাত্রকে সন্তরণ শিক্ষা করিতে হইত। কেহ যদি তাহাতে অসম্মত হইত, তবে তাহাকে বেত্রাঘাত সহ্য করিতে হইত। আমরা সেই সময়ের কোন জমিদারকে বলিতে শুনিয়াছি– 'আমার পিঠে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বেতের দাগ আছে'। শীতকালে কোন ছাত্র শয্যাত্যাগ করিয়া আসিতে বিলম্ব করিলে, রাজেন্দ্রলালের আদেশে ভৃত্যরা তাহাকে ধরিয়া আনিয়া পুষ্করিণীতে ফেলিত। ছাত্ররা কিন্তু বড় হইয়া তাঁহার নিকট সু-শিক্ষার ঋণ স্বীকার করিতেন। তিনিও তাহাদিগকে পিতার ন্যায় স্নেহ করিতেন— তিনি যে কঠোরতা অবলম্বন করিতেন, তাহা তাহাদিগের কল্যাণের জন্য।"

৬ মার্চ
এসিয়াটিক সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত হলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

১৫ মার্চ

'সংবাদ প্রভাকর'-এ 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'-র বিজ্ঞাপন—

"অদ্য শনিবার সন্ধ্যার সময় বিদ্যোৎসাহিনী সভার প্রকাশ্য সভা হইবেক, দর্শক ও সভ্যগণ সভাস্থ হইয়া বাধিত করিবেন। সম্পাদক মহাশয় তাঁহার সম্পাদকীয় আসনে এইবার শেষ উপবেশন করিয়া বঙ্গদেশের কুরীতি বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।

শ্রীউমাচরণ নন্দী কর্ম্মাধ্যক্ষ।"

খিদিরপুরে হেমচন্দ্রের ছোটো ভাই ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম।

১৭ মার্চ

প্রায় ৩৭ হাজার লোকের স্বাক্ষরসহ বিধবা বিবাহ আইনের বিরুদ্ধে রাধাকান্ত দেবের আবেদন।

এপ্রিল

সংস্কৃতে পারদর্শিতা দেখিয়ে সংস্কৃত কলেজ থেকে এক বছরের জন্যে ১৬ টাকা মাসিক বৃত্তি পেলেন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য।

নিজের বাড়িতেই এই মাসে কালীপ্রসন্ন সিংহ গড়লেন 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ'।

১১ এপ্রিল

বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'বেণীসংহার' নাটকের অভিনয়। কালীপ্রসন্ন নিজেও এ-নাটকে অভিনয় করে খ্যাতি পেলেন খুব। তাতেই নাটক লেখায় উৎসাহ।

১৫ এপ্রিল

'সংবাদ প্রভাকর'-এ 'বেণীসংহার' অভিনয়ের খবর—

"যুগল সেতু নিবাসী সিংহবাবু দিগের ভবনে শনিবার (১১ এপ্রিল) সন্ধ্যার পর মহাসমারোহে নাট্য ক্রীড়া হইয়াছিল, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যার আরথর বুলার সাহেব, ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারি মেং সিসিল বিডন সাহেব প্রভৃতি ৫।৭ প্রধান ইংরেজ এবং নগরীর অনেক আঢ্য মহাশয়েরা ঐ নাট্য ক্রীড়া দর্শনে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই নাট্য কৌতুক দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং বাবুরা সাহেবদিগেকে পানভোজনে পরিতোষ করিয়াছেন।"

৩১ মে সিলেক্ট কমিটি সমর্থন জানাল বিধবা বিবাহ আইনকে।

জুন

চালু হল কোন্নগর রেল-স্টেশন, শিবচন্দ্র দেব-এর যুক্তি আর দক্ষতার জোরে।

"পঞ্চাননতলা স্ট্রিট দিয়েই তখন কোন্নগর স্টেশনে যাতায়াত চলত। মধ্যে পড়ত বাগখালের উপর একটা কাঠের পোল। এই রাস্তার অবস্থা তখন মোটেই ভাল ছিল না। রাস্তার দুধারে ছিল বন জঙ্গল। আর আম কাঁঠাল ও বাঁশ বাগান। বর্ষাকালে এক হাঁটু কাদা ভেঙে চলতে হত। কোনো রকম আলোর ব্যবস্থা তো ছিলই না তার ওপর অপদেবতার ভয়...।

এই পথেই পড়ত কালাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়দিগের বাড়ী, তারপর আর কোন লোক বসতি

ছিল না। তাঁদের বাড়ি পর্যন্ত এসে পৌঁছতে পারলে লোকে তখন কিছুটা আশ্বস্ত ও নিরাপদ জ্ঞান করত। সে যুগে এই বাড়ীটার নাম হয়ে গিয়েছিল তাই 'হোপ হাউস'। তামাক খাওয়া চলত এই বাড়ি পর্যন্ত, হুঁকো কলকে নিয়ে রেলে ভ্রমণ তখন নিষিদ্ধ।... কবে কোথায় একবার গাড়ীর ক্যাম্বিসের ছাদ আগুনে পুড়ে গিয়েছিল তারই ফলে এই নিষেধাজ্ঞা। ইংরেজরা কিন্তু আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ট্রেনে যাতায়াত করতে পারতেন এবং গাড়ীর মধ্যেই কখন কখন ডুয়েল লড়তেন। এই বৈষম্যমূলক বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে তাই ২০ জুন ১৮৫৭ 'সংবাদ ভাস্কর' পত্রিকায় নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল:
"রেল রোড কোম্পানীরা আরোহীগণকে হুঁকা সহিত গাড়ী আরোহণ করিতে দেন না কিন্তু সাহেবরা গুলীপোরা পিস্তল সহিত বাষ্পীয় শকটে উঠিতে পারেন ইহা কি আশ্চর্য নয়।"
যাই হোক, গতিবেগ এবং সময়ানুবর্তিতা এই দুটো ছিল সে যুগে রেলপথের আকর্ষণীয় বস্তু। গঙ্গার জোয়ার ভাঁটার জন্যে সরকারী বা সদাগরী অফিসে পৌঁছতে প্রায়ই বিলম্ব হয়ে যেত। রাজা দিগম্বর মিত্রের জীবনীতে এই কথারই উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়—

"It is now twenty minutes journey from Konnagar to Calcutta by rail. But for years people had to come from there and return to it daily in swift sailing 'Pansways', that took away much of their time, interfered with their punctual attendance at office, exposed them to 'Nor-westers' and obliged them on mornings of adverse tide to be content with cold rice cooked overnights".

বলা বাহুল্য, ট্রেনের সময় তালিকা অনুযায়ী গাড়ী ধরার জন্যেই তখন থেকে লোকে ঘড়ির ব্যবহারের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হতে থাকেন। পোষ্ট কার্ড সাইজের প্রথম টাইম টেবিল এক পয়সা মূল্যে বিক্রী হত।"

তিন শতকের রিষড়া ও তৎকালীন সমাজচিত্র/
কৃষ্ণগোপাল পাকড়াশী

এখান থেকেই পাওয়া যায় আরও কিছু প্রায়-অজানা খবর। তখন শ্রেণী অনুযায়ী গাড়ির কামরার রঙ হত সাদা, লাল ইত্যাদি। তৃতীয় শ্রেণীর মাথায় থাকত না ছাদ, থাকত না বসবার জায়গা। খোলা আর বেঞ্চহীন কামরায় ছাতা দিয়ে যাত্রীরা মাথা বাঁচাতো রোদ বৃষ্টি থেকে। অবশ্য এই অব্যবস্থার পরামায়ু ছিল মোটে এক বছর। পরের বছর থেকেই কামরার মাথায় ছাদ আর বসবার জন্যে বেঞ্চ। গাড়ির কামরার রঙের ভেদাভেদ ঘুচল বঙ্গভঙ্গ-পরবর্তী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সময়। শাদা চামড়ার সাহেবরা যাতায়াত করতেন প্রথম অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীতে। এই দুটো কামরার উপর ইট পাটকেল ছোঁড়া হত কলকাতার কাছাকাছি জায়গা থেকে। কর্তৃপক্ষ ভাবলে সব কটা কামরার রং এক করে দিলে বিপ্লবীরা আর শ্রেণী পার্থক্য ধরতে পারবে না ফলে তাদের লক্ষ্য হবে ভ্রষ্ট। এর পরই এক রঙে একাকার হয়ে গেল সব কামরা।

৪ জুন
'সংবাদ প্রভাকর'-এ 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'-র বিজ্ঞাপন—

"জগতে সুখী কে ? এই বিষয়ক প্রবন্ধ যে লিখিতে ইচ্ছা করেন উত্তম হইলে বিচার মতে ২২ আষাঢ়ের মধ্যে বিদ্যোৎসাহিনী সভা তাঁহাকে ২০০ শত টাকা পুরস্কার প্রদান করিবেন, ৮ পেজি ফরমার ১ ফরমার ন্যূন হইলে যোগ্য নহে।"

২২ জুন
হুগলি নর্ম্যাল স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগ দিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়। বাংলার মফঃস্বলের স্কুলের জন্য যোগ্য শিক্ষক গড়ে তোলার জন্যেই নর্ম্যাল স্কুল। ভূদেবকে পরীক্ষা দিতে হয়েছিল এই পদের জন্যে। প্রতিযোগী ছিলেন আরো দুজন। রাজনারায়ণ বসু আর মাদ্রাজ-প্রত্যাগত মধুসূদন দত্ত। প্রথম হয়েছিলেন ভূদেবই। চুঁচড়া শহরের পশ্চিমে গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের ধারের এক বাড়িতে শুরু হয় এই স্কুলের কাজ।

জুলাই
বেরলো কালীপ্রসন্ন সিংহের মাসিক পত্রিকা 'সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা'। আর বিদ্যাসাগর-রচিত 'চরিতাবলী'।

৪ জুলাই
বেরলো 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকা, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রেরণায়, 'ভাস্কর' পত্রিকা সরকারের ভালো কাজেরও সমালোচনা করলে ভূদেব শিক্ষা বিভাগের দক্ষিণ ভাগের ইনসপেক্টর হজসন প্রাটকে বুঝিয়েছেন সরকারের উদ্দেশ্য-অভিপ্রায় সাধারণ মানুষকে সহজ ভাষায় বুঝিয়ে বলার মতো কাগজের প্রয়োজনীয়তা। প্রাট সম্মত হয়ে চেয়েছিলেন ভূদেবই হোক পত্রিকার সম্পাদক, কিন্তু সরকার চায়নি দেশীয় কারো হাতে এতবড়ো দায়িত্ব ছেড়ে দিতে। তাই সম্পাদক হলেন বেভারেণ্ড ও'ব্রায়ান স্মিথ। সহকারী, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

২০ জুলাই
কিশোরীচাঁদ মিত্র তাঁর রোজ নামচায় লিখলেন—

> Mr. M. S. Dutt gave me the following song—
> When I was young and gay recruit
> Just landed at Madaras
> I thought to lead a sober life
> With a superfine black shining lass.

পুলিশ কোর্টে চাকরি পাওয়ার পর কিশোরীচাঁদের ১নং দমদম রোডের বাগানবাড়িতে কিছুদিন থেকেছিলেন মধুসূদন। তখন নানাবিষয়ে আলোচনা হত দুজনেব। কখনো জমে উঠল আরো নানা জনের উপস্থিতিতে সাহিত্যালোচনার মজলিস। এখানেই বাংলা ভাষা নিয়ে প্যারীচাঁদ মিত্রের সঙ্গে বেধে গিয়েছিল তুমুল বিতর্ক একদিন।

২৬ জুলাই
বিধবা বিবাহ আইন পাস হয়ে গেল ভারত সরকারের ব্যবস্থাপক সভায়। আইনটি ছিল "Act XV of 1956, being an act to remove all legal obstacles to the Marriage of Hindu Widows."
এই উপলক্ষে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রশ্নচিহ্নময় কবিতা—

> "শ্রীমান ধীমান, নীতি নির্মাণকারক।
> যাঁরা সবে হতে চান বিধবাতারক।।

নত ভাবে নিবেদন, প্রতি জনে জনে।
আইন বৃক্ষের ফল ফলিবে কেমনে?
গোলেমালে হরিবোল, গণ্ডগোল সার!
নাহি হয় ফলোদয়, মিছে হাহাকার।।
বাক্যের অভাব নাই, বদনভাণ্ডারে।
যত আসে তত বলে, কে দূষিবে কারে ?
সাহস কোথায় বল, প্রতিজ্ঞা কোথায় ?
কিছুই না হতে পারে মুখের কথায়।।
মিছামিছি অনুষ্ঠানে, মিছে কাল হরা।
মুখে বলা বলা নয় কাজে করা করা।।
সকলেই তুড়ি মারে, বুঝে নাকো কেউ।
সীমা ছেড়ে নাহি খ্যালে সাগরের ঢেউ।।
সাগর যদ্যপি করে সীমার লঙ্ঘন।
তবে বুঝি হতে পারে, বিবাহ ঘটন।।
নচেৎ দেখিনা কোন, সম্ভাবনা আর।
অকারণে হই হই, উপহাস সার।।
কেহ কিছু নাহি করে, আপনার ঘরে।
যাবে যাবে যায় শত্রু, যাক্ পরে পরে।।
তখন এরূপ কবে, হলে ব্যতিক্রম।
ফাটায় পড়েছে কলা, গোবিন্দায় নম।।

আগস্ট

লালবিহারী দে-র সম্পাদনায় বেরলো ‘অরুণোদয়’ পাক্ষিক পত্রিকা।

উদ্দেশ্য—

> “এতৎ নূতন পত্রিকা কেবল সাংসারিক ও বৈষয়িক সংবাদ এবং বিজ্ঞানবার্ত্তাদিতে পূরিত না হইয়া সত্যধর্ম অর্থাৎ খৃষ্টীয়ান ধর্ম-সূচক উপদেশ ও নানাবিধ পরমার্থঘটিত প্রবন্ধ অলঙ্কৃত হইবে।”

৬ আগস্ট

সংবাদ প্রভাকর-এ কালীপ্রসন্ন সিংহের ‘সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশিকা’-র সংবাদ—

“সর্ব্ব তত্ত্ব প্রকাশিকা অর্থাৎ প্রাণিবিদ্যা, ভূতত্ত্ব বিদ্যা, ভূগোল বিদ্যা ও শিল্প সাহিত্যাদি দ্যোতক মাসিক পত্রিকা, ইত্যভিধেয় একখানি নূতন পত্রিকা প্রকাশক বা প্রকাশকগণ যে যে বিষয় লিখিয়াছেন তাহার প্রায় সমুদায়াংশকেই উত্তম বলিতে হইবেক, যেহেতু তাহাতে সুসাধু সরল বঙ্গ ভাষায় অতি পরিষ্কাররূপে অভিপ্রায় সকল ব্যক্ত হওয়াতে ঐ পত্রিকা সর্ব্বসাধারণের পাঠোপযোগী হইয়াছে, বিশেষতঃ ‘কুতর্ক-দমন’ নামক প্রথম প্রস্তাব সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে।...”

২৮ আগস্ট

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবীর জন্ম।

সেপ্টেম্বর
সংস্কৃত কলেজের ৭ম শ্রেণীর প্রতিনিধি-অধ্যাপকের চাকরি পেলেন নন্দকুমাব ন্যায়চঞ্চু। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে পড়তেই শিক্ষকতার চাকরির পরীক্ষা দিলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৫ সেপ্টেম্বর
নিজের সম্পাদিত 'অরুণোদয়'-এ Folk Tales of Bengal লিখতে শুরু করলেন লালবিহারী দে।

> "প্রায় প্রত্যেক রজনীযোগে বঙ্গরাজ্যে উত্তমাধম পরিবার মাত্রেই প্রায় উপকথা ব্যবহার করিয়া থাকেন। আর বালক-বালিকাকুল উপকথা শ্রবণ মানসে আপনাদিগকে অতি উৎসুক দেখায়, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অনেক উপকথা নীতিগর্ভ নহে। যাহা হউক বঙ্গে যে সকল নীতিজনক উপকথা ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে কতকগুলিন উপকথা সর্বসাধারণগোচর জন্য এই পত্রে ক্রমশ প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম।"

১৮ সেপ্টেম্বর
'সংবাদ ভাস্বর'-এর সংবাদে জানা গেল বেরিয়েছে গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নর লেখা ছোট্ট একটা নাটকের বই 'বিধবা বিষম বিপদ'।

২৪ সেপ্টেম্বর
'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'-র বিজ্ঞাপন 'সংবাদ প্রভাকর'-এ—
"আগামী শনিবার সন্ধ্যার পরে যুগলসেতু বিদ্যোৎসাহিনী সভায় শ্রীযুত কার্কপেট্রিক সাহেব 'Sentiment Proper to the Age and Country' অর্থাৎ দেশকাল বিষয়োপযোগী অভিপ্রায় বিষয়ে লেকচার অর্থাৎ উপদেশ করিবেন, অতএব উক্ত সময়ে সভ্য ও বিদ্যোৎসাহী দর্শক মহাশয়েরা উপস্থিত হইয়া বাধিত করিবেন। শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

৪ নভেম্বর
'সংবাদ প্রভাকর'-এ 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'-র বিজ্ঞাপন—

> "হিন্দু ধর্মের উৎকৃষ্টতা' বিষয়ক প্রবন্ধ নানাপ্রকার প্রমাণাদির সহিত লিখিতে হইবে, যিনি লেখকগণের মধ্যে বিচারে উত্তম হইবেন তাঁহাকে বিদ্যোৎসাহিনী সভা তিনশত মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিবেন ২ মাঘ সাম্বৎসরিক সভায় প্রেরণ করিতে হইবেক। ক্ষেত্রমোহন বসু, বিদ্যোৎসাহিনী সভা-সম্পাদক"।

১৫ নভেম্বর
প্রখ্যাত চিকিৎসক আর এদেশে প্রথম শব-ব্যবচ্ছেদকারী হিসেবে স্মরণীয় মধুসূদন গুপ্তর মৃত্যু।

২২ নভেম্বর
'সম্বাদ ভাস্করে' প্রয়াত মধুসূদন গুপ্ত সম্পর্কে মন্তব্য—

> "উক্ত গুপ্তবাবুর মৃত্যু হইয়াছে ইহাতে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম, মধুসূদনবাবু এতদ্দেশীয় ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা ব্যবসায়ীগণের আদিপুরুষ ছিলেন, এতদ্দেশীয়েরা বিশেষত

হিন্দু জাতিরা মৃতদেহ স্পর্শ করিবেন দূরে থাকুক পিতামাতাদি আত্মীয় লোকের মৃত্যু হইলে যে স্থানে শব রাখে গোময়? সেস্থান পর্যন্ত ধৌত করেন, শব লইয়া গেলে বহির্দ্বার পর্য্যন্ত গোময় জলের ছিটা দেন, মৃতদেহের বিষয়ে অদ্যাপিও যে জাতির ঘৃণা ও পাপবোধ রহিয়াছে মধুসূদনবাবু সেই জাতির মধ্যে এক উত্তম কুলে জন্মিয়াছিলেন তথাচ মেডিক্যাল কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া হিন্দু জাতির মধ্যে সর্ব্বাগ্রে মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ কার্য্যে প্রবর্ত্ত হন, তাঁহার দৃষ্টান্তে অন্যান্য হিন্দুরা মৃতদেহ কাটাকুটি কার্যে সুপটু হইয়াছেন। ঐ বাবুই তাঁহাদিগকে শিক্ষাদান করিয়াছেন, মধুসূদন গুপ্ত স্বজাতীয় বৈদ্যক বিদ্যায় এবং ইংরেজী চিকিৎসা বিদ্যায় সুপ্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাতে দেশের বিস্তর উপকার করিয়াছেন তাঁহার মৃত্যু সমাচারে ইংরেজ বাঙ্গালী সাধারণ বহু লোক আক্ষেপ করিবেন।"

৭ ডিসেম্বর

বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে কলকাতায় প্রথম বিধবা বিয়ে করলেন খ্যাতনামা কথক রামধন তর্কবাগীশের ছেলে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। বিয়ের আসর বসেছিল সুকিয়া স্ট্রিটে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রমাপ্রসাদ রায়, নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখেরা। প্রথম বিধবা-বিবাহ ঘটে যাওয়ার পরও কিন্তু থেমে গেল না বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে আক্রমণ। ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর চরিত্র হনন, ঠাট্টা-বিদ্রূপ-অপমানেই প্রতিপক্ষ পরিতৃপ্ত হতে না পেরে উদ্যোগী হয়েছিলেন তাঁকে একঘরে করতেও।

"এখন যেখানে কিং কোম্পানির হোমিওপ্যাথিক ঔষধের দোকান, ঐখানে একতলা বাড়ীতে বিদ্যাসাগর লোকজন লইয়া থাকিতেন; তাহার পূর্ব্বে বৌবাজারে রাজকৃষ্ণ বাঁড়ুয্যের পৈতৃক বাড়ীতে অনেক দিন ছিলেন। রাজকৃষ্ণ পৈতৃক সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ লইয়া দাদা নীলকমলের নিকট হইতে পৃথক হইলেন এবং সুকিয়া স্ট্রীটে নূতন বাড়ী করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। বিদ্যাসাগর অধিকাংশ সময় ঐখানে অতিবাহিত করিতেন। ঐ বাড়ীতেই প্রথম বিধবা বিবাহ হয়। আমি তখন কলেজে পড়ি। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের বিবাহ —লোকে লোকারণ্য, ভয়ানক গোলমাল,—কিন্তু বিধবাবিবাহ সুশৃঙ্খলে সম্পাদিত হইল। কয়েক বৎসর পরে যখন সিপাহী-বিদ্রোহ হইল, তোমরা জান না বোধহয় যে এই বিধবাবিবাহ প্রচলন সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছিল। শুধু দাঁত দিয়া টোটা কাটা নয়,—বিধবাদের বিবাহ দিয়া ইংরাজ হিন্দুর সর্ব্বনাশ করিতেছে, এইরূপ একটা রব উঠিয়াছিল।"

পুরাতন প্রসঙ্গ/ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য

এ বিয়ের ঘটক ছিলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

৯ ডিসেম্বর

পানিহাটির কৃষ্ণকালী ঘোষের ছেলে মধুসূদনের সঙ্গে ঠনঠনের ঈশানচন্দ্র মিত্রের ১২ বছরের মেয়ে থাকমণির বিয়ে।

১৮৫৭

বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতায়, গতবছরের জুলাই থেকে। কলকাতা তখন প্রতিদিনই স্পন্দিত। এদেশের ইতিহাসেব যে পর্বটাকে আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে নবজাগরণের কাল হিসেবে, নিজের বৃত্তটাকে সম্পূর্ণ করতে সেই কাল তখন দুলে চলেছে পেন্ডুলামের ছন্দে। রামমোহন রায়-প্রবর্তিত ব্রাহ্মসমাজের বয়স হয়ে গেছে ২৫ বছর। টিকে থাকলে ডিরোজিও-র 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' পৌঁছোত ৩১-এ। দেবেন্দ্রনাথের 'তত্ত্ববোধিনী সভা' পা দিয়েছে ১৮-য়। 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি' আর 'বেঙ্গল ল্যান্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন' জুড়ে গিয়ে যে 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সোসাইটি', তার বয়স ৬। কলকাতায় প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর বেথুন স্কুল। জনস্বার্থে অথবা শ্রেণীস্বার্থে যে-ভাবেই তাকানো যাক, প্রায় মাসে মাসে গড়ে উঠছে এক-একটি নতুন সভা, কোনো-না-কোনো সামাজিক সমস্যার দিকে নজর রেখে। তোড়জোড় চলছে কলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার। সেটা প্রতিষ্ঠিত হবে তখন, যখন শাসিত ভারতবর্ষ আর ইংরেজ শাসকদের সিংহাসন দুটোই একসঙ্গে কেঁপে উঠবে সিপাহী বিদ্রোহের রক্ত-রণে। শাসকশক্তিকে সমর্থন জুগিয়েও নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা খুঁজে পাবে না কলকাতা। বিপন্ন হতে হবে তাকেও। তার কথা বলার স্বাধীনতার উপর, মাত্র এক বছরের জন্যে হলেও, চেপে বসবে সরকারি নিয়ন্ত্রণ। বিদ্রোহ শব্দটাও কলকাতার কানে নতুন নয় আর। সিপাহী বিদ্রোহের আগে থেকেই সে শুনে আসছে একাধিক আঞ্চলিক বিদ্রোহের সংবাদ। যেমন তিতুমিরের বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, আর নীল বিদ্রোহের প্রস্তুতিপর্ব। যে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ছেন তিনি, সেখানেই সহপাঠীদের মধ্যে রয়েছেন ব্রাহ্মসাজের আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির ছেলে সত্যেন্দ্রনাথ। আর আছেন কেশবচন্দ্র সেন, যিনি ছাত্রাবস্থা থেকেই সামাজিক আর সাংস্কৃতিক নানা কর্মকাণ্ডের সক্রিয় কর্মী। কলকাতা থেকে নিয়মিত বেরচ্ছে অজস্র উজ্জ্বল পত্রিকা, আধা-স্থবির নাগরিক জীবনকে নিয়ত ঝাঁকুনি দিয়ে চলেছে যার অভিঘাত। শিক্ষা এবং সমাজ, দুটো জায়গাতেই তখন বিদ্যাসাগরের প্রবল আধিপত্য। তাঁর নেতৃত্বে শুরু হয়ে গেছে বিধবা বিবাহের পক্ষে ব্যাপক আন্দোলন।

কিন্তু আশ্চর্য, এর কোনো কিছুর দিকেই আগ্রহের চোখে তাকানো নেই বঙ্কিমের। সমস্ত কিছুকেই যেন ঠেলে সরিয়ে রাখছেন অনাগ্রহের দূরত্বে। ডিরোজিও-র বিদ্রোহী শিষ্যেরাই তখন কলকাতার সর্ববিধ আন্দোলনের সংগঠনের নেতৃত্বে। প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁদের অন্যতম। এই প্যারীচাঁদের প্রথম উপন্যাস বই হয়ে বেরবে এক বছর পরে। ৩৫ বছর পরে উচ্ছ্বসিত ভাষায় অকৃত্রিম অভিনন্দন জানাবেন বঙ্কিম এই উপন্যাসকে। অথচ সেই প্যারীচাঁদের সঙ্গে আলাপ করারও ইচ্ছা জাগে নি তাঁর তখন। প্রেসিডেন্সি কলেজেই নিত্য যাওয়া-আসা এমন যে দুজন ছাত্রের সঙ্গে তাঁর হার্দ্য সখ্যতা গড়ে উঠবে পরে, ছাত্রজীবনে তাঁরা রয়ে যাবেন তাঁর অপরিচিত। অক্ষয়চন্দ্র সরকার আর কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য।

সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'-এ অনুবাদ করেছেন যে, ১৮৫৭-য় কলকাতায় আইন পড়তে এসেই বঙ্কিম পেয়ে গিয়েছিলেন বেশ-কিছু সাহিত্যসঙ্গী। সম্ভাব্য কয়েকজনের নামোল্লেখও করেছেন তিনি। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি। এ অনুমান ভিত্তিহীন। ১৮৫৭-য় এঁরা কেউই তাঁর বান্ধব তালিকাভুক্ত নন। বঙ্কিম বান্ধব-সংগ্রহে তখন অনাগ্রহী।

পরস্পর-বিরোধী বহু মতাদর্শের আবার পরস্পরকে মেলানো বহু রাজনৈতিক আন্দোলনের জোয়ারে নিত্য কল্লোলিত কলকাতার ভিতরে থেকেও বঙ্কিম যেন রয়ে যান একজন বহিরাগত। শিশিরকুমার দাস, বঙ্কিমকে নিয়ে লেখা তাঁর 'দি আর্টিস্ট ইন চেনস' নামের বঙ্কিমজীবনীতে কোনো অস্পষ্টতা না রেখেই তাই তাঁকে সংজ্ঞায়িত করেছেন—'a complete outsider'। আর এই আউটসাইডার হিসেবে চিহ্নিত করার একটু আগেই, ব্রাহ্মসমাজের কোনো অনুষ্ঠানেই তাঁর অংশগ্রহণ না করার দৃষ্টান্তের সূত্রে জানিয়ে দিয়েছেন—

> "His traditional roots were too strong."

গ্যেটের প্রসঙ্গেও এই 'ট্রাডিশনালে রুটস'-এর কথাটা পেড়েছিলেন স্টিফেন স্পেনডার, তাঁর গ্যেটে-রচনা-সংকলনের ভূমিকায়।

> "The poets politics were partly an expression of his need for the profound roots in tradition which were vital to his work. partly loyalty to the responsibility he had undertaken as a member of a princely government."

বঙ্কিমের ক্ষেত্রেও এই দ্বৈত আনুগত্যটা মিলে যায় বেশ। এ-সবই অনেকখানি সত্যি। তবুও নিভু-নিভু প্রদীপের শিখার দপদপানির মতো কিছু প্রশ্ন ঠেলা মারে আমাদের চেতনায়। নিজের শিকড়ের অভ্রান্ত ঐতিহ্য সম্বন্ধে বঙ্কিম যদি এতটাই সচেতন, তাহলে তো সেটার প্রমাণ দিতেই, অংশ না নিলেও, আসা-যাওয়ার প্রয়োজনটা ছিল জরুরি তখনকার সভা-সমিতিতে। বিদ্যাসাগর তো ঘনিষ্ঠ ভাবেই জুড়েছিলেন 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সঙ্গে, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র বাবদে। ব্রাহ্মধর্মের দিকে টাল খান নি তো তবু। বঙ্কিমও কি মেলামেশা করতে পারতেন না সেভাবে ? আর সেভাবে মেলামেশা করেও নিজের 'traditional roots'-টাকে অক্ষত রাখতে পারলেই তো বরং যথার্থ প্রমাণিত হতে পারত যে সেটা সত্যিই 'too strong'। সংঘাত-এড়ানো বিশ্বাসের শিকড়কে কি সত্যিই শনাক্ত করা সম্ভব, অসম্ভব শক্ত হিসেবে ? আবার অন্য ভাবেও তাকানো যেতে পারে প্রশ্নগুলোর দিকে।

যে সময়ে বঙ্কিম ঘুরে তাকাচ্ছেন না চারপাশের আলোড়িত পরিমণ্ডলের দিকে, তখন কি তিনি সত্যিই নিস্পৃহ পুরোপুরি? নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে গ্রহণ করছেন না কিছুই, পারিপার্শ্বিকতার ভিতরে বয়ে-চলা ঝোড়ো হাওয়া থেকে ? বঙ্কিমের নিজস্ব আদর্শ-বিশ্বাসের শক্ত, স্বাতন্ত্র্যগর্বিত, ঐতিহ্যবান শিকড়টা কি তাহলে কলকাতার পাথুরে জমিতে প্রবিষ্ট হয় নি কখনোই ? এবং কোনো ভাবেই ? তাঁর সমগ্র রচনাবলিতে আলোচিত হয়েছে যে-সব ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক আর সাহিত্য-সম্পর্কিত সমস্যা, সে-সব কি এই শহর সম্পর্কে

উদাসীন এবং অনবহিত থেকে রচনা করা সম্ভব ? আর এতখানি বিযুক্ত থাকাটাই যদি হয়ে থাকে তাঁর চরিত্রের আভ্যন্তরিক ধর্ম, তাহলে হঠাৎ স্বধর্মচ্যুত হয়ে কেন একসময়ে সিদ্ধান্ত নেবেন কলকাতা শাসনের অথবা এই শহরের সংস্কৃতি-ভাবনার জগতে প্রায় একচ্ছত্র সম্রাটের ভূমিকা পালনের ? কেন বের করতে চাইবেন বঙ্গদর্শন? কোন পাঠকের জন্যে? আবার সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র কেন এবং কিসের টানে নিরাপদ সাহিত্য-চর্চার নিভৃত কক্ষ থেকে নিজেকে চ্যুত করে নিয়ে নেমে আসতে চাইবেন ধর্ম, রাজনীতি, সামাজিক শাসন-শোষণ জাতীয় জটিল ঘূর্ণিপাকের রাজপথে? উপন্যাসে-উপন্যাসে, গদ্যে-গদ্যে, প্রবন্ধে-প্রবন্ধে, রসরচনায়, ব্যঙ্গে-বিদ্রূপে, তত্ত্বে-তর্কে কেনই-বা মেতে উঠতে চাইবেন এত অনর্গল কথা বলার কৃচ্ছ্রসাধনে, যদি না এই শহরের ভূমিকা তাঁর নিজের আত্মপ্রকাশের সমান্তরালে আত্ম-আবিষ্কার এবং আত্ম-সংকট থেকে উদ্ধারের পক্ষে হয়ে ওঠে কখনো প্রতিবন্ধক আর কখনো উদ্দীপক ? এখন ১৮৫৭। এখনো তিনি ছাত্র। তাই এখুনি হয়তো পৌঁছনো যাবে না এ-সব প্রশ্নের কোনো সুস্থির মীমাংসার ছায়াসুনিবিড় দিগন্তে। তাঁর জীবনের অগ্রগতির সমান্তরালে হাঁটতে হাঁটতেই ক্রমশ সত্য হয়ে উঠবে এই বিপরীত অনুভব যে, তাঁর সমকালে, 'আউটসাইডার' বঙ্কিমই ছিলেন সর্বোত্তম 'ইনসাইডার'। ছিলেন যে তারও ইশারা রয়ে গেছে শিশিরকুমারের ওই বইটিতে। ১১ পাতায় তাঁকে 'complete outsider' হিসেবে চিহ্নিত করার পরই ১২ পাতায় তাঁকে লিখতে হয়—

> "He always remained an outsider in Calcutta though it was Calcutta where his impact was felt most strongly."

আবার এরও পরে ১৪-১৫ পাতায়—

> "He may have remained an outsider to most of the social and religious movements of Calcutta but he kept in touch with all the important intellectual trends of his time."

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বঙ্কিমের চরিত্রের পার্থক্যটাও মনে এসে যায় এই মুহূর্তে। সমাজের প্রত্যক্ষগোচর মঞ্চে আবির্ভাবের পিছনে রবীন্দ্রনাথের গ্রীনরুম ছিল না কোনো। ছিল না কোনো স্বেচ্ছা-অজ্ঞাতবাস, নিজেকে অধ্যয়নে-অনুশীলনে সর্বতোভাবে সক্ষম করে তোলার প্রস্তুতিপর্ব হিসেবে। এমন-কি বয়সের হিসেবে যখন মনে হওয়া স্বাভাবিক যে মঞ্চারোহণের পক্ষে অনেকটাই অপরিণত, সেই তখন থেকেই তাঁর আপন পরিচিতি অথবা আপন পরিণতিকে চিনে নেওয়ার আপ্রাণ প্রয়াস, প্রকাশ্য মঞ্চে নিজেকে দাঁড় করানোর দুঃসাহসিকতায়।

"সেই আদি বাল্যকাল থেকে তাঁর ব্যক্তিজীবনও হয়ে উঠতে চায় সাহিত্য জীবন।"

রবীন্দ্রনাথের আদি গদ্যের আলোচনায় দেবেশ রায়ের এই প্রবাদপ্রতিম উক্তিটি যেমন চিনিয়ে দেয় তাঁর সত্তাবিকাশের মূলসূত্রটিকে, ঠিক তেমনি লেখালেখির সূচনাপর্বেই হঠাৎ থমকে গিয়ে বঙ্কিমের দীর্ঘকালীন মৌন আর বিলম্বিত আত্মপ্রকাশের কার্যকারণকে চিনিয়ে দেয় বুদ্ধদেব বসুর, ভিন্ন প্রসঙ্গ থেকে আহরিত, একটি সহায়ক উক্তি। তাঁর আলোচ্য বিষয়, মহাভারত। রামায়ণ এবং মহাভারতের দুটি বিচ্ছিন্ন বনবাস পর্বের তুলনামূলক আলোচনায় এগতে এগতে যখন তাঁর দৃষ্টির একাগ্র অনুসরণ কেবল যুধিষ্ঠিরকে, তখনই পড়ি—

> "তিনিও তো, রামেরই মতো, ভ্রমণ করেছেন বন থেকে বনান্তরে, ষড়ঋতুর আবর্তন দেখেছেন বারো বার, অনেক দেখেছেন নদী পর্বত স্বচ্ছ সরোবর, আর তরুশ্রেণী আর ফুল পল্লব পশুপক্ষী:—কিন্তু একবারও তিনি নিসর্গপ্রীতির কোনো পরিচয় দেন না, কোনো দৃশ্যের সামনে এসে থমকে দাঁড়ান না কখনো, লক্ষ্য করেন না পৃথিবীতে এখন বর্ষা চলেছে না বসন্ত:—মনে হয় তাঁর জগৎ যেন ঋতুরহিত, রূপগন্ধহীন। তাহলে কী করছেন তিনি বনপর্বে, ঐ দীর্ঘ বারো বছর তিনি কেমন করে কাটালেন?

সত্যি বলতে, আর-কিছুই করছেন না, শুধু শুনছেন, কখনো কিছু বলছেন না তা নয়, কিন্তু শোনার অংশটা বহুগুণে বেশি। শোনা, এই তাঁর কাজ, তাঁর বৃত্তি: তিনি যে শুনছেন এটাই বনপর্বের ঘটনা।... আর যখন, বনবাসের অন্তিম দিনে, সেই রহস্যময় বকপক্ষীর সামনে যুধিষ্ঠিরকে আমরা দেখতে পাই, তখন উপলব্ধি করি যে এই অরণ্য—যেখানে দ্রৌপদী মনোদুঃখী, আর ভীম-অর্জুন অবিরাম সংগ্রামশীল—তা ছিল যুধিষ্ঠিরের কাছে এক বিদ্যালয়, এক মহান বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে শ্রেষ্ঠ আচার্যদের কাছে বারো বছর ধরে শিক্ষা পেয়েছেন তিনি—অস্ত্রবিদ্যায় নয়, পুঁথিগত শাস্ত্রেও নয়—আত্মবিকাশে, আত্মসন্ধানে, বিশ্বচেতনায়।"

১৮৫৩-র পর 'সংবাদ প্রভাকর' বা অন্য কোনো পত্রিকায় কবিতা ছাপাতে পাঠান নি বঙ্কিম। অথচ এও সত্যি নয় যে ছেড়ে দিয়েছেন কবিতা লেখা। লিখেছেন, কিন্তু ছাপাতে দেন নি। বয়স যখন আঠারো, সেই ৫৬-য় বেরলো প্রথম কবিতার বই 'ললিতা। পুরাকালিক গল্প। তথা মানস'। এরপর বাংলা ভাষায় লেখা তাঁর দ্বিতীয় বই বেরবে ৬৫-তে। মাঝখানে দীর্ঘ ৯ বছরের ব্যবধান। ইচ্ছে করলে এই হিসেবটাকে যুধিষ্ঠিরের বনবাসের ১২-তেই মিলিয়ে দেওয়া যায়, যদি পত্র-পত্রিকার পাতায় লেখা ছাপানোর শেষ বছরটাকে গুরুত্ব দেওয়া যায় একটু বেশি।

আর এই ১২ কিংবা ৯ বছরের নীরবতার কালটাকে যদি যুধিষ্ঠিরের বনবাস-পর্বের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে ভাবতে বসি—কলকাতার ছাত্রজীবন আর রাজকর্মচারী হিসেবে যশোহর-নেগুয়া-বহরমপুরের কর্মজীবনে অবশ্য-পালনীয় ধরাবাঁধা কাজের বাইরে আর কী করেছেন তিনি, তাহলে হয়তো উত্তরটাও হয়ে যাবে যুধিষ্ঠিরের মতোই—শুনেছেন আর পড়েছেন কেবল। কিন্তু লেখেন নি আর বলেন নি কিছু।

এক বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন পাঠরত, তখনই যেন দ্বিতীয় এক বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে আত্যন্তিক সচেতন তিনি। যেন তখনই সংকল্পবদ্ধ যে, দ্বিতীয় এই বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিকে পরিপূর্ণ আত্মস্থ করার আগে কখনোই হস্তক্ষেপ নয় আত্মপ্রকাশের বা আত্মঘোষণার তূরী-ভেরীতে।

২

বেশ, লেখার ক্ষেত্রে না-হয় ধরে নেওয়া গেল তিনি রবীন্দ্রনাথের বিপরীত মেরুতে। প্রকাশ্য মঞ্চকে রিহার্সালের রুম বানাতে তাঁর অনিচ্ছা ঘোরতর। এটা অস্বাভাবিকও নয় এমন কিছু। পৃথিবীর সাহিত্য হাতড়ালে মিলে যাবে এর একটা-দুটো দৃষ্টান্তও । হয়তো বঙ্কিমের সঙ্গে বেশি মেলানো যাবে স্তাঁদালকে, অহংবাদী মনস্তাত্ত্বিক গঠনের সাদৃশ্যে। সমকাল ও সমবয়স্কদের সঙ্গে তিনিও গড়ে তুলেছিলেন বিচ্ছিন্নতার দেওয়াল। আর নিজেকে গড়তে চাইতেন কীভাবে, স্তেফান জাইগ জানিয়ে দেন তার পদ্ধতি-প্রকরণ—

"He builds a Chinese wall around his personality in order to exclude all alien influences, all possibility of the infiltration of others' thought, opinion, judgements: his privacy is not to be encroached upon by the common herd. His soul ambition is to keep Henri Beyle in a room apart, in a forcing-house where the rare plant of individuality may grow and blossom undisturbed."

সাহিত্য বা অন্য কোনো সৃজন মাধ্যমে সত্তাবিকাশের প্রস্তুতিপর্বে হয়তো কারো কারো প্রয়োজন হতে পারে এমন নিশ্ছিদ্র দুর্গবাস। কিন্তু সামাজিক কথোপকথনও কি নিয়ন্ত্রিত হবে

ওই একই যুক্তিতে? বঙ্কিম যে সভাসমিতি এড়িয়ে চলতেন সে কি তাহলে এই কারণে যে পাছে সে-সব মতামত গোপনে অনুপ্রবেশ করে তছনছ ঘটিয়ে দেয় তাঁর সাজানো-গোছানো নিজস্ব তত্ত্ববিশ্বের ঘর-দোরে ?

নাকি ভয় পেতেন কথা বলতেই ? এমন কি হতে পারে যে যথাযথভাবে কথা বলার অক্ষমতা সম্পর্কে এক ধরনের সজ্ঞান সতর্কতাই তাঁর কলকাতাবাসের জীবনে তাঁকে অংশীদার হয়ে উঠতে দেয় নি তখনকার সভাসমিতিব ? এমন ধারণাকে প্রশ্রয় দেওয়ার পক্ষে আছে কি কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ ?

অন্তত পরিণত বঙ্কিমের জীবনে এমন দৃষ্টান্ত দুর্লভ যা বুঝিয়ে দেবে যে অজস্র কথায়, অক্লান্ত আলাপচারিতায় তিনি উৎসাহহীন। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্কিম জীবনী'-তে যা জানান, তাতে দেখি কখনো কখনো সন্ধে থেকে প্রায় সারা রাতটাই তিনি মেতে রয়েছেন বিশ্বসাহিত্য মন্থন করা তর্কে-বিতর্কে। আর যখন তর্কের আসরে, তখন তাঁর ভিন্ন রূপ।

> "তাঁহাব উজ্জ্বল নয়নদ্বয় আরও উজ্জ্বল হইত, হস্তপদ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি সময় সময় ঈষৎ কম্পিত হইত—একটা প্রতিভার ছটা সমস্ত মুখমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইত।"

সানকিভাঙার একটা বাড়িতে একদিনের তর্কের আসরের বিবরণও শুনিয়েছেন শচীশচন্দ্র—

> "রাত্রি নয়টার সময় যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং সমাপ্ত হইতে রাত্রি তৃতীয় প্রহর হইয়া যায়। সমাপ্ত হইয়াছিল কিনা জানি না; আমি তখন তাঁহাদের পদতলে নিদ্রিত। য়ুরোপের সাহিত্যরাশি মন্থন করিয়া সেদিন যে তর্ক-যুদ্ধ উঠিয়াছিল, তাহাতে আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির নিদ্রাকর্ষণ হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি ? হুগো, বালজাক, গেতে, দন্তে, চসার প্রভৃতির নাম হইলে আজও আমার সেই দিনের কথা মনে পড়ে।"

আড্ডায় মুখর বঙ্কিমচন্দ্রকে চিনে নেওয়ার আরও বহু দৃষ্টান্ত ছড়ানো রয়েছে তাঁর সমসাময়িকদের স্মৃতিকথায়। তাহলে? প্রকাশ্যে কথা বলার পক্ষে তিনি নিজেকে মনে করেন বা করতে পারেন অনুপযুক্ত, এমন সম্ভাবনা অথবা সিদ্ধান্ত তো খারিজ হয়ে যাওয়ার কথা। যায়, কিন্তু পুরোপুরি যায় না। পুরোপুরি যায় না যে তার কারণও ওই শচীশচন্দ্রেরই বিস্ময়-জাগানো ভিন্ন বিবরণ—

> "বঙ্কিমচন্দ্র সুবক্তা ছিলেন না। সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিবার ক্ষমতা তাঁহার এককালে ছিল না। সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার এ অভাব—এ শক্তিহীনতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন; তাই বড় একটা সভাসমিতিতে যোগদান করিতেন না। তিনি সময়ে-সময়ে আমাদের সহিত অসংলগ্নভাবে বাক্যালাপ করিতেন। আমাদের মনে হইত, তিনি যেন একটা কথা কহিতেছেন, আর একটা কথা ভাবিতেছেন। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই আমার ভাবার্থ সকলে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অনেকেরই সম্ভবত স্মরণে আছে যে, বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী প্রভৃতির বিরুদ্ধে গভর্নমেণ্ট একবার মোকর্দমা উপস্থিত করেন। শুনিয়াছিলাম, বঙ্গবাসী যাহা লিখিয়াছিল, তাহা ইংরাজিতে অনুবাদ করিবার ভার বঙ্কিমচন্দ্রের উপর অর্পিত হয়। জানি না কি কারণে গভর্নমেণ্ট পক্ষ হইতে বঙ্কিমচন্দ্রকে সাক্ষী মান্য করা হয়। সাক্ষ্য দিতে হইবে শুনিয়া তিনি সাতিশয় চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন এবং টিটাগড়ে গিয়া জজ নরিসকে ধরিলেন। নরিস সাহেব দুর্দ্দান্ত হইলেও বঙ্কিমচন্দ্রকে একটু স্নেহ ও শ্রদ্ধা করিতেন। বুঝি এতটা অন্য কোন বাঙালীকে করিতেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য শুনিয়া নরিস সাহেব সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—
> 'সাক্ষ্য দিতে তুমি ভয় পাইতেছ কেন ?
> বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর করিলেন—

'আমি হাইকোর্টে কখন সাক্ষ্য দিই নাই—জেরা আমার সহ্য হয় না—আমার ক্রোধ সহজে উদ্দীপ্ত হয়—আমায় নিষ্কৃতি দান করুন।'

নরিস সাহেব বলিলেন—

'বঙ্কিমবাবু, তুমি স্থির জানিবে, আমি তোমায় নিষ্কৃতি দিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।'

সাহেব নিষ্কৃতি দিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সে সংবাদ তখনও অবগত ছিলেন না। সংবাদ আনিবার জন্য আমায় সবিশেষ উপদেশ দেন। উপদেশ দিবার সময় তিনি কিরূপ অসংলগ্নভাবে আমার সহিত কথা কহিয়াছিলেন, তাহা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। একবার বলিলেন—'যোগীন বোসকে বল, নরিস সাহেবকে ডেকে দিতে।' পরক্ষণে হয়ত বুঝিলেন, কথাটা আমায় গুছাইয়া বলিতে পারেন নাই, সংশোধন করিয়া বলিলেন, 'নরিস সাহেবকে বলগে যোগীন বোসকে ছেড়ে দিতে।' তিনবার এইরূপ অসংলগ্নভাবে বলিবার পর তাঁহার চৈতন্য হইল। তখন তিনি আমায় কথাটা গুছাইয়া বলিলেন, এইরূপে অনেকবার তাঁহাকে অসম্বদ্ধভাবে কথা কইতে দেখিয়াছি।

বঙ্কিমচন্দ্রের কথাবার্তা শুনিয়া বড় একটা তাঁহার প্রতিভার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারি নাই। কিন্তু তিনি যখন তর্কের আসরে অবতীর্ণ হইতেন, তখন তাঁহার ভিন্নরূপ।... তখন মনে হইত, একটি পঞ্চমবর্ষীয় শিশু সহসা প্রৌঢ়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া রঙ্গালয়ে অবতীর্ণ হইয়াছে।"

এ বিবৃতি তাঁর কোনো বন্ধু-বান্ধবের হলে অবশ্যই ভুগতে হত সংশয়ে। কিন্তু যেহেতু একেবারে ঘরের লোকের বিনীত নিবেদন, তাই বিশ্বাসযোগ্যতা যথেষ্ট। এই বিবরণকে মনে রেখে মরকত-কুঞ্জে দ্বিতীয় কলেজ রি-ইউনিয়নের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের প্রথম স্মৃতিচারণার দিকে তাকালে যে বঙ্কিমকে দেখতে পাওয়া যাবে, তিনিও মুখচোরা আর ভিড় এড়িয়ে ভিড়ের ভিতরেও একা থাকার দিকেই তাঁর প্রবণতা। প্রথম দর্শনেই তাই রবীন্দ্রনাথের চরম উপলব্ধি—

"আর সকলে জনতার অংশ, তিনি যেন একাকী একজন।"

সুতরাং শচীশচন্দ্রের বিবরণকে মেনে নিয়ে আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে, ঘরের নিভৃত পরিমণ্ডলে যিনি দীর্ঘস্থায়ী বিতর্কেও ক্লান্তিহীন, সেই তিনিই প্রকাশ্য সভাসমিতিতে অংশগ্রহণে একান্তরূপে ভীত এবং সন্ত্রস্ত। পাছে কথা বলতে হয়, সেই উদবেগেই সম্ভবত তিনি থেকে গেছেন দূরবর্তী এক নিবিষ্ট শ্রোতা। পরে, যখন তিনি স্বনামে প্রতিষ্ঠিত আর স্ব-প্রতিভায় সর্বজনমান্য এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিত্ব, তখন অবশ্য তাঁকে দেখা যাবে সাহিত্য-সংস্কৃতির বেশ-কিছু অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বক্তা রূপে। বক্তা, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তিনি পাঠ করছেন লিখিত প্রবন্ধ। প্রস্তুতিহীন তাৎক্ষণিক বাগ্মিতার দৃষ্টান্ত, তাঁর জীবনে দুর্লভ।

জনতার অংশ হতে বঙ্কিমের পক্ষে হয়তো ছিল ভিন্ন এক বাধাও। সে বাধা দলে জড়ানোর। এমন হতে পারে বহুদল বহু সভায় ভাগাভাগি এই সময়টাকে কিছুতেই জোগাতে পারছিলেন না মনের সমর্থন। আর তখনকার প্রত্যেক সচেতন নাগরিকই যেহেতু কোনো-না-কোনো দল বা সভার সঙ্গে যুক্ত, তাই ইচ্ছাকে সংহত করেই সম্ভবত তাকে বাধ্য হতে হয়েছিল বন্ধুত্ব রচনায় বিরত থাকতে। যেন ভয়, ব্যক্তির টানেই জুড়ে যাবেন কোনো-না-কোনো প্রতিষ্ঠানে বা দলে উপদলে। কোথাও জুড়ে না গিয়ে তিনি তখন চাইছিলেন দূরের দর্শক হতে। শহরে তিনি নবাগত। বহু মত-সংঘর্ষে নিয়ত ঝংকৃত এই শহরটাকে বিরাট ক্যানভাসের পেনটিং ভেবে নিয়েই নিজের অবস্থানকে, সংগত ভাবেই, সরিয়ে নিয়েছিলেন ঈষৎ দূরত্বে।

৩

বঙ্কিমচন্দ্রের কলকাতাবাসের সূচনা-পর্বকে ঘিরে প্রশ্ন উঠেছে আরো নানা রকম। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যাসাগর আর তাঁর বিধবা-বিবাহের আন্দোলনকে উপলক্ষ ক'রে।

১। "১৮৫৬-র ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় যখন প্রথম আইনসম্মত বিধবা-বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়, বঙ্কিমচন্দ্র তখন কলকাতায়। এ-সময় তিনি থাকতেন গোলদিঘীর কাছে একটি বাসাবাড়িতে। গোলদিঘী থেকে কৈলাস বসু স্ট্রিটের দূরত্ব বেশি নয়—ঐতিহাসিক এই ঘটনাকে দেখতে সেদিন ঐ রাস্তায় হাজার হাজার মানুষ সমবেত হয়েছিল। এদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের থাকাটাও বিচিত্র কিছু নয়।"

স্বপন বসু/বঙ্কিমচন্দ্র ও কলকাতা

২। "This is also the time when Vidyasagar launched his movement advocating the re-marriage of young widows. In later years Bankim criticized Vidyasagar fiercely and probably never had any sympathy for the movement".

Sisir Kumar Das/ The Artist in Chains

৩। "বিদ্যাসাগরের করুণা তাঁর বিদ্যার চাইতেও প্রসিদ্ধ। বিধবা-বিবাহের প্রশ্নে তাঁর উদারতা বঙ্কিমের রক্ষণশীলতাকে ধরিয়ে দেয়।"

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী/ বঙ্কিমচন্দ্রের জমিদার ও কৃষক

এলোমেলোভাবে বেছে-নেওয়া এই তিন উদ্ধৃতির প্রথমটিতে অনুমান। দ্বিতীয়টিতে সিদ্ধান্ত। তৃতীয়টিতে ধারণা। আবার শিশিরকুমারের একটি বাক্যে যেন দুটি স্বতন্ত্র অভিযোগ প্রচ্ছন্ন। যাব একটিতে, বঙ্কিম বিদ্যাসাগরের হিংস্র অথবা প্রচণ্ড সমালোচক। অন্যটিতে বিধবা-বিবাহের ঘোরতর অসমর্থক। বিদ্যাসাগরের ভাষা আর বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ, এই দুটো বিষয়কে ঘিরেই বঙ্কিমের মত-সংঘাত। বঙ্কিম কিন্তু দুটো বিষয়েই পুরোপুরি 'হ্যাঁ' অথবা পুরোপুরি 'না' বলেন নি কখনো কিংবা শেষপর্যন্ত। তাঁর ছিল দ্বান্দ্বিক যুক্তিপরায়ণতা, গোনাগুনতি কিছু ডিরোজিয়ান আর বিদ্যাসাগরিয়ান ছাড়া অধিকাংশই যেখানে প্রাণপণে ধর্মীয় আবেগের লাঙলে চাষ করে চলেছেন পতিত মানবজমিন, বঙ্কিম সেখানে যুক্তির চাবিকাঠি ছাড়া খুলতে চান নি কোনো স্থির সিদ্ধান্তের দরজা।

ককতো একবার বলেছিলেন, কার্টুনের মতো দেখতে পিকাসোর রেখাচিত্রগুলোও কার্টুন না হয়ে নিখাদ ছবি হয়ে যায় কেবল রেখার বলিষ্ঠতায়। যুক্তির বলিষ্ঠতার দিকেও আমাদের তাকানো দরকার সেইভাবে। রবীন্দ্রনাথ সম্মিলিত স্বদেশী-আবেগকে শ্রদ্ধা জানাতে স্বদেশী আন্দোলনের সূচনাপর্বে অবধারিত রূপে হয়ে উঠেছিলেন তার শ্রেষ্ঠতম অংশীদার। কিন্তু সেইসঙ্গেই তাঁকে যে পরে হয়ে উঠতে হল ওই আন্দোলনের কঠোরতম সমালোচক, সে তো ওই ফেনাময় আবেগের অপরিণামদর্শিতাকে যুক্তি দিয়ে বুঝতে পারার সুবাদে।

যুক্তিবাদী বঙ্কিমকে রক্ষণশীল হিসেবে চিহ্নিত করে যদি ঠেলে দেওয়া হয় সত্যিকারের ধর্মীয় সংস্কারসর্বস্ব রক্ষণশীলদের এলাকায়, তাতে তো এক শতাব্দী আগের মৃত রক্ষণশীলেরা শ্মশানের শুকনো ডাঙা ফুঁড়ে জেগে উঠবে মস্ত একটা জিতে-যাওয়ার উল্লাসে। তাঁরা মরার পরেও জিতবেন, এমন অবাঞ্ছনীয় ঘটনাকে ঘটতে না-দেওয়াটাই তো শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবীদের একটা দায়।

রক্ষণশীলেরা যা মানতেন বা মানতেন না, সবের পিছনেই ছিল শাস্ত্রীয় বচনের ওকালতি। বঙ্কিমের মানা না-মানা সামাজিক শৃঙ্খলতা আর প্রগতির দিকে তাকিয়ে, হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের

বিধি-বিধানের বদলে।

> "আমি হিন্দুধর্ম বিরোধী নই, হিন্দুধর্ম পরিশুদ্ধ হইয়া প্রচলিত থাকে, ইহাই আমার কামনা, তাই বলিয়া যাহা কিছু ধর্মশাস্ত্র বলিয়া পরিচিত তাহাই যে হিন্দুধর্মের প্রকৃত অংশ এবং আমাদের মঙ্গলকারক, একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না।"

আর-একবার বহুবিবাহ নিরাকরণের আইন সম্পর্কে—

> "আর যদি প্রজার হিতার্থে আইনের আবশ্যকতা আছে, ইহা স্থির হয়, তবে ধর্মশাস্ত্রের মুখ চাহিবার আবশ্যক নাই।"

এ কি রক্ষণশীলের কণ্ঠস্বর?

হিন্দু রক্ষণশীল কি তুলতে পারেন এমন প্রশ্ন যে, বাংলার লোকসংখ্যার অর্ধেক যেখানে হিন্দু আর অর্ধেক মুসলমান, সেখানে সরকার কী করে অর্ধেক প্রজার হিতের জন্যে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আইন বানাবে?

হিন্দু-মুসলমান মিলিয়ে বহুবিবাহের প্রশ্নটাকে হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সীমারেখা ডিঙিয়ে বিস্তৃত করে দিতে চেয়েছিলেন বঙ্কিম স্বদেশের ব্যাপ্ত পরিমণ্ডলে। কেউই কিন্তু সেটাকে ভেবে দেখার যোগ্য প্রস্তাব হিসেবে বিবেচনা করেন নি। করেন নি কারণ গোড়া থেকেই এই সব আন্দোলন হিন্দুত্ব সংরক্ষণ বনাম হিন্দুত্ব সংশোধনের গণ্ডিকাটা দাগের মধ্যে আটকানো, দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তর অংশকে হিসেবের অঙ্কের বাইরে রেখে। বহুবিবাহের প্রশ্নটাকে হিন্দু-মুসলমান মিলিয়ে তুলতে গেলে কি সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বলে ওঠার সম্ভাবনা উঁকি দিয়েছিল নেতৃবৃন্দের মনে? যদি দিয়ে থাকে, তা যে অলীক, তা তো প্রমাণ হয়ে গেল পাকিস্তান গঠনের পর বহুবিবাহকে বাতিল-করা আইন তৈরিতেই।

বঙ্কিম-বিদ্যাসাগরের আরেক সংঘর্ষ বাংলা ভাষা নিয়ে। সন্দেহ নেই বিদ্যাসাগরের ক্ষমতাকে অনেকখানি খাটো করে দেখতে এবং দেখাতে চেয়েছিলেন বঙ্কিম এই বলে যে, তিনি মৌলিক লেখক নন, দক্ষ অনুবাদক অথবা নিপুণ সংকলক। এর উপর তাঁর সংস্কৃত-ঘেঁষা গদ্যের গঠনকে নিয়েও বঙ্কিমের বঙ্কিম-কটাক্ষ।

এ-হেন নিন্দোক্তিতেও কিন্তু প্রমাণিত হয় না বঙ্কিম বিদ্যাসাগরে শ্রদ্ধাহীন। বঙ্কিমের আমলে, বঙ্কিমের কলমে বাংলা ভাষা আর-একরকম সজীবতা ফলিয়ে তোলার পর ভাষা-বিতর্কটা আর-একবার হাওয়া-লাগা পালের মতো ফুলে-ফেঁপে উঠলেও, বিদ্যাসাগরী ভাষা নিয়ে বাঙালি বুদ্ধিজীবী মহলের সংশয় আর সংক্ষোভ অনেক দিনের পুরনো। 'দুর্গেশনন্দিনী'র সূত্রে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের আবির্ভাবের যখন আরো ১১ বছর আর 'বঙ্গদর্শন'-এর সূত্রে প্রাবন্ধিক বঙ্কিমের আত্মপ্রকাশের ১৪ বছর বাকি, সেই তখনই 'মাসিক পত্রিকা'য় বেরনো 'আলালের ঘরের দুলাল'-কে উপলক্ষ করে বিদ্যাসাগর-সমালোচনার শুরু।

> ১। "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কৃত-বহুল ভাষার বিরুদ্ধে একটা revolt হইয়াছিল। বোধহয় ১৮৫৪-৫৫ খৃষ্টাব্দে রাধানাথ সিকদার 'মাসিক পত্রিকা' নামে একখানি কাগজ বাহির করেন, তাহাতে অনেক চলিত ভাষা ব্যবহৃত হইত।"
>
> কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য/পুরাতন প্রসঙ্গ

> ২। "এক বছর কি দু-বছর আগে অতিমাত্রায় সংস্কৃতবহুল রচনারীতির ঝোঁক প্রবল ছিল, কিন্তু এখন একটি প্রতিক্রিয়া এই মুহূর্তে সম্ভবত অত্যন্ত উগ্রভাবে দেখা দিয়েছে এবং কোনও কোনও লেখক অত্যন্ত সরল ভাষা ব্যবহারকে তাঁদের উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করেছেন—আমরা তার জন্যে আনন্দিত।"
>
> দি হিন্দু ইনটেলিজেন্সিয়ার

৩। "শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি পণ্ডিতগণের সংস্কৃতবহুল সাধুভাষার প্রতি বিরক্ত হইয়া ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বাবু রাধানাথ শিকদার ও বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র 'মাসিক পত্রিকা নামে একটি অপভাষায় মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন; তাহাতেই প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর প্রণীত 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রথম প্রকাশিত হয়।"

কৈলাসচন্দ্র ঘোষ/বাঙ্গালা সাহিত্য

৪। "বিদ্যাসাগরের ইদানীন্তন ভাষা যেমন সহজ, কোমল ও মসৃণ হইয়াছে, পূর্বে সেরূপ ছিল না। তিনি সংস্কৃত শব্দ-বহুল ভাষা ব্যবহার করাতে শ্রীযুক্ত রাধানাথ শিকদার ও প্যারীচাঁদ মিত্র বিরক্ত হইয়া ১৮৫৪ সালে অপভাষায় লিখিত একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।... সেই অবধি দুই প্রকার ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, বিদ্যাসাগরী আর আলালী ভাষা।"

রাজনারায়ণ বসু/ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা।

৪

১৮১০। ২৮ অক্টোবর

আজীবন অন্বিষ্ট পরমার্থের সান্নিধ্য পেতে, গার্হস্থ্য জীবনকে পিছন দিকে ছুঁড়ে ফেলে, পরিপূর্ণ সর্বত্যাগীর সাজে টলস্টয়ের নিরুদ্দেশ যাত্রা। তার মাত্র দুদিন আগে পড়ছিলেন ডস্টয়ভস্কির 'দি ব্রাদার্স কারামাজোভ'-এর কয়েকটা পাতা। পড়ছিলেন এই কারণে নয় যে, ভালো লাগছিল পড়তে। পড়ছিলেন মূলত ডস্টয়ভস্কি তাঁর তুলনায় কতখানি অক্ষম তা মেপে নিতে। ডস্টয়ভস্কি তাঁর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রতিভাময় প্রতিপক্ষ। অথচ কী বিপরীত দীপ্তিতেই-না ঝলমলিয়ে ওঠে এই ঘটনা যে, 'অপটিনা' নামের অপরিচিত স্টেশনে তাঁর নিরুদ্দেশ যাত্রার ট্রেনটি থামলেই তিনি চিঠি লিখতে বসে যান শাশা-কে, ব্যবহারযোগ্য কিছু জিনিসের জরুরি প্রয়োজনে। খুবই সামান্য চাওয়া অবশ্য। যে বইগুলো পড়ছিলাম, একটা ছোট্ট ছুরি, কিছু পেনসিল আর নিজের ড্রেসিং গাউনটা।

কী কী বই পড়ছিলেন নিরুদ্দেশ যাত্রার আগে ? পড়ছিলেন মাত্র তিনখানা বই। মঁতেন-এর 'এসেস'। মোপাসাঁ-র উপন্যাস। আর ? আর ডস্টয়ভস্কির 'দি ব্রাদার্স কারামাজোভ'। তবে জর্জ স্টেইনার-এর 'টলস্টয় অব ডস্টয়ভস্কি' পড়লে মনে হয় শেষ পর্যন্ত মোপাসাঁ এসে পৌঁছয় নি।

'অস্তাপেভো'-র স্টেশনমাস্টারের কুঠরিতে যখন তিনি মৃত্যুশয্যায়, তখন তাঁর শয্যার পাশে দুটি বই, ডস্টয়ভস্কির আর মঁতেনের। স্টেইনার তাঁর সাড়ে তিনশো পাতার বইয়ের শেষ পরিচ্ছেদে এই ঘটনাটি বিবৃত করে জানাচ্ছেন—

> Had he turned turned to the celebrated twelfth chapter of Book II of the Essais while composing his fierce genius to tranquility, Tolstoy would have found a judgement equally appropriate to himself and to Dostoevsky.
> C'est un grand ouvrier de miracles que L'espnt humain...

বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিমও, তাঁদের সমকালে, পরস্পরের প্রতিপক্ষ। বিদ্যাসাগরের প্রয়াণ ১৮৯১-এ। তাঁর প্রয়াণের আগে বিদ্যাসাগর-রচিত 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার—২য় পুস্তক'-এর একটি কঠোর সমালোচনা বঙ্গদর্শন-এ লিখেছিলেন বঙ্কিম। তাঁর প্রয়াণের পর ওই প্রবন্ধটি আবার ছাপার সময় বঙ্কিম তার মুখবন্ধে লিখলেন—

"বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রণীত বহুবিবাহ সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় পুস্তকের কিছু তীব্র সমালোচনায়

আমি কর্তব্যানুরোধে বাধ্য হইয়াছিলাম। তাহাতে তিনি কিছু বিরক্তও হইয়াছিলেন। তাই আমি এ প্রবন্ধ আর পুনর্মুদ্রিত করি নাই। এই আন্দোলন ভ্রান্তিজনিত, ইহাই প্রতিপন্ন করা আমার উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবদ্দশায় ইহা পুনর্মুদ্রিত করিয়া দ্বিতীয়বার তাঁহার বিরক্তি উৎপাদন করিতে আমি ইচ্ছা করি নাই। এক্ষণে তিনি অনুরক্তি বিরক্তির অতীত। তথাপি দেশস্থ সকল লোকেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে, এবং আমিও তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করি, এজন্য এক্ষণে পুনর্মুদ্রিত করার ঔচিত্য বিষয়ে অনেক বিচার করিয়াছি। বিচার করিয়া যে অংশে সেই তীব্র সমালোচনা ছিল তাহা উঠাইয়া দিয়াছি।"

১৮৯৫। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনুরোধ জানালেন বঙ্কিমকে এণ্ট্রান্স পরীক্ষার পক্ষে উপযুক্ত একটি রচনা সংকলনের জন্যে। সে সংকলনে সসম্মানে সংযোজিত হল বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা'-র অংশবিশেষ। সঙ্গে বঙ্কিমের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য—

"Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar's beautiful rendering from Kalidasa..."

এখন কি আমরাও ভাবতে পারি না যে মঁতেন-এর ওই উক্তিটি বঙ্কিম এবং বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গেও একটি বিশ্বস্ত সত্য ?

মঁতেন তো জানিয়েছিলেন এই কথাটা—

"এঁরা মহান কর্মী এক অলৌকিকের, যা আসলে মানবিক সত্য-সন্ধান।"

৫

৪২ বছর চাকরির পর অবসর নিলেন যাদবচন্দ্র। পেনশন মাসে ২২৫ টাকা। বয়স তখন ৭৯ বছর।

৬ এপ্রিল

কলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নেওয়া হয় এণ্ট্রান্স পরীক্ষা। প্রেসিডেন্সি কলেজের আইন বিভাগ থেকে বঙ্কিম বসেছিলেন সে পরীক্ষায়। চলেছিল পাঁচদিন ধরে। মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২৪৪।

১৩ এপ্রিল

এণ্ট্রান্স পরীক্ষা শেষ।

এই প্রসঙ্গের বিস্তৃত বিবরণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে বেরনো 'সুবর্ণলেখা' থেকে—

"১। পরীক্ষণীয় ভাষা

প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে দুইটি ভাষার পরীক্ষা দিতে হইত। তন্মধ্যে একটি ইংরাজি, অপর ভাষা—গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু, আরবী, ফার্সি, সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী ও উর্দু এই ৯টি ভাষার মধ্যে যে কোনো একটি। পরে এই ৯টি ভাষার সঙ্গে ওড়িয়া, বর্মী প্রভৃতি আরও কতিপয় ভাষার পরীক্ষা লওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল।

২। পরীক্ষার কেন্দ্র

প্রথম এণ্ট্রান্স পরীক্ষা নিম্নলিখিত কেন্দ্র হইতে লওয়া হইয়াছিল: কলিকাতা, বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, ঢাকা, চট্টগ্রাম, কটক, পাটনা, ভাগলপুর, বারাণসী, আগ্রা, দিল্লী, আজমীর ও লাহোর।

৩। পরীক্ষার ফি

এণ্ট্রান্স পরীক্ষার ফি ৫ টাকা ধার্য হইয়াছিল।

৪। পরীক্ষার পাঠ্য

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবনী, রামায়ণ।

৫। পরীক্ষার কর্ম্মসূচী

৬ই এপ্রিল সোমবার—ইংরাজী

৭ই এপ্রিল মঙ্গলবার—অন্যান্য ভাষা

৮ই এপ্রিল বুধবার—ভাষা সম্বন্ধে মৌখিক পরীক্ষা।

৯ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার—ইতিহাস, ভূগোল

১০ই এপ্রিল শুক্রবার— অঙ্ক ও বিজ্ঞান।

এই কার্যসূচী গৃহীত হওয়ার পর দেখা গেল যে ১০ই এপ্রিল গুড ফ্রাইডে এবং ১১ই এপ্রিল হিন্দুপর্ব, ফলে ১০ই এপ্রিলের পরীক্ষা ১৩ এপ্রিল সোমবার লওয়া হইয়াছিল।

৬। পরীক্ষার সময়

পূর্বাহ্ণ ১০ ঘটিকা হইতে ১।।০ ঘটিকা অপরাহ্ণ ২ ঘটিকা হইতে ৫।।০ ঘটিকা।

৭। পরীক্ষক

বাংলা পরীক্ষার—বিশপস কলেজের অধ্যাপক রেভাবেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।"

বাংলা পাঠ্য বিষয়ের আরো নির্ভুল চেহারা—

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম আর কৃত্তিবাসী রামায়ণ।

বাংলা ছাড়া অন্যান্য বিষয় ও তার পরীক্ষকদের নাম—

English, Greek, Latin.
G. Smith, Esq., Principal Doveton College.
Sanskrit, Bengali, Hindee
Revd. K.M. Banerjee, Professor, Bishop's College.
History, Geography.
E. B. Cowell. Esq., M.A. Professor, Presidency College.
Mathematics & Natural Science.
W. Masters. Esq., Professor, Metropolitan College.

২ মে

ফল বেরলো এণ্ট্রান্স পরীক্ষার। ২৪৪ জন প্রার্থীর মধ্যে প্রথম বিভাগে পাস ১১৫ জন। দ্বিতীয় বিভাগে ৪৭। ৬৭ জন ফেল। ১৫ জন পরীক্ষা দেয় নি শেষ পর্যন্ত। শতকরা ৫০ ভাগের উপরে যাদের নম্বর তারাই প্রথম বিভাগে। শতকরা ৫০-এর নীচে কিন্তু ২৫-এর উপরে, তারা দ্বিতীয় বিভাগে। বঙ্কিম পাস করেছিলেন প্রথম বিভাগে। সেবারে তাঁরই সঙ্গে এই পরীক্ষা দিয়েছিলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরপাড়া থেকে, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য সংস্কৃত কলেজ থেকে, আর হিন্দু কলেজ থেকে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

২৩ মে

'সংবাদ প্রভাকর'-এ বেরলো এক আশ্চর্য চিঠি, সম্পাদককে তাঁর প্রিয় শিষ্যবর্গের কবিতা

ছাপানোর অনুরোধ জানিয়ে।

"...ক্রমাগত এক ব্যক্তির ভাব ও লেখাতে সাধারণের মনস্তুষ্টি হওয়া কোন প্রকারেই সম্ভব নহে, আর সাধারণের মনস্তুষ্টি ব্যতীত পত্রের মানসম্ভ্রম ও আদর কিছুই থাকে না, কিন্তু অদ্যাবধি এদেশে যত সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে আপনকার পত্রের ন্যায় আদর ও গৌরব অন্য কোন পত্রেরই হয় নাই তাহার কারণ স্পষ্টই রহিয়াছে, আপনার দৈবশক্তি বিলক্ষণ আছে এবং আপনকার পাঠক ও বিজ্ঞ লেখকমণ্ডলীও আহ্লাদ ও উৎসাহপূর্বক সময়ে সময়ে স্ব স্ব রচিত প্রবন্ধাদি দ্বারা পত্র ভূষিত করেন, কাযেই সকল দিক বজায় ছিল, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে আপনাকার পীড়া প্রযুক্ত সে ব্যাপারে যৎপরোনাস্তি বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। আমি যথার্থ কহিতেছি কি না ? আপনি সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন, আমি বহুকাল পর্যন্ত আপনকার প্রভাকর পড়িতেছি তাহাতে আপনার লেখকদিগের মধ্যে অনেককেই ভালরূপে জানি, আপাততঃ তাহাদের মধ্যে কতিপয় সুলেখক বুদ্ধিমন্ত যুবকের নাম পাঠাইতেছি তাঁহারা অধিকন্তু আপনকার ছাত্ররূপে গণ্য, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহারদিগ্যে নিজ পত্র মধ্যে আহ্বানপূর্বক পূর্ণ লিখনে [পুনর্লিখনে] অনুরোধ করিলে বোধ করি তাঁহারা যত্ন ও আহ্লাদ করিয়া স্বীকৃত হইবেন, তাঁহারা যে এখন কি কারণে পূর্বরাগ বিবর্জিত হইয়াছেন আর কেনই বা লেখেন না, তাহার সবিশেষ কিছুই বোধগম্য হইবার নহে, তবে অনুমান হয় উপযুক্ত উৎসাহ না পাইয়া থাকিবেন, হে মহাশয়, অসময়ে শিষ্যের সাহায্য প্রার্থনায় মর্য্যাদার লাঘব কিছুই নাই, বরং তাহাতে দেশের বিধিমতে উপকার সম্ভাবনা। আপনি দেশের হিতার্থে কৃতসংকল্প হইয়া অনেক প্রকার করিয়াছেন, অতএব বর্তমান বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকায় উভয়তঃ ক্ষতিমাত্র, আপনার প্রভাকরই বঙ্গভাষাকে অন্ধকার হইতে মুক্ত করিয়াছে, আর সেই আলোক প্রভাবেই বঙ্গভাষা অধুনা এইরূপ উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব এক্ষণে সে প্রভাবের হীনতা দেখিলে অত্যন্ত আক্ষেপ হয়, আপনি প্রস্তাবিত বিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোযাগ করিলেই সকল দিক বজায় থাকিতে পারে। আপাততঃ যে কয়েকটি নাম স্মরণ হইল তাহা লিখিতেছি, প্রয়োজনমতে অনুসন্ধান করিয়া আরো কিছু লিখিতে ত্রুটি করিব না, এস্থলে নাম বসানতে গুণের ইতর বিশেষ কিছুই করা হয় নাই।

শ্রীযুত দ্বারকানাথ অধিকারী
শ্রীযুত দীনবন্ধু মিত্র
শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শ্রীযুত রাধামাধব মিত্র
শ্রীযুত গোঁসাইদাস গুপ্ত
শ্রীযুত শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়
শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র রায়
শ্রীযুত রায়কমল মজুমদার
শ্রীযুত যাদবচন্দ্র রায়
শ্রীযুত শ্যামানন্দ গুপ্ত
শ্রীযুত চন্দ্রনাথ বরাট
শ্রীযুত যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়
শ্রীযুত দিননাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রীযুত বলদেব পালিত

(অদ্য এই পর্যন্ত)
কস্যচিৎ প্রভাকরহিতেচ্ছু জনস্য
৬ বৈশাখ, ১২৬৪"

বঙ্কিম একাই দীর্ঘদিন 'সংবাদ প্রভাকর'-এ লিখছেন না আর, এইটুকু তথ্যই জানা ছিল এতক্ষণ। এই চিঠিতে জানা গেল তাঁর প্রিয় শিষ্যমণ্ডলীর কেউই লিখছেন না আর। তা ছাড়াও জানা গেল ঈশ্বরচন্দ্রের অসুস্থতার সংবাদ। হয়তো নিজে আর আগের মতো মনোযোগ দিতে পারছেন না বলেই পাঠকের কাছে প্রভাকরকে মনে হচ্ছে উজ্জ্বলতাহীন।

১ আগস্ট

বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত নিল আগামী বছর অর্থাৎ ১৮৫৮-র ৫ এপ্রিল নেওয়া হবে প্রথম বি. এ. পরীক্ষা।

> "12. For the first three years after the establishment of the University, the only requirement from candidates for the Degree of B.A. shall be that they produce certificates showing that they have passed the Entrance Examination and are of good moral character."
>
> (Minutes of the Provisional Committee held on 1.8.57)

যদিও হাতে সময় নিতান্তই কম, অনেক পাঠ্যই অচেনা, তবুও বঙ্কিমের সিদ্ধান্ত, দেবেন বি এ পরীক্ষা।

১৮৫৭

এই বছরের অন্যান্য ঘটনাবলী

কলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা আর ভারতবর্ষে সিপাহী বিদ্রোহ, এই বছরের সবচেয়ে গুরুত্বময় ঘটনা এ-দুটোই । দুটো দুই আলাদা তাৎপর্যে বিস্ফোরক। আর দুটোরই প্রতিক্রিয়া আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে দূরপ্রসারী। কলকাতার কাছে ব্যারাকপুরে শহিদ মঙ্গল পাণ্ডে প্রথম দেশলাই কাঠিটা জ্বালিয়ে দিলেও, বিদ্রোহের অগ্নিগর্ভ মশালগুলো জ্বলেছিল কলকাতা থেকে অনেক দূরে। দূরে ভারতের ভিন্ন প্রান্তে। তবুও অমন দূরের আগুনের আঁচেও ঝলসাতে হল কলকাতাকে। ঝলসাতে হল বিদ্রোহের সমর্থনে হাত না তুলেও। সমর্থন না জানিয়েও কলকাতাবাসীকে হতে হল শাসক ইংরেজদের সন্দেহভাজন, আর অধিবাসী ইংরেজদের দুচোখের বিষ। পত্র-পত্রিকার খোল-কত্তালে ইংরেজি সুশাসনের উচ্চকণ্ঠ কীর্তনের সুর বাজিয়েও বাঙালি সমাজের রেহাই মিলল না অনাকাঙ্ক্ষিত অপমান থেকে। অবশ্য এ অপমানটা কিছুকাল পরেই কাজ করবে শক-থেরাপির মতো, মচকানো মেরুদণ্ডটা সিধে করে নিতে। সিপাহী বিদ্রোহ যখন চলছিল তখন জানা যাচ্ছিল বা দেশবাসীকে শাসকশক্তি জানাচ্ছিল যে বিদ্রোহীরা কী ভয়ানক রকমের নৃশংস হত্যাকারী। বিদ্রোহ শেষ হওয়ার বেশ-কিছু পরে পৃথিবী জেনে গেল প্রতিহিংসাপরায়ণতায় ইংরেজ শাসকরা প্রতিদ্বন্দ্বীহীন।

> "There was a time when English Historian wrote of Mutiny as though all the horrors should be debited to the Indian account : Edward Thompson in his eagerness to be just has not only displayed the other side of the medal but in his summing-up has judged the English guilty by the highest moral standards and convicted the Indians of more than a failure in revolutionry technique."
>
> The Men Who Ruled India/Philip Woodruff

ফিলিপ ম্যাসন তাঁর 'এ ম্যাটার অব অনার'-এর, যার আলোচ্য বিষয় ইন্ডিয়ান আর্মি, তার

অফিসারবৃন্দ আর তার মানুষ, এক জায়গায় বিদ্রোহের কারণ খুঁজতে গিয়ে যা জানান, সেখানে বিদ্রোহী সিপাহীরা পেয়ে যান সমর্থন—

> "...in many units they felt they had been betrayed by a new generation of officers who did not like them or listen to them, who despised their customs and religion, who made light of their honour. Betrayed and deserted they turned in savage anger on those they had once trusted."

আর শাসকেরা তিরস্কার—

> "Complete incomprehension of this fear and sense of betrayal. It was black ingratitude, faithlessness and villainy."

বিদ্রোহ-পরবর্তী সময়ের পথরেখা ধরে যতই এগোনো যাবে, চোখে পড়বে এই মহাবিদ্রোহকে জিন্দাবাদে নন্দিত আর নিন্দাবাদে বিকৃত করার আগ্রহে একদিকে যেমন ক্রমশই মেতে উঠছেন বাংলাসাহিত্যের লেখকরা, অন্যদিকে ব্রিটিশ বিজয় ঘোষণার আত্মম্ভরী উৎসাহে ইংরেজি কলমেও লেখা হয়ে চলেছে বইয়ের পর বই। ইংরেজ প্রসঙ্গ থাক। বাংলা সাহিত্যের ফসলের দিকেই তাকানো যাক কেবল। ১৮৫৮ অর্থাৎ বিদ্রোহের ঠিক পরের বছরেই বাংলাসাহিত্যে ঘটে গেল বিদ্রোহ-অর্জিত অভিজ্ঞতার পরোক্ষ প্রতিফলন, এমন মন্তব্য কি খুব অবিশ্বাস্য ঠেকবে যদি মনে রাখা যায় রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মিনীর উপাখ্যানেব প্রকাশের বছর ঐটিই ? আর পদ্মিনীর উপাখ্যানকে মেনে নিলে এরই দোসর হিসেবে মধুসূদনের মেঘনাদবদ কাব্য-কেও সংবর্ধনা জানানো যাবে দ্বিধাহীনতায়। কিন্তু পরোক্ষ প্রভাব-প্রতিফলনের দৃষ্টান্তকে দূরে সরিয়ে আমরা যদি বিদ্রোহ অথবা বিদ্রোহের অন্তর্গত চরিত্রদের নিয়ে লেখা বাংলা রচনাবলীর দিকে তাকাতে চাই, মিলে যাবে প্রভূত উদাহরণ। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশকে নিয়ে একালের একজন নিবিষ্টতম গবেষক স্বপন বসু। তাঁর 'গণ অসেন্তোষ ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ'-এ, পরবর্তী গবেষকদের পরিশ্রম অনেকখানি হালকা করে দিতেই যেন, বিদ্রোহ অবলম্বনে রচিত বাংলা সাহিত্যকে সাজিয়ে দিয়েছেন মোটামুটি পাঁচটা ভাগে।

১। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাজাত স্মৃতিচারণা :

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আমার জীবন চরিত', যদুনাথ সর্বাধিকারীর 'তীর্থ ভ্রমণ', কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা', রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত'।

এখানে অবশ্যই উল্লেখ থাকা উচিত ছিল শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন সমাজ' আর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আত্মজীবনী'-র।

২। গল্প-উপন্যাস :

গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ-এর 'চিত্তবিনোদিনী', উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের 'নানা সাহেব', বরদাকান্ত সেন-গুপ্তর 'হেমপ্রভা', কালীপ্রসন্ন দত্তের 'বিজয়', প্রসন্নময়ী দেবী-র 'অশোকা', নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'অমরসিংহ', সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'শঙ্কর', চণ্ডীচরণ সেন-এর 'ঝান্সীর রাণী' প্রভৃতি।

৩। নাটক ও কবিতা :

অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'নির্বাপিত দীপ', গিরিশচন্দ্র ঘোষ-এর অসম্পূর্ণ 'ঝাঁসীর রাণী', ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, প্রসন্নময়ী দেবী, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য আর অভয়চন্দ্র পাঁড়ে প্রমুখের কবিতা।

৪। চরিতকথা :

গোপাল চন্দ্র দে-র 'নানাসাহেবের জীবনী', রবীন্দ্রনাথ, দুর্গাদাস লাহিড়ী, রজনীকান্ত গুপ্ত প্রমুখের লেখা ঝাঁসীর রানীর জীবনী, রজনীকান্ত গুপ্তের কুমার সিংহের বীরকাহিনী প্রভৃতি।

৫। ইতিহাস :

রজনীকান্ত গুপ্তের পাঁচখণ্ডের 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস'। বিশ শতকেও, সৌভাগ্যের কথা, এই মহাবিদ্রোহকে নিয়ে ভাঁটা পড়ে নি অনুসন্ধিৎসায়। তবে কথাসাহিত্যের চেয়ে ঐতিহাসিক গবেষণার দিকেই প্রাধান্য। বাংলায় কম, ইংরেজিতে বেশি। গবেষক হিসেবে সুরেন্দ্রনাথ সেন, রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রমোদ সেনগুপ্ত প্রমুখ স্বনামধন্যদের সঙ্গে আমাদের পরিচয়টা অনেক ঘনিষ্ঠ। এখন আরও একজন বাঙালি গবেষক এঁদের পাশেই নিজের বসুবার সম্মানজনক অধিকার অর্জন করে নিয়েছেন নিজের কৃতিত্বে। তিনি শশিভূষণ চৌধুরী। তাঁর প্রথম বইটি ছিল 'Civil Disturbances During the British Rule in India'। ১৯৫৫-য় বেরনো। দুবছর পরে 'Civil Rebellion in the Indian Mutinies'। এর সাত বছর পরে 'Theories of the Indian Mutiny'। মৃত্যুর আগে শেষ বই 'English Historical Writings on the Indian Mutiny।' মহাবিদ্রোহকে নিয়ে পর পর এতগুলো বই ধারাবাহিকভাবে লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি যে বেদনাবোধ থেকে, তাঁর নিজের কথায় সেটা এই রকম—

> "বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় প্রতিক্রিয়ার বিরাট ছবিটি কোথাও চিত্রিত হয় নি, না ভারতবর্ষে, না ব্রিটেনে।"

শশিভূষণ একজন ভারতীয় ঐতিহাসিক হিসেবেই তন্ন অনুসন্ধানে ঝুঁকেছিলেন মহাবিদ্রোহের ভিতরকার ভারতীয় দৃষ্টিকোণকে আবিষ্কার করে নিতে। ভারতীয় আলোচনা তাঁকে তৃপ্তি জোগায় নি। বিদ্রোহ দমন করেছিল যে ইংরেজ, সেই ইংরেজ জাতের ঐতিহাসিকদের আত্মসন্তুষ্টিময় অপব্যাখ্যায় তিনি বীতশ্রদ্ধ।

> "ভারতবর্ষ যে ভারতীয়দের এ সত্যকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য ইংরাজ সৈনিকদের বন্দুক আর ইংরাজ ঐতিহাসিকদের কলম যে একসাথে কাজ করেছিল, তা শশীভূষণের দৃষ্টি এড়ায় নি। পরাভূত ও পদাহত ভারতীয়দের বেদনা শশীভূষণের মধ্যে এক নূতন দায়িত্ববোধের সঞ্চার করেছে। ব্যারাকপুর, মীরাট, দিল্লীতে যারা বিদ্রোহ করেছিল তারা তো ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে তাদের প্রাথমিক দায়িত্ব সম্পন্ন করেছে, কিন্তু তাদের মহান অভ্যুত্থানকে পরবর্তীকালের ভারতীয় ঐতিহাসিকেরা কি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছিলেন ? তাঁরা কি দিয়েছিলেন সেই অভ্যুত্থানকে যথাযোগ্য মর্য্যাদা ? বোধহয় দেন নি বা দিতে পারেন নি। কেন পারেন নি এ প্রশ্ন শশীভূষণ কখনো তোলেন নি। কিন্তু তাঁর চেতনার অন্তর্পটে সব সময় এ প্রশ্ন কাজ করেছে।..."

মহাবিদ্রোহের ঐতিহাসিক শশিভূষণ চৌধুরী/
রঞ্জিত সেন/ইতিহাস পত্রিকা

ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে ভারতীয় মহাবিদ্রোহের চরম ব্যর্থতার ইতিহাস লিখতে চেয়েছিল যে ইংরেজ, বিধাতার কৌতুকে সেই দেশেই আমরা খুঁজে পাই এক বিস্ময়কর ব্যতিক্রম। ভারতবর্ষে যখন জ্বলছে মহাবিদ্রোহের আগুন, ঠিক সেই শুভলগ্নেই ইংরেজ কবি আর্নস্ট জোন্স ছেপে বের করলেন তাঁর কবিতার বই 'দি রিভোল্ট অব হিন্দুস্থান অর দি নিউ ওয়ার্ল্ড'। উৎসর্গ নিজের মৃতা স্ত্রীকে। উৎসর্গপত্রে লেখা—

> "I can not rear marble on her grove. I give her this".

ভারতবর্ষে সিপাহী বিদ্রোহের মতো অগ্নিবর্ণ ঘটনার সামান্যতম স্ফুলিঙ্গও যখন অনুমান-অনুভবের হাজার মাইল দূরত্বে, সেই তখন, ১৮৪৮-এ, জোন্স বিদ্রোহমনস্ক শ্রমিকদের মিছিল সংগঠনের অপরাধে জেলখানায়। তিনি সংগ্রামী মানুষের কবি। আবার সেইসঙ্গে চার্টিস্ট আন্দোলনের তরুণতম নেতা। তাঁর সংগঠনশক্তিকে ইংরেজ শাসকদের ভয়। আর তাঁর

কলমের শক্তি সম্পর্কে আতঙ্ক। তাই কারাবাসের দিনগুলোয় কাগজ কলম নিয়ে লিখবার সামান্যতম অধিকারটুকুকেও ছিনিয়ে নিয়ে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হল ওল্ড টেস্টামেন্টের একটা সস্তা সংস্করণ।

"উদ্দেশ্য, কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে এই বিপথগামী অমৃতের সন্তান করুণাময় ঈশ্বরের কাছে অহোরাত্র সাশ্রু প্রার্থনায় কালাতিপাত করবেন। মূর্খেরা জোন্‌সকে চেনে নি। লেখনীর অভাব কি দমিয়ে রাখতে পারে এই অকুতোভয় কবিকে ?... শরীরের নানা জায়গা চিরে চিরে ক্ষত সৃষ্টি করলেন জোন্‌স। সেই ক্ষতনিঃসৃত শোণিতপ্রবাহে ওল্ড টেস্টামেন্টের জীর্ণ পাতায় লিখে চললেন কয়েক হাজার লাইনের এক দীর্ঘ কবিতা। আগাগোড়া রক্তের অক্ষরে রচিত তিমির হননের এই অনন্য কাব্যের বিষয়— না চার্টিস্ট আন্দোলন নয়—'দি রিভোল্ট অব হিন্দুস্তান'। দশ বছর পরে যে অভ্যুত্থান আসমুদ্রহিমাচলের শিকড় নাড়িয়ে দেবে, জোন্‌সের কবিতায় তা আলোকচিত্রের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠল। কল্পনার তরী বেয়ে কবির মানসযাত্রা শুরু হল আমেরিকা থেকে। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য আমেরিকার সংগ্রামকে অভিবাদন জানাতে গিয়ে থমকে গেল তাঁর হাত। নিগ্রো ক্রীতদাসের উপর মার্কিন গণতন্ত্রের উদ্যত চাবুক দেখে তীব্র বিদ্রূপে তাঁর পতাকার উদ্দেশে কবি বলে উঠলেন—

'তোমার ঝাণ্ডার ডোরা, কাঁদিয়া রক্তাক্ত পিঠে, বহিছে তোমারি ক্রীতদাস,
তোমার ঝাণ্ডার তারা যে আকাশে জ্বলে আজ সে আকাশ রাত্রির আকাশ।'

মার্কিন মুলুক থেকে পশ্চিমে যাত্রা করে জাপান ও অন্যান্য প্রাচ্যদেশ পেরিয়ে অবশেষে কবি পৌঁছলেন ভারতবর্ষে। এই ভারতবর্ষেরই মদগর্বিত অত্যাচারীর খড়্গকৃপাণ চূর্ণ করতে হিন্দু পুরাণের কল্কি অবতারের আবির্ভাব কল্পনা করেছিলেন কবি টমাস ক্যাম্পবেল। এই ভারতবর্ষেরই গঙ্গা ও সিন্ধুতীরের মানুষ রক্তের মূল্যে তাদের উৎপীড়কদের কাছ থেকে শোষণ ও নির্যাতনের পাওনা উশুল করে নেবে এমন কল্পনা করেছিলেন বায়রন সেই ১৮১১ সালে। ক্যাম্পবেল-বায়রনের সেই স্বপ্নেরই প্রতিধ্বনি শোনা গেল ১৮৪৮ সালে ২৯ বছরের যুবক জোনসের কবিতায়।"

একজন ইংরেজ কবি ও একটি ভারতীয় বিদ্রোহ/
গৌতম রায়/ আনন্দবাজার পত্রিকা

১৮৫৭-য় তাঁর স্বপ্ন যখন বাস্তবে রক্তিম, চারটিস্ট আন্দোলনের মুখপত্র 'পিপল্‌স পেপার'-এর পাতায় লেখালেখি ছাড়াও জোনস মাঠে-ময়দানে জনসভা সংগঠিত করে সমর্থন জানিয়ে গেছেন বিদ্রোহী ভারতবর্ষ বা ভারতবর্ষের মহাবিদ্রোহকে। বিদ্রোহের সময় আর বিদ্রোহকে নিয়ে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের ভাবনাচিন্তায় অক্ষমতা-অসংগতির খবর জোনস নিশ্চয়ই জানতেন না ঐ সময়। তবু মনে হয়, জানতেন যেন। যেন জেনেই নিজের কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছিলেন তার প্রায়শ্চিত্তের দায়। যেন ভারতবর্ষের কবিদের কলমের বন্ধ্যাত্ব মোচনের উদ্দেশ্যেই নিজের মহাকাব্যের প্রকাশ। অথচ আশ্চর্য, এমন ভারত-বন্ধু আজও এদেশে অখ্যাত, অ-সম্মানিত।

অথচ এমন নয় যে কোনো ভারতবাসী অথবা বঙ্গভাষীই তখন স্বপ্ন দেখেন নি পরাধীনতা-মোচনের কিংবা তার চেয়েও আরো বড়ো কিছুর অর্থাৎ ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র-সংগ্রাম সংগঠনের। আপাত-অজানা সে তথ্যও এখন আমাদের সামনে হাজির করে দিয়েছেন পল্লব সেনগুপ্ত, তাঁর 'উনিশ শতকের ইংরেজি সাহিত্যে বিপ্লবী ভারতের চিত্রকল্প' নামের পুস্তিকায়। তাঁর ঐ গবেষণার সূত্রেই আমরা পেয়ে যাচ্ছি এমন দুজন ইংরেজি ভাষার বাঙালি লেখককে যাঁরা নিঃসন্দেহে তাঁদের সময়ের থেকে দু-কদম এগিয়ে থাকা মানুষ, পরে ভাবনা-

চিন্তার চরিত্র বদল ঘটলেও। এঁরা দুজন হলেন কৈলাসচন্দ্র দত্ত আর শশীচন্দ্র দত্ত। কৈলাসচন্দ্র হিন্দু স্কুলের ছাত্র। সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক রসময় দত্তের মেজো ছেলে, কবি তরু দত্তের জেঠামশাই আর পরে 'দি হিন্দু পাইওনিয়র'-এর সম্পাদক। শশীচন্দ্র দত্ত, রমেশচন্দ্র দত্তের কাকা। এঁরা দুজনেই একটি করে গল্প লিখেছিলেন ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের অনেক আগে, মহাবিদ্রোহকে স্বাগত জানিয়ে। কৈলাসচন্দ্রের গল্পের নাম, "এ জার্নাল অব ফর্টি-এইট আওয়ার্স অব দি ইয়ার ১৯৪৫"। বেরিয়েছিল ১৮৩৫-এ, ৬ জুনের ক্যালকাটা লিটেরারি গেজেটে। শশীচন্দ্রের গল্পের নাম "দি রিপাবলিক অব ওড়িশা : অ্যানালস ফ্রম দি পেজেস অব টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী"। ছাপা হয়েছিল ১৮৪৫-এ, ২৫ মে-র স্যাটারডে ইভনিংস হরকরায়। শশীচন্দ্র সম্পর্কে আরো একটা উল্লেখযোগ্য সংবাদ হল, ১৮৭৫-এ সরাসরি সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় লিখেছিলেন একটা পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসও। যথাসময়ে আলোচিত হবে তা।

কৈলাসচন্দ্র তাঁর গল্পের জন্যে 'দি ক্যালকাটা কুরিয়ার'-এর পক্ষ থেকে আখ্যা পেয়েছিলেন 'রাজদ্রোহী'। অভিযুক্ত কৈলাসচন্দ্রকে শাসক শক্তির আক্রমণ থেকে বাঁচাতে এগিয়ে এসেছিলেন যিনি, সেই রিচার্ডসন কিন্তু মতবাদের দিক থেকে কট্টর টোরি।

> "পরবর্তীকালে কৈলাসচন্দ্র আর এভাবে কলম ধরেন নি—অন্তত আমরা আর কোনো প্রমাণ পাই নি তার। পরে তিনি কটকের উপ-জেলা-সমাহর্তাও হয়েছিলেন পক্ষান্তরে। তবুও রায়বাগানের দত্ত পরিবারের যে সাহিত্যিক খ্যাতি উত্তরকালে বিশ্ববন্দিত হয়েছিল তার মুখপাত্র তিনি এইভাবে ঘটিয়ে যান এটাও কম উল্লেখযোগ্য নয়। প্রত্যক্ষে, পরোক্ষে মাতৃভূমির প্রতি যে ভালবাসা এই পরিবারের সাহিত্যধারায় সদাপ্রবাহমান, তার আদি পুরুষ তিনিই।...
>
> উত্তরকালে রায়বাহাদুর খেতাবধারী শশীচন্দ্র তাঁর গল্পটি লিখে জ্ঞাতি ভ্রাতার মতো বিপন্ন হন নি অবশ্যই। তবে সাময়িক পত্র থেকে সংকলন করে যখন তিনি এটিকে গ্রন্থে স্থান দিলেন, তখন তাঁর শ্রেণীধর্মের বশেই এটিকে নিছক কবি-কল্পনা বলে অভিহিত করে, সিপাহীযুদ্ধের অনেক আগেই যে এটি লিখিত হয়েছিল, অতএব এর মধ্যে বাস্তবিক পক্ষে কোনো বিপ্লবের চিন্তা নেই, এমন পাদটীকা দিয়ে আত্মরক্ষা করতে প্রয়াসী হয়েছেন তাঁর 'স্ট্রে লীভস্' গ্রন্থে।...
>
> এসব সত্ত্বেও একটা কথা স্মর্তব্য যে, সিপাহী বিদ্রোহের বেশ কিছুকাল আগে প্রকাশিত হলেও পরবর্তী সময়েও এই ধরনের বিপজ্জনক গল্পের বারবার প্রকাশনায় পিছু হটেন নি শশীচন্দ্র।..."

উনিশ শতকের ইংরেজি সাহিত্যে বিপ্লবী ভারতের চিত্রকল্প/পল্লব সেনগুপ্ত

এসব তথ্যের সঙ্গেই মনে রাখতে হবে কৈলাসচন্দ্র তাঁর জীবনের প্রথম গল্পটি লিখেছিলেন নিজের তাগিদে নয়, হিন্দু কলেজের পক্ষ থেকে চাপিয়ে দেওয়া একটি প্রতিযোগিতা উপলক্ষে। হিন্দু কলেজে বাৎসরিক রচনা প্রতিযোগিতার একটা ধারা অব্যাহত ছিল অনেক দিনই। ছিল বিতর্ক সভা, যেখানে বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে পাঠ করত ছাত্রেরা। ছাত্রদের মধ্যে মৌলিক চিন্তার বিকাশকে উৎসাহ জোগাতেই এই বিতর্ক সভার চলন। রাজনারায়ণ বসু তখন হিন্দু স্কুলের ছাত্র, যখন বিতর্ক সভায় পাঠ করার জন্যে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তার বিষয়— 'বিজ্ঞান সাহিত্য অপেক্ষা শ্রেয়ঃ কিনা'। আর এক বিতর্ক সভার জন্যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় আর মধুসূদন দত্ত। সেবারের বিষয় ছিল "শেকস্পীয়র এবং নিউটন— উভয়ের মধ্যে প্রতিভায় শ্রেষ্ঠ কে ?"

১৮৩৫-এ হিন্দু কলেজের ১৬ বছরের ছাত্র কৈলাসচন্দ্র যোগ দিয়েছিলেন ঐ রকমই একটা রচনা প্রতিযোগিতায়। বিষয় ছিল, 'শতবর্ষ পরে তোমার কল্পনার ভারতবর্ষ'। আর প্রতিযোগিতার গল্পটা লিখে প্রথম পুরস্কার পাওয়ার সম্মানটা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন তিনিই। ডিরোজিও তখন হিন্দু কলেজের শিক্ষক নন আর। বিতাড়িত হয়েছেন ৪ বছর আগেই। বিতাড়িত হওয়ার ৮ মাস পরেই প্রয়াত। কিন্তু ছাত্রসমাজের চেতনাস্তর থেকে ডিরোজিওর আদর্শ বা স্বপ্ন মুছে যেতে সময় লাগবে আরো অনেকগুলো বছর।

সিপাহী বিদ্রোহ চলার সময়েই কলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনা। বিদ্রোহের উদবেগে বন্ধ হল না তার গঠনের দৈনন্দিন কাজ। বরং কত দ্রুত এটা গড়ে তোলা যায় সেদিকেই সরকারের নিবিষ্ট মনোযোগ।

কলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠার সময়কার এক টুকরো ছবি আমরা পেয়ে যাই শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্কিম জীবনী'-তে।

> "তখন কলিকাতার অবস্থা ভয়ানক। বিদ্রোহানল চারিদিকে প্রজ্বলিত। ইংরাজের সিংহাসন প্রবল জনস্রোতে জীর্ণ তরীর ন্যায় কাঁপিতেছে। ইংরাজের শিশু ও রমণীরা, বাঙালীর প্রৌঢ় ও বৃদ্ধেরা, ইংরাজের দুর্গ ও জাহাজে আশ্রয় অন্বেষণ করিতেছে। ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব আলিপুব ছাড়িয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছেন। গভর্ণর জেনারেল ক্যানিং নেটিভ গার্ড তাড়াইয়া দিয়া তাঁহার প্রাসাদ দুর্গে পরিণত করিয়াছেন। ভলাণ্টিয়ারদল চারিদিকে সজ্জিত হইতেছে। কোম্পানীর কাগজের দর অসম্ভাবিতরূপে নামিয়া গিয়াছে। কাজকর্ম বন্ধ। দস্যু তস্কর মাথা তুলিয়াছে। কলকাতাবাসীরা ভীত, ত্রস্ত ; যে পারিতেছে, পলাইতেছে।"

এখানে কাজ-কর্ম বন্ধের উল্লেখ থাকলেও দেখা যাবে, বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার কাজে বিরতি ঘটছে না একদিনও। বিশ্ববিদ্যালয় গড়াটাকে থামিয়ে দিয়ে দেশীয় নাগরিকদের তো ধমকানো যেত এই সুযোগে যে, বিদ্রোহ চললে বন্ধ করে দেওয়া হবে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার কাজ। আসলে ঘটছিল এর উলটোটাই। উচ্চশিক্ষা বিস্তারের জন্যে অধিকতর মনোযোগ উপুড় করে দিতে চাইছিলেন সরকারি মহল। শাসকগোষ্ঠীর মগজে তখন ডুমুরগুচ্ছের মতো থোকা থোকা ফলতে শুরু করেছে এই রকম একটা অখণ্ড বিশ্বাস যে, ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষার বীজ বপন মানেই ইংরেজ প্রভুত্বের চাষের জমিটাকে অনাদি কাল পর্যন্ত সুজলা-সুফলারূপে নিজেদের অধিকারে রাখা। এমন গোপন অভিপ্রায় কেউ কেউ বলেও ফেলেছেন প্রকাশ্য সভায়।

১৯৬০-এর সমাবর্তন উৎসবের ভাষণে ভাইস চ্যান্সেলার উইলিয়ম রিচি-র মুখে অভ্রান্ত প্রত্যয়—

> "Educate your people from Cape Comorin to the Himalayas, and a second mutiny of 1857.. will be impossible."

ছোটোলাট হ্যালিডেও একই ধারণার পরিপোষক। কারণ, তিনি কলকাতা শহরে এমন একজনও উচ্চশিক্ষিত দেখেন নি, যিনি সিপাহী বিদ্রোহের সম্পর্কে সামান্যতম সহানুভূতিশীল।

এই বছরে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হলেন সত্যেন্দ্রনাথ ও গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এশিয়াটিক সোসাইটির অবৈতনিক যুগ্ম সম্পাদক হলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

বেরলো ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'।

প্রখ্যাত পাঁচালিকার দাশরথি রায়ের মৃত্যু।

খ্যাতনামা জীবনীকার মাইকেল মধুসূদনের অন্যতম চরিতকার যোগীন্দ্রনাথ বসুর জন্ম চব্বিশ

পরগনার নিতাড়া গ্রামে।

বঙ্গবাসী পত্রিকার লেখক, 'মেঘনাদবধ কাব্য'-র পরিমার্জিত সংস্করণের সম্পাদক দীননাথ সান্যালের জন্ম নদীয়ার কৃষ্ণনগরে।

ঢাকা থেকে স্বগ্রাম খুলনা জেলার সেনহাটিতে ফিরে এলে ঢাকার মানিকগঞ্জের উমাশঙ্কর সেন-এর ১২বছরের মেয়ে অমৃতময়ীর সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের বিয়ে।

ঢাকা 'মনোরঞ্জিকা সভা'-র মুখপত্র হয়ে বেরলো 'মনোরঞ্জিকা' নামের মাসিক পত্র। সম্পাদক, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। বিদ্যাসাগরের সম্পাদনায় বেরলো 'শিশুপাল বধ'।

বেরলো দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 'রোম সাম্রাজ্যের ইতিহাস', বিজ্ঞাপন—

> "প্রায় চারি বৎসর অতীত হইল, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে রোম সাম্রাজ্যের ইতিহাস লিখিতে কহেন এবং লিয়োনার্ড স্মিট্জ মহোদয়ের কৃত একখানি রোমের ইতিহাস পুস্তক দেন। আমি সেই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক লিখিয়াছি। স্থানে স্থানে টমাস আর্নল্ড মহোদয়ের কৃত রোমীয় ইতিহাস হইতে কোন কোন বিষয় গ্রহণ করা গিয়াছে।"

এই বছরেই বেরবে দ্বারকানাথের 'গ্রীসদেশের ইতিহাস'। সেও বিদ্যাসাগরের অনুরোধে-উৎসাহে।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। সম্ভবত এই বছরেই বেরবে তাঁর 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ'। ১৬-১৭ বছর বয়স তখন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'-র সমালোচনায় লিখলেন—

> "এতদ্দেশীয় উপন্যাস সকলেরই এক ধারা; সকলেই 'এক রাজা ছিলেন তাঁহার সো দো দুই রাণী' এইরূপ বান্ধা ধরনে আরম্ভ হইয়া থাকে ; এই উপন্যাস তদ্রূপ নহে, এবং গল্পটিও তাদৃশ নিন্দনীয় বোধ হয় না।"

অক্ষয়চন্দ্র সরকারের মুগ্ধতা—

> "আমি বালককালে এই গ্রন্থের ভাষায় যে কেবল মুগ্ধ হইলাম এমন নহে, ইহার ভাবেও আকৃষ্ট হইলাম। আর উহার গল্প বড়ই ভাল লাগিয়াছিল।... আমি চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত সুবোধিনী পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ছিলাম। তাহাতে 'ভারতবর্ষীয় কুটীর' নাম দিয়া একটি গল্প খণ্ডক বাহির হইত।... এ পুস্তকে পড়িলাম দুরাকাঙ্ক্ষ যখন মান্দ্রাজ, মহীশূর মালব উলটপালট করিয়া সেই বটতলে উপস্থিত হইলেন, তখন পড়িয়ার সহধর্মিণী মরিয়াছে, কন্যা যুবতী হইয়াছে, দুইটি বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্নরূপে প্রকাশিত গল্পের এইরূপ অপূর্ব্ব মিল দেখিয়া, আমার বালক মনে বড়ই আনন্দ হইল। ভারতবর্ষীয় কুটীরে ও দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা কেন যে মিল হইল, এখন তাহা জানি। দুইখানিই ইংরাজী রোমান্স অফ হিসট্রি হইতে সংকলিত।"

স্বদেশে চলে গেলেন খ্যাতনামা অধ্যাপক ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন।

প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে সিনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষা দিয়ে চতুর্থ স্থান পেলেন কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃত্তি দুবছরের জন্যে মাসে ২৫ টাকা করে। বেরলো হেমচন্দ্রের 'লাইফ অফ শ্রীকৃষ্ণ'।

> "১৮৫৭ কেশবচন্দ্র হিন্দু কলেজে একটি তর্কসভার প্রতিষ্ঠা করেন। কেশবচন্দ্র এই সভার সম্পাদক ছিলেন।... হেমচন্দ্রও এই সভায় 'শ্রীকৃষ্ণের জীবনচরিত' বিষয়ক একটি ইংরাজী প্রস্তাব পাঠ করিয়াছিলেন। প্রবন্ধটি এত সুন্দর হইয়াছিল যে রেভারেণ্ড লঙ উহা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। 'বেঙ্গল হরকরা'-র তৎকালীন সম্পাদক মিষ্টার

ফর্বস উচ্চকণ্ঠে এই প্রবন্ধের প্রশংসা করেন এবং খ্রীস্ট ও কৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশের সৌসাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়া একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন।"

হেমচন্দ্র / মন্মথনাথ ঘোষ

"With the aid of these gentlemen (Dall and Long), and with some of his friends, Keshub established about this time a Literary Society, called the British India Society, with the somewhat pompous object of 'the cultivation of literature and science."

কেশবচন্দ্র সেন /
প্রতাপচন্দ্র মজুমদার

এই বছরের মাঝামাঝি সময়ে দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা বর্ণকুমারী দেবীর জন্ম। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরও জীবিত ছিলেন তিনি।

কবি প্রসন্নময়ী দেবীর জন্ম পাবনায়। বাবা, দুর্গাদাস চৌধুরী। স্বামী, কৃষ্ণকুমার বাগচী। ভাই, আশুতোষ, কুমুদনাথ, প্রমথ ও জ্যোতিষ চৌধুরী। কবি প্রিয়ংবদা দেবীর মা।

নিজের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে প্রসাদদাস মল্লিক, বন্ধু গোষ্ঠবিহারী মল্লিকের সঙ্গে, প্রতিষ্ঠা করলেন 'গার্হস্থ্য সাহিত্য সমাজ'। অধিবেশন বসত মাসে একবার। প্রবন্ধ পড়া হত ইংরেজি আর বাংলা দুটো ভাষাতেই। বছরে একবার পুরস্কার দেওয়া হত নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রবন্ধের জন্যে। পরে সে-সব প্রবন্ধকে পুস্তিকার আকারে ছাপিয়ে বিনা পয়সায় বিলি করা হত জনসাধারণের মধ্যে। সভার আরো একটা কাজ ছিল দেশের বিশিষ্ট মানুষদের আমন্ত্রণ ও অভিনন্দন জানানো।

কেন সিপাহী বিদ্রোহ তার প্রকৃত কারণ দেখিয়ে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বের করলেন 'Causes of Mutiny by a Hindu of Bengal' নামের পুস্তিকা। ঐ রকম উত্তপ্ত সময়ে এই জাতীয় বই কলকাতা থেকে বের করা উচিত হবে না ভেবেই পুস্তিকাটি ছাপানো হয় বিলেতের স্টানফোর্ড কোম্পানি থেকে। ভূমিকা লিখে দেন মাদ্রাজের প্রাক্তন বিচারপতি ম্যালকম লিউসন। ভারতবর্ষে হিন্দু আর খৃস্টানদের মধ্যে মোকদ্দমা হলে বিচারে পক্ষপাতিত্ব করা হয় খৃস্টানদের দিকে, এই মন্তব্য করার অপরাধে বিচারপতির পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। স্টানফোর্ড-এ ছাপা আর বিশুদ্ধতম ইংরেজি দেখে লোকের ধারণা হয়, এর আসল লেখক নিশ্চয়ই সেই ম্যালকম লিউসন।

বেথুন সোসাইটির পা পড়ল ৬ বছরে। সভাপতির পদে, জেমস্ হিউম। আর ডা. নর্ম্যান বেভার্স অন্যতম সহকারী সভাপতি। এ বছরে বেরবে সোসাইটির তৃতীয় আর চতুর্থ প্রবন্ধের বই। তৃতীয় প্রবন্ধের বইয়ে ছিল পাদ্রী ড্যালের—'অন দি টেমপারেন্স মুভমেণ্ট ইন মডার্ন টাইমস', আর কৈলাসচন্দ্র বসুর 'অন দি এডুকেশন অব হিন্দু ফিমেলস, হাউ বেস্ট অ্যাচিভড আণ্ডার প্রেজেণ্ট স্টেট অব নেটিভ সোসাইটি'। চতুর্থ বইয়ে জেমস হিউমের সভাপতির ভাষণ, আর জর্জ স্মিথের 'অন দি মর‍্যাল স্পিরিট অব আর্লি গ্রীক পোয়েট্রি' আর জর্জ ইভান্‌সের 'অন কেমিস্ট্রি অ্যাপ্লায়েড টু এগ্রিকালচার'। যদিও শহরে সিপাহী বিদ্রোহজনিত উদ্‌বেগ-উত্তেজনা, তবুও এ বছরে সোসাইটিতে নতুন সদস্য হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন ৪১ জন। এঁদের মধ্যে ভারতীয় ২৫, য়ুরোপীয় ১৬।

সোসাইটির সাংবৎসরিক বিবরণে উল্লেখ করা হয়েছিল একটি সভার, যা গড়ে উঠেছে এই সোসাইটিরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে। সাহিত্য আর বিজ্ঞান ঐ নতুন সভার বিশেষ আলোচনার বিষয়।

"সম্পাদক এই সভার নাম উক্ত বিবরণে উল্লেখ না করিলেও ইহা যে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি' নামে অভিহিত হয় তাহা বুঝা যায়। প্রতি মাসে এই সোসাইটির অধিবেশন হইত। ...পাদ্রী সি. এইচ. এ. ড্যাল এবং পাদ্রী জেমস লঙ এই সভার অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া ছাত্রদের উৎসাহ দান করিতেন, নিজেরা নিয়মিতভাবে আলোচনায় যোগ দিতেন। এই সভার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন পরবর্তীকালের বিখ্যাত ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেন, সভার সভাপতি, প্রেসিডেন্সি কলেজের বিজ্ঞানাধ্যাপক এইচ. হেলিউর।"

বেথুন সোসাইটি/যোগেশচন্দ্র বাগল

প্রবন্ধ পাঠ ছাড়া এ বছর সোসাইটির সম্পাদক জেমস হিউম শেকসপিয়র-এর নাটক থেকে পাঠ করেছিলেন ১৮, ২০ মার্চ আর ১৩ আগস্ট। মাসিক অধিবেশনগুলোয় পড়া হয়েছিল মোট সাতটা প্রবন্ধ।

জানুয়ারি

প্রেসিডেন্সি কলেজের বিল্ডিং কমিটির প্রেসিডেন্ট মেজর বেল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রভিশনাল কমিটি'-র কাছে জানতে চাইলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে তাঁদের দরকার ঠিক কী ধরনের অ্যাকোমোডেশন।

৩ জানুয়ারি

প্রথম বসল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভা, যদিও তখনো বিশ্ববিদ্যালয়-আইনে স্বাক্ষর পড়ে নি গভর্নর জেনারেলের। সভায় হাজির ছিলেন ভাইস-চ্যান্সেলর সিসিল বিডন ছাড়াও আরও ২২ জন সদস্য। ঐ সভাতেই প্রেসিডেন্সি কলেজের 'প্রফেসর অব জুরিসপ্রুডেন্স' কর্নেল ডাবলিউ. গ্রাপেলকে দু বছরের জন্যে মনোনীত করা হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার হিসেবে। সেনেটকে ভাগ করে দেওয়া হল চারটে ফ্যাকালটিতে। আর্টস, ল, মেডিসিন আর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং।

১৫ জানুয়ারি

'সংবাদ প্রভাকর' জানাল নন্দকুমার রায়-এর লেখা 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নাটক নিয়ে বাবু আশুতোষ দেব-এর বাড়িতে 'জ্ঞানপ্রদায়িনী সভা'-র সভ্যেরা মহড়া দিয়ে চলেছে অভিনয়ের।

"কৃতকার্য হইতে পারিলে উত্তম বটে, বহু দিবস আমাদিগের কলিকাতায় বাঙ্গালা নাটকের অনুরূপ হয় নাই...।"

২১ জানুয়ারি

আশুতোষ দেব বা সাতুবাবুর মৃত্যু।

২২ জানুয়ারি

'ইংলিশম্যান' লিখলে—দমদম আর ব্যারাকপুরের সিপাহীদের গুজব ছড়িয়েছে যে তাদের খৃস্টান করা হবে।

২৪ জানুয়ারি
আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

২৭ জানুয়ারি
'সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ সমিতি'র অধিবেশনে সভাপতি রাজেন্দ্রলাল মিত্র। তাঁর প্রস্তাব —বহুবিবাহ নিবারণের জন্যে আইন বিধিবদ্ধ করা উচিত, যাতে বহুবিবাহকারী কুলীন ব্রাহ্মণেরা তাঁদের বিবাহিতা স্ত্রীদের ভরণপোষণ দিতে আইনত বাধ্য হয়।

৩০ জানুয়ারি
সরস্বতী পুজো উপলক্ষে আশুতোষ দেব-এর বাড়িতে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা'-র অভিনয়। কারো কারো ধারণা এদেশে প্রথম অভিনীত বাংলা নাটক এটাই। কিন্তু শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'-এ জানিয়েছেন অন্য মত।

> "দেশীয় ভদ্রলোকদিগের মধ্যে ইংরাজী অভিনয়ের আদর দেখিয়া ১৮৫৪ সালে ইংরাজদিগের রঙ্গালয়ের লোকেরা উদ্যোগী হইয়া ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী ভবনে 'ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার' নামে এক শাখা রঙ্গালয় স্থাপন পূর্ব্বক শেক্সপীয়রের নাটক সকলের অভিনয় আরম্ভ করিলেন। তাহাতে দেশীয় শিক্ষিত সমাজে ইংরাজী অভিনয়ের ধূম লাগিয়া গেল। রঙ্গালয়ের অভিনয় একটা বাতিকের মধ্যে দাঁড়াইল। স্কুলে ছেলে ছোকরারা স্বীয় স্বীয় দলে ছোট ছোটরকমে ম্যাকবেথ প্রভৃতির অভিনয় আরম্ভ করিল। ক্রমে ধনীগণ অনুভব করিলেন যে ইংরাজী নাটক অভিনয় করিলে সাধারণের প্রীতিকর হয় না। এই জন্য বাঙ্গালা নাটকের অভিনয়ের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িল। এই সময়ে সংস্কৃত কলেজের অন্যতম অধ্যাপক রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় কোনও ধনী-প্রদত্ত পারিতোষিক লাভের উদ্দেশে 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নামক এক নাটক রচনা করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের প্ররোচনায় ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারে একবার তাহার অভিনয় হয়। ইহাতেই দেশীয় নাটক অভিনয়ের দ্বার খুলিয়া গেল। তৎপরে ১৮৫৭ সালে সিম্‌লীয়ার বিখ্যাত ধনী আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু) উদ্যোগী হইয়া শকুন্তলাকে বাঙ্গালা নাটকাকারে পরিণত করিয়া অভিনয় করাইলেন।"

এই বছর সবচেয়ে স্মরণীয় করে তুলবে প্রধানত তিনটে ঘটনা। মহাবিদ্রোহ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনা, আর বাংলা ভাষায় নাট্যচর্চার বিকাশ। প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর 'Bengali Drama and Stage'-এ ১৮৫৭-কে সম্মান জানিয়েছেন নাটক ও অভিনয়ের জন্মবছর হিসেবে।

> "The year 1857 marks the beginning of a new epoch in the history of Bengali drama and the theatre. In fact. Bengal Drama and the stage have had a continuous history since that memorable year."

ফেব্রুয়ারি
বিদ্রোহ ঘোষণা করল বহরমপুরের সিপাইরা।

> "এই সংবাদ শোনামাত্র বহু সহস্র স্থানীয় কৃষক বিদ্রোহী সিপাহীদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য বহরমপুরে সমবেত হয়েছিল, তারা অন্য কোন নেতৃত্বের সন্ধান না পেয়ে স্বাধীন বাংলার নবাবের বংশধর বহরমপুরবাসী ফেরেদুন খাঁ-এর কাছে নির্দেশ প্রার্থনা করেছিল— তাঁর আদেশ পেলেই হাজার হাজার মানুষ বিদ্রোহে ঝাঁপিয়ে পড়ত। বাংলার মানুষের দুর্ভাগ্য, এমন কোনো আদেশ ফেরেদুন খাঁর মুখ দিয়ে বার হয় নি। কে. সাহেব

তাঁর সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে যথার্থই লিখেছেন 'এটা সহজেই বুঝতে পারা যায়, যদি বহরমপুরের সিপাহীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করত এবং মুর্শিদাবাদের জনসাধারণ নবাবকে সামনে রেখে সিপাহীদের সঙ্গে মিলিত হত, তাহলে সমগ্র বাংলাদেশে দেখতে না দেখতে আগুন জ্বলে উঠত।' আরও একটি কথা মনে রাখতে হবে—বাংলাদেশে সিপাহীদের বিশেষ কোনো গণসংযোগ ছিল না—ভিন্ন প্রদেশবাসী এইসব মানুষের সঙ্গে সেই কারণে বাংলার মানুষ একাত্মতা অনুভব করে নি। এরই জন্যে চট্টগ্রামের সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করলেও জনসাধারণের সহযোগিতার অভাবে ইংরেজ সহজেই তাদের দমন করে।"

গণ অসন্তোষ ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ / স্বপন বসু

৫ ফেব্রুয়ারি

'হিন্দু পেট্রিয়ট' জানাল, এনফিল্ড রাইফেলে দাঁত দিয়ে কেটে টোটা ব্যবহারের আদেশে বিক্ষোভ জমে উঠেছে ব্যারাকপুর সেনানিবাসের হিন্দু-মুসলমান সিপাহীদের মধ্যে। তাঁদের ধারণা, এই মোড়ক গোরু আর শুকরের চর্বি দিয়ে তৈরি। হরিশচন্দ্রের সতর্কবাণী— দমননীতি দিয়ে এই ক্রমবর্ধমান অসন্তোষকে বিনষ্ট করা যাবে না।

৭ ফেব্রুয়ারি

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রভিনশিয়াল কমিটি'র- মিটিঙে কোন্ কোন কলেজকে অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে আর অনুমোদন দিতে গেলে কলেজ সম্পর্কে কোন্ কোন্ তথ্য পেশ করতে হবে, তা নিয়ে আলোচনা।

৯ ফেব্রুয়ারি

'সমাচার চন্দ্রিকায় 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নাটকাভিনয়ের আলোচনা।

"...প্রতি বৎসর প্রসিদ্ধ ইংরেজী কবি সেকস্পিয়র নাট্যক্রীড়া ইস্কুলের ছাত্রেরা প্রায় করিয়া থাকেন কিন্তু কেহ এরূপ বাঙ্গালায় নাট্যক্রীড়ার চেষ্টা করেন নাই, সাহেবেরা কি কখন বাঙ্গালা বা সংস্কৃত সুমধুর রস পূরিত নাটকের ক্রীড়া করিয়া থাকেন, তবে বাঙ্গালি বাবুরা স্বজাতীয় ভাষায় নাট্যক্রীড়া করিয়া কেন ইংরেজদিগের অনুগামী হন না, ইহাতে এই উপলব্ধি হয় ইয়ং বাঙ্গালবাবু সাহেবেরা নিশ্চয় করিয়াছেন আমাদিগের বাঙ্গালীর কোন শাস্ত্রাদিতে পারমার্থিক রস ঘটিত কিছু নাই যাহা আছে ইংরেজীতেই আছে ডুমুরের মধ্যস্থ কীটের পক্ষে ডুমুরই ব্রহ্মাণ্ড তদ্রূপ ইয়ং ব্যাঙ্গল বাবুদিগের ইংরেজীই সর্ব্ব বিদ্যা, অতএব বিশিষ্ট শিষ্ট হিন্দু সন্তানেরা যদ্যপি কিঞ্চিৎ নিবিষ্ট হইয়া সংস্কৃত শাস্ত্রের অন্তর্গত নাটকাদি অনুপম শাস্ত্র দৃষ্টি করেন তাহার কি পর্যন্ত রসমাধুর্য আস্বাদে আশ্চর্য হইবেন অতএব আমরা বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষকে ধন্যবাদ করিতেছি যে স্বজাতীয় আমোদে রসাস্বাদন গৃহীতা হইয়াছেন।"

১৫ ফেব্রুয়ারি

'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এ 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নাটকাভিনয়ের আলোচনা—

"...বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেল। নাট্যশালা বলিয়া আমাদের যে একটা জিনিষ ছিল, তাহাও আমরা ভুলিয়া গেলাম। এমন সময়ে একটি নিমন্ত্রণপত্র পাইয়া আমরা

জানিতে পারিলাম যে, পূর্ববর্ত্তী নাট্যশালার ভস্মাবশেষের উপর ফিনিক্স পক্ষীর ন্যায় আর একটি বঙ্গীয় নাট্যশালা আবির্ভূত হইয়াছে। এই নিমন্ত্রণের মধ্যে আরও উৎসাহের বিষয়— যে নাটকটির অভিনয় হইবে, উহা একটি সত্যকার বাংলা নাটক— কালিদাসের বিখ্যাত নাটক শকুন্তলার বঙ্গানুবাদ। আর একটি কথা শুনিয়া আমরা আরও আনন্দিত হইলাম যে, এই নাট্যশালা পরলোকগত বাবু আশুতোষ দেবের দৌহিত্রগণের উৎসাহে ঐ লক্ষপতির বাড়িতেই প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। সম্ভ্রান্ত ও ধনী দেশীয় ভদ্রলোকেরা বিশুদ্ধ আমোদের-জন্য অর্থব্যয় সচরাচর করেন না। এই কারণে, আমাদের সম্ভ্রান্ত যুবকগণ সাধারণতঃ যে-সকল নীচ আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকেন, তাহা হইতে তাঁহাদিগকে মুক্ত দেখিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম।...”

২২ ফেব্রুয়ারি

আশুতোষ দেব-এর বাড়িতে ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলা’ নাটকের দ্বিতীযবারের অভিনয়।

২৪ ফেব্রুয়ারি

‘গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য’ নামে খ্যাত সাংবাদিক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ নিজের পরিচালনায় বের করলেন। ‘হিন্দুরত্নকমলাকর’ নামের সাপ্তাহিক পত্রিকা। প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়—

> “সর্বসাধারণ হিন্দুগণ প্রতি আবেদন। —ধর্মপরায়ণ হিন্দুমহাশয় গণ এই বিজ্ঞাপনে দৃষ্টি রোপন করুন, উপস্থিত কাল কালরূপে উপস্থিত হইয়াছে, এই বিশাল কাল ধর্ম গ্রাসে কাল বেশ ধারন করিয়াছে। কাল ভয়ে হিন্দু জাতির ধর্মদেহে শিরঃ কম্পন হইতেছে। কাল বলে বিজাতীয় ধর্মপাল ভূপালগণ হিন্দু রাজ্যে রাজ্যেশ্বর হইয়াছেন, তাঁহারা হিন্দু ধর্মের অনুকূল নহেন, প্রতিকূল হইয়া হিন্দুকুলকে ব্যাকুল করিতেছেন, হিন্দু ধর্মের বিনাশার্থ নাস্তিকতার স্বস্ত্যয়ন করেন। ইহাতে হিন্দুধর্ম দুর্ব্বলভাবে পলায়নপর হইয়াছেন, শান্ত স্বভাব হিন্দুগণ রাজাজ্ঞা পরিহেলন করিতে পারেন না, হিন্দু ধর্মের দুর্বলতায় কেবল মনোব্যাথায় কাল বিলম্ব করিতেছে। এমন ঘোরতর ভয়ানক সময়ে একখানি সমাচার পত্র দেখিতে পাই না হিন্দু ধর্ম পক্ষে একটি কথা কহিয়া উপকাব করে, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মান্যবর হিন্দু মহাশয়দিগের উপদেশ ক্রমে আমরা ‘হিন্দুরত্নমালাকর’ প্রকাশ করিলাম, এই পত্র হিন্দু ধর্ম পক্ষের পক্ষ রক্ষার অস্ত্র স্বরূপ হইল, সর্বসাধারণ হিন্দু মহাশয়গণ এই অস্ত্রকে ব্রহ্মাস্ত্র জ্ঞানে রক্ষা করন।...”

তাঁর ‘বঙ্কিম সমীক্ষা’-য় অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় খুঁজে পেয়েছেন সিপাহী বিদ্রোহের সূচনাপর্বকে, এই পত্রিকা প্রকাশের আছে হিসেবে। তাঁর ধারনায়। গৌরীশঙ্কর-এর এই উদ্যমের পিছনে ছিল রক্ষণশীল বাঙালী সমাজের সমর্থন। আর চর্বি-মাখানো কার্তুজ প্রচলনের মধ্যেই তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন হিন্দু-সমাজ ধ্বংসের আর-এক স্বস্ত্যয়ন, সতীদাহ দিবারথের আন্দোলনে যে-স্বস্ত্যয়নের সূচনা।

২৬ ফেব্রুয়ারি

‘সংবাদ প্রভাকর’-এ ২২ তারিখের ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলা’ নাটকাভিনয়ের আলোচনা—

> “...প্রায় ৪০০ শত ভদ্রলোক বিবিধ প্রকার বিচিত্র পরিচ্ছদে পরিবৃত হইয়া সভার শোভা অতিশয় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, সম্ভ্রান্ত ভদ্র কুলোদ্ভব বালকগণ নট-নটীরূপ ধারণপূর্ব্বক নাটকের বিচিত্র রচনাক্রমে রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইয়া আপনাপন বক্তৃতা

ও শরীরের ভঙ্গি অতি উত্তমরূপে প্রকাশ করাতে দর্শক মাত্রেই পরম পুলকিত হইয়া সাধুবাদ করিয়াছেন, ...অধুনা ভদ্রকুল প্রসূত বিদ্যানুরাগি ছাত্রগণ এই মহদ্দৃষ্টান্তের অনুগামি হইয়া যদ্যপি সংস্কৃত কবিগণ কৃত নাটকের পুনরুদ্ধার করেন তবে পরমোপকার হয়।"

মার্চ

এই মাসের প্রথম সপ্তাহে চড়কডাঙা রোডের রামজয় বসাকের বাড়িতে অভিনীত হল রামনারায়ণ তর্করত্ন-র 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নাটক। বাংলা থিয়েটারে এই প্রথম সামাজিক নাটকের অভিনয়।

৯ মার্চ

কান্দীতে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মৃত্যু।

২০ মার্চ

'ফিনিক্স' পত্রিকায় যখন এই উল্লাস যে, 'দি সিপাই মিউটিনী ইজ অ্যাট অ্যান এন্ড', তার পরেই ব্যারাকপুরের বিদ্রোহের শুরু।

এপ্রিল

সংস্কৃত কলেজে এনট্রান্স পরীক্ষা দিলেন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য।

২ এপ্রিল

'হিন্দু পেট্রিয়ট' তার সম্পাদকীয়তে জানালে বন্দুকের টোটা থেকে ধর্মনাশের আশঙ্কা নয়, এই অসন্তোষের পিছনে রয়েছে অন্য কোনো গভীরতর কারণ।

৬ এপ্রিল

টাউন হলে জনসভা। দেশের প্রধান নাগরিকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন জর্জ টমসন, জেমস হিউস, রেভারেন্ড লঙ প্রমুখ ভারতবন্ধুরাও। অনিবার্য কারণে রাধাকান্ত দেব হাজির হতে না পারায় সভাপতি রাজা কালীকৃষ্ণ দেব। বক্তাদের মধ্যে প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীলাল মিত্র, দিগম্বর মিত্র আর রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে মনে রেখে পরের দিন ইংলিশম্যান লিখেছিল—'Four Mitras have own the day.' সেদিনের সভায় বিলেতের কোর্ট অব ডাইরেকটার্সকে পাঠানোর জন্যে গৃহীত হয় একটা আবেদনপত্র। পরে এই আবেদনপত্রে সই করেন ১৮০০ জন। সে আবেদনপত্র বিলেতে পাঠাতে দেরি হয়ে গেল সিপাহী বিদ্রোহের নতুন পরিস্থিতির ফলে। পাঠানো হবে নভেম্বর মাসে। সভার কারণ—

"অনেক দিন হইতেই ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ এবং হাইকোর্টের জজগণ অনুভব করিয়া আসিতেছিলেন যে, মফস্বলবাসী ইংরাজদিগকে সম্পূর্ণরূপে ফৌজদারি আদালতের অধীন না করিলে এদেশীয় গরিব প্রজাদিগের উপরে তাঁহাদের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতে পারা যাইবে না। ১৮৫৬ সালের মধ্যে নীলকরদিগের অত্যাচারের কথা কর্ত্তৃপক্ষের ও কলিকাতাবাসী ইংরেজগণের কর্ণগোচর হওয়াতে সেই মনের ভাব প্রবল হইয়া উঠে, তদনুসারে ১৮৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে কলিকাতা হাইকোর্টের চীফ জাস্টিস্ সুপ্রসিদ্ধ সার বার্ণেস পীকক গভর্ণর জেনারেলের মন্ত্রীসভাতে কোম্পানীর মফস্বলস্থ ফৌজদারি

আদালতের এলাকা বৰ্দ্ধিত করিবার ও ইংরাজগণেকে তদধীন করিবার উদ্দেশ্যে এক বিল উপস্থিত করেন। ইহাতে ইংরাজগণের মধ্যে আবার এক আন্দোলন উপস্থিত হয়। কিন্তু এবারে তাঁহারা কোম্পানীর আদালতের অধীন হইব না, এই রবটি না তুলিয়া, এদেশীয় বিচারকদিগের বিচারাধীন হইব না, এবং ইংরাজ জুরির সহায়তা ভিন্ন তাঁহাদের বিচার হইবে না, এই বাণী ধরিলেন।... ইংরাজদিগের চেম্বর অব কমার্স, ট্রেডস এসোসিয়েশন, ইণ্ডিগো প্লান্টার্স এসোসিয়েশন প্রভৃতি সমুদয় সভা এই আন্দোলনে যোগ দিয়া টাউন হলে এক প্রকাণ্ড সভা করিলেন।"

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ

এদিনের সভায় পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের প্রথম প্রস্তাব ছিল

"এই সভার সতর্কবিচারে ন্যায় এবং বিশুদ্ধ নীতি অনুসারে, তথা দেশের পরিবর্ত্তিত অবস্থায় ইহা বাঞ্ছনীয় যে, মহারাণীর ভারত-সাম্রাজ্যের মধ্যে মহারাণীর সৰ্ব্বজাতীয় প্রজা ফৌজদারী মোকদ্দমায় যে কোনও দোষের জন্য অভিযুক্ত হউন না, একই বিধি দ্বারা, একই বিচারকগণ কর্তৃক বিচারিত হইবেন এবং কোন সম্প্রদায়ের ব্যক্তি জন্মস্থান, ধর্ম অথবা লৌকিক অবস্থার নিমিত্ত অন্যান্য প্রজাবৃন্দ হইতে বিশেষ সর্ত্ত বা অপ্রকাশ্য সুবিধা দ্বারা রাজবিধির নিকট ভিন্নভাবে দৃষ্ট হইবেন না। অতএব এই সভা আন্তরিক আশা করেন যে, মহারাণীর কোনও শ্রেণীর প্রজা মফঃস্বলস্থ বিচারালয়ের অধিকার বহির্ভূত হইবেন না—এই নীতি ব্যবস্থাপক সভার আলোচনাধীন ফৌজদারী বিধির মধ্যে সম্পূর্ণভাবে সন্নিবিষ্ট হইবে।"

৮ এপ্রিল

ব্যারাকপুর কোর্টের সামনে দিয়ে চলে গেছে যে প্যারেড রোড, তা ধরে আধমাইল এগোলেই দূরে রেল লাইনের পাশে একটা অশত্থ গাছ, বহুদিনের প্রাচীন। সকাল ১০টায় এই গাছেই মঙ্গলপাণ্ডের ফাঁসি। মরেও বেঁচে রইলেন মঙ্গল পাণ্ডে। বাঁচাল তার ঘাতকরাই। তারাই এরপর বিদ্রোহী সিপাইদের নাম দিয়েছিল 'পাণ্ডিয়া'।

৯ এপ্রিল

বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করতেই ১৯ নং পদাতিক বাহিনী ভেঙে দেওয়া হয়। এই তারিখে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লিখলে, এতে সিপাহীদের মনে আনুগত্য এবং আস্থা ফিরিয়ে আনা যাবে না। সমস্ত বারুদ তাদের চোখের সামনে পুড়িয়ে ফেললেও দূর হবে না তাদের অসন্তোষ। তাদের মনের অনেক গভীরে গেঁথে গেছে অসন্তোষের কারণ।

টাউন হলে কালা-কানুন-এর সমর্থনে কলকাতার নাগরিকদের সভা। এই সভাতেই জর্জ টমসন-এর শেষ উপস্থিতি। সিপাহী বিদ্রোহ শুরুর আগেই তিনি কলকাতা ছেড়ে চলে যান স্বদেশে।

১০ এপ্রিল

ঈশ্বরী পাণ্ডের বিচার শুরু। সে মাঁলে পাণ্ডের লোক, তাই তাকে গ্রেপ্তার করে নি সে, এই অপরাধে।

১১ এপ্রিল

কালীপ্রসন্ন সিংহের উৎসাহে তাঁর বাড়িতেই বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চের উদবোধন। অভিনীত হল ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার' নাটকের রামনারায়ণ তর্করত্নের করা বাংলা অনুবাদ। কালীপ্রসন্ন নিজে অভিনয় করে প্রশংসা পেলেন প্রচুর। তার ফলেই নিজের নাটক লেখার উৎসাহ।

১৩ এপ্রিল
সামরিক আদালতের বিচারে ঈশ্বরী পাণ্ডের বিরুদ্ধে রায়, মৃত্যুদণ্ড

১৫ এপ্রিল
সংবাদ প্রভাকর-এ 'বেণীসংহার' নাটকাভিনয়ের আলোচনা—

"যুগলসেতু নিবাসী সিংহবাবুদিগের ভবনে গত শনিবার (১১ এপ্রিল) সন্ধ্যার পর মহাসমারোহে নাট্যক্রীড়া হইয়াছিল, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যার আরথার বুলার সাহেব, ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারী মেং সিসিল বিডন সাহেব প্রভৃতি ৫।৭ জন প্রধান ইংরেজ এবং নগরীর অনেক আঢ্য মহাশয়েরা ঐ নাট্যক্রীড়া দর্শনে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই নাট্য কৌতুক দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং বাবুরা সাহেবদিগকে পানভোজনে পরিতোষ করিয়াছেন।"

'বিদ্যোৎসাহিনী' রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে প্রিয়রঞ্জন সেন-এর দেওয়া দুটি তথ্য—

১। "...the band from the Fort William served the Vidyotsahini as its orchestra".

২। "There are entrances and exits by a sudden pull at the screen."

Western Influense in Bengal Literature.

২১ এপ্রিল
ঈশ্বরী পাণ্ডের ফাঁসি।

১০ মে
মীরাটে জেল ভেঙে বিদ্রোহী সিপাহীরা মুক্ত করল বন্দী সিপাহীদের।

১৯ মে
মীরাটের সিপাহীরা অধিকার করল দিল্লি। দিল্লির সিপাহীরা যোগ দিল তাদের সঙ্গে।

২১ মে
'হিন্দু পেট্রিয়ট' লিখলে, তরবারি দিয়ে ইংরেজদের পক্ষে ভারত শাসন অসম্ভব। ভারত সরকারের পিছনে গণ-সমর্থনের কতখানি অভাব তা তো গত দুসপ্তাহের ঘটনাবলীতে প্রমাণ। এটা এখন আর 'মিউটিনী' নেই, এটা এখন 'রিবেলিয়েন' অর্থাৎ ব্যাপক বিদ্রোহ।

২২ মে
ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভায় বিদ্রোহী সিপাইদের কাজে অসন্তোষ প্রকাশ করে আনুগত্য জানানো হল সরকারকে। সভায় উপস্থিতদের কয়েকজন হলেন ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, রাধাকান্ত দেব, মহারাজ কালীকৃষ্ণ, প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রমুখ।

২৫ মে
হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজে রাজভক্ত হিন্দু-সম্প্রদায়ের আর-এক সভা। সভাপতি রাধাকান্ত দেব। উপস্থিতদের কয়েকজন, রাজা কমলকৃষ্ণ, রাজেন্দ্র দত্ত, হরচন্দ্র ঘোষ, কালীপ্রসন্ন সিংহ।

"সভায় একাধিক প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং এর অনুলিপি সরকারকে পাঠানো হয়। সরকারের পক্ষ থেকে এজন্য পরম সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে আবেদন আসতে থাকে। ঢাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়। ঢাকার খ্রীষ্টানরা ভলেণ্টিয়ার বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত করলে

দেশীয়রা আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। অনেক ধনাঢ্য বাঙালী এই সুযোগে রাজভক্তি প্রদর্শনের জন্যে উঠে পড়ে লাগল। কলকাতার মল্লিক পরিবারের কয়েকজন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের জন্য ঠাকুরবাড়িতে বিশেষ প্রার্থনার ব্যবস্থা করেন। শ্রীকৃষ্ণ সিংহ বিদ্রোহ দমনের জন্য সরকারকে একটা বিরাট হাতি উপহার দিলেন। যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যারা কলকাতায় আসছে তাদের সাহায্যের জন্যে একটা তহবিল খোলা হল। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, রমাপ্রসাদ রায় এর কমিটিতে রইলেন। গোরা সৈন্যদের থাকার ব্যবস্থা করার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা মাদ্রাসা প্রভৃতি বন্ধ করে দেওয়া হয়। সেপ্টেম্বর মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজ শ্রীকৃষ্ণ মল্লিকের প্রশস্ত বাড়িতে উঠে আসে। শ্যামাচরণ মল্লিক বিনা ভাড়ায় সরকারকে এই বাড়িটি কিছুদিনের জন্যে ছেড়ে দিয়ে কৃতার্থ হন। সংস্কৃত কলেজকে মিলিটারি হাসপাতালে পরিণত করা হয়। ধনী ব্যক্তিরা বাড়ি পাহারার জন্য গোরা প্রহরী নিযুক্ত করে। পাইকপাড়ার ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ও প্রতাপচন্দ্র সিংহ নিজেদের বাড়ির সামনের রাজপথে ৪০।৫০ জন বন্দুকধারী গোরা সমেত প্রায় হাজার দুই লোক মোতায়েন করেন।"

গণ অসন্তোষ ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ/স্বপন বসু

২৮ মে

কলকাতার আরমানি, ফরাসি আর ইংরেজ বণিকেরা এই সময়ে আবেদন জানাল লর্ড ক্যানিং-এর কাছে যে, কলকাতা বিপন্ন। একে রক্ষা করতে অনুমতি দেওয়া হোক রক্ষীবাহিনী বা ভলান্টিয়ার গার্ডস গড়ে তুলতে। হরিশচন্দ্র এই তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এ প্রশ্ন তুললেন 'we seriously ask, is Calcutta really in danger?' তাঁর আরো প্রশ্ন, যদি মাত্র দু হাজার সিপাই ভারতবর্ষের রাজধানীকে লুট করে, তলোয়ারের ভয় দেখিয়ে, বিনা বাধায় ঘরবাড়ি সব পুড়িয়ে ফেলতে পারে, তাহলে এই কাপুরুষ নগরীর বঙ্গোপসাগরের তলায় চলে যাওয়াটাই শ্রেয়।

২ জুন

'সংবাদ প্রভাকর'-এ খবর বেরলো, জনৈক সরকারি কর্মচারী রেলের কামরায় কয়েকজন সাহেবের কাছে বিদ্রোহী সিপাইদের পক্ষে অভিমত প্রকাশ করলে, সাহেবরা তাঁর রিপোর্ট পাঠায় সরকারেব কাছে। সরকাব তাঁকে 'বিলক্ষণ ভর্ৎসমা' করে ক্ষমা করার সময় ভবিষ্যতের জন্যে সতর্ক করে দেয়।

প্রভাকর-এর ঘটনায় আভাস মিলে যায় স্বাধীন মতামতের কণ্ঠরোধ করতে কী ধরনের ভয়াবহ আবহাওয়া তৈরি করে দিয়েছে তখন শাসকশক্তি। যিনি ভর্ৎসিত হলেন তিনি কে? সম্ভবত শিবচন্দ্র দেব। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'-এ তাঁর সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে এই রকমই ঘটনার।

> "১৮৫৭ সালে যখন সিপাহি বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তখন শিবচন্দ্রবাবুকে অকারণ একটু বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। সে সময়ে একদিন তিনি রেলগাড়িতে কলিকাতায় আসিতে-ছিলেন। সেই গাড়িতে কয়েকজন ইউরোপীয় ভদ্রলোক ছিলেন। কথা প্রসঙ্গে মিউটিনীর কথা উপস্থিত হয়। তখন শিবচন্দ্রবাবু স্বাধীনভাবে স্বীয় মত প্রকাশ করেন। সেই ইংরাজ ভদ্রলোকগুলি কলিকাতাতে পৌঁছিয়াই এই কথোপকথনের বিষয় গবর্ণমেন্টের গোচর করেন। এই সামান্য কারণে গবর্ণমেন্ট তাঁহার নিকট কৈফিয়ৎ চাহিয়া পাঠান।"

১৩ জুন

আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পারে, অথবা রাজদ্রোহকে উসকানি দেয়, সংবাদপত্রে এমন লেখা

ছাপানোকে নিষিদ্ধ করে এক আইন জারি করলেন লর্ড ক্যানিং, এক বছরের জন্যে। আসলে কিন্তু ইংরেজ-স্বার্থ-ঘেঁষা সংবাদপত্রেরাই তৈরি করে চলছিল আতঙ্কের আবহাওয়া। আর সেটা দিয়েই তারা চাপ সৃষ্টি করতে চাইছিল ক্যানিং-এর উপর, যাতে সামরিক আইন জারি করেন তিনি। আইন তৈরির পর তার এলাকা থেকে ইংরেজি কাগজপত্র বাদ পড়ল না দেখে, সাহেব-ধনীদের মুখ রাগে-ক্ষোভে আরো বেশি লাল। তারা চেয়েছিল আইনের কোপটা পড়ুক শুধু নেটিভ প্রেসের ঘাড়েই। এই সময়ে রাজরোষে পড়ে বন্ধ হয়ে গেল দুটো পত্রিকা। কালীপ্রসাদ ঘোষের 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার' আর রংপুর থেকে বেরনো 'বার্তাবহ'।

১৮ জুন

কলকাতার শান্তিরক্ষার জন্যে বেসরকারি ইওরোপীয়দের দিয়ে গড়া 'ভলান্টিয়ার গার্ডস'-দের আচরণ সম্পর্কে 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এ তীব্র সমালোচনা। দেশীয় ব্যক্তিদের নির্যাতন করার অধিকার পেয়ে গেছে যেন তারা হাতের মুঠোয়। অবশ্য কলকাতার বিশেষ বিশেষ বাড়িতে এই সময় বসে গেছে গোরা সৈন্যের পাহারা। 'সম্বাদ ভাস্কর' জানাচ্ছে—

> "পাইকপাড়া রাজবাড়ি অর্থাৎ শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপ সিং বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র বাহাদুর আপনারদিগের বাড়ির সম্মুখে রাজপথে ন্যূনাধিক দুই সহস্র অস্ত্রধারী লোক নিযুক্ত রাখিয়াছেন। তাহারদিগের মধ্যে ৪০-৫০ জন গোরা, অন্যরা এতদ্দেশীয় লোক, গোরাদিগের হস্তে গুলিপোরা বন্দুক রহিয়াছে...শোভাবাজারীয় উভয় রাজবাটিতে সিপাহিসকল বন্দুক লইয়া খাড়া রহিয়াছে, মলঙ্গানিবাসী দত্ত বাবুদিগের এবং জানবাজার নিবাসিনী শ্রীমতী রাণী রাসমণির বাটিতে বাটিতে সৈন্যসকল হৈ২ চৈ২ করিতেছে, নগরের মধ্যস্থলে কলুটোলা অবধি বাগবাজার পর্যন্ত সেন, শীল, দত্ত, মল্লিক, ঠাকুর, সিংহ, ঘোষ, মিত্র, বসু, দেবাদি প্রত্যেক ধনীর বাড়ি ২ দেশীয় সৈন্য ও গোরা সৈন্যরা যুদ্ধোদ্যমে বাদ্যোদ্যম করিতেছে।"

২০ জুন

বাঙালি সমাজেব কাছে 'সংবাদ প্রভাকর'-এর আবেদন—

> "হে বাঙ্গালি মহাশয়েরা। এ বিষয়ে আপনারদিগকে যুদ্ধ করিতে হইবে না, অস্ত্র ধরিতে হইবে না, আপনারা সকলে একান্তচিত্তে কেবল রাজপুরুষগণের মঙ্গলার্থে স্বস্ত্যয়ন করুন। পরম পরাৎপর পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করুন, সকল প্রকারে মহারাণীর জয় হউক, লার্ড বাহাদুর অভিলষিত বিষয়ে কৃতকার্য হইয়া সর্বতোভাবে সুখী হউন। বিদ্রোহানল এখনি নির্বাণ হউক।..."

ওই সংখ্যাতেই রাজ-বন্দনা—

> "চিরকাল হয় যেন ব্রিটিশদের জয়।
> ব্রিটিশের রাজলক্ষ্মী স্থির যেন রয়।
> এমন সুখের রাজ্য, আর নাহি হয়।
> শাস্ত্রমতে এই রাজ্য, রামরাজ্য কয়।।

২৫ জুন

'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'-য় বেরলো 'পলাশীর শতবার্ষিকী' নামে একটা প্রবন্ধ। গভর্নমেন্ট বিচলিত হয়ে সতর্ক করে দেয় ঐ পত্রিকাকে।

'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এ হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'দি গবর্নমেন্ট অ্যাণ্ড দি এডুকেটেড নেটিভস' সম্পাদকীয়। লিখেছিলেন 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া-য় জনৈক বাঙালি পত্রলেখকের চিঠিতে শিক্ষিত বাঙালির রাজভক্তি সম্পর্কে সংশয় ঘোষণা প'ড়ে। হরিশচন্দ্রের সম্পাদকীয় পড়ে ওই পত্রলেখক 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এ আবার চিঠি লিখলেন এই তারিখে 'ইয়ং বেঙ্গলস ভিউ অব দা মিউটিনী'। তাঁর মতে শিক্ষিত বাঙালির মনের গোপন কথাটা এই—

> "...Disinterested love to British rule is not our sentiment. We Prefer it to any other government, simply because, under existing circumstances, we know of no better government."

৩০ জুন

কার্ল মার্কস চিঠিতে লিখছেন—

> "মুসলমান ও হিন্দুরা তাদের উভয়ের মনিবের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, বিদ্রোহ শুধু কতকগুলো এলাকায় সীমাবদ্ধ নেই, বিশাল এশীয় জাতির অংশ হিসাবে একটা সাধারণ অসন্তোষের সঙ্গে এ-বিদ্রোহ মিশে আছে।"

জুলাই

কলকাতার রাস্তায় পাকাপাকিভাবে গ্যাসের আলোর চল।

কলকাতায় গ্যাসের আলো জ্বলা নিয়ে গান লিখেছিলেন রাধানাথ মিত্র। দীনবন্ধু মিত্রের সুরধুনী কাব্যের মধ্যে রয়েছে গ্যাসালোকে কলকাতার কথা। এর অনেক পরে, ১৮৭৭-এ, শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁর 'ভিকেটারিয়া গীতিমালা'-য় মহারাণীকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন —'এ হেন গ্যাসের আলো হেরিনু তব কৃপায়'।

৪ জুলাই

লণ্ডনের পশুবিজ্ঞান সমিতিকে প্রথম হিমালয়ের ফিজেন্ট পাখি উপহার দেওয়ার জন্যে ঐ সমিতি মেডেল পাঠিয়ে সম্মান জানাল রাজা রাজেন্দ্র মল্লিককে। পশুপ্রীতি আর পশুবিজ্ঞানের জন্যে খ্যাত তিনিই আলিপুর পশুশালার আদি প্রস্তাবক। তাঁর বাড়ির পশুশালাই কলকাতার আদি পশুশালা। অজস্র দামি ও দুর্লভ পশু আলিপুর পশুশালাকে তাঁরই দান। তাঁরই স্মৃতিতে তাই ঐ পশুশালায় তৈরি প্রথম বাড়িটার নাম দেওয়া হয়েছিল 'মল্লিকস হাউস'।

৯ জুলাই

'ফিনিক্স' পত্রিকাই নয় শুধু, গোটা ইংরেজ সম্প্রদায়েরই উগ্র ইচ্ছা, সমস্ত উচ্চপদ থেকে দেশীয়দের সরিয়ে সেখানে বসিয়ে দেওয়া হোক সাহেবদের। এই তারিখে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' এই প্রস্তাবকে আখ্যা দিল "audacity, not to say impudence."

১৮ জুলাই

কলকাতার 'গ্রাণ্ড জুরি' সরকারের কাছে আবেদন জানাল যে মহরম সামনে। এই সময়ে কলকাতা আর তার আশপাশের দেশীয় মানুষদের কাছে যে অস্ত্র-শস্ত্র আছে কেড়ে নেওয়া

হোক। বেচে দেওয়া হোক বন্দুক, রাইফেল, টোটা। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ফেটে পড়ল সমালোচনায়। সরকারও কান দিলেন ওই প্রস্তাবে। তবে সরকার পক্ষ থেকে কথা উঠল এমন একটা আইনের যার ফলে যার কাছে যা অস্ত্র-শস্ত্র আছে তা রেজিস্ট্রি করাতে হবে আর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে এ-সবের ব্যবহারের উপর।

২৫ জুলাই
এই আইন জারির কথা উঠল।

২৮ জুলাই
ডিসরেলির মন্তব্যকে সমর্থন জানিয়ে মার্কস সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে লিখলেন—

"এই গোলমাল ঠিক সেনাবাহিনীর নয়, একে জাতীয় বিদ্রোহই বলা উচিত।"

৩০ জুলাই
অস্ত্র-শস্ত্র রেজিস্ট্রি আইনের ঘোষণায় ক্ষুব্ধ হরিশচন্দ্র 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এ লিখলেন, এর ফলে নিশ্চয় শুরু হবে দেশীয় মানুষদের বাড়িতে বাড়িতে তল্লাশি। যদি সত্যিই এই আইন চালু করতে হয়, তাহলে তার ভার যেন দেওয়া হয় সত্যিকারের দায়িত্ববানদের উপর। এই সময়ে কলকাতার দেশীয় অঞ্চলের চেহারা অসম্ভব বিশৃঙ্খল আর ভয়ার্ত।

"১৮৫৭ সালের জুলাই মাসে কলিকাতাতে এরূপ জনরব উঠিল যে বিদ্রোহী সিপাহীগণ আসিতেছে, তাহারা কলিকাতা সহরের সমুদয় ইংরাজকে হত্যা করিবে এবং কলিকাতা সহর লুট করিবে। এই জনরবে কলিকাতার অনেক ইংরাজ কেল্লার মধ্যে আশ্রয় লইলেন; দেশীয় বিভাগেও লোকে কি হয় কি হয় বলিয়া ভয়ে ভয়ে দিনযাপন করিতে লাগিল। ইংরাজ, ফিরিঙ্গী ও দেশীয় খ্রীস্টানগণ সর্বদা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বন্দুকের দোকানের পসার অসম্ভবরূপে বাড়িয়া গেল। ইংরাজগণ ভয়ে ভীত হইয়া গবর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিংকে অদ্ভুত পরামর্শ দিতে লাগিলেন,—কালাদের অস্ত্র হরণ কর, কঠিন সামরিক আইন জারি কর, ইত্যাদি; ক্যানিং তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। এজন্য ইংরাজেরা তাঁহার নাম Clemency Canning 'দয়াময়ী ক্যানিং' রাখিলেন। আজ শোনা গেল দেশীয় সংবাদপত্র সকলের স্বাধীনতা হরণ করা হইবে, কালি কথা উঠিল রাত্রি ৮টার পর যে মাঠের ধারে যায় তাহাকেই গুলি করে; সন্ধ্যার পর বাজার বন্ধ হইত; একটি জিনিসের প্রয়োজন হইলে পাওয়া যাইত না; লোকে নিজ বাসাতে দুই চারিজনে বসিয়া অসংকোচে রাজ্যের অবস্থা ও রাজনীতি সম্বন্ধে নিজ নিজ মত প্রকাশ করিতে সাহস করিত না, মনে হইত প্রাচীরগুলি বুঝি শুনিতেছে! কিছু অধিক রাত্রে গড়ের মাঠের সন্নিকটবর্তী রাস্তা দিয়া আসিতে গেলেই পদে পদে অস্ত্রধারী প্রহরী জিজ্ঞাসা করিত 'হুকুমদার', অর্থাৎ Who comes there? তাহা হইলেই বলিতে হইত 'রাইয়ত হ্যায়' অর্থাৎ আমি প্রজা, নতুবা ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া তবে ছাড়িত। এইরূপে সকল শ্রেণীর মধ্যে একটা ভয় ও আতঙ্ক জন্মিয়া কিছুদিন আমাদিগকে স্থির থাকিতে দেয় নাই।"

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ

হুতোম প্যাঁচার বর্ণনায় এই সময়ের ছবি ব্যঙ্গে-বিদ্রূপে ইস্পাতের মতো ধারালো।

"পাঠকগণ! একদিন আমরা মিছেমিছি ঘুরে বেড়াচ্ছি, এমন সময় শুনলেম, পশ্চিমের সেপাইরে খেপে উঠেচে, নানা সাহেবকে চাঁই করে ইংরেজদের রাজত্ব নেবে, দিল্লীর

ন্যেড়ে চীফ আবার 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' হবেন—ভারি বিপদ! সহরে ক্রমে হুলস্থূল পড়ে গ্যালো, চূনোগলী ও কসাইটোলার মেটে ইদরুস, পিদরুস, গমিস্, ডিস্ প্রভৃতি ফিরিঙ্গিরে খাবার লোভে ভলিনটিয়ার হলেন, মাথালো মাথালো বাড়িতে গোরা পাহারা বসলো, নানা রকম অদ্ভুত হুজুক উঠতে লাগলো— আজ দিল্লী গ্যালো—কাল কানপুর হারানো হলো, ক্রমে পাশা খেলার হার কেতের মত ইংরেজরা উত্তর পশ্চিমের প্রায় সমুদায় অংশেই বেদখল হলেন— বিধি, ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলে ও মেয়েরা মারা গ্যালো, 'শ্রীবৃদ্ধিকারী' সাহেবরা (ইঁদুর দেবতা পঞ্চানন্দের মত) বড় ছেলের কত্তে পাল্লেন না, ছোট ছেলের ঘাড় ভাঙ্গবার উজ্জুগ পেলেন, সেপাইদের রাগ বাঙ্গালির উপর ঝাড়তে লাগলেন; লর্ড ক্যানিংকে বাঙ্গালিদের অস্ত্রশস্ত্র (বঁটি কাটারি মাত্র) কেড়ে নিতে অনুরোধ কল্লেন! বাঙ্গালিরা বড় বড় রাজকর্ম না পায়, তার তদ্বির হতে লাগল, ডাকঘরের কতকগুলি নেড়ে প্যায়দাদের অন্ন গ্যালো, নীলকরেরা অনরেরী ম্যাজিষ্টর হয়ে মিউটিনী উপলক্ষ করে (চোর চায় ভাঙ্গা ব্যাড়া) দাদন, গাদন ও শামচাঁদ খেলাতে লাগলেন; শামচাঁদ সামান্নি নন, তাঁর কাছে আইন এগুতে পারেন না—সেপাই তো কোন ছার! লক্ষ্ণৌ-এর বাদসাকে কেল্লায় পোরা হলো, গোবারা সময় পেয়ে দুচার বড বড় ঘরে লুটতরাজ আরম্ভ কল্লে, মার্সাল লা জারি হলো, যে ছাপা যন্ত্রের কল্যাণে হুতোম নির্ভয়ে এত কথা অক্লেশে কইতে পাচ্ছেন, যে ছাপা যন্ত্র কি রাজা কি প্রজা কি সেপাই পাহারা —কি খোলার ঘর, সকলকে এক রকম দ্যাখে, ব্রিটিস কুলের সেই চিরাচবিত ছাপা যন্ত্রর স্বাধীনতা মিউটিনী উপলক্ষে কিছু কাল শিক্‌লী পরলেন। বাঙ্গালিরে ক্রমে বেগতিক দেখে গোপাল মল্লিকের বাড়িতে সভা করে সাহেবদের বুঝিয়ে দিলেন যে—যদিও একশ বছর হয়ে গ্যালো, তবু তাঁরা আজও সেই হতভাগা ম্যাড়া বাঙ্গালিই আছেন—বহুদিন ব্রিটিস সহবাসে, ব্রিটিস শিক্ষায় ও ব্যবহারে অ্যামেরিকানদের মত হতে পাবেন নি।... ইংরেজরা মাগ ছেলে ও স্বজাতির শোকে একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন, সুতরাং তাতেও ঠাণ্ডা হলেন না—লার্ড ক্যানিং-এর রিকলের জন্যে পার্লিয়ামেণ্টে দরখাস্ত করলেন, সহরে হুজুকের এক শেষ হয়ে গ্যালো। বিলেত থেকে জাহাজ জাহাজ গোরা আসতে লাগলো—সেই সময় বাজারে এই গান উঠলো—

গান।

বিলাত থেকে এলো গোরা,
মাথার পর কুর্‌তি পরা,
পদভরে কাঁপে ধরা,
হাইল্যাণ্ড নিবাসী তারা।
টানটিয়া টোপির মান,
হবে এবে খর্ব্বমান,
সুখে দিল্লী দখল হবে,
নানা সাহেব পড়বে ধরা।

বাঙ্গালিরা ঝোপ বুঝে কোপ ফেলতে বড় পটু; খাঁটি হিন্দু (অনেকেই দিনের ব্যালায় খাঁটি হিন্দু) দলে রটিয়ে দিলে যে, 'বিধবাবিবাহের আইন পাস ও বিধবাবিবাহ হওয়াতেই সেপাইরে খেপেছে। গবর্নমেণ্টে বিধবাবিবাহের আইন তুলে দিয়েছেন—বিদ্যাসাগরের কর্ম্ম গিয়েচে—প্রথম বিধবাবিবাহ বর শিরীশের ফাঁসি হবে!"

এলাহাবাদ, বারাণসীতে বিজয়ী ইংরেজ সৈন্যরা লুটপাট, আগুন লাগানো আর গণহত্যায় মাতোয়ারা হয়ে উঠলে ক্যানিং এই ধরনের কাজকে নিষিদ্ধ করে একটা ঘোষণা পাঠালেন। সতর্ক হতে বললেন সেনাপতিদের।

কার্ল মার্কস তাঁর চিঠিতে আগের চেয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হয়ে জানালেন—"জনবুল যাকে সৈনিকদের অসন্তোষ বলছেন, আসলে তা জাতীয় বিদ্রোহ।"

১ আগস্ট
ডায়মন্ড হারবারের নিতাড়া গ্রামে মধুসূদনের জীবনচরিতকার যোগীন্দ্রনাথ বসুর জন্ম। বাবা নিতাইচাঁদ। মা, বামাসুন্দরী। যোগীন্দ্রনাথ অবশ্য শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন।

১১ আগস্ট
সিপাহী বিদ্রোহের আতঙ্কে শিউরে ওঠা ইংরেজ সরকার কলকাতার স্কুল কলেজ মাদ্রাসায় গড়তে লাগল সৈন্য-ব্যারাক। সংস্কৃত কলেজের কাছে সৈন্যদের থাকার জন্যে কলেজ খালি করে দেওয়ার প্রস্তাব এলে, বিদ্যাসাগর তা না মেনে সরকারের কাছে চিঠি পাঠালেন।

১৩ আগস্ট
কলকাতার ইংরেজ, আংলো-ইণ্ডিয়ান আর খ্রিস্টানরা একজোট হয়ে গোপনে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে পাঠিয়েছিল একটা দরখাস্ত, নিয়মতান্ত্রিক বা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সরকারের বদলে ভারতবর্ষে সামরিক শাসন চেয়ে। সেইসঙ্গে এদেশে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থাকে সমূলে উপড়ে ফেলবার অনুরোধ। আসলে লর্ড ক্যানিংকে গভর্নর জেনারেলের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার মতলব। দরখাস্তে সই পড়েছিল ২৫৩ জনের। ইংল্যাণ্ড থেকে সে আবেদনপত্র ফেরত আসে কলকাতায়, যেহেতু তা নিয়মানুসারে গভর্নর জেনারেলের মারফত পাঠানো হয় নি। এই তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এ হরিশচন্দ্র মন্তব্য করলেন যে, দরখাস্তকারীরা খুবই হুঁশিয়ার আর সেয়ানা, কারণ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে যখন ভারতের শাসনব্যবস্থাকে আরো উন্নত করার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে, তখনই তাঁরা ব্রিটিশ রাজনৈতিক নেতাদের মনটাকে বিষিয়ে দিতে চাইছেন সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনাবলীকে বিকৃত আর বীভৎস করে দেখিয়ে। তবে তাঁদের মধ্যে যাঁরা সৎ, তাঁরা নিশ্চয়ই এমন প্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না। এই সব দরখাস্তকারীদের মনে রাখা উচিত, ভারতবর্ষ নামের একটা বিরাট দেশের বিরাটসংখ্যক মানুষকে দুর্দশা আর বঞ্চনার মধ্যে রেখে দেওয়ার পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে বাধ্য। এঁদের উচিত ভারতবর্ষের স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একসঙ্গে সংগ্রাম চালানো।

১৭ আগস্ট
বাংলা গভর্নমেন্টের সেক্রেটারি বিদ্যাসাগরকে লিখলেন—

> "আপনার ১১ তারিখের চিঠির উত্তরে আমি ভারত সরকারের সামরিক বিভাগের সেক্রেটারির একখানি চিঠির কপি আপনাকে পাঠাচ্ছি। সেই চিঠিতে আপনি দেখতে পাবেন, হিন্দু ও মাদ্রাসা কলেজের অট্টালিকা দুটি সৈন্যদের বাসের জন্য গবর্নমেণ্ট সাময়িকভাবে দখল করবেন মনস্থ করেছেন। কলকাতায় শীঘ্র যে সৈন্যসামন্ত আসবে তাদের এইস্থানে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হবে। আপনাকে তাই অনুরোধ করছি যে আপনি আর বিলম্ব না করে এখনই গ্যারিসান-কমাণ্ডারের হাতে আপনার বিদ্যালয়গৃহ ছেড়ে দেবার বন্দোবস্ত করবেন।"

১৮ আগস্ট
পরের দিনই শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার গর্ডন ইয়ং-এর, যাঁর সঙ্গে এই সময়ে অবনিবনা বা

মতবিরোধ চলছিল বিদ্যাসাগরের, চিঠি—

> "সৈন্যরা আপনার বিদ্যালয়গৃহ দখল করলে আপনি আপনার ছাত্রদের শিক্ষাসমস্যার এবং ক্লাসের সমস্যার কি ভাবে সমাধান করবেন, সে সম্বন্ধে চিন্তা করে যত শীঘ্র সম্ভব পত্রোত্তরে আমাদের জানাবেন।"

২৪ আগস্ট

'সংবাদ প্রভাকর'-এ খবর বেরলো, পুলিশ অফিসের সামনে একজন মুসলমান অন্য একজন মুসলমানকে কথাপ্রসঙ্গে জানায় যে, আর ৩-৪ দিনের মধ্যে কলকাতার দুর্গ দখল করে নেবে বিপক্ষেরা। কোনো পুলিশ সার্জেন সেটা শুনতে পেয়ে 'অনিষ্ট চিন্তক যবনকে' ধরে চালান দেয় বিচারের জন্যে। প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট হিউম সাহেবের বিচারে এটা গুরুতর অপরাধ সাব্যস্ত হওয়ায় জরিমানা হল ২০ টাকা।

সেপ্টেম্বর

কালীপ্রসন্ন সিংহ অনুবাদ করলেন কালিদাস-এর 'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটক।

কালীপ্রসন্নর বয়স তখন মাত্র ১৭। তাই 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' লিখেছিল—

> "ঐ কালে বালকেরা বিদ্যালয়ে অভিনয় করিয়া থাকে; গ্রন্থরচনায় কেহই পারগ বা উদ্যত হয় না ; কিন্তু উল্লিখিত বাবু ঐ কাল মধ্যে নানা গ্রন্থ সাময়িক পত্র ও বক্তৃতা রচনা করিয়া স্বদেশীয়দিগের নিকট প্রশংসাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।"

ইংলিশম্যান-এ বেরনো একটা চিঠিতে জনৈক পাঠক সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন তাঁর ক্ষমতায়। সেখানে জানানো হয়েছিল আসলে ঐ নাটক পণ্ডিত দীননাথ শর্ম্মার রচনা। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' প্রতিবাদ জানায়—

> "পণ্ডিত মহাশয় স্বয়ং সম্মুখে উপস্থিত থাকায় এই মিথ্যা নির্দেশ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন।"

বই হিসেবে ছাপা হওয়ার আগে আংশিক ছাপা হয়েছিল 'পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রিকায়।

৩ সেপ্টেম্বর

'ফ্রেন্ড অব ইণ্ডিয়া'-ব সংবাদে জানা গেল যে, কলকাতার নর্ম্যাল স্কুলের এক দারোয়ান কথাপ্রসঙ্গে মন্তব্য করে—আর কদিনের মধ্যেই গলা কাটা হবে সাহেবদের, জনৈক সৈন্য তা শুনতে পেয়ে তার হাত-পা বেঁধে তুলে দেয় সেনাবাহিনীর হাতে। সৈন্যরা যে তার কথা বুঝতে পারবে, সে বেচারা স্বপ্নেও ভাবে নি।

৫ সেপ্টেম্বর

আশুতোষ দেব-এর বাড়িতে 'কাদম্বরী' অবলম্বনে 'মহাশ্বেতা' নাটকের অভিনয়।

১০ সেপ্টেম্বর

'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এ হরিশচন্দ্র 'পলিসি ফর দা টাইম' নিবন্ধে লিখলেন— উপদ্রুত অঞ্চলে প্রশাসন চালাতে লর্ড ক্যানিং রাজকর্মচারীদের নির্দেশ দিয়েছেন, বোঝা যাচ্ছে তা তাঁদের পছন্দ হয় নি। লর্ড ক্যানিং জানেন, বিদ্রোহের পর এই দেশ তাঁকে চালাতে হবে, সুতরাং ছাড়তেই হবে প্রতিহিংসার পথ। এদেশে যে পরিমাণ ব্রিটিশ সৈন্য আমদানী করা হয়েছে,

এরা হয়তো বিদ্রোহ প্রশমিত করতে পারবে, কিন্তু উত্তর ভারতের প্রত্যেকটি প্রাপ্তবয়স্ককে বেয়নেটে খুঁচিয়ে ফাঁসিকাঠে ঝোলানোর পক্ষে কি সংখ্যাধিক্য রয়েছে তাঁদের? এটা কি তাঁদের পক্ষে রুচিকর কাজ? যতই নৃশংস হোক-না কেন, গুনে গুনে নব্বই লক্ষ লোককে নির্বিচারে হত্যা, অথবা নির্বাসনে পাঠানো অথবা ফাঁসিকাঠে ঝোলানো সম্ভব নয়। সম্ভব না হলেও 'রক্ত চাই' আওয়াজ-তোলা বেসরকারি ইংরেজ সমাজ আর তাদের কাগজপত্র চাইছে সেটাই ঘটুক।

বিদ্রোহ দমনে সাফল্য আসতে-না-আসতেই বিদ্রোহীদের উপর নৃশংস প্রতিহিংসা নেওয়াটা কোনো সভ্য সরকারের কর্মচারীদের কাছ থেকে আশা করা যায় না। ৬ জুন থেকে ১৬ জুলাই-এর মধ্যে এলাহাবাদে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে ৮০০ জনকে। সিপাহীরা একজন 'শিখ' সৈন্যকে হত্যা করেছিল, তার প্রতিহিংসা নিতে সমগ্র বাহিনীকে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেওয়া হল এলাহাবাদ শহরের অধিবাসীদের উপর। বেনারস থেকে যে পথ দিয়ে ব্রিগেডিয়ার নেইল এলাহাবাদে ফিরছিলেন, সে পথ নিরীহ গ্রামবাসীদের মৃতদেহে বোঝাই। এই গ্রামবাসীরা ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে প্রতিরোধ করতে এসেছিল, এমন নয়। নদীর দুধারের মাইলের পর মাইল ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে সমস্ত ঘরবাড়ি। এত নিষ্ঠুরতা সত্ত্বেও তো বিদ্রোহ দমন করা যায় নি। লর্ড ক্যানিং-এর ঘোষণা এক্ষেত্রে সরকারের পক্ষে ছিল সত্যিকারের মর্যাদাসূচক।

১৪ সেপ্টেম্বর

বিদ্রোহী সিপাহীদের দখল থেকে ইংরেজ সৈন্যরা ছাড়িয়ে নিলে দিল্লি।

১৫ সেপ্টেম্বর

কার্ল মার্কস চিঠিতে লিখেছেন

"ব্রিটিশের থানাগুলো বিপ্লব-সমুদ্রের মধ্যে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো।"

১৭ সেপ্টেম্বর

'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এ আবার উত্তরপ্রদেশে গণহত্যার তীব্র সমালোচনা। উত্তরপ্রদেশের লেঃ গভর্নর জে পি গ্রান্ট-এর হুকুমকে অমান্য করেই জেনারেল নীল ফাঁসি দিয়ে চলেছেন নিজের প্রতিহিংসা মেটাতে। সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলাদের ইনি বন্দী করে রেখেছেন এইজন্যে যে সিপাহীরা যদি লক্ষ্ণৌ-এ অবরুদ্ধ মহিলাদের উপর অত্যাচার করে, তবে এই ভারতীয় মহিলাদের তুলে দেওয়া হবে সৈন্যদের হাতে, তাদের লালসার খাদ্য হিসেবে। জেনারেল নীলই যখন সর্বেসর্বা, তখন মিঃ গ্রান্টকে মেকি রাজপ্রতিনিধিরূপে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে না রেখে ফিরিয়ে আনা হোক রাজধানীতে। প্রতিহিংসা আর খতমের নীতিই যদি আদর্শ হয়ে থাকে, তাহলে একদল কষাই আর ঘাতকের হাতে রাজ্য শাসনের ভার তুলে দিয়ে লর্ড ক্যানিং-এর সরে আসা উচিত।



২৮ সেপ্টেম্বর

বিদ্যাসাগর শেষ পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজের কাজ চালানোর জন্যে ১০৫ টাকায় ভাড়া করলেন দুটো বাড়ি।

১২ অক্টোবর

সিমলা থেকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর চিঠি লিখছেন রাজনারায়ণ বসুকে—

"প্রীতিপূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনমিদং

তোমার ১০ ভাদ্রের পত্র প্রাপ্ত হইলাম। রাজবিদ্রোহের তরঙ্গ মেদিনীপুরকেও কম্পমান করিয়া তুলিয়াছে। বিদ্রোহীরা কি ভয়ানক অত্যাচার করিয়াছে স্মরণ হইলে হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হয়। পরিবারদিগকে কলিকাতায় পাঠান হইয়াছে, উত্তম হইয়াছে। সিমলাচলও বিদ্রোহীদিগের আক্রমণে একবার চঞ্চল হইয়াছিল। ভাগ্যে ভাগ্যে সিমলাচল রক্ষা পাইয়াছে। এখানে যে সৈন্যদল ছিল, তাহারদিগকে নিরস্ত্র হইতে অনুমতি দেওয়াতে তাহারা ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া সিমলা বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিল। বহু আয়াস ও যত্নে তাহারদিগকে সান্ত্বনাবাক্যে শান্ত করিয়া সাহারানপুরে পাঠাইয়া সিমলার রক্ষা হইল। ইহাও প্রায় ছয় মাসের কথা হইল। এইক্ষণে দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ উভয়েই ইংরাজদিগের পুনর্ব্বার হস্তগত হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে দেশে শান্তি ব্যাপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে।..."

রাজনারায়ণ বসু, দেবেন্দ্রনাথকে সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে চিঠিতে কী লিখেছিলেন, তা এখন আর জানার উপায় নেই। তবে সিপাহী বিদ্রোহের সময়কার মেদিনীপুরকে নিয়ে তাঁর আত্মচরিতে রয়েছে একই ভয়াবহ ও রসাল বৃত্তান্ত। তেমনি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী-তেও রয়েছে সিপাহী বিদ্রোহের সময় তাঁর সিমলা বাসের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। বিদ্রোহের সময় তিনি সিমলায় যাবার আর সেখান থেকে কোনো চিঠিপত্র না পৌঁছনোয় ঠাকুরবাড়িতে ঘোরতর আশঙ্কা। সৌদামিনী দেবীর 'পিতৃস্মৃতি'-তে রয়েছে সে-আশঙ্কার ছবি—

"একটা গুজব উঠিল সিপাহীরা তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। একে অনেকদিন চিঠিপত্র লেখেন নাই, তাহার উপর এই গুজব—বাড়ির সকলে ভাবনায় অভিভূত হইল। মা তো আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন।"

১৫ অক্টোবর

লালবিহারী দে নিজের 'অরুণোদয়'' পত্রিকায় সিপাহী বিদ্রোহের অত্যাচারের বিবরণ দিয়ে প্রমাণ করলেন এই বিদ্রোহের নিরর্থকতা। সিপাইদের ইংরেজকে পরাজিত করার ভাবনা অলীক। আর সেপাইরা বিদ্যাবুদ্ধিহীন পাষণ্ড।

১৬ অক্টোবর

তত্ত্ববোধিনী সভার পক্ষ থেকে অক্ষয়কুমার দত্তকে মাসে ২৫ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা। পরে অবশ্য নিজের বই থেকে খানিকটা ভালো আয় হলে অক্ষয়কুমার নিজেই বন্ধ করে দেন ঐ বৃত্তি নেওয়া।

১৮ নভেম্বর

বিদ্রোহ ঘোষণা করল চট্টগ্রামের ৩৪ নং দেশীয় পদাতিকবাহিনী। জেল ভেঙে মুক্ত করে দিল বন্দীদের। ট্রেজারি ভেঙে ৩ লাখ টাকা লুট করে তাদের সিলেটের দিকে এগোনোর খবর পেয়ে নিরস্ত্র করা হল ঢাকার বিক্ষুব্ধ বাহিনীকে।

২১ নভেম্বর

ঢাকায় পৌঁছল চট্টগ্রাম বিদ্রোহের খবর। সন্ধে ৬টার সময় সরকারি কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত, পরের দিন রবিবারে ৭৩ নং নেটিভ ইনফ্যানট্রির সিপাইদের নিরস্ত্র করার।

২২ নভেম্বর
কলকাতার ঠনঠনিয়ায় অতুলকৃষ্ণ মিত্রের জন্ম। বাবা, জয়কৃষ্ণ।
এই দিন সকালেই নৌসেনা বিভাগের লেফটেনান্ট লিউইস দুটো কামান আর গোরা সৈন্যদের নিয়ে প্রথমে গেলেন তোষাখানায়। সেখানকার সিপাইদের পর নিরস্ত্র করা হল ইঞ্জিনিয়ার কার্যালয় রক্ষক সেপাইদের, তারপর মালগুদাম সিপাইদের। সবটাই ঘটল বিনা বাধায়। কেবল লালবাগেই বাধল তুমুল লড়াই। মারা গেলেন চল্লিশ জন সেপাই। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ সগর্বে জানাল, তাদের পক্ষে নিহতের সংখ্যা মোটে এক।

২৪ নভেম্বর
বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটকের অভিনয়। কালীপ্রসন্ন নিজে অভিনয়ও করেছিলেন এ নাটকে পুরুরবার ভূমিকায়। 'বেণীসংহার' নাটকের অভিনয়ে প্রশংসায় অভিভূত হয়ে আবার এ নাটকে অভিনয় করলেন পুরুরবার ভূমিকায়। 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা তাঁর অভিনয়ের।
এই তারিখ থেকে ১৮৫৮-র ১৫ মের মধ্যে বিদ্যাসাগর হুগলি, বর্ধমান, নদীয়া, মেদিনীপুরের বিভিন্ন গ্রামে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় গড়লেন ছোটোলাট হ্যালিডের পরামর্শ নিয়ে।

২৭ নভেম্বর
৬ এপ্রিল টাউন হলে অনুষ্ঠিত সভার আবেদনপত্র পাঠানো হল ইংল্যান্ডে। সিপাহী বিদ্রোহের জন্যে পাঠানো যায় নি যথাসময়ে।

ডিসেম্বর
নভেম্বর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে হুগলি জেলায় ৭টা আর বর্ধমানে একটা বালিকা বিদ্যালয় গড়লেন বিদ্যাসাগর।
বছরের শেষে পাকাপাকি হয়ে গেল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভাগ। এরপরই স্বাভাবিক কাজকর্মের শুরু।

৭ ডিসেম্বর
হুগলি জেলার দিগ্‌সই গ্রামে বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে গড়ে উঠল প্রথম বালিকা বিদ্যালয়।

১৬ ডিসেম্বর
হুগলির হোয়েড়া গ্রামে আরেক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে।

২২ ডিসেম্বর
শ্রীহট্টের ডিগালীতে প্রখ্যাত চিকিৎসক ও দেশপ্রেমিক সুন্দরীমোহন দাস-এর জন্ম। বাবা, স্বরূপচন্দ্র।

৩১ ডিসেম্বর
এঙ্গেলস কার্ল মার্কসকে লিখছেন—

> "আমরা একবারও ভারতে কোনো বিদ্রোহী সেনাদলের কথা শুনলাম না যারা কোনো স্বীকৃত দলপতির দ্বারা ঠিকমত গঠিত হয়েছে।"

১৮৫৮

বঙ্কিমের জীবনের এই বছরটির নীচে আমরা নির্দ্বিধায় টেনে দিতে পারি লাল কালির দাগ। সেটা এজন্যে নয় যে এটা তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কোনো বছর। সেটা এজন্যে যে, নিজের অপ্রস্তুতি সত্ত্বেও, এটাই তাঁর জীবনকে আকস্মিকভাবে ঠেলে দেবে জটিল আত্মনির্মাণের দিকে। এই বছরেই এক অর্থে শেষ হবে তাঁব ছাত্রজীবন। তিনি পাস করতে চেয়েছিলেন আইনে। কিন্তু আইনের আগেই বসে যাবেন বি.এ. পরীক্ষায়। আর সেখানে উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অযাচিতভাবেই তাঁর কাছে পৌঁছে যাবে সরকারি চাকরির প্রস্তাব। অনিচ্ছাসত্ত্বেও হ্যাঁ জানাতে হবে তাঁকে। আইনের অসমাপ্ত পাঠ ও পরীক্ষা তিনি শেষ করবেন অনেক পরে। তাই এই একই বছরে যেমন ঘটবে তাঁর ছাত্রজীবনের আপাত সমাপ্তি, তেমনিই ঘটে যাবে কর্মজীবনের সূচনা। নিখাদ ব্যক্তিজীবন থেকে ব্যাপক সমাজ জীবনে প্রবেশও বলা যেতে পারে একে। আর এই সামাজিক বঙ্কিমই ক্রমশ ত্বরান্বিত করে তুলবেন সাংস্কৃতিক বঙ্কিমের প্রথমে দ্বিধান্বিত, পরে গৌরবান্বিত ও প্রত্যয়পরায়ণ আবির্ভাব।

বঙ্কিম যখন চাকরিতে যোগ দিচ্ছেন, সেই আগস্টে সিপাহী বিদ্রোহের গনগনে আগুনটা যতখানি নিভে আসার দিকে, নীল বিদ্রোহের ছাই-চাপা ধিকিধিকি আগুনটা অনতিবিলম্বে ঠিক ততখানি দাউ দাউ জ্বলে ওঠার দিকে। বঙ্কিমের চাকরি জীবনের প্রাথমিক পর্বটিকে তাই ছুঁয়ে থাকবে এই দুই আগুনের তাপ। কিন্তু এই তাপ কীভাবে আত্মীকরণ করছেন তিনি, অথবা আদৌ করছেন কিনা, তার কোনো প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ প্রমাণ মিলবে না তখুনি। কারণ বঙ্কিম তখনো লেখক হন নি, যদিও বেরিয়ে গেছে প্রথম কবিতার বই। প্রথম কবিতার বই বেরনো আর চাকরির জীবনে প্রবেশ, এই দুয়ের মাঝখানের ব্যবধানটা ছ বছরের। এই ছ-বছরে বঙ্কিম কোনো কবিতা লেখেন নি আর। আর গদ্যের বঙ্কিম তখনো কল্পনার বাইরে। যেহেতু তাঁর গদ্য রচনার পরিমাণ একেবারেই নামমাত্র, এবং নমুনা হিসেবে চরিত্রহীন, কোনো জাতের পাঠকের কাছেই নেই তার সম্ভাবনা বিষয়ে আগ্রহ। ফলে এই রকম পাথুরে নীরবতার

মুহূর্তে অনুমান করাও দুঃসাধ্য যে তিনি অদূরভবিষ্যতে নিয়মিত সাহিত্য-চর্চায় ফিরে আসবেন কিনা, অথবা আসার জন্যে সংগোপনে নিজেকে প্রস্তুত করছেন কিনা।

অথচ অন্যদিকে এই বছরেই বাংলা সাহিত্যে ঘটে যাবে তিনটি উজ্জ্বল ঘটনা, বেরবে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনীর উপাখ্যান' কবিতার বই। আর ইংরেজি ভাষায় লেখালেখিতে অভ্যস্ত মধুসূদন দত্ত ফিরে আসবেন মাতৃভাষায়, প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা'-র মাধ্যমে। আর বাংলা ভাষায়, আরো বিশেষ করে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিনতা থেকে উদ্ধার করা চলতি বাংলা ভাষায়, প্রথম আত্মপ্রকাশ কববে টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' উপাখ্যান অথবা উপন্যাস। সিপাহী বিদ্রোহের সমকালে, বিদ্রোহজনিত পরিস্থিতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধহীন হয়েও বেসরকারি ইংরেজ সমাজের অপমানের আগুনে ঝলসানো বাঙালী বুদ্ধিজীবী সমাজের যেখানে বোবা হয়ে থাকার কথা, সেখানে পর পর সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্যের ছাপ-মারা এমন তিনখানা বই-এর আত্মপ্রকাশকে আমরা কখনোই ভেবে নিতে পারি না কার্যকারণহীন কাকতালীয় রূপে। তা যে ভাবা সম্ভব নয়, তা আরো সূচিহ্নিত করে তুলবে ঠিক পরের বছরেই দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের বিস্ময়কর আবির্ভাব। ১৯৫৮-র ঐ তিনখানা বইকেই বরং আমরা ভেবে নেব ১৮৫৯-এর 'নীলদর্পণ' প্রকাশের প্রেরণাময় প্রেক্ষাপট।

এক বিশেষ ধরনের সমাজতান্ত্রিক বিশ্লেষণ আমাদের প্ররোচিত করতে চায় এই সিদ্ধান্তে আস্থা স্থাপনে যে, সিপাহী বিদ্রোহের সময় বাঙালী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ইংরেজ তোষণে মেতে বিরুদ্ধাচারণ করেছে এই বিদ্রোহের বা মহাবিদ্রোহের। এই যুক্তি আংশিক সত্য হতে পারে, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ সত্য নয়। প্রকাশ্যে যে ঘটনাই ঘটুক, সিপাহী বিদ্রোহ দমনে ইংরেজ শাসকদের বর্বরতাকে বাহবা ধ্বনিতে বরণ করে নেওয়ার যত বৃত্তান্তই শোনানো হোক-না কেন, কলকাতার দেশীয় অধিবাসীদের উপর সরকারি জুলুমকে নখে দাঁতে হিংস্রতর করে লেলিয়ে দিতে বেসরকারি ইংরেজ আর খৃস্টান আর ফিরিঙ্গী সমাজের তৎপরতা যে পরিমাণে অমানবিক ও অমানুষিক হয়ে উঠতে চেয়েছিল তখন, আর তার পরিণামে বাঙালী সমাজকে মুখোমুখি হতে হয়েছিল যে ধরনের আত্মমর্যাদাহীন অপমান ও লাঞ্ছনার, আর সে বেদনা এবং বিক্ষোভ তখনই দানা বেঁধে উঠতে না পারার নিষ্ক্রিয়তাও যতখানি নিন্দনীয় হয়ে উঠুক, এই সব সত্যির সমান্তরালে রয়ে গেছে বা গিয়েছিল আরো যে বড়ো মাপের সত্যি, তা হল, সেই ভয়ংকর প্রতিশোধপরায়ণ মুহূর্তেই বাঙালী বুদ্ধিজীবী সমাজের প্রগতিশীল অংশ সজাগ হয়ে উঠতে চেয়েছে আত্মপরিচয়ের সন্ধানে, এবং আত্মঘোষণার উপযুক্ত ভাষার আবিষ্কারে। নিজেদের অন্তর্গত বেদনা-বিক্ষোভকে কোনো-না-কোনো ভাবে বিচ্ছুরিত করে দেওয়ার তাড়না এবং প্রেরণার শুরু সিপাহী বিদ্রোহের অগ্নিপর্বেই। এমন-কি ব্যক্তি হিসেবে নয়, ব্যক্তিনামকে গোপন রেখেই, সামাজিক মানুষ হিসেবে লেখকরা বেছে নিয়েছেন নিজেদের আত্মপ্রকাশের চোরা পথ। একটু নজর ছড়ালেই আমাদের চোখে পড়বে, সিপাহী বিদ্রোহের পরের বছর অর্থাৎ ১৮৫৮ থেকে বাংলা সাহিত্যে নানা বিষয়ে ঘটে যাবে বই বেরুনোর যে অকল্পনীয় জোয়ার সেখানে শতকরা ৯০ জন লেখকই নিজের জন্যে বেছে নিয়েছেন ছদ্মনাম। আমি কে সেটা বড়ো নয়, আমি কী বলতে চাইছি সেটাই বড়ো, এই রকমই উদার এবং দায়িত্ববান হয়ে উঠেছে সেই সময়ের লেখকদের সামাজিক ভূমিকা।

এই ঘটনার সঙ্গে, অর্থাৎ সিপাহী যুদ্ধের সমকালে সচেতন বাঙালী বুদ্ধিজীবী সমাজের সমস্যার সঙ্গে অনায়াসেই তুলনায় আনা যেতে পারে ইন্দিরা গান্ধী-প্রচারিত 'এমার্জেন্সি'-র সমকালীন

পরিস্থিতিকে। এমার্জেন্সি-কালীন নিপীড়নের সময়ে তার বিরুদ্ধে ইতস্তত ছড়ানো যে-সব প্রতিবাদধ্বনি সংগ্রহ করতে পারি আমরা, বিশাল ভারতবর্ষের তুলনায় তা নিতান্তই নগণ্য, অর্ধোচ্চারিত এবং অসংগঠিত। কিন্তু এমার্জেন্সি প্রত্যাহারের পরই, প্রবলতর কোনো জলোচ্ছ্বাসের বেগে উথলিয়ে উঠল এই প্রমাণ যে ঠিক কোন ধরনের তীব্রতর আত্মঅপমানজনিত বেদনা ও ক্রোধ সংগোপনে লালন করে চলেছিল ভারতবর্ষের আত্মা ও শরীর।
সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে কলকাতা শহরের দেশীয় অঞ্চলের জনজীবন আর সমাজ জীবনের উপর আছড়ে-পড়া আতঙ্কময় পরিস্থিতির বর্ণনা দিতে দিতে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'-এ উপসংহারে লিখছেন

> "ক্রমে দেশে আবার শান্তি স্থাপিত হইল। ১৮৫৮ সালে মহারানী প্রজাদিগকে অভয় দান করিয়া ভারত সাম্রাজ্য নিজ হস্তে লইলেন, স্টেট-সেক্রেটারীর পদ সৃষ্টি হইল; কলিকাতা শহর আলোকমালাতে সজ্জিত হইল; চারিদিকে আনন্দধ্বনি উঠিল। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের উত্তেজনার মধ্যে বঙ্গদেশের ও সমাজের এক মহোপকার সাধিত হইল; এক নবশক্তির সূচনা হইল; এক নব আকাঙ্ক্ষা জাতীয় জীবনে জাগিল।"

হুবহু এই রকম উদ্দীপক উচ্চারণ অজিতকুমার চক্রবর্তীর লেখা দেবেন্দ্রনাথের জীবনীতেও। সিপাহীবিদ্রোহ পরবর্তী সমাজে কীভাবে ব্যক্ত ও বাঙময় হয়ে উঠল বা উঠেছিল এই নবশক্তি, নব আকাঙ্ক্ষা, তার দিকে অনুবীক্ষণী চোখে তাকানো হচ্ছে ইদানীং। সম্ভবত এই আধো-অন্ধকারে-ঢাকা সময়টার উপর প্রথম আলো ছিটিয়েছিলেন গোপাল হালদার, তাঁর 'বাঙলা সাহিত্য ও স্বাধীনতার প্রেরণা' নামের প্রবন্ধে। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় ব্রিটিশ-বিরোধীতার যৎসামান্য লক্ষণকে চিনিয়ে দিয়েই তিনি জানান

> "কিন্তু নতুন বাংলা কবিতা কথা কইতে আরম্ভ করল রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে এ-প্রশ্ন নিয়ে—
>
> স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়?
> দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায়?
>
> এই হল নতুন বাংলা সাহিত্যের মূল সুর— আর এই সুর ও ধ্বনি আমরা শুনলাম ১৮৫৮তে, সিপাহী বিদ্রোহের আগুন যখন নেভে নি। এর পরে বাংলা সাহিত্যের নবযুগের জোয়ার।"

এরপর প্যারীচাঁদ মিত্রের বিদ্রোহ সংস্কৃত-ঘেঁষা সাধুভাষার বিরুদ্ধে। ১৯৫৮-য় বই হয়ে বেরল তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল'। ১৮৫৯-এ দীনবন্ধু মিত্রের নাটকে নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে সমর্থন। বেরল 'নীলদর্পণ'। ১৮৬১-৬২ জুড়ে 'হুতোম প্যাঁচার নকসা'। সেখানেও কি বিদ্রোহ আত্মগোপন করে আছে কোথাও? কিংবা ঐ বছরেই বেরনো মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যে? আছে যে তা জানিয়ে দিয়ে গোপাল হালদার লেখেন :

> "১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'হুতোম প্যাঁচার নকসা'— তাতে বাংলা সাহিত্যে দেখি ব্যঙ্গোক্তির আড়ালে সর্বপ্রথম সিপাহী-বিদ্রোহের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন। তাহলে 'কি সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে সিপাহী বিদ্রোহের সম্বন্ধে এই দৃষ্টি শিক্ষিত সমাজের অন্যত্রও আত্মগোপন করে ছিল? হুতোমের স্রষ্টা মাইকেলকে মেঘনাদবধ কাব্যের জন্যে ঠিক

এই সময়ই পুরস্কৃত করেন ; সেই 'মেঘনাদবধে'র বিদ্রোহের সুরটির মধ্যে এই সিপাহী সুরটিও কি গোপনে গোপনে মিশে যায় নি?"

বাংলা সাহিত্যকে হঠাৎ প্লাবিত করে তোলা এই-সব বিদ্রোহের সুরকে মনে রেখেই আমরা ঘুরে তাকাতে পারি বঙ্কিমের দিকে। বিদ্রোহী মধুসূদনকে এই বঙ্কিমই একদিন জানাবেন উদাত্ত কণ্ঠের সম্মান। আর নীলদর্পণ-এর নাট্যকার তো তাঁর প্রাণাধিক সুহৃদ। বঙ্কিম নিজে কি তাহলে কোনো পাঠ গ্রহণ করেছিলেন এই-সব বিদ্রোহ থেকে? এ প্রশ্নের উত্তরের জন্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে আরো কয়েকটা বছর, অন্তত যতদিন না তিনি বাংলা ভাষায় তাঁর প্রথম উপন্যাসটিতে হাত দিচ্ছেন।

২

৫ এপ্রিল

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হল প্রথম বি. এ. পরীক্ষা। বঙ্কিমচন্দ্র আইন বিভাগ থেকেই প্রস্তুত হলেন বি.এ. পরীক্ষা দিতে। মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১৩ জন। সাধারণ বিভাগ থেকে ১২ জন, তার মধ্যেই যদুনাথ বসু। আইন বিভাগ থেকে একা বঙ্কিম। তিন জন পরীক্ষা দেয় নি শেষ পর্যন্ত। সাধারণ বিভাগের ছাত্রেরা পরীক্ষার প্রস্তুতিপর্বে পেয়েছিল অধ্যাপকদের অকাতর সাহায্য। আইনের ছাত্র বলেই বঙ্কিম পান নি সে সুযোগ। অর্ধেক সময়ে, নিজের কৃতিত্বেই তাঁর তৈরি হওয়া। 'সুবর্ণলেখা' থেকে এই প্রথম বি.এ. পরীক্ষার বিবরণ

"বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য গঠিত অস্থায়ী কমিটির ১৮৫৭ ইং ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখের পঞ্চম অধিবেশনে ১৮৫৮ ও ১৮৫৯ ইং বি. এ. পরীক্ষার পাঠ্য তালিকা নির্ধারিত হয়। ১৮৫৮ বি.এ. পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল। বোম্বে ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. পরীক্ষা দিতে পারিতেন। প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশের ৪ বৎসরের মধ্যে কেহ বি.এ. পরীক্ষা দিতে পারিবেন না এই নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় এই আইন অনুসারে বি.এ. পরীক্ষা লইতে হইলে ১৮৬১ ইং পূর্বে পরীক্ষা লওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু সর্বপ্রথম পরীক্ষা বলিয়া ইহা স্থির হয় যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর ৩ বৎসর পর্যন্ত এই আইন বলবৎ হইবে না। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এমন সার্টিফিকেট দেখাইতে পারিলে যে-কেহ এই বি.এ পরীক্ষা দিবার অধিকারী হইবেন। এফ.এ. (First Arts) পরীক্ষা ১৮৬০ ইং পূর্বে প্রচলিত হয় নাই।

১। পরীক্ষার ভাষা

বি.এ. পরীক্ষার প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে দুইটি ভাষায় পরীক্ষা দিতে হইত। তার মধ্যে একটি ইংরাজী, অপরটি—গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু, আরবী, ফার্সী, সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী, উর্দু, ওড়িয়া ও বার্মী ভাষার মধ্যে যে কোন একটি।

পরীক্ষাকেন্দ্র

একমাত্র কলকাতা

পরীক্ষার ফি ২৫ টাকা ধার্য হইয়াছিল।

পরীক্ষার পাঠ্য (বাংলা)

বত্রিশ সিংহাসন, পুরুষ পরীক্ষা, মহাভারত ১ম থেকে ৩য় পর্ব।

পরীক্ষার কার্যসূচি

বি.এ. পরীক্ষা ৫ই এপ্রিল ইং সোমবার আরম্ভ হইয়াছিল। বাংলা পরীক্ষা ৬ই এপ্রিল

মঙ্গলবার পূর্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণে গৃহীত হয়।
পরীক্ষার সময়
পূর্বাহ্ণ ১০ ঘটিকা হইতে ১।।০ ঘটিকা অপরাহ্ণ ২ ঘটিকা হইতে ৫।।০ ঘটিকা
পরীক্ষক (বাংলা) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
এ ছাড়া আরো কিছু তথ্য, এই পরীক্ষার পাঠ্য বিষয় আর পরীক্ষকদের নিয়ে।

English. Greek, Latin. W. Grapd. Esq., M.A. Presidency College
Sanskrit. Bengali. Hindee and Oorya. Pandit Isserchunder Bidyasagar. Principal. Sanscrit College.
History. E.B. Cowell. Esq. M.A.. Professor Presidency College.
Mathematics and Natural philosophy The Revd. T. Smith. Professor, Free Church Institution.
Physical Sciences. H. S. Smith Esq.. B.A. Professor Civil Engineering College.
Mental and Moral Sciences, The Red. A. Duff. D. D."

এই ডাফ কলকাতা-কাঁপানো মিশনারি রেভারেন্ড আলেকজান্ডার ডাফ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা আর পরিচালনার পিছনে অনেকখানিই সক্রিয় ছিল তাঁর ভূমিকা। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে 'মেঘনাদবধ কাব্য' নির্বাচিত হয়েছিল তাঁরই ইচ্ছায়-আগ্রহে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারি হস্তক্ষেপ তাঁর দৃষ্টিতে ছিল অবাঞ্ছনীয়। তিনি আন্তরিকভাবে চাইতেন শিক্ষার ক্ষেত্রে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমতা, উদারতা আর নিরপেক্ষতা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থে আমরা পড়ি—

"Duff always maintained and upheld the view that all educational institutions should be equalised and state patronage should not be the monopoly of any one or any group. Indeed. now after about a century. as one reads through his notes. speeches. and writings. one feels that he was the first spokesman of the contemporary demand of educationists. at any rate in Bengal. for de-provinicialisation or de-governmentisation of education."

The Formative Years/
Niharranjan Ray

বি.এ পরীক্ষা দিয়ে বঙ্কিম প্রেসিডেন্সিতে আগের মতোই পড়তে লাগলেন আইন নিয়ে। তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে দুজন ছিলেন পরবর্তীকালের বিখ্যাত মানুষ। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য আর অক্ষয়চন্দ্র সরকার। আইন পড়ার সময় অক্ষয়চন্দ্রের সঙ্গে আলাপ হয় নি বঙ্কিমচন্দ্রের। হয়েছে অনেক পরে, ঔপন্যাসিক হিসেবে বঙ্কিম খ্যাতিমান হওয়ার পর। তখন বি.এ. পাস করেছেন অক্ষয়চন্দ্র। আগে যেখানে সিটি কলেজ ছিল, তার পশ্চিমদিকে, নিজের তেতলা বাসাবাটি থেকে বঙ্কিম কলেজে আসতেন যখন গোলদিঘীর ধার দিয়ে, দেখা যেত আরদালি ছাতা ধরে আছে মাথার উপর। অক্ষয়চন্দ্রের নিজের স্মৃতিচারণায় বঙ্কিমের আইন পড়ার সময়কার একটা ছবি—

"সুন্দর সুশ্রী গঠন, পাতলা পাতলা দেহ, উন্নত নাসিকা, উজ্জ্বল চক্ষু, ঠোঁটের আশেপাশে একটু একটু হাসি আছে। কিন্তু সেই হাসির সঙ্গে আছে প্রবল গরিমা-জ্ঞান। আসেন,

এক পার্শ্বে বসেন, চুপ করিয়া থাকেন, কাহারও সহিত কথা কহেন না। তাৎকালিক সংস্কৃতাধ্যাপক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মহাশয়। তিনিও ঐ তৃতীয় শ্রেণীতে আইন শিক্ষা করেন। অধ্যাপক বলিয়া সাহেব শিক্ষক উঠিয়া গেলে তাঁহার অনুরোধে রেজেষ্টরী কইতেন। কৃষ্ণকমলবাবু প্রথম নামটি করিয়াছেন কি বঙ্কিমবাবু অমনি উঠিলেন,—তাঁহার কানের কাছে গিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "আমাকে উপস্থিত লিখে দেবেন মহাশয়!" কৃষ্ণকমল বলিলেন, "আচ্ছা"। অমনি বঙ্কিমচন্দ্র গোলদীঘির ধার দিয়া, ছাতা ধরাইয়া সটানে সমানে চলিয়া গেলেন। আমাদের কাহারো সহিত তখন বঙ্কিমের আলাপ হয় নাই।"

পরে এই অক্ষয়চন্দ্র সরকারই হয়ে উঠবেন তাঁর আরেক প্রিয়তম বন্ধু। এমন-কি অক্ষয়চন্দ্রের লেখাকে অন্তর্ভুক্ত করে নেবেন নিজের প্রবন্ধাবলীতে।

'বঙ্গভাষার লেখক' নামের বইয়ে অক্ষয়চন্দ্র তাঁর এই স্মৃতিচারণাধর্মী প্রবন্ধটি লিখেছিলেন 'পিতাপুত্র' নামে। ঐ প্রবন্ধ পড়ে বিপিনবিহারী গুপ্তের ধারণা হয়েছিল যে, বঙ্কিম সম্ভবত আইন পড়েছিলেন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের কাছে। বিপিনবিহারীর লেখা 'পুরাতন প্রসঙ্গ'-র পঞ্চম অধ্যায় শুরুই হয়েছে এই প্রসঙ্গটি নিয়ে। বিপিনবিহারীর প্রশ্ন—

—বঙ্কিমবাবু কি কখনও আপনার Law Lectures শুনিতে আসিতেন?

প্রশ্ন শুনেই কৃষ্ণকমল বিস্মিত। তাঁর পাল্টা প্রশ্ন

—আমার Law Lectures? বঙ্কিমবাবু?

বিপিনবিহারী তাঁর প্রশ্নে অবিচলিত।

—আজ্ঞা হাঁ, আপনার।

কৃষ্ণকমল সম্ভবত কিছুটা বিমূঢ়।

—না। কেন একথা জিজ্ঞাসা করিলে, বল দেখি?

—একজন প্রবীণ সাহিত্যসেবী স্বীয় জীবনের পুরাতন ঘটনাবলীর আলোচনা প্রসঙ্গে এইরূপ একটি কথা লিখিয়াছেন, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পোশাক পরিয়া বঙ্কিমবাবু আপনার ক্লাসে আসিয়া, ছাত্রদিগের সহিত বেঞ্চে বসিয়া আপনার লেকচার শুনিতেন।

এরপর কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের স্বগতোক্তি অথবা স্বীকারোক্তি— "দেখ, এ কথা সম্পূর্ণ অমূলক। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে আমি Law Lecturer হই নাই। কখনও যে তিনি আমার ক্লাসে আসিয়াছিলেন এমন আমার মনে হয় না। তবে আন্দাজ ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমবাবু ও আমি একত্র Law Class-এ লেকচার শুনিতে যাইতাম। সেই সময়ে তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। একটা analogous ঘটনা আমি বলিতে পারি। তারাপ্রসাদবাবু বঙ্কিমবাবুর সমসাময়িক লোক। তিনি যখন বহরমপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, গুরুদাসবাবু তখন তথায় ওকালতি করেন ও কলেজে Law Lecturer. তারাবাবু গুরুদাসবাবুর Law class-এ উপস্থিত হইয়া লেকচার শুনিতেন। একথা আমি গুরুদাসবাবুর মুখে শুনিয়াছি।"

এরপর বিপিনবিহারীর কৌতূহলী জিজ্ঞাসা।

—আপনার বঙ্কিমবাবুর সহিত intercourse বরাবর ছিল কি?

কৃষ্ণকমলের উত্তর—

"ছিল বৈকি? তিনি যখন আলিপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, তখন হাবড়ায় (হাওড়া) কখনও

কখনও আমার বাড়িতে আসিতেন ; যখন হাবড়ায় ছিলেন, তখন আমি তাঁহার এজলাসে অনেক সময় ওকালতি করিয়াছি। এখনও বেশ মনে পড়ে, একদিন হাবড়া হইতে এক গাড়িতেই আমরা দুজনে যোগেন্দ্রবাবুর বাড়িতে গেলাম। পথে কোঁৎ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিলাম। আমি বলিলাম, 'দেখুন, আমার মনে হয় কোঁতের দর্শন-শাস্ত্র সম্বন্ধে আমাদের দেশে আলোচনা হইবার সময় বোধ হয় এখনও আইসে নাই, the time is not ripe for it. বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'কেন? যেটা truth তার আবার সময়-অসময় কি?' অবশ্যই বঙ্কিমবাবু যে কোঁৎ ভাল করিয়া পড়িয়াছিলেন তাহা আমার মনে হয় না, কিন্তু তখন যেন তিনি বেশ মন খুলিয়াই কথাটি বলিলেন, এ ধারণা আমার হইল।"

প্রেসিডেন্সিতে ৭ আগস্ট পর্যন্ত আইনের ক্লাস করেছিলেন বঙ্কিম।

১৮ এপ্রিল

বেরল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বি.এ পরীক্ষার ফল। পাস করতে পারে নি একটি ছাত্রও। না করার পক্ষে কারণও ছিল কিছু। প্রথমত প্রশ্নপত্র হয়েছিল কোনো কোনো বিষয়ে বেশ কঠিন। তা ছাড়া ছাত্রেরা নতুন বিষয় নিয়ে পড়াশোনার জন্যে সময় পেয়েছে অল্প। আর বি.এ. পরীক্ষার মান বা প্রশ্নপত্রের ধরন-ধারণ সম্বন্ধেও পূর্বঅভিজ্ঞতা ছিল না কারো। এ-সবের উপরেও কাজ করেছে সিন্ডিকেট-এর নির্দেশ পরীক্ষকদের উপর ছাত্রদের নম্বর দেওয়ার ব্যাপারে পরীক্ষার্থীর বিদ্যাবুদ্ধিকে কড়া নজরে যাচাই করে নিতে। পরীক্ষকদের কাছে পাঠানো সিন্ডিকেটের ফরমান—

"That with reference to the Degree of B.A., the examiners be instructed that while the standard will be very considerably higher and the number of marks to be obtained in each subject greater than that of for Entrance, the Vice-chanceller and Senate became it to the discretion of the Board of Examiners to say that proportion of marks should be demanded in order to show that a candidate prossess that competent. that special. or that competent knowledge of several subjects in the absence of which no candidate can be approved."

(Resolution no 2 on the item not of minutes of the Provisional Committee held on 28.11.1857)

সমস্ত পরীক্ষার্থীই পাসের অযোগ্য, এই নির্মম বাস্তবের ভিতরেও পরীক্ষকদের চোখে পড়েছিল দুটি পরীক্ষার্থীর বিশেষ কৃতিত্ব। দুজনেই উত্তীর্ণ হয়েছে ছটি বিষয়ের পাঁচটিতে, নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে। ৬ নং বিষয়ে তারা দুজনেই অকৃতকার্য হয়েছে ৭ নম্বর কম পেয়ে। পরীক্ষকেরা এরপর সিন্ডিকেটের কাছে তাদের রিপোর্ট পাঠানোর সময় সুপারিশ করলে, এই দুটি ছাত্রকে ষষ্ঠ বিষয়ে মাত্র ৭ নম্বর গ্রেস মার্ক দিয়ে যেন উত্তীর্ণ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সিণ্ডিকেট্ সে সুপারিশকে অহেতুক অথবা অযৌক্তিক বলে সরিয়ে দিল না আলোচ্য বিষয়ের বাইরে। যথেষ্ট সহানুভূতির সঙ্গে তাঁরাও বিবেচনা করতে বসলেন ঐ সুপারিশ। একেবারে কেউই যদি পাস না করতে পারে, প্রথম বছরের বি.এ. পরীক্ষা নেওয়ার গুরুত্ব অথবা গৌরবেও ঘাটতি পড়বে কিছুটা, হয়তো এমন ভাবনাও কাজ করে থাকবে তাঁদের চিন্তায়।

২৪ এপ্রিল

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট বসল আলোচনায়। সে সভায় পাঠ করা হল বোর্ড অব একজামিনার্স-দের পাঠানো বিধি। এরপরই সিদ্ধান্ত, হ্যাঁ, প্রস্তাবিত ছাত্র দুজনকে বি.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হিসেবে ঘোষণা করা হবে ৭ নম্বর গ্রেস মার্ক দিয়ে। সেইসঙ্গে বহাল হল এই সিদ্ধান্তও যে ভবিষ্যতে কখনোই এই বিশেষ সিদ্ধান্তকে ব্যবহার করা যাবে না দৃষ্টান্ত হিসেবে। সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তের বয়ান—

"Read a letter from the University Board of Examiners in Arts. stating that of the 13 Candidates for the degree of B.A.. three had been absent during the whole. or a portion of the Examination. and that of the others. all had failed. Read also a letter from the like Board. recommending that. two candidates *VIZ.* Bunkim Chunder Chatterjee and Judoonath Bose who had passed creditably in five of the six subjects. and had failed by not more than seven marks in the sixth. might. as a special act of grace. be allowed to have their degrees. being placed in the second division. it being clearly understood. that such favour should. in no case. be regarded as a precedent in future years."
Resolved : —
That the two candidates mentioned. be admitted to the degree of B.A.

মে

এই মাসের মাঝামাঝি বি.এ. পরীক্ষার ফলাফল বেরল। বঙ্কিম তখন প্রেসিডেন্সিতে পড়ছেন আইন নিয়ে।

৬ আগস্ট

এই তারিখ পর্যন্ত বঙ্কিম প্রেসিডেন্সিতে আইন নিয়ে পড়েছেন। এরপরই তাঁকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি নিয়ে চলে যেতে হয় যশোহরে। তাঁর এই চাকরি পাওয়ার বিবরণ, 'বঙ্কিম জীবনী'-তে—

"পরীক্ষার ফল দেখিয়া ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন— তুমি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কার্য গ্রহণ করিবে? বঙ্কিমচন্দ্র। পিতাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া উত্তর দিতে পারি না। ছোটলাট। এতদপেক্ষা কি চাক্‌রী তুমি প্রত্যাশা কর? বঙ্কিমচন্দ্র। যত বড় চাকরী আমাকে দিন না কেন, পিতার অভিপ্রায় না বুঝিয়া আমি কোনও কার্য গ্রহণ করিতে পারি না। ছোটলাট বঙ্কিমচন্দ্রের পিতৃভক্তি দর্শনে প্রীত হইলেন ; বলিলেন— ভাল, তোমায় আমি কিছুদিনের সময় দিলাম ; তোমার পিতার সহিত পরামর্শ করিয়া সত্বর আমাকে সংবাদ দিবে। চাক্‌রী গ্রহণ করিতে বঙ্কিমচন্দ্রের বড় বেশী ইচ্ছা ছিল না ; কিন্তু পিতার আদেশে গ্রহণ করিতে হইল।"

এই বিবরণ সম্পর্কে পাদটীকায় লিখেছেন—

"আমি ঠিক বলিতে পারি না, এ কথোপকথন হ্যালিডে সাহেবের সঙ্গে অথবা অন্য কোনও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর সঙ্গে হইয়াছিল।"

ব্রত তপাদার-এর লেখা 'সে যুগের রাজকর্মচারী বঙ্কিমচন্দ্র' বইটিতে দেওয়া তথ্যের

চেহারা একটু আলাদা।

"তখন স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে বাংলার ছোটলাট। চিফ সেক্রেটারী টু দ্যা বেঙ্গল গভর্মেন্ট Mr. A. R. Young-কে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে বললেন। কয়েক মিনিট কথা বলবার পর Mr. A. R. Young সোজা জিজ্ঞেস করলেন— "Would you accept the Post of Deputy Magistrate?" সাহেব ভেবেছিলেন যুবক কৃতার্থ জানাবেন, কিন্তু যুবক পাথরের মূর্তির মত বিশাল হয়ে বসে রইলেন। সাহেব আবার বললেন—"If you have any hesitation, please tell me. বঙ্কিমচন্দ্র বিনয়ের সঙ্গে উত্তর করলেন—"I can not say anything, Sir! without consulting my father."

- What higher post do you expect than this?

—What your office might be—I cannot accept it without consulting my father."

এই তারিখেই লেফটেনান্ট গভর্নরের অর্ডারে যশোহরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আর ডেপুটি কালেক্টর রূপে তাঁর নিয়োগের আদেশ ঘোষণা করা হল। যে-সময়ের কথা, সেই সময়ের ডেপুটিগিরির সম্পর্কে বাঙালীর মোহ, বঙ্কিমের অনীহা, আর বাংলা সাহিত্যে ডেপুটিদের অবদান প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার-দত্ত-র 'বঙ্কিমচন্দ্র' থেকে কিছু উদ্ধৃতি।

১। বাঙালির মোহ

"ডেপুটিগিরি চাকরির প্রতি চিরকালই শিক্ষিত বাঙালীর একটা লোলুপ দৃষ্টি আছে। স্বাধীনচেতা বাজনারায়ণ বসুও ঐ চাকরির জন্য উমেদারি করিয়াছিলেন। তখন পরীক্ষা ছিল না, পরে যখন ঐ চাকরির জন্য প্রতিযোগিতা করিতে হইত, তখন ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিতম ছাত্রেরা ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করিতেনই, এখন কেবল সুপারিশ ও উমেদারির দ্বারাই ঐ কর্ম লভ্য হইলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্রগণও তাহাতে বীতরাগ হয়েন নাই। অবশ্য যে একেবারে মুরুব্বিহীন, তাহার পক্ষে দায়ে পড়িয়া স্বাধীনচিত্ততা প্রদর্শন করা কঠিন নহে। ডেপুটিগিরিতে বাঙ্গালীব অনুরাগ তাহার সাহিত্যেও ছায়াপাত করিয়াছে। অনেক ছোট গল্পেরই নায়ক ডেপুটিবাবু কোন নবীন ডেপুটিবাবু বা অন্ততঃ পক্ষে সব-ডেপুটির হস্তে কন্যাদান বাঙ্গালী শ্বশুরের সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা। ছেলে ডেপুটি হইলে কাশীতে মঠ স্থাপিত হইল মনে করেন।"

২। বঙ্কিমের অনীহা অথবা বিদ্বেষ

"ডেপুটিগিরির চাকরির প্রতি বিদ্বেষ সম্বন্ধে এইস্থলে দুই-একটি বিষয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। চন্দ্রনাথ বসু বঙ্কিমের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, বঙ্কিমের মৃত্যুর পর তিনি 'প্রদীপ' পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধুবৎসলতা সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন যে, যখন তিনি ডেপুটিগিরি চাকরি লইয়া ঢাকায় যান, তখন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'যাইতে চাও যাও, কিন্তু এ চাকরি তুমি করিতে পারিবে না।' তিনি নিজের চাকরি সম্বন্ধে অনেক সময় বলিতেন, এটাই তাঁহার জীবনের একটা বড় বিড়ম্বনা। স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত একদিন আলাপ করিবার সময় প্রসঙ্গক্রমে বঙ্কিমচন্দ্র নিজের স্বাস্থ্যনাশের কতকগুলি কারণ উল্লেখ করেন। তন্মধ্যে একটি কারণ, 'চাকরির চাপ'। বঙ্কিম বলেন 'চাকরিতে মানুষ আধমরা হয়।' চাকরিমাত্রের প্রতি ত বঙ্কিমের বিদ্বেষ ছিলই, ডেপুটিগিরির প্রতি তাঁহার— বিশেষ বিদ্বেষ ছিল। রায় সাহেব হারানচন্দ্র রক্ষিত লিখিয়াছেন, "একজন বর্ধিষ্ণু বংশের ছেলেকে ডেপুটিগিরি করিতে দেখিয়া বঙ্কিম স্পষ্টই বলিয়াছেন, 'কি দুঃখে তোমাদের মত ধনী সন্তান এরূপ চাকরি গ্রহণ করে?"

৩। বাংলা সাহিত্যে ডেপুটিগণের অবদান

"কিন্তু বঙ্কিম ডেপুটিগিরির প্রতি বিরক্ত হইলেও বাঙ্গালা সাহিত্য ডেপুটিগণের কাছে চিরঋণী থাকিবে। এক ডেপুটি বাঙ্গালীকে 'কপালকুণ্ডলা', 'আনন্দমঠ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'বিষবৃক্ষ', 'কমলাকান্ত' দিয়াছেন, আর এক ডেপুটি 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র', 'প্রভাস' দিয়াছেন। আর একজন হইতে আমরা 'পদ্মিনী উপাখ্যান' লাভ করিয়াছি। এই সাহিত্যরত্নগুলির কোনটিই কালের অত্যাচারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার নহে। আর এক ডেপুটির 'ধ্রুবতারা' বাঙ্গালা উপন্যাস-গগনে ধ্রুবতারার মতই স্থিরসুষমাময়ী। ডেপুটি দ্বিজেন্দ্রলালকে বাঙালী কতকালে ভুলিবে? প্রাচীনকালের ডেপুটিগণের মধ্যে হরচন্দ্র ঘোষ, এককালে বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত ছিলেন; সুপ্রসিদ্ধি মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও তদীয় জামাতা ও জীবনী লেখক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণও ডেপুটিগিরি করিতেন। ডেপুটি চন্দ্রশেখর কর, পরমেশপ্রসন্ন রায় সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত। উদীয়মান ডেপুটিকুলে কুমার সুরেশচন্দ্র সিংহের নাম উল্লেখযোগ্য।"

ডেপুটিগিরি অথবা তাঁর চাকরির প্রসঙ্গে পরে আরও নানা সময়ে বঙ্কিম জানিয়েছেন তাঁর বিতৃষ্ণা অথবা বিক্ষোভ।

১১ অগাস্ট

বঙ্কিমচন্দ্রের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হওয়ার সংবাদ জানিয়ে প্রভাকর সম্পাদকের বঙ্কিম প্রশস্তি—

"বঙ্কিমবাবু অতিশয় সদ্বিদ্বান, সুধীর, বিচার কার্যে তাঁহার যে বিশেষ পারদর্শিতা প্রকাশ পাইবে তাহাতে আর কোনো সন্দেহ নাই, আমরা বঙ্কিমবাবুকে বিশিষ্টরূপে অবগত আছি, গবর্নমেণ্ট বঙ্কিমবাবুকে ডেপুটি মেজিস্ট্রেট পদাভিষিক্ত করাতে অতিশয় সুবিবেচনার কার্য করিয়াছেন, এই প্রকার ব্যবহার দ্বারাই যথার্থপক্ষে গুণের গৌরব প্রকাশ পায়।"

২৩ অগাস্ট

৭ অগাস্ট চাকরিতে যোগদানের দিন নির্ধারিত থাকলেও, তিনি যোগ দিয়েছিলেন এই তারিখে। যশোহর যাওয়া এখনকার মতন সহজ ছিল না তখন। রেলপথ চালু হয় নি। ফলে যেতে হত হয় নৌকায় নয় পাল্কিতে। লেগে যেত তিন-চার দিন সময়।

যশোহরে পৌঁছেই দীনবন্ধুর সঙ্গে প্রথম চাক্ষুষ পরিচয়। ১৮৮৫ পর্যন্ত দীনবন্ধু হিন্দু কলেজের ছাত্র। কিন্তু সে বছর পরীক্ষা দেন নি। সম্ভবত ১৫০ টাকা মাইনের পাটনায় পোস্টমাস্টারের চাকরি পেয়ে যাওয়ায়। পাটনায় ছিলেন ৬ মাস। আর পোস্টমাস্টারের পদে দেড় বছর। তারপরই পদোন্নতি। হয়ে গেলেন ইন্সপেকটিং পোস্টমাস্টার। সারা দেশের ডাক ব্যবস্থা তখন কতকগুলো জোনে বা বিভাগে ভাগ করা। একজন ইন্সপেকটিং পোস্টমাস্টারের কাজ সেই বিভাগে বিভিন্ন ডাকঘরে ঘুরে ঘুরে কাজ-কর্ম দেখা। কাজটা বিরক্তিকর। কাজের চেয়ে অবিরল ঘোরাঘুরির শ্রমটাই বেশি। নিজের লেখা দীনবন্ধু-জীবনীতে তাই নিয়ে বঙ্কিমের খেদোক্তি—

"এক্ষণে মনে হয়, দীনবন্ধু চিরদিন দেড়শত টাকার পোস্টমাস্টার থাকিতেন, সেও ভাল ছিল, তাঁহার ইন্‌সপেকটিং পোস্টমাস্টার হওয়া মঙ্গলের বিষয় হয় নাই। পূর্ব্বে এই পদের

কার্যের নিয়ম ছিল যে, ইঁহাদিগকে অবিরত নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া পোস্ট আপিসের কার্য সকলের তত্ত্বাবধারণ করিতে হইবে। এক্ষণে ইঁহারা ছয় মাস হেডকোয়ার্টারে স্থায়ী হইতে পারেন।·পূর্ব্বে সে নিয়ম ছিল না। সংবৎসরই ভ্রমণ করিতে হইত। কোন স্থানে একদিন কোন স্থানে দুই দিন, কোন স্থানে তিনদিন— এইরূপ কাল মাত্র অবস্থিতি। বৎসর বৎসর ক্রমাগত এইরূপ পরিশ্রমে লৌহের শরীরও ভগ্ন হইয়া যায়। নিয়ত আবর্ত্তনে লোহার চক্র ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। দীনবন্ধুর শরীরে আর সে পরিশ্রম সহিল না। বঙ্গদেশের দুরদৃষ্টবশতঃই তিনি ইনস্পেকটিং পোস্টমাস্টার হইয়াছিলেন। ইহাতে আমাদের মূলধন নষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু কিছু লাভ হয় নাই এমত নহে। উপহাসনিপুণ লেখকের একটি বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন। নানা প্রকার মনুষ্যের চরিত্রের পর্য্যালোচনাতেই সেই শিক্ষা পাওয়া যায়। দীনবন্ধু নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া নানাবিধ চরিত্রের মনুষ্যের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। তজ্জনিত শিক্ষার গুণে তিনি নানাবিধ রহস্যজনক চরিত্র-সৃজনে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত নাটক সকলে যেরূপ চরিত্র বৈচিত্র্য আছে, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে বিরল।"

চাক্ষুষ পরিচয়েব পর বঙ্কিম আর দীনবন্ধুর মধ্যে যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠবে, তা যেমন স্থায়ী, তেমনি সুদৃঢ় অথবা নিবিড়। চাক্ষুষ পরিচয়ের আগে বঙ্কিমেব জীবনে দীনবন্ধুর প্রভাব সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা—

১. দীনবন্ধুর কবিতা পড়েই বঙ্কিমের কবিতা লেখার বাসনা।

২. সংবাদ প্রভাকরে কবিতা প্রতিযোগিতায় দীনবন্ধু ছিলেন প্রতিযোগীদের একজন।

৩. 'কালেজীয় কবিতা যুদ্ধ' চলবার সময়ও ভিন্ন দুই কলেজ থেকে তাঁরা দুজনই ছিলেন দুই সেনাপতি।

এর বাইরেও যে দুজনের মধ্যে অন্তরঙ্গ যোগাযোগ ছিল কোনো রকমের, বঙ্কিমেব আপন কথা থেকে তা জানতে পারি না আমরা। কিন্তু আমাদেব সে তথ্য, খানিকটা সবিস্তারেই, জানান পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 'বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু' নামের একটি প্রবন্ধে তিনি যা লিখেছেন, তার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা অনুচিত। কিন্তু তাকে বিশ্বাসযোগ্য ভেবে নিতে গেলে আমাদের মনে ঘনিয়ে ওঠে অনেক প্রশ্ন।

তিনি জানাচ্ছেন, যখন তাঁদের মধ্যে দেখাশোনা আর চোখাচোখি হয় নি, তখন থেকেই দুজনের মধ্যে পারস্পরিক পত্র বিনিময়।

> "কখনও কখনও পত্রের ভিতর কবিতা থাকত, আদরের কবিতা, কখনও গালাগালির কবিতা থাকিত ....।"

একবার এই রকম একটা গালি দেওয়া চিঠি হাতে পেয়ে খুব হাসছিলেন বঙ্কিম। পূর্ণচন্দ্র কার চিঠি জানতে চাইলে তিনি উত্তর না দিয়ে আবার চিঠিখানা পড়ে হাসতে লাগলেন। তারপর রাখতে গেলেন বাক্সের ভিতর। তখনই পূর্ণচন্দ্র 'দেখি দেখি' করে হাত বাড়ালে বঙ্কিম প্রথমে রুষ্ট। পরে স্বভাবসুলভ কোমলতায় ছোটোভাইকে বলেছিলেন—

—তুমি কি বুঝিবে? ইহা কবিতা। দীনবন্ধু আমায় গালি দিয়াছে।

পূর্ণচন্দ্রের পরামর্শ

—আপনিও গালি দিয়া লিখুন

বঙ্কিমের উত্তর

—লিখিব বই কি।

পূর্ণচন্দ্রের ঐ প্রবন্ধ থেকে আরো অতিরিক্ত তথ্য হিসেবে যা পাই তা হল একটি বাক্সের কথা। দীনবন্ধুর লেখা সমস্ত চিঠিই তিনি জমিয়ে রাখতেন একটি বিশেষ বাক্সে। পরে সে বাক্স আর তার ভিতরকার চিঠির কোনো হদিশ মেলে নি।

অতঃপর আমাদের প্রশ্নমালা—

১. দীনবন্ধু গালি দিয়ে যে কবিতা পাঠাতেন, সে-সব কি প্রভাকরে ছাপতে দেওয়ার আগে 'কালেজীয় কবিতা যুদ্ধে'-র কবিতার অংশ বিশেষ?

২. নাকি প্রভাকরে লেখালিখির সঙ্গে সম্পর্কহীন ভিন্ন চিঠি?

৩. মুখোমুখি আলাপ-পরিচয়ে বন্ধুত্বের ভিত পাকা হয়ে ওঠার আগে আদরের কবিতা লেখাও যেতে পারে হয়তো, কিন্তু গালাগালি দেওয়া চিঠি কি সম্ভব? আর সে রকম চিঠি পেয়ে বঙ্কিমের মতো প্রবল আত্মসম্ভ্রমশীল মানুষ হেসে যেতে পারবেন ক্রমাগত?

৪. 'প্রভাকর' অথবা 'কালেজীয় কবিতা যুদ্ধ' নিরপেক্ষ রূপে বঙ্কিম দীনবন্ধুর কাছ থেকে পাওয়া চিঠির জবাব দিয়ে থাকেন, সে-সব কবিতা তাহলে অস্তিত্বহীন হয়ে গেল কী করে? বাক্স হারিয়ে যাওয়ায় দীনবন্ধুর চিঠি হয়ে উঠতে পারে দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু নিজের লেখা জবাবী-কবিতা নিশ্চিহ্ন হওয়ারও কি সংগত কারণ থাকতে পারে কোনো?

৫. তাহলে কি বঙ্কিম তাঁর 'ললিতা-মানস', 'গদ্যপদ্য' আর সর্বশেষ 'কবিতাপুস্তক'-এর বাইরেও লিখেছিলেন আরো কিছু কবিতা? যতই ব্যক্তিগত হোক, তারও তো ছিল কিছু ঐতিহাসিক মূল্য, স্থায়ী সাহিত্যমূল্যের কথা সরিয়েই রাখি যদি। সেগুলো সঞ্চিত অথবা সংরক্ষিত করলেন না কেন তিনি?

৬. দীনবন্ধুকে নিয়ে তাঁর এত আগ্রহময় কথা। অথচ এই পত্রালাপের বিস্ময়কর বিবরণী জানাতে একেবারেই ভুলে গেলেন তিনি?

পূর্ণচন্দ্রের ঐ প্রবন্ধে চিঠি লেখালেখি অথবা চিঠিপত্রে পারস্পরিক কৌতুক বিনিময়ের বিবরণও দুটো ভাগে ভাগ করা। প্রথম পর্ব কম বয়সের। দ্বিতীয় পর্ব, যখন দুজনেই বয়স্ক ও সরকারি কর্মচারী।

> "দীনবন্ধু কোনো এক বিশেষ সরকারী কার্যোপলক্ষে কাছাড়ে প্রেরিত হয়েছিলেন। সে স্থলের একজোড়া নতুন জুতা যাহা এখানে তখন পাওয়া যাইত না, বাটি ফিরিয়া আসিয়া, বঙ্কিমচন্দ্রকে পাঠাইয়াছিলেন ও তাহার সহিত একখানি তিন কথার পত্র লিখিয়াছিলেন, যথা— "বঙ্কিম কেমন জুতো।" পত্রখানি আমি পড়িয়াছি, অনেকেই পড়িয়াছেন ; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র উত্তরে কি লিখিয়াছিলেন তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। পরে দীনবন্ধুর অগ্রজের নিকট শুনিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন— 'তোমার মুখের মতন'।"

এ-সব ঘটনা নিশ্চয়ই বঙ্কিমের চাকরি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরের সময়ের। চাকরি জীবনের সূচনা পর্ব থেকে পাওয়া দীনবন্ধুর বন্ধুত্বময় সান্নিধ্য বঙ্কিমের জীবনে হয়ে উঠেছিল এক ধরনের স্থায়ী সম্পদ। 'প্রাণতুল্য বন্ধু' তাঁর সমগ্র জীবনে ঐ একজনই।

১১ ডিসেম্বর

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের প্রথম বার্ষিক সভা। এক অর্থে সেটাই তখন 'কনভোকেশন' বা 'সমাবর্তন' উৎসব। তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব বাড়ি তৈরি হয় নি।

তাই সেবারের সমাবর্তন উৎসবের জায়গা টাউন হল। সভা শুরু হয় সকাল সাড়ে দশটায়। মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন—

The Vice-Chancellor.
The Bishop of Calcutta.
The Hon'ble H. Ricketts.
Mr. Bedon.
Dr. Duff, D.D., L.L.D.
Dr. Grant, M.D.
Mr. Ritche.
Captain Less, L.L.D.
Babu Ramprasad Roy.
Mr. Gordon Young.
Dr. Mouat, M.D.
Dr. Thornson, M.D.
Dr. Oldham, L.L.D.
Pundit Eshwar Chunder Bidyashagar
Baboo Ram Gopal Ghosh
Mr. Lodge, M.A.
The Revd. J. Ogilvie, M.A.

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর তখন জেমস উইলিয়াম কোলভিল সভার কাজ শুরু হল নির্দিষ্ট সময়ে। প্রথমেই বলতে উঠলেন কোলভিল। সরকারি শিক্ষানীতি আর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মধারা নিয়ে বলার পর সদ্যোজাত বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য—

> "We are planting a tree of slow growth. The Plant is young and tender, and obstructed by weeds and brambles. But is healthy, and if carefully tended, will, by God's blessings become a goodly tree and overshadow the land."

এটাই ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন উৎসবে প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলারের ভাষণ। এরপরে স্নাতকোত্তর দুই ছাত্রকে ডিগ্রি দান।
ঐদিন সকালেই 'সংবাদ প্রভাকর' জানিয়ে দিয়েছিল এই সমাবর্তন উৎসবের খবর।

> "আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, শ্রীযুক্তবাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্তবাবু যদুগোপাল (যদুনাথ) বসুকে বি.এ উপাধি প্রদানার্থ অদ্য দিন স্থির হইয়াছে। এই কার্য টাউনহলে অতি সমারোহপূর্ব্বক নির্ব্বাহ হইবেক। এ জন্য কলিকাতাস্থ প্রেসিডেন্সী কলেজ, হিন্দু কলেজ, এবং অন্যান্য কার্যালয়ের প্রধান প্রধান ইংরাজ ও এতদ্দেশস্থ কর্মচারী সকল তদ্দর্শনার্থ অবকাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। আরও অবগতি হইল যে, সাধারণ লোকের পরিচ্ছদের উক্ত উপাধিধারীদিগের সহিত বিশেষ বিভেদ থাকিবেক। অর্থাৎ তাঁহাদের, বেশের এই রূপ বৈচিত্র্য থাকিবেক যে, তাহাদিগকে দর্শনমাত্রই সর্বসাধারণ হইতে চিনিয়া লইতে পারা যাইবেক। অতএব এ বিষয়ে আমাদের যে কি পর্যন্ত আহ্লাদ ও উৎসাহ বর্ধন হইয়াছে, তাহা বলিবার নহে। এমন সময়ে বাঙালীদের গৌরব বর্দ্ধনার্থ রাজপুরুষদিগের যে এতদূর যত্ন হইয়াছে, ইহা অস্মাদির পক্ষে অতিশয় সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবেক। ইহাতে সুবিজ্ঞ গভর্ণমেন্ট এবং রাজপুরুষদিগকে আমাদের অগণ্য ধন্যবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য।"

কনভোকেশন মিটে গেল। কিন্তু কবেকার সেই বি.এ. পরীক্ষার ফলাফলকে কেন্দ্র করে একটা বিতর্ক ছাই-চাপা আগুন হয়ে জ্বলে উঠল। লাগল থেকে থেকে। এখনো জের মেটে নি যার। সে বির্তকের দুই প্রধান চরিত্র পরীক্ষার্থী বঙ্কিম বনাম পরীক্ষক বিদ্যাসাগর। সমাবর্তন সভায় দুজনে ছিলেন মুখোমুখি। তাঁদের দুজনের এই উজ্জ্বল উপস্থিতির প্রসঙ্গে দিনেশচন্দ্র সিংহ—

"...ডিগ্রিদানের জন্য আহূত সেনেট সভার বাংলা সাহিত্যের দুই মহানায়ক— একজন পূর্ণ প্রস্ফুটিত অপরজন স্ফুটনোন্মুখ— পরস্পর মুখোমুখি আসীন। একজন ধুতি চটি চাদর নিয়ে মঞ্চে বিদেশী বিজাতি শাসককুলের মাঝে পরাধীন জাতির একমাত্র বিজয়ডঙ্কা বিদ্যাসাগর ; মাত্র ৩৮ দিন আগে ৫০০ টাকার সরকারী চাকরি হেলায় ত্যাগ করে এসেছেন। আর মঞ্চের একেবারে সামনে উৎসব-সজ্জায় সজ্জিত সে দিনের প্রধান আকর্ষণ বিংশতি বৎসর বয়স্ক বঙ্কিমচন্দ্র— যিনি বি.এ. পাশের ১২৫ দিন পরেই সরকারী কর্মে প্রবিষ্ট হয়েছেন। যখন তিনি ডিগ্রি নিতে এলেন তখন তিনি 'ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অ্যান্ড ডেপুটি কলেক্টর অফ যশোহর'। যদিও উভয়ের মধ্যে এই প্রথম অ-বাক সাক্ষাৎকার, তবু বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাহিত্যকর্মের সঙ্গে অবশ্যই পরিচিত ছিলেন — তখন পর্যন্ত ব্যক্তিগত পরিচয় বা না থাক। আর বিদ্যাসাগর নিশ্চয়ই স্বপ্নেও ভাবেন নি যে মাত্র ৭ বছর পর ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে দুর্গেশনন্দিনী রচনা করে ঐ ডিগ্রিধারী ডেপুটি বাংলা সাহিত্যের বাল্যদশা কাটিয়ে এক লাফে যৌবনের দোরগড়ায় হাজির করবে।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েট/দেশ

বঙ্কিম বনাম বিদ্যাসাগরের বিরোধ সম্বন্ধে বাংলা সাহিত্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অনেক মন্তব্য, একাধিক অনুমান। আর এই বিরোধের সূচনা যে অনেক আগেই তার দৃষ্টান্ত মিলে যায় বিপিনবিহারী গুপ্ত-র 'পুরাতন প্রসঙ্গে'। দু পর্যায়ে লেখা এই বইয়ের প্রথম পর্যায়ে লেখকের ভূমিকার তারিখ ১৩২০। এর দশ বছর পরে দ্বিতীয় পর্যায়। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের তারিখ ১৩১৭, অর্থাৎ ইংরেজি ১৯১০। সেদিনের আলোচনা বহু প্রতিভাধরকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগোতে এগোতে, মাইকেলে। তখনই এসে গেলেন বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর পছন্দ করতেন না মাইকেলের Blank Verse. মাইকেলের পরেই বঙ্কিম।

"তিনি বঙ্কিমকেও পছন্দ করিতেন না। Matter সম্বন্ধে তিনি আপত্তি করিতেন না ; কিন্তু manner সম্বন্ধে, style সম্বন্ধে, তাঁহার বিশেষ আপত্তি ছিল। আমার মতে Bankim brought about a revolution in Bengali literature similar to that brought about by Crabbe and Cowper in English literature. যে revolution-এর চূড়ান্ত রূপ হইল Wordsworth-এ। Edinburgh Review Wordsworth-কে গোড়াতেই চাপা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, 'This will never do।' কিন্তু কবি অবিচলিতভাবে অগ্রসর হইলেন ও Poet Laureate হইলেন। বঙ্কিমও বিচলিত হইলেন না। তিনি বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস'কে বলিতেন 'কান্নার জোলাপ'।"

এরই একটু পরে—

"একদিন বঙ্কিম আমাকে বলিলেন, 'বিদ্যাসাগর বড় বড় সংস্কৃত কথা প্রয়োগ কোরে বাঙ্গালা ভাষার ধাতটা গোড়ায় খারাপ করে গেছেন।' আমারও অনেকটা ঐ রকম মত।"

বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বঙ্কিমের শ্রদ্ধা আর সমালোচনার যথার্থ স্বরূপ আলোচিত হবে পরে, প্রসঙ্গক্রমে। বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে বঙ্কিম অনেক কথা বলেও যে কথাটি বলেন নি এখনো, ইঙ্গিতেও জানতে দেন নি যে-অভিযোগের অস্তিত্ব, ইদানীং তা নিয়েই বেশ-কিছু লেখালেখি। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের এই সব খোলামেলা আলাপচারীতার ৭০ বছর পরে অমিত্রসূদন ভট্টাচার্যর এই দুই প্রতিভার পারস্পরিক বিদ্বেষ অথবা অবনিবনার দিকে আমাদের নজরটাকে ঘুরিয়ে দেন তাঁর 'সাগর ও সম্রাট' প্রবন্ধে।

ঐ প্রবন্ধের সূত্রেই এরই ছ মাস পরে 'দেশ পত্রিকাতেই চিঠিপত্র বিভাগে সন্তোষকুমার অধিকারী জানিয়েছেন এক নতুন তথ্য :

> "যিনি পরবর্তীকালে বাংলা উপন্যাসের স্রষ্টা এবং সাহিত্য জগতের কর্মবীর, তিনি তাঁর এই লাঞ্ছনাব কথা কোনদিনই ভুলতে পাবেন নি। তাই সীতার বনবাসকে তিনি যেমন কান্নার জোলাপ বলে বর্ণনা করেছেন, বিদ্যাসাগরের অসাধারণ সাহিত্য-প্রতিভাকে গর্ব করার জন্যে তেমনি সারা জীবন চেষ্টা করে গিয়েছেন।"
> কি সেই লাঞ্ছনা, যার ফল এতখানি সুদূরপ্রসারী? বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ভাষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি। তাঁকে গ্রেস মার্ক দিয়ে পাস করানো হয়। আর বাংলা ভাষার পরীক্ষক ছিলেন বিদ্যাসাগর।"

সন্তোষকুমার অধিকারীর এই অভিযোগের পর আমাদের নজরে এসেছে অভিযোগ-স্খালনে উদ্যোগী দুটি রচনা। লেখকেরা হলেন দীনেশচন্দ্র সিংহ আর গোপালচন্দ্র রায়। দীনেশচন্দ্রের প্রবন্ধটি বেরিয়েছিল 'দেশ' পত্রিকায়। গোপালচন্দ্রের রচনাটি বেরোয় তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র' বইতে। সন্তোষকুমার-এর চিঠিটি পড়ার পর তিনি নিজে চিঠির লেখকের সঙ্গে দেখা করে জানতে চান, বঙ্কিমের বাংলায় ফেল করার তথ্য তিনি জানলেন কি করে? সন্তোষবাবুর উত্তর, 'মন্দিরা' পত্রিকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিকী সংখ্যায় হেমেন্দ্রপ্রসাদ তাঁকে জানিয়েছিলেন —বঙ্কিমচন্দ্র ফেল করেছিলেন বাংলা আর সংস্কৃত দুটোতেইও ৮ নম্বর কম পেয়ে। এরপর গোপালবাবুর বিস্তৃত আলোচনা থেকে আমরা সংক্ষেপে গুছিয়ে নিতে পারি তাঁর যুক্তিগুলো।

১। ৮ নম্বর প্রশ্নাতীত, কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মিনিটস-এই ছাপানো আছে ৭ নম্বর।

২। সংস্কৃত আর বাংলা দুটো পরীক্ষার কথাও অবান্তর, কারণ ৬ এপ্রিল মঙ্গলবার একই সময়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে বাংলা আর সংস্কৃতের। তা ছাড়া পরীক্ষার নিয়মাবলী অনুযায়ী একজন ছাত্রকে পরীক্ষা দিতে হবে ইংরেজিতে অবশ্যই, এরপর গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু, আরবি, ফার্সি, সংস্কৃত, বাংলা, ওড়িয়া, হিন্দী, উর্দু আর বার্মিজ-এর যে-কোনো একটি।

৩। বঙ্কিমের কম নম্বর পাওয়ার কারণ কঠিন প্রশ্নপত্র আর প্রস্তুতির জন্যে অল্প সময়।

৪। কিন্তু তার বাংলায় ফেল করা অসম্ভব, কারণ বাংলার প্রশ্ন ছিল সহজ, যেমন সহজ ছিল বাংলার পাঠ্য বিষয়।

গোপালচন্দ্র রায়-এর মতো দীনেশবাবুরও ঘোরতর অবিশ্বাস বঙ্কিমের বাংলায় ফেল করার সঙ্গে বিদ্যাসাগরকে জড়ানো কিংবদন্তীতে যেহেতু তার সমর্থনে নেই কোনো তথ্যনির্ভর সাক্ষ্য প্রমাণ। তাঁর অনুসন্ধান, বঙ্কিমের ফেল করা ষষ্ঠ বিষয় কোনটি।

> **"সিন্ডিকেটের কার্যবিবরণীতে (২৪ এপ্রিল ১৮৫৮) দেখা যায় বঙ্কিমচন্দ্র ছয়টি বিষয়ের মধ্যে পাঁচটিতে উত্তীর্ণ হন, কিন্তু ষষ্ঠ বিষয়ে অকৃতকার্য হন। এখন ষষ্ঠ বিষয়টি কোন্ বিষয় তার নাম জানতে পারলেই সমস্যার সহজ সমাধান হয়। অথচ ষষ্ঠ বিষয়ের নাম**

যেমন কার্যবিবরণীতে নেই, তেমনি ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের বি.এ. পরীক্ষার ফলাফল পুস্তক (রেজাল্ট বুক) বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ডরুম থেকে উধাও (১৮৫৭ থেকে ১৮৫৯ খ্রীঃ পর্যন্ত সকল পরীক্ষার ফলাফল সমেত, ফলে পরীক্ষণীয় বিষয়গুলির নাম জানবার মূল সূত্রই বিচ্ছিন্ন। তবে ১৮৬০ সালের বি.এ. পরীক্ষার রেজাল্ট বইতে বিষয় বিন্যাস দেখা গেছে নিম্নরূপ (প্রথম বি.এ. পরীক্ষাতেও অনুরূপ বিষয়বস্তু পাঠ্য ছিল)

১। English

২। Vernacular

৩। Mathematics and Natural Philosophy

৪। History

৫। Physical Science

৬। Mental and Moral Science

এখন উপরোক্ত ছয়টি বিষয়ের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র যদি ১ থেকে ৫ এই পাঁচটি বিষয়ে পাশ করে থাকেন, তা হলে ষষ্ঠ বিষয় অর্থাৎ মেণ্টাল অ্যান্ড মর‍্যাল সায়েন্স-এ তিনি ফেল করেছেন। আর যদি ছয়টি বিষয়ের মধ্যে যে-কোনও পাঁচটিতে পাশ করে ষষ্ঠ বিষয়ে ফেল করেন, তা হলে বিফলকামবিষয়টি বাংলাও হতে পারে বা অন্য পাঁচটির যে কোনওটি হতে পারে।”

গোপালচন্দ্র রায়-এর মতো তাঁরও বিশ্বাস, বঙ্কিম ফেল করতে পারেন না বাংলায়। কারণ প্রশ্নপত্র ছিল সহজ সরল, তাঁর প্রবন্ধ থেকেই প্রশ্নপত্রের বৃত্তান্ত।

প্রথম প্রশ্ন, মহাভারতের সভাপর্ব থেকে, 'পাণ্ডব রাজসভায় মহর্ষি নারদের আগমন ও জিজ্ঞাসাছলে বিবিধ উপদেশ প্রদান' শীর্ষক কাহিনী থেকে ১৩টি ত্রিপদী উদ্ধৃত করে তার উপর ১৫টি ছোট ছোট প্রশ্ন, প্রথমার্ধের দ্বিতীয় প্রশ্ন, 'পুরুষ পরীক্ষা' থেকে, ছোট্ট একটি কাহিনী উদ্ধৃত করে; ছোটো ছোটো প্রশ্নে তার অর্থ ও তাৎপর্য জানতে চাওয়া। আধঘণ্টা বিরতির পর পরীক্ষার দ্বিতীয়ার্ধ এখানে মোট দুটো প্রশ্ন, দুটোই অনুবাদ। প্রথমটি বাংলা থেকে ইংরেজিতে। দ্বিতীয়টি ইংরেজি থেকে বাংলায়। বাংলা থেকে ইংরেজির অংশটা প্রশ্নকর্তা বিদ্যাসাগরেরই 'শকুন্তলা'-র দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ। সেবারে 'বত্রিশ সিংহাসন' থেকে কোনো প্রশ্ন আসে নি।

১৮৫৮

প্রধান ঘটনাবলী

১৮৫৭-র কপালে রাজটিকা পরিয়ে দিয়েছে সিপাহী বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের তাৎপর্য ব্যক্তি বা সমাজের অবস্থান বিশেষে গৌরবে-অগৌরবে মাখামাখি। এখনো যে এই বিদ্রোহের স্বপক্ষের রায়টা সর্ববাদীসম্মতরূপে এক, তাও নয়। এখনো অনেক প্রশ্ন সজারুর কাঁটার মতো সজাগ। এখনো অনেক বিহ্বলতা, বাঙালী বুদ্ধিজীবীর মননে। তবে মোটামুটিভাবে যেন এতদিনে এক ধরনের সায় মিলেছে যে, হাঁ, সিপাহী বিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম প্রবল পরাক্রান্ত আক্রমণ। এই বিদ্রোহের সার্থকতা-অসার্থকতার চুলচেরা বিচার এখানে অপ্রাসঙ্গিক। তাছাড়া আমরা রয়েছি ঐ ঘটনার সময়সীমার মধ্যেই। পেনটিং আর ইতিহাস দুটোকেই দেখতে হয় ঈষৎ দূরত্ব থেকে। যে-কোনো সাম্প্রতিক ঘটনার উপর দিয়ে সময়ের দীর্ঘ একটা স্রোত বয়ে না যাওয়া পর্যন্ত, সেই ঘটনাকে তার যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে চিনে নেওয়ার মতো প্রজ্ঞা অর্জন সবসময়েই অসম্ভব। বাঙালি শিক্ষিত সমাজ বা আরো নিবিড়ভাবে বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজ এই বিদ্রোহ সম্পর্কে ছিল সচেতনরূপে অচেতন, অথবা সত্যসন্ধানে অনিচ্ছুক অথবা সত্যের অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি হতে দ্বিধাগ্রস্ত, এ-সব বহিরবয়বের তথ্যে যতখানি সত্যি, অন্তর্গত সমাজ-দ্বন্দ্বের গূঢ়তর তত্ত্বের প্রয়োগে তা হালকা হয়ে যায় অনেকখানি। অগ্রসর সমাজ-চেতনার ব্ল্যাকবোর্ডে একশো দেড়শো বা কখনো দুশো-আড়াইশো বছরের ঈষৎ অপরিণত সমাজচেতনার অঙ্ক কষতে গিয়ে যোগফল কাঁটায় কাঁটায় মেলাতে না পেরেই আমরা ফেটে পড়ি অভিযোগে, অবিবেচনার ক্রোধে, তীক্ষ্ণধার সমালোচনায়।

১৮৫৭ যেমন স্মরণীয় সিপাহী বিদ্রোহের অগ্নিতাপের ছটায়, ১৮৫৮-ও তেমনি স্মরণীয় হয়ে উঠল সিপাহী বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়াজাত এক বিরাট রাজনৈতিক পরিবর্তনের ঘনঘটায়।

এই বছরে অবসান ঘটবে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দীর্ঘকালের শাসন। রাজদণ্ড চলে যাবে ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর হাত থেকে সরাসরি সেদেশের, রাজা বিহনে রাজ্ঞীর করকমলে। আর যেহেতু রাজ্ঞীই হয়ে উঠবেন ভারত-ভাগ্য দেবতা, তাই এক শ্রেণীর ভারতবাসীর মনে হবে—এতদিনে অনাথ ভারতবর্ষ ফিরে পেতে চলেছে যথার্থ মাতৃক্রোড়। মহারানী ভিকটোরিয়ার স্তবগানে মুখর হয়ে উঠবে এই বছরের বাংলাদেশ।

বছরের গোড়া থেকেই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আলোচনার শুরু ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে। সে খবর কলকাতায় পৌঁছলে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এ লিখলেন যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে ভারতবর্ষ শাসনের ক্ষমতা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাতে চলে গিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্ঞী ভিকটোরিয়াকে যদি এদেশেরও মহারানী বানানো হয়, তাতে মৌলিক কোনো পরিবর্তন ঘটার সম্ভাবনা নেই। শুধু বদল ঘটবে শাসক-গোষ্ঠীর নামেরই, যেহেতু শাসন-ব্যবস্থায় সব-কিছুই থেকে যাবে অপরিবর্তিত। বিচার বিভাগের উন্নতি হবে না। কঠোরতা কমবে না কর-আদায়ের বেলায়। আর আগের মতোই সরকারি চাকরির বড়ো বড়ো পদগুলোয় বসে থাকবে ইংরেজরাই। আর এরপর যা ঘটবে তা দমন-পীড়নের বাড়াবাড়িই। তৈরি হবে নতুন নতুন আইন-কানুন। কণ্ঠরোধ করা হবে দেশীয় সংবাদপত্রের। অস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ হবে দেশীয়দের বেলায়। সিপাহী বিদ্রোহের এলাকা ছাড়িয়ে সারা দেশেই বলবৎ হবে সামরিক আইন। তবে দমননীতি কখনোই হতে পারে না চিরস্থায়ী। তাছাড়া একশো পঞ্চাশ মিলিয়ন মানুষকে ভয় দেখিয়ে, পীড়ন করে যাওয়াটা কতটা স্থায়ী হবে তা সন্দেহজনক। ভারতবর্ষের শাসন নিয়ে এই নতুন পদক্ষেপের আগে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল এদেশে একটা তদন্ত কমিশন পাঠানো। তাঁদের বোঝা উচিত ছিল এদেশের সমস্যাগুলো ঠিক কোন ধরনের। উত্তর ভারতের মানুষরা দিল্লীর বাদশাকে কীভাবে দেখেছে, পেশোয়া পরিবার সম্পর্কে মধ্যভারতের মানুষের মনোভঙ্গিটা কোন ধরনের, সিপাহী বিদ্রোহের পিছনে থেকে গেছে কোন কোন সক্রিয় কারণ, চিরস্থায়ী ব্যবস্থা ভালো না রায়ত-ওয়ারি ব্যবস্থা, এ-সব না বুঝে শুধুমাত্র ক্ষমতা হস্তান্তর দিয়ে দেশের মানুষের মন জয় করা যাবে না। এই হস্তান্তরে যাঁরা খুশি হতে চলেছেন, তাঁদের ভুল ভাঙবেই। ওদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও এই হস্তান্তরের আশঙ্কায় বিপন্ন। তাঁরা পার্লামেন্টে আবেদন করছেন যে, ভারতবর্ষে সুষ্ঠু শাসন চালানোর ব্যাপারে কোনো রকম ত্রুটিই রাখেন নি তাঁরা। আর সিপাহী বিদ্রোহের জন্যেই যদি তাঁদের হাত থেকে শাসনভার কেড়ে নেওয়ার ইচ্ছা, তাহলে এও জানা উচিত যে ভারত শাসন বিষয়ে কোম্পানির একচ্ছত্র দায়িত্ব ছিল না, ব্রিটেনের মন্ত্রীরাও সমান দায়িত্বে ছিলেন। সে আবেদনে কোনো কাজ হয় নি। শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়টা পাকা হয়ে যাবে বছরের গোড়াতেই।

ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী বের করলেন অদ্বৈতচরণ আঢ্য।

শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আর কৃষ্ণদাস পাল বের করলেন 'ক্যালকাটা মান্থলি ম্যাগাজিন' নামের ইংরেজি মাসিক পত্রিকা। খরচ জোগাতেন বন্ধু প্রসাদদাস দত্ত। বেরিয়েছিল মাত্র তিন-চারটে সংখ্যা।

প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে পড়তেই কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের অন্তর্ধান। আসলে কাউকে কিছু না জানিয়েই চলে গিয়েছিলেন পশ্চিমে।

"আমার ভ্রাতা শ্রীমান কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য গত ৫ বৈশাখ শনিবার দিবস নিরুদ্দেশ

হইয়াছে। তাহার বয়স ১৬/১৭ বৎসর কিন্তু খর্ব্বাকৃতি জন্য অল্প বোধ হয়, গৌরাঙ্গ, কৃশ, সংস্কৃত কলেজ হইতে প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিল যে কেহ তাহার অনুসন্ধান করত ধৃত করিতে পারেন প্রভাকর যন্ত্রালয় অথবা নরমেল স্কুলে আমার নিকট সংবাদ দিলে তাঁহার নিকট যথোচিত বাধিত ও উপকৃত হইব। শ্রী রামকমল ভট্টাচার্য। নরমেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক।"

সংবাদ প্রভাকর, ২০ এপ্রিল

বেরল কালীপ্রসন্ন সিংহের 'সাবিত্রী সত্যবান' নাটক। প্রাচীন কোনো সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ নয়। নিজের লেখা।

অল্প কিছুদিনের জন্যে যখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, তখনই বেরল বিহারীলাল চক্রবর্তীর গদ্য রূপক কাব্য 'স্বপ্নদর্শন'।

বেলগাছিয়া থিয়েটারে 'রত্নাবলী' নাটকে নাম-ভূমিকায় অভিনয় করলেন সংগীতজ্ঞ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

জেমস হিউমের পরামর্শে আর কিশোরীচাঁদ মিত্রের উদ্যোগে কলকাতায় গড়ে উঠল Calcutta Printing and Publishing Co. উদ্দেশ্য 'ইন্ডিয়ান ফীল্ড' নামের এমন একটি পত্রিকার প্রকাশ, যা হয়ে উঠবে দেশবাসীর মুখপত্র। মূলধন ৫০ হাজার টাকা, ২৫০ টাকার ২০০ শেয়ার থেকে। টাকা জোগালেন প্রধানত পাইকপাড়ার প্রতাপচন্দ্র আর ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ। যে পরিচালক মণ্ডলী গড়া হল, তাতে থাকলেন

মিঃ সেথ. এ. আপকার
মিঃ জর্জ শ্যালো
মিঃ চার্লস পিকার্ড
বাবু রমানাথ ঠাকুর
বাবু ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ

নীলমণি মিত্র পেয়ে গেলেন প্রেসিডেন্সি বিভাগের সহকারী ইঞ্জিনিয়ারের পদ। কয়েক বছর পরে অবশ্য ইস্তফা দেবেন এই চাকরি থেকে, স্বাধীনভাবে স্থাপত্যের কাজ করতে চেয়ে।

যুক্ত প্রদেশের গাজীপুরে সম্ভ্রান্ত বৈদ্যবংশে কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের জন্ম। আদি নিবাস, হুগলি জেলার বলাগড়। বাবা, লক্ষ্মীনারায়ণ সেন।

নীলমণি কুমার যোগ দিলেন সৈন্য সংক্রান্ত হিসেব-বিভাগের চাকরিতে।

১৪ বছর বয়সে মহেশপুরের মডেল স্কুল থেকে পাস করে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হলেন লালমোহন বিদ্যানিধি।

বেরল ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'প্রবোধ প্রভাকর'। পিতা বনাম পুত্রের কথোপকথনের ছলে এ বইয়ে

"কেবল নীতি এবং হিতোপদেশাদি বহুবিধ শিবকর বিষয় লিখিত হইয়াছে, গদ্যের অপেক্ষা পদ্যের অংশই অধিক।"

তারাশঙ্কর কবিরত্নের মৃত্যু।

বেরল রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী' নাটক।

"....অবিশ্রান্ত পীযূষ পানের ন্যায় গ্রন্থের আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমরা সর্বতোভাবে পরিতৃপ্ত হইয়াছি।... তাঁহাকর্ত্তৃক রত্নাবলীর সৌন্দর্য্য যাদৃশ পরিপাটীরূপে বঙ্গভাষায়

প্রকটিত হইয়াছে, বোধ হয় অতি অল্প লোকে তাদৃশরূপে সংস্কৃতের চাতুর্য্য বাঙ্গালাতে রক্ষা করিতে পারিতেন।"

বিবিধার্থ সংগ্রহ

বেরল রঙ্গলালের 'ভেক-মূষিক যুদ্ধ'। এই উপকাব্য আগে ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল এডুকেশন গেজেটে।

"এই উপকাব্যখানি এডুকেশন গেজেট পত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়া ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে পুস্তিকাকারে প্রচারিত হয়। গ্রীক সাহিত্যের Batrachomyomachia নামে প্রাচীন বীর-ব্যঙ্গ রসাত্মক উপকাব্য হইতে বাঙ্গালা ভাষায় পদ্যানুবাদ, মাত্র ৩৩ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত গ্রন্থখানি রঙ্গলাল মূল গ্রীক ভাষা হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে 'ভেক ও মূষিকের যুদ্ধ'-ই সর্বপ্রথম বীর-ব্যঙ্গ-কাব্য। কারণ এই বইখানি প্রকাশিত হইবার চারি বৎসর পরে জগদ্বন্ধু ভদ্রের 'ছুছুন্দরী বধ কাব্য' রচিত হইয়াছিল।"

মহাকবি রঙ্গলাল / শিবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

"রেভারেণ্ড ও'ব্রায়েন স্মিথ গ্রীক্ সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং রঙ্গলাল সম্ভবতঃ তাঁহার নিকটেই ইতিমধ্যে গ্রীক্ ও ল্যাটিন ভাষায় শিক্ষা লাভ করেন। পার্ণেলের ইংরাজী অনুবাদ হইতে তিনি বোধ হয় সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু মূল গ্রীক কাব্য অবলম্বনেই তাঁহার 'ভেক ও মূষিকের যুদ্ধ' রচিত হইয়াছিল এরূপ অনুমানও অসঙ্গত নহে। রঙ্গলালের অনুবাদে গোল্ডস্মিথ কর্ত্তৃক পার্ণেলের অনুবাদে লক্ষিত দোষ বর্ত্তমান নাই।...'ভেক ও মূষিকের যুদ্ধ' 'এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশিত হইলে পাঠকগণ পরম আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং কতিপয় বন্ধুর সনির্বন্ধ অনুরোধে রঙ্গলাল উহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন।"

রঙ্গলাল / মন্মথনাথ ঘোষ

প্রথম প্রকাশের সময় বইয়ের প্রচ্ছদ অথবা টাইটেল পেজে অনুবাদকের নাম ছিল না। বেরল ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'পুরাবৃত্ত সার'-এর প্রথম খণ্ড।
প্রথম বারের বিজ্ঞাপন—

"বাঙ্গালাভাষায় ইতিহাস গ্রন্থ অধিক নাই। কিন্তু যে সকল বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থানে স্থানে সংস্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাতে অন্যান্য বিষয়ের সহিত মনুষ্যজাতির প্রকৃত ইতিবৃত্তের বিষয়ও কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজনীয় বোধ হয়। ঐ প্রয়োজন সাধন করিবার অভিপ্রায়ে নানা ইংরাজী পুস্তক হইতে 'পুরাবৃত্তসার' সঙ্কলিত হইল। পশ্চিমে মিশরদেশ হইতে পূর্বদিকে পারস্য সাম্রাজ্য পর্যন্ত নানা জনপদবাসী কতিপয় প্রধান প্রাচীন জাতীয় লোকদিগের স্থূল স্থূল পূর্ব বিবরণ সমুদয় সংক্ষেপে বর্ণনা করা, আর মনুষ্য সমাজ যে নিয়ত পরিবর্ধন এবং পরিবর্তনশীল, ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রত্যয়িত করা, ইহাই এই খণ্ডের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সাধনে যে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য হইয়াছি কদাচিৎ ভ্রমক্রমেও এমত দুরাশা সঞ্চিত করি নাই। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, বাঙ্গালা দক্ষিণ খণ্ডের বিদ্যালয়সমূহের অফিসিয়েটিং ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত হ্যাণ্ড সাহেবের বিশেষ যত্নে এই পুস্তক মুদ্রিত করিতে দেওয়া হয় এবং ইহার মুদ্রণকালে হুগলী নর্ম্যাল বিদ্যালয়ের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন শোধনার্থ বিশিষ্ট সহায়তা করেন।"

বেরল ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান'-এর প্রথম ভাগ আর টেকচাঁদ ঠাকুর ওরফে

প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'।

আগেই এই বইটি নিয়ে শোনা হয়ে গেছে সমসাময়িক আলোচনা। ফরাসি ইমপ্রেশনিস্টরা যেমন ছবির ভিতরে বইয়ে দিয়েছিল আলো আর হাওয়া, প্যারীচাঁদ মিত্র অনেকটা সেইভাবে মুখের কথার আলো হাওয়াকে বইয়ে দিলেন বাংলা ভাষার কথাসাহিত্যে। আর জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গেই 'আলালী' ভাষা নামে সংবর্ধিত হল তাঁর এই নতুন ভাষারীতি। এই আনকোরা নতুন গড়নের ভাষার পক্ষে বিপক্ষে আরো কিছু কথা—

"....আলালী ভাষা সম্প্রদায় বিশেষের বিশেষ মনোরঞ্জিকা হইলেও, উহা সর্ববিধ পাঠকের পক্ষে উপযুক্ত নয়। যদি তাহা না হইল, তবে আবার জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, ঐরূপ ভাষার গ্রন্থ রচনা করা উচিত কিনা? আমাদের বোধে উচিত। যেমন ফলারে বসিয়া অনবরতই মিঠাই-মণ্ডা খাইলে জিহ্বা একরূপ বিকৃত হইয়া যায়, মধ্যে মধ্যে আদার কুচি ও কুমড়োর খাট্টা মুখে না দিলে সে বিকৃতি নিবারণ হয় না, সেইরূপ কেবল বিদ্যাসাগরী রচনা শ্রবণে, মনের যে একরূপ ভাবে জন্মে তার পরিবর্ত্তন করণার্থ মধ্যে মধ্যে অপরবিধ রচনা শ্রবণ করা পাঠকদিগের আবশ্যক।"

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব/রামগতি ন্যায়রত্ন

"বিশুদ্ধ সহজ বাঙ্গালায় সুন্দর গদ্য হয়, প্যারীচাঁদ মিত্র হইতে এইটি যে কেবল শিখিয়াছিলাম এমন নহে, শব্দের ছটা, ঘটা না করিয়া, সোজা কথাতেই যে অনুপ্রাস আসে, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আলালের ঘরের দুলালের আরম্ভ 'বৈদ্যবাটীর বাবুরাম বাবু বড় বৈষয়িক ছিলেন'। এতো টেনে বুনে অনুপ্রাস নয়; শব্দের ঘটা ছটায় মিলন নয়। সহজ কথা সহজে বলিতে গিয়া অনুপ্রাস হইয়াছে। টেকচাঁদের সারল্যে মুগ্ধ হইয়াছিলাম বটে। কিন্তু কেহ বলিয়া না দিলেও তাহার গ্রাম্য দোষ— তখনও নাম টাম না জানিলেও একটা দোষ বলিয়া বোধ হইয়াছিল।... বুঝিয়াছিলাম সংস্কৃতানুসারিণী বাঙ্গালা ভাষা অতি সুন্দর হইলেও বয়স্থা কুলীন কন্যার মত কেমন বোধ হইত। শীঘ্র ছিন্ন গোত্র হউক আপনার বর আপনি করিতে শিখুক। আপনার পথ আপনি দেখুক, এই প্রকার ইচ্ছা হইত। যখন টেকচাঁদ ঠাকুর ঘটক সাজিয়া সোজা বাঙ্গালাকে বর সাজাইয়া সভাতে উপস্থিত করিলেন, তখনও পাত্র আপনাদের আত্মীয় হইলেও কেমন যেন ছোট ঘরের অপাত্র বলিয়া, বোধ হইল। বঙ্কিমবাবু যখন স্বয়ং বর বেশে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহাকে উপযুক্ত পাত্র বলিয়া বোধ হইল।"

পিতাপুত্র/অক্ষয়চন্দ্র সরকার

"বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয়বাবু উভয়েই সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ ও সংস্কৃত ভাষানুরাগী লোক ছিলেন; সুতরাং তাঁহারা বাঙ্গালাকে যে পরিচ্ছদ পরাইলেন তাহা সংস্কৃতের অলঙ্কারে পরিপূর্ণ হইল। অনেকে এইরূপ ভাষাতে প্রীতিলাভ করিলেন বটে, কিন্তু বহুসংখ্যক লোকের নিকট বিশেষতঃ সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের নিকট ইহা অস্বাভাবিক, কঠিন ও দুর্বোধ্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সে সময়ে পাঁচজন ইংরাজি শিক্ষিত লোক কলিকাতার কোনও বৈঠকখানাতে মিলিলেই এই সংস্কৃত বহুল ভাষা লইয়া অনেক হাসাহাসি হইত। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর'-এর ন্যায় সাময়িক পাত্রেই সেই উপহাস বিদ্রূপ প্রকাশ পাইত। অক্ষয়বাবু যখন সংস্কৃতকে আশ্রয় করিয়া 'জিগীষা' 'জিজীবিষা' প্রভৃতি শব্দ প্রণয়ন করিলেন, তখন আমরা কলিকাতার যে কোন শিক্ষিত লোকের বাটী যাইতাম, শুনিতে পাইতাম 'জিগীষা', 'জিজীবিষা', প্রভৃতি শব্দের সহিত 'টিড্‌টিমীষা' শব্দ যোগ করিয়া হাসাহাসি হইতেছে।...কিন্তু আলালের ঘরের দুলাল, বঙ্গসাহিত্যে নবযুগ আনয়ন করিল। এই পুস্তকের ভাষার নাম 'আলালী ভাষা'

হইল। তখন আমরা কোনও লোকের ভাষাকে গাম্ভীর্যে হীন দেখিলেই তাহাকে আলালী ভাষা বলিতাম।... এই আলালী ভাষার সৃষ্টি হইতে বঙ্গসাহিত্যের গতি ফিরিয়া গেল। ভাষা সম্পূর্ণ আলালী রহিল না বটে, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রী রহিল না, বঙ্কিমী হইয়া দাঁড়াইল। এজন্য আমার পূজ্যপাদ মাতুল, সোমপ্রকাশ সম্পাদক, খ্যাতনামা দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সোমপ্রকাশে কতই শোক করিলেন। কিন্তু আমার বোধ হয় ভালই হইয়াছে। জীবন্ত মানুষ ও ভাষা যত কাছাকাছি থাকে, ততই ভাল।"

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ/শিবনাথ শাস্ত্রী

আলালের ঘরের দুলাল ইংরেজিতে অনুবাদ হয়েছে ছ বার। প্রথম বারের অনুবাদক নরেন্দ্রনাথ মিত্র। বিলেত থেকে বেরনো 'জার্নাল অব দি ন্যাশনাল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'-এ ১৮৮২-৮৩-তে ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল সে অনুবাদ 'দি স্পয়েল্ট চাইল্ড' নামে। নরেন্দ্রনাথ সাহায্য নিয়েছিলেন মিরিয়ম এস. নাইট-এর। ১৮৯৩-এ জি. ডি. অসওয়েল বের করলেন আর-এক অনুবাদ, 'দি স্পয়েল্ট চাইল্ড : এ টেল অব হিন্দু ডোমেস্টিক লাইফ'।

সম্ভবত এই বছরেই গড়ে ওঠে বাঙালির প্রথম চিত্রশালা 'রয়্যাল লিথোগ্রাফিক প্রেস'। 'শিল্পপুষ্পাঞ্জলি' পত্রিকায় শরচ্চন্দ্র দেব 'কলিকাতার ইতিহাস' নামের প্রবন্ধে লেখা হয়েছিল—

"এই সময়ে বঙ্গদেশের প্রথম আর্ট স্টুডিও স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়ের চারিজন ছাত্র (দিননাথ দাস, নবীনচন্দ্র ঘোষ, হীরালাল দাস ও তিনকড়ি মজুমদার) ১নং জিগজাগ লেন কসাইটোলার পেন্টিং, লিথোগ্রাফি, ডেকোরেশন, এনগ্রেভিং প্রভৃতি বিষয় অবলম্বন করিয়া কার্য আরম্ভ করেন।"

এ-লেখায় 'বিদ্যালয়ের চারিজন' বলতে গিয়ে যে বিদ্যালয়ের উল্লেখ করা হয়েছে সেটা 'ক্যালকাটা স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্টস', যার প্রতিষ্ঠা ১৮৫৪-য়। এই স্কুলই পরে রূপান্তরিত হয় গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্টস-এ। শিল্প-গবেষক কমল সরকার তাঁর 'বাঙালীর আদি চিত্রশালা' প্রবন্ধেই প্রথম হদিশ দেন এই চিত্রশালাটির।

বরিশালের বানারিপাড়ায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অন্যতম নায়ক মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার জন্ম।

প্রাচীন পুঁথির সংগ্রাহক ও সাহিত্যিক অম্বিকাচরণ গুপ্তের জন্ম বর্ধমানের ভাঙামোড়ায়।

রসায়নশাস্ত্রে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক পেলেন বিখ্যাত চিকিৎসক নবীনচন্দ্র মিত্র।

বিদ্যাসাগর-এর জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম চব্বিশ পরগনার নলকুঁড়ায়। বাবা, রামকমল।

যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর যৌথ উদ্যোগে এদেশের থিয়েটারে ঐকতান বাদনের প্রচলন।

ঢাকার বারদীতে কুঞ্জলাল নাগের জন্ম। নাট্যকার, শিক্ষক আর বাগ্মী হিসেবে ছিলেন ঢাকার সাংস্কৃতিক জগতের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব।

বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের কর্ণধার মধুসূদন মুখোপাধ্যায়-এর লেখা সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বই বেরবে এইখান থেকে। ... থেকে ৫৮ মধ্যে ৬ খানা বই। সুকুমার সেন-এর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' থেকে বইগুলির সম্পর্কে তথ্য—

১। হংসরূপী রাজপুত্রদিগের কথা। ছবি এক। পৃষ্ঠা ৪৫। দাম ৭ পয়সা
২। পুত্রহারা শোকাতুরা দুঃখিনী মাতা ও নায়ক শোকাতুরা দুঃখিনী নায়িকা। ছবি ১। দাম ১ আনা।
৩। ছোট কৈলাস, বড় কৈলাস। ছবি ১। পাতা ২৫। দাম ১ আনা।
৪। চকমকি বাক্‌সো, অপূর্ব রাজপুত্র। ছবি ১। পাতা ৩০। দাম ১ আনা।
৫। মৎস্যনারীর উপাখ্যান। পাতা ৭৮। দাম ৯ পয়সা।
৬। চীনদেশীয় বুলবুল পক্ষীর গল্প। পাতা ২৮। দাম ১ আনা।

ঢাকায় খ্যাতনামা সাহিত্যিক কায়কোবাদ-এর জন্ম। আসল নাম, মোহাম্মেদ কাজেম আলী কোরেশী। আজীবন পোস্টমাস্টার নিজের গ্রাম নবাবগঞ্জের আগলায়।

জানুয়ারি

সাধারণ মানুষকে বিনামূল্যে বিলোনোর কথা মাথায় রেখে বেরল 'রচনা-রত্নাবলী' নামের মাসিক পত্রিকা। প্রাণনাথ দত্ত অন্যতম পরিচালক। 'সংবাদ প্রভাকর'-এর মন্তব্য—

"অতি মান্যবংশ্য বিদ্যানুরাগি সুশিক্ষিত সুলেখক শ্রীমান্ বাবু প্রাণনাথ দত্ত, বৈদ্যনাথ চন্দ্র এবং অপরাপর কতিপয় সুপথগামি সুজন যুবকের প্রণীত 'রচনা-রত্নাবলী' নাম্নী একখানি বিনামূল্যের মাসিক পত্রিকার ১ সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া পাঠ পূর্ব্বক পরমানন্দ লাভ করিলাম। ইহার গদ্য পদ্য উভয় রচনাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং অতি সুমধুর হইয়াছে।"

বিদ্যাসাগর 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সম্পাদক। এই বছরের জানুয়ারি থেকে মে মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগর বালিকা বিদ্যালয় গড়ে তুললেন মোট ২৭টি। হুগলিতে ১৩। বর্ধমানে ১০। মেদিনীপুরে ৩। নদীয়ায় ১টি।
কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য সম্ভবত এই বছরের জানুয়ারিতেই বের করেছিলেন তাঁর সাপ্তাহিক পত্রিকা 'বিচারক'। ২২ ফেব্রুয়ারির 'সংবাদ প্রভাকর'-এ মন্তব্য—

"বিচারক নামক একখানি অভিনব সাপ্তাহিক পত্রের ১ হইতে ৩ সংখ্যা প্রাপ্ত হইলাম, বিচারক তত্ত্ব বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এই অনুষ্ঠানটি অতি সদনুষ্ঠান বটে। প্রতিজ্ঞা এবং উৎসাহকে স্থির রূপে রক্ষা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারিলে অত্যন্ত সুখের বিষয় হইবে। সম্পাদক মহাশয় কি জন্য আপনার নামটি গোপন করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারিলাম না।"

কৃষ্ণকমলের নিজের কথা—

"সে সময়ে বাঙ্গালা রচনার দিকে আমার কিছু ঝোঁক ছিল। 'বিচারক' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র তৎকালে আমি বাহির করিয়াছিলাম। ইহা অ্যাডিসনের Spectator-এর ধরণে গঠিত হইয়াছিল। একটি সন্দর্ভে সমস্ত কাগজ পূর্ণ হইত। সর্ব্বোপরি একটি করিয়া সংস্কৃত motto থাকিত। কি কারণে, মনে নাই, পাঁচ ছয় সংখ্যা বাহির হইয়াই উহা কিন্তু বন্ধ হইয়া যায়। পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের জ্ঞাতিভ্রাতা তারাধন ভট্টাচার্য্য পত্রিকার ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন।
বিচারক বন্ধ হইয়া গেল। অনতিবিলম্বে সুহৃদ্বর কবি বিহারীলাল 'পূর্ণিমা' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রতিষ্ঠিত করেন।"

পুরাতন প্রসঙ্গ

১৩ জানুয়ারি

রামচন্দ্র দিচ্ছিতের সম্পাদনায় চুঁচড়া থেকে বেরল 'সুবোধিনী' পাক্ষিক পত্রিকা। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'পিতা পুত্র'-য় রামচন্দ্র সম্পর্কে তথ্য—

"বাঙ্গালার হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ। ওবারসিয়র পরীক্ষা পাশ করা। সংস্কৃত, বাঙ্গালা বেশ জানিতেন। সরল, প্রাঞ্জল, বিশুদ্ধ, সাধুভাষায় সুবোধিনী ছাপা হইত।"

১৪ জানুয়ারি

বেথুন সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশন। জেমস হিউম সভাপতি। এ বছরের জন্যে অধ্যক্ষ সভা গড়া হল এই রকম—

সভাপতি, জেম্‌স হিউম
সহ সভাপতি, নর্ম্যান চেভার্স আর রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ
গ্রন্থাধ্যক্ষ,—গর্ডন ইয়ং, জেমস লঙ, কিশোরীচাঁদ মিত্র
কোষাধ্যক্ষ, হরমোহন চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক, রামচন্দ্র মিত্র

তখন নিয়ম ছিল বেথুন সোসাইটিতে পাঠ-করা কোনো প্রবন্ধ পত্র-পত্রিকায় ছাপতে হলে জানাতে হবে সেটা সোসাইটিতে পঠিত। এবারের অধিবেশনে নবীনকৃষ্ণ বসুর 'On the Landed tenure in Bengal' প্রবন্ধ নিয়ে বিতর্ক। যেহেতু একটি ইংরেজি দৈনিকের সম্পাদকীয় রচনা হিসেবে সেটি ছাপা হয়েছে সোসাইটিতে পঠিত উল্লেখ না করেই। সভাপতি হিউম জানালেন, সোসাইটির এই সপ্তম নিয়মটা পাল্টানো দরকার। কিন্তু যতক্ষণ না পাল্টানো হচ্ছে, প্রত্যেক প্রবন্ধ-পাঠককে মেনে চলতেই হবে ঐ নিয়ম।

১৮ জানুয়ারি

বেরল 'কলিকাতা বার্ত্তাবহ' নামের অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা।

৬ ফেব্রুয়ারি

১৮ বছর বয়সে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিয়ে যশোহরের নরেন্দ্রপুরের তারাচাঁদ চক্রবর্তীর মেয়ে সর্বসুন্দরীর সঙ্গে।

৭ ফেব্রুয়ারি

১৭ বছর বয়সে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিয়ে।

১৩ ফেব্রুয়ারি

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির পর পর দুটি বিয়েকে নিয়ে 'সংবাদ প্রভাকর' লিখলে—

"মহামান্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সিমলা হইতে লাহোরে আসিয়াছেন। আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, তিনি তথা হইতে অবিলম্বে এতন্নগরে প্রত্যাগমন করিবেন।

গত শনিবার রাত্রিতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের এবং রবিবার রাত্রিতে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের শুভবিবাহ কার্য সর্বাঙ্গসুন্দররূপে সুনির্বাহ হইয়াছে। সুবিখ্যাত সর্বগুণজ্ঞ ধার্ম্মিকবর শ্রীযুত

বাবু রমানাথ ঠাকুর মহাশয় তথা বাবু নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই মাঙ্গলিক কর্ম্মে সর্ব্বতোভাবে প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথবাবু এতৎ কর্ম্মে স্বয়ং উপস্থিত থাকিলে আরো অধিক সুখের বিষয় হইত।"

৯ মার্চ

কান্দীতে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মৃত্যু। ১৮৫০-এর নভেম্বরে সংস্কৃত কলেজ ছেড়ে দিয়ে মুর্শিদাবাদের জজপণ্ডিত হয়েছিলেন পাঁচ বছর। ১৮৫৫-র ডিসেম্বরে মুর্শিদাবাদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। এর এক বছর পরে কান্দীর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। মুর্শিদাবাদে থাকার সময় গঙ্গাচরণ সেন-এর সাহায্য নিয়ে বহরমপুরে গড়ে তুলেছিলেন একটা দাতব্য সমাজ, অনাথ-আতুরদের সাহায্য জোগাতে। কান্দীতে এসে গড়লেন সেখানকার রাস্তা-ঘাট বিদ্যালয় ইত্যাদি। মুর্শিদাবাদের মতো এখানেও গড়লেন অনাথ মন্দির। খুললেন বালিকা বিদ্যালয়। এ ছাড়াও দাতব্য চিকিৎসালয় আর ইংরেজি স্কুল গড়ে উঠল তাঁরই চেষ্টায়।

"মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জন্য আমার বড় আপশোষ হয়। স্কুলে যতদিন শিক্ষক ছিলেন, সেই সময়েই তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যচর্চ্চা করিতেন, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হওয়ার পর আর সেদিকে নজর দেন নাই। তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা তাঁহাকে যে স্বাতন্ত্র্য-দান করিয়াছিল, সেই স্বাতন্ত্র্য বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা অমূল্য জিনিষ। সেই স্বাতন্ত্র্যই বাঙ্গালা সাহিত্যকে বৈচিত্র্য দান করিতে পারিত, শুধু বিদ্যাসাগরের ভাষাই বাঙ্গালার একমাত্র উপকরণ হইয়া থাকিত না। কিন্তু তিনি সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালা-সাহিত্যচর্চ্চাও ছাড়িলেন। যিনি 'বাসবদত্তা'-র প্রণেতা তাঁহারই 'শিশু শিক্ষা' এখনও আমাদের ছেলেমেয়েদের উপভোগ্য জিনিষ। তাঁহার 'পাখী সব করে রব' কবিতাটি কোন্ শিশু না সুর করিয়া আবৃত্তি করিয়াছে? তিনি 'সর্ব্বশুভকরী' নাম্নী একখানি মাসিক পত্রিকাও সম্পাদন করিয়াছিলেন।...

আমার বিশ্বাস মদনমোহনের 'বাসবদত্তা' তাঁহার পঠদ্দশায় বিরচিত ও মুদ্রিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি 'রসতরঙ্গিণী' নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থখানি বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন। পদ্য ও গদ্য লিখিবার ক্ষমতা তাঁহার অতি অদ্ভুত ছিল।... আমার মনে হয়। তিনি যদি ডেপুটিগিরি চাকরি করিতে না গিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যসেবায় রত থাকিতেন তাহা হইলে এক্ষণে আমরা যে প্রশংসা-পুষ্পাঞ্জলি কেবল বিদ্যাসাগরের চরণে অর্পণ করিতেছি তাহা অর্দ্ধেক ভাগ করিয়া দুই জনকে দিতে হইত। Genius অর্থাৎ প্রতিভা নামক যে পদার্থ আছে, মদনমোহনের স্বভাবসিদ্ধ তাহা ছিল বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু অনুশীলনের অভাবে উহার তাদৃশ খোল্‌তা হইতে পারিল না।

বিদ্যাসাগর ও মদনমোহনের দৃষ্টান্ত দেখিয়া বেশ বুঝা যায় যে, ইহ সংসারে উন্নতিলাভের পক্ষে বুদ্ধিবৃত্তির উপযোগিতা অপেক্ষা যাহাকে character (চরিত্র) কহে অর্থাৎ অধ্যবসায়, বিবেচকতা, এবং অকুতোভয়তা এই সকল বৃত্তির উপযোগিতা অধিক। বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাসাগর দুইজনেই বোধ হয় কাছাকাছি ছিলেন, কিন্তু চরিত্র অংশে আস্‌মান জমিন্ প্রভেদ। যাহাকে backbone কহে, বিদ্যাসাগরের তাহা পূর্ণমাত্রায় ছিল, কিন্তু সে বিষয়ে তর্কালঙ্কার হয় ত Vertebrate শ্রেণীর অন্তর্গত হয়েন কি না সন্দেহ।"

পুরাতন প্রসঙ্গ/কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য।

২২ মার্চ
'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' আরও দুবার রামজয় বসাকের বাড়িতে অভিনয়ের পর তৃতীয় বারের অভিনয় গদাধর শেঠের বাড়িতে।

২৪ মার্চ
'সংবাদ প্রভাকর'-এ 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব'র অভিনয় নিয়ে 'একজন সভ্যতাপথের পথিক' নামে জনৈক পাঠকের চিঠি—

> "....গত ১০ চৈত্র সোমবার রজনীতে শ্রীযুক্ত বাবু গদাধর সেট্ মহাশয়ের ভবনে কুলীন কুল সর্ব্বস্ব নামক নবীন নাটকের তৃতীয় বার অভিনয় হয়। বড়বাজার স্থিত এই রঙ্গভূমি প্রায় ছয় সাত শত লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, তম্মধ্যে শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীযুক্তবাবু কিশোরীমোহন [চাঁদ] মিত্র প্রভৃতি অনেকানেক মহোদয়গণ আগমন করিয়া সভামণ্ডপ শোভিত করিয়াছিলেন। অভিনয় প্রক্রিয়া যে কতদূর সুন্দর হইয়াছিল, তাহা লেখনী সম্যকরূপে প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে। এই অভিনয় দর্শন করিয়া প্রত্যেক দর্শকেই ভূরি ২ ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন।"

...

বঙ্গদেশে আজকাল বড় ধুম ধাম
যেথা সেথা শুনা যায় অভিনয় নাম।।
বঙ্গদেশে বঙ্গবিদ্যা হোতেছে প্রকাশ।
সকলে উৎসাহ করে এই মম আশ।।
নাটক লইয়া সবে রঙ্গরসে থাক।
কালিদাস হোয়ে সবে কালীনাম ডাক।।

২৭ মার্চ
দিনটা ছিল শনিবার। এই তারিখ থেকে বেরতে লাগল নতুন ইংরেজি সাপ্তাহিক 'ইন্ডিয়ান ফীল্ড'।

> "এই পত্রিকার শিরোদেশে শিকার, কৃষি, পূর্ত্ত, রাজনীতি, সাহিত্য ও শিল্পবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণের চিত্র অঙ্কিত থাকিত। সর্বপ্রথমে শিকার ও ক্রীড়া বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। পরবর্তী পৃষ্ঠায় রাজনীতি প্রভৃতি আলোচিত হইত। জেমস হিউম 'এবেল ইষ্ট' (Abel East) এই ছদ্মনামে এই পত্রিকা সম্পাদন করিতেন। অনেক ইংরাজ লেখক এই পত্রিকা পরিচালনে তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। রাজনীতিক স্তম্ভে কিশোরীচাঁদ ফীল্ডের অন্যতম প্রধান লেখক ছিলেন। রাজা (তখন বাবু) ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ এই পত্রিকায় মধ্যে মধ্যে ক্রীড়াবিষয়ক প্রবন্ধাদি লিখিতেন। এই পত্রিকা প্রচারের অব্যবহিত পরেই আশাতীত সাফল্যলাভ করিয়াছিল এবং সৈন্যবিভাগীয় অধিকাংশ ইংরাজ কর্ম্মচারী ইহার গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হন।"

কর্ম্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র /
মন্মথনাথ ঘোষ

এপ্রিল

কলকাতার হাড়কাটা লেনের 'হিতৈষিণী সভা'-র মুখপত্র হয়ে বেরল 'হিতৈষিণী' নামের মাসিক পত্রিকা।

১৩ মে

জননারায়ণ সর্বাধিকারী আর বৌবাজারের দত্ত পরিবারের উমেশচন্দ্র দত্ত গোল্ডস্মিথ আর পার্নেলের 'দি হারমিট' নামের কবিতা দুটোর উৎকৃষ্ট অনুবাদের জন্যে ঘোষণা করেছিলেন ১০ আর ৩৫ টাকা পুরস্কার। এই তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' জানিয়ে দিলে দুটোতেই 'সর্ব্বতোভাবে উত্তম' হয়েছে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদ। দুটো অনুবাদই ছাপা হয়েছিল ঐ পত্রিকায়। যদিও এর সত্যতা নিয়ে সংশয় আছে কিছুটা।

৪ জুন

সংবাদ প্রভাকর আগামী শনিবার ৭টায় বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'সাবিত্রী সত্যবান' নাটকের আভিনয়িক পাঠ-এর খবর দিয়ে লিখলে—

> "এরূপ প্রথা বঙ্গবাসিগণের মধ্যে প্রচলিত নাই, তবে ইংরাজী সেক্সপিয়র প্রভৃতি নাটক যেরূপ পঠিত হইয়া থাকে ইহাও সেইরূপে পঠিত হইবেক অধিকন্তু ইহাতে বিস্তর গীত সংযোজিত হইবায় তাহা যন্ত্রের সহিত মিলাইয়া গান করা যাইবেক।"

১৪ জুন

সংবাদপত্রের উপর থেকে উঠে গেল সরকারি নিয়ন্ত্রণ।
'সংবাদ প্রভাকর' লিখলে—

> "আমাদিগের বর্ত্তমান গভর্নর জেনারল বাহাদুর বিগত ইংরাজি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ জুন দিবসাবধি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ জুন তারিখ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় ছাপাযন্ত্রের স্বাধীনতা বন্ধ করেন, আমরা সেই অবধি যে প্রকার সাবধান এবং বিহিত বিবেচনা-সহকারে মানে মানে সম্পাদকীয় কার্য নির্বাহ করিয়া আসিতেছি, তাহা গুণগ্রাহী পাঠক মহাশয়েরা বিশেষরূপে অবগত আছেন, এক্ষণে ছাপাখানার স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া গেল।"

১৫ জুন

হিন্দু কলেজের পড়া শেষ করে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেন ডা. বলাইচন্দ্র সেন।

৩ জুলাই

'সংবাদ প্রভাকর'-এ চুঁচড়ায় নরোত্তম পালের বাড়িতে 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নাটকের অভিনয়ের খবর—

> "...এই উপলক্ষে প্রায় নয় শত দর্শক সমুপস্থিত হইয়া সভাকে শোভায়মান করিয়াছিলেন, যেরূপে অভিনয় প্রদর্শনের কার্য্য নিষ্পাদিত হইয়াছিল তদ্দর্শনে দর্শক মাত্রেই আমোদী হইয়াছিলেন এবং নটগণের অঙ্গভঙ্গী ও বাক্য কৌশল দর্শন ও শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন, বিশেষতঃ জীবানুরাগি নটগণ এই প্রথমবারেই

এতদ্ব্যাপার এবম্প্রকার উত্তমরূপে সুসম্পন্ন করাতে অনেকেই মুক্ত কণ্ঠে তাঁহাদিগের প্রশংসিত কর্ম্মের ঘোষণা করিতেছেন...."

অক্ষয়চন্দ্র সরকার ছিলেন এদিনের অভিনয়ের অন্যতম দর্শক। 'পিতা পুত্র' প্রবন্ধে তারই স্মৃতি-চারণা—

"এই সময়ে মহা ধুমধামে চুঁচুড়ায় কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটকের অভিনয় হইল। তখনও কলিকাতায় নাটক অভিনয় আরম্ভ হয় নাই। প্রসিদ্ধ গায়ক এবং গাথক রূপচাঁদ পক্ষী আসিয়া গান বাঁধিয়া দিলেন, তালিম দিলেন ; একদিন নিজে গাহিয়াও দিলেন। নাটকের নটীর গান হাটে বাজারে গীত হইতে লাগিল— 'অধিনীরে গুণমণি পড়েছে কি মনে হে?' গ্রন্থকার রামনারায়ণের রচনার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হইল, তাঁহার নান্দী, নাপ্‌তে বৌ-এর পরিচয় ও তিনরূপ ফলারের লক্ষণ প্রভৃতি মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলাম। ফলার এখনও ভুলি নাই।"

পিতা পুত্র/অক্ষয়চন্দ্র সরকার/
বঙ্গ-ভাষার লেখক

৩১ জুলাই

বেলগাছিয়া নাট্যশালায় রামনারায়ণ তর্করত্নের বাংলা অনুবাদে শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয়।

"পাইকপাড়ার রাজাদের বেলগাছিয়াস্থিত বাগান-বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার এই নাম হয়। এই নাট্য-শালা প্রতিষ্ঠায় পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও তাঁহার ভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন এবং এই ব্যাপারে সে-যুগের ইংরেজী-শিক্ষিত বহু নবীন বাঙালী তাঁহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই নাট্যশালায় প্রথম অভিনয়ের পর কলিকাতার অভিজাত-মহলে অভাবিত রকমের সাড়া পড়িয়া যায়। সকলেই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেন যে, কি রঙ্গমঞ্চের সাজসজ্জায়, কি গীতি বাদ্যে, কি অভিনয়ে এরূপ সর্বাঙ্গ সুন্দর নাট্যাভিনয় বাংলা দেশে কখনও দেখা যায় নাই। গৌরদাস বসাক তাঁহার স্মৃতিকথায় লিখিয়া গিয়াছেন যে, বেলগাছিয়া নাট্যশালার অভিনয়-কৃতিত্ব-কাহিনী সুপরিচিত প্রবাদ বাক্যের মত সর্ব্বজনবিদিত। তাঁহার বিবরণ হইতে বেলগাছিয়া নাট্যশালা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আমরা জানিতে পারি। এই বেলগাছিয়া নাট্যশালাতেই প্রথমে দেশীয় ঐকতান বাদনের প্রবর্ত্তন হয়। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও যদুনাথ পাল এই ঐকতানের দল গঠন করেন। এই নাট্যশালার সাজসজ্জা-সংগ্রহ ও দৃশ্যপট-অঙ্কনে বহু অর্থব্যয় হয়। এক 'রত্নাবলী' অভিনয়ের জন্যই রাজাদের দশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। নাট্যশালা-নির্মাণে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর রাজাদের পরামর্শদাতা ছিলেন। এই নাট্যশালার অভিনেতাদের সকলেই ছিলেন সে-যুগের ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালী। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বিদূষকের ভূমিকায় অভিনয় করেন। তিনি স্বভাবতঃ উচ্চশ্রেণীর অভিনয়-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন : ইহার সহিত অফুরন্ত ব্যঙ্গ রহস্যের সংযোগ ঘটাইয়া বিদূষকের ভূমিকাটির এমন জীবন্ত বাস্তব রূপ দিতে পারিয়াছিলেন যে, তিনি রঙ্গমঞ্চের 'গ্যারিক'-আখ্যায় অভিহিত হইয়াছিলেন। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহও একটি চরিত্রের অভিনয় করেন। দর্শকদের মধ্যে কলিকাতার দেশী ও বিদেশী গণ্যমান্য ব্যক্তিমাত্রেই এবং সপরিবারে বাংলার লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্নর স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে উপস্থিত ছিলেন।"

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস/ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

"কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলী, ফিনান্স আপিসের কর্মচারী, বড় রাজার বিশিষ্ট বন্ধু, তখনকার দিনে সব চেয়ে সেরা বিদূষক ছিলেন। পাইকপাড়ায় 'শর্মিষ্ঠা' ও 'রত্নাবলী'-র অভিনয়ে তিনি বিদূষক হইয়া বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। তিনি আমাদের শিক্ষাগুরু ছিলেন,— Motion, স্বগতঃ, চমকে ওঠা ইত্যাদি বিষয়ে আমাদিগকে শিক্ষা দিতেন।"

পুরাতন প্রসঙ্গ/মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

"কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্য ও বন্ধু বাবু গুরুদয়াল চৌধুরী নামক এক ব্যক্তি সে সময়কার একজন উৎকৃষ্ট সঙ্গীত-রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন ; তিনি 'রত্নাবলী'র জন্য কয়েকটী তানলয়-বিশুদ্ধ সঙ্গীত রচনা করিয়া দিলেন। অভিনয়ের সমস্ত আয়োজন এইরূপে সম্পূর্ণ হইল ; কিন্তু এক বিষয়ে তখনও পর্য্যন্ত অভাব রহিল। রাজাদিগের উভয় ভ্রাতার তৎকালীন কলিকাতা সমাজে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি এবং সাধারণের হিতকর অনুষ্ঠানসমূহের উৎসাহদাতা বলিয়া রাজপুরুষেরা তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। তদ্ভিন্ন ইংরাজ, পারসী, ইহুদী প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়েরই লোকদিগের সহিত তাঁহাদিগের ঘনিষ্ঠতা ছিল। বেলগাছিয়া নাট্যশালার অনুষ্ঠানের কথা শুনিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে অভিনয় দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এত অর্থ ব্যয় করিয়াও তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইবে না, এবং করিলেও, বাঙ্গালা ভাষায় অনভিজ্ঞতা বশতঃ তাঁহারা অভিনয়ের রসাস্বাদ করিতে পারিবেন না, এই ভাবিয়া রাজারা স্থির করিলেন যে, 'রত্নাবলী' ইংরাজীতে অনূদিত করাইয়া, অভিনয়ের সময়, বাঙ্গালা ভাষায় অনভিজ্ঞ দর্শকদিগকে এক এক খণ্ড প্রদান করিবেন। শুভক্ষণেই তাঁহাদিগের হৃদয়ে এইরূপ সঙ্কল্প উদিত হইয়াছিল ; তাঁহাদিগের সেই সঙ্কল্প হইতেই মধুসূদনের ভবিষ্যৎ জীবনের পথ পরিষ্কৃত হইল।"

যোগীন্দ্রনাথ বসু/মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত

আশুতোষ দেব-এর বাড়িতে 'শকুন্তলা' অভিনয়ের দর্শকদের মধ্যে ছিলেন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র আর প্রতাপচন্দ্র সিংহ। তিনজনেই নাট্যোৎসাহী। অভিনয় শেষ হলে যতীন্দ্রমোহনের খেদ—

"দেখুন দুই-এক দিনের আমোদে এত অর্থ ব্যয় না করিয়া, স্থায়ীভাবে একটা নাট্যশালা সংস্থাপন করিতে পারিলে, বোধ হয়, অধিক উপকার হয়।"

প্রস্তাবটা মনে গাঁথল ঈশ্বরচন্দ্রের। প্রতাপচন্দ্রও বুঝলেন কথাটা ঠিক। অল্প কিছুদিন আগে সিংহ-রাজারা কিনেছেন দ্বারকানাথ ঠাকুরের বেলগাছিয়ার বাগানবাড়ি। তাই তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন ঐ বাগানবাড়িতেই তৈরি হবে একটা নাট্যশালা। উদ্যোগী হলেন দুই ভাই-ই। সঙ্গে উৎসাহী যতীন্দ্রমোহন। নাট্যশালা প্রসঙ্গে ঐ সময়ে তাঁর আরো একটা মন্তব্য—

"জাতীয় নাট্যশালার সঙ্গে জাতীয় একতান-বাদনও সংগঠিত হওয়া কর্ত্তব্য।"

সে-পরামর্শকে মনে রেখে বেলগাছিয়া নাট্যশালা গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই, তারই প্রয়োজনে আর উদ্যোগে, বাংলাদেশে প্রথম জন্ম নিল একতান-বাদন সম্প্রদায়, সংগীতাচার্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর পরিচালনায়। ক্রমে ক্রমে তখনকার সেরা সব মানুষেরা এসে সমবেত হলেন বেলগাছিয়া নাট্যশালায়, তাঁদের প্রথম নাটক 'রত্নাবলী'-কে ঘিরে।

"বেলগাছিয়া নাট্যশালার অভিনেতৃগণ কিরূপ শ্রেণীর লোক [হইতে] নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, নিম্নলিখিত কয়েকজন প্রধান অভিনেতার পরিচয় হইতে পাঠক তাহা অনুমান করিতে

পারিবেন। বাবু প্রিয়নাথ দত্ত রাজা উদয়নের এবং বাবু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বিদূষকের অংশ অভিনয় করিতেন। প্রিয়নাথবাবু, যোগ্যতার সহিত আসিষ্টাণ্ট কম্পট্রোলার জেনারেলের সম্মানজনক কার্য্য করিয়া, পরলোকগমন করিয়াছেন। কেশববাবুর পরিচয় পাঠক স্থানান্তরে দেখিতে পাইবেন। কম্পট্রোলার জেনারেলের আফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্য করিয়া তিনি পেনশন গ্রহণ করেন। কয়েক বৎসর হইল তিনিও লোকান্তরিত হইয়াছেন। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ সেনাপতি রুমন্বানের এবং গৌরদাসবাবু রাজমন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের অংশ অভিনয় করিতেন। অপর একজন অভিনেতা, বাবু দীননাথ ঘোষ, ফাইনান্সাল বিভাগে কার্য্য করিয়া রায়বাহাদুর উপাধির সঙ্গে স্পেশাল পেনশন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন, সঙ্গীতাচার্য্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, বাবু যদুনাথ পাল প্রভৃতি একতান-বাদন সম্প্রদায়ের নেতা ও অধ্যক্ষ ছিলেন। তদ্ভিন্ন স্বর্গীয় ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বিদ্যাসাগর মহাশয়, রমাপ্রসাদ রায়, পটলডাঙ্গার স্বর্গীয় দ্বারকানাথ মল্লিক, এবং হোগলকুঁড়ের স্বর্গীয় তারাচরণ গুহ প্রভৃতি অনেক প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি ইহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বন্ধ ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রায় প্রতি রাত্রিতেই অভিনয়াভ্যাস স্থলে উপস্থিত থাকিতেন। বঙ্গদেশের আর কোন নাটকাভিনয়ে কখনও এতগুলি সম্ভ্রান্ত ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি একত্রিত হন নাই। স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে অভিনীত 'নববৃন্দাবন' ইহার পরে উল্লেখযোগ্য।"

যোগীন্দ্রনাথ বসু/মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত

বেলগাছিয়া নাট্যশালায় 'রত্নাবলী'র অভিনয় হয়েছিল পর পর ১২ বার। মধুসূদন-জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসুর মতে প্রথম দু বারের অভিনয়ের দর্শক প্রধানত বাঙালীই। পরের দুটো অভিনয়ে বাঙালী দর্শকের সঙ্গেই আমন্ত্রিত ইংরেজ, মুসলমান, ইহুদী প্রমুখ সম্প্রদায়ের জ্ঞানীগুণীরা। এঁরা ছাড়াও আমন্ত্রিতের তালিকায় বাংলাদেশের গভর্নর স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে, হাইকোর্টের বিচারপতি, কমিশনার, ম্যাজিস্ট্রেট জাতীয় উচ্চপদাধিকারী রাজকর্মচারীরাও। তখনই দেখা দিল একটা সমস্যা। সাহেবরা বাংলা নাটকের মর্ম বুঝবেন কী করে? তাহলে ইংরেজিতে অনুবাদ করাতে হয় এটাকে। সমস্যাটা শুনেই গৌরদাস বসাকের প্রস্তাব, হ্যাঁ, মধুসূদনকে দিয়ে করিয়ে নেওয়া যায় এর অনুবাদ। 'ক্যাপটিভ লেডি'-র সুবাদে মধুসূদনের ইংরেজি-জ্ঞানের সম্পর্কে কলকাতার শিক্ষিত মহল যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। সুতরাং আপত্তি তুললেন না কেউ। আর মধুসূদনও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনুবাদ করে দিলেন 'রত্নাবলী'-র। পেলেন ৫০০ টাকা সম্মান-দক্ষিণা। এই অনুবাদের সূত্রেই 'রত্নাবলী'-র রিহার্সালে আসা-যাওয়া তাঁর। আর এই রিহার্সাল-দেখাটাই তাঁকে অল্প কিছু দিনের মধ্যে উদবুদ্ধ করবে নিজের কলমে নাটক লেখায়।

আগস্ট

কেদারনাথ দত্তের সম্পাদনায় বেরল ইংরেজি আর বাংলায় 'চমৎকার মোহন' নামের বারত্রয়িক পত্রিকা।

পারিবারিক কারণে অক্ষয়কুমার দত্ত পদত্যাগ করলেন নর্ম্যাল স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে। সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন ছাত্র কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের দাদা রামকমল ভট্টাচার্যকে দেওয়া হল সেই পদ।

২ আগস্ট

চূড়ান্ত হল ভারতবর্ষের শাসন-ক্ষমতার হস্তান্তর, মহারানীকে ভারতেশ্বরী ক'রে। ঠিক হল ব্রিটিশ

মণ্ডলীর একজন সদস্য বিশেষভাবে পরিচালন করবেন এখানকার শাসনকাজ। তাঁর পদের নাম হবে ভারত-সচিব বা সেক্রেটারি অব স্টেট ফর ইন্ডিয়া। ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় ভারতসচিব হলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড ডারবি। হরিশচন্দ্র প্রতিবাদ জানালেন এই বলে যে, ভারতবাসীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর কোনো গুরুত্ব না দিয়ে অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করেই গৃহীত হয়েছে এই ভারত-শাসন প্রস্তাব।

৩ আগস্ট

'সংবাদ প্রভাকর'-এ বেরল বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'স্বপ্নদর্শন'-এর আলোচনা :

> "আমরা 'স্বপ্নদর্শন' ইত্যভিধেয় একখানি অভিনব পুস্তক প্রাপ্ত হইয়া আনুপূর্বিক পাঠ করত অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি, শ্রীযুত বাবু বিহারীলাল চক্রবর্তী এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, ...গ্রন্থকর্তা সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার ঘরের ছাত্র, অদ্যাপি পাঠ সমাপ্ত হয় নাই, এই অল্প বয়সেই যে প্রকার লিপিনৈপুণ্য প্রদর্শন করিলেন, তাহাতে বোধ হয়, এই সুপাত্র ছাত্র মহোদয় একজন প্রধান লেখকরূপে পরিগণিত হইবেন।"

৪ আগস্ট

'সংবাদ প্রভাকর'-এ 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয়ের খবর :

> "গত শনিবার রাত্রে শ্রীযুত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের বেলগেছে উদ্যানে এতদ্দেশীয় কতিপয় যুবা ব্যক্তি কর্তৃক ঐ নাটক সমাধা হয়, রাত্রি ৮।।০ সাড়ে আট আরম্ভ হইয়া দুই প্রহরের সময় শেষ হয়, তদ্দর্শনে বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। তম্মধ্যে বাঙ্গালাদেশের ছোট গভর্নর শ্রীযুক্ত মান্যবর হেলিডে সাহেব, শ্রীযুক্ত সেং হিউম সাহেব, ডাক্তার গুডউইব চক্রবর্তী এবং আরো অনেকানেক ইংরাজ লেখক ও বাঙ্গালির মধ্যে শ্রীযুত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, শ্রীযুত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, শ্রীযুত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, শ্রীযুত বাবু রামগোপাল ঘোষ, শ্রীযুত বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র, শ্রীযুত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রভৃতিরা উপস্থিত ছিলেন। নাট্যোক্ত স্ত্রী-পুরুষেরা যে প্রকার অঙ্গ-ভঙ্গিমা ও নৃত্য গীত দ্বারা সভা মোহিত করেন, তাহাতে তাহাদিগকে দর্শকেরা বিস্তর সাধুবাদ প্রদান করিয়াছিলেন, নাট্যশালা অতি পরিপাটী হইয়াছিল, নাট্যোক্ত ব্যক্তিবর্গের কেশ-বিন্যাস অতি সুদৃশ্য মনোহর হইয়াছিল, এই ব্যাপার এমত সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে যে, দর্শকমাত্রেরই মনোরঞ্জন হইয়াছে, এবং তাবতেই মুক্তকণ্ঠে কহিয়াছেন যে এতদ্দেশীয় ব্যক্তির দ্বারা যত অভিনয় প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে এ সম্প্রদায়কে সর্বোৎকৃষ্ট বলিতে হইবে। ছোট বাহাদুর মহাশয় নাটক শেষ হওন-কালীন অনেক প্রশংসা করিলেন, এবং কহিলেন যে, এতদ্দেশীয় যুবা ব্যক্তিরা লেখাপড়া শিখিয়া কত শত মহাত্মাকে সুখি করিয়াছে তাহা বর্ণনাতীত, এতাদৃশ সুখ অপেক্ষা আরো কত প্রকার গুরুতর ব্যাপার সকল সম্পাদনের আকাঙ্ক্ষা করা যায় তাহার পরিসীমা নাই, যাহা হউক বাঙ্গালা দেশ সভ্য হইয়াছে ও এতদ্দেশীয় ব্যক্তিবর্গ বিদেশীয় বিদ্যায় ব্যুৎপন্নশালি হইতেছে ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে? সর্বশেষে নাট্যোক্ত পুরুষদিগ্যে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় লইলেন।... শুনা গেল আগামী বৃহস্পতিবার ঐ নাটক ঐ স্থলে পুনরায় হইবেক...।"

যোগীন্দ্রনাথ বসুর দেওয়া তথ্য থেকে মনে হয় যেন বাঙালি ছাড়া অন্য ভাষাভাষীর দর্শক 'রত্নাবলী'র অভিনয় দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন ঐ নাটকের তৃতীয়বারের অভিনয় থেকে।

কিন্তু তেমন ধারণা যে সত্যি নয়, তার প্রমাণ উপরের আলোচনা। এখানে জানা যাচ্ছে প্রথম দিনের অভিনয়েই হাজির ছিলেন ইংরেজ রাজপুরুষেরা। যোগীন্দ্রনাথ বসু পড়লে আরও এক ধরনের ভ্রান্তি তৈরির সুযোগ জোটে। মনে হয় যেন, প্রথম দু বারের অভিনয়ের পর তৃতীয় বারের অভিনয়ে সাহেব-সুবোরা আসবেন জেনেই যেন মধুসূদনের উপর দায় চাপানো হল ঐ নাটকের অনুবাদের। কিন্তু বাস্তব ঘটনা তা নয়। প্রাথমিক রিহার্সাল শুরু হওয়ার সময় থেকেই উদ্যোক্তাদের ভাবনায় জুড়ে গেছে অনুবাদের প্রয়োজনীয়তাটা।
নগেন্দ্রচন্দ্র সোম-এর মধুস্মৃতি'-তে মধুসূদনের বন্ধু শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণা থেকে 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয়ের পিছনকার আরো কিছু তথ্যের সঙ্গেই আমরা জানতে পারি, অভিনয় শুরুর অনেক আগেই অনুবাদের সিদ্ধান্ত।

> "রত্নাবলী নাটক অভিনয় হওয়ার পূর্বে বঙ্গের তৎকালীন ছোট লাট, হাইকোর্টের জজ, বোর্ডের মেম্বার প্রভৃতি প্রধান প্রধান সাহেবরা রাজাদিগকে অভিনয় দেখিতে আসার বাসনা জ্ঞাপন করিলেন ; কিন্তু বঙ্গভাষায় তাঁহাদের অধিকার না থাকা প্রযুক্ত, নাটকের মর্ম তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন না, এজন্য ইংরাজি অনুবাদের কথা উঠিল। একথা রামগোপাল বাবু, কি রমাপ্রসাদ বাবু, কি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রস্তাব করেন, এক্ষণে আমার স্মরণ হইতেছে না। ফলতঃ ইংরাজি অনুবাদের বিষয় একপ্রকার অবধারিত হইল। ...নাটকের মধ্যে কয়েকটি সঙ্গীত সংযোগ করিবার আবশ্যক হয়। গুরুদয়াল রায় নামে রাজা কৃষ্ণনাথের রঙ্গপুর জেলাস্থ বাহারবন্দরের নায়েব, আমার অগ্রজ প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের এক প্রধান ছাত্র ছিলেন। সেকালের হাফ-আখড়াইয়ের অনেক দলে সঙ্গীত রচনা করিয়া তিনি উৎকৃষ্ট সঙ্গীত-রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার উপর রত্নাবলীর সঙ্গীত রচনার ভার অর্পিত হয়। সঙ্গীতগুলি অতীব রমণীয় হইয়ছিল। এটর্নী রমানাথ সাহা নটী সাজিয়া প্রথম সঙ্গীত অতি সুস্বরে গান করেন।...
> মধুসূদনের রত্নাবলীর ইংরাজি অনুবাদ দেখিয়া ছোটলাট ও তাঁহার সহধর্মিণী অতিশয় প্রশংসা করেন। নাটক অভিনয়ের দুই চারি দিবস পরে রাজার নিকট আমি এ কথা শুনিয়াছিলাম কেবল লাটসাহেব নহেন, ইংরাজি সংবাদপত্র সমূহের তাবৎ সম্পাদকেরা রত্নাবলীর অভিনয় সম্বন্ধে যে সকল দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন, তাহাতে অনুবাদের বিস্তর প্রশংসা করেন। 'হরকরা' কাগজের সম্পাদক বলেন 'এতদূর বিশুদ্ধ ইংরাজি রচনা আমরা কখনও দেখি নাই। বাঙ্গালীর লেখনী হইতে এরূপ লেখা কখন যে হয়, আমরা জানিতাম না। কেবল বাঙ্গালী নহে, কলিকাতার মধ্যে অনেক ইংরাজও এরূপ লিখিতে পারিয়াছে বলিয়া, আপনা আপনি শ্লাঘা প্রকাশ করিলে অহঙ্কৃত বলিয়া দূষিত হইবে না'।"

৫ আগস্ট
'হিন্দু পেট্রিয়টে' বেরল রত্নাবলী নাটকাভিনয়ের আলোচনা। উচ্ছ্বসিত প্রশংসার সঙ্গেই সেখানে ছিল কিছু ভুল-ত্রুটির উল্লেখ। পরের অভিনয়ে সংশোধিত হয় সে-সব।
শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের কাছে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে পদত্যাগপত্র পাঠালেন বিদ্যাসাগর।

> "সরকারি কাজের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমাকে অবিরত মানসিক পরিশ্রম করতে হয়েছে। তাতে আমার এমন গুরুতর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়েছে যে ছোটলাটের কাছে পদত্যাগপত্র দাখিল করতে আমি বাধ্য হলাম।

এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হলে যে অবিশ্রান্ত মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন, এখন তা আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। আমার বিশ্রাম একান্ত প্রয়োজন।...

স্বাস্থ্য ভাল হলে আমার ইচ্ছা আছে জীবনের বাকি সময়টুকু আমি বাংলা বই রচনা ও সংকলনের কাজে সম্পূর্ণ নিয়োগ করব।...

আমার পদত্যাগের এইটাই হল প্রধান কারণ। এ ছাড়া আরও যে দুই-একটি গৌণ কারণ আছে, তা এই : ভবিষ্যতে এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতির আর কোন আশা নেই। অন্ততঃ আমার তাই ধারণা। তা ছাড়া কর্তব্যনিষ্ঠ কোন আদর্শ কর্মী সরকারী বিভাগীয় কর্মচারীদের কাছ থেকে যে সহানুভূতি পাওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় মনে করেন, আমি অনুভব করেছি আমার পক্ষে আর তা পাওয়া সম্ভব হবে না।..."

কেন পদত্যাগ করলেন তিনি এমন আচমকা, তা নিয়ে যখন চারপাশে জল্পনা-কল্পনা, তখন আসল কারণটা জানিয়ে ছোটো লাট হ্যালিডের কাছে লিখে পাঠালেন স্বতন্ত্র একটা চিঠি।

"অসুস্থতা আমার পদত্যাগের একটি প্রধান কারণ বটে, কিন্তু একমাত্র কারণ নয়। তা যদি হত তা হলে দীর্ঘদিনের জন্য বিশ্রাম নিয়ে আমি আমার উন্নতি করতে পারতাম। কিন্তু বর্তমানে সরকারি চাকরি করা নানাকারণে আমার কাছে অপ্রীতিকর হয়ে উঠেছে। যে পদ্ধতি অনুযায়ী বাংলা শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা চলছে, আমার ধারণা তাতে শুধু অর্থের অপব্যয় হচ্ছে, আসল কাজ বিশেষ কিছু হচ্ছে না। এ কথা আপনাকে বহুবার বলেছি। আপনি জানেন কতবার আমি কাজে বাধা পেয়েছি। তা ছাড়া ভবিষ্যতের কাজের দিক থেকেও আমার পদোন্নতির কোনও সম্ভাবনা নেই। অতএব আমার দিক থেকে পদত্যাগ করার যে যথেষ্ট যুক্তিসংগত কারণ আছে আশা করি আপনি তা স্বীকার করবেন।"

১৮ আগস্ট

কলকাতার ভবানীপুরের মামার বাড়িতে কবি ও শিল্পী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর জন্ম। বাবা, হারানচন্দ্র।

২৬ সেপ্টেম্বর

বিদ্যাসাগরের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে বাংলা সরকার শিক্ষা দপ্তরকে জানাল—

"পণ্ডিত মশায় শেষ পর্যন্ত খানিকটা অশোভনভাবে অবসর গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন, এটা খুবই দুঃখের বিষয়। বিশেষ করে তাঁর যখন অসন্তোষের কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই। যাই হোক, আপনি অনুগ্রহ করে তাঁকে জানাবেন, এ দেশের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে তিনি দীর্ঘকাল উৎসাহের সঙ্গে যে কাজ করেছেন তার জন্য সরকার তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।"

৩০ সেপ্টেম্বর

'হিন্দু পেট্রিয়টে' রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এর প্রথম বিজ্ঞাপন—

"শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত বীর করুণাশ্রিত উক্ত কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা চৌরঙ্গী সদর স্ট্রীটে ১০ নং ভবনে এডুকেশন গেজেট অফিসে তত্ত্ব করিলে তাহা প্রাপ্ত হইবেন।..."

কবির জীবিতকালে মোট তিনবার ছাপা হয়েছিল এ বই। ১২৬৫, ১২৭২ আর ১২৭৮ বঙ্গাব্দে।

অক্টোবর
সিপাহী বিদ্রোহের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকার অপরাধে বন্দী দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে কলকাতায় আনানো হল রেঙ্গুনে নির্বাসনে পাঠানোর আগে।
মথুরানাথ দত্তের অধ্যক্ষতায় বেরল 'কলকাতা পত্রিকা' নামের মাসিক পত্রিকা।

১৬ অক্টোবর
চব্বিশ পরগনার হরিনাভী গ্রামে শিল্পী শরচ্চন্দ্র দেব-এর জন্ম। বাংলা ভাষায় চারুকলা বিষয়ে প্রথম মাসিক পত্রিকা 'শিল্প পুষ্পাঞ্জলি'-র উদ্যোক্তা ও সম্পাদক। বাবা, নন্দলাল।

২৪ অক্টোবর
দ্বারকানাথের কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু।
নিজের কর্মচ্যুতির আদেশ পাওয়ার পর কিশোরীচাঁদ মিত্র নিজের ডায়েরিতে লিখলেন—

> "Dismissed from my appointment of Magistrate of Calcutta. God's will be done. I bow to it and know the fact that it is ultimately for my good."

২৬ অক্টোবর
নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে শোকাহত কিশোরীচাঁদ তাঁর ডায়েরিতে লিখলেন—

> "I deeply mourn the death of my dear lamented friend Nagendranath. He breathed his last on Sunday last (24th Oct. 1858). May god bless his soul. I mourn over him as good man who loved to good to all men. I mourn over him as a personal friend— one whose friendship it was my privilege to enjoy for several years."

২৮ অক্টোবর
কর্মচ্যুত হলেন কিশোরীচাঁদ মিত্র।

১ নভেম্বর
তারকচন্দ্র চূড়ামণি বের করলেন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'ভারতবর্ষীয় সমাচার পত্র'। ভারতবর্ষের ইতিহাসে অন্য একটি কারণে স্মরণীয় হয়ে উঠল তারিখটি। এই দিনই এলাহাবাদের রাজদরবারে লর্ড ক্যানিং ভারত সাম্রাজ্ঞী হিসেবে মহারানী ভিক্টোরিয়ার হাতে তুলে দিলেন এ দেশের শাসনভার। এই তারিখটিই 'রয়্যাল প্রোক্লামেশন ডে' হিসেবে চিহ্নিত।
সরকারি সার্কুলার নির্দেশ পাঠিয়েছিল বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে এই তারিখে সভাসমিতি বা উৎসব উদ্‌যাপনের। আর কলকাতায় যে উৎসব চেহারা নেবে মহোৎসবের সে তো অবধারিত। কলকাতায় অনুষ্ঠিত সে উৎসবের খানিকটা ছবি আমরা পেয়ে যাই 'সংবাদ প্রভাকরে'।

"শ্রীশ্রী বিশ্বমাতা রাজ্যেশ্বরীর রাজ্যোৎসব উপলক্ষে ১ *নবেম্বর সোমবার* বৈকালে এবং যামিনীযোগে এতন্মহানগরে মহামহা মহোৎসব অপেক্ষা মহাব্যাপার হইয়াছিল, যৎকালে গবর্ণমেণ্ট হৌসে শ্রীশ্রীমতি জননীর ঘোষণাপত্র পঠিত হয় তৎকালে পিপীলিকা শ্রেণীর মানবশ্রেণীর সমারোহ হইয়াছিল, প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণ প্রভৃতি এতদ্দেশীয় প্রধান প্রধান তাবতেই সভাস্থ হইয়াছিলেন, বিশেষ বিশেষ-ব্যতীত সর্ব্বপ্রকার অবস্থা-বিশিষ্ট সর্ব্বজাতীয় কত মনুষ্যের সমারোহ হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা নিরূপিত হইবার নহে, যেরূপ অঙ্কপাত করিব তাহাই সম্ভবপর হইবে। সুনীতিজ্ঞ শ্রীযুত বিডন সাহেব ইংরাজী ভাষায় ঘোষণাপত্র পাঠ করেন, কিন্তু তাঁহার গলার স্বর তাদৃশ ...না হওয়াতে দূরস্থ সকলে শুনিতে পান নাই, সুপ্রিমকোর্টের দ্বোভাষী উচ্চভাষী বাবু শ্যামাচরণ সরকার সপ্তমের উপর টাকীসুরে গলাবাজী করিয়া বাঙালা অনুবাদ পাঠ করাতে তাঁহার বদনবিগলিত বচনগুলীন অনেকেরি শ্রবণপথে প্রবেশ করিয়াছিল, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, কৌন্সেলের সভাপতি এবং লেপ্টেনাণ্ট গবরনর সাহেব প্রথম সোপানে অবস্থিত ছিলেন, তাঁহাব নিম্নসোপানে আর আর সিবিল মিলেটরি সাহেবদিগের আসন হইয়ছিল, মান্যবর শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর, রাজা কালীকৃষ্ণ বাাহাদুর, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি মহাত্মারা তাহার সমীপস্থ সোপানে সমারূঢ় ছিলেন, গাড়ি পালকির ভিড়ের ব্যাপার বর্ণনা হয় না। পরমাহ্লাদের বিষয় এই যে, এতদ্রূপ গুরুতর লোকারণ্য ব্যাপারে কোনো প্রাণির কিছুমাত্র হানি হয় নাই, এ বিষয়ে আমরা পুলিস কমিস্যনর শ্রীযুত ওয়াকোপ সাহেবকে যথোচিত সাধুবাদ প্রদান করিব যেহেতু তিনি গাড়ি পরিচালনার বিষয়ে অতি সুনিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিযা দেওযাতেই কাহারো কোনো প্রকার ক্লেশ এবং অনিষ্ট হয় নাই।"

এ হল গভর্নমেণ্ট হাউসের ভিতরকার অনুষ্ঠানের ছবি। অবশ্য সম্পূর্ণ ছবি নয়। কেননা অনুষ্ঠানের পর ছিল ভোজসভা বা নাচগানের আসর, তার বর্ণনা নেই এখানে। এর বাইবে রয়েছে গোটা শহরেব সম্মিলিত উৎসব। ওয়াকোপ সাহেবের নির্দেশ জারি হয়েছিল সারা শহরকে আলোয় সাজাতে। সেজেও ছিল তাই। কলকাতাব সেই আলোকসজ্জার আলোকোৎসবেব বিবরণও ঐ 'সংবাদ প্রভাকর' থেকেই শুনব এখন।

"ঐ দিবস সন্ধ্যা হইতে সমস্ত রাত্রি কলিকাতা মহানগর এবং শাখানগরের জলে স্থলে সমান শোভা হইয়াছিল। বৃদ্ধ বালকে আলোকের পুলকে সকলেই ভূলোক গোলকেব দীপ্তি দর্শন করিয়াছেন, ইংরাজ পল্লীর তো কথাই নাই, আলোর প্রভায় কালো রাত্রি দিবসের ভাগকে পরিহাস কবিয়াছিল, বাজপুরুষগণ এবং অন্যান্য মান্য সাহেবেরা টাকাব বাতি জ্বালিযাছিলেন বলিলেই হয়, অনেক ধনি ভবনে আলোকলতা পুষ্পিতা হইযাছিল, গমিশ্, রামিস, আন্দুস, পিন্দ্রুস প্রভৃতি 'সুঁকটিওয়ালা', বাক্সাওয়ালা ও জুতাওয়ালা, জেণ্টিলম্যানেরাও আমোদের ত্রুটি করেন নাই, বাঙ্গালি মহলে "রায়" "বাঁড়ী" তাবতেই সমান আমোদ করিয়াছেন, ভিকারী ও ভিকারিণী পর্য্যন্ত দুইটা প্রদীপের আলো জ্বালিয়াছিল, "দুগ্ধপোষ্য শিশু ও কুলবধূরাও" মহারাজ্ঞীর মঙ্গলমানসে মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক দীপ জ্বালিয়াছে, সকলেই জয় প্রার্থনা করিয়াছে ও করিতেছে। বিদ্যালয়ের শিশুরাও দ্বারে দ্বারে চিত্রবিচিত্র অক্ষরে লিখিয়াছে "জয় বিক্টোরিয়ার জয়", প্রত্যেক পল্লীর প্রত্যেক প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য গলির ভিতর ভ্রমণ করিয়া যিনি বেড়াইবেন, তিনিই এইরূপ মাঙ্গলিকচিহ্ন দেখিতে পাইবেন। যাঁহার যেমন সঙ্গতি তিনি তদ্রূপ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন, অনেকের বাটীতেই নৃত্যগীত বাদ্য ও ভোজের উৎসব হইয়াছিল। যাঁহারা বাগবাজার ও শোভাবাজারের উভয় রাজবাটী হইতে মলঙ্গা পর্য্যন্ত গমন করিয়াছেন,

তাঁহারাই যথেষ্ট তুচ্ছ হইয়াছেন, ভাগ্যধর বাঙ্গালিরা কেহই রাজভক্তিসূচক আন্তরিক আনন্দ প্রকাশের ন্যূনাধিক করেন নাই, অন্তরস্থ ভাব সকলেরই সমান, তবে বাহ্য জাঁক-জমকের যে কিছু তারতম্য, তাহা বক্তব্যের মধ্যেই নহে। এবিষয়ে মলঙ্গা নিবাসী সুবিখ্যাত দত্ত বাবুরা সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যয় ও আমোদ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সমস্ত "বাদামী দীঘিটি" আলোকের হারে ভূষিত করেন, তাহার সুচারু শোভা বর্ণনা করা যায় না। আতসবাজীর ছটার ঘটা অতি পরিপাটি হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন নৃত্য-গীত-ভোজাদির সমূহ সমারোহ হয়।

এই উৎসবের ব্যাপার বিশেষ রূপে কি লিখিব, যে শিশির হাজার কখনোই ৫ পাঁচ টাকার অধিক মূল্যে বিক্রয় হয় নাই, সেই শিশি ৫০ হইতে ৬০/৭০/৮০/৯০/১০০ পরে খুজুরা ২০০ দুই শত টাকা পর্যন্ত বিক্রীত হইয়াছে, যে প্রদীপের হাজার ২ দুই টাকা ছিল, তাহা ১০/১২/১৫ পরে ২০ টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছিল, অতএব যখন রাজ্যেশ্বরীর রাজ্যারম্ভের প্রথমেই এতদ্রূপ গুরুতর ব্যাপার হইল, তখন রাজপুরুষেরা তাঁহার সম্মানার্থ প্রতিবৎসর নিয়মিতরূপে সমান উৎসব করিবেনি করিবেন, কখনোই অন্যথা করিবেন না, প্রার্থনা করি বর্ষে বর্ষে এই বর্ষের ন্যায় সমান হর্ষের সঞ্চার হয়। জগদীশ্বর রাজা প্রজার সর্ব্বতোভাবেই মঙ্গল করুন।..."

'সংবাদ প্রভাকরে'র বিবরণ এইখানেই শেষ নয়। এর পরও রয়েছে দীর্ঘ প্রতিবেদন, যা সংগৃহীত হয়েছে দেশের বিভিন্ন শহরাঞ্চল থেকে পাঠানো তথ্যের ভিত্তিতে। চুঁচুড়া, বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, মেদিনীপুর ইত্যাদি শহরের উদযাপিত অনুষ্ঠানের খানিকটা আন্দাজ মিলে যায় যা থেকে।

৩ নভেম্বর

ভারতেশ্বরী ভিকটোরিয়াকে তাঁর অনুরক্ত ও বিশ্বস্ত প্রজাবৃন্দের পক্ষ থেকে একটি সম্ভাষণপত্র দানের কথাকে মাথায় রেখে কলকাতার শেরিফ যে সভা ডাকেন, সেখানে রামগোপাল ঘোষ বলবেন—

"তাঁর যদি শক্তি ও প্রভাব থাকত তবে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা, ব্রহ্মপুত্র থেকে কাম্বে উপসাগর পর্যন্ত দেশের সর্বত্র তিনি ঘোষণা করতেন, চক্রী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষেরা তাদের ধর্ম বিপন্ন বলে তাদের ওপর যে ধারণা চাপিয়ে দিয়েছে, তাকে গ্রহণ করে এদেশীয়রা যত শোচনীয়ভাবে বিভ্রান্ত হয়েছে, আর কখনও তার থেকে বেশি পরিমাণে হয় নি ; তাঁর বিশ্বাস, এই ধারণাই বিদ্রোহের মূলে ছিল। তারা ইংরেজের চরিত্র বোঝে না, বোঝে না শাসক শক্তির ঔদার্য ও সদাশয়তা, নিরপেক্ষ ন্যায়বিচার, যা নিয়ে এই শক্তিকে শাসক অথবা শাসিত শ্রেণীভুক্ত তার নজির ছাড়াই একজন মানুষ ও অপরজনের মধ্যে যেটি ন্যায় তা করার জন্যে সর্বদাই ইচ্ছুক ও উৎকণ্ঠিত। এসব যদি জানা থাকত, তবে এই দেশে বিদ্রোহ হতে পারত? সাম্প্রতিককালে যা সাম্রাজ্যের ভিত্তি কাঁপিয়ে দিয়েছে তার মত অশুভ সংঘটন কখনই হত না। শিক্ষাই প্রতিবিধানের একমাত্র পথ।"

প্যারীচাঁদ মিত্র/নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

১৫ নভেম্বর

১৮৫৬-য় ভ্রমণে বেরিয়ে এই তারিখে কলকাতায় ফিরলেন দেবেন্দ্রনাথ। বয়স তখন ৪১।

কিশোরীচাঁদ মিত্রের পদচ্যুতি নিয়ে লালবিহারী দে তাঁর 'অরুণোদয়' পত্রিকায় লিখলেন

"আমরা দুঃখসাগরে মগ্ন হইয়া লিখিতেছি যে কলিকাতা পোলিশের ছোট ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্তবাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র কোনো দুষ্কর্ম নিমিত্ত পদচ্যুত হইয়াছেন। অনেকেই বলিতেছেন, লঘু পাপে গুরুদণ্ড হইয়াছে। কিন্তু আমরা সেরূপ বোধ করি না। যেমন পাপ তাহার সমুচিত দণ্ড হইয়াছে সন্দেহ নাই। ফলতঃ ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে কিশোরীবাবুর পরিবর্তে যদি কোন শ্বেতবর্ণ মহাত্মা ঐ দোষ করিতেন তাহা হইলে তাহার এতাদৃশ দণ্ড হইত না। বহুদিবস হইল ঐ পোলিশের জনৈক শ্বেতবর্ণ কর্মচারী বহুবিধ কুকর্ম করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি পদচ্যুত হয়েন নাই—কেবল স্থানান্তরিত হইয়া উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনেকেই বোধ করেন কিশোরীবাবুর শাস্তি কেবল কৃষ্ণবর্ণ দরুন।"

সংস্কৃত কলেজে চাকরি করতে করতেই দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ নিজের সম্পাদনায় বের করলেন 'সোমপ্রকাশ' সাপ্তাহিক পত্রিকা। পিছনে পরামর্শদাতা ছিলেন বিদ্যাসাগর। পত্রিকার পরিকল্পনাটাও তাঁরই।

"বিদ্যাভূষণ মহাশয় বাঙ্গালা সংবাদপত্রের প্রথম শিক্ষাগুরু। তাঁহা হইতেই বাঙ্গালা সংবাদপত্রের উন্নতি হয়। পূর্ব্বে ভাস্কর, প্রভাকর, সমাচার-চন্দ্রিকা প্রভৃতি বাঙ্গালা সংবাদপত্র সকল ছিল বটে, কিন্তু সংবাদপত্রের উপযুক্ত বিষয়সমূহ সেই সকল পত্রে লিখিত হইত না। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ই সুপদ্ধতিতে বাঙ্গালা সংবাদপত্রের পরিচালনের প্রকৃত পথ প্রদর্শন করেন। রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ের আন্দোলন কিরূপে করিতে হয়, তিনিই প্রথম তাহা বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগকে দেখাইয়া দেন। এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা বাঙ্গালা সংবাদপত্রসমূহের অনেক উন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্তু সোমপ্রকাশ সংবাদপত্রই যে এ উন্নতিব মূল, ইহা সকলেই স্বীকার করিবে।

এডুকেশন গেজেট/ভূদেব মুখোপাধ্যায়

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মবৃত্তান্ত

"কথিত আছে—যখন বঙ্কিমচন্দ্রের জননী প্রসব বেদনায় বিশেষ কাতর—অসহ্য যন্ত্রণায় মুহ্যমান, ধাত্রী ও গৃহস্থ সকলে বিশেষ ব্যস্ত ও উদ্‌বিগ্ন— সেই সময় এক আশ্চর্য শঙ্খধ্বনি সমগ্র বাড়িখানির চারিদিকে ধ্বনিত হইতে সকলে শুনিয়াছিলেন। ধাত্রী তাড়াতাড়ি ছেলে ধরিবার নিমিত্ত হাত বাড়াইয়া দিয়া হতাশ্বাস হইয়া গেল। সমবেত পুরুষ অভিভাবকেরা শঙ্খধ্বনি শুনিয়া ছেলে হইয়াছে মনে করিয়া সূতিকাগারের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন কিন্তু ভগ্নমনোরথ হইয়া ফিরিয়া গিয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন—'এ কিরূপ দৈব বিড়ম্বনা বুঝিতে পারিতেছি না।' বাটীর আশেপাশে আত্মীয় কুটুম্ব প্রভৃতি সকলে নিজ নিজ বাটী হইতে অদ্ভুত শঙ্খধ্বনি শুনিয়া ছেলে হইয়াছে মনে করিয়া দৌড়িয়া আসিয়া ব্যাপার শুনিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে যে যেখানে সুবিধা পাইয়াছিল, সেইখানেই বসিয়া পড়িয়াছিল।

কেবলমাত্র পরোপকারী, উদারচেতা, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ প্রাতঃস্মরণীয় যাদবচন্দ্র (বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা) অচল অটলভাবে কুলদেবতা রাধাবল্লভের চরণে সমস্ত অর্পণ করিয়া ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে এ দারুণ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার নিমিত্ত কাতর প্রার্থনা করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে সেই অদ্ভুত ধ্বনি টলাইতে পারে নাই। ইহার অল্পক্ষণ পরে ঠিক ব্রাহ্ম মুহূর্তে বঙ্কিমচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হইলেন। ধাত্রী ছেলে হাতে করিয়া ধরিয়া একটু মূর্ছিতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল— প্রসূতিও প্রসবের সঙ্গে সঙ্গেই মূর্ছিত— প্রায় সকলেই যেন একটু মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ইহা অতি অল্পক্ষণের জন্য।...

শঙ্খধ্বনির কথা সত্য হইতে পারে। আবার মিথ্যাও হইতে পারে। অনেকে হয়তো ইহা একেবারে বাগবাজারের আড্ডার গল্প বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা যে খাঁটী সত্য ইহার প্রমাণাদি যদি কেহ চাহেন তাহা হইলে আমি তাঁহাদিগকে সাদরে আহ্বান

করিতেছি তাঁহাদের সুবিধা ও সুযোগ মত আমার সহিত একবার বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভূমি কাঁটালপাড়া গ্রামে কষ্ট স্বীকার করিয়া যাইতে স্বীকৃত হউন, সেখানে এখন পর্য্যন্ত এমন অশীতিবৎসর বৃদ্ধ জীবিত আছেন যিনি স্বকর্ণে এই অদ্ভুত শঙ্খধ্বনি শুনিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ দিবেন।"

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মবৃত্তান্ত/
দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়/
সচিত্র শিশির ১৩৩১

বঙ্কিমের বংশপরিচয়

Babu Bankim Chandra was descended from one of the five Brahmans who about a thousand year ago settled in Bengal and gave it a Hindu civilisation. He belonged to that section of the descendants of these Brahmans who settled in *Râr̄h* or western Bengal. One of his ancestors received the title of high nobility in the court of Ballâl Sen. His title was confirmed by Ballâl's distinguished son, king Lakshman Sen. One of Bankim's ancestors performed the difficult and now unknown sacrifice of *Abasathî*. hence the family was distinguished above all other Brahman families in Bengal as *Abasathî*. This family is one of those which never migrated to Vikrampur after the fall of Hindu monarchy in western Bengal. By the middle of the sixteenth century, when a great chapter of Râr̄hyah Brahman nobility was held under the presidency of Devivara, the great re-organizer. Bankim's ancestors were found so distinguished for their learning, piety and strict adherence to Hindu laws that they were placed in the highest of the thirty-six exogamus groups of *Mels* into which Devivara divided the *Kulin* Brahmans of his time. How and under what circumstances one of his ancestors lost the high place by marrying in a family of lower status is not generally known, but the family always retained the proud distinction of belonging to the *Fulia Mel*.

About two hundred years ago at the beautiful spot where a creek of the *bheel bariati* joins the Ganges opposite the Dutch settlement of Chinsurah, there lived a poor Brahman, Raghudeva Ghosâl, who eked out a precarious livelihood by priestly work. Tradition asserts that a holy person, সন্ন্যাসী, *Sannyâsî*, fell ill at Kântâlpârâ, the name of the village where Raghudeva lived. Raghudeva nursed him with all the attention of a devoted disciple. And his care was rewarded by the complete recovery of the Sannyâsî's health. The Sannâysî rewarded the poor Brahaman with the image of Krishna and Râdhâ named *Râdhâballabha* and procured for the maintenance of the worship some land in the Purgana of Muragâchâ in Diamond Harbour. This not only placed the Brahman above want, but enabled him to marry two of his daughters, one in the *Fulia Mel* and another in the *Ballabhî*. Raghudeva's son-in-law in the *Fulia Mel* was Ramjîvan Chatterji, the great grandfather of the distinguished novelist whose death has just now plunged the whole of Bengal into deep sorrow.

The Late Bankim Chandra Chatterji/
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ, খণ্ড ২

যাদবচন্দ্রের আত্মকথা

"সন ১২০১ সালে ১৮ই পৌষ তারিখে আমি [জন্মগ্রহণ] করিয়াছি। জন্মাবধি ১৫/১৬ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত সর্ব্বদা পীড়িত থাকিতাম, যে হেতু আমার ধাত বড় শ্লৈষ্মিক ছিল। এ জন্য স্বর্গীয় পিতা মাতা সর্ব্বদা আমাকে নিকটে নিকটে রাখিতেন। সুস্থ সময়ে পাঠশালায় লেখাপড়া করিতাম, কিন্তু গুরুমহাশয় প্রভৃতি আমাকে কেহ কিছু বলিতে পারিতেন না।

নবম বৎসরে উপনয়ন হয়। দশম বৎসরে কর্ণমূল ফুলিয়া আমার জ্বর বিকার হয়। কর্ণমূলে অস্ত্র হইলে গলার ভিতর পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইত। এতাদৃশ ঘা হইয়াছিল যে, ঐ রোগে গঙ্গাযাত্রা হেতু উপর হইতে আমাকে বাহির-বাটীতে আনা হইয়াছিল, পরে পরমায়ু থাকায় রক্ষা পাইলাম।

১১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কিতাবাদি লেখা পড়া যাহা শিক্ষা হইবার হইল। ১২ বৎসর বয়সে পার্শি পড়িতে আরম্ভ কবি। ১৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে উহা ত্যাগ করিয়া ইংরাজি পড়িতে আরম্ভ করিলাম। দুই মাস পাঠান্তর উহা ভাল লাগিল না; পুনরায় পার্শি পড়িতে আরম্ভ করিলাম; কৃতবিদ্য হওনের অত্যল্পকাল বাকী থাকিতে, অর্থাৎ অল্লামি, উর্কি, হাফেজ এই তিন কেতাব বাকী থাকিতে আমাব হামসরফ (সহপাঠী) এবং পরমবন্ধু বিষ্ণুমোহন মিত্রের ভ্রাতা মথুরমোহন মিত্র ও মধুসূদন মিত্র লোকান্তরে গমন করিলেন। আমার পড়িতে আর ইচ্ছা হইল না। আমি বাটীতে না জানাইয়া কলিকাতায় গমন করিলাম, এবং ভগবতীচরণ মিত্রের নিকটে পবিচিত হইয়া তাঁহার স্নেহপাত্র হইলাম। তিনি পার্শি, ইংরাজীতে সুপণ্ডিত ছিলেন। দুই মাস স্বয়ং আমাকে পড়াইলেন বটে. আমার আর পড়াশুনা ভাল লাগিল না, আমার মন সর্ব্বদা উচাটন থাকিত। পরে বাটী আসিয়া, ছয় মাস পর্য্যন্ত ব্যারাম ভোগ করিলাম।

রোগের উপশম হইলে জগন্নাথ-দর্শনের ইচ্ছা করিলাম। পিতা মাতা প্রভৃতি কাহাকেও কিছু না বলিয়া কটক অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

নারায়ণ-গড়ের সরহদ্দে 'ব্রহ্মচারী লীলা বানদির' সন্নিকটে যেখানে রাস্তার উপর পুল আছে, সেখান পৌঁছিয়া রৌদ্রে কাতর হইয়া পড়িলাম। একখানি ধূতি উড়ানি, আর কাপড়ের খোটে কয়েকটি টাকা বাঁধা ছিল। সে সব বাখিয়া জলে নামিলাম। অনেকক্ষণ জলে থাকিয়া শীতল হওনান্তর ডাঙ্গায় উঠিয়া দেখিলাম যে. বস্ত্র ও টাকা নাই।

বড় ক্ষুধা হইয়াছিল। পয়সার অভাবে আহার্য্য কিনিতে না পারিয়া হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিলাম। বেলা ২/৩ টার সময় কাঁচড়াপাড়া-নিবাসী ঠাকুরচরণ রায় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কটক জেলাব রড়াই নামক এক আড়ঙ্গের পোক্তানি দারোগা। তিনি আপন কর্ম্মস্থানে গমন করিতেছিলেন। দূর হইতে আমাকে দেখিতে পাইয়া নিকটে আসিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছ? কোথায় যাইবে?'

উত্তরে আমূল সকল কথা বলিলাম। পরিচয় দিলাম। পরিচয়ে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি সস্নেহে আমার হস্ত ধারণান্তর কহিলেন, 'তুমি কাশীর ভাই? বেশ আমার সঙ্গে এস। এই স্থানে লোক ঠেঙ্গাইয়া মারে, তুমি কেমন করিয়া এতক্ষণ বাঁচিয়া আছ ইহাই আশ্চর্য্য।'

পরে রড়াই পর্য্যন্ত সঙ্গে লইয়া গেলেন। তথায় পাঁচ ছয় দিন রাখিয়া লোক সঙ্গে দিয়া ভদরক মোকামে দাদার নিকট পাঠাইলেন। দাদা আমার প্রতি দৃষ্টিমাত্র বুঝিলেন, আমি বাটী হইতে পলাইয়া আসিয়াছি। তিনি তৎক্ষণাৎ বাটীতে সংবাদ পাঠাইলেন।

কয়েক রোজ ভদরকে থাকিয়া কটকে গেলাম। তথায় বিশ্বমোহন মিত্রের সহিত

সাক্ষাৎ হইল। তিনি দৃষ্টিমাত্র চিনিলেন; জানিলেন, মথুরের বন্ধু যাদব। অনেক রোদন করিলেন। দুই দিবস আমাকে দেখিলেন না। ভিন্ন ঘরে মথুরের প্রতি যে স্নেহ ছিল সেই স্নেহে রাখিলেন।

কয়েক দিবস পরে শোক শান্তি হইলে তিনি আমাকে শ্রীক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিলেন। সদরআলা জগদ্বন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা নীলমণি আর তাঁহার পারিষদ নবীন গাঙ্গুলী, নিমকির দেওয়ানের ভ্রাতা কৃষ্ণদাস বসু ও হরিহর রায় প্রভৃতি কয়েক জন শ্রীক্ষেত্রে যাইতেছিলেন, আমাকেও তাঁহাদের সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন। আমার ঈপ্সিত শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া জগন্নাথদেবকে দর্শন করিলাম।

জগন্নাথদেবের রত্নবেদীর চতুষ্পার্শ্ব বড় অন্ধকার-ময়। লোকের ভিড়ও খুব। প্রদক্ষিণ করিবাব সময় আমার দম বন্ধ হইয়া আসিল। কম্পিতকণ্ঠে অস্পষ্টভাবে বলিলাম, নীলমণি দাদা, আমি মরিলাম।

নীলমণি ও নবীন বড় জোয়ান ও সাহসী। তাঁহারা সেই রত্নবেদীর দেওয়ালে আমাকে ঠেলা দিয়া রাখিয়া দুই জন দুই দিকে হস্ত প্রসারিয়া দাঁড়াইলেন। সে স্থানে কেহ আসিতে পারিল না। পথ রুদ্ধ হইল বটে, কিন্তু আমি অচৈতন্য হইয়া পড়িলাম; তখন আমার সঙ্গীরা আমাকে শূন্যভরে লইয়া অক্ষয় বট তলায় ফেলিলেন। অনেকক্ষণ জল সেচন ও ব্যজন করিতে করিতে আমার চৈতন্য হইল। আমার সঙ্গীদের যত্ন ও শুশ্রূষায় সে দিবস আমার প্রাণ রক্ষা হইল।

এই ঘটনার কয়েক মাস পরে দাদার কর্ম্মোন্নতি ঘটিল। তাঁহার সেই পদে আমি ১৮৮৭* খ্রীষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারি তারিখে নিযুক্ত হইলাম। হরিনাথ সাহায্য করিয়াছিলেন। তখন আমার বয়স আঠার বৎসর। এই আঠার বৎসর বয়সে আমি বৈতরণী নদীর কিনারায় যাজপুর মোকামের নমক চৌকীর দারোগা হইলাম। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর পর্য্যন্ত উক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলাম। এই সময়ের মধ্যে একবার কিছু দিনের জন্য দাদার কর্ম্মের ভার প্রাপ্ত হই। ঘোড়ায় চড়িয়া আমায় তদারক করিতে হইত। এক দিবস তদারকে বহির্গত হইয়াছি। কোনও এক সরাইয়ের কিঞ্চিৎ দূরে একটা কাঁটাজঙ্গল ছিল। ঘোড়া ক্ষেপিয়া সেই জঙ্গলে আমাকে ফেলিয়া দিয়া একটা পদাঘাত করিল; দ্বিতীয় পদাঘাত সময়ে তাহার কদমে কি বাজিল,—সে কাত হইয়া অন্যদিকে পড়িল। আমার সঙ্গী চাপরাশি ছুটিয়া আসিয়া আমার অবস্থা দেখিল—ডাকিল, উত্তর পাইল না। পরে কাঁটাজঙ্গল কাটিয়া আমাকে বাহির করিয়া সরাইতে লইয়া ফেলিল। অনেকক্ষণ পরে চৈতন্যোদয় হইল। কয়েক দিবস তথায় থাকিলাম। ঘোড়া আর দুই এক কদম মারিলে বাঁচিতাম না, দিগম্বর মিত্রের পুত্রের ন্যায় হইতাম।

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে বালিহস্তায় বদলি হইলাম। প্রবাদ আছে, এইখানে বালিরাজার মৃত্যু হয়। এই চৌকিতে আসিতে না আসিতে শুনিলাম, সমুদ্রের লোণা সৈবালিতে দরিয়া কিনারায় অনেক মানুষ গোরু ভাসিয়া যাইতেছে। তা'তে সরকারি নমকের ক্ষতি হয়। আড়ঙ্গ মুড়মালঙ্গ ও সাত ভেয়ে তদারকের ভার আমার প্রতি অর্পিত হয়। আমি মুড়মালঙ্গে পৌঁছিয়া তিনশত মণ চোরাই নমক মায় কিস্তি গ্রেপ্তার করিয়াছিলাম। দরিয়ার একস্থানে যথায় মাইপহরা নামক বাতিঘর আছে, তাহারই সন্নিকটে—দরিয়ার উপকূলে—মুড়মালঙ্গ।

* ১৮১২ হওয়া সম্ভব; কেন না, ১৮১২ সালে তাঁহার বয়স আঠার বৎসর।

কটক পৌঁছিলে চার্লস বিচর সাহেব এজেন্ট আমার প্রতি তুষ্ট হন। সেই সময় বিষ্ণুমোহন মিত্র (ভদরক মোকামের রিটেল গোলার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী) কর্ম্ম হইতে অপসৃত হন। সাহেব আমাকে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। কিছুদিন কাজ করিবার পর কটক জেলা তিন খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গেল ; ভদরক রিটেল গোলা বালেশ্বর জেলার সামিল হইল। সার জন ডাউনি সাহেব তথাকার এজেন্ট হইলেন। অস্করি ফেকরত নামক কোনও ব্যক্তি দেওয়ান হইলেন। তিনিই কর্ত্তা। তিনি আসিয়া দেখিলেন, ভদরক-গোলা বড় উপার্জ্জনের স্থান। তখন তিনি আমাকে বরখাস্ত করিয়া আমার স্থানে তাঁহার ভ্রাতাকে নিযুক্ত করিয়া এক রোবকারি লিখিলেন। তাহাতে লিখিলেন, যাদবচন্দ্র বালক এবং অনুপযুক্ত—এতাদৃশ ভারি কর্ম্মের যোগ্য নহেন। আমার বদলি দারোগা আসিয়া পৌঁছিল। আমার জিম্মায় তহবিলে তখন সাত আট হাজার টাকা ছিল। তহবিল বুঝিয়া লইবার সময় নূতন দারোগা আপন তসবি অর্থ জপের মালায় সংখ্যা রাখিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, কাগজ কলমে না লিখিয়া জপের মালায় সংখ্যা রাখিলে ভুল হইবে। তিনি কোনও উত্তর দিলেন না। অবশেষে টাকার রসিদ দিবার সময় তিনি দস্তখতের স্থানে নামের মোহর করিয়া কহিলেন, 'আমরা এইরূপে দস্তখত করিয়া থাকি, তুমি রিপোর্ট করিলে জানিতে পারিবে।'

আমি ঐ রসিদ রিপোর্ট সহ পাঠাইলাম। তাহাতে লিখিলাম যে, 'আমার স্থানে যে ব্যক্তি আসিয়াছেন, তিনি তহবিলের টাকা বুঝিয়া লইবার সময় জপের মালায় সংখ্যা রাখেন, এবং রসিদে দস্তখত না করিয়া নামের মোহর দিয়াছেন। ইহা হুজুরে মঞ্জুর হইবে কি না জানি না।' তখন উইলিয়ম বেলেন্ট সাহেব কমিশনর ছিলেন। তিনি আমার রিপোর্ট পাইয়া আমাকে তলব করিলেন, এবং আমার সাক্ষাতে উইলি সাহেবকে বলিলেন, 'এই ব্যক্তিকে সারথা আড়ঙ্গে পোক্তানি দারোগগিরি কর্ম্মে বাহাল কর।'

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে আমি সারথা আড়ঙ্গে বাহাল হইলাম। তথায় একদিন ডোঙ্গায় করিয়া একটা লোণা নদী পার হইতেছিলাম। সহসা ডোঙ্গা উল্টাইয়া গেল, আমি ডুবিয়া গেলাম। মাঝি রক্ষা করিল, নতুবা সে যাত্রা মরিতাম। ১৮২৪ সালে দনমঙ্গল আড়ঙ্গে, ১৮২৫ সালে অন্য একটা আড়ঙ্গে বদলি হই। তৎকালে ব্রজমোহন ঘোষাল নমকির দেওয়ান। তাঁহার অত্যাচারে আমি তিষ্ঠিতে না পারিয়া কর্ম্মে ইস্তফা দিয়া বাটী আসিয়াছিলাম। ১৮২৭ সালে ডাউনি সাহেব আমাকে তলব করিয়া মলঙ্গ আডঙ্গের দারোগাগিরি কর্ম্ম দেন। তথায় ১৮৩৪ সাল পর্য্যন্ত কার্য্য করি। ঐ সময় হেনরি রিকেট সাহেব বালেশ্বরের ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টার ছিলেন। ব্রজমোহন ঘোষালের দৌরাত্ম্যের কথা তিনি অবগত ছিলেন। এমন সময় ডাউনি সাহেব বদলি হইলেন, এবং রিকেট সাহেব তাঁহার স্থানে নমকির এজেন্ট নিযুক্ত হইলেন। নিমকি এলাকায় ছোট বড় ছয় শত কর্ম্মচারী ছিল, প্রায় সকলেই অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ায় কর্ম্মচ্যুত হইলেন। ব্রজমোহন সসপেণ্ড হইলেন। ব্রজনন্দ দাস নামে একজন বাঙ্গালী দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন। আমিও অপরাধী মধ্যে গণ্য হইয়াছিলাম ; কিন্তু আমার বিচার হয় নাই।

আমার অপরাধের বিচার জন্য রিকেট সাহেব আমাকে বালেশ্বরে তলব করিলেন। আমি তিন শত বেহারা মালঙ্গি লইয়া হাজির হইলাম। আমার মুহুরি দুই জনে ভয়ে হাজির হইল না। সাহেব আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি ঘুষ লইয়া থাক?'

উত্তর। না ; আর ঘুষ লইয়া কে কোথায় স্বীকার করিয়া থাকে?

সাহেব আরও রাগিয়া কহিলেন, 'হলপানে হলপ করিয়া বল।'

আমি উত্তর করিলাম, 'মহাপ্রসাদ বা গঙ্গাজল যবন-স্পৃষ্ট হইলে মহত্ত্ব হারায়। এ হলপ লইয়া

শতবার বলিতে পারি, যে হেতু ইহার মহত্ত্ব নাই। কিন্তু আসল হলপ, আপনি ধর্ম্মস্বরূপ, আপনার প্রতি দৃষ্টি করিয়া যাহা বলা যায়, তাহা অপেক্ষা অন্য হলপ বড় নয়, শাস্ত্রে এইরূপ বলে।'

সাহেব। তুমি কি পণ্ডিত?

আমি। পণ্ডিত নহি, পণ্ডিত সমাজে বাস করি।

সাহবে। মণ্ডলঘাট পণ্ডিত সমাজ?

আমি। মণ্ডলঘাটে পণ্ডিত লোক আছে বটে, কিন্তু সেটা চাষা-গ্রাম। আমার বাসস্থান গঙ্গার ধারে—হুগলির নিকট। তথায় অনেক পণ্ডিত ও সভ্যলোক আছেন।

সাহেব। ব্রজমোহন ঘোষাল তোমার কে?

আমি। কেহ নহে—আমার সঙ্গে কোন সুবাদও নাই।

সাহেব। তোমাকে কে চাকবী দিযাছে?

আমি। কটক জেলার এজেণ্ট চার্লস বিচর সাহেব।

সাহেব। কতদিন চাকরী করিতেছ?

আমি। দশ বৎসর।

হলপ মুকুব হইল।

দাদন করিতে কবিতে সাহবে মলঙ্গিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন. 'তোমরা ১৬ কুস্তি খোরাকি নমক পাও, তাহা ওজনে ৮ মণ। আর গাছা নমক ৮ মণ পাও। এই ১৬ মণ নমক তোমরা কি কর?'

উত্তর। আমরা খাইয়া থাকি।

সাহেব সহাস্যে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। আমি বলিলাম, 'মলঙ্গি লোক আপন আপন প্রাপ্য এক বিন্দুও খায় না ; পোক্তানি নমক হইতে দৈনিক খরচ নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। খোরাকি নমক বিক্রয় করে।'

সাহবে। তোমার জানত বিক্রয় হয়?

আমি। হাঁ ; বরং আমি আপন দস্তখত মোহবে ছাড় চিঠি দিয়া বিক্রয় করাই।

সাহেব। সরকারের চাকব হইযা তুমি একপ গর্হিত কার্য্য করিয়া থাক? তোমায সসপেণ্ড করিলাম।

আমি। আপনি সব করিতে পারেন. কিন্তু আমাব বক্তব্য শেষ করিতে দিতে আজ্ঞা হয়।

সাহেব। কি, বল।

আমি। মালঙ্গি লোক অতি দুঃখী ; পবিধানে বস্ত্র নাই—এক টুকবা ন্যাকড়া অবলম্বন ; দেহে বা কেশে তেল নাই—রুক্ষ অপরিষ্কার ; আহার্য্য—ভাত. পুইডাঁটা, কাঁকড়া আব লবণ। আট মাস পোক্তানে থাকে, চারি মাস ছুটি পায়। এই চারি মাস ঘরে গিযা চাষ করে। জমিদার খাজনার জন্য পীড়ন করিলে চাষের ধান্য বিক্রয় করিয়া খাজনা দেয়। তখন আহারের উপায় আর থাকে না।... যে সকল স্থানে নমক দুষ্প্রাপ্য, অথবা মহার্ঘ, সেই সকল স্থানের মলঙ্গির নামে আপন দস্তখত মোহরে ছাড় চিঠি লিখিয়া দিয়া থাকি। ইহা অমুক আইনের ধারার বিধান অনুসারে অবিধি নয়। ফলে তাহারা বিক্রয়লব্ধ অর্থে জমিদারের খাজনা দিতে এবং পরিবার প্রতিপালন করিতে সমর্থ হয়।...

রিকেট সাহেব প্রজাপালক, ন্যায়বান ; তিনি ক্ষণকাল আমার প্রতি তীক্ষ্ণ নয়নে চাহিয়া মালঙ্গিদের জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কত টাকা এই দারোগাকে ঘুষ দিয়া থাক? আর ইহার উপর তোমাদের কোনও নালিশ আছে?'

সকলে এক জবানে কহিল, 'কোনও নালিশ নাই, আমরা ঘুষ দিই না।'

তিন জন মালঙ্গি কহিল, 'এক দিবস আমরা দৈনিক খাইবার নমক (এক এক সের হইবেক) লইয়া যাইতেছিলাম। দারোগা তাহা দেখিতে পাইয়া ক্রোক করিয়া লইলেন; এবং চাপরাসি মহসিল দিয়া বালেশ্বব লইয়া যাইবার হুকুম দিলেন। পরে চাপরাসিকে চুপি চুপি কি বলিয়া দিলেন। চাপরাসি আমাদিগকে সরকারি গোলায় লইয়া গিয়া আপনার খাবার নমক হইতে তিন জনকে তিন সের নমক দিল; এবং আমাদিকে বাটিতে রাখিয়া আসিয়া কহিল, 'এমত কর্ম্ম আর করিও না।' অন্য মালঙ্গিরা ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেল, তাদের কিছু হ'ল না। আমরা ধরা পড়িলাম। তাই এ শাস্তি। অতএব ইনি পক্ষপাত।'

সাহেব হাস্য সংবরণ করিয়া গম্ভীব বদনে কহিলেন, 'দাবোগা বাবুকে আর এখানে রাখিব না।'

কথিত তিন জল মালঙ্গি শ্রবণমাত্রেই উচ্চৈঃস্বরে বোদন কবিয়া উঠিল, এবং ক্ষমা ভিক্ষা কবিতে লাগিল। বলিল, 'এ দারোগা না থাকিলে আমবা পোক্তান করিব না।'

এই কথা শুনিবামাত্র তিন শত মালঙ্গি একেবারে হরিবোল দিয়া উঠিল। সাহেব হাস্য করিয়া কহিলেন, 'এই দারোগা তোমাদের থাকিবেক।' পরে আমার পানে চাহিয়া কহিলেন, 'তুমি অদ্য মাজুল হইতে, কিন্তু তুমি প্রজাপালক ও সত্যবাদী; যদি তোমার কোন অপরাধ থাকে, তাহা আমি ক্ষমা করিলাম। তুমি ব্রজমোহন ঘোষালের আত্মীয় হইলে বোধ হয় ক্ষমা কবিতে পারিতাম না। আগামী সালে তোমায় বড় আডঙ্গের কর্ম্ম দিব। তুমি আট মাস কর্ম্ম করিয়া চার মাস আমার হুজুরে হাজিব হইবে। রিটেল গোলাব নমক চালানি যাহা ব্রজমোহনেব ছিল, তাহা তোমাকে দিলাম। ইহাতে বৎসরে দেড় হাজার টাকা কিফাত পাইবা।'

ইতিমধ্যে মেদিনীপুরের কালেক্টরি তহবিলে তছরুপাত হইল। খাজাঞ্চিকে বরতরফ করিয়া কালেক্টার ইষ্টেনীফোরত সাহেব, গঙ্গাপ্রসাদ গোঁসাইকে খাজাঞ্চিগিবি কর্ম্ম দিলেন। কিন্তু গভর্মেণ্টি ইষ্টেনীফোরত সাহেবকেও সরাইলেন। তাঁহার স্থানে ডনেলি সাহেব আসিলেন। রিকেট সাহেব কমিশনার হইলেন। তিনি ডনেলি সাহেবকে আদেশ কবিলেন, 'গোঁসাইকে তাড়াইয়া যাদবচন্দ্রকে সেই স্থানে নিযুক্ত করিবে।'

১৮৩৬ ও ১৮৩৭ সাল দুই বৎসর খাজাঞ্চিগিবি কর্ম্ম করিলাম। ডনেলি সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া হেড কেরাণি জগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমার নাম কমিশনারের নিকট পাঠাইয়া ডিপুটি কালেক্টরির পদের জন্য রিকমেণ্ড করিলেন। রিকেট সাহেব জগবন্ধুর নাম কাটিয়া আমাকে রিকমেণ্ড করিলেন। ১৮৩৮ সালে জানুয়ারী মাহায় আমি ডিপুটি কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলাম।

১৮৪৯ সাল পর্য্যন্ত মেদিনীপুর, হিজলি, ও অন্যান্য স্থানে বন্দোবস্ত কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম। ১৮৪৯ সালের নভেম্বর মাহায় চব্বিশ পরগণায় বদলি হইলাম। একবার খাড়িজুড়ি বন্দোবস্ত করিতে গিয়া বনের মধ্যে বাঘের হাতে পড়িয়াছিলাম। বাঘ ১০/১২ হাত তফাতে ছিল। সঙ্গের লোক চীৎকার করাতে বাঘ পলাইয়া গেল।

১৮৫২ সালে বর্দ্ধমানে বদলি হই। ১৮৫৩ সালে হুগলি আসি। তথা হইতে আবার বর্দ্ধমান। অবশেষে ১৮৫৭ সালে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করি। পেন্সন হয় মাসিক ২২৫ টাকা। এক্ষণে আমার চারিটি পুত্র। জ্যেষ্ঠ শ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়—ডিপুটি কালেক্টর, মধ্যম

শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র—ডিপুটি কালেক্টর, পরে রেজিষ্ট্রার ; তৃতীয় শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র—ডিপুটি কালেক্টর ; চতুর্থ শ্রীপূর্ণচন্দ্র—রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত আছেন ; ৪২ বৎসর চাকরী করি। এক্ষণে আমার বয়স ৭৯ বৎসর।

ইতি ১৫ই বৈশাখ ১২৭৯ সাল।*"

পূজ্যপাদ যাদবচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১২৮৭ সালের ১৩ই মাঘ কৃষ্ণ-দশমী তিথিতে ; তখন তাঁহার বয়স ৮৭ বৎসর।

বঙ্কিমজীবনী/
শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মেকানিকস ইনস্‌টিটিউশন

"প্রতিষ্ঠানের কোন নিজস্ব গৃহ ছিল না। গৃহ থেকে গৃহান্তরে তার কাজকর্ম চলত। বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য গুণী ব্যক্তিদের ডাকা হত। প্রধানত তত্ত্ববিজ্ঞান ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান বিষয়েই বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হত। তার মধ্যে 'ডিজাইন' এবং 'ড্রয়িং'-এরও একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। জর্জ ও কোলসওয়র্দি দুই ভাই এই বিষয়টাকে এক রকম অধিকার করে রেখেছিলেন বলা চলে। ডিজাইনের বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব এবং পরিপ্রেক্ষিত বিষয়ে বড় ভাই জর্জ গ্রাণ্ট ইনস্টিটিউশনে একটি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাটি ছোট ভাই কোলসওয়ার্দির অধীনে নিয়মিত একটি 'ডিজাইন, ড্রয়িং ও পার্সপেকটিভ' বিষয়ে ক্লাস খোলার প্রস্তাবনা বলা চলে। বক্তৃতার শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র এবং পাশে বসেছিলেন 'বোর্ড অব রেভিনিউ'-এর সদস্য ওয়েব স্মিথ। স্মিথ নিজে শিল্পচর্চাও করতেন। জর্জের বক্তৃতার তিনি তারিফ করেন খুব এবং সেটা গভর্নর জেনারেল অকল্যাণ্ডের কানে পর্যন্ত পৌঁছয়। এরপর মুয়াট সাহেব মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন এবং ক্যাপ্টেন বয়েলো 'ঝুলন্ত সেতু' সম্বন্ধে বলেন। জর্জ টমসন বিলেত থেকে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে এদেশে এসে ইনসটিটিউশনে ধারাবাহিক কয়েকটি বক্তৃতা দেন। তার ফলে ঝিমন্ত প্রতিষ্ঠান আবার বেশ চাঙ্গা হয়ে ওঠে। পর পর লেকচার চলতে থাকে। এক সময় কোলসওয়ার্দি সপ্তাহে দুদিন করে ড্রয়িং ও ডিজাইনের ক্লাস খোলেন। ক্লাস হত সন্ধ্যায়, বুধবারে সাধারণ ড্রয়িং-এর ক্লাস এবং শনিবারে পরিপ্রেক্ষিত বিষয়ে ক্লাস। সন্ধ্যা ছটা থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত সময় ছিল ক্লাসের। ৮ই এপ্রিল ১৮৪১, কোলসওয়ার্দি তাঁর ছাত্রদের জন্য প্রাথমিক ড্রয়িং, ডিজাইন ও পরিপ্রেক্ষিত বিষয়ে নিয়মাবলী প্রকাশ করেন। এদেশের ছাত্রদের আধুনিক ড্রয়িং ও ডিজাইন শিক্ষার আদিগুরু কোল্‌সওয়ার্দির কাজ আরম্ভ হয় এইভাবে, কলকাতার মেকানিকস ইন্‌সটিটিউশন থেকে। পরে

* আত্মজীবনীর কোনও কোনও অংশ পরিত্যাগ করিয়াছি। স্থানে স্থানে একটু আধটু পরিবর্ত্তন করিয়াছি। সকল শব্দ পড়িতে না পারায় এরূপ করিতে হইয়াছে।

এই আত্মজীবনীতে আরও একটা জিনিষ লক্ষ্য করিবার আছে। তিনি তাঁহার গুরুদেব সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করেন নাই এবং যে ঘটনা হইতে তাঁহার গুরুলাভ হয়, সে ঘটনারও কোনও উল্লেখ নাই।

হাওড়ার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ড্রয়িং-এর শিক্ষক এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ড্রয়িং-এর অধ্যাপক পদে নিয়োগ তাঁর খুবই যোগ্য পুরস্কার বলা চলে।"

বিনয় ঘোষ/কোলসওয়ার্দি গ্রান্ট/
শারদীয়া অমৃত, ১৩৬৮

ল' কমিটির পরীক্ষা ও 'বিদ্যাসাগর' উপাধি

"স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করে তিনি হিন্দু ল' কমিটির পরীক্ষা দেবার সঙ্কল্প করেন। এই পবীক্ষায় পাশ করলে তখনকার দিনে আদালতের জজ-পণ্ডিতের চাকরি পাওয়া যেত। ১৮৩৯ সালের এপ্রিল মাসে ঈশ্বরচন্দ্র পরীক্ষা দিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। এই সময় তাঁকে যে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। তাতে লেখা হয়—
...Issuar Chandra Vidyasagur was found and declared to be qualified by his eminent knowledge of the Hindu Law to hold the office of Hindoo Law Officer in any of the Established Courts of Judicature.
১৮৩৯ সালের মে মাসের এই প্রশংসাপত্রে দেখা যায়, তাঁর নামের শেষে 'বিদ্যাসাগর' উপাধিটি ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং ১৮৪১ সালে কলেজের পাঠ শেষ হবার পর, অধ্যাপকরা মিলিত হয়ে তাঁকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি দিয়েছিলেন, এ-ধারণা প্রচলিত হলেও ঠিক নয়।"

বিনয় ঘোষ/বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ
(২য় খণ্ড, ১৩৬৪)

বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর

"১৮৪২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে রামগোপাল ঘোষ 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' নামক একখানি দ্বিভাষী সাময়িক পত্রের প্রবর্ত্তন করেন এবং বন্ধু প্যারীচাঁদের হস্তে উহার সম্পাদকীয় ভার অর্পণ করেন। এই পত্র প্রথমে মাসিক, পরে সেপ্টেম্বর (১৮৪২) মাস হইতে পাক্ষিক এবং মার্চ্চ (১৮৪৩) হইতে সাপ্তাহিক পত্ররূপে প্রকাশিত হয়। ইহা 'নব্যবঙ্গ'দিগের মুখপত্র ছিল। এই পত্রিকা পাঠে জানা যায় যে বিখ্যাত জর্জ্জ টমসন এই পত্রিকা প্রকাশের জন্য আর্থিক সাহায্য করিতেন। তথাপি এই পত্রিকার কর্ম্মকর্ত্তারা দেখিলেন, তাঁহাদের প্রায় সহস্র টাকা ক্ষতি হইয়াছে এবং ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাস পর্যন্ত প্রকাশ করিয়া এই পত্র বন্ধ করিয়া দিলেন।"

কর্ম্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র/মন্মথনাথ ঘোষ

কলকাতায় জর্জ টমসন-এর প্রথম ভাষণ

"১১ জানুয়ারি রাত্রিযোগে সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভার যে মাসিক বৈঠক হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুক্ত বাবু রামগোপাল ঘোষের আহ্বানে মেং জর্জ টমসন সাহেব উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সভার কার্য্য শেষ হইলে সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ঐ সাহেবকে সভার ভাবি মঙ্গল বিষয়ক কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে অনুরোধ করাতে তন্মহাশয় নিম্নলিখিত বক্তৃতা করেন।

হে সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভার সভাপতি এবং সভ্য মহাশয়েরা! আমি আপনাদিগের অনুমতিক্রমে ভবদগণকে প্রিয় বন্ধুরূপে সম্বোধন করিতেছি; সভাপতি মহাশয় আমাকে কিঞ্চিৎ বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করাতে আমার অন্তঃকরণে নানাবিধ ভাবোদয় হইতেছে, আমি কোন বিষয়ে কি কহিব এখন স্থির করিতে পারি নাই। কিয়ৎ বৎসরাবধি ভারতবর্ষের সদবস্থা এবং ভবিষ্যন্মঙ্গলানুসন্ধানে আমার ক্রমশ অধিক যত্ন হইয়াছে, আমি যদিও এতদ্দেশীয় বিষয় সকল সর্ব্বদা পাঠ এবং পুনঃ ২ চিন্তা করিয়াছি ও তন্নিমিত্ত অনেক লিখিয়াছি ও বক্তৃতা করিয়াছি তথাপি আমার বাসনা ছিল এতদ্দেশে আগমন করিলে অত্রস্থ জনগণের সহিত আলাপ করিব এবং ভ্রমণ ও দর্শন দ্বারা বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ইহাদিগের উপকার করণে অধিক সক্ষম হইব; এক্ষণে জগদীশ্বরের কৃপায় এই স্থানে উত্তীর্ণ হইয়াছি, অদ্য রাত্রিতে এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিত বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকটে দণ্ডায়মান হওয়াতে এতাদৃশ আহ্লাদ হইল যে তাহা স্বপ্ন কি বাস্তবিক এখনও নিশ্চয় করিতে পারি নাই। আমি অদ্ভুত বস্তু দর্শনার্থ অথবা আত্মলাভাকাঙ্ক্ষায় এতদ্দেশে আগমন করি নাই; আমি ইংলণ্ডে প্রয়োজনীয় কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলাম, তাহা ত্যাগ করিয়া এখানে আসিবার তাৎপর্য্য এই, এদেশের অবস্থা যথার্থরূপে অবগত হইলে আমার দ্বারা আপনাদিগের উপকার হইবেক; এদেশের নদী পর্ব্বত ও প্রাচীন আশ্চর্য্য দ্রব্যাদি দর্শনে আমার প্রয়াস নাই, অনুসন্ধান করিতে হইলে যদৃচ্ছাক্রমে দৃষ্ট হইতে পারে; আমি এতদ্দেশের বর্ত্তমান অবস্থা এবং বর্ত্তমান ও ভবিষ্যন্মাঙ্গলিক বিষয় অবগত হইতে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছি, আমার বাসনা এই যে এদেশের লোকদিগের স্বদেশীয় ধনভোগ হয়। আমি যে দেশ হইতে আসিয়াছি তাহা ভাবতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মূল এবং এদেশের শাসন সম্পর্কীয় তাবদ্বিষয়ান্দোলনের স্থান; এতদ্দেশের শাসনের উৎকর্ষাপকর্ষে ইংলণ্ডীয় লোকেরা যাহাতে পরমেশ্বরের নিকট আপনাদিগকে দায়ী বোধ করেন তদ্বিষয়ে আমি বিশেষ মনোযোগ করিয়াছি, যাঁহাদিগের হস্তে শাসনের ভার সমর্পিত হইয়াছে তাঁহারা অতি বিবেচক সৎকর্ম্মশালী এবং সুবিচারক হইলেও ইংলণ্ডীয় লোকেরা উক্ত দায় হইতে মুক্ত হইতে পারেন না, কিন্তু তাঁহারা এদেশের বিশেষ বৃত্তান্ত অনবগত প্রযুক্ত কোন বিষয়ের বিবেচনা করণে অথবা বর্ত্তমান দোষ শোধনেব উপায় করণে অক্ষম; যদি তাঁহারা এদেশের বিষয় সকল জ্ঞাত হইতে পারেন এবং যদি তাহাদিগের যত্ন উৎপাদন করিয়া দেওয়া যায় তবে এতদ্দেশের সুবিচার ও উপকার জনক উপায়ে অবশ্য সাহায্য করেন এবং তাহাতে এতদ্দেশের ক্লেশজনক ব্যাপারের দমন ও পরিবর্ত্ত হইয়া রাজশাসনের ভবিষ্যৎ রীতি উৎকৃষ্ট হয়; অতএব ইংলণ্ডীয় লোকেদের অমনোযোগ ও অজ্ঞাততার দূরীকরণ ব্যতিরেকে আপনাদিগের এবং এতদ্দেশের পক্ষে শ্রেয়ঃ সম্ভাবনা নাই, আর এতদ্দেশ শাসনের সনন্দ পত্র পার্লিয়ামেণ্টে প্রস্তুত হয়, ইংলণ্ডীয়েরা পার্লিয়ামেণ্টের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং ইংলণ্ডের রাজার ও তত্রস্থ মনুষ্যদিগের আজ্ঞানুসারে যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এতদ্দেশ শাসন করেন তাঁহারা কোন বিষয় আবেদন করিলে ইংলণ্ডীয় লোকেরদের দ্বারা শেষ বিবেচনা হয়; তাঁহাদিগের এদেশের সদ্বিচার এবং উত্তমরূপে শাসনের উপায় করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম বটে কিন্তু তাঁহারা এখানকার যথার্থ বৃত্তান্ত অনবগত প্রযুক্ত তৎকরণে অক্ষম। আমি ইংলণ্ডে থাকিয়া ভারতবর্ষীয় বিষয়ের অনুসন্ধান পাইবার জন্যে চেষ্টা করিতে ত্রুটি করি নাই তাহাতে যাহা ২ যথার্থ বোধ হইয়াছিল তাহা

অস্মদ্দেশীয়দিগকে বিদিত করিয়াছি, আমি সর্ব্বদাই দেখিতাম যে বিলাতের অনেক লোক ঐরূপ জানিতে এবং তদনুসারে কর্ম্ম করিতে অতিশয় ইচ্ছুক, তাঁহাদিগের বাসনা এই যে, এদেশ সুবিচার পূর্ব্বক শাসিত হয়, আর তাঁহারা সকলেই স্ব ২ কর্ত্তব্য কর্ম্ম উত্তমরূপে জ্ঞাত হইয়া তদনুসারে কর্ম্ম করিতে বাঞ্ছিত আছেন, তাঁহাদিগের এমত ইচ্ছা নয় যে এতদ্দেশে ব্যবহার এবং রাজ্য সম্বন্ধীয় মন্দ ব্যাপার চিরস্থায়ী হয়, তাহাদিগের বোধ হইয়াছে যে ঐ সকল মন্দ ব্যাপার থাকাতে ইংলণ্ডীয় ও তত্রস্থ লোকদিগের পরস্পর উপকারের অনেক হানি হয় ; আমি এতদ্দেশে আগমনোম্মুখ হইলে ভারতবর্ষের হিতৈষী তত্রস্থ সহস্র ২ ব্যক্তি আমাকে উৎসাহ দিয়াছেন এবং পরমেশ্বরের নিকট আমার অভিলাষ সিদ্ধির প্রার্থনা করিয়াছেন। আমি শীঘ্র এতদ্দেশে উত্তীর্ণ হইয়া অত্রস্থ লোকদিগের সমীপে যে বক্তৃতা করিয়াছি এবং সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিক সভায় উপস্থিত হইয়াছি তাহাতে আমার আগমনের সার্থকতার সম্ভাবনা হইল, আপনাদিগের সভায় মুদ্রিত পুস্তক পাঠ করিয়া আমার অতিশয় আহ্লাদ জন্মিয়াছে এবং তৎপাঠে বিলাতের এবম্প্রকার সভাকে স্মরণ হইল ; আমি দুর্দ্দশাপন্ন লোকদিগের যে উপকার করিয়াছি ও তদ্বিষয়ে আমার যে যৎকিঞ্চিৎ ক্ষমতা জন্মিয়াছে তাহা সভার প্রসাদাৎ হয়। এই সভার কিঞ্চিৎ কালাবধি হ্রাসতা শ্রবণ করিয়া আমি অতিশয় দুঃখিত হইলাম আমার বিবেচনায় এই বোধ হয় যে সাধারণের মনোনীত এবং এতদ্দেশীয়েরদের চিত্ত ও কর্ত্তব্য কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ বিষয় সকল প্রস্তাব্য হইলে সভার উন্নতি হইতে পারে, আপনাদিগের সভার যেরূপ অভিপ্রায় তাহাতে উক্ত প্রকার অনেক ২ প্রশ্ন উপস্থিত হইবে এবং তদ্দ্বারা আপনাদিগের ভাবি নানাবিধ কার্য্যেও উপকার দর্শিবে ; এরূপ করিলে আপনারা শিক্ষা ও লাভ উভয়ই প্রাপ্ত হইবেন এবং যন্নিমিত্ত জীবন ধারণ করিতে হয় তাহাতেও অনেক আনুকূল্য পাইবেন ; আর এবম্প্রকার সভা সকল বিধিমতে উপকারজনক, কারণ তদ্দ্বারা স্বীয় অজ্ঞানের জ্ঞান হইয়া জ্ঞানোপার্জ্জনে ইচ্ছা হয় এবং অন্যকে উপার্জ্জিত জ্ঞানের উপদেশ করিতে ক্ষমতা জন্মে।

আমার এতদ্দেশে আগমনের তাৎপর্য্য এতৎ সভার অভিপ্রায় হইতে ভিন্ন নহে অর্থাৎ জ্ঞানোপার্জ্জনই উভয়ের অভিপ্রেত ; আমি আপনাদিগকে ও ভবদীয় দেশের বিষয় সকলকে কর্ণে শুনিয়াছিলাম এবং কোন ২ পুস্তক পাঠে এদেশের অবস্থা বিশেষ ব্যবহার এবং অভাব ইত্যাদিও যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞাত হইয়াছিলাম কিন্তু আমার যথার্থ ও নিগূঢ় তত্ত্বানুসন্ধানের মানস থাকাতে তাহাতে পরিতোষ জন্মে নাই, অতএব স্বয়ং দেখিতে এবং অত্রস্থ জনগণের সহিত বিবেচনা করিতে আসিয়াছি। যদবধি এখানে থাকিব তাবৎ পর্য্যন্ত এতদ্দেশীয়দিগের সহিত সর্ব্বদা আলাপ হইলেই আমার কর্ত্তব্য কর্ম্মানুষ্ঠান এবং সম্মান হয় যেহেতু তাহাতে আমি সকলের মানস অবগত হইতে পারিব আপনারা উপযুক্ত হইয়া স্বদেশীয় লোকদিগের প্রাপ্য বস্তুর নিমিত্ত পুনঃ ২ আন্দোলন করত ঐ সকল বিষয় সদ্বিচারপ্রিয় ইংলণ্ডীয়দিগের দৃষ্টিগোচর করিলে আমি যথেষ্ট পুরস্কার বোধ করিব (প্রশংসার ধ্বনি)।”

বেঙ্গল স্পেকটেটর

উমেশচন্দ্রের সস্ত্রীক খৃস্টধর্ম গ্রহণ

“১৭৬৭ শকের [১৮৪৫ খ্রী.] বৈশাখ মাসের এক দিন প্রাতঃকালে সংবাদপত্র দেখিতেছি, এমন সময় আমাদের হাউসের সরকার রাজেন্দ্রনাথ সরকার আমার নিকট কাঁদিয়া আসিয়া

উপস্থিত হইল। বলিল যে, 'গত রবিবারে আমার স্ত্রী ও আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা উমেশচন্দ্রের স্ত্রী, দুইজনে একখানা গাড়ীতে চড়িয়া নিমন্ত্রণে যাইতেছিলেন, এমন সময় উমেশচন্দ্র আসিয়া তাহার আপনার স্ত্রীকে গাড়ী হইতে জোর করিয়া নামাইয়া লয়, এবং উভয়ে খ্রীষ্টান হইবার জন্য ডফ সাহেবের বাড়ীতে চলিয়া যায়। আমার পিতা অনেক চেষ্টা করিয়া তাহাদিগকে সেখান হইতে ফিরিয়া আনিতে না পারিয়া, অবশেষে সুপ্রীম কোর্টে নালিশ করেন। নালিশে সে-বার আমাদের হার হয়। কিন্তু আমি ডফ সাহেবের নিকট গিয়া অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিলাম যে, "আমরা আবার কোর্টে নালিশ আনিব। দ্বিতীয় বার বিচারের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত আমার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূকে খ্রীষ্টান করিবেন না।" কিন্তু তিনি তাহা না শুনিয়া গত কল্যই সন্ধ্যার সময়ে তাহাদিগকে খ্রীষ্টান করিয়া ফেলিয়াছেন।' এই বলিয়া রাজেন্দ্রনাথ কাঁদিতে লাগিল।

ইহা শুনিয়া আমার বড়ই রাগ হইল ও দুঃখ হইল। অন্তঃপুরের স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত খ্রীষ্টান করিতে লাগিল! তবে রোস, আমি ইহার প্রতিবিধান করিতেছি। এই বলিয়া আমি উঠিয়া পড়িলাম। আমি তখনি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তের লেখনীকে চালাইলাম, এবং একটি তেজস্বী প্রবন্ধ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ পাইল।...

আমি তাহার পরে প্রতিদিন গাড়ী করিয়া প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কলিকাতার সকল সম্ভ্রান্ত ও মান্য লোকদিগের নিকটে যাইয়া তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতে লাগিলাম যে, হিন্দু-সন্তানদিগের যাহাতে পাদ্রিদের বিদ্যালয়ে যাইতে আর না হয়, এবং আমাদের নিজের বিদ্যালয়ে তাহারা পড়িতে পারে, তাহার উপায় বিধান করিতে হইবে। এদিকে রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, ওদিকে রামগোপাল ঘোষ ; আমি সকলের নিকট গিয়া সকলকেই উত্তেজিত করিতে লাগিলাম। আমার এই উৎসাহে সকলেই উৎসাহিত হইলেন।"

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর/আত্মজীবনী

হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়

"১৩ই জ্যৈষ্ঠ [২৫মে ১৮৪৫] আমাদের একটা মহা সভা হইল। এই সভাতে প্রায় সহস্র ব্যক্তি একত্র হইয়াছিলেন। স্থির হইল যে, পাদ্রিদের বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে যেমন ছেলেরা পড়িতে পায় তেমনি আমাদেরও একটা বিদ্যালয় হইবে...। আমরা চাঁদার পুস্তক লইয়া, তাহাতে কে কি স্বাক্ষর করেন তাহার অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় আশুতোষ দেব ও প্রমথনাথ দেব আমাদের নিকট হইতে চাঁদার বহি চাহিয়া লইয়া তাহাতে দশ হাজার টাকা স্বাক্ষর করিলেন। রাজা সত্যচরণ ঘোষাল তিন হাজার টাকা, ব্রজনাথ ধর দুই হাজার টাকা, রাজা রাধাকান্ত দেব এক হাজার টাকা। এইরূপে সেই দিনই চল্লিশ হাজার টাকা স্বাক্ষর হইয়া গেল।...

এই সভা হইতে 'হিন্দুহিতার্থী' নামে একটা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল, এবং তাহার কর্ম্ম সম্পাদন জন্য শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সভাপতি হইলেন। আমি ও হরিমোহন সেন সম্পাদক হইলাম। এই অবৈতনিক বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় নিযুক্ত হন। সেই অবধি খ্রীষ্টান হইবার স্রোত মন্দীভূত হইল, একেবারে মিশনরিদিগের মস্তকে কুঠারাঘাত পড়িল।"

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর/আত্মজীবনী

কৃষ্ণনগর কলেজের প্রতিষ্ঠা

"এখন যে স্থানটি 'পুরাণো কলেজের হাতা' নামে পরিচিত উহার একটু ইতিহাস আছে। ঐ অঞ্চলে পূর্ব্বে বড় ডাকাতি হইত ; পুলিশ কিছুই করিয়া উঠিতে পারিত না। একজন ম্যাজিষ্ট্রেট আসিলেন, তাঁহার নাম এলিয়ট। তিনি ভবানীপুরের চট্টোপাধ্যায়-বংশীয় একজন ধনাঢ্য ভদ্রলোককে বলিলেন, 'তুমি যদি ঐখানে একখানি বাড়ি করিয়া দিতে পার, উহা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের আবাসগৃহ হইবে ; একদিনও খালি থাকিবে না ; তুমি উপযুক্ত ভাড়া পাইবে।' ভদ্রলোক বাড়ি তৈয়ার করাইয়া দিলেন। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সেই গৃহে অবস্থান করিতে আরম্ভ করিলেন। বাড়ির সম্মুখেই বড় রাস্তা ; রাস্তার অপর পার্শ্বে পুলিশের থানা বসিল। অল্পদিনের মধ্যেই ডাকাতি বন্ধ হইয়া গেল। তখন গোয়াড়ি অঞ্চলে লোকে বাস করিতে আরম্ভ করিল ; নূতন নূতন বসতবাটি নির্ম্মিত হইল। কিছুকাল পরে কৃষ্ণনগরে কলেজ স্থাপনার প্রস্তাব হইল। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কলিকাতার সমস্ত সাহেব মত প্রকাশ করিলেন। একা বীডন সাহেব (মিঃ সেসিল বীডন) প্রস্তাবের স্বপক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন। কলেজ স্থাপন করা যখন স্থির হইল, তখন ম্যাজিষ্ট্রেট ট্রেভর (Trevor) কলেজের জন্য স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া ঐ বাড়িটি ছাড়িয়া দিলেন। কৃষ্ণনগর কলেজ স্থাপিত হইল।"

উমেশচন্দ্র দত্ত-র উক্তি/বিপিনবিহারী গুপ্ত/পুরাতন প্রসঙ্গ

কিশোরীচাঁদ মিত্রের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি

"হিন্দু কলেজ পরিত্যাগের অব্যবহিত পরেই কিশোরীচাঁদ তদানীন্তন লিগাল রিমেমব্রানসার মিঃ আলেকজান্ডারের অধীনে কিয়ৎকাল কার্য্য করিয়াছিলেন। পরে তিনি ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের সেক্রেটারী মিষ্টার থিওবোল্ডের অধীনে কিছুদিন কার্য্য করেন। কিন্তু এসকল কার্য্য তাঁহার রুচির অনুরূপ ছিল না। সুতরাং তিনি এই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কিয়ৎকাল ২৪ পরগণার তদানীন্তন প্রধান সদর আমীন, (প্যারীচাঁদের অন্যতম পরম বন্ধু) হরচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সহিত আলিপুর বিচারালয়ে বিচার বিভাগীয় কার্য্য সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টিলাভার্থ যাতায়াত করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি বিচারবিভাগীয় কার্য্যসম্বন্ধে কিছু জ্ঞানলাভ করেন। ইহার কিছু পরে মিষ্টার হেনরী টরেন্স এসিয়াটিক সোসাইটীর সহকারী সম্পাদকের কার্য্যের নিমিত্ত একজন উপযুক্ত লোক অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করায়, প্যারীচাঁদ তাঁহার ভ্রাতার সম্মতি লইয়া তাঁহার নাম প্রস্তাব করিলে কিশোরীচাঁদ উক্ত পদ প্রাপ্ত হন। এই কর্ম্ম তাঁহার রুচির সম্পূর্ণ অনুযায়ী ছিল এবং তাঁহার জ্ঞানচর্চ্চায়ও বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল।...

এই সময়ে কিশোরীচাঁদ তাঁহার জীবনের আদর্শ, উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক—রাজা রামমোহন রায়ের জীবনবৃত্তান্ত প্রণয়ন করেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রের অক্টোবর-সংখ্যায় উহা প্রকাশিত হয়। 'বেঙ্গল হরকরা' এই প্রস্তাবের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেন—"We understand it is the Production of a young educated native and it is altogether the best account we have ever seen of Rammohan, especially of his early life."... ভাষার মাধুর্য্যে, রচনার পারিপাট্যে, যুক্তির সারবত্তায় ও বর্ণনার অকৃত্রিমতায় ঐ প্রবন্ধ পাঠক মাত্রেরই নিকট অতি উপাদেয় বলিয়া বোধ হয় এবং বাঙ্গালার তদানীন্তন ডেপুটী গভর্ণর গুণগ্রাহী (পরে স্যার ফেডরিক) হ্যালিডে উহা পাঠ করিয়া

এত প্রীত হন যে, তিনি কিশোরীচাঁদকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। তখন এ কার্য্যে ভারতীয়গণকে প্রায় নিযুক্ত করা হইত না এবং এই পদ অত্যন্ত সম্মানের বলিয়া বিবেচিত হইত।"

মন্মথনাথ ঘোষ/কর্ম্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র

দ্বারকানাথ ঠাকুর

"আমাদের বাল্যাবস্থায় দ্বারকানাথ ঠাকুরই বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন। তাঁহাকে আমি অনেকবার দেখিয়াছি। তিনি আমাদের কলেজ পরিদর্শন করিতে প্রায়ই আসিতেন, এবং গবর্ণমেন্ট হাউসে কিংবা টাউনহলে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ সভায় প্রায়ই উপস্থিত থাকিতেন। আমি তাঁহাকে মেডিক্যাল কলেজেও কয়েকবার দেখিয়াছি ; সেখানে গ্যালারিতে তিনি লর্ড অক্ল্যাণ্ডের আসনের পশ্চাতেই বসিতেন, এবং লর্ড অক্ল্যাণ্ড যখন তাঁহার করমর্দ্দন করিতেন তখন আমরা তাঁহার পদমর্য্যাদা বিস্ময়ের সহিত উপলব্ধি করিতাম। আমি দুই একটি সভায় দ্বারকানাথকে বক্তৃতা করিতেও শুনিয়াছি,—তিনি ইংরাজী শব্দ বাঙ্গালার ন্যায় উচ্চারণ করিতেন। দিল্লীর বাদশাহ ও নিজামের দরবার হইতে নবাগত স্যর চার্লস-মেটকাফ প্রথম জুতা-বিভ্রাটের সূচনা করেন। তিনি আদেশ দেন যে লেভিতে দেশীয় ব্যক্তিগণ জুতা খুলিয়া আসিবেন। এই আদেশ শুনিয়া দ্বারকানাথ ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ লাট-প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া আসেন। আজিকালি মহারাজা বা উচ্চ-উপাধি-লোলুপ ব্যক্তিগণ এরূপ স্বাধীন-চিত্ততা দেখাইতে পারেন না। তিনি লর্ড অক্ল্যাণ্ডের ভগিনী মাননীয়া কুমারী ইডেনকে যে বিরাট ভোজ দিয়াছিলেন তাহার তুলনা নাই। মাল্টা, নেপল্স, রোম এবং য়ুরোপের অন্যান্য নগর হইতে লিখিত তাঁহার যে সকল ভ্রমণ কাহিনী সম্বলিত পত্র 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' পত্রে প্রকাশিত হইত, তাহা পাঠ করিয়াই ভবিষ্যতে আমার ভ্রমণ কাহিনী লিখিবার বাসনা জন্মে। আমাদের কলেজে জরীপ শিখিবার সময় আমরা তাঁহার বেলগাছিয়ার উদ্যানে জরীপ করিতে গিয়াছিলাম। য়ুরোপে প্রাপ্ত বহুমূল্য উপহার সামগ্রী দ্বারা উহা তখন সুসজ্জিত ছিল। পোপের নিকট হইতে প্রাপ্ত ম্যাডোনার একটি দুষ্প্রাপ্য ছবির কথা এখনও আমার স্মরণ আছে।

তখন দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনের প্রভাতকাল। তিনি মধ্যমাকৃতি একহারা পুরুষ ছিলেন ; গায়ের রং সচরাচর বাঙ্গালীর যেমন হইয়া থাকে তেমনই। তাঁহার উজ্জ্বল বুদ্ধি-তীক্ষ্ণ চক্ষুদ্বয় তাঁহাকে বিশেষত্ব প্রদান করিয়াছিল। যখন কোনও বিষয়ে তাঁহার মনোযোগ বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করা হইত এবং যখন দক্ষিণপার্শ্বের গুম্ফরাশি কুঞ্চিত করিতে করিতে তিনি কোনও কথা শুনিতেন তখন তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে একপ্রকার জ্যোতিঃ নির্গত হইত। আচার, ব্যবহার ও পরিচ্ছদে তাঁহার কোনও আড়ম্বর ছিল না। তিনি হিন্দুস্থানী জোড়া ও পাগড়ী পরিধান করিতেন—য়ুরোপীয় পরিচ্ছদের দিকে অর্দ্ধেক অগ্রসর হইয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে কখনও সাটিন বা মখমলের পোষাক পরিতে, বা হীরামুক্তা পরিতে দেখি নাই। তাঁহার যানেরও জাঁকজমক ছিল না, তিনি সাধারণ সবুজ রঙ্গের পাল্কী গাড়ী চড়িতেন। তিনি জাঁকজমকের দ্বারা নহে— মহৎ কার্য্যের দ্বারা— খ্যাতিলাভ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। সমসাময়িক সমাজে তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল বিভিন্ন অভিমত প্রচলিত ছিল তাহার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। সাধারণ লোকহিতকর কার্য্যে আগ্রহ এবং দানশীলতার জন্য তিনি য়ুরোপীয় সমাজে বিশেষ খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছিলেন। দেশীয় সমাজ তাঁহার দানশীলতার খ্যাতিতে

ঈর্ষ্যান্ধ হইয়া প্রশংসার মাত্রা সীমাবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমনের পর তাঁহার কোনও নিকট আত্মীয় তাঁহাকে একঘরে করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু দ্বারকানাথ তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই।"

ভোলানাথ চন্দ্র

বেতাল পঞ্চবিংশতি

"...'বেতাল পঞ্চবিংশতি' রচনার গৌরব কতখানি বিদ্যাসাগরের প্রাপ্য, তা নিয়েও সেকালে প্রশ্ন উঠেছিল, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জামাই যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ১৮৭১-এ মদনমোহনের যে জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ করেন তাতে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' রচনার ক্ষেত্রে মদনমোহনের বিশেষ অবদান প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয়, 'বিদ্যাসাগর প্রণীত বেতাল পঞ্চবিংশতিতে অনেক নূতন ভাব ও অনেক সুমধুর বাক্য তর্কালঙ্কার দ্বারা অন্তর্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা তর্কালঙ্কার দ্বারা এতদূর সংশোধিত ও পরিমার্জিত হইয়াছিল যে বোমাণ্ট ও ফ্লেচরের লিখিত গ্রন্থগুলির ন্যায় ইহা উভয় বন্ধুর রচিত বলিলেও বলা যাইতে পারে।' এই অভিযোগে বিদ্যাসাগর রীতিমতো বিচলিত বোধ করেন এবং যোগেন্দ্রনাথের অভিযোগ যে অলীক ও অসঙ্গত তা বেতাল পঞ্চবিংশতির দশম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে (১৮৭৬) তুলে ধরার চেষ্টা করেন। এখানে তিনি জানান, 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' লিখে প্রকাশ করার আগে তিনি তা গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে শুনিয়েছিলেন। তাঁদের পরামর্শে দু-একটি শব্দ ছাড়া মূল গ্রন্থের কিছুই তিনি পরিবর্তন করেন নি। এই অভিযোগ সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের মত জানতে চাইলে, ১২ বৈশাখ ১২৮৩-তে একটি চিঠিতে বিদ্যাসাগরকে তিনি জানান, বেতাল পঞ্চবিংশতি সম্পর্কে যোগেন্দ্রনাথের দাবি 'নিতান্ত অলীক ও অসঙ্গত'। আসল ব্যাপার হল 'আপনি বেতাল পঞ্চবিংশতি রচনা করিয়া আমাকে ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে শুনাইয়াছিলেন। শ্রবণকালে আমরা স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতাম। তদনুসারে স্থানে স্থানে দুই-একটি শব্দ পরিবর্তিত হইত। বেতাল পঞ্চবিংশতি বিষয়ে আমার অথবা তর্কালঙ্কারের এতদতিরিক্ত কোন সংস্রব বা সাহায্য ছিল না।' আত্মপক্ষ সমর্থনে গিরিশচন্দ্রের এই চিঠিটিও বেতালের দশম সংস্করণে বিদ্যাসাগর ব্যবহার করেছিলেন।... 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' সমকালে নানা রকম বিতর্ক সৃষ্টি করলেও, বইটির জনপ্রিয়তার ওপর তা কোনো ছাপ ফেলতে পারেনি। যে কারণে জেমস লং বইটিকে 'very popular' বলে চিহ্নিত করেন। বইটি সে যুগে এতই জনপ্রিয় ছিল যে ঘরের বউ-ঝিরা পর্যন্ত আগ্রহ নিয়ে এর পাঠ শুনত। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটকে সৈরিন্ধ্রীকে বলতে শুনি, 'ছোট বউ বসিস আমি আসচি, বিদ্যাসাগরের বেতাল শুনবো।' "

স্বপন বসু/সমকালে বিদ্যাসাগর

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসাগর

"ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বইয়ে জানিয়েছিলেন যে 'অন্নদামঙ্গল' ১ম ও ২য় খণ্ড বিদ্যাসাগরের সম্পাদনায় ১৮৪৭ সালে বের হয়। এবং বইটি 'কৃষ্ণনগর রাজবাটীর মূল পুস্তক দৃষ্টে পরিশোধিত।' বিহারিলাল সরকার লেখেন—'এই সময়ে মদনমোহন

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় 'সংস্কৃত-যন্ত্র' প্রতিষ্ঠিত করেন।... এই প্রেসে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথম ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ মুদ্রিত করেন। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি কৃষ্ণনগর মহারাজার বাড়ী হইতে আনীত হয়।... ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বড় প্রিয় ছিল। ভারতচন্দ্রকে তিনি ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন।... অন্নদামঙ্গলের পরিমার্জিত ভাষা, বাঙ্গালা ভাষার আদর্শ বলিয়া তাঁহার ধারণা ছিল।' বিহারিলালের গল্পই ইংরেজিতে বলেছেন সুবলচন্দ্র মিত্র।

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ দাবী করেছিলেন—'ভারত-রচিত অন্নদামঙ্গল (মদনমোহন) তর্কালঙ্কার দ্বারা সংশোধিত হইয়া সর্বপ্রথমে এই (সংস্কৃত যন্ত্রে) যন্ত্রে মুদ্রিত হয়।' বিদ্যাভূষণের কথায় বড় একটা কান দেয়নি কেউ। হালে অরবিন্দ গুহ সরকারী নথিপত্র ঘেঁটে জি. টি. মার্শাল আর এ. আর. ইয়ুং-এর চিঠিপত্র তুলে দেখিয়েছেন যে মদনমোহনই অন্নদামঙ্গলের সম্পাদক, বিদ্যাসাগর নন। প্রথম দিকে সংস্কৃত যন্ত্রে ছাপা বইয়ের বেশির ভাগই ছিল মদনমোহনের।"

বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ/পরমেশ আচার্য/শারদীয় অনুষ্টুপ, ১৩৯১

তত্ত্ববোধিনী ও প্রভাকর

"১ম ভাগ ১ সংখ্যা হইতে তত্ত্ববোধিনী আমাদের বাটীতে ছিল। একদিকে অক্ষয়কুমারের ভাষা হইতে যেমন গম্ভীর রচনার ভঙ্গি শিক্ষা করিলাম, অন্য দিকে গুপ্তের সেই সরল চটুল চকচকে পদ্যের ভাষাও শিক্ষা করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। তখন প্রভাকরের প্রভূত পশার। লোকে কথায় কথায় প্রভাকরের পদ্য আওড়াইয়া কোনো বিষয়ের মীমাংসা করে, তামাসা করিতে হইলে প্রভাকরের ভাষায় বলে,— এই গৌরব এই আদর দেখিয়া বালক হৃদয়ে একরূপ বুঝিয়াছিলাম যে, সহজ সরল বাঙ্গালা একটা ফেলনা জিনিষ নয়।"

পিতা-পুত্র /
অক্ষয়চন্দ্র সরকার/
বঙ্গভাষার লেখক

মাসিক প্রভাকর

"তখন খৃষ্টানির সংবাদপত্র ছিল, জ্ঞানকিরণোদয় প্রভৃতি। ধর্ম্মের জন্য ছিল, এক পক্ষে সমাচার চন্দ্রিকা। উহা দৈনিক। অন্য পক্ষে ছিল, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। উহা মাসিক। আর সাধারণ সংবাদ বহন ও রসভাষ সঞ্চালনের জন্য ছিল, একদিকে প্রভাকর, অন্যদিকে ভাস্কর। তখন আমি চন্দ্রিকা দেখি নাই। পড়িতাম তত্ত্ববোধিনী ও মাসিক প্রভাকর। দৈনিক প্রভাকরের সংবাদ আদি থাকিত আর সরিফসেলের বিজ্ঞাপন থাকিত। উহা আমি বড় পড়িতাম না। প্রতি মাসের প্রথম দিনের প্রভাকরে প্রচুর পদ্য থাকিত। তাহাই পড়িতাম, নাড়িতাম-চাড়িতাম, মুখস্ত করিতাম। প্রতি বৎসরের ১লা বৈশাখের প্রভাকর অবয়বে ছয় ভাগের কলিকাতা গেজেটের মত পুরু। সম্বৎসরের প্রধান ঘটনাবলী, রং বিরং পদ্যে, ঈশ্বর গুপ্তের সেই সরল সতেজ লেখনীতে প্রকাশিত হইত।...

তখন আমার বয়স পুরা দশ বৎসর হয় নাই। ইতিমধ্যে তিনবার বার্ষিক প্রভাকর আমি পড়িয়াছিলাম; অর্থাৎ সপ্তম বর্ষে আমি প্রভাকর পড়িয়াছি, বুঝিয়াছি, মুখস্থ করিয়াছি।"

পিতা-পুত্র /
অক্ষয়চন্দ্র সরকার /
বঙ্গভাষার লেখক

মেঘনাদবধ কাব্য

"বোধ করি বিবিধার্থ সংগ্রহে, আমি মাইকেলের তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যের পরিচয় পাইয়াছিলাম। কিন্তু বালক কালে আমি মাইকেল কিছুই পড়ি নাই। একটু বড় হইলে, মাইকেলের মিত্রাক্ষরে উপহাস করিতাম। তাঁহার লেখার ভাবে, অবহেলা করিতাম। তাঁহার প্রতি এক প্রকার মুখস্থ বিদ্বেষ দেখাইতাম। আসল কথা মধুসূদনকে লইয়া তখন দুইটা পক্ষ হইয়াছিল। এক পক্ষ বলিত, মাইকেলের মত অমন হয় নাই, হবে না। আর এক পক্ষ বলিত, উহা কেবল ছাই ভস্ম। উহাতে না আছে ছন্দ, না আছে মিল, ব্যাকরণে দুষ্ট, অলঙ্কারে দুষ্ট। বালককালে এই বিতর্ক শুনিতাম। মনে মনে বিদ্বেষী পক্ষের দিকে একটু টান ছিল। তাহার পর এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া যখন আমি সায়েন্সা বিদ্যা-দিগগজ বলিয়া পরিচিত হইলাম, তখন সেই বিদ্বেষী পক্ষের অধিনায়কতা, জানি না কেমন করিয়া, আমার স্কন্ধে আসিয়া পড়িল। ইহার বাহাদুরী এই, দুই দশ ছত্র ব্যতীত তখন আমি মাইকেল ভাল করিয়া পড়ি নাই। তবে তুখোড় ছেলে কিনা, মাইকেলের পক্ষে কেহ কিছু বলিলে, আমি বিপক্ষে একটা না একটা জবাব দিতে পারিতাম। মাইকেলকে ভেঙচাইয়া, অমৃতাক্ষর [অমিত্রাক্ষর] পদ্য লিখিতাম। কিন্তু তখন বাস্তবিক জানিতাম না, — অমৃতাক্ষর [অমিত্রাক্ষর] কাহাকে বলে।...
বিধাতার নির্ব্বন্ধে, বি. এ. পরীক্ষার জন্য, বাঙ্গালার পদ্যাংশে মাইকেলের মেঘনাদের শেষ ভাগ স্থিরীকৃত হইল। সংস্কৃতাধ্যাপক গোপালচন্দ্র গুপ্তের সহিত, আমার নিত্য দ্বন্দ্ব চলিতে লাগিল। কিশোর-স্বভাব-সুলভ, অতিশয় উক্তিতে আমি বলিলাম যে, মাইকেলের সমস্তই চুরি, তাঁহার নিজের একটুও নয়। আর এ কথা মাইকেল নিজেই তাহা স্বীকার করিয়াছেন। কেননা তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন "গাঁথিব নূতন মালা" অর্থাৎ আমি টীকা করিতেছি,—ফুলগুলি তোমাদের পাঁচজনের,—গাঁথনি খালি আমার। তখন যে স্থানটা পড়া হইতেছিল, সে স্থানে ছিল "অন্ধকার ঘরে দীপ আছিল মৈথিলী"। অধ্যাপক বলিলেন—"দেখ, দেখি কেমন সুন্দর নূতন উপমা?' আমি বলিলাম, "ও ত চাহার দরবেশে আছে। আঁধারি ঘরমে এক দিয়া না দিয়া।"... বলা বাহুল্য, এখন আমি, সেরূপ বিদ্বেষী নহি। মাইকেলের ছন্দ, কবিবর হেমচন্দ্রের অপেক্ষা সরল, সতেজ, মোলায়েম, সহজ এবং সঙ্গীত-স্বাদ-বিশিষ্ট, তাহা বুঝিতে পারি।"

পিতা-পুত্র/অক্ষয়চন্দ্র সরকার /
বঙ্গভাষার লেখক

বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়

বঙ্কিমবাবুর বাড়ি আমার বাড়ি হইতে বেশি দূর নয়। নৈহাটি স্টেশন হইতে তাঁর বাটী যতটুকু দক্ষিণ, আমার বাড়ি প্রায় ততটুকু উত্তর-পশ্চিম। তাঁদের বাড়িতে রাধাবল্লভ বিগ্রহ আছে,

খুব জাঁকাল নিত্য-ভোগ হয়, রোজ দশ সের চাল রান্না হয়, আর নয় সিকা করিয়া নিত্য বাজার খরচ বন্দোবস্ত আছে। শুনিয়াছি, মুড়াগাছা পরগণায় রাধাবল্লভের খুব বড় একটা তালুক আছে। তারই মুনাফা হতে তাঁহার সেবা চলে। দুইঘর চাটুয্যে মহাশয়রা রাধাবল্লভের সেবাইত, একঘর ফুলে, আর একঘর বল্লভী। বঙ্কিমবাবুরা ফুলে। চাটুয্যে মহাশয়দের সেবার জন্য কিছু দিতে হয় না। কেবল উঁহাদের মধ্যে যাহাদের অবস্থা তত ভালো নয়, ভোগের এক অংশ তাঁহাদের বাড়িতে যায়। অনেক গরীব-দুঃখী লোক মধ্যে মধ্যে রাধাবল্লভের প্রসাদ পায়। বারমাসে তের পার্বণ হয়। কিন্তু রথে খুব জাঁক হয়। রথখানি পিতলের, বেশ বড়। বারমাস রথখানি গোলপাতার ছাউনিতে ঢাকা থাকে। রথের সময় উহা বাহির করিয়া ঘষে-মেজে চক্‌চকে করিয়া লওয়া হয়। রথের সময় বঙ্কিমবাবুদের বাড়ির দক্ষিণে একটা খোলা জায়গায় বেশ একটা মেলা হয়। প্রচুর পাকা কাঁটাল ও পাকা আনারস বিক্রি হয় ; তেলেভাজা পাঁপর ও ফুলুরির গাঁদি লাগিয়া যায়, আট-দশখান। বড় বড় ময়রার দোকান বসে, গজা, জিলিপি, লুচি, কচুরি, মিঠাই, মিহিদানা, মুড়ি-মুড়কি, মটরভাজা, চিড়েভাজা যথেষ্ট থাকে। আগে ঘিয়ের খাজা থাকিত, এখন আর সেগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না। মেলায় মণিহারি দোকান অনেকগুলি থাকে। তাহাতে নানা রকম বাঁশী, কাগজের পুতুল, কাঠির উপর লাফ দেওয়া হনুমান, কটকটে ব্যাঙ্ কিনিতে পাওয়া যায়। এ সব তো গেল ছেলেদের। বুড়োদের একটি বড় দরকারি জিনিস এই মেলায় বিক্রি হয়—নানা রকম গাছের চারা ও কলম। আমাদের দেশে যাহারা বাগান করিতে চায়, তাহাদের চারা কিনিবার এই প্রধান সুযোগ। অনেক নারিকেলের চারা, আমের কলম, নেবুর কলম, সুপারির চারা, লকেট ফলের গাছ, গোলাপজামের গাছ, পিচের গাছ, সবেদার গাছ, ফল্‌সার গাছ এবং গোলাপ, যূঁই, জাতি, বেল, নবমালিকা, কামিনী, গন্ধরাজ, মচুকুন্দ, বক, কুরচি, কাঞ্চন, টগর, সিউলি প্রভৃতি নানা ফুলের চারা ও কলম পাওয়া যায়। মেলা আট দিন হয়। প্রথম প্রথম বলিয়া দিলে মালীরা, যে কোনো গাছের চারা চাওয়া যায়, আনিয়া দিতে পারে।

আগে পুতুলনাচের খুব ভাল ব্যবস্থা ছিল। প্রকাণ্ড এক দোচালার মধ্যে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ রকমের পুতুল হইত। সীতার বিবাহ, লবকুশের যুদ্ধ, কালীয়দমন—এসব তো ছিলই ; তার উপর একটা মকদ্দমার সঙ ছিল—জজসাহেব বসেছেন, পেশকার কাগজ পেশ করিয়া দিল, কাঠগড়ায় আসামী থাকিল, সাক্ষীর জবানবন্দী হইল, উকীলের বক্তৃতা হইল। জজসাহেব রায় দিলেন। আসামীর ফাঁসি-শাস্তি হইল। ফাঁসিও হইল। ফাঁসিকাঠে ঝুলিলে আসামীর কাপড়ের ভিতর দিয়া একরকম পদার্থ বাহির হইত দেখিয়া ছেলেরা হাসিয়া খুন হইত। আর-একরকম সঙ ছিল—আহ্লাদে পুতুল। তার একগাল হাসি লাগিয়াই আছে। সে হাত পা নাড়ে আর হাসে।

রাধাবল্লভের বাটীর গেটের বাহিরেই গুঞ্জবাড়ি। একখানা খুব বড় পাঁচচালা ঘর। গুঞ্জবাড়ি বলিলে অনেকেই মনে করেন, কৃষ্ণ রথের সময় মাসির বাড়ি যাইতেন, সেখানে অনেক ফুলের গাছ ছিল ; কুঞ্জ ছিল ; কুঞ্জ হইতে গুঞ্জবাড়ি হইয়াছে। কিন্তু সে কথাটা ঠিক নয়। গুঞ্জ শব্দের মূল—গুণ্ডিচা ; অর্থ, কুঁড়েঘর, তামিল ভাষার শব্দ। উড়িয়ারা জগন্নাথকে গুণ্ডিচা বাড়ি লইয়া যায়, তাই দেখিয়া বাঙ্গালীরাও কৃষ্ণকে গুঞ্জবাড়ি লইয়া যায়। বঙ্কিমবাবুদের পাঁচচালায় কৃষ্ণ আট দিন থাকেন, দিনের বেলায় পুরুষেরা দর্শন করে। সন্ধ্যার পর নানা গ্রামের বৌ, ঝি, গিন্নীবান্নী, আধাবয়সী ও বুড়ীরা আসিয়া দেখিয়া যায়। রাধাবল্লভের পূজারি প্রায়ই একজন খুব বেশকার। নীলমণি ঠাকুর যে বেশ করিতেন, তাহা সত্য সত্যই বলিহারি

যাই। বড় বড় যূঁইয়ের গড়ে দিয়ে কৃষ্ণ রাধা তো প্রায়ই ঢাকা থাকেন, তাহার উপর নানা রকম ফুলের গহনা, ফুলের মুকুট ও ফুলের সাজ করিয়া দেওয়া হয়। সে সাজ দেখিয়া, দেশসুদ্ধ লোক চমৎকৃত হইয়া যায়। কোন্ দিন কোন্ সাজ হবে, আগে বলিয়া দেওয়া হয়। যাহার যে সাজ দেখিবার ইচ্ছা, সে সেই দিন আসিয়া তাহা দেখিয়া যায়। তাছাড়া ঘরটিকেও বেশ করিয়া ফুলের মালা-টালা দিয়া সাজান হয়। এই ঘরের সামনে একখানি প্রকাণ্ড আটচালা, চারিদিক্ খোলা, গুটিকতক চৌকা থামের উপর দাঁড়াইয়া আছে। চালাখানি আগে খড় দিয়া ছাওয়া হইত, এখন গোলপাতা দিয়া ছাওয়া হয়। এই আটচালায় রথের সময় যাত্রা, নাচ, গান, কীর্তন প্রভৃতি হইত। এখন দুই-একদিন যাত্রা হয় মাত্র। আগে আট দিনই খুব জমজমাট থাকিত।

আটচালার পশ্চিমে একটি শিবমন্দির ; পাথরের শিবলিঙ্গ, নিত্য-পূজার ব্যবস্থা আছে। মন্দিরটির দক্ষিণ দিকে বঙ্কিমবাবুর বসিবার ঘর ও পশ্চিমদিকে একটি ঘর, তাহাকে বঙ্কিমবাবু আদর করিয়া তোষাখানা বলিতেন। সেখানে তামাক খাওয়ার সরঞ্জাম থাকিত। হুঁকা কলিকা, বৈঠক ফর্সি, গড়গড়া, তামাক, টিকা, গুল, আগুন, দেশালাই ইত্যাদি। সে ঘরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বঙ্কিমবাবুর চাকর, নাম মুরলী। মুরলীর গলায় তুলসীর মালা, কিন্তু সে যে বিশেষ বৈষ্ণব ভক্ত, তাহা আমরা দেখি নাই। দক্ষিণ দিকে শিবমন্দির-সংলগ্ন একটি বড় দালান, উহার পূর্বদিকে দুটি দরজা একেবারে খোলাজমিতে পড়িয়াছে, আর পশ্চিমদিকে দুইটি জানালা, ঘরটি পুব-পশ্চিমে লম্বা। এই ঘরের দক্ষিণে দুটি ঘর। দালানটি যতখানি লম্বা ; ঘরদুটিও ততখানি লম্বা। পশ্চিমের ঘরটিতে একখানি খাট থাকিত, পুবের ঘরটিতে একটি ফরাশ থাকিত। পশ্চিমের ঘরটিতে বঙ্কিমবাবু দিনের বেলায় শুইতেন, পুবের ঘরটিতে একা বসিয়া লেখাপড়া করিতেন, দুই-একজন বিশেষ আত্মীয়েরও সেখানে যাইবার অধিকার ছিল। কখনো কখনো সে ঘরটিতে দুই-একখানি চেয়ার টেবিলও দেখিয়াছি। দালানটিতে দালানযোড়া একটি ফরাশ পাতা থাকিত, অনেকগুলি তাকিয়া থাকিত, হারমোনিয়ম থাকিত, সময়ে সময়ে অন্যান্য অনেক রকমের বাজনাও থাকিত। দালানের উত্তর দিকে একটি দরজা থাকিত, সেই দরজা দিয়া তোষাখানায় যাওয়া যাইত।

এতক্ষণ যাহা বলিলাম, যে-কোনো সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বাড়িতে এসব হইতে পারে। কিন্তু তিনি যে কবি, তাহার কোনো নিদর্শনই এখনো দিই নাই। সে নিদর্শনটি তাঁহার শুইবার ও বসিবার ঘরের দক্ষিণ দিকে দেখা যাইত। সে একটি ছোট্ট ফুলের বাগান, দুকাঠাও পুরা হইবে না। ঘরদুটি একত্রে যত লম্বা, বাগানটিও ততখানি লম্বা, আড়েও প্রায় ঐরূপ। তিনদিকে পাঁচিল দিয়া ঘেরা, সে পাঁচিলের আগায় একটি আলসে ও তাহার নিচে একটি বেঞ্চি। চারিদিকেই এইরূপ। বাগানের ঠিক মাঝখানে একটি চৌকা গাঁথান, হাতখানেক উঁচা, তাহারো আবার মাঝখানে একটি ছোট চৌকা হাতখানেক উঁচা, তাহারো মাঝখানে আবার একটি ছোট চৌকা হাতখানেক উঁচা, চারিদিকেই যেন গ্যালারি মতো। এই সমস্ত গ্যালারিতে চারিদিকেই টব সাজান থাকিত। টবে নানারূপ রঙিন ফুল ও পাতার গাছ। বাগানে আর যেটুকু জমি ছিল, তাহাতে সুরকির কাঁকর দিয়া রাস্তা করা। বাকী জমিতে যূঁই, জাতি, কুঁদ, মল্লিকা ও নবমালিকার গাছ। বর্ষাকালে ফুল ফুটিলে সব সাদা হইয়া যাইত, এবং বৈঠকখানাটি গন্ধে ভরপুর হইয়া যাইত। বঙ্কিমবাবু বাগানটিকে বড়ই ভালবাসিতেন। যতদিন তিনি বাড়ি থাকিতেন, বাগানটি খুব সাবধানে পরিষ্কার রাখিতেন, এবং মাঝে মাঝে অবসর পাইলে আলসেটিতে হেলান দিয়া বেঞ্চির উপর বসিয়া ফুলের বাহার দেখিতেন।

আমরা বালককালে প্রতি বৎসরই রথ দেখিতে যাইতাম। রেলওয়ের গেট হইতে শিবের মন্দির পর্য্যন্ত দুইধারে অনেকগুলি কামিনীফুলের গাছ ছিল। আমরা প্রায়ই ফুল ছিঁড়িতাম। ফুল ছিঁড়িলেই কেহ-না-কেহ আসিয়া আমাদিগকে ভয় দেখাইত, 'তোমাদিগকে ধরিয়া সঞ্জীববাবুর কাছে লইয়া যাইব।' সঞ্জীববাবু আমাদিগকে কি শাস্তি দিতেন, জানিতাম না, কিন্তু সেই অবধি আমরা জানিতাম যে, শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুর মহাশয়ের পুত্রেরা বড় দুষ্ট লোক, ছেলেপিলে ধরিয়া মারেন, সেই ভয়ে আমরা অনেকবার সুযোগ হইলেও রায় বাহাদুরের বাড়ি বড়-একটা যাইতাম না। একবার ধরণী কথকের কথা হইতেছিল। তখন আমার বয়স বছর এগারো, টোলে পড়িতাম। টোলের ভট্টাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে দুচার দিন ধরণী কথকের কথা শুনিতে গিয়াছিলাম। রায় বাহাদুরের বাহির বাড়ির পাঁচফুকরে দালানের সামনে যে উঠান আছে, সেই উঠানে কথা হইত। কথকের জন্য যেমন সব জায়গায় ইঁটের বেদী হয়, এ বাড়িতে তাহা হয় নাই। একখানা বড় চৌকি ও একটা বড় তাকিয়া বেদীর কাজ করিত। ঐ বেদীর উপর একখানি ভাল গালিচা পাতা থাকিত। সামনে একটি বড় টিপায়ের উপর একখানি পিতলের সিংহাসনে শালগ্রাম থাকিতেন, তিনি কথার প্রধান শ্রোতা। উঠানময় গালিচা ও সতরঞ্চ পাতা থাকিত, ব্রাহ্মণেরা গালিচায় বসিতেন। শূদ্রেরা সতরঞ্চে বসিত। ধরণী কথক মহাশয় খুব ভাল কথা কহিতেন। তাঁহার সুমিষ্ট অথচ গম্ভীর ও উচ্চস্বরে প্রথম হইতেই আসর জমজম করিত। কিন্তু তিনি যখন হাঁ করিয়া গালের কাছে হাত আনিয়া গান ধরিতেন, তখন সমস্ত লোক মুগ্ধ হইয়া যাইত। আমরা তখন গানের কি বুঝি? কিন্তু এখনো সে-সুর কানে লাগিয়া আছে। শুনিয়াছি বাড়ি হইতে কিছুদূরে, পুবদিকে, সঞ্জীববাবুর ফুল বাগানে ধরণী কথকের বাসা ছিল। সে ফুলবাগান দেখিবার আমাদের খুবই শখ ছিল, কিন্তু পাছে সঞ্জীববাবু আমাদের মারেন, সেই ভয়ে কোনোদিন সেদিকে যাই নাই। চারি-পাঁচ দিন ধরণী কথকের কথা শুনিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার পর একদিন গিয়া শুনিলাম, তাঁহার শরীর বে-এক্তার হইয়া গিয়াছে, তিনি আসিবেন না। তাহার পর আর কোনোদিন তাঁহার কথা শুনিতে যাই নাই। তাঁহার তো আর ঠিক ছিল না, কোন দিন আসিবেন, কোন দিন আসিবেন না।...

বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায় / হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
রচনা-সংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ড

হুগলির কলেজের বিবরণ

"ইংরাজী ১৮৩৬ শকে ১লা জুলাই দিবসে চুঁচুড়া নগরস্থিত মৃত হাজি মহম্মদ মহসীনের কলেজ সংস্থাপিত হয়। এই প্রধান বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত হওনের পূর্ব্বে চুঁচুড়া চন্দননগর, হুগলী প্রভৃতি নগরে রাজপুরুষদের ভাষা কিম্বা দেশ ভাষায় সুচারুরূপে শিক্ষা হয় এমত কোন বিদ্যালয় বিরাজিত ছিল না, চুঁচুড়ানগরে লন্ডন মিশনরীদের স্থাপিত যৎসামান্য এক অবৈতনিক পাঠশালা ছিল, তথায় যীশু খ্রীষ্টের গুণসংকীর্ত্তন যে সকল গ্রন্থে বর্ণনা আছে, ঐ সকল গ্রন্থ পাঠের প্রাচুর্য্য থাকাতে ভদ্রলোকের সন্তানেরা কেহ বিদ্যাভ্যাস করিত না, হুগলি এমামবাটীর অধীনস্থ মাদরসা সংক্রান্ত দাতব্য এক ইংরাজী পাঠশালা ছিল ; এই পাঠশালার কার্য্য কেবল একজন শিক্ষক দ্বারা নির্ব্বাহ হইত এবং তত্ত্বাবধারণের অভাবে ও কোন বিশেষ নিয়মবদ্ধ না থাকাতে সুশৃঙ্খলারূপে পাঠনাকার্য্য নিষ্পাদন হইত না, সুতরাং তৎকালে

পূর্ব্বোক্ত নগরত্রয়ে ও তন্নিকটস্থ গ্রামের বালকবৃন্দের জ্ঞানার্জ্জনের উপায় ছিল না, উল্লেখিত মাদরসা ও তৎসংক্রান্ত ইংরাজী বিদ্যালয়ের সমস্ত ব্যয় পুণ্যাত্মা মহম্মদ মহসীনের ধন হইতে চলিত, ঐ মহল্লোকের উত্তরাধিকারী না থাকাতে উইলে অর্থাৎ মুমূর্ষ কালীনের দানপত্রে অন্যান্য সৎ ও পুণ্যজনক কর্ম্মের মধ্যে সধন ও নির্ধন ও সাধারণ ব্যক্তিদিগের বালকগণের বিদ্যাভ্যাস জন্য এক উপযুক্ত পাঠশালা সংস্থাপনের অনুমতি লিখিত ছিল, কিন্তু তাঁহার সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়কেরা পূর্ব্বোক্ত ঐ সামান্য মাদরসা ও ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনা করিয়া তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছিলেন, ঐ পাঠশালাদ্বয়ের ব্যয় অত্যল্প ছিল, মহম্মদ মহসীনের বার্ষিক আয় ষষ্টি সহস্র মুদ্রার অধিক, কিন্তু এসমস্ত টাকা কেবল অপব্যয়ে শেষ হইত, কিয়ৎ কাল পরে দেশহিতৈষী শ্রীযুত ডাক্তর ওয়াইজ সাহেব হুগলিস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ দ্বারা এমামবাটীর সমস্ত ব্যাপার গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর করাইতে দয়ালু গবর্ণমেণ্ট হুগলির লোকেদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া মহম্মদ দানপত্রের মর্ম্মানুসারে তাঁহার বিষয়ের আয় হইতে উক্ত স্থানে এক উপযুক্ত কলেজ সংস্থাপিত করিতে বিদ্যাধ্যাপক সমাজের প্রতি অনুমতি করিলেন, উক্ত সভা উল্লেখিত শুভসময়ে বিদ্যার আলোক বিকীর্ণ করণার্থে ঐ প্রধান পাঠশালা স্থাপন করিলেন, এবং ঐ বিদ্যালয়ের কার্য্যসম্পাদনের ভার ডাক্তার ওয়াইজ সাহেবের প্রতি অর্পিত হইল, পরে কথিত মহাশয়ের কায়িক পরিশ্রমে ও মানসিক যত্নে বিদ্যালয়ের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি হইতে লাগিল, এবং তাঁহার অধ্যক্ষতাতে ও নিয়মাদিতে শিক্ষক প্রভৃতি কর্ম্মকারকেরা সন্তুষ্ট ছিলেন, তিনি কখন কাহার প্রতি অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করেন নাই, বরং নিজাধীন শিক্ষাদাতাদের যাহাতে পদোন্নতি হয় এমত নিরন্তর চেষ্টা করিতেন অনন্তর তিনি বিদ্যাধ্যাপনা সভার সম্পাদকত্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইলে শ্রীযুত জেম্‌স্ সদরলেণ্ড সাহেব মহাশয় তাঁহার পদে অভিষিক্ত হইলেন, তিনি পাঠশালার অধ্যক্ষতা কর্ম্ম প্রাপ্ত হইলে পাঠশালাস্থ সমুদয় ব্যক্তিরা আনন্দে পুলকিত হইল, ঐ মহাশয়ের সুশৃঙ্খলতা ও পারিপাট্য ও বাক্যের মিষ্টতা ও স্বভাবের সরলতা ও দয়া এবং পরহিতেচ্ছা প্রভৃতি যে গুণ তাহা বর্ণে বর্ণনা করা যায় না, তিনি অধীনস্থ ছাত্রগণকে স্বীয় প্রিয় সন্ততির ন্যায় স্নেহ করিতেন এবং তাহাদের সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী হইতেন, অলৌকিক কথা বা অপ্রিয় বাক্য তিনি জানিতেন না, ছাত্রদের যাহাতে মঙ্গল হয় এমত বিষয়ে অশেষ বিশেষরূপে মনোযোগ করিতেন, শিক্ষকবর্গের প্রতিও তাঁহার তদ্রূপ দৃষ্টি ছিল, তিনি অনেককে উচ্চপদাভিষিক্ত করিয়াছেন, কোন শিক্ষক বা পণ্ডিত বা মৌলবি কোন কর্ম্মানুরোধে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার ভবনে গমন করিলে তিনি তাহাদের সম্মান পুরঃসর অভ্যর্থনা করিয়া আসনে উপবিষ্ট করাইতেন পরে সদালাপ ও মধুর বচনে তাহাদের পরিতোষ জন্মাইয়া বিদায় করিতেন, অপিচ হিন্দু ধর্ম্মের কোন অংশে হানি না হয় তাঁহার এমত বিশেষ মনোযোগ ছিল, তাহার এক দৃষ্টান্ত দেখুন, যৎকালীন চুঁচুড়ার একজন ধর্ম্মোপদেশক সাহেব হুগলী কালেজের উচ্চ শ্রেণীতে বাইবেল পাঠ করাইবার আশায় কয়েকখানা ঐ গ্রন্থ ও এক অনুরোধলিপি তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিলেন, তৎকালে তিনি কি পর্য্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন তাহার সবিশেষ তাঁহার অধীনস্থ পাঠার্থিরা কেবল বলিতে পারেন, পরে তিনি পত্রের প্রত্যুত্তর সম্বলিষ্ট উক্ত কতিপয় ধর্ম্মপুস্তক প্রতিপ্রেরণ করিলে ধর্ম্মোপদেষ্টা সাহেবের সহিত সংবাদ লিপিতে তাঁহার তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল, তত্তাবদ্বৃত্তান্ত লিখিলে পত্রবাহুল্য হয়, এ জন্য এই মাত্র লিখিলাম যে ঐ ঈষু ধর্ম্ম শিক্ষকের পরাজয় হইয়াছিল, অপরন্তু গৌড়ীয় ভাষার উন্নতির নিমিত্তে তিনি পণ্ডিত ও ছাত্র বর্গকে সর্ব্বদা উৎসাহ প্রদান করিতেন, এক শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতে বালকদিগকে উত্থিতকরণের সময় যে বালক

ইংরাজী ও দেশভাষার তুল্য পরীক্ষা দিতেন তিনিই উত্থিত হইতেন, যিনি দুই ভাষায় তুল্য ব্যুৎপন্ন না হইতেন তিনি কদাচ উচ্চ শ্রেণীতে উঠিতে পারিতেন না, এবং এদেশের পর্ব্বোপলক্ষে পাঠশালার অবকাশ দেওনের পূর্ব্বে পণ্ডিতগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদিগের অভিমতানুসারে বিদ্যালয়ের পাঠনাকার্য্য স্থগিত করিতেন, ফলতঃ তিনি বিদ্যামন্দিরস্থ সমস্ত লোকের মনোরঞ্জন পূর্ব্বক সকল কার্য্য নিষ্পাদন করিয়া দিতেন, ইতিমধ্যে সদরলেণ্ড সাহেব পীড়িত হইয়া যখন জন্মভূমিতে প্রস্থান করেন তখন সুবিজ্ঞ শ্রীযুক্ত ডাক্তার ইস্‌ডেইল সাহেব তাঁহার প্রতিনিধি ছিলেন, তাঁহার অধ্যক্ষতা ও অধ্যাপনায় সকলে সন্তোষিতচিত ছিল, এবং তিনিও অনেক শিক্ষকের ও ছাত্রের উপকার করিয়াছিলেন, পরে সদরলণ্ড সাহেব স্বদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে ডাক্তার সাহেব অনেক প্রশংসাপত্র প্রাপণানন্তর অধ্যক্ষতা পদ হইতে অবসর হইলেন, তদনন্তর সদরলণ্ড সাহেব পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ পূর্ব্বক কালেজের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া অতি অল্প দিবস পরে মেরিণের সেক্রেটরী পদ প্রাপ্ত হইলে কলেজাধ্যক্ষতা ভার শ্রীযুক্ত এল ক্লিণ্ট সাহেবের প্রতি অর্পিত হইল, সদরলণ্ড সাহেব যখন পাঠশালার শিক্ষক ও পণ্ডিত ও মৌলবী ও ছাত্রগণ ও নগরবাসি মান্য ও সম্ভ্রান্ত লোকদিগের নিকট হইতে এড্রেস অর্থাৎ সুখ্যাতিপত্র পাইয়া বিদায় হয়েন তখন অনেকেই শোকাকুলিত হইয়া নয়ননীর নিবারণে অসমর্থ হইয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত ক্লিণ্ট সাহেব মহাশয় হুগলি কালেজাধ্যক্ষ হইয়া কিঞ্চিৎকাল শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, অনন্তর কালেজের অপূর্ব্ব অট্টালিকা ও মনোহর কুসুমোদ্যান ও পুস্তকালয় এবং তৎসংক্রান্ত পাঠার্থি সন্দোহ ও শিক্ষকগণ ও অন্যান্য বেতনভুক্ত কর্ম্মকারক প্রভৃতি লোক তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীন এবম্প্রকার বিবেচনা করতঃ আপনাকে ধন্য মানিয়া এককালে মদমত্ত হইলেন। সম্পাদক মহাশয় এই মহাপুরুষ কালেজের অধ্যক্ষের আসনে উপবিষ্ট হইয়া জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি বিচারপতির ন্যায় (খোদাবন্দগিরী) ও কথায় কথায় পাঠশালাস্থ ভৃত্যদিগের নাম ও বেতন কর্ত্তন এবং ছাত্রেরা অনুপস্থিত হইলে তাহাদিগকে অর্থদণ্ড করিতেন, অপর শিক্ষকদিগের পদ ও মান বৃদ্ধি করা দূরে থাকুক বরঞ্চ যাহাতে তাঁহারা অপ্রতিভ ও অপমানিত হয়েন এমত পথানুসন্ধানে নিয়ত থাকিতেন, যদি কোন শিক্ষক ও পণ্ডিত প্রভৃতিরা তাঁহার বাটীতে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন তবে তিনি তাহাদিগকে সম্মান না করিয়া কুবাক্য-বাণ নিক্ষেপণ দ্বারা তাহাদিগের মর্ম্মভেদ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করাইতে বাধ্য করিতেন, এবম্প্রকার ব্যবহার ও অন্যান্য বিষয়ে তিনি কালেজস্থ সমস্ত লোককে যেরূপ জর্জ্জরীভূত করিয়াছিলেন তাহা লিখনে লেখনী কম্পমানা হয়, আহা, এমত মিষ্টভাষী ও পরোপকারী ও দয়াবান সদরলণ্ড সাহেবের পরিবর্ত্তে যে এক কটুভাষী ও নির্দ্দয় ও পর-পীড়াদায়ক ক্লিণ্ট সাহেব নিযুক্ত হইবেন ইহা আমাদিগের স্বপ্নের অগোচর ছিল। মহম্মদ মহসীনের কালেজ সংস্থাপনের মুখ্যোদ্দেশ্য এই যে দীন দরিদ্র সন্তানদিগকে বিনাবেতনে বিদ্যাদান করা কিন্তু এই পুণ্যাত্মা সাহেবের দ্বারা এই পাঠশালা সম্পূর্ণ বৈতনিক হইয়াছে, অপিচ তিনি যে হিন্দু-ধর্ম্মদ্বেষী তাহার অন্য প্রমাণ দর্শাইবার আবশ্যক নাই এতদ্দেশীয় পর্ব্বোপলক্ষে ঐ কালেজের ছুটি বিষয়ে কৌন্সেল অব এডুকেশনে অনুরোধ করিয়া যেরূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টেই বিশেষ জানা যাইতেছে, যাহা হউক অধুনা তিনি যে স্থানান্তর গমন করিয়াছেন ইহা উক্ত পাঠশালায় ছাত্র ও শিক্ষক প্রভৃতির সৌভাগ্যের বিষয় ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, তিনি যেরূপ পুণ্যাত্মা ও যশস্বী তাহা তাঁহার বিদ্যাদান কালীন ব্যক্ত হইয়াছে। শুনিতেছি যে বর্ত্তমান অধ্যক্ষ কাপ্তেন রিচার্ডসন সাহেব অল্প দিনের মধ্যে উক্ত কালেজের সর্ব্বসাধারণের প্রিয়পাত্র হইয়াছেন, পরমেশ্বরের সমীপে প্রার্থনা করি

যে এই বিজ্ঞবর মহাশয় সদরলণ্ড সাহেবের ন্যায় যশস্বী হইয়া ছাত্র ও শিক্ষকদিগের উপকারে নিয়ত রত হউন।”

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
রঙ্গলাল/মন্মথনাথ ঘোষ

শিশুশিক্ষা

“লঙ সাহেবের বিবরণ থেকে জানা যায়, মাত্র ছয় বৎসরেই শিশুশিক্ষা প্রথম ভাগের দশটি সংস্করণের প্রয়োজন হয়। দশম সংস্করণের (পৃষ্ঠা ২৭, মূল্য এক আনা) তারিখ ১৮৫৫। দ্বিতীয় ভাগের যষ্ঠ সংস্করণ (মূল্য এক আনা) প্রকাশিত হয় ১৮৫৪ সালে। পরবর্তী সংস্করণে দ্বিতীয় ভাগের আয়তন ২০ থেকে বাড়িয়ে ২৬ পৃষ্ঠা করা হয়। মনে হয় কোনো কোনো বিষয়ে সংযোজন ও উন্নতি বিধান করা হয়েছিল।
মদনমোহনের শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৫০ সালে। লেখকের অভিপ্রায় জানা যায় এটির মুখবন্ধ (১৬ ভাদ্র ১৭৭২ শক) থেকে—“শিশুশিক্ষার প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে বর্ণপরিচয়ের উপায় ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে তৃতীয় ভাগে অতি ঋজু ভাষায় নীতিগর্ভ নানা বিষয়ক প্রস্তাব সকল সঙ্কলিত হইল।”
পরের বৎসরে প্রকাশিত হয় শিশুশিক্ষা চতুর্থ ভাগ (১৮৫১ এপ্রিল)। এটি অধিকতর পরিচিত ‘বোধোদয়’ নামে। রচয়িতা বিদ্যাসাগর।... ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত পাঠশালা-জগতে শিশুবোধকের একাধিপত্য অব্যাহত ছিল। অবশেষে মদনমোহনের শিশুশিক্ষা এসে ওই একাধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে মধ্যযুগীয় শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষাপ্রণালীর অচলায়তনে ভাঙন ধরাতে উদ্যত হল। শিশুবোধকের স্থলাধিকারই যে এটির লক্ষ্য ছিল তার ইঙ্গিত রয়েছে ‘শিশুশিক্ষা’ নামটির মধ্যেই। এই ‘শিশুশিক্ষা’ যেন শিশুশিক্ষার লক্ষ্য ও পদ্ধতিকে মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে সহসা আধুনিকতার অরুণালোকে নিয়ে এল। এই প্রথম একজন প্রতিভাধর ব্যক্তি প্রাথমিক শিশুশিক্ষার উপযোগী পুস্তক রচনায় বিচার শক্তির প্রয়োগ করলেন।...
প্রথার বদলে বিচার, রীতির বদলে নীতি। মদনমোহন প্রথমেই গণিত প্রভৃতি ব্যবহারিক শিক্ষা থেকে ভাষাশিক্ষাকে নানা পর্য্যায়ে বিন্যস্ত করলেন, ঠিক যেন শিশুর হাত ধরে তাকে একটি সিঁড়ি পার করে ভাষামন্দিরের দোড়গোড়ায় পৌঁছিয়ে দিলেন। এই ক্রমারোহণের প্রতি লক্ষ্য রেখেই তিনি শিশুশিক্ষা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ভাগ রচনা করেন।”

প্রবোধচন্দ্র সেন /
শিশুবোধক, শিশুশিক্ষা ও বর্ণপরিচয় /
বিদ্যাসাগর স্মারক গ্রন্থ

মদনমোহন তর্কালঙ্কার/১

“শিশুদের উন্মেষোন্মুখ মনকে সর্বপ্রকার কুসংস্কার ও দুর্নীতিহীন জাগতিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানে পুষ্ট করা ও তাঁদের কাছে চারিত্রিক আদর্শস্থাপন, এই ছিল মদনমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্র উভয়েরই লক্ষ্য। শুধু জ্ঞানদান নয়, চরিত্রদানও ছিল উভয়ের অভিপ্রেত। তাঁদের রচিত শিশুপাঠ্য পুস্তকগুলির যে-কোনো একটি পাঠের প্রতি একটু দৃষ্টি দিলেই এ কথার সত্যতা বোঝা যাবে।

কিন্তু একটি বিষয়ে মদনমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যে ছিল দুস্তর ব্যবধান। মদনমোহন ছিলেন পাকা ছন্দশিল্পী, আর ঈশ্বরচন্দ্র পাকা গদ্যশিল্পী। ঈশ্বরচন্দ্রের গদ্যশিল্পের কথা সুবিদিত, মদনমোহনের ছন্দোনৈপুণ্যের কথা খুবই স্বল্পবিদিত। মদনমোহন দুখানিমাত্র কবিতার বই লিখেছিলেন, তাও অতি অল্প বয়সে। মাত্র সতের বৎসর বয়সে রচিত তাঁর 'রসতরঙ্গিণী' গ্রন্থেই (১৮৩৪) 'পয়ারাদি নানা ছন্দোবন্ধে'র প্রতি আসক্তি দেখা যায়, আর উনিশ বৎসর বয়সে রচিত তাঁর 'বাসবদত্তা' কাব্যগ্রন্থটি (১৮৩৬) বিশেষভাবে স্মরণীয় তাঁর ছন্দোবৈচিত্র্যের জন্য। দুঃখের বিষয় পরবর্তীকালে তিনি আর কবিতা রচনায় হাত দেননি। যদি তিনি কবিতা রচনায় নিবৃত্ত না হতেন তবে তৎকালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-৫৯) অদ্বিতীয় কবি বলে গণ্য হতে পারতেন কিনা সন্দেহ। যা হক, তবু দেখা যায় শিশুপাঠ্য পুস্তক রচনাকালেও তাঁর ছন্দপ্রীতির অভাব ঘটেনি। শিশুশিক্ষা তিন ভাগেই তিনি গদ্যের পাশে পদ্যকেও সমমর্য্যাদায় স্থাপন করেছিলেন। বোধ করি তিনি এ রীতির প্রবর্তক। তা ছাড়া, এই শিশুপাঠ্য কবিতাগুলিতেও যাতে ছন্দোবৈচিত্র্যের অভাব না ঘটে সে দিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল। সব চেয়ে বড় কথা তিনি বর্ণপরিচয়ের পরে শিশুর প্রথম পড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন পদ্য দিয়েই, গদ্য দিয়ে নয়। মায়ের মুখে ছড়া শুনে যে শিশুর জ্ঞানের আরম্ভ তাঁর পড়ার আরম্ভও হবে ছোট ছোট ছড়াজাতীয় রচনা দিয়ে। এটাই শোভন ও সংগত... শিশুচিত্তের পক্ষে ছন্দের চেয়ে মিলের আকর্ষণশক্তি যে কম নয়, মদনমোহন সে বিষয়েও সমভাবে সচেতন ছিলেন। তাই দেখি শিশুশিক্ষা প্রথম ভাগে ছন্দোবৈচিত্র্যের সঙ্গে মিলের অজস্রতাও সমন্বিত হয়েছে। অথচ ছন্দ ও মিলের প্রাচুর্য রক্ষা করতে গিয়ে অকারাদি স্বরবর্ণ-যোজনার পর্য্যায়ক্রমও উপেক্ষিত হয়নি।''...

প্রবোধচন্দ্র সেন /
শিশুবোধক, শিশুশিক্ষা ও বর্ণপরিচয় /
বিদ্যাসাগর স্মারক গ্রন্থ

মদনমোহন তর্কালঙ্কার/২

"মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জন্য আমার বড় আপশোষ হয়। স্কুলে যতদিন শিক্ষক ছিলেন, সেই সময়েই তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যচর্চ্চা করিতেন, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হওয়ার পর আর সেদিকে নজর দেন নাই। তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা তাঁহাকে যে স্বাতন্ত্র্য-দান করিয়াছিল সেই স্বাতন্ত্র্য বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা অমূল্য জিনিষ। সেই স্বাতন্ত্র্যই বাঙ্গালা সাহিত্যকে যে বৈচিত্র্য দান করিতে পারিত, শুধু বিদ্যাসাগরের ভাষাই বাঙ্গালার একমাত্র উপকরণ হইয়া থাকিত না। কিন্তু তিনি সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালা সাহিত্যচর্চ্চাও ছাড়িলেন। যিনি 'বাসবদত্তা'র প্রণেতা তাঁহারই 'শিশুশিক্ষা' এখনও আমাদের ছেলেমেয়েদের উপভোগ্য জিনিষ। তাঁহার 'পাখী সব করে রব' কবিতাটি কোন্ শিশু না সুর করিয়া আবৃত্তি করিয়াছে?"

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য/
বিপিনবিহারী গুপ্ত/পুরাতন প্রসঙ্গ

ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল

১৮৪৯-এর ৭ মের 'সংবাদ প্রভাকর'-এ বেরনো সংবাদ—

"ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক তথা বিদ্যাধ্যাপনীয় সমাজের অধিপতি করুণাময় ড্রিঙ্কওয়াটার বেথেউনি সাহেব বাঙ্গালি জাতির বালিকাবর্গের বঙ্গভাষার অনুশীলন নিমিত্ত বিপুলবিত্ত ব্যয়ব্যসন পূর্ব্বক 'বিকটোরিয়া বাঙ্গলা বিদ্যালয়' নামে এক অভিনব স্ত্রী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, অদ্য প্রাতে তাহার কর্মারম্ভ হইবেক, আপাততঃ সিমুলার অন্তঃপাতি সুকিএস স্ট্রিট মধ্যে দয়ার্দ্রচিত্ত বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বৈঠকখানা বাটিতে কর্ম সম্পন্ন হইবেক, পরে তাহার জন্য স্বতন্ত্র স্থানে এক স্বতন্ত্র বাটী নির্মাণ করা যাইবেক, এই স্থলে স্থাপন কর্ত্তার কথাইতো নাই, তাঁহাকে এদেশের মহোপকারী অদ্বিতীয় বন্ধু বলিয়া বাচ্য করিতে হইবেক,... কিন্তু শ্রীমান দক্ষিণারঞ্জন বাবুর বদান্যতা এবং সদগুণের বিষয় এইক্ষণে বাক্য দ্বারা ব্যাখ্যা হইতে পারে না, ঐ মহাশয় কিছুদিনের জন্য পাঠশালার কর্মনির্বাহ নিমিত্ত বিনা বেতনে বাটী দিয়াছেন এবং নতুন বাটী নির্মাণার্থে এককালীন ৮০০০ অষ্ট সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন আর সময়ানুসারে সাধ্যমত আনুকূল্যকরণে অঙ্গীকার করিয়াছেন।"

বোধোদয়

"দেখা যাচ্ছে মদনমোহন-পরিকল্পিত শিশুশিক্ষা পুস্তকমালার চতুর্থ পুস্তকটি রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র। এটা কিছুমাত্র অপ্রত্যাশিত নয়। মদনমোহন ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের সুদীর্ঘ কালের সহাধ্যায়ী (১৮২৯-৪২), সহকর্মী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, এই দুই বন্ধু সংস্কৃত কলেজেও চার বৎসরের অধিককাল (১৮৪৬ জুন – ১৮৫০ নভেম্বর) সহযোগী অধ্যাপক ছিলেন এবং ঐ সময়েই উভয়ের মিলিত উদ্‌যোগে 'সংস্কৃত যন্ত্র' নামে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮৪৭)। তা ছাড়া স্ত্রীশিক্ষা, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি, 'মহৎ কার্যে'ও মদনমোহন ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের উৎসাহী সমর্থক। তাই ১৮৫০ সালের শেষভাগে মদনমোহনের কলকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনার কাজ ছেড়ে অন্যত্র যাবার ফলে শিশুশিক্ষা চতুর্থ ভাগ (নামান্তর 'বোধোদয়') রচনার দায়িত্ব স্বভাবতঃই গ্রহণ করতে হয় তাঁর সহকর্মী বন্ধু ঈশ্বরচন্দ্রকে। এর থেকে অনুমিত হতে পারে যে, শিশুশিক্ষা প্রথম তিন ভাগও ঈশ্বরচন্দ্রের অনুমোদিতই ছিল।...

মদনমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্রের চিন্তা ও আদর্শগত সমতার সবচেয়ে বেশি পরিচয় পাওয়া যায় শিশুশিক্ষা ও বর্ণপরিচয়ের পাঠ্য বিষয় নির্বাচনে। এই সমতা ছিল বলেই ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর 'বোধোদয়' বইটি রচনা করেছিলেন শিশুশিক্ষা চতুর্থ ভাগ হিসেবে এবং শিশুশিক্ষা দ্বিতীয় ভাগের কয়েকটি পাঠ বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগের অঙ্গীভূত করে নিয়েছিলেন।"

প্রবোধচন্দ্র সেন /
শিশুবোধক, শিশুশিক্ষা ও বর্ণপরিচয় /
বিদ্যাসাগর স্মারক গ্রন্থ

ডেভিড হেয়ারের মৃত্যু

আমরা অতিশয় খেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে সাধারণ হিঁতৈষী এবং হিন্দুদিগের পরমোপকারী মেং ডেবিড হিয়ার সাহেব ওলাউঠা রোগের বশবর্ত্তী হইয়া বর্ত্তমান মাসের প্রথম দিবসে বেলা প্রায় ৬ ঘণ্টার সময় প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। মরণের পূর্ব্বদিবসীয় রাত্রি ১ ঘটিকা সময়ে তাঁহার ঐ মহারোগের সঞ্চার হয়, উক্ত মহাশয়ের বয়ঃক্রম ৬৭ বৎসর হইয়াছিল। আমারদিগের বোধ হয় যে তাঁহার অনেক হিন্দু বন্ধুগণের পক্ষে এই মৃত্যু সম্বাদ অকস্মাৎ বজ্রাঘাত তুল্য হইয়াছিল; বহুসংখ্যক বাঙ্গালিরা শোকে কাতর হইয়া তাঁহার মৃতদেহে সম্মান প্রদানার্থে গিয়াছিলেন যে পর্য্যন্ত তাঁহার শরীর মেং গ্রে সাহেবের বাটীতে ছিল তাবৎ প্রায় হিন্দুগণ দ্বারা বেষ্টিত দেখিয়াছি তৎকালে তাহারা সকলে দুঃখ-সাগরে মগ্ন ও অন্তঃকরণ মধ্যে নিতান্ত অসুখী হইয়া কেহ এক দৃষ্টিতে মৃতকায় নিরীক্ষণ করিতেছিলেন কেহ বা অনুপম গুণানুবর্ণনে ব্যাকুল ছিলেন এবং কেহ তাঁহার প্রাণ বিয়োগে বিষাদ প্রকাশ করিতেছিলেন। তাহাদিগের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি তাঁহার মুখের প্রতিমূর্ত্তি করাইবার নিমিত্তে সচেষ্টিত হইয়া মেং মেণ্ডি সাহেবকে আনয়ন করিয়াছিলেন কিন্তু ঐ সাহেব তাঁহার বদন বিলক্ষণরূপে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন যে কালাতীত প্রযুক্ত তৎকর্ম্ম উত্তমরূপে সম্পন্ন হইবেক না। পরে বেলা ৫।।০ ঘটিকার সময় শবানুগমনার্থে উক্ত গ্রে সাহেবের বাটীতে বিস্তর ভদ্রলোকের সমাগম হইলে তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া মৃতদেহের পশ্চাতে হিন্দুকলেজের দক্ষিণ গোলদীঘীর ধারে গমন করিয়াছিলেন যদ্যপিও তদ্দিনে যে মেঘাড়ম্বর প্রযুক্ত আকাশের সুগতি ছিল না তথাপি তাঁহারা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দর্শনার্থে প্রায় পঞ্চ সহস্র লোক আসিয়াছিলেন।

মেং হিয়ার সাহেব ইং ১৮০০ শালে ঘটিকা যন্ত্র নির্ম্মাণ কর্ম্ম করণার্থে এতন্নগরে আগমন করেন, তিনি কিয়দ্বৎসর পর্য্যন্ত ঐ ব্যবসা করিয়া পরে মেং গ্রে সাহেবকে তৎকর্ম্মার্পণ করিয়াছিলেন। ব্যবসা দ্বারা তাঁহার যে ধন সঞ্চিত হইয়াছিল তৎসহিত স্বদেশে প্রত্যাগমন না করিয়া এতদ্দেশীয় লোকদিগের বিদ্যা বৃদ্ধি বিষয়ে স্বীয় ধন ও সময় ক্ষয় করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন অতএব প্রথমে স্কুল সোসাইটীর স্থাপনে অনেক সাহায্য ও বঙ্গভাষা শিক্ষা প্রদানের সদুপায় করেন এবং এতন্নগরীর নানা স্থানস্থ পাঠশালায় স্বয়ং গমনাগমন করত শিক্ষক ও ছাত্রদিগের উৎসাহার্থে সময়ে ২ টাকা ও পুস্তক পারিতোষিক দিতেন পরে হিন্দু বালকদিগের নিয়মমতে বঙ্গভাষা শিক্ষার নিমিত্তে আপনার কর্ত্তৃত্বাধীনে পটলডাঙ্গায় এক পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন আমাদিগের বোধ হয় যে তাহাতেও সাধারণের উপকার হইয়াছে।

ইংলণ্ডীয় ভাষা শিক্ষা প্রদানেও তাঁহার তদ্রূপ মনোযোগ ছিল কারণ বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রকারে জ্ঞানোৎপাদক পুস্তক সকলের অভাব প্রযুক্ত তিনি স্বীয় ব্যবসা পরিত্যাগাবধি এতন্নগরস্থ সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য হিন্দুদিগের সহিত আলাপ করত তাঁহাদিগের বালকদিগকে ইংলণ্ডীয় ব্যুৎপাদক শাস্ত্র ও দর্শন বিদ্যা শিক্ষা করাইতে পুনঃ ২ অনুরোধ করিতেন এবং ইং ১৮১৬ শালে এতদ্দেশীয় ধনবান্ বাঙ্গালি মহাশয়দিগের সাহায্যে হিন্দু কলেজ স্থাপিত করেন। তিনি ওই বিদ্যালয়ের উন্নতির নিমিত্তে অতিশয় যত্নবান্ হইয়া তৎপ্রতি যে ২ উপকার করিয়াছেন তাহা ওই শিক্ষালয়ের আদ্যন্ত বিবরণের মধ্যে এক প্রধান চিরস্মরণীয় ইতিহাস হইবেক আর তিনি উক্ত বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ প্রযুক্ত কেবল যে নির্ধারিত কোন সময়ে কখন ২ আসিয়া

রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন এমত নহে কিন্তু প্রায় প্রত্যহ তথায় উপস্থিত হইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিতেন এবং প্রত্যেক বালকের পাঠ বিবরণ ও বিদ্যালয়ে আগমন অনাগমন, শারীরিক কুশলাদি এবং বিদ্যামন্দিরে ও বাটীতে কি প্রকার ব্যবহার ইত্যাদির অনুসন্ধান করিতেন এবং অমনোযোগি ও কুব্যবহারি ছাত্রদিগকে পিতৃবৎ স্নেহভাবে অনুযোগ করিতেন ও সুশিক্ষিত সদ্‌গুণ বালকদিগকে উৎসাহ ও পুরস্কার প্রদান করিতেন আর ছাত্রদিগের মধ্যে যে ২ বিবাদ উপস্থিত হইত তাহা স্বয়ং ভঞ্জন করিতেন এবং বালকদিগের পিতা মাতা অথবা অন্য অভিভাবকেরা কোন বিষয়ের নিমিত্তে অনুরোধ করিলে তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিতেন এইরূপে বিদ্যামন্দিরের সুন্দররূপ নির্ব্বাহ ও শ্রীবৃদ্ধির উপায়ানুসন্ধানে সাধ্যানুসারে তাঁহার ত্রুটি ছিল না।

স্কুল সোসাইটীর বিদ্যালয়ের উন্নতির নিমিত্তেও তাঁহার অতিশয় যত্ন ছিল তিনি ঐ পাঠশালার অনেক ২ সুশিক্ষিত ছাত্রকে হিন্দুকালেজে প্রেরণ করেন বোধ হয় ঐ বিদ্যালয় ব্যয় বিষয়ে সোসাইটী অপেক্ষা তাঁহার দ্বারা যথেষ্ট আনুকূল্য প্রাপ্ত হইত। শেষাবস্থায় ছোট আদালতের কর্ম্মানুরোধে যদ্যপিও দিবাভাগে ঐ পাঠশালায় উপস্থিত থাকিতে অক্ষম হইয়াছিলেন তথাপি বেলাবসানে তথায় যাইতেন এবং রাত্রি পর্য্যন্ত থাকিয়া তাহার তাবৎ বিষয়ের নিগূঢ় অনুসন্ধান করিতেন। আর তাঁহার প্রতি মেডিকেল কালেজের রক্ষণাবেক্ষণের ভার থাকাতে তিনি প্রাচীন হিন্দুদিগের সহিত আলাপ দ্বারা এতদ্দেশীয় লোকদিগের ব্যবচ্ছেদ বিদ্যার প্রতি যে দ্বেষ ছিল তাহার হ্রাস করিয়াছিলেন নতুবা এদেশীয় লোকেরা স্ব ২ বালকদিগকে তথায় শিক্ষার্থ প্রেরণ করিতে শীঘ্র সম্মত হইতেন না। উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রগণ যে প্রকার মান্য করিতেন ও তাঁহার বিয়োগে যদ্রূপ কাতর আছেন ইহাতে বোধ হইতেছে যে ঐ বিদ্যামন্দিরের উন্নতির নিমিত্তে বিশেষ চেষ্টা করিতেন। এতদ্দেশীয় লোকদিগের বিদ্যা বৃদ্ধির নিমিত্তে যে ২ শিক্ষা সমাজ ও বিদ্যালয় হইয়াছে তাহার তাবতে তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছেন। তিনি এতদ্দেশীয় বালকদিগের বিদ্যা শিক্ষার অনেক সদুপায় সৃজন ও তাহার বৃদ্ধি করিয়াছেন কেবল তজ্জন্যে আমরা কৃতজ্ঞতা ও মান্যতা পূর্ব্বক তাঁহার নাম স্মরণ করিতেছি এমত নহে কিন্তু পীড়িত ব্যক্তির রোগ শান্তি, বিপদগ্রস্ত লোকের সান্ত্বনা, অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে সৎপরামর্শ কথন, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দান, এবং নির্ধনের সাহায্য করণ ইত্যাদি বিষয়ে সর্ব্বদা ব্যগ্র ও অভিরত থাকাতে তাঁহার প্রতি এদেশে আবালবৃদ্ধ বনিতাদি তাবৎ লোকের শ্রদ্ধা ছিল। ভিন্ন জাতীয়দিগের উপকারার্থে স্বীয় সময় ও ধনব্যয় পূর্ব্বক আত্মশ্লাঘা ত্যাগ করিয়া প্রবৃত্ত হইতে এবং পৃথিবীর যাবদীয় সুখাভিলাষ বিহীন হইয়া কেবল পরোপকারকে পরম সুখ জ্ঞান করত নিয়ত তদনুষ্ঠান করিতে ইঁহার তুল্য অন্য কেহই দৃষ্ট হয় নাই।

উল্লেখিত এই সকল সদ্‌গুণ ভিন্ন সাধারণ মঙ্গলার্থে তাঁহার অতি প্রশংসনীয় উৎসাহ ছিল, কলিকাতায় যে ২ সৎকর্ম্ম হইয়াছে তাহার তাবতে প্রায় তিনি সাহায্য করিয়াছেন, সকল ব্যক্তির স্মরণ থাকিতে পারে যে জুরিদিগের দ্বারা দেওয়ানী মোকর্দ্দমার বিচার, মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনতা, বর্ত্তমান চার্টরের অন্যান্য বিষয় সংশোধন ও আদালতে পারস্য ভাষার রহিত করণ ইত্যাদি বিষয়ের সুসিদ্ধির নিমিত্তে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। আর কুলি লোকদিগকে দেশান্তর লইয়া তাহাদিগের উপরে যে অত্যাচার হইত তন্নিবারণার্থে তিনি বিবিধ প্রকারে যত্ন পাইয়াছিলেন এবং পটলডাঙ্গায় বল দ্বারা অবরুদ্ধ কতিপয় ধাঙ্গড় অর্থাৎ ইতর লোককে মুক্ত করিয়াছিলেন এবং সাধারণ ক্লেশ নিবারণার্থে ও মঙ্গল জনক বিষয়ের আবেদন

নিমিত্তে যখন যে সভা হইত তাহাতেই উপস্থিত থাকিয়া তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন আর কলিকাতাস্থ প্রায় সকল সোসাইটীতেই তাঁহার গতিবিধি ছিল এবং তাহাদিগের মঙ্গলার্থে স্বীয় ক্ষমতানুসারে যথেষ্ট আনুকূল্যও করিয়াছেন।

এতাদৃশ সচ্চরিত্র ও সৎকর্ম্মাশি মেং ডেবিড হিয়ার সাহেব কেবল অস্মদ্দেশীয় লোকদিগের উপকারার্থে বহুকাল পর্য্যন্ত অভিরত ছিলেন অতএব তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করণে আমাদিগের সাধ্যানুসারে বিশেষ যত্ন বিধান কর্ত্তব্য। লোকেরা স্বভাবত সর্ব্বদাই আমাদিগকে নিরুদ্যম বলিয়া থাকে ইহাতে যদি আমরা অতিশীঘ্র ঐ দয়ালু মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক অস্মদাদির বংশাবলির মধ্যে তাঁহার নাম স্মরণের উপায় না করি তবে পৃথিবীস্থ লোকদিগের সমীপে আমাদিগের মনুষ্যত্ব থাকিবেক না তন্নিমিত্তে আমরা এতন্নগরস্থ মান্য হিন্দু মহাশয়গণকে বিনয় পুরঃসর নিবেদন করিতেছি যে তাঁহারা অতি ত্বরায় এক সভা করিয়া উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করুন বোধ হয় যে মেডিকেল কালেজ এই সভার উপযুক্ত ও সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট স্থান হইতে পারিবেক। আমাদিগের ব্যসন এই যে কেবল এতদ্দেশীয় লোকদিগের নিকট হইতে চাঁদা স্বরূপে কতক টাকা সংগৃহীত হইয়া তাঁহার চিরস্মরণার্থে এক পতিমূর্ত্তি হয় এবং যে স্থানে তাঁহার স্তম্ভ নির্ম্মাণের সূচনা শুনিতেছি তাহার নিকটে ঐ প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত থাকে। এস্থলে যদ্যপিও তাঁহার স্মরণ যোগ্য অথচ সাধারণের উপকার জনক অন্যান্য সম্মান চিহ্নের প্রস্তাব হইতে পারে আমাদিগের বিবেচনায় বোধ হয় যে প্রতিমূর্ত্তি দ্বারা যাদৃশ উত্তমরূপে স্মরণ ও মনোমধ্যে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধার উদয় হইতে পারে অন্য কোন চিহ্ন দ্বারা তদ্রূপ হইবেক না।

অতএব আমরা আশ্বাস করি যে এই প্রস্তাব সকলে অন্তঃকরণ সহিত গ্রহণ করিয়া এতৎ কর্ম্ম সম্পাদনে সত্বর হইবেন।

উক্ত এক পংক্তি লিখনানন্তর আমরা অবগত হইলাম যে রাজা কৃষ্ণনাথ রায় বাহাদুর এবিষয়ে উদ্যোগী হইয়া ১৭ জুন শুক্রবার বেলা ৪ ঘণ্টার সময় মেডিকেল কালেজে এক সভা করিবার আহ্বান পত্র প্রকাশ করিতেছেন ঐ পত্রে অধিক ব্যক্তির স্বাক্ষর থাকিলে উত্তম হইত তথাপি তাহাতে আমাদিগের কিঞ্চিন্মাত্র আপত্তি নাই যাহা হউক রাজা বাহাদুরকে আমাদিগের প্রশংসা করিতে হইবেক, আর তিনি যে ঐ সভাতে অধিক মান্য ব্যক্তির সমাগমার্থে ও উক্ত কার্য্য সমাধার নিমিত্ত চাঁদা সংগ্রহ করণে বিশেষ যত্ন করিবেন তাহাতে আমরা সন্দেহ করি না আমাদের বোধ হয় হিন্দুদলস্থ তাবৎ সম্ভ্রান্ত লোকেরা ও মেং হিয়ার সাহেবের ভক্ত ব্যক্তিরা সকলেই এ বিষয়ে সাহায্য করিবেন। আমরা রাজা বাহাদুরকে অনুরোধ করি যে তিনি ইতিমধ্যে সাধারণ বিজ্ঞাপনার্থে সকল বাঙ্গালা সমাচার পত্রে ঐ সভার কল্পনা প্রকাশ করুন এবং সভার দিবসে প্রত্যেক বাঙ্গালি পল্লীর প্রকাশ্য স্থানে ঐ সভার সমাচার লিখিয়া সংলগ্ন করিয়া দিউন।

সম্পাদকীয়/বেঙ্গল স্পেকটেটর
১৪ জুন, ১৮৪২

● অর্জ্জুনা পুষ্করিণী

অনেকে এই পুষ্করিণীকে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইলের বারুণী পুষ্করিণী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাহা ঠিক নহে। 'বারুণী' পুষ্করিণী বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনার সৃষ্টি মাত্র। এই পুষ্করিণী

বঙ্কিমচন্দ্রদিগের পৈতৃক। গ্রামোপান্তে অতি নির্জ্জন স্থানে উহার খনন হইয়াছিল, কিন্তু কোন সময়ে উহা খাত হইয়াছিল তাহা কেহ বলিতে পারে না। অর্জ্জুনা পূর্ব্বে সুবৃহৎ জলাশয় ছিল, জল দেখা যাইত না, পদ্মপত্রে ঢাকা থাকিত, আর উহার উপর অসংখ্য পদ্মফুল বায়ুতাড়িত হইয়া দুলিত। চারিদিকের পাড় আম্রকাননে সুশোভিত। এই আম্রবনের গাছে গাছে অসংখ্য পাখী বাস করিত। প্রাতে, বৈকালে ও সন্ধ্যায় সকল সময়েই তাহাদের কলরবে এই নির্জ্জন সরোবরের চিরনিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইত।

এই পুষ্করিণী এক্ষণে মজিয়া গিয়া সঙ্কীর্ণ আয়তন হইয়াছে এবং পাড়ে পাড়ে প্রজা বসিয়াছে। ইহার সে রম্যতা আর নাই।

'অর্জ্জুনা'র উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্রদিগের ফুলবাগান ছিল, উহাতে একটি ক্ষুদ্র বাগানবাটীও ছিল, এক ব্যক্তি উহাতে কিছুদিন বাস করিতে পারিত, কোন কষ্ট হইত না। বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠাগ্রজ ঐ বাগানের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন, পরে বঙ্কিমচন্দ্র উহা একটি উৎকৃষ্ট ফুলবাগান করিয়াছিলেন। তেরচৌদ্দবর্ষ বয়ঃক্রমে জলপানি পাইয়া ঐ টাকা হইতে এবং পিতৃদেবের সাহায্য হইতে হুগলি কলেজের মালীর দ্বারা নানাপ্রকার ফুলের চারা আনাইয়া রোপণ করিয়াছিলেন এবং স্থানে স্থানে বিশ্রামের জন্য ইষ্টক-নির্ম্মিত বসিবার স্থান প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ঐ বাগানের পূর্ব্ব পশ্চিম ও উত্তর দিকে বড় বড় মনসাকাঁটার বেড়া ছিল, আর দক্ষিণ দিকে ইষ্টক-নির্ম্মিত ভিতের উপর রেলিং ছিল ও একটি ফটক ছিল। এই রেলিং-এর পরই অর্থাৎ বাগানের দক্ষিণেই 'অর্জ্জুনা'। মাঠাল গ্রামে যাইবার জন্য কেবল মধ্যে একটি সঙ্কীর্ণ রাস্তা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই ফুলবাগানে ও পুষ্করিণীর পাড়ে বেড়াইতে ভাল বাসিতেন এবং যতদিন না তাঁহাদের বসতবাটীর সম্মুখে একটি বৈঠকখানাবাটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, ততদিন এই ফুলবাগানে সর্ব্বদা থাকিতেন। ঐ ফুলবাগানের এক্ষণে আর কোন চিহ্ন নাই, ঐ জমিতে এখন প্রজা বসিয়াছে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বর্ণপরিচয়

"ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-৯১) 'বর্ণপরিচয়' গ্রন্থ থেকে শুধু যে বাংলা বর্ণেরই পরিচয় পাওয়া যায় তা নয়, স্বয়ং রচয়িতার চারিত্রিক বর্ণেরও পরিচয়ও পাওয়া যায়। মানুষের চারিত্রিক রূপ প্রতিফলিত হয় তার কর্মের মধ্যেই। শুধু যে বৃহৎ কর্মেই মানুষের মহত্ত্ব ধরা পড়ে তা নয়। বরং ক্ষুদ্র কর্মেই মানুষের স্বাভাবিক চিত্তপ্রকৃতি সত্যরূপে প্রকাশ পায়। 'বর্ণপরিচয়' একটি ক্ষুদ্র পুস্তক। তাই এটির মধ্যে বিদ্যাসাগর-চরিত্রের স্বাভাবিক রূপটি কতখানি প্রকাশ পায় তা দেখাবার চেষ্টা করা যেতে পারে।

'বর্ণপরিচয়' প্রথম ভাগ প্রকাশের তারিখ সংবৎ ১৯১২ বৈশাখ ১ (১৮৫৫ এপ্রিল)। বইটির ষষ্টিতম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সংবতের ১লা পৌষ তারিখে (১৮৭৫ ডিসেম্বর)। মাত্র কুড়ি বছরে ষাট সংস্করণ। এই বইটির দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৯১২ সংবতের ১লা আষাঢ় (১৮৫৫ জুন) তারিখে। দ্বিষষ্টীতম সংস্করণের তারিখ ১৯২০ সংবৎ। আট বৎসরে বাষট্টি সংস্করণ। এই আশ্চর্য জনপ্রিয়তার দ্বারাই বোঝা যায় এই বইটি আপন বৈশিষ্ট্যে পূর্ব্ববর্তী শিশুপাঠ্য প্রাথমিক পুস্তকগুলিকে বহুগুণে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।...

'বর্ণ পরিচয়' প্রকাশ করে ঈশ্বরচন্দ্র 'শিশুশিক্ষা'-য় স্বীকৃত নীতি থেকে কোন্ কোন্ বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করলেন এবং শিশুশিক্ষার প্রণালীতে কোন্ কোন বিষয়ে উন্নতিসাধন ও নূতনত্ব প্রবর্তন করলেন, এখন তা বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন যে, সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা (১৮৫১), ঋজুপাঠ তিনভাগ (১৮৫১-৫২) এবং ব্যাকরণকৌমুদী তিনভাগ (১৮৫৩-৫৪) প্রকাশের পরে বিদ্যাসাগর 'বর্ণ পরিচয়' রচনায় হাত দেন। তাই সহজেই বোঝা যায়, পরিণত বিশ্লেষণবুদ্ধি ও পাকা হাত নিয়েই তিনি এ কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। বস্তুতঃ 'বর্ণপরিচয়'কে বাংলা শিক্ষার উপক্রমণিকা ও ঋজুপাঠ বলে অভিহিত করা যেতে পারে। ব্যাকরণের বিচারবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায় এই ক্ষুদ্র বইটির প্রতি পৃষ্ঠায়। বইটির 'বিজ্ঞাপন' অংশেই বিদ্যাসাগরের চিন্তাস্বাতন্ত্র্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। এটির ঐতিহাসিক গুরুত্বও কম নয়। তাই এটি এখানে সমগ্রভাবেই উদ্‌ধৃত হল— "বর্ণপরিচয়ে'র প্রথম ভাগ প্রচারিত হইল। বহুকাল অবধি বর্ণমালা ষোল স্বর ও চৌত্রিশ ব্যঞ্জন, এই পঞ্চাশ অক্ষরে পরিগণিত ছিল। কিন্তু বাঙলা ভাষায়, দীর্ঘ ঋৃ কার ও দীর্ঘ ৯ৢ কারের প্রয়োগ নাই, এই নিমিত্ত ঐ দুই বর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে, আর সবিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে, অনুস্বর ও বিসর্গ স্বরবর্ণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। এজন্য, ঐ দুই ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে পঠিত হইয়াছে। আর চন্দ্রবিন্দু ব্যঞ্জনবর্ণস্থলে, এক স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ড, ঢ, য, এই তিন ব্যঞ্জনবর্ণ পদের মধ্যে অথবা পদের অন্তে থাকিলে ড়, ঢ়, য়, হয়; ইহারা অভিন্ন বর্ণ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু যখন আকার ও উচ্চারণ উভয়থাই পরস্পর ভেদ আছে, তখন উহারা স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া উল্লিখিত হওয়া উচিত; এই নিমিত্ত, উহারাও স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনবর্ণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ক ও ষ মিলিয়া ক্ষ নয়, সুতরাং উহা সংযুক্ত বর্ণ; এজন্য অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের গণনাস্থলে পরিত্যক্ত হইয়াছে।"

এই কয়েকটি পঙক্তির মধ্যে ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাকরণকারের মননস্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ সুস্পষ্ট। বাংলা বর্ণমালার এই সংস্কারসাধন ঈশ্বরচন্দ্রের অন্যতম কীর্তি বলে গণ্য হবার যোগ্য।..."

প্রবোধচন্দ্র সেন/
শিশুবোধক, শিশুশিক্ষা ও বর্ণপরিচয় /
বিদ্যাসাগর স্মারক গ্রন্থ

এডুকেশন গেজেট

"এখনকার দিনের মত নয়, অপেক্ষাকৃত বৃহৎ অক্ষরে ছাপা প্রথম খণ্ড প্রথম সংখ্যা এডুকেশন গেজেট প্রকাশিত হইল, আমার বেশ মনে পড়িতেছে। ওব্রাইনন্ স্মিথ স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক, কালিদাস মৈত্র সহ-সম্পাদক। তাঁহার দুই তিনজন আত্মীয় উলায় থাকিতেন, তাঁহারা হর্ষে গৌরবে, তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন,— সকলে একটু ঠাণ্ডা হইলে আমি চুপি চুপি তাহা হইতে যাদব-মাধবের কথোপকথন পাঠ করিতে লাগিলাম। গেজেট কথাটা আমি তৎপূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম। বাঙ্গলা গেজেট দেখিয়াও ছিলাম। এডুকেশন কথাটা তৎপূর্ব্বে আমার কানে উঠে নাই। বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এই কথাটা কি ?' বাবা বলিলেন 'ওটা ইংরাজি কথা— অর্থ শিক্ষা।' আমি বলিলাম 'তবে শিক্ষা গেজেট বলিল না কেন ?' পিতা একটু

হাস্য করিলেন। বোধ হয় শৈশবে আমার সমালোচনার প্রবৃত্তি দেখিয়া, তিনি হয়ত একটু আহ্লাদিত অথচ বিচলিত হইতেছিলেন। আমি পঞ্চাশ বৎসর কথাটা শুনিতেছি কিন্তু শিক্ষা-বিভাগের মুখপত্রের নাম এডুকেশন গেজেট এ বিড়ম্বনা কণ্টক এখনও প্রাণে খচ্ করিয়া উঠে।"

পিতা-পুত্র /
অক্ষয়চন্দ্র সরকার

মধুসূদনের লিরিক ও রবীন্দ্রনাথ

"এখানে প্রশ্ন জাগে, রবীন্দ্রনাথ যখন আত্মগত গীতিকবিতার ক্ষেত্রে বঙ্গসুন্দরী কাব্যকে অগ্রণীত্বের মর্য্যাদায় ভূষিত করেন, এবং বিহারীলালকে 'বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি' বলে আখ্যাত করেন, তখন তিনি কি মধুসূদনের লিরিক প্রতিভা সম্বন্ধে একেবারেই অনবহিত ছিলেন? মধুসূদনের চতুর্দ্দশপদী কবিতায় কখনও কখনও কবির আত্মনিবেদনের সুর প্রকাশ পেয়েছে বটে, কিন্তু সনেটের নির্দিষ্ট বিধিবিধান ও সংকীর্ণ সীমার মধ্যে সে সুর গীতোচ্ছ্বাসে পরিণত হবার সুযোগ পায়নি, এ কথাও তিনি বলেছেন। পক্ষান্তরে ব্রজাঙ্গনা কাব্যে যদি বা কখনও কখনও বেদনার সঙ্গীত উচ্ছ্বসিত হয়ে থাকে, তবু সে বেদনা কবির নিজের হৃদয়জাত নয়। বোধ করি সেইজন্যই তিনি ব্রজাঙ্গনা কাব্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেননি। কিন্তু মধুসূদনের 'আত্মবিলাপ' কবিতাটির অগ্রণীত্বের অধিকারকে তো কোনো প্রকারেই উপেক্ষা করা চলে না। রবীন্দ্রনাথ যে এই কবিতাটির কথা সে সময়ে অবগত ছিলেন না তাও নয়। কারণ ১২৯০ (ইং ১৮৮৩) সালের শ্রাবণ সংখ্যা ভারতীতে 'সিন্ধুদূত' নামে একটি কাব্যের ছন্দ আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি স্মৃতি থেকে ওই কবিতার প্রথম চার পংক্তি উদধৃত করেন। তা হলে বিহারীলালের আত্মগত কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি এই কবিতাটির কথা উল্লেখও করলেন না কেন? অনবধানতাই কি এর কারণ? আমার বিশ্বাস, তা নয়। সম্ভবত 'আত্মবিলাপ'-এর রচনাকাল সম্বন্ধে তাঁর মনে কিছু ভ্রান্তি ছিল। এই ভ্রান্তি ঘটবারও একটু কারণ ছিল মনে করি। সে কারণটি এই—

রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের পাঠক মাত্রেই জানেন, ১২৮১ (ইং ১৮৭৪) সালের 'আর্যদর্শন' পত্রিকায় যখন বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' কাব্যখানি প্রকাশিত হচ্ছিল তখনই রবীন্দ্রনাথ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ওই ১২৮১ সালেরই জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'আর্যদর্শনে' (পৃ ৯১) মধুসূদনের 'আশার ছলনে ভুলি' ইত্যাদি কবিতাটি মুদ্রিত হয় 'আশার ছলনা' নামে। তার পাদটীকার ছিল এই মন্তব্যটি—

"আমরা মৃত মহাত্মা কবিবর মধুসূদন দত্তের ক্লার্ক মহাশয়ের নিকট হইতে এই অপ্রত্যাশিত কবিতাগুলি প্রাপ্ত হইয়া মৃত কবির প্রতি ভক্তির চিহ্নস্বরূপ সাধারণকে উপহার দিতেছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, সাধারণে অতি সমাদরে ইহা গ্রহণ করিবেন।"

—আর্যদর্শন ১২৮১ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ৯১ পাদটীকা

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে আর্যদর্শন পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ও জানতেন না যে, এই কবিতাটি প্রায় তেরো বৎসর পূর্বেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল 'আত্মবিলাপ' নামে তাই এটি অপ্রকাশিত কবিতা হিসেবেই তিনি এটিকে সাধারণকে উপহার দিয়েছিলেন। এর থেকে

এ ধারণা হওয়াও স্বাভাবিক যে, কবিতাটি মধুসূদনের শেষ বয়সের, হয়তো মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বের রচনা। আর্যদর্শনের আগ্রহী পাঠক বালক রবীন্দ্রনাথের মনেও বোধ হয় এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। কবিতাটি যে তাঁর জন্মের কয়েক মাস মাত্র পরে তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হয়েছিল, এ কথা তৎকালে তাঁর জানা থাকা প্রত্যাশিত নয়, বিশেষতঃ যে স্থলে পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় নিজেও অনবহিত ছিলেন। মনে হয় পরবর্তী কালেও রবীন্দ্রনাথের বালককালের এই ধারণা অপরিবর্তিতই ছিল। সম্ভবত এজন্যই 'আশার ছলনা' কবিতাটির কথা মনে রেখেও তিনি বিনা দ্বিধায় 'সর্বদাই হু হু করে মন'-কে আগ্রগামিতার মর্য্যাদা দিয়েছেন।"

প্রবোধচন্দ্র সেন /
ঊনবিংশ শতকে বাংলা কবিতার ধারা /
বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৭৭

ইণ্ডিয়ান ফীল্ড

"১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কিশোরীচাঁদের চেষ্টায় যে বিরাট Black Act meeting আহূত হয়, তাহার বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, ঈর্ষ্যাপ্রণোদিত ইংরাজগণের মুখপত্রগুলিতে এই সভার কার্য্যবিবরণী কঠোরভাবে সমালোচিত হইয়াছিল। হিন্দুগণের একমাত্র ক্ষমতাশালী মুখপত্র 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ইংরাজগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত সংবাদপত্রসমূহের কুপ্রভাব নিবারণে অসমর্থ হইয়াছিল। কারণ হিন্দু পেট্রিয়ট দেশবাসীগণ কর্ত্তৃকই পরিচালিত হইত, এবং উহার ইংরাজ গ্রাহক ও পাঠক এত অল্প ছিল যে ঐ পত্রিকার প্রচার দ্বারা সাধারণ ইংরাজগণের বিদ্বেষভাব দূরীভূত করা অসম্ভব ছিল। দূরদর্শী কিশোরীচাঁদ দেখিতে পাইয়াছিলেন যে দেশের তৎকালীন অবস্থায় যে কয়জন অকৃত্রিম ভারতবন্ধু আছেন, তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য না করিলে, তাহাদিগকে দেশের জনসাধারণের উন্নতির জন্য লেখনী ধারণ না করাইলে দেশের উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। ইংরাজদিগের মধ্যে ভারতবন্ধুর অভাব ছিল না। কলিকাতার প্রধান পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জেমস লঙ, রেভারেণ্ড সি. এইচ. এ. ডল প্রভৃতি মহাত্মাগণ দেশের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। সুতরাং তিনি এই সময়ে তাঁহাদিগের সহায়তায় দেশবাসীর মুখপত্রস্বরূপ এরূপ একটি সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠার সংকল্প করিলেন যে, তাহাতে সাধারণ ইংরাজদিগের সহানুভূতি আকর্ষণ করিবে এবং তাঁহাদিগকে দেশহিতকর কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিবে। কিন্তু কেবল রাজনীতিক সংবাদপত্র—যাহাতে দেশবাসীর কল্যাণ আলোচিত হইবে —সাধারণ ইংরাজগণের প্রীতিকর হইবে কেন ? সুতরাং উহাতে রাজনীতি ব্যতীত কৃষি, পূর্ত, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বিষয় ও সর্ব্বোপরি ইংরাজগণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতিকর ঘোড়দৌড় প্রভৃতি ক্রীড়া-বিষয়ক প্রবন্ধাদিও প্রকাশিত হইবে, এইরূপ সংকল্প হইল। তৎকালে ক্রীড়াবিষয়ক কোনও সংবাদপত্র এদেশে প্রচলিত ছিল না; সুতরাং 'ইণ্ডিয়ান স্পোর্টিং রিভিউ'-এর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক জেমস হিউম যখন এই পত্রিকার সম্পাদনাভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন তখন উহার প্রচার ও প্রতিষ্ঠালাভ সম্বন্ধে কাহারও অণুমাত্র সংশয় রহিল না।"

মন্মথনাথ ঘোষ / কর্ম্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র

কিশোরীচাঁদ মিত্রের পার্টি

"কিশোরীচাঁদ কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া প্রথমে কাশীপুরে গঙ্গাতীরে একটি উদ্যানবাটিকায় অবস্থান করেন। তখন চীফজাস্টিস, পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীরা অনেকে কাশীপুরে অবস্থান করিতেন। কিশোরীচাঁদের ইচ্ছা, পূর্ব্বোক্ত প্রথম উদ্দেশ্য সাধন করা। নিকটবর্ত্তী কামারহাটী গ্রামে বিখ্যাত বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ বাস করিতেন এবং দেশের অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তি ইহার নিকটে অবস্থান করিতেন। কিশোরীচাঁদের অমায়িকতায় মুগ্ধ হইয়া সকলেই তাঁহার বাসস্থানে সতত সম্মিলিত হইয়া নানা প্রকারে সদালাপে সময় অতিবাহিত করিতেন।

কিশোরীচাঁদ প্রায়ই তাঁহার ইয়ুরোপীয় ও দেশীয় বন্ধুগণকে নিমন্ত্রিত করিয়া পরস্পরের সহিত আলাপ করাইয়া দিতেন এবং প্রায় প্রতি সপ্তাহে বিরাট আয়োজনে ভোজ দিতেন।"

মন্মথনাথ ঘোষ /
কর্ম্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র

লোকহিতের জন্যে এই সময়ে কিশোরীচাঁদের মনে দানা বেঁধেছিল দুটো উদ্দেশ্য : ১। ইংরেজদের সঙ্গে আলাপ করে তাদের দেশের অবস্থা বুঝিয়ে দিয়ে দেশহিতকর কাজে তাদের সহানুভূতি আর সহকারিতা আদায় করা। ২। দেশের প্রধান মানুষ আর সমাজনেতা, যাঁরা দেশের কলঙ্ক মোচনে উদাসীন, তাঁদের মনে কর্ত্তব্যবোধ জাগিয়ে দিয়ে কাজে অনুপ্রাণিত করা।

কিশোরীচাঁদের বাগানবাড়ির মজলিস

"কিশোরীচাঁদের এই উদ্যান-বাটিকা সাহিত্য-চর্চার এবং সুহৃৎ সম্মিলনের প্রীতি-নিকুঞ্জ-স্বরূপ একটি কেন্দ্র ছিল। এই বিবিধ তরুলতারাজি-সুশোভিত উদ্যান-বাটিকায় বাঁধাঘাট সুশোভিত একটি সরোবর ছিল। এই সুশীতল, বাপীতটবর্তী রমণীয় মণ্ডপে সায়াহ্নে সুহৃৎমণ্ডলী সমবেত হইয়া, সাহিত্যচর্চা, রহস্যালাপ ও ভাববিনিময় করিতেন। একদিন এইরূপ এক বৈঠকে প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরের সহিত বাঙ্গালা ভাষা-গঠন সম্বন্ধে মধুসূদনের মহাতর্ক উপস্থিত হয়। প্যারীচাঁদ মিত্র তখন 'মাসিকপত্র' নামক একখানি সাময়িক পত্রের সম্পাদকরূপে অধিষ্ঠিত; তাঁহার 'আলালের ঘরের দুলাল' সেই পত্রে ক্রমশ প্রকাশিত হইতেছিল। সে সময়ে সংস্কৃত রীত্যনুসারে বাঙ্গালাভাষা লিখনের যুগ প্রচলিত; প্যারীচাঁদ মিত্র সেই 'পণ্ডিতী' রীতির পরিবর্তন ও চলিত ভাষায় পুস্তক প্রণয়ন ও প্রচার করিতেছিলেন। মধুসূদন প্যারীচাঁদকে উক্ত গ্রন্থ লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনি এ আবার কি লিখিতে বসিয়াছেন ?— লোকে ঘরে আটপৌরে যাহা-হয় পরিয়া আত্মীয়-জন সকাশে বিচরণ করিতে পারে; কিন্তু বাহিরে যাইতে হইলে, সে বেশে যাওয়া চলে না। 'পোষাকী' পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তাই এখানে। আপনি দেখিতেছি, 'পোষাকী'র পাট তুলিয়া দিয়া, ঘরে বাহিরে সভ্য-সমাজে সর্বত্রই এই আটপৌরে চালাইতে চাহেন। ইহাও কি কখন সম্ভব।" ইংরাজি ভাষায় সুপণ্ডিত এবং অন্যান্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইলেও, মধুসূদন যে বাঙ্গালা ভাষার কোনো ধার ধারেন, এরূপ ধারণা কাহারও ছিল না। তাঁহার মুখে এইরূপ শ্লেষোক্তি সম্পূর্ণ অনধিকার-চর্চা মনে করিয়া, উত্তেজিতভাবে

প্যারীচাঁদ বলিলেন, "তুমি বাঙ্গালা ভাষার কি বুঝিবে? তবে, জানিয়া রাখ, আমার প্রবর্ত্তিত এই রচনা-পদ্ধতিই বাঙ্গালা ভাষায় নির্ব্বিবাদে প্রচলিত ও চিরস্থায়ী হইবে।" মধুসূদন তাঁহার স্বভাব-সুলভ হাস্য-সহকারে তদুত্তরে বলিলেন, "It is the language of Fishermen, unless you import largely from Sanskrit. উহা কি আবার একটা ভাষা। দেখিবেন, আমি যে ভাষার সৃষ্টি করিব, তাহাই চিরস্থায়ী হইবে।" এই কথা শুনিয়া এবং উহাকে সম্পূর্ণ রহস্য-বাক্য মাত্র মনে করিয়া, সমবেত সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন; কেহ কেহ বিদ্রূপচ্ছলে বলিলেন, "তুমি বাঙ্গালা লিখিবে, আর সেই রচনা চিরস্থায়ী হইবে। সে ত আর একালে নহে (till the Greek Calends!)"... ইহার কিছুকাল পরে তাঁহার শর্ম্মিষ্ঠা নাটক রচিত ও প্রকাশিত হইলে, বন্ধুবর্গ মধুসূদনের এই দিনকার ঐ দম্ভ-বাক্য স্মরণ করিয়া উল্লসিত হইয়াছিলেন।

মধুস্মৃতি/নগেন্দ্রনাথ সোম

দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ

"গ্রন্থকারের নাম নাই, কোথায় কবে ছাপা হইল, তাহার কিছুই নাই। দুইখানি শাদা কাগজের মলাট দুই দিকে, মধ্যে ৬২ পৃষ্ঠাব্যাপী একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ; নাম 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ'। বহু পরে জানিয়াছি এখানি রামকমল ভট্টাচার্য্যের লেখা। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া আমি যেন ভাষা রাজ্যের আর এক দেশে উপস্থিত হইলাম। এ ত কাদম্বরী নয়, বেতাল পঁচিশ নয়, তারাশঙ্করও নয়। প্যারীচাঁদও নয়,— এ যে এক নূতন সৃষ্টি। ইহাতে কাদম্বরীর আড়ম্বর নাই, বিদ্যাসাগরের সরসতা নাই, অক্ষয়কুমারের প্রগাঢ়তা নাই, প্যারীচাঁদের গ্রাম্য সরলতা নাই, অথচ যেন সকলই আছে।... আমি বার বার তিনবার পাঠ করিলাম... বিশেষত্ব এই যে, সংজ্ঞাপদে এবং বিশেষণে, স্থলে স্থলে সংস্কৃতের মত। ক্রিয়া পদগুলি অনেক স্থলেই খাঁটি বাঙ্গালা। কাদম্বরীতে কঠোর সংস্কৃত দেখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু 'এলা-লতা-লিঙ্গিত চূত ও তাম্বূল-বল্লী-পরিণদ্ধ সুপারি' এরূপ ঢং দেখি নাই।

বাঙ্গলা ভাষার ও বাঙ্গালা সাহিত্যের নানারূপ আলোচনা আলোড়ন হইতেছে; কিন্তু এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানির কথা কাহাকেও বলিতে শুনি না, বা লিখিতে দেখি না। অথচ আমার বিশ্বাস দুরাকাঙ্ক্ষের ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার জননী। হউক বা না হউক, এই ভাষার বিশেষত্বের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ক্ষতি কি?"

পিতা-পুত্র/অক্ষয়চন্দ্র সরকার /
বঙ্গ-ভাষার লেখক

কুলীনকুলসর্ব্বস্ব

"এই সময়ে মহা ধুমধামে চুঁচুড়ায় কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটকের অভিনয় হইল। তখনও কলিকাতায় নাটক অভিনয় আরম্ভ হয় নাই। প্রসিদ্ধ গায়ক এবং গাথক রূপচাঁদ পক্ষী আসিয়া গান বাঁধিয়া দিলেন, তালিম দিলেন; একদিন নিজে গাহিয়াও দিলেন। নাটকের নটীর গান হাটেবাজারে গীত হইতে লাগিল। 'অধিনীরে গুণমণি পড়েছে কি মনে হে?" গ্রন্থকার রামনারায়ণের রচনার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হইল, তাঁহার নান্দী, নাপ্‌তে বৌ-এর

পরিচয় ও তিনরূপ ফলারের লক্ষণ প্রভৃতি মুখস্ত করিয়া ফেলিয়াছিলাম। ফলার এখনও ভুলি নাই।"

পিতা-পুত্র/অক্ষয়চন্দ্র সরকার /
বঙ্গ-ভাষার লেখক

কুলীনকুলসর্ব্বস্ব

"কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটকের রচয়িতা বলিয়া পণ্ডিত রামনারায়ণ জনসাধারণে পরিচিত। আমার কিন্তু ছেলেবেলা থেকে শোনা আছে যে উক্ত নাটকখানি পণ্ডিত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রচনা করিয়া দেন। এ বিষয়ের ভাল করিয়া অনুসন্ধান হওয়া উচিত। বইখানার মধ্যে কয়েকটা লক্ষণ দেখিয়া আমারও সন্দেহ হয় যে বোধ হয় উহা পণ্ডিত মহাশয়ের রচিত নহে। প্রথমতঃ দেখিবেন— বক্তৃতার ভাষাটা গুরুগম্ভীর সংস্কৃত ধাঁজের ভাষা; তাঁহার অন্যান্য নাটকের ভাষা এতটা সংস্কৃত ঘেঁসা নহে। আবার দেখুন, তাঁহার অন্য কোনও নাটকে

ঘিয়ে ভাজা তপ্ত লুচি
দু চারি আদার কুচি

এই ধরণের কবিতা আর দেখিতে পাওয়া যায় না। যিনি ও রকম কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত, তিনি যে একেবারেই আর ও পথ মাড়ালেন না, এ যেন কেমন কেমন ঠেকে। বিশেষতঃ তখনকার দিনে ও-ধরণের কবিতা অত্যন্ত আদরণীয় ছিল। আমি জানি, ভাল ভাল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বাঙ্গালা ভাষায় ঐ রকম সহজ সরস কবিতা রচনা করিয়া আনন্দবোধ করিতেন, দশের কাছে সমাদরও পাইতেন; বটতলার ছাপাখানায় সেই সকল কবিতাপুস্তক প্রকাশিত হইত। ইদানীং অনেক জায়গায় আমি সেই সকল বইয়ের সন্ধান করিয়াছি। কিন্তু কোথাও আর সেগুলি পাই না। আর একটা কথা,— 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকে পট-পরিবর্ত্তন নাই; পণ্ডিত মহাশয়ের অন্যান্য নাটকে কিন্তু ইংরাজী নাটকের পদ্ধতি অনুসারে গর্ভাঙ্কাদি বিভাগ আছে।..."

পুরাতন প্রসঙ্গ/অমৃতলাল বসু/
বিপিনবিহারী গুপ্ত

ব্ল্যাক অ্যাক্‌ট ও জর্জ টমসন

"১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি (জর্জ টমসন) দ্বিতীয়বার এদেশে আগমন করেন। ইনি কিছুদিন কিশোরীচাঁদের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নব্যবঙ্গকে পুনরায় উত্তেজনাময়ী রাজনীতিক বক্তৃতায় উদ্দীপ্ত করিয়া তুলেন। এই সময়ে "মফঃস্বলস্থ ফৌজদারী বিচারালয়ে শ্বেতাঙ্গ অপরাধীর বিচার উচিত কি না," এই বিষয় আলোচিত হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত এই সকল স্বাধীন ব্রিটনবাসীর ফৌজদারী মোকদ্দমা-সমূহের বিচারনিষ্পত্তির ক্ষমতা কেবল সুপ্রীম কোর্টেরই ছিল। সুদূর মফঃস্বলে ইংরাজ প্লাণ্টার এবং দেশীয় প্রজার মোকদ্দমা বাধিলে দরিদ্র প্রজাকে প্রভূত সময় ও অর্থ নাশ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া নালিশ রুজু করিতে হইত। তখন যাতায়াতেরও এত সুবিধা ছিল না। আইন কমিশনের তদানীন্তন সভাপতি মাননীয় মিঃ পিকক নূতন ফৌজদারী বিধির খসড়া পেশ করিবার সময় এই প্রশ্ন উত্থাপিত

করেন। শিক্ষিত ভারতবাসীরা এই বিষয়ে যে বিরাট আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা আমাদিগের দেশে এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার, পরে বোধ হয়, ইলবার্ট বিলের আলোচনাকালে এবং গত স্বদেশী আন্দোলনের সময় মাত্র দেশবাসী এইরূপ উত্তেজিত হইয়াছিলেন। কিশোরীচাঁদের ডায়েরী হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি এই আন্দোলনের অন্যতম স্রষ্টা।"

মন্মথনাথ ঘোষ /
কর্ম্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র

সিপাহী বিদ্রোহ ও শিবচন্দ্র দেব

"১৮৫৭ খৃঃ মে মাসে শিবচন্দ্র একদিন রেলপথে কোন্নগর হইতে কলিকাতায় ফিরিবার পথে কয়েকজন ইউরোপীয়ানদের সঙ্গে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িতে আলাপ হয়। কথায় কথায় মিউটিনীর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়ায় দেশীয়দিগের উপর অজস্র গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। শান্তস্বভাব শিবচন্দ্রের মুহূর্তের জন্য ধৈর্য্যচ্যুতি হইল এবং তিনি তর্কের মুখে অনবধানতা-বশতঃ বলিলেন— "কেবল এক পক্ষের দোষ দেখিলে চলিবে না, সিপাহীরা যখন ধর্ম্মমূলক কুসংস্কারবশতঃ দাঁত দিয়া টোটা কাটিতে আপত্তি করিয়াছিল, তখন তাহাদিগকে ঐ কাজ করিতে বাধ্য করা গবর্ণমেন্টের অন্যায় ও অনুচিত কার্য হইয়াছিল।
উক্ত সাহেবগণ এই কথা শুনিয়া সকলে মিলিয়া লর্ড ক্যানিং-এর হোম সেক্রেটারী বিডন সাহেবের নিকট শিবচন্দ্রের নামে রাজবিদ্রোহের অভিযোগ উপস্থিত করেন এবং হুগলীর জজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে এই অভিযোগের একজন প্রবল সমর্থক খাড়া করেন। শিবচন্দ্রের কৈফিয়ৎ তলব হইল। বহুলোকের প্রশংসাপত্রসহ তিনি অবেদন করেন এবং তাঁহাকে সতর্ক করিয়া বলা হয় যেন বারান্তরে এইরূপ অবিবেচনার কার্য না করেন, পদচ্যুতি বা পদাবনতির আশঙ্কা দূরীভূত হইল।"

তিন শতকের রিষড়া /
শ্রীকৃষ্ণগোপাল পাকড়াশী

সিপাহী বিদ্রোহ, ঢাকা। ১

"জুন মাসের গোড়াতেই ঢাকা শহরে প্রতিদিন গুজব রটতে লাগলো বিদ্রোহ সম্পর্কে। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো শহরে। বিশেষ করে ইংরেজরা শঙ্কিত হয়ে উঠলো মনে মনে।
বারো জুন তারিখের একটি ঘটনা। ঢাকার আদালতে এক বিচার চলছে। এমন সময় কে যেন চেঁচিয়ে বলে উঠলো, আসছে তারা আসছে। বাস, মুহূর্তের মধ্যে আদালত খালি। শুধু আদালত নয়, এর পর দেখা গেল বিভিন্ন অফিসটফিস থেকেও পিলপিল করে লোকজন বেরিয়ে আসছে। চারিদিকে হৈ চৈ। ইংরেজদের অনেকে নদীর ঘাটে গিয়ে নৌকো ভাড়া করতে লাগলো যাতে শহর ছেড়ে চলে যাওয়া যায়। অনেকে আবার অস্ত্র-শস্ত্র জমা করতে লাগলো। ক্যাম্প সাহেব ছিলেন তখন ঢাকার ইংরেজী সাপ্তাহিক 'ঢাকা নিউজ'-এর জবরদস্ত সম্পাদক। দেখা গেল, তিনতলায় তাঁর আফিসে রিভলবার হাতে শঙ্কিতচিত্তে তিনি বসে আছেন। সেখানে আবার হুড়মুড় করে আশ্রয় নিল আর্মানি ব্যবসায়ী সিরকো। শুধু আজ,

ম্যাজিস্ট্রেট ও কমিশনার সদরঘাটে টহল দিতে লাগলেন।

শহরে যারা একটু অবস্থাপন্ন তারা ঘরে গিয়ে দরজা জানলা আটকে চুপ করে বসে রইলো। অনেকে আবার বাড়ির উঠোনে টাকা-পয়সা বা অলংকার পুঁতে রাখলো। অবশ্য বেশীরভাগ লোকই ছুটোছুটি করছিল। আর দোকানীরা এই সুযোগে জিনিসপত্রের দাম অনেকগুণ বাড়িয়ে দিল। জুন মাসের ২৩ তারিখে বাইরে থেকে একদল নৌসেনা ঢাকায় এলে সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

নভেম্বরের ২৩ তারিখ পর্যন্ত শুধু 'ওরা আসছে, ওরা আসছে' করেই কেটে গেল। ইংরেজরা ইতিমধ্যে গড়ে তুললো একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। এ দলে ছিল ইংরেজ, আর্মানিয়ান ও শহরের বেশ কিছু লোকজন। তাদের প্ল্যান ছিল ২২ তারিখ রাতে হঠাৎ করে তোষাখানা বা ট্রেজারীর রক্ষীদের নিরস্ত্র করে স্বেচ্ছাসেবকরা তার ভার নেবে। অন্যদিকে নৌসেনারা লালবাগ দুর্গ অবরোধ করবে।

ইংরেজরা সব গুছিয়ে-টুছিয়ে কেল্লার সুবেদারকে ডেকে পাঠালো। বললো, তার সেনাদলকে যদি পেনসন দেওয়া হয় তাহলে তারা চাকরি ছেড়ে চলে যাবে কিনা। সুবেদার বললো, তার সঙ্গীদের সঙ্গে আলাপ করে সে জানাবে।

ইংরেজরা কিন্তু বিশ্বাসঘাতকের মত কাজ করলো। ঐ দিন রাতেই তারা অস্ত্র কেড়ে নিল তোষাখানাব রক্ষীদের, তারপর চললো লালবাগ কেল্লার দিকে। অন্যদিকে সিপাহীরা এ-ধরনের আক্রমণের কোন আশঙ্কাই করেনি। কেল্লার মধ্যে ঘুমোচ্ছিল তারা নিরুদ্বেগে। তাই ইংরেজরা যখন কেল্লা আক্রমণ করলো, তারা হতভম্ব হয়ে গেল। কিন্তু বিপদ দেখে সঙ্গে সঙ্গে তারা নিজেদের প্রস্তুত করে নিল। তাদের প্রত্যেকের কাছে ছিল মাত্র তখন দশ রাউণ্ড করে গুলি। তাই সিপাহীরা সুবেদারকে অনুরোধ জানালো অস্ত্রাগার খুলে দিতে। সুবাদার রাজী হলো না। সুবাদারের স্ত্রীও অনুরোধ জানালো। সুবাদার রাজী নয়। তা দশ রাউণ্ড গুলি দিয়ে আর কতোক্ষণ লড়াই করা যায়। কিছু সিপাহী নিহত হলো, কিছু পালালো, বাকীরা আত্মসমর্পণ করলো। ইংরেজরা এদের সবাইকে বন্দী করলো।

তার পরদিন আণ্টাঘর ময়দানে হাজির করা হলো বন্দী সিপাহীদের বিচারের জন্যে। আজকের বাহাদুর শাহ পার্কের (যা কয়েকদিন আগে পরিচিত ভিকটোরিয়া পার্ক নামে) নাম ছিল তখন আণ্টাঘর ময়দান। সেখানে সুবাদারসহ সবার বিচার হলো। সুবাদার জানালে, সে নির্দোষ। শুধু তাই নয়, সে অস্ত্রাগারের চাবি দেয়নি বলেই ঢাকা শহর রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু ইংরেজরা কি যুক্তি শোনে! তারা বললো, যেহেতু সুবাদার আগের দিন আত্মসমর্পণ করে নি তাই সে দোষী। সুতরাং সুবাদার, তার বউ, ও অন্যান্য সিপাহীদের আণ্টাঘর ময়দানেই ফাঁসী দেওয়া হলো। ব্রেনাণ্ড লিখেছেন, সব শুদ্ধ নাকি এগার জনকে ফাঁসী দেয়া হয়েছিলো। ঢাকার লোকজন এরপর আণ্টাঘর ময়দানের পাশ দিয়ে চলাফেরা করতে ভয় পেত।"

ঢাকার কথা/মুনতাসীর মামুন

সিপাহীবিদ্রোহ, ঢাকা। ২

"লালবাগ অঞ্চলের বৃদ্ধদের মুখে শুনেছি, তাঁদের ছেলেবেলায় তাঁদের দাদী-নানীদের মুখে এই কালা-ধলার লড়াইয়ের কাহিনী শুনতে শুনতে শিউরে উঠতেন। মৃত্যুপথের যাত্রী এই

জখমী মানুষগুলো যখন আকণ্ঠ তৃষ্ণায় ছটফট করতে করতে 'পানি', 'পানি' বলে চীৎকার করছিল. তাদেব সেই আর্তকণ্ঠ লালবাগের দেওয়ালে প্রতিহত হয়ে বাইরের মানুষের কানে গিয়ে পৌছেছিল। তাদের সেই আর্তনাদে কত মায়ের চোখে অশ্রু ঝরেছিল, কত ভাই বোনের প্রাণ রুদ্ধ আবেগে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল ! কিন্তু নির্মম সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের হিংস্র অনুচরের দল সেদিন পথ আটকে দাঁড়িয়েছিল। লালবাগের কালো মানুষ সেদিন তার কালো সিপাই ভাইদেব জন্য বিনিদ্র নয়নে ছটফট করে কাটিয়েছে।

সত্য মিথ্যা জানি না. লোকে বলাবলি করত, তারা স্বকর্ণে শুনেছে ! রাত্রি যখন গভীর হয়ে আসত. একটা নিঃসীম নিঃশব্দতার কালো পর্দা নেমে আসত ঘুমন্ত লালবাগে, মাঝে মাঝে আকস্মিক দমকা হাওযায় বুড়ীগঙ্গার পানিতে জেগে উঠত মর্মরিত বিলাপ, তখন ঠিক সেই সময় লালবাগেব ভাঙ্গা প্রাচীরের অন্তরাল থেকে কাদের করুণ কণ্ঠ ভেসে আসত: ভাইয়া. পানি দে। এ মায়ি, থোড়া পানি দে।

আজকাব ভিক্টোরিযা পার্ক রূপগরবিনী সুন্দরীর মত ফুলের হাসি হাসছে। পথচলতি মানুষ মুগ্ধ হয়ে তার দিকে তাকিযে থাকে। পুরানো ঢাকার সেই অতিপরিচিত আণ্টাঘরের ময়দান। আজ তার কত বর্ণ কত বিলাস ! কিন্তু এখনকার লোকেরা কি জানে, এই ফুলের হাসির অন্তরালে সে কি এক নিষ্ঠুর ও বীভৎস স্মৃতি বহন করে চলেছে ?

লালবাগের সেই খণ্ডযুদ্ধে যে-সব সিপাইরা বন্দী হয়েছিল, যে-সব পলাতকেরা ক্রমে ক্রমে ধরা পড়তে লাগল, তাদের সবাইকে সেদিন আণ্টাঘরের ময়দানে গাছের ডালে ডালে ফাঁসি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। ঢাকার কালো মানুষেরা আতঙ্কে চোখ বুজল। কোথায় ছিল তাদের বাড়ীঘর কে জানে ! কোথায় রইল তাদের বাপ-মা, ভাই বোন, স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা ! তাদের এই শেষ খবরটুকু কেই বা পৌছে দেবে তাদের কাছে !

দিনের পর দিন মৃতদেহগুলো ঝুলতে লাগল, পচে গলে পড়তে লাগল, শকুনেরা মহোৎসবে মেতে গেল ! ঢাকা শহরের মানুষের মনে আতঙ্ক ও বিভীষিকার সৃষ্টি করে আণ্টাঘরের ময়দানে ইংরাজ তার বিজয়োৎসব সম্পন্ন করল।

আণ্টাঘরের সেই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তখনকার দিনের ঢাকা শহরের একজন নাগরিক একটু উল্লেখ করে গেছেন। তাঁর নাম হৃদয়নাথ মজুমদার। তিনি তাঁর 'দি রেমিনিসেনস অব ঢাকা'-নামক বইটিতে লিখেছেন:

তাদের সব কজনাকে ফাঁসিতে ঝুলানো হোল। আণ্টাঘরের ময়দানে এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তার পর থেকে ঢাকার লোক এই জায়গাটাকে ভয়ের চোখে দেখত। বাঙ্গলাবাজার, শাঁখারীবাজার, কলতাবাজার এবং চারদিককার অন্যান্য মহল্লার লোকদের মধ্যে এ নিয়ে নানারকম গল্প চলতি ছিল। রাত্রিবেলা নিহত লোকদের প্রেতাত্মারা নাকি ময়দানে ঘুরে বেড়াত এবং সেখান থেকে নাকি আর্তনাদ ও নানারকম বিকট শব্দ শোনা যেত। লালবাগের খণ্ড যুদ্ধের পর অধিকাংশ সিপাই ঢাকা ছেড়ে তাদের হেড কোয়ার্টার জলপাইগুড়ির দিকে ছুটল। গভর্নমেণ্টের মতলব ছিল ঢাকার সিপাইদের ঢাকাতেই খতম করে দেওয়া, যাতে তারা অন্যত্র গিয়ে উপদ্রবের সৃষ্টি করতে না পারে। কিন্তু তাদের এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেল। জাহাজী গোরা সৈন্যদের নায়ক মিঃ লিউইস তাদের অবরোধ করেছিলেন, সত্য, কিন্তু অধিকাংশ সিপাই সেই বেড়া ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়ল এবং তাদের আগেকার পরিকল্পনা-অনুযায়ী তারা জলপাইগুড়ির দিকে যাত্রা করল।

ঢাকার বিদ্রোহী সিপাইরা জলপাইগুড়ির দিকে আসছে শুনে সরকারী মহলে 'সামাল', 'সামাল' রব পড়ে গেল। ভাগলপুরের কমিশনার ইউল সাহেব তাদের আটকাবার জন্য সসৈন্যে জলপাইগুড়ির দিকে যাত্রা করলেন। ঢাকার সিপাইরা তিস্তা নদী পার না হতেই ইউল সাহেব এসে তাদের ধরে ফেললেন। ইউল সাহেবের লক্ষ্য ছিল এরা যাতে কিছুতেই তিস্তা পার হতে না পারে। কিন্তু এদের আটকে রাখা সম্ভব হোল না। এরা অন্য পথ দিয়ে নদী পার হয়ে গেল। ইউল সাহেব তাদের পেছনে পেছনে ছুটলেন। সিপাইরা বৃটিশ এলাকা ছেড়ে নেপাল রাজ্যে গিয়ে ঢুকে পড়ল। কিন্তু সেখানে গিয়েও নিশ্চিন্ত হবার যো নেই। নেপালের জঙ্গ বাহাদুর ইংরাজদের পরম বন্ধু বা বিশ্বস্ত অনুচর হিসেবে বিদ্রোহকে দমন করবার জন্য তাঁর সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। ইউল সাহেব ঢাকার সিপাইদের শায়েস্তা করবার জন্য জঙ্গ বাহাদুরকে লিখে পাঠালেন।

জঙ্গ বাহাদুর এই কাজ হাসিল করবার জন্য রত্নমণি সিং নামে একজন নেপালী সেনাপতিকে আদেশ দিলেন। কিন্তু তাতে কোনই কাজ হোল না। সিপাইরা নেপালের অরণ্যময় পার্বত্য পথ দিয়ে এমন কৌশল করে অযোধ্যার উত্তর-পশ্চিমাংশে পালিয়ে গেল যে, ইংরাজ ও নেপালীরা বহু চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাদের ধরতে পারল না।"

মহাবিদ্রোহের কাহিনী /
সত্যেন সেন

আলালের ঘরের দুলাল

"বিশুদ্ধ সহজ বাঙ্গালায় সুন্দর গদ্য হয়, প্যারীচাঁদ মিত্র হইতে এইটী যে কেবল শিখিয়াছিলাম এমন নহে, শব্দের ছটা, ঘটা না করিয়া, সোজা কথাতেও যে অনুপ্রাস আসে, আমি তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আলালের ঘরের দুলালের আরম্ভ "বৈদ্যবাটীর বাবুরাম বাবু বড় বৈষয়িক ছিলেন", এ ত টেনে বুনে অনুপ্রাস নয়; শব্দের ঘটাছটায় মিলন নয়; সহজ কথা সহজে বলিতে গিয়া অনুপ্রাস হইয়াছে।

টেকচাঁদের সারল্যে মুগ্ধ হইয়াছিলাম বটে কিন্তু কেহ বলিয়া না দিলেও তাঁহার গ্রাম্য দোষ—তখন নাম টাম না জানিলেও— একটা দোষ বলিয়া বোধ হইয়াছিল। 'শ্যামের নাগাল পালাম না গো সই, —ওগো মরমেতে মরে রই,—টক-টক্-পটাস্-পটাস্, মিয়াজান গাড়োয়ান এক এক বার গান করিতেছে, টিটকারি দিতেছে ও শালার গরু চলতে পারে না বলে, লেজ মুচড়াইয়া সপাৎ সপাৎ মারিতেছে।" এই লেখা আমার আপনা হইতেই ভালো লাগে নাই। তাহার পর যখন পিতৃদেবের সঙ্গেতে ঐ অংশ পাঠ করিলাম, তিনি শুনিয়া উচ্চ হাস্য করিলেন। সেই একরূপ সমালোচন। আমি বুঝিলাম এরূপ লেখা প্রশংসনীয় নহে।"

পিতা-পুত্র /
অক্ষয়চন্দ্র সরকার/বঙ্গভাষার লেখক

ডেপুটিগিরি ও বঙ্কিম

"তাঁর বি. এ. পরীক্ষার ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই নবগঠিত বাংলা প্রেসিডেন্সীর লেফ্টেনান্ট-গভর্নর হ্যালিডে তাঁকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিয়োগের প্রস্তাব করেন। তখন এই পদের প্রতি শিক্ষিত বাঙালীর লোলুপ দৃষ্টি ছিল, কারণ এর চেয়ে উচ্চতর পদে নেটিভদের নিয়োগ

নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু বঙ্কিম হ্যালিডেকে বললেন যে তিনি পিতার সঙ্গে পরামর্শ করে ঐ পদে নিয়োগ সম্বন্ধে নিজের মতামত জানাবেন। পরে তিনি পিতার আদেশে নিজের ঘোরতর অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঐ কর্ম গ্রহণ করেন।... পিতৃভক্ত পুত্র আদেশ গ্রহণ করলেও তাঁর মনে দ্বিধা ছিল। তাই তিনি আইন পড়া ছাড়লেন না; ১৮৬৯ সালে বি. এল. পরীক্ষা পাস করলেন। হয়তো তিনি মনে করেছিলেন যে 'যদি কর্তৃপক্ষের সহিত মন কষাকষির দরুন চাকরি ছাড়িতে হয়, তবে জীবিকা নির্বাহের একটা পথ খোলা থাকিবে।' মন কষাকষি অনেকবার হইয়াছিল, কিন্তু বঙ্কিম চাকরি ছেড়ে ওকালতী করেন নি। হীরেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা একটি প্রবন্ধ (দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র) থেকে এর কারণ অনুমান করা যায়। বঙ্কিমের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে যুবক হীরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, তিনি একসঙ্গে ওকালতি এবং সাহিত্যচর্চা করবেন। বঙ্কিম উত্তর দিয়েছিলেন, 'আপনি বোধহয় কখনো জানেন না যে Law কিরূপ exacting mistress। বিশেষতঃ যে উকীলের সাহিত্যচর্চারূপ দুর্নাম রটে, মক্কেল তাঁহাকে দূর হইতে পরিহার করে।' তিনি দাসত্ব ঘৃণা করতেন, কিন্তু দশ বছর ডেপুটিগিরি করার পরে আর নতুন করে ওকালতী শুরু করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু যে চাকরি থেকে আর্থিক নিরাপত্তা ও সামাজিক মর্য্যাদা পাওয়া যায় তার সম্বন্ধেও বঙ্কিমের আজীবন বিরাগ ছিল। পরাধীনতার গ্লানি ছিল এই বিরাগের মূল। ঘটনাচক্র তাঁকে এ গ্লানিতে নিমজ্জিত করেছিল।"

বঙ্কিম সমীক্ষা /অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সিপাহি বিদ্রোহ ও ঢাকা

"এ বিষয়ে আমরা যে-সব উপাদান থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারি সেগুলি হল—

F. J. Halliday, *Minute by Lieutenant Governor of Bengal on the Mutineers as they effected the lower provinces, under the Government of Bengal*, Calcutta 1858.

Brennand, "Echoes of the Indian Mutiny at Dacca", *The Dacca Review*, Vol V and VI, Nos. VII and VIII, 1915.

Dacca News, Dacca, 1857-58

Hridaynath Mazumdar, *Reminiscences of Dacca*, Calcutta, 1926.

রেবতীমোহন দাস, 'আত্মকথা', ১৩৪১

১৮৫৭ সালের ঢাকার বিদ্রোহ সম্পর্কে সাধারণ যে ধারণা প্রচলিত ছিল, তা হল, শহরবাসীরা সিপাহী আক্রমণের আশঙ্কা করছিল এবং সিপাহীরাও মোটামুটিভাবে প্রস্তুত ছিল আক্রমণের জন্য। তারপর, প্রবল সংঘর্ষের পর, সিপাহীরা পরাজিত হয়ে পালিয়েছিল। যাদের বন্দী করা হয়েছিল, শাস্তি হিসেবে তাদের কয়েকজনের ফাঁসী হয়েছিল। এবং ইংরাজদের এই উদাহরণ, পূর্ববঙ্গে সব ধরনের বিদ্রোহের আশঙ্কা নির্মূল করেছিল। এ ধারণার উৎস কি এবং আদৌ তা ঠিক কিনা বিভিন্ন সূত্র বিচার করে এবার আমরা তা দেখব।

হ্যালিডে ছিলেন বাংলার লেফটেনান্ট গভর্নর। সরকারের পদস্থ প্রশাসনিক অফিসারদের রিপোর্টের মূলকথা ছিল পূর্ববঙ্গে সিপাহীদের আক্রমণের সম্ভাবনা ছিল এবং পূর্ববঙ্গবাসী এ নিয়ে ছিল আতঙ্কিত (অর্থাৎ ছিল তারা সরকারের পক্ষে)।

ব্রেনাণ্ড ছিলেন ঢাকা কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষ। দেশীয় অধিবাসীদের ঘৃণা করতেন তিনি এবং তাঁর রোজনামচার ছত্রে ছত্রে তা ফুটে উঠেছে।

'ঢাকা নিউজ' ছিল ঢাকা থেকে প্রকাশিত জমিদার, নীলকরদের পরিচালিত সংবাদপত্র, ঢাকার শিক্ষিতদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়াতে 'ঢাকা নিউজ' যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।...

শেষোক্ত দুটি সূত্র হল আত্মজীবনী।... বাংলা আত্মজীবনীকাররা নিজ সমাজে বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগ করেছিলেন এবং প্রতিপত্তিশালী ইংরেজদের পরিপ্রেক্ষিতে পালন করেছিলেন অধস্তন ভূমিকা, তাই আমরা দেখি, সমাজের আলোড়নকারী ঘটনাবলী সম্পর্কে অধিকাংশ সময়েই তারা নিশ্চুপ। মাঝে মাঝে যে এর ব্যতিক্রম হয় না তা' নয়, কিন্তু লুকাচের ভাষায়, তা হল সম্পূর্ণভাবে প্রাথমিক এবং উদ্দেশ্যবিহীন। তাদের মূল কাজই হয়ে দাঁড়ায়, নিজ সমাজের সত্যিকার প্রকৃতিকে আড়াল করা।

কিন্তু আত্মজীবনী অন্যভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। গোল্ডম্যান লিখেছেন, এই ধরনের রচনার অন্য একটি দিক আছে। তা' হল এর মাধ্যমে আমরা কিছু সামাজিক বৈশিষ্ট্য জানতে পারি। আমরা জানতে পারি লেখকের সামাজিক অবস্থান এবং ঐ অবস্থান নির্ধারণ করতে পারলে, একটা বিশেষ সময়ে, একটি বিশেষ সমাজে, একটি বিশেষ শ্রেণীর সামাজিক চালচলন, মূল্যবোধ আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠবে।

হৃদয়নাথ ছিলেন পেশায় উকিল। রেবতীমোহন সরকারী কর্মচারী যিনি ইংরেজদের কাছ থেকে উপাধি পেয়েছিলেন। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ সম্পর্কে স্বাভাবিক ভাবেই তিনি বিস্তৃত কোন বিবরণ রেখে যান নি। বিদ্রোহ তারা দেখেন নি তবে ছেলেবেলা বা যৌবনে এ সম্পর্কে যা শুনেছিলেন তাই নিজের মত করে লিখেছেন।...

'ঢাকা নিউজ' প্রায় একবছর ধরে বিদ্রোহ সম্পর্কে পাঠকদের অবহিত করেছিল। শুধু এ পত্রিকা অবলম্বন করে অগ্রসর হলে আমরা যে চিত্রটি পাই, তা হল, সিপাহীরা উত্তরভারতের ঘটনাবলী সম্পর্কে জানত এবং তারা আসন্ন বিপ্লবের জন্যে নিজেদের সংগঠিত করেছিল। শহরবাসীরা সিপাহীদের চালচলনে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল এবং সিপাহীদের সঙ্গে শহরবাসীদের মাঝে মাঝে সংঘর্ষ হচ্ছিল। শহরে ইংরেজদের পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, সিপাহীদের আক্রমণাত্মক মনোভাবের পরিচয় পেয়ে, লালবাগ দুর্গ আক্রমণ করে সিপাহীদের হটিয়ে দিয়েছিল এবং দোষীদের দিয়েছিল শাস্তি। বা অন্যকথায় এক ও দু নম্বর সূত্রের সঙ্গে 'ঢাকা নিউজ'-এর বক্তব্যের অমিল ছিল না।

পূর্বোল্লিখিত আলোচনা মনে রেখে বলতে পারি, ইংরেজদের মত হৃদয়নাথ লোকপরম্পরায় শ্রুত যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন, তাতে জানা যায়, সিপাহীদের সঙ্গে শহরবাসীর সম্পর্ক ভালই ছিল। এবং সিপাহীরা শহর আক্রমণের কোন প্রস্তুতিই নেয় নি। 'ঢাকা নিউজ'-এর সংবাদগুলি যাচাই করলে পরোক্ষভাবে এ মতই প্রচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। রেবতীমোহন লিখেছেন, ইংরেজরা যখন লালবাগ আক্রমণ করেছিল, তখন সিপাহীরা 'প্রাতকৃত্যাদি' সমাপনে ব্যস্ত ছিল। অর্থাৎ শহর আক্রমণের কোন পরিকল্পনাই তাদের ছিল না। শুধু তাই নয়, পূর্ববঙ্গের শহরবাসীদের বিরাট অংশ যে ইংরেজদের সহায়তা করেছিল এমন কোন তথ্য পাওয়া যায় নি। বরং, নিরীহ জনসাধারণের মনে আতঙ্ক সৃষ্টির জন্যে ইচ্ছে করে ঢাকায় নিরীহ কিছু সিপাহীকে ফাঁসী দেয়া হয়েছিল। এ মন্তব্য যে ঠিক তা বোঝা যাবে ব্রেনাণ্ডের উক্তিতে। ঢাকার সিপাহীদের ফাঁসী দেয়ার পর তিনি লিখেছিলেন, 'এ সময় এ ধরনের উদাহরণের একান্ত প্রয়োজন ছিল। এ ধরনের উদাহরণ সাধারণ মানুষের ওপর সৃষ্টি করে চমৎকার প্রতিক্রিয়ার। এখন নেটিভরা যেমন ভদ্র, আগে তাদের কখনও এমন দেখেছি বলে মনে হয় না।' "

উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র / মুনতাসীর মামুন

ব্যবহৃত বই

বঙ্কিম রচনাবলী ।। সাহিত্য সংসদ ।। সব কটি খণ্ড
বঙ্কিম-জীবনী ।। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বঙ্কিমচন্দ্র জীবনী ।। অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য
বঙ্কিমচন্দ্র ।। অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত
বঙ্কিমচন্দ্র ।। গোপালচন্দ্র রায়
অন্য এক বঙ্কিমচন্দ্র ।। গোপালচন্দ্র রায়
বঙ্কিম প্রসঙ্গ ।। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি -সম্পাদিত
কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র ।। সোমেন্দ্রনাথ বসু -সম্পাদিত
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবন চরিত ।। বঙ্কিমচন্দ্র ।। ভবতোষ দত্ত -সম্পাদিত
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ ।। দ্বিতীয় খণ্ড
ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ।। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
দ্বারকানাথ ঠাকুর ।। কৃষ্ণ কৃপালনী
ডিরোজিও ।। রমাপ্রসাদ দে -সম্পাদিত
রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ ।। শিবনাথ শাস্ত্রী
বাংলা দেশের ইতিহাস ।। রমেশচন্দ্র মজুমদার
সেকালের শিক্ষাগুরু ।। হারাধন দত্ত
সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র ।। সব কটি খণ্ড ।। বিনয় ঘোষ
সাহিত্য সাধক চরিতমালা ।। সব কটি খণ্ড ।।
রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত
রাজনারায়ণ বসু, জীবন ও সাহিত্য ।। অশ্রু কোলে
আত্মজীবনী ।। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
অক্ষয় চরিত ।। নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস
ডেভিড হেয়ার ।। প্যারীচাঁদ মিত্র
পুরাতন প্রসঙ্গ ।। বিপিনবিহারী গুপ্ত
আমার বাল্যকথা ।। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সমকালে বিদ্যাসাগর ।। স্বপন বসু
প্যারীচরণ সরকার ।। নবকৃষ্ণ ঘোষ
বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ।। বিনয় ঘোষ ।। সব কটি খণ্ড
মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত ।। যোগীন্দ্রনাথ বসু
মধুস্মৃতি ।। নগেন্দ্রনাথ সোম
আশার ছলনে ভুলি ।। গোলাম মুরশিদ

বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস ।। স্বপন বসু
জীবনস্মৃতি ।। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বেথুন স্মারকগ্রন্থ
বিদ্যাসাগর স্মারকগ্রন্থ ।। সম্পাদনা : আজহারউদ্দীন খান ও উৎপল চট্টোপাধ্যায়
বেথুন সোসাইটি ।। যোগেশচন্দ্র বাগল
বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্প ও সঙ্গীতের জগৎ ।। শ্যামলী চক্রবর্তী
হুগলী মহসিন কলেজ ।। সার্ধ শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ
রঙ্গলাল ।। মন্মথনাথ ঘোষ
হেমচন্দ্র ।। মন্মথনাথ ঘোষ
ভোলানাথ চন্দ্র ।। মন্মথনাথ ঘোষ
কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র ।। মন্মথনাথ ঘোষ
সেকালের কৃতী বাঙালী ।। মন্মথনাথ ঘোষ
মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ ।। মন্মথনাথ ঘোষ
সাংবাদিক কেশরী হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।। গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত
রাজেন্দ্রলাল মিত্র ।। অলোক রায়
আলেকজাণ্ডার ডাফ ও অনুগামী কয়েকজন ।। অলোক রায়
গিরিশচন্দ্র ।। অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
কলিকাতা দর্পণ ।। রাধারমণ মিত্র
কবিজীবনী ।। ভবতোষ দত্ত
সেকাল ও একাল ।। রাজনারায়ণ বসু
উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা ।। ডকটর ওয়াকিল আহমদ
ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস ।। সুপ্রকাশ রায়
তিন শতকের রিষড়া ।। কৃষ্ণগোপাল পাকড়াশী
মহাভারত ।। বুদ্ধদেব বসু
বঙ্কিমচন্দ্রের জমিদার ও কৃষক ।। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
সুবর্ণলেখা ।। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
উনিশ শতকের ইংরেজি সাহিত্যে বিপ্লবী ভারতের চিত্রকল্প ।। পল্লব সেনগুপ্ত
গণ অসন্তোষ ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ ।। স্বপন বসু
হুতোম প্যাঁচার নকশা ।। প্যারীচাঁদ মিত্র
প্রবন্ধ সংগ্রহ ।। গোপাল হালদার
বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব ।। রামগতি ন্যায়রত্ন
বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস ।। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্যারীচাঁদ মিত্র ।। নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
ঈশ্বরগুপ্ত : সাংবাদিক কবি ও গদ্যশিল্পী ।। রেণুপদ ঘোষ
চরিতকথা ।। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
বাঙলার শিক্ষক ।। প্রবীরগোপাল রায়
রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ।। মন্মথনাথ ঘোষ

মেদিনীপুরে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ।। হরিপদ মণ্ডল
বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও নানা প্রসঙ্গ ।। শঙ্করীপ্রসাদ বসু
বঙ্কিম সমীক্ষা ।। অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
রেভারেণ্ড লালবিহারী দে ও চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান ।। দেবীপদ ভট্টাচার্য
প্যারীচাঁদ মিত্র ও সমকালীন বাঙলা ।। শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ
উনিশ শতকের কবি রঙ্গলাল ।। অরুণা চট্টোপাধ্যায়
ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য ।। শিপ্রা লাহিড়ী
উনিশ শতকের বাংলায় বিজ্ঞান সাধনা ।। বিনয়ভূষণ রায়
উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ ।। সুশীলকুমার গুপ্ত
হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ ।। সুধীরকুমার মিত্র
বাংলা সাময়িক পত্র ।। ১ ও ২ খণ্ড ।। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
মাইকেল মধুসূদন দত্ত : জীবন ও সাহিত্য । সুরেশচন্দ্র মৈত্র
উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িক পত্র ।। মুনতাসীর মামুন
বাংলা চরিত সাহিত্য ।। দেবীপদ ভট্টাচার্য
মহাবিদ্রোহের কাহিনী ।। সত্যেন সেন
কারিগরি কল্পনা ও বাঙালি উদ্যোগ ।। সিদ্ধার্থ ঘোষ
সে যুগের রাজকর্মচারী বঙ্কিমচন্দ্র ।। সত্যব্রত তপাদার
বঙ্গভাষার লেখক
ঢাকার কথা ।। মুনতাসীর মামুন
The Artist in Chains || Sisir Kumar Das
History of Hoogly College || K. Zachariah
A Bengali Zaminder
The Men Who Ruled India || Philip Woodruff
Keshab Chandra Sen || Pratap Chandra Mazumdar
Hundred Years of Calcutta University
David Hare Bi-Centenary Volume 1
Krishnagar College Centenary Commemoration Volume
Europe Reconsidered || Tapan Raychaudhuri
Bethune College & School Centenary Volume
Bethune College Centenary Volume

ব্যবহৃত প্রবন্ধ

সমাজ বিজ্ঞানী জেমস্ লঙ ।। বিনয়ভূষণ রায় ।। শারদীয় এক্ষণ, ১৩৯৭
বঙ্কিমচন্দ্রেব জন্মবৃত্তান্ত ।। দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় ।। সচিত্র শিশির, ১৩৩১
পুরাতন হিন্দু কলেজের স্মৃতি ।। ভোলানাথ চন্দ্র ।। অনু. মৃদুলকান্তি বসু ।। এবং সেই সময়
বঙ্কিমচন্দ্রের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ।। উদয়ন ঘোষ ।। অনীক, বঙ্কিম মূল্যায়ন সংখ্যা
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
কলিকাতায় বিদ্যাসাগর ।। রাধারমণ মিত্র
মাতৃভাষা ও বঙ্কিমচন্দ্র ।। তপোবিজয় ঘোষ
বঙ্কিমচন্দ্র ।। অক্ষয়কুমার সরকার
নববার্ষিকী ।। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়
শহীদ সিধু মুর্মুর জবানবন্দী ।। অর্ণব মজুমদার ।। শারদীয় রানার, ১৪০০
বঙ্কিমচন্দ্র ।। নবীনচন্দ্র সেন
বঙ্কিমচন্দ্র ও কলকাতা ।। স্বপন বসু
মহাবিদ্রোহের ঐতিহাসিক শশিভূষণ চৌধুরী ।। রঞ্জিত সেন ।। ইতিহাস পত্রিকা
একজন ইংরেজ কবি ও একটি ভারতীয় বিদ্রোহ ।। গৌতম রায় ।। আনন্দবাজার পত্রিকা
পিতৃস্মৃতি ।। সৌদামিনী দেবী
পিতাপুত্র ।। অক্ষয়চন্দ্র সরকার
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েট ।। দিনেশচন্দ্র সিংহ ।। দেশ
বঙ্কিমচন্দ্রের সংস্কৃত শিক্ষায় টোল ও তাঁর গুরু ।। শ্যামলী চক্রবর্তী ।। উদীচী
ডেভিড হেয়ারের স্টাচু ।। কমল সরকার ।। আনন্দবাজার পত্রিকা
দ্বারকানাথ অধিকারীর 'সুধীরঞ্জন' ।। দেশ
কবি কাশীপ্রসাদ ঘোষ ও মাইকেল মধুসূদনের স্মৃতিচর্চা প্রসঙ্গে ।। মুরারি ঘোষ ।। শ্লোক
জর্জ টমসন ও বাংলায় দলীয় রাজনীতির সূচনা ।। সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
বঙ্কিমচন্দ্র ও কলকাতা ।। স্বপন বসু ।। কলকাতা পুরশ্রী
সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়ক সিধু ।। স্বপন বসু ।। দেশ
বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান : পথিকৃৎ অক্ষয়কুমার দত্ত ।। অসীম মুখোপাধ্যায় ।। চতুরঙ্গ
কোলসওয়ার্দি গ্রান্ট ।। বিনয় ঘোষ ।। শারদীয়া অমৃত, ১৩৬৮
নারী সাম্য ও বঙ্কিমচন্দ্র ।। অশোক মিত্র ।। দেশ
বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ ।। পরমেশ আচার্য ।। শারদীয় অনুষ্টুপ, ১৩৯১

নির্দেশিকা

অকল্যাণ্ড, লর্ড, গভর্নর ৩৪, ৩৮, ৩৯, ৪৭, ৫৩, ৫৫
অক্ষয়কুমার ঘোষ ৫৬
অক্ষয়কুমার দত্ত ২৪, ৪০, ৪৬, ৪৭, ৬৮, ৭২, ৭৪, ৯২, ১০৭, ১০৮, ১৪৪, ১৫০, ১৭০-৭১, ১৯৪, ২২৪, ২৪৬, ২৫৪, ২৫৮, ২৬৫, ২৭৬, ২৭৭, ২৮৮, ৩৩৩, ৩৪৩, ৩৬৪
—'ধর্মনীতি' ২৮৮, 'পদার্থবিদ্যা' ২৮৮
অক্ষয়চন্দ্র সরকার ২০, ২২, ৪৪, ১০৪, ১২৫, ১৬৫, ১৭২, ১৮৩, ২১৩, ২৭৪, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৯৮, ৩১৬, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৫৫
—'বঙ্কিমচন্দ্র' ১৭৫, "পিতা-পুত্র" ৩৫৮
অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ১৪৩
'অক্ষয়-চরিত' ৭৪, ১৯৪, ২৬৫
অঘোরনাথ গুপ্ত ৪৭
অঘোরনাথ চক্রবর্তী, সঙ্গীতরত্নাকর ১৮৯
অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৪৩
অজিতকুমার চক্রবর্তী ৩৩৭
অতুলকৃষ্ণ মিত্র ৩৩৪
অদ্বৈতচরণ আঢ্য ৪৭, ৮৮, ১৫৫, ২৪৫, ২৫৮, ৩৫২
অদ্বৈতচরণ মল্লিক ১৮৯
অধীরলাল সেন ২৬১
অনঙ্গমোহন মিত্র ১৯৪
অনুশীলন সমিতি ২৩৫
অন্নদাপ্রসাদ বাগচী ১০৭, ১৩৩, ১৫১
'অন্নদামঙ্গল' ১০৬, ১৯০, (সচিত্র সংস্করণ) ২৫৭
অপূর্বকৃষ্ণ বাহাদুর ৯২
'অবসথী' ১৮
অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ২৩৪
অভয়াচরণ তর্কপঞ্চানন ২৪৩, ২৪৪, ২৫৫
অভয়াচরণ দত্ত ১০৮
অভয়াচরণ মিত্র ২৮
অভয়াচরণ মুখোপাধ্যায় ১৪৭
'অমরকোষ' ২৫৮
অমর সিংহ ২৫৮
অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য ৩৪৯
অমিত্রাক্ষর ছন্দ ১১৪
'অমৃতবাজার পত্রিকা' ৪২, ১১১
অমৃতলাল বসু ২২৮-২৯, ২৫৮
অম্বিকাচরণ গুপ্ত ৩৫৬
অম্বিকাচরণ ঘোষ ২৪১
অম্বিকাচরণ মজুমদার ১৫০
অযোধ্যানাথ পাকড়াশী ২৬৭
'অরুণোদয়' ২৯৪
অর্ণব মজুমদার ২৬৫
অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী ১৪৪
অলকাসুন্দরী ২৮, ২৯
অলোক রায় ২২৭
অশ্বিনীকুমার দত্ত ২৮৮
অস্ত্র-শস্ত্র রেজিস্ট্রি আইন ৩২৭-২৮

'আঞ্জুমান ইসলামী' (মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন) ২৬২-৬৪
'আত্মজীবনী' (দেবেন্দ্রনাথ) ৪৪, ৭২, ৭৪, ৭৫, ৯০, ৯৮, ১৯৪, ৩৩৩
"আত্মবিলাপ" ২৭৮, ২৭৯
আত্মীয় সভা ১৭, ১৯৪, ২২১
আদিশূর ১৯
আনন্দকিশোর গোস্বামী ৪৭
আনন্দচন্দ্র মিত্র ২৪৫
আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৯৩
আনন্দ পাল ২৭
'আনন্দমঠ' ২৩, ১১৩-১৪, ১৫৯, ১৬২, ১৬৪, ২২০, ৩৪৪
আনন্দমোহন বসু ১১০
আনন্দমোহিনী দেবী (সতী) ১৯, ২২
আণ্ডারসন, জন ২৮২
আপকার, এ. সেথ ৩৫৩
আফগান যুদ্ধ ২৪
আবদুল জব্বার ২৬২
আবদুল লতিফ ২৬২
আবদুল লতিফ খাঁ ৯৫, ১৩৩, ১৯৩, ২২৪, ২৩৩, ২৮১
আবদুল হামিদ ২৬২

আবদুস সামাদ ২৬২
আমহার্স্ট, লর্ড ২১৫
'আমার বাল্যকথা' ৯৭
আমির আলী ১২৫
'আয়ুর্বেদ দর্পণঃ' ৪৪
আর্চডিকন, ডেয়ালট্রি ৬৭
আর্কডিকন, বিশপ ৪৮
আর্ট স্টুডিও, প্রথম (ছাত্র: দিননাথ দাস, নবীনচন্দ্র ঘোষ, হীরালাল দাস, তিনকড়ি মজুমদার) ৩৫৬
'আলালের ঘরের দুলাল' ৪৬, ২৫২, ২৬১, ২৭৭, ৩০৪, ৩০৫, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৫৫ ৩৫৬
—ইংরেজি অনুবাদ ৩৫৬
আলিপুর পশুশালা (মল্লিকস হাউস) ৩২৭
'আশার ছলনে ভূলি' ১১৯, ১৮০
আশুতোষ চৌধুরী ৩১৭
আশুতোষ দেব (সাতুবাবু) ৯২, ১৩৪, ৩১৮, ৩৬৩
আসাম কোম্পানি, লন্ডন ৩৮
অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন ১৭, ২৯৭
অ্যাডাম ৩২
অ্যালবার্ট, যুবরাজ ৫৯
অ্যালেন, মিঃ ২৪৭

ইংরেজি স্বরলিপি-পদ্ধতি ৫১
'ইংলিশম্যান' ৩১, ৫০, ২১২, ২২৬, ২২৭, ৩১৮, ৩৩১
ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি অব এডিনবরা ৬০
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ৫৮, ১০৭
ইডেন, আশলি ১৯০
ইডেন, এমিলি ৪৭
'ইতিহাস' পত্রিকা ৩১২
'ইন্ডিয়া গেজেট' ৭২, ২৫১
ইন্ডিয়ান জেনারেল স্টীম নেভিগেশন কোম্পানি ৮৫
'ইন্ডিয়ান ফিল্ড' ১৭০-৭১, ৩৫৩, ৩৬০
'ইন্ডিয়ান মিরর' ৬৮, ১১১, ২৩০
'ইন্ডিয়ান সন' ১০০
'ইন্দিরা' ৮১
'ইন্দিরা গান্ধী'
—'এমার্জেন্সি' ৩৩৬
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পঞ্চানন্দ, পাঁচুঠাকুর) ১৩২, ১৭২
"ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়" ২৮২
ইনস্টিট্যুট-ডি-ফ্রান্স ৯৭
ইমস, মি. ৪৮
ইমামবারা ১২৩-২৪
ইয়ং, গর্ডন ৩৩০-৩১, ৩৫৮
'ইয়ং বেঙ্গল' ১৭, ২৪, ২৮, ৩৩, ৪৩, ১৩৯, ১৬৮, ১৯০, ১৯১, ২৯০
'ইলাসট্রেটেড লন্ডন নিউজ' ১৭৯
ইলিয়াস, আর. টি. ৪৮
'ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ ও তড়িৎ বার্তাবহ প্রকরণ' ২৫৮
'ইস্ট', ঢাকা ২৮৭
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ২৪, ২৩২, ৩৫২

ঈশানচন্দ্র দত্ত ১১৯
ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৫, ১৫০, ১৮৭, ১৯৯, ২১১, ২১২-১৩, ২৮০
ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই) ২৯১
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮, ৩৮, ৪০, ৬৮, ৭৩, ১০০, ১১২-১৩, ১১৪, ১৩৩, ১৫৪ (বেথুন সাহেবের মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপক কবিতা), ১৫৭, ১৮৮, ১৯২, ১৯৩, ১৯৭, ২৪২ (দ্বারকানাথ অধিকারীর মৃত্যুতে "শোকোচ্ছ্বাস" কবিতা), ২৫৭, ২৭১, ২৭২, ২৭৩, ২৭৫, ২৮৫, ২৯৩-৯৪ (বিধবা বিবাহ আইন পাস বিষয়ে কবিতা), ৩৫৩, ৩৫৫, ৩৬৩
"ঈশ্বরগুপ্তের জীবনচরিত" ২৪২
'ঈশ্বরগুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব' ২০১, ২৪০, ২৫৭
ঈশ্বরচন্দ্র পাল ২৬
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ২৬, ৩৫, ৩৭, ৩৮, ৪৩, ৪৯, ৪৯-৫০ (সংস্কৃত কলেজের প্রশংসাপত্র), ৬৫, ৮৭, ৮৮, ৯৩, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০১, ১০৩, ১০৫, ১০৮ (সংস্কৃত কলেজ থেকে পদত্যাগ), ১০৯-১০ (পদত্যাগের কারণ), ১১৭, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৮ ('জীবনচরিত', 'বাসুদেব

চরিত'), ১৪৭, ১৪৯ (সংস্কৃত কলেজে প্রত্যাবর্তন), ১৫১, ১৬৫, ১৭২, ১৭৩, ১৯০, ১৯১, ১৯৩, ২১৭, ২১৮, ২২৩ (বীরসিংহ গ্রামে অবৈতনিক বিদ্যালয়), ২২৪, ২২৬, ২২৮, ২২৯, ২৩০, ২৩১-৩২, ২৩৩-৩৪ (বিদ্যাসাগর-ব্যালান্টাইন বিরোধ), ২৩৫, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৯, ২৫০, ২৫৩, ২৫৭, ২৫৯-৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৭, ২৬৮, ২৮৮, ২৮৯, ২৯৩, ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮, ৩০৩, ৩০৪, ৩০৬, ৩১৬, ৩৩০, ৩৩২, ৩৩৪, ৩৫০, ৩৫৫, ৩৫৭, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬৪, ৩৭১

—১৮৪৭ থেকে ১৮৫৬ পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থরাজি ২৭৭

—হুগলিতে বালিকা বিদ্যালয় ৩৩৪

—সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে ইস্তফা পত্র ৩৬৬-৬৭

ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র ২৫৪

ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ৩৫৩, ৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৪

উইলবারফোর্স, বাউ উইলিয়াম ৮৬

উইলসন, বিশপ ৩৩

উইলসন, হোরেস হেম্যান ১৭৭

উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়, উত্তরপাড়া ৯৬

উড, স্যর চার্লস ২৫০

উড্রো, আর. এইচ. ২৪৬

উত্তরপাড়া কলেজ ৩৩

উত্তরপাড়া বালিকা বিদ্যালয় ১৪৩

উদয়চরণ আঢ্য ৩৩, ২৯০

উদয়চাঁদ আঢ্য ২৭

উদ্যানবিদ্যাশিক্ষার স্কুল, বোটানিক্যাল গার্ডেন ১১০

'উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা' ২৬৪

'উপদেশ কথা' ৪১

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ১০৭

উপেন্দ্রনাথ সেন ১৮৯

উমাকান্ত ভট্টাচার্য ১০৩

উমাচরণ নন্দী ২৯১

উমাচরণ ভদ্র ১১০

উমাচরণ শেঠ ৩৪

উমাশঙ্কর সেন ৩১৬

উমেশচন্দ্র দত্ত ৪৫, ২১১, ২৪১, ৩৬১

উমেশচন্দ্র দত্তগুপ্ত ৩৫, ১৩২, (লাইব্রেরি স্বর্ণপদক) ১৪৫, ১৫১

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৭, ৯১, ৯৩.

উমেশচন্দ্র মল্লিক ২২৩

উমেশচন্দ্র শূর ১৪২, ১৫০

'ঋগ্বেদ' (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর -অনূদিত) ১১৮

'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র' ৭৭, ৭৮, ৭৯, ১২২, ১৮০

'এ ডিকসনারি অব ইংলিস ল্যাংগুয়েজ উইথ ইংলিস ডেফিনেশন অ্যান্ড এ বেঙ্গলি ইনটারপ্রিটেশন' ২৪৫

'এ বেঙ্গলি জমিন্দার' ২৮৪-৮৫

'এ ম্যাটার অব অনার' ৩১০-১১

'এক্ষণ' শারদীয় ৪৮

এগ্রি-কালচারাল অ্যান্ড হর্টি-কালচারাল সোসাইটি ৩৬, ৭০, ১৩১

এঙ্গেলস

—কার্ল মার্ক্‌সকে সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে পত্র ৩৩৪

এডুকেশন কাউন্সিল ৩৪, ১১৮

'এডুকেশন গেজেট' ২৯৩, ৩৫৪, ৩৭১

'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ' ২৩৭

এডুকেশন 'ডেসপ্যাচ' ২৫০-৫১

'এনকোয়ারার' ২৮৮

এমিলিয়া হেনরিয়েটা সোফিয়া ২৬৮

এলফিনস্টোন ৯৬

এলিয়ট ২৮০

এলিয়ট, রবার্ট ১৭৭

—'Views in India. China, and on the Shores of the Red Sea' ১৭৭

এশিয়াটিক সোসাইটি ১০০, ১০৫, ১৫৬, ২৪৫, ২৮৯, ২৯০, ৩১৫

ঐতিহাসিক বিদ্যুৎ সমাচার ১৫০

ওথেলো নাটক ১১৯

ওয়াইজ, অধ্যক্ষ ১২৫

ওয়াকিল আহমেদ ২৬৪

ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন ১০০, ২৯০
ওয়ার্ডসওয়ার্থ ৬০, ১৮০
ওয়েঙ্গার, পাদরি ১১৭, ২৫৭
ওরম, এমিলি ৬৫
ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার ২৩৪
-এ 'ওথেলো' অভিনয় ২৩৪
-এ 'মার্চেণ্ট অব ভেনিস' অভিনয় ২৪৭, ২৪৮
-এ 'চতুর্থ হেনরি' অভিনয় ২৬১
ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি ৪৭, ৭০, ৮৯, ১১৮, ২৩৪
ওল্ড মিশন চার্চ ৬৭
ও'শানেসি ১৫০

ককতো ৩০৩
'কপালকুণ্ডলা' ২৩, ৮১, ১১৪, ১৬১, ১৮২, ৩৪৪
-র প্রত্যেক পরিচ্ছেদে ব্যবহৃত উদ্ধৃতি ১৮২
কবিকঙ্কণ ১৪৩
'কবিতা কুসুমাবলী' ২৮
'কবিতাপুস্তক' ২৮০
'কবিতাবলী' ২৯৩
'কবিবর ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত' ২৫৫-৫৬
কমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ২৯১, ২৯৬
কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ ২১৯
কমল সরকার
—"বাঙালীর আদি চিত্রশালা" ৩৫৬
'কমলাকান্ত' ৩৪৪
কমলাকান্ত গুপ্ত ১৩৬
করবাইন. ডঃ ৪৮
করবিন, ফ্রেডারিক ৩৭
কর্পোরেল গ্রেভ্স ১২৫
'কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র' ৩৬০
কলকাতা পশুশালা ১৪৪
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২৩৮, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৬, ৩৪৭
—প্রতিষ্ঠা ৩১৯
—প্রথম গ্র্যাজুয়েট ৩৪৮
—প্রথম বি. এ. পরীক্ষা (এপ্রিল ১৮৫৮) ৩০৯
—বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৩৩৫
—বি. এ পরীক্ষার বিবরণ ৩৩৮-৩৯
—শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ ৩৩৯
—সমাবর্তন উৎসবের (টাউন হলে) খবর ৩৪৬-৪৭
—সেনেটকে আর্টস, ল. মেডিসিন আর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভাগ ৩১৮
কলকাতা মাদ্রাসা ৭৩, ১২০, ১৩৩, ২২৮, ২৩৩
কলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় ২৩৮
'কলকাতার ইতিহাস' ৮৪
'কলকাতার রথচাইল্ড' ৮৪
কলকাতার রাস্তায় গ্যাসের আলো ৩২৭
কলভিন, জে. আর. ২২৮, ২৩৩
কলভিল (কোলভিল), উইলিয়ম জেমস্ ১১১, ২৪৯, ২৬৭, ৩৪৭
'কলিকাতা দর্পণ' ২৫১
'কলিকাতা বার্তাবহ' ৩৫৮
'কলিকাতায় বিদ্যাসাগর' ৮৯
'কলিকাতার ইতিবৃত্ত' ১৫১
'কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র' ৬৯
'কলেজ পাঠশালা' ৪২
কাউন্সিল অব এডুকেশন ৫৩, ৬২, ৯১, ১২৫, ১৩২, ১৬৬
কাজী অল-কুজ্জাত ২৬২
কাজী আবদুল বারি ২৬২
কাজী ফজলুর রহমান ২৬২
'কাদম্বরী' ২৪৬
'কাদম্বরী' অবলম্বনে 'মহাশ্বেতা' ৩৩১
কাদম্বিনী দেবী (গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা) ২৫৪
কানাইলাল দে সরকার ১৩২
কানু মুর্মু ২৬৪
কায়কোবাদ (মোহাম্মেদ কাজেম আলী কোরেশী) ৩৫৭
কার-ঠাকুর কোম্পানি ৫৮, ৭৫, ১১৮
কার্ক পেট্রিক ১১৯, ২৯৫
কার্ল মার্কস
—সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে চিঠি ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩২

কালাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৬, ২৯১
কালিকাদাস দত্ত ৪৭
কালিদাস ২৭১
কালিদাস বিদ্যাবাগীশ ১০৭
কালিদাস মৈত্র ১৯০, ২৪৫, ২৫৮
কালীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় ৩৯
'কালীকীর্তন' ২৫৫
কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ৯২, ১০৭, ১৩৪, ১৫৫
কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী ১৪৯, ২০৩, ২০৬-০৭, ২২৭, ২৮২
কালীচরণ শর্মা ২২৩
কালীপ্রসন্ন ঘোষ ৩৬, ৭৩
কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, সংগীতজ্ঞ ৫১, ৩৫৩
কালীপ্রসন্ন সিংহ ৪৩, ৯৫, ২২৩, ২৩০, ২৩১, ('বাবু' নাটক) ২৪৫, ২৫১, ২৬৮ ('বাবু' নাটক), ২৯১, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬, ৩২৩, ৩৩১, ৩৫৩, ৩৬১
'কালেজীয় কবিতাযুদ্ধ' ১৮৫, ২০৫, ২১৩-১৪, ২২৭, ২৩৬, ২৩৮-৩৯ (সন্ধিপত্র), ২৭৫, ৩৪৫, ৩৪৬
কাশীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ৯৩
কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৯-২০, ২২
কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ১০৯, ১৫৬
কাশীনাথ তর্কভূষণ ২৪৪
কাশীনাথ বসু ৯২
কাশীপ্রসাদ ঘোষ ৯২, ৯৮, ১০৪, ১৩২, ১৩৩, ১৭৬-৭৭, ১৮০, ২২৫, ২৫৭, ২৫৯, ২৬৬
—"বোটম্যান'স সঙ টু গঙ্গা" ১৭৬
—"দি স্টর্ম অ্যান্ড দি বেন" ১৭৬
—'ইন্ডিয়ান বার্ড'—কাশীপ্রসাদের ছবি ১৭৭
কাশীরাম দাস ১৮
কাশীরাম দাসের মহাভারত ৯৯
কাশীশ্বর দাশ ৪৯
'কিরাতার্জুনীয়ম্' ২২৪
কিশোরীচাঁদ মিত্র ৫২, ৬১, ৬৮, ৭২, ৭৩, ৮৭, ৯২, ৯৯, ১১৮, ১৩৯, ১৭০-৭১, ১৮৯, ২১৭, ২৪৫, ২৪৭, ২৫০, ২৫৪, ২৮৮, ২৮৯, ২৯৩, ৩২২, ৩৫৩, ৩৫৮, ৩৬০, (কর্মচ্যুত) ৩৬৮, ৩৭১
-র পদচ্যুতি নিয়ে লালবিহারী দে-র 'অরুণোদয়' পত্রিকায় 'রচনা' ৩৭১
কীট্‌স ১৮০
'কীর্তিবিলাস' ১৯০
কুইলার পেরী ১২৩
কুঞ্জলাল নাগ ৩৫৬
কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ২২৬
কুন্দবালা (মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কন্যা) ১৩৪
কুপার ১২৫
কুমুদনাথ চৌধুরী ৩১৭
কুমুদিনী দেবী (গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা) ২৫৪
'কুরুক্ষেত্র' ৩৪৪
কুলি-চালান ৩৩
কুলি-ব্যবসা নিরোধ ৯২
'কুলীনকুলসর্বস্ব' ২০৪, ২৪৫, ৩১৯
—নাটকাভিনয় ৩২১, ৩৬০, ৩৬১-৬২
—বিষয়ে কবিতা 'সংবাদ প্রভাকরে' ৩৬০
'কুসুমাবলী' ১৯০
কৃত্তিবাস ১৮
কৃত্তিবাসী রামায়ণ ৯৯, ৩০৭
কৃষক বিদ্রোহ ২৫
কৃষি বিদ্যালয়, শিল্পবিদ্যালয়, বারাসাত ৯৬
কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ৯৯, ১১০, ১১৭, ১৬৬, ১৬৭, ২২৩, ২৩১, ২৪৬, ২৪৮, ২৯৮, ৩০৪, ৩০৭, ৩১৬, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪৮, ৩৫২, ৩৫৭, ৩৫৯, ৩৬৪
'কৃষ্ণকান্তের উইল' ৮১, ১২৮, ১৬২, ৩৪৪
কৃষ্ণকালী ঘোষ ২৯৬
কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী ২৫৯
কৃষ্ণকুমার বাগচী ৩১৭
কৃষ্ণকুমার মিত্র ১৯০, ১৯৪
কৃষ্ণ কৃপালনী ২৮, ৪৮, ৯০, ৯৩, ১০৩
কৃষ্ণগোপাল পাকড়াশী ২৯২
কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকার ১৪৬
কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ৩১৬
কৃষ্ণচন্দ্র রায় ৩০৮
'কৃষ্ণচরিত' ১১৬
কৃষ্ণদাস পাল ২৪, ২৬, ১০৪, ২২৩, ২২৭, ২৩০, ৩৫২
কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৮

কৃষ্ণনগর কলেজ ৪৭, (প্রতিষ্ঠা) ৯৩, ৯৪, ৯৬, ১৩২, ২১১
কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরি ৪৭
কৃষ্ণনগর রাজবাড়ি ২৫৭
কৃষ্ণনাথ রায়, রাজা ৪৪
কৃষ্ণপ্রাণ গঙ্গোপাধ্যায় ৮৫
কৃষ্ণবল্লভ চট্টোপাধ্যায় ১৯
কৃষ্ণবিহারী সেন ১১১
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৩২, ৩৮, ৪১, ৪৪, ৫৩, ৫৫, ৬৬, ৬৭-৬৮, ৭০, ৭২, ৭৩, ৮৪, ৮৬, ৮৯, ৯৬, ৯৭, ১০৫, ১০৬, ১১০, ১১১, ১১৭, ১৩৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৫২, ১৫৪, ১৬৯, ১৭১, ১৮৯, ১৯১, ২১৭, ২৬৮, ২৮৯, ৩০৭
কেদারনাথ দত্ত ৩৩, ২৬৭, ৩৬৪
কেরামত আলি ১২৫
কেলি ১২৫
কেশব আকাদেমি ২৭
কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (রঙ্গমঞ্চের 'গ্যারিক') ৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৪
কেশবচন্দ্র সেন ২৪, ২৭, ৩৪, ৮৬, ৮৯, ১০৭, ২২২, ২২৯, ২৩০, ২৪৫, ৩০৩, ৩৬৪
'কেশবচন্দ্র সেন' ৩১৭
কেষ্টা বসু ২২২
কৈলাসচন্দ্র ঘোষ ৩০৫
কৈলাসচন্দ্র দত্ত ২৮৯, ৩১৪, ৩১৫
—"এ জার্নাল অব ফর্টি-এইট আওয়ারস অব দি ইয়ার ১৮৪৫" ৩১৪
কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১, ২২৪
কৈলাসচন্দ্র বসু ১৪৬, ১৯১, ১৯২, ২২৭, ২৫৭, ২৫৮
কোর্ট অব ডাইরেক্টর্সকে আবেদন : মফস্বলবাসী ইংরেজদিগের ফৌজদারী আদালতের অধীন করা ৩২২-২৩
'কোর্ট জার্নাল', লন্ডন ৯৮
কৌলীন্য প্রথা ২৬১
'কৌস্তভকিরণ' ১৩৫
ক্যার, ই. এইচ. ৩২, ৭০, ১৪৫, ২৪৪
ক্যানিং, লর্ড ২০৪, ২৮৭, ৩২৬, ৩৩১-৩৩২
—ভারতসাম্রাজ্ঞী রূপে মহারানী ভিক্টোরিয়াকে ভারতের শাসনভার অর্পণ ৩৬৮
'ক্যাপটিভ লেডি' ১১৫, ২৩৭, ২৭৩, ৩৬৪
ক্যামেরন, সি. এইচ. ৫১, ৬২
'ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও' ১০৭
'ক্যালকাটা কুরিয়ার' ৪৩, ৪৭
'ক্যালকাটা গেজেট' ১১৮, ১২৩, ২৩৩
'ক্যালকাটা জার্নাল অব ন্যাচুরাল হিসট্রি' ১৭৯
ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি ৫৮, ১১৯
'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল' ১০৭, ১৩৪, ১৪৪-৪৫
'ক্যালকাটা মান্থলি ম্যাগাজিন' ৩৫২
'ক্যালকাটা য়ুনিভার্সিটি ম্যাগাজিন' ২৭৮
'ক্যালকাটা রিভিউ' ৫২, ২৫৭
'ক্যালকাটা লিটেরারি গেজেট' ৩১৪
ক্যালকাটা স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্টস ৩৫৬
ক্রাইস্ট চার্চ কলেজ ১৮৯
ক্রাইস্ট চার্চ গির্জা, হেদুয়া ৩৮
ক্রো, এম. ৭২
ক্লার্ক, এল. ৩৩
ক্লাসিক থিয়েটার ৮২
ক্রিন্জার, মিঃ ২২৮
ক্ষেত্রনাথ বসু ২২৩
ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ৫১, ৩৫৬, ৩৬৩, ৩৬৪
ক্ষেত্রমোহন জানা ৭৮, ৭৯
ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৩
ক্ষেত্রমোহন বসু ২৯৫
ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় ২৪৫
ক্ষেম বসু ৩৬

'খগোল' ২২১

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ২৫৭
গঙ্গাচরণ সরকার ১০৪, ১২৫, ১৬৫, ১৭২, ২৪৬, ২৮১-৮২
গঙ্গাচরণ সেন ৩৫৯
গঙ্গাধর তর্কবাগীশ ৬৫, ৮৯, ২৪৩, ২৫৫
গঙ্গাধর দে ২৫৯
গঙ্গাধর ভট্টাচার্য ৩৯
গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১৮, ১৯
গঙ্গামণি দেবী ৪২
'গণ অসন্তোষ ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ' ৩১১, ৩২০, ৩২৪-৩২৫

গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪৬, ২৫৪, ৩১৫, ৩৫৮
গণেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬৮
গদাধর শেঠ ৩৬০
'গদ্য পদ্য বা কবিতা পুস্তক' ২৭৩
গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্টস ৩৫৬
'গভর্নমেন্ট গেজেট' ৪৪
গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্ট ২৪৭
গারো বিদ্রোহ ২৫
'গার্হস্থ্য বাংলা পুস্তক সংগ্রহ' ১৪৮
'গার্হস্থ্য সাহিত্যসমাজ' ৩১৭
'গিরিশচন্দ্র' ২৩৪
গিরিশচন্দ্র কবিরত্ন ৮৪
গিরিশচন্দ্র ঘোষ ৮৫, ১০৪, ২২৬
গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৭
গিরিশচন্দ্র বসু ১২৫
গিরিশচন্দ্র বসু (বাংলাভাষায় উদ্ভিদ ও কৃষিবিদ্যাচর্চার অন্যতম পথিকৃৎ) ২৩৪
গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ৮৮, ৮৯, ১০৯, ১৫৬, ২৯৫
গিরীন্দ্রকুমার দত্ত (চৌধুরী) ৪৬
গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪৬, ৭৫, ৮৭, ৯১, ৯৩, ১০৮, ২৫৪
গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ৩৬৭
গিরীশচন্দ্র মজুমদার ৪৫
'গীতগোবিন্দ'-টীকা ১৯
গুডউইন, কর্নেল ২৪৬, ২৪৭
'গুডউইল ফ্রাটার্নিটি' ১০৭
গুডিভ, এইচ. এইচ. ৯০, ১০০, ১০২
গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০৮, ২৫৪, ৩০৭
গুরুচরণ মিত্র ১৯০, ১৯৪
গুরুচরণ রায় ২০৪
গুরুচরণ সিংহ ১৩৭, ১৪৬
গুরুদয়াল চৌধুরী ৪৪, ৩৬৩
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৫, ৩৪০
গোকুলচন্দ্র সেন ৩৬.
গোগারলি, মিঃ ৪৮
গোজলা গুই ২২২
গোপাল উড়ে ৪২, (মৃত্যু) ১০৭
গোপালচন্দ্র গুপ্ত ২১৫
গোপালচন্দ্র বিদ্যানিধি ২৪৪
গোপালচন্দ্র রায় ৬৩, ৬৪, ১২২, ১২৮, ৩৪৯, ৩৫০
গোপালচন্দ্র সরকার ১০১
গোপাল হালদার ৩৩৭
গোপীমোহন সেন ১০৮
'গোবিন্দ অধিকারী'-র গীত ২১
গোবিন্দচন্দ্র আঢ্য ৪৭
গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত ২৪৪
গোবিন্দচন্দ্র দত্ত ১৯১, ২৮৯
গোবিন্দচন্দ্র দাস, স্বভাবকবি ২৬০
গোবিন্দচন্দ্র দে ১৩৫
গোবিন্দচন্দ্র বসাক ৩৬
গোবিন্দচন্দ্র রায় ২৭
গোবিন্দচন্দ্র শিরোমণি ২১৫, ২৪৪, ২৫৫
গোবিন্দচন্দ্র সেন ৭২, ১১৭, ২৬৭
গোমেশ, মিঃ ১৫১
গোর, ডি. ক্যাপটেন ১০২
গোলাম ইয়াহিয়া ২৬২
গোলাম ইসহাক ২৬২
গোলাম মুরশিদ ১১৯, ১৮০
গোল্ডস্মিথ ২৪৫
গোল্ডস্মিথ ও পার্নেল
—'দি হারমিট' ৩৬১
গোষ্ঠবিহারী মল্লিক ৩১৭
গোঁসাইদাস গুপ্ত ৩০৮
গৌতম রায়
—"একজন ইংরেজ কবি ও একটি ভারতীয় বিদ্রোহ" ৩১৩
গৌরচাঁদ বসাক ১৯১
গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত ২২৭
গৌরদাস বসাক ৩৫, ৩৭, ৪৩, ৫২, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৮, ১১৮, ১৩৩. ১৩৫, ১৩৯, ২৫৪, ২৬৮, ২৭০
গৌরমোহন আঢ্য ৮৯, ১১৮
গৌরাঙ্গসুন্দর রায় ২৭
গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ১০১
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ৩৭, ৩৯, ৪৪, ১৯৩, ২৩৫, ২৫০, ২৫৭, ২৬৭
—'নীতিরত্ন' ২৫০
—'ভূগোলসার' ২৩৫
—'মহাভারত' ২৫৭

গ্রাণ্ট, কোলসওয়ার্দি ৩৭
গ্রাণ্ট, জর্জ ৩৭
গ্রাণ্ট, সার জন পিটার ৩৭, ৬৬, ৭০, ২৬৭, ৩৩২
গ্রাপেল, কর্নেল ডাবলিউ. ৩১৮
"গ্রাম্যকথা" ৬৪
গ্রীক সাহিত্যের 'Batrachomyomachia' ৩৫৪
'গ্রীসদেশের ইতিহাস' ৩১৬
গ্রে, মিঃ ৫৭
গ্রে, ডাবলিউ. ২৬৬
গ্রেগরি, এম. ১৯১
'গ্রেট ওয়েস্টার্ন অব বেঙ্গল' ৯১
গ্রেভস, জে. ১৮৭, ২৪৪
গ্লাডস্টোন ৯৪

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (বিদ্যাসাগরের জীবনীকার) ৩৫৬
চণ্ডীচরণ সেন ৮৯, ২৮৯
চণ্ডীদাস ১৮
'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' ২৭৯
'চন্দননগর সেমিনারী' ১০৬, ১২০
চন্দ্রকান্ত বাগচী ১৩৩
চন্দ্রনাথ বরাট ৩০৮
চন্দ্রনাথ বসু ৮৬
চন্দ্রমাধব ঘোষ ২৯
চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ৫৩
'চন্দ্রশেখর' ২৩, ১২৩, ১২৬, ১২৭, ১৩২, ১৬১, ২২০
চন্দ্রশেখর কর ৩৪৪
চন্দ্রশেখর দেব ৬৬, ৬৮, ৭২, ২৫৪
চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ১৩৭
'চমৎকার মোহন' বারত্রয়িক পত্রিকা ৩৬৪
'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' ১৬০
চাঁদ মুর্মু ২৬৪
চারুচন্দ্র রায় ২৮২
'চারুপাঠ' ২২৪, ২৪৬
'চার্চ অফ ইংলন্ড ম্যাগাজিন' ৫৯
চার্চ সোসাইটি স্কুল, মির্জাপুর ৪২
চার্লস, ডাঃ ৩৩
চিকিৎসাবিদ্যা, মাতৃভাষায় ৩৭-৩৮
চিন্তামণি সরকার ৩৫

চুকু মুর্মু ২৬৪
চুঁচুড়া সেমিনারি ৮৪
চেম্বার্স, ডাঃ ১০১
'চোরপঞ্চাশিক' ২৫৭

'ছুছুন্দরী বধ কাব্য' ৩৫৪
'ছোট কৈলাস ও বড় কৈলাস' ১৪৮

জগদীশচন্দ্র বসু ২৪৫
'জগদ্দীপক ভাস্কর' ১০০
জগদ্বন্ধু ভদ্র ৩৫৪
জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ১৯
জগন্মোহন শর্মা ২৬৪
জগবন্ধু ঘোষ ৯৪
'জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন' ১৩৭
জননারায়ণ সর্বাধিকারী ৩৬১
জনসন ১৩৯
জনসন, রেভারেন্ড ৬৯
জমিদার সভা ৭০
জয়কালী বসু ১৩৬
জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৩১, ৪৫, ৮৭, ৮৯, ১৪৩, ১৪৮, ১৫১, ১৫৬, ২৬৭
জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের জীবনী ২৮৪
জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ২৭, ৯৯, ১০১
জয়গোবিন্দ লাহা ২৩০
জয়দেব ১৮, ১১৩, ১১৪, ১৬৪
জয়নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ১৯
জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ১০৯
জয়নারায়ণ তর্কালংকার ৪৩
জয়পুর আর্ট স্কুল ১৮৯
জয়রাম ন্যায়ভূষণ ২১৯
'জামাইষষ্ঠী' ১৫৩, ১৮৫
'জার্নাল অব দি ন্যাশনাল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' ৩৫৬
জিন, সার রবার্ট ৭০
জুরী ব্যবস্থা ৩৩
জেঙ্কিনস, সি. ১১৮
জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইন্‌সটিটিউশন ৩২, ৪৩
জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন ১২৪
জোড়াসাঁকো নাট্যশালা ২৪৮
—তে 'জুলিয়াস সিজার' ২৪৮

জোওয়াদ ২৬২
জোন্‌স্ আর্নস্ট
—'দি রিভোল্ট অব হিন্দুস্থান অর দি নিউ ওয়ার্ল্ড' ৩১২
'জ্ঞানদর্শন' ১৫২
জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ১৪৭
'জ্ঞানপ্রদায়িনী সভা' ৩১৮
'জ্ঞানপ্রদীপ' ৪৪
'জ্ঞানান্বেষণ' ৩৯, ৪৩, ৫২, ১১৪, ১৫৭, ২৮৮
'জ্ঞানারুণোদয়' ১৯০
জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর ৯৯, ১৫২
জ্যাকেরিয়া, কে. ২৮১
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৪, ১৪৩
জ্যোতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২৩
জ্যোতিষ চৌধুরী ৩১৭

টমসন, জর্জ (লিবারাল নেতা) ২৪, ৬২, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭৩, ৭৪, ১৩১, ২৩২, ৩২২
টমাস মুর ৬২
টর্টন, মিঃ ১১১
টলস্টয়, লিও ১২৯, ১৬২-৬৩, ২৮১, ৩০৫
'টলস্টয় অব ডস্টয়ভস্কি' ৩০৫
টাইট অ্যাণ্ড ম্ল্যাক রোপ নাচ ৮৬
'টাইমস' লন্ডন ১০২
টিড, এফ. ৭৬, ৭৮, ৭৯
টেনিসন ১৮০
টেম্পল, রিচার্ড ১০৭
টেম্পারেন্স সোসাইটি ৪৯
টোলসন, ক্যাপ্টেন ২৬৬
'ট্রিবিউন', লাহোর ২৮৭
ট্রেভেলিয়ান ৩৭
ট্রোয়েট, হেনরি ১৬২

ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ২১৮
ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ১৫০

ডস্টয়ভস্কি ১২৯, ৩০৫
ডাকাটিকিটে লন, ভারতবর্ষে ২৫৩
ডাচেস অব ইনভেরনস ১০১
ডাফ, আলেকজান্ডার ১৭, ৩২, ৪২, ৪৩, ৪৮, ৬৮, ৭০, ১৩১, ১৫১, ২৫৭, ৩৩৯
ডাফ স্কুল ২৭
ডারবি, লর্ড ৩৬৫
ডিউক অফ ওয়েলিংটন ৫৯
ডিউক অফ কেমব্রিজ ৫৯
ডিকেন্স, টি. ৩০, ৩৩
ডিকেন্স, ব্যারিস্টার ৩৯
ডিক্রুজ ১২৫
ডিগবি, জন ১৭০
ডিবেটিং ক্লাব ২৩১
ডিরোজিও ১৭, ২৯, ৬৭, ১৮০, ২৬৯, ২৯৭, ২৯৮
—'দি হার্প অব ইন্ডিয়া' ২৬৯
'ডিরোজিও' (রমাপ্রসাদ দে সম্পাদিত) ২৯
"ডিরোজিও ও ইয়ং বেঙ্গল" ২৯
'ডিস্‌ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি' ২৮, ১১৭
ডেভিড হেয়ার একাডেমী ১৫৪, ২২৭-২৮
'ডোয়ার্কিন অ্যান্ড সন্স' ১০৭
ড্যাল, রেভারেন্ড ৭৩
ড্যালহৌসি, লর্ড ১১৮, ১৪৪-৪৫, ১৫০, ২৪৭, ২৫০
ড্রামন্ড, উইলিয়ম ১৭৬, ১৮১-৮২, ১৮৪
—এর মূল কবিতা ১৮০

ঢাকা কলেজ ২৭
'ঢাকা নিউজ' ২৮৮

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ৪৪, ৪৭, (প্রকাশ) ৭৪, ৯০, ৯১, ১১৮, ১৭১-৭২, ১৯৩, ২৪৪, ২৪৭, ২৫৯, ২৯৮
তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা ৪৪, ৭২, ৮৭
তত্ত্ববোধিনী সভা ৩৮, ৪০, ৪৪, ৪৭, ৪৯, ১০৩, ১০৮, ১১০, ২৯৭, ২৯৮, ৩৩৩
তত্ত্বরঞ্জিনী সভা ৩৮
তপোবিজয় ঘোষ ১৬৮, ২১৭
তরু দত্ত ২৮৯
তারকচন্দ্র চূড়ামণি ৩৬৮
তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৭৫, ১৩২, ২২৩
তারাচরণ গুহ ৩৬৪
তারাচরণ শিকদার ১৯০
তারাচাঁদ চক্রবর্তী ২৮, ২৯, ৫৩, ৫৫, ৬৬, ৬৭, ৭২, ৯২, ২১৭, ২৬৩
তারাচাঁদ বিদ্যারত্ন ২২০

তারাধন ভট্টাচার্য ৩৫৭
তারানাথ তর্কবাচস্পতি ৮৮, ১০৯, ১১০, ২৬৭, ৩৫৭
তারামণি দেবী ১৯
তারাশংকর কবিরত্ন ১৪৪, ১৪৮, ১৫০, ১৫৪, ১৫৬, ২৪৬, ২৬৪, ৩৫৩
তারাশংকর ভট্টাচার্য ১৩৫
তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮, ২৯, ৪৩
তিতুমীর ২৫, ২৯৭
তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় ৯৮
'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' ৪৬, ২৭৩
ত্রৈলোক্যনাথ দেব, কাঠখোদাই শিল্পী ১০৭
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ১০৭, ('ডমরুচরিত') ১৩৮

থাকমণি মিত্র ২৯৬
থিওবোল্ড, ডব্লু. ৭৩, ২৬১
থিয়েটারে ঐকতান বাদনের প্রচলন ৩৫৬
থোয়েট সাহেব ২৮১

দক্ষ ১৮, ১৯
দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ৩৬, ৪৩, ৪৪, ৬৬ (প্রথম রাজনৈতিক বক্তৃতা), ৬৭, ৭২, ১৪৪-৪৫, ১৪৮, ১৫০, ২১৭
দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি ২৫৮
'দফত বেওয়াকেয়ার্ত' ১০০
দাশরথি রায় (মৃত্যু) ১০৭, ৩১৫
'দি ইভানজেলিস্ট' ৬৫
'দি টেরর অব পাঞ্জাব' ২৮৭
'দি ব্রাদার্স কারামাজোভ' ৩০৫
দি ক্যালকাটা স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট ২৪৭
'দি ফক্স অ্যান্ড দি উল্‌ফ' ৮৬
'দি মর্নিং ক্রনিকল' ২৫৯, ২৬২
'দি সিটিজেন' ২৫১-৫২, ২৫৯
"দি স্পয়েল্ট চাইল্ড" ৩৫৬
'দিগদর্শন' ১৮৪
দিগম্বর বিশ্বাস ১২৫
দিগম্বর মিত্র ১৩১, ১৫৫, ২৫৪, ৩২২
দিগম্বরী দেবী ৩৬
দিননাথ মুখোপাধ্যায় ৩০৮
দিনেশচন্দ্র সিংহ ৩৪৮, ৩৪৯
দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮
দীনদয়াল (মগন দাস) ১৩৫
দীননাথ ঘোষ ৩৬৪
দীননাথ শর্মা ৩৩১
দীননাথ সান্যাল ৩১৬
দীননাথ সেন ৩৬
দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ২৬০
দীনবন্ধু মিত্র ১১৩, ১৫৩, ১৫৭, (প্রথম কবিতা প্রকাশ) ১৭৪, ('মানবচরিত্র' কবিতা প্রকাশ) ১৭৪, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৭, ১৮৮, ('বিজয় কামিনী' কবিতা প্রকাশ) ১৯৯-২০০, ২০১-০২, ২০৫-০৬, ২০৭-০৮, ২১৩-১৫, ২১৭, ২২৭, ২৩৬, ৩০৮, ৩২৭, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৬
—'দীনবন্ধু জীবনী' ৩৪৪
'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথাভ্রমণ' ৩১৬
দুর্গাচরণ দত্ত ৯২
দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১২০, ১৩২
দুর্গাচরণ লাহা ১৯২
দুর্গাদাস চৌধুরী ৩১৭
দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ ২৯
দুর্গামোহন দাশ ৪৯
দুর্গাসুন্দরী দেবী ১৯, ২৩
'দুর্গেশনন্দিনী' ৭৯, ৮২, ১৪১, ১৯৭, ৩০৪, ৩৪৮
'দূরবীক্ষণ' ১৪৬
'দূরবীণ' (ফারসি ভাষায়) ২৪৫
দেবীচরণ মুখোপাধ্যায় ৪৭
'দেবী চৌধুরানী' ২৩, ২৪, ১২৭, ১৬২, ২২০
দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী ২৪৬
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩৮, ৪৩, ৪৯, ৫৬, ৬৮, ৭২, ৭৩, (ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা) ৭৫, ৮৬, ৮৭, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৮, ৯৯, ১০৩, ১০৮, ১১০, ১১৮, ১৩৫, ১৪৬, ১৪৮, ১৫৫, ১৯১, ১৯৪, ২২৯, ২৪৭, ২৫৪, ২৬৭, ২৯৪, ২৯৭, ৩৫৮-৫৯, ৩৭০
—সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসুকে পত্র. ৩৩৩
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী (অজিতকুমার চক্রবর্তী) ৩৩৭

দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক ১৮৯, ২৩৫
দেবেন্দ্রনাথ সেন ৩৫৩
দেশে সামরিক আইন বিষয়ে গভর্নমেণ্টকে পত্র ৩২৯-৩১
দ্বারকানাথ অধিকারী ১৫৭, (প্রথম কবিতা "তত্ত্বপ্রকরণ" প্রকাশ) ১৮৫, ('সত্যবতীর সহিত পাপিনীর বিবাদ' প্রকাশ) ২০০, ২০২, ২০৫, ২০৬, ২১৪, ২৩৮-৪০, ২৪২, ২৭২, ৩০৮
দ্বারকানাথ অধিকারী বনাম দীনবন্ধু মিত্র ২৭৫
দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৮৫, ২১৮
দ্বারকানাথ গুপ্ত (ডি. গুপ্ত) ২৭, ৩৪
দ্বারকানাথ ঘোষ ১০৭
দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৮, ২২, ২৪, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪২, ৪৪, ৪৭, ৪৯, ৫০, ৫২, ৫৩-৬২, ৭০, ৭১, ৭২-৭৩, ৭৫, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯৩, ৯৪, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১১৮, ১৩১, ১৩৯, ২৫৪, ২৫৮, ৩৬৩, ৩৬৮
'দ্বারকানাথ ঠাকুর' জীবনী ২৮, ৪৮, ৫৪
দ্বারকানাথ তর্কচূড়ামণি ৭৫
দ্বারকানাথ বসু ৯১
দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ৮৪, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ১০৯, ১৩৫, ১৬৯, ২৬৪, ২৬৮, ২৮৮, ৩১৬, ৩৭১
দ্বারকানাথ মল্লিক ৩৬৪
দ্বারকানাথ মিত্র ১২৫, ১৬৫, ১৭৯, ২২৬
দ্বারিকানাথ রায় ২৩১
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪৩, ১০৭-১০৮, ৩৫৮
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১২৫, ২৮২, ৩৪৪

'ধর্মতত্ত্ব' ১১৬
ধর্মদাস দত্ত ৩৬
ধর্মদাস মুখোপাধ্যায় ৩৯
'ধর্মসভা' ১৭, ৯১, ৯৫, ১১৮
ধর্মাধর্ম প্রকাশিকা সভা ২৬০
'ধর্মোন্নতিস..ধন বিষয়ক প্রস্তাব' ২৫৮
"ধীর সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী" ১৬৪
'ধ্রুবতারা' ৩৪৪

নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস ৭৪, ১৯৪, ২৬৫
নকুল চট্টোপাধ্যায় ১৯
নগেন্দ্রচন্দ্র সোম
—'মধুস্মৃতি' ৩৬৬
নগেন্দ্রনাথ ঘোষ (এন. এন. ঘোষ), সাংবাদিক ২৫১
নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৭৫, ১৭০
নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭৫, ৯০, ১০২, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬৮
—মৃত্যুতে কিশোরীচাঁদ ৩৬৮
নগেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী ১০৪
নগেন্দ্র মল্লিক ২৩৫
নন্দকিশোর বসু ৯৪
নন্দকুমার কবিরত্ন ২৬০
নন্দকুমার ন্যায়চঞ্চু ২৯৫
নন্দকুমার রায় ৩১৮
—'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নাটক অভিনয় ৩১৯
নন্দগোপাল চট্টোপাধ্যায় ১৯
নন্দরানী দেবী ১৯
নন্দলাল বসু ১০৮
নন্দলাল সিংহ ৪৩, ৯২, ৯৫, ২৩০
নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ৯৩
নবকুমার চক্রবর্তী ১২২
নবকুমার বিশ্বাস ১৫১
নবকুমার মুখোপাধ্যায় ১৫০
নবকৃষ্ণ গুপ্ত ৩৮
নবকৃষ্ণ ঘোষ ১০৭
নবকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ১৯
নবকৃষ্ণ, রাজা ৪২
নবগোপাল মিত্র ৪১
নবদ্বীপ (বাংলার অক্সফোর্ড) ২১৯
'নববাবুবিলাস' ১৭, ১১৮
'নববিবিবিলাস' ১১৮
'নববৃন্দাবন' অভিনয় ৩৬৪
নবীনকৃষ্ণ বসু ২২৭, ৩৫৮
নবীনকৃষ্ণ মিত্র ১০৭
নবীনচন্দ্র দাস, শিক্ষক ১৪২
নবীনচন্দ্র দাস, কবি-গুণাকর ২২৮
নবীনচন্দ্র পালিত ১৯১, ১৯২
নবীনচন্দ্র মিত্র ২৭, ৩৪

নবীনচন্দ্র মিত্র, চিকিৎসক ৫৬
নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৯০, ৯১, ৯৩, ৯৬, ৯৮, ৯৯, ১০০
নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ছদ্মনাম ভুবনমোহিনী দেবী) ২৩১
নবীনচন্দ্র সেন ৮৯, ১০৮, ২৭১, ২৭৬-৭৭
—'বঙ্কিমচন্দ্র' ২৭৬
'নব্যভারত' ৯৬, ২৪৬
নরিস সাহেব ৩০২
নরেন্দ্রনাথ মিত্র ৩৫৬
নরেন্দ্রনাথ সেন ৬৮, ২৩০
নরোত্তম মল্লিক ১২৫
নর্টন, জর্জ ১৩৩
নর্ম্যাল স্কুল ২৬৫, ৩৬৪
'নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা' ৯৭, ২৬০
নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী ২২২
নিবারণ রায় ৪৪
নিমচাঁদ সেন ৮৯
নিমাইচাঁদ শিরোমণি ৩৫, ৪৩
নির্মলনারায়ণ গুপ্ত ২৭৮-৮০
নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় ১৮৯
নিস্তারিণী দেবী ১০৮, ১৪৭
'নীতিরত্ন' ১৯৩
'নীতিসার' ২৮৮
নীরদচন্দ্র চৌধুরী ১৮২
নীলকমল ঘোষ ৮৫
নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯৬
নীলকমল ভাদুড়ী ২৪১
নীলকমল মুস্তফী ২৭
'নীলদর্পণ' ৩৩৬, ৩৩৭
নীল বিদ্রোহ ২৫, ৩৩৫
নীলমণি কুমার ৩৩, ৩৫৩
নীলমণি দে ২৩০
নীলমণি বসাক ('বত্রিশ সিংহাসন') ২৪৫
নীলমণি মিত্র (প্রথম সরকারি খেতাবধারী বাঙালি ইঞ্জিনিয়ার) ১৫১, ৩৫৩
নীলমণি মুখোপাধ্যায় ১৭০, ২৮৪
নীলমণি হালদার ২৫৮
নীলমাধব মুখোপাধ্যায় ১০৬
নীলমাধব শর্মা ৮৭
নীলরতন অধিকারী ২৪২
নীলরত্ন হালদার ৯২, ২৫৭-৫৮
নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় ২০৪
নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৯৮, ২২৯, ৩৫৯
নৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ২৮২
নৃপেন্দ্রনারায়ণ, রাজা ৪৭
নৃসিংহ ২২২
নেটিভ ফিমেল এডুকেশন ৪১
নেলার, যোশেফ রিচার্ড ১৩৩
'ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন' ১৫৫
ন্যাশনাল লাইব্রেরি ১১৯

'পক্ষীর বিবরণ' ৮৪
পঙ্কজ চট্টোপাধ্যায় ১৯
পঞ্চানন কর্মকার ১৪৬
পঞ্চানন তর্করত্ন ২২০
'পতিতোদ্ধার সভা' ১৫২
'পতিব্রতোপাখ্যান' ২২৭
পদ্মলোচন ন্যায়রত্ন ২৫৯
পদ্মলোচন বসু ১১০
'পদ্মিনী উপাখ্যান' ১৫৭, ১৮৮, ২৩৭, ৩৬৭, ৩৬৮
পদ্মিনীর উপাখ্যান ৩১১, ৩৩৬, ৩৪৪
'পদ্য প্রকটন' ১৫৭
'পপুলার লিটারেচর অব বেঙ্গল' ২৫৭
পরমানন্দ মৈত্র ৫৩
পরমেশ প্রসন্ন রায় ৩৪৪
পরাশর সংহিতা ৫৫
'পরিচয়' ২৭৮
পরেশচন্দ্র দাস ২৩১
পল্লব সেনগুপ্ত
—'উনিশ শতকের ইংরেজি সাহিত্যে বিপ্লবী ভারতের চিত্রকল্প' ৩১৩-৩১৪
"পাখী সব করে রব" ১৩২, ৩৫৯
পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ২২
পামার, ক্যাপ্টেন ৮৪
'পারসীক অভিধান' ২৭
'পারস্যবঙ্গীয় ভাষাভিধান' ২৭
পার্কার, এইচ. এম. ২৮
পার্কার, হেনরি মেরিডিথ ২৬১
পার্বতীচরণ দাস ২৬
পার্বতীচরণ ভাদুড়ী ১০৪

'পাল বর্জিনিয়া ইতিহাস' ২৮৭
'পাবণ্ডপীড়ন' ১০০, ১১২, ২০৪
পিকার্ড, চার্লস ৩৫৩
পিকাসো ৩০৩
'পিপ্‌লস পেপার' ৩১৩
পীতাম্বর চট্টোপাধ্যায় ১৯
পীতাম্বর সেন ২৬০
'পুরশ্রী' ২৭৮
'পুরাতন প্রসঙ্গ' ৯৯, ১১০, ১১৭, ১৪৫, ১৬৬, ২১১, ২২৩, ২৯৬, ৩০৪, ৩৪০, ৩৪৮, ৩৫৭, ৩৫৯, ৩৬৩
"পুরাতন হিন্দু কলেজের স্মৃতি" ৬৭
'পুরাবৃত্ত সার' ৩৫৪
পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৯, ২১, ২২, ৬৪, ৭৬, ৭৭, ১১২, ১১৩, ১১৫, ১২৭, ১২৮, ১৩৮, ১৩৯, ১৭৯, ২৮৩, ৩৪৫-৪৬
'পূর্ণিমা' ৩৫৭
পূর্ববঙ্গীয় ব্রাহ্মসমাজ ৯৫
'পেনি ম্যাগাজিন' ১৫৫
পেরেণ্টাল অ্যাকাডেমিক ইন্‌স্টিটিউশন ৭০
পো, এডগার অ্যালেন ২৮০
প্যাটন, জে. ৭০
প্যারীচরণ সরকার ২৬, ৩৫, ৪১, ৪৭, ৫১, ৬৫, ৭৫, ৯৪, ৯৬, ১০৭
'প্যারীচাঁদ মিত্র' ২৫২, ৩৭০
প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর) ২৯, ৩, ৩৮, ৩৯, ৪৩, ৪৫, ৪৮, ৪৯, ৫৩, ৫৫, ৬১, ৬৮, ৭১, ৭২, ৭৩, ৯২, ৯৯, ১১৭, ১৩৫, ১৩৯, ১৫৬, ২২৩, ২৪৬, ২৪৮, ২৫২-৫৩, ২৫৪, ২৯৩, ২৯৮, ৩০৫, ৩২২, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৫৪-৫৫, ৩৭০
প্যারীমোহন বসু ২৪৮-৪৯
প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ৪৫
প্যারীমোহন সেন ৩৪, ১১১
'প্রচার' ৬৪, ২৭৩
প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ৪৫, ৩১৭
প্রতাপচন্দ্র সিংহ ১৫৬, ২২৬, ২২৭, ২৪৭, ৩২২, ৩৫৩, ৩৫৮, ৩৬২, ৩৬৩
প্রতাপনারায়ণ সিংহ ২৪৮
প্রথম প্রকাশ্য বালিকা বিদ্যালয় ১০৭
প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ১২৫
প্রবোধচন্দ্র সেন ৩১৯
'প্রবোধ প্রভাকর' ৩৫৩
'প্রভাস' ৩৪৪
প্রমথ চৌধুরী ৩১৭
প্রমথনাথ দেব ৯২
প্রমথনাথ বসু, ভূতত্ত্ববিদ ২৬৪
প্রমথনাথ বিশী ১৯৬
প্রমথনাথ মিত্র (পি. মিত্র) ২৩৫
প্রসন্নকুমার ঘোষ ৫৬
প্রসন্নকুমার ঠাকুর ৩০, ৩১, ৪০, ৪৩, ১৩৪, ১৪৬, ১৫২, ১৫৫, ২৬১
প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় ২৫৯
প্রসন্নকুমার সরকার ৭৫
প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী ২২৪, ২৩২
প্রসন্নকুমার সেন ২৭
প্রসন্নদেবী ১০৮
প্রসন্নময়ী দেবী ৬৫, ৩১৭
প্রসন্নময়ী দেবী, কবি ২৫৩
প্রসাদদাস মল্লিক ৩১৭
প্রসাদ লাহিড়ী ৩৫, ২১১
'প্রাইভেট অবজার্ভার' (হাতে লেখা পত্রিকা) ৪৬
'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান' ৩৫৪
'প্রাচীন ইতিহাস' ১২১
প্রাচ্য বনাম পাশ্চাত্য শিক্ষা পদ্ধতি ৩২
প্রাট, হজসন ২৪৬, ২৪৭, ২৯৩
প্রাণকৃষ্ণ দত্ত ১৫১
প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর ১০৯
প্রাণকৃষ্ণ মিত্র ১৩২
প্রাণকৃষ্ণ হালদার ১২৩
প্রাণনাথ দত্ত, হাটখোলা ৪২, ৩৫৭
প্রিন্স গোলাম মহম্মদ ১৩৭
প্রিন্সেপ, জর্জ ৩০
প্রিয়ংবদা দেবী ৩১৭
প্রিয়নাথ দত্ত ৩৬৪
প্রিয়নাথ সেন ২৫৩
প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ ১০৯, ১১৩
প্রেস অ্যাক্ট ২৮
প্রেসিডেন্সি কলেজ ৩৮, ১১০, ২৩০, ২৬১, ২৬৪, ২৮২, ৩৩৯, ৩৪১, ৩৪২, ৩৫২
প্রেসের স্বাধীনতা ৯২
প্লাউডেন, সি. ১০২

'প্ল্যান্টার্স জার্নাল' ২৮৮

ফজলুল করিম ২৬২
ফরেন মিশন কমিটি ২৫৭
'ফাউন্ডেশন অব মিউজিক' ১৬৩
ফিটজেরাল্ড, লর্ড ৫৮
'ফিনিক্স' ২২৬
—এ 'দি সিপাই মিউটিনি ইজ অ্যাট অ্যান এন্ড' ৩২২
'ফিভার হসপিটাল' ৩১
ফোগো, ডি. ১৮৭
'ফোটোগ্রাফিক সোসাইটি' ২৮৯
ফোর্ট উইলিয়ম ৬৮, ৯৪
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ১৭, ২৭, ৩৮, ৫০, ৭০, ৮৮, ১০৫, ১০৬, ১৩২, ১৩৩, ১৪৯, (কলেজ বন্ধ) ২৪৭
ফৌজদারী বালাখানা ৬৭, ৬৯, ৭০, ৯২
ফ্রি চার্চ ইন্সটিটিউশন, কলকাতা ৭৩, ৮৭
ফ্রি চার্চ ইন্সটিটিউশন, চুঁচুড়া ৪২
ফ্রি চার্চ মিশন স্কুল ১১৮
ফ্রী প্রেস ২৮
'ফ্রেনলজিক্যাল সোসাইটি' ৯৩, ১৪৪
'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' ৩৬, ৩৯, ৪০, ৪৪, ৫২, ৫৩, ৫৯, ৭১, ৭৫, ৮৪, ১২৫, ১৭৩, ৩৩১
—তে "পলাশীর শতবার্ষিকী" ৩২৬

'বঙ্কিমচন্দ্র' ২৭৬, ৩৪৯
বঙ্কিমচন্দ্র (হাতে খড়ি) ৬৩, (মেদিনীপুর) ৭৬, (ছড়া বানানোর প্রবণতা) ৮১, (কাঁঠালপাড়ায়) ১১২, (হুগলি কলেজে) ১১২, (ঈশ্বর গুপ্ত ও সংবাদ প্রভাকর বিষয়ে) ১১৩, (মধুসূদনের মধ্যে মিল) ১১৫, (কাঁঠালপাড়ায়) ১২১, ("বাঁকা") ১২৭, (বারো বৎসর বয়সে) ১৩৮, (কমলাকান্তের বীজ) ১৪২, (সিনিয়র বিভাগের তৃতীয়শ্রেণীতে) ১৫০, (কবি) ১৫৭, (কীর্তন ও কথকতায় আগ্রহ) ১৫৯-৬০, (গীত রচনা) ১৬০-৬১, (প্রকৃতি-মুগ্ধতা) ১৬৩, (কবিতা পাঠে আগ্রহ) ১৬৩-৬৪, (প্রথম কবিতা 'পদ্য') ১৭৩, (দীনবন্ধুর কবিতা সম্বন্ধে) ১৭৪, ('বিরলে বাস' কবিতা) ১৭৫, (পাঠ্য বইয়ের বাইরের পড়ায় আগ্রহ) ১৭৭, (ড্রামন্ডের কবিতার অনুবাদ) ১৮০-৮১, ("ছাত্র হইতে প্রাপ্ত" নামে রচনা 'গদ্য' প্রকাশ) ১৮৪-৮৫, ('জামাইষষ্ঠী' বিষয়ে বঙ্কিম) ১৮৫, (জীবন ও সৌন্দর্য প্রকাশ) ১৮৫, ('বর্ষাঋতু' কবিতা প্রকাশ) ১৮৫; ("বর্ষায় মানভঞ্জন" কবিতা প্রকাশ ১৮৬, (স্বামী-স্ত্রীরূপী নায়কনায়িকার কথোপকথনে কবিতা) ১৯৫-২১০, (দীনবন্ধুর রচনা বিষয়ে) ২০১, ("বিচিত্র নাটক") ২০৬, (সংস্কৃতানুশীলন) ২১৫, ২১৭, (স্বেচ্ছা নির্বাসনের বছর) ২৩৬, (কবিতার জন্য পুরস্কার) ২৪৩, ২৬৯-৮৫, ৩০৮, ৩৩৯, ৩৪১, (আইনের ক্লাস) ৩৪২, (প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন অধ্যয়ন, পরে যশোহরে), ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৬
—Senior Scholarship Examination-এ বৃত্তিলাভ ২৪৩, ২৫৫, ২৮০
—(শিবনাথ শাস্ত্রী বিষয়ে) ২৭৬-৭৭
'বঙ্কিমচন্দ্র ও কথক ঠাকুর' ১৪০-৪২
"বঙ্কিমচন্দ্র ও কলকাতা" ৩০৩
'বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু' ৩৪৫
'বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন' ২৭৬
"বঙ্কিমচন্দ্র কাঁঠালপাড়ায়" ১৬০, ১৭৯, ২১৯
"বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়" ৮২
বঙ্কিমচন্দ্রের 'অনুশীলনতত্ত্ব' ২৩৫
"বঙ্কিমচন্দ্রের কবিজীবন" ২৭১
'বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচর্চা' ১১৬
বঙ্কিমচন্দ্রের জমিদার ও কৃষক ৩০৩
'বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম গদ্য রচনা' ২১৩
'বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা' ৬৪, ১১৫
'বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যশিক্ষা' ১১২
'বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্প ও সঙ্গীতের জগৎ' ১৬০-৬১
"বঙ্কিমচন্দ্রের সংস্কৃত শিক্ষায় টোল ও তাঁর গুরু" ২১০
'বঙ্কিম জীবনী' ১৮, ৬৩, ১১৫, ১২২, ১২৭, ১২৮, ১৬৪, ২৭৩, ৩০১, ৩১৫, ৩৪২
বঙ্কিম বনাম পরীক্ষক বিদ্যাসাগর ৩৪৮
'বঙ্কিম বরণ' ২৭১
'বঙ্কিমযুগের কথা' ১২৮

বঙ্কিম স্মৃতিসভা ৮২
বঙ্কিমের চাকরির প্রতি অনীহা অথবা বিদ্বেষ ৩৪৩
'বঙ্কিমের প্রথম গদ্য রচনা' ২৭৪
বঙ্কুবিহারী দত্ত ৬৫
'বঙ্গদর্শন' ৮৮, ৯৪, ১৫৮, ১৮৩-৮৪, ২৪২, ২৭১, ২৭৩, ২৯৯, ৩০৪
"বঙ্গদর্শনের বিদায়" ১৮৪
'বঙ্গদূত ২৫৭
'বঙ্গদেশের পুরাবৃত্ত' ১১৭
'বঙ্গবাসী' ২৫৪, ৩১৬
'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' ৩৫৫
'বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ' (ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি) ১৪৮
'বঙ্গভাষার লেখক' ৩৪০, ৩৬২
'বঙ্গাধিপ পরাজয়' ৪৬
'বঙ্গাভিধান' ২৭
'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' ৩৬২
"বঙ্গীয় যুবক ও তিন জন কবি" ১৮৩, ২৭১
'বত্রিশ সিংহাসন' ৩৫০
বন্দেমাতরম্ ১৬২
বরদাকান্ত রায় ৬৬
বর্চ, ক্যাপ্টেন ৭০
বর্ণকুমারী দেবী ৩১৭
'বর্ণপরিচয়' ৬৪, ২৬১, ২৬৪
'বর্ধমান চন্দ্রোদয়' ১৩৭
বর্ধমান ব্রাহ্মসমাজ ১৫২
বলদেব পালিত ৩০৮
বলাইচন্দ্র সেন ৪৫, ৩৬১
বসওয়েল ১৩৯
'বসন্তক', প্রথম কার্টুন পত্রিকা ৪২
বসন্তরঞ্জন রায় ১৬০
বসন্তলাল মিত্র ১৩২
বসু, এস. এম. স্যার ১২৫
বহুবিবাহ প্রথা ২৫৮, ২৬৮
বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলন ২৮৮
'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার—২য় পুস্তক' ৩০৫
'বাংলা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' ২৫৭
বাংলা থিয়েটার ৪২
'বাংলাদেশের ইতিহাস' ৩১, ৭১, ১৫৬
বাংলা নাট্যআন্দোলন ২২২
"বাংলা সাহিত্য, বর্তমান শতাব্দীর" ২৭১
'বাংলা সাহিত্য ও স্বাধীনতার প্রেরণা' ৩৩৭
বাংলা সাহিত্যে ডেপুটিগণের অবদান ৩৪৪
'বাংলা সাহিত্যের নরনারী' ১৯৬
'বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস' ৯৫
'বাংলার কলঙ্ক' ১২৭
"বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ" ১৯২-৯৩
'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা' ৩০৫
'বাঙ্গালা সাহিত্য' ৩০৫
'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ৩৫৬
'বাঙ্গালার ইতিহাস' ১১৭
বাঙালির মোহ ৩৪৩
'বান্ধব' পত্রিকা ৩৬, ৭৩
বামনদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৬
বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩২
বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫১
'বামাবোধিনী' পত্রিকা ৪৫
বায়রন, লর্ড ২৮, ১৮০, ১৮২-৮৪, ২৭১
বায়রন-জীবনী ৬২
বারনুফ, প্রোফেসার ৯৭
বারাণসী সংস্কৃত কলেজ ২৩২-৩৩
বারাসাত কৃষি স্কুল ১৯৩
বারাসাত গভর্নমেন্ট স্কুল (প্রতিষ্ঠা) ৯৬
বারাসাত বালিকা বিদ্যালয় ১৩৪
বার্ড, ডব্লু. ৭২
'বার্তাবহ'
—রাজরোষে বন্ধ ৩২৬
বালিকা বিদ্যালয় ৩৫৭
'বাষ্পীয় আরোহীদের প্রতি উপদেশ' ২৫৮
'বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে' ২৪৫
বাষ্পীয় পোত প্রবর্তন ৮৫
'বাসবদত্তা' ৩৫৯
বাহাদুর শাহ, দ্বিতীয়
—সিপাহী বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত থাকায় নির্বাসনে পাঠানোর আগে কলকাতায় ৩৬৮
'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' ১৫০, ২২৪
'বিক্রমোর্বশী' ৩৩১, ৩৩৪
'বিচারক পত্রিকা' ৩৫৭
বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় ১২৫

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ৪৭
বিডওয়েল, এ. সি. ২৬৬
বিডন, সিসিল ১৩১, ১৪৫, ২৪১, ২৪৭ ২৯১, ৩১৮
'বিদ্যাকল্পদ্রুম' ('Encyclopedia Bengalensis') ৯৭, ১০৬, ১৬৯
'বিদ্যাদর্শন' ৫৬, ১০৭, ২৮৮
'বিদ্যাসাগর' উপাধি ৩৮
'বিদ্যাসাগর জীবনচরিত' ১৪৭
'বিদ্যাসুন্দর' ২৫৭
বিদ্যাসুন্দর যাত্রা ৪২
'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' ২৩১, ২৬২
বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ ২৯১
—'সাবিত্রী সত্যবান' ৩৬১
—সম্বন্ধে প্রিয়রঞ্জন সেন ৩২৪
বিদ্যোৎসাহিনী সভা ২২৩, ২৩০-৩১, ২৬২, ২৯১, ২৯২-৯৩, ২৯৫
বিধবা বিবাহ ৫৫, ১৯১, ২২২, ২৩৫ (শাস্ত্রসম্মত), ২৩৮
বিধবাবিবাহ আইন ২৬৭, ২৮৯, ২৯০, ২৯১, ২৯৩
—এর বিরুদ্ধে আবেদনপত্র ২৬৮
—পাস ২৯৩
বিধবা বিবাহ নিষেধ ২৬০
'বিধবা বিবাহ নিষেধ বিষয়ক ব্যবস্থা' ৯৫
'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া অত্যন্ত অনুচিত এতদ্বিষয়ক প্রমাণ সমূহ' ২৫৯-৬০
'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' ২৫৯
'বিধবাবিবাহবাদ' ২৬০
বিধবাবিবাহের পক্ষে ও বিরুদ্ধে আবেদনপত্রের তালিকা ২৮৬-৮৭
'বিধবার বিষম বিপদ' ২৯৫
বিনয় ঘোষ ৩৭
বিনয়কৃষ্ণ দেব ৮৪
বিনয়ভূষণ রায় ৪৮
বিপিনবিহারী গুপ্ত ৩৪০, ৩৪৮
'বিবলিওথিকা ইন্ডিকা' ১০৭
'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ১৪৮, ১৫৫, ১৬৯, ২৪৫-৪৬, ২৮৮, ৩১৬, ৩৫৪
—কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিক্রমোর্বশী' বিষয়ে ৩৩১
বিশপস কলেজ ৮৭, ১৮৯
বিশ্বপ্রেমোদ্দীপনী সভা ৬৮
'বিশ্ববিলোচন' ১৯০
বিশ্বম্ভর দাস বসু ২০২
বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্য ৬৩
বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায় ১০৭
বিশ্বম্ভর মৈত্র ২৫৮
বিশ্বম্ভর শীল ১২৩
বিশ্বম্ভর হালদার ৪২
'বিষবৃক্ষ' ২১, ৮১, ৮২, ১৬১, ১৮৩, ৩৪৪
বিহারীলাল গঙ্গোপাধ্যায় ৪২
বিহারীলাল গুপ্ত ১৩২
বিহারীলাল চক্রবর্তী ২৭৯, ৩৫৩, ৩৫৭, ৩৬৫
—'বঙ্গসুন্দরী' ২৭৯
—'সারদামঙ্গল' ২৭৯
—'সংবাদ প্রভাকরে' তাঁর 'স্বপ্নদর্শনে'র আলোচনা ৩৬৫
বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় ৯৬
বীনল্যান্ড, জে. সি. ২১১
বীরনৃসিংহ মল্লিক ৯২
বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৪৩
বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৯৩
বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায় ১৩৭
বুদ্ধদেব বসু ২৯৯-৩০০ (রামায়ণ ও মহাভারত বিষয়ে)
বুলার, স্যর, আর্থার ২৯১
বৃত্তিপরীক্ষার পাঠ্যতালিকা ২৪৩
বৃন্দাবনচন্দ্র বসু ৯৮
বেইলি, এডোয়ার্ড হজেস ৮৫
বেকনের প্রবন্ধাবলী ৯৫
বেঙ্গল টি অ্যাসোসিয়েশন ৩৮
বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি ৭১, ২৯৭
'বেঙ্গল ল্যান্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন' ২৯৭
বেঙ্গল ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটি ৩০-৩১, ১৩১
'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' ৫৫, ৫৯, ৬৯
'বেঙ্গল হরকরা' ২৮, ৬৭, ৭২, ৭৫, ৯০, ৯৮, ১০৪, ১৩৯, ১৫২-৫৩, ১৯২, ২২৬, ২২৮, ২৫১, ২৬৮, ৩১৬, ৩১৭
'বেঙ্গল হেরাল্ড' ৫৯, ৭৩
'বেঙ্গলী' ১০৪

'বেঙ্গলী জমিন্দার, এ' ১৭০
বেঠোফেন ১৬৩
বেণীমাধব বসু ২৫১
'বেণীসংহার' নাটক ২৮৮, ২৯১, ৩৩৪
—অভিনয় ৩২৩
—সমালোচনা ৩২৪
'বেতাল পচীসী' ১০৫
'বেতাল পচ্চীসী' হিন্দী ১৯০
'বেতাল পঞ্চবিংশতি' ১০৫, ১০৬, ২৪৪, ২৪৬
বেথুন, জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার ১০৭, ১১৭, ১১৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৭, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৮, ১৫৪ (মৃত্যু), ১৫৬, ২২৪, ২৩০
বেথুন সোসাইটি ১৫৬, ১৯০-৯২, ২২৮, ২৪৬, ২৫৭, ২৮৮, ৩৫৮
বেথুন সোসাইটি, ঢাকা ১৯১
'বেথুন সোসাইটি' ১৯২, ২৪৭, ৩১৮
'বেথুন স্কুল' ১০৭, ১৩৪, ১৪৭, ১৫১, ২৯৭
'বেথুন স্মারক গ্রন্থ' ১৪৮, ১৫৪
'বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম' ১১০
'বেদান্তসার' ১৭০
'বেণ্টলেজ মিসেলেনি' ৬০-৬১, ২৭০
'বেণ্টলেস ম্যাগাজিন' ১১৪
বেণ্টিঙ্ক, উইলিয়ম ৩২, ৯০
বেভার্স, নর্ম্যান ৩১৭, ৩৫৮
বেলগাছিয়া থিয়েটার ৩৫৩, ৩৬২, ৩৬৩
—রত্নাবলী অভিনয় ৩৬২, ৩৬৪
বেলগাছিয়া ভিলা ৫০, ৩৬৩
বেলফার, মিঃ ১৩৫
বেলি, ভিনসেণ্ট হেনরি ১৯৩
বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৮, ৭৯
বৈকুণ্ঠনাথ ভুঁইয়া ৭৮
বৈদ্যনাথ চন্দ্র
বৈদ্যনাথ রায় ৩৬
বৈদ্যনাথ সান্যাল ১৪৪
বৈষ্ণবচরণ আঢ্য ১১৯
'বোধোদয়' ১৫১
বোয়াজ (ভোয়াজ), রেভারেন্ড টি. ৩৩, ৩৭, ৪৮, ৬৯
'ব্যবহার বিচার শব্দাভিধান' ২৭
'ব্যাকরণ কৌমুদী' ২২৪, ২৪৫
ব্যাকিয়ার, ডাবলিউ. সি. ২৩৩
ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস, শ্রীরামপুর ১৮৪
ব্যাপটিস্ট মিশনের প্রথম ছাপাখানা, ঢাকা ১১৭
ব্যারি, মিঃ ৮৬
ব্যারোজ, ক্যাপ্টেন ২৬৫
ব্যালাণ্টাইন ২৩২-৩৩, (বিদ্যাসাগর-ব্যালাণ্টাইন বিরোধ) ২৩৩-৩৪
ব্যোমকেশ চক্রবর্তী ২৫৮
ব্রজনাথ ধর ৭২, ৯২
ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় ৩৫, ২৪১
ব্রজমোহন কলেজ, বরিশাল ২৮৮
ব্রজসুন্দর মিত্র ১৯১
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩০, ৩৬২
ব্রাউন, মি. ২৬৫
ব্রাহ্মধর্ম ১১০
'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ ১১০
'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' ১১০
ব্রাহ্মসভা ৯১
ব্রাহ্মসমাজ ৪৭, ১০৭, ১০৮
ব্রাহ্মসমাজ, ঢাকা ৩৬
ব্রাহ্মসমাজ, মেদিনীপুর ১৯০
ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সভা ৩৬
ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ১৩১, ১৫৫, ২২৭, ২৪৭, ২৬৩
—সভায় বিদ্রোহী সিপাইদের কাজে অসন্তোষ প্রকাশ ৩২৪
'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' ২৪, ৫৮, ৭১, ৭২, ৭৩, ৯৫, ১৩১
ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ৩৫২
'ব্রিটিশ বার্ডস' ১৭৯
ব্রুয়াম, লর্ড (লিবার‍্যাল নেতা) ২৪, ৫৭
ব্রেনান্ড, ডাবলিউ. ১৮৭, ১৯৯
ব্ল্যাক অ্যাক্ট বা কালা কানুন ১৩১
'ব্ল্যাকউড ম্যাগাজিন' ৫২, ৬০, ১১৪

ভগবচ্চন্দ্র রায় ২৪৪
ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় ১১৮

ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৯২
ভগবানচন্দ্র বসু ২৪৫
'ভদ্রার্জুন' ১৯০
ভবতোষ দত্ত ২০১, ২৪০, ২৫৫, ২৫৭
ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন ২৫৯
ভবানীচরণ দত্ত ৯৫
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭, ১১৮
ভবানীচরণ বিদ্যাভূষণ (মাতামহ) ১৯
ভবানীচরণ মিত্র ৩০
ভবানীচরণ সেন ৭৪
ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ ২৫৪
ভাটপাড়া (দ্বিতীয় অক্সফোর্ড) ২১৯
'ভানুমতী চিত্তবিলাস' ২২৩
ভারতচন্দ্র রায় ১৮, ১০৬, ১১৩, ১১৪, ১৪৩, ১৫৭, ১৯০
ভারতচন্দ্র শিরোমণি ১০৯
'ভারতবর্ষীয় সমাচার পত্র' ৩৬৮
'ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা' ১৩৫, ১৪৮, ১৫০
'ভারতবর্ষের ইতিহাস' ৯৬
'ভারতবর্ষের বিশেষ বিবরণ' ৪১
'ভারত শ্রমজীবী' ৪২
'ভারত-সুহৃদ' ২৪৩
'ভারতী' ১০৭, ১২৮
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ৮৭
'ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী' ৯৩
'ভারতীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা' ১৪৪
'ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস' ২৬৪
ভার্নাকুলার প্রাইমারি স্কুল ১৪৪
'ভাস্কর' ১০১, ২৯৩
ভিক্টোরিয়া বালিকা বিদ্যালয় ১৩৪
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ২৫০
ভুবনমালা (মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কন্যা) ১৩৪
'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' ২৩১
'ভূগোল' ৪৬, ২২১
'ভূগোল বৃত্তান্ত' ১১৭
ভূদেব মুখোপাধ্যায় ১৮, ৩৫, ৪২, ৪৬, ৫১, ৬৫, ৬৮, ৯৫, ৮৯, ৯৮, ১০৬, ১১৭, ১২০, ১৩৬, ১৯১, ২১৭, ২৯৩, ৩১৪, ৩১৫, ৩৫৪
—'ঐতিহাসিক উপন্যাস' ৩১৫
ভূপেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩৬
ভূম্যধিকারী সভা ৪০, ৭১
'ভেক-মূষিক যুদ্ধ' ৩৫৪
ভৈরব মুর্মু ২৬৪
ভোলানাথ ঘোষ ৭৮, ৭৯
ভোলানাথ চন্দ্র ২৪, ২৭, ৫৩, ৬৭
ভোলানাথ বসু ৯০
'ভ্রমর' ২৭৩

মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসি ৩২৩
'মঙ্গলোপাখ্যান পত্র' ৬৫
মজি, উইলিয়ম ২৪৭
মডেল স্কুল ২৪৯, ২৫০
মতিলাল ঘোষ ১১১
মতিলাল চট্টোপাধ্যায় ১৪৭
মতিলাল শীল ৩৮, ৪৩, ৬৯, ৮৪, ৯১, ৯২, ১৮৯, ২২৯, ২৪৯
মঁতেন ৩০৫, ৩০৬
—'এসেস' ৩০৫
মথুরানাথ দত্ত
—'কলকাতা পত্রিকা' ৩৬৮
মথুরানাথ মল্লিক ৯৫
মথুরানাথ মুখোপাধ্যায় ৩৭
মদনমোহন তর্কালঙ্কার ২৬, ৫০, ৫২, ৭০, ৯৪, ৯৬, ১০১, ১০৬, ১০৯, ১১০, ১৩২, ১৩৪, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৭, ১৭১, ২৯০, ৩২২, ৩৪৪, ৩৫৯ (মৃত্যু)
—'শিশুশিক্ষা' ১৩২, ১৪৪
—'পাখী সব করে রব' ১৩২
মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাসাগর ৩৫৯
মদনমোহন বাচস্পতি ২৬৫
মদ্যপান মিতাচারী সভা ৪৮, ৪৯
মধুসূদন গুপ্ত ৪৫, ২৯৫-৯৬
মধুসূদন মুখোপাধ্যায় ৩৫৬
—বঙ্গভাষানুবাদ সমাজ থেকে প্রকাশিত বই ৩৫৬-৫৭
মধুসূদন রায় ২২৭
'মধো কানে'-র গীত ২১
'মনতত্ত্ব সারসংগ্রহ' ১৪৪
মনোমোহন ঘোষ ৮৫, ১৩২

মনোমোহন বসু ১১৩
মনোমোহন বসু, নাট্যকার ১৯০, ১৯৩
মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা ৩৫৬
'মনোবঞ্জিকা' ৩১৬
'মন্দিরা' ৩৪৯
মন্মথনাথ ঘোষ ১৯২, ২২৪, ২২৯, ২৩০, ৩১৭, ৩৫৪, ৩৬০
ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজ ২৪৫
'মর্নিং ক্রনিকল' ১০১
মলেট, মি. ৭৯-৮০, ২৭৬
মশাররফ হোসেন ১২৫
—আমার জীবনী ১২৫
মঁসিয়ে রেজিয়ার ৮৬
মহতাবচাঁদ, বর্ধমানের মহারাজা ২৬৮
মহম্মদ আলি পাশা ৫৪, ৯১
মহম্মদ মহসীন ১২৩, ১২৪
মহম্মদ মহসীন কলেজ ১৮, ২২৩
মহসীন ফান্ড ১২৩, ২৮১
'মহাকবি রঙ্গলাল' ৩৫৪
'মহাজন দর্পণ' ১৩৬
'মহানির্বাণতন্ত্র'-টীকা ১৯
মহামেডান লিটেরারি সোসাইটি ২৬৩
মহারানী ভিক্টোরিয়া ২৪, ৫৭, ৬০, ৯৯, ২৬৩, ৩৫২
—মহারানী ভিক্টোরিয়া আর প্রিন্স অ্যালবার্টের তৈলচিত্র ৮৯, ৯৩
-কে 'ভারতেশ্বরী' করে শাসনক্ষমতা হস্তান্তর ৩৬৪, ৩৬৫
মহেন্দ্রনাথ দাঁ ৯৬
মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৩৬৩
মহেন্দ্রনাথ রায় ১৯০
মহেন্দ্রনাথ সোম ১৯১
মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫০
মহেশ পাগলা ১৫৭
মহেশপুর মডেল স্কুল ৩৫৩
মাইকেল মধুসূদন দত্ত ২৮, ৩৫, ৩৭, ৪৬, ৪৮, ৫১, ৫২, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৭-৬৮, ৮৭, ৯৮, ১১১, ১১৪, ১১৮, ১১৯, ১৩১, ১৩৩, ১৩৫, ১৩৯, ১৫০, ১৫২, ১৫৭, ১৭৭, ২১৭, ২২৬, ২৩১, ২৩৭, ২৬০, ২৬৮, ২৭০, ২৭১, ২৭৩, ২৭৮, ২৮৯, ৩১১, ৩১৪, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৪৮, ৩৬৬
'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত' ৩৬৩-৬৪
মাণিক্য তর্কভূষণ ২৩৫
মাতৃভাষা ৯২
'মাতৃভাষা ও বঙ্কিমচন্দ্র' ১৬৮, ২১৭
মাতৃভাষা শিক্ষাচর্চা ১৩৪, ১৭০-৭৩
মাতৃভাষায় শিক্ষায় প্রয়োজনীয়তা ২৩৪
'মাদ্রাজ রাইজিং স্টার' ২২৫
মাধবচন্দ্র বসু ২৫৪
মান, টমাস ১২৯
মানসিং মাঝি ২৫৮
'মানসিংহ' ২৫৭
মার্কুইস অব ল্যান্সডাউন ৫৮
'মার্চেন্ট অব ভেনিস' ২২৩, (অভিনয়) ২২৭-২৮
মার্টিন, ডাঃ ১০১
মার্টিন কোম্পানির রেলপথ ২৫০
মার্শম্যান, জে. সি. ৪৪, ১০৫, ১০৬, ১১৭, ১৮৪
মার্শাল, জি. টি. ৮৪, ৮৮, ৯৭, ৯৮, ১০৫, ১০৬, ১৯১
'মাসিক পত্রিকা' ২৫২, ২৬১, ২৭৭, ৩০৪
মিশনারি বিদ্যালয়, কৃষ্ণনগর ৩৫
মিহিরচন্দ্র চৌধুরী ১৪৩
মুকুন্দ করণ ৪২
মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় ২৮২
মুকুন্দরাম দাস ২৮৮
মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ২৬, ৪৭, ৭৩, ২২৪, ২৫৮
'মুখার্জিস ম্যাগাজিন' ৩৭
মুর, টমাস ২৭
'মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী' ৪৪
'মৃণালিনী' ১৬১
মৃদুলকান্তি বসু ৬৭
মেকলে ৩২, ১২৪, ২১৬-১৭, ২২২
মেকানিক্স্ ইনস্টিটিউট ৩৬-৩৭, ৬০, ৬৯
'মেকানিক্স ম্যাগাজিন' ৩৭
'মেঘনাদবধ কাব্য' ১১৪, ২৭৩, ৩১১, ৩১৬, ৩৩৭, ৩৩৯

মেডিকেল কলেজ ১৮, ৩১, ৩৪, ৩৫, ৪০, ৪৮, ৭৪, ৯০, ১৩২, (বাংলাভাবায় শিক্ষা) ১৯২, ১৯৩, ৩৬১
মেদিনীপুর ইংরেজি বিদ্যালয় ৭৮
মেদিনীপুর উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় ৭৬
'মেদিনীপুর ও হিজলি অধ্যক্ষ' ১৫২
মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুল ৭৮
মেদিনীপুর পাবলিক লাইব্রেরি (বেলি হল পাবলিক লাইব্রেরি) ১৯৩
মেদিনীপুর সরকারি কলেজ ১৫১
মেদিনীপুর স্কুল ১১৬
'মেদিনীপুরে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র' ৭৮
মেরেঋকভক্ষি ১২৯
মোপাসাঁ ৩০৫
মোহম্মদ আবদুর রউফ ২৬২
মোহম্মদ ওয়াজিহ্ ২৬২
মোহম্মদ মোজাহার ২৬২
মোহিতলাল মজুমদার ২৭১, ২৭২
মোহিনী দেবী ১২২
মৌয়াট, এফ. জে. ৮৮, ৯৭, ১০৮, ১৩৫, ১৪৫, ১৫৬, ১৭২-৭৩, ২৩৩, ২৪৬, ২৪৮
ম্যাককিলপ, ডি. জে. ১০২
ম্যাকক্লিল্যাণ্ড, ডাঃ ১১০
ম্যাকগাওয়ান, চিকিৎসক ৫৩
ম্যাকডুগাল, মি. ৪৯
ম্যাকস্‌মূলর, ফ্রেডরিখ ৯৭
ম্যাডক, হার্বার্ট ১৩৩
ম্যাসন, ফিলিপ ৩১০

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ২২৭, ৩১৯, ৩৬৩, ৩৬৪
যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় ৩০৮
যদুনাথ ঘোষ ২৩০
যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৯০
যদুনাথ দাস ১৪১
যদুনাথ পাল (মৃৎশিল্পী) ২৭,
যদুনাথ পাল ৩৬৪
যদুনাথ বসু ৩৩৮
যদুনাথ ভট্টাচার্য (যদুভট্ট) ৪২
যদুনাথ সর্বাধিকারী ৩৬
যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৯, ২০, ২১, ২৩, ৬৩, ৭৬, ৭৯, ৮০, ১১১, ১২১, ১২৮, ১৬৫, ১৮৭, ১৯৫, ২১৮, ২৮৫, ৩০৬
যাদবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৫৪
যাদবচন্দ্র রায় ২৪৩, ৩০৮
যাদবচন্দ্র রায় কবিভূষণ ৪৭
যাদবরাম রায় ২২
যোগধ্যান মিশ্র ১০৯
যোগমায়া দেবী ২৫৪
যোগীন বোস ৩০২
যোগীন্দ্রনাথ বসু ৩১৫, ৩৩০, ৩৬৩-৬৫
যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ৩০৭
যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ২৫৪
যোগেন্দ্রনাথ বসু ১৩৮
—'চিনিবাস চরিত্রামৃত' ১৩৮
যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ৯৩, ৯৬, ৩৪৪
যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর ১১২-১৩, ১১৪-১৫, ১৫৭
যোগেশচন্দ্র গুপ্ত ১৯০
যোগেশচন্দ্র বাগল ৬৯, ৮৪, ১৫৬, ১৯২, ২৪৭, ৩১৮
যোশেফ হেয়ার ৮৬, ১০০, ১৩৯
য়ুনিয়ন ব্যাঙ্ক ৪৪

রঘুদেব ঘোষাল ১৯, ২০, ২৩
'রঘুবংশম্' ২৩০
'রংপুর বার্তাবহ' ২০৪
'রঙ্গলাল' ১৯২, ৩৫৪
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৭, ৬৫, ১১৩, ১৩৩, ১৫৭, ১৮৭, ১৯২, ২৩৭, ২৫৭, ২৬৮, ২৭১, ২৯৩, ৩১০ ৩১১, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৬১, ৩৬৭-৬৮
"রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরচন্দ্র ঘোষ" ২৮২
'রচনা রত্নাবলী' ৩৫৭
রজনীকান্ত গুপ্ত
—'সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস' ৩১২
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩৬, ৫৪, ৯৩, ১১১, ১৩৮, ১৩৯, ১৪৩, ১৫৫-৫৬, ১৫৭, ১৬২, ১৮১, ১৯৬, ২২০, ২৫৩, ২৬৯, ২৭৪, (প্রথম বঙ্কিম দর্শন) ২৭৬, ২৭৮-৮০, ২৯৯, ৩০২

—'চতুরঙ্গ' ১৬২
—'জীবনস্মৃতি' ১৩৮, ১৩৯, ১৪৩, ১৫৫, ২৬৯
—"নিরুদ্দেশযাত্রা" ২৭৮
—"মানসসুন্দরী" ২৭৮-৮০
—'যোগাযোগ' ১৬২
—'সোনার তরী' ২৭৮-৮০
'রজনী' ১৬২
রজনীকান্ত গুপ্ত ১৩৬
রঞ্জিত সেন
—"মহাবিদ্রোহের ঐতিহাসিক শশিভূষণ চৌধুরী" ৩১২
রণজিৎ সিংহ ২৪
'রত্নাবলী' ৩৫৩, ৩৬৩
—'সংবাদ প্রভাকরে' নাটকাভিনয়ের খবর ৩৬৫-৬৬
রবার্টস, এমা (কাশীপ্রসাদের ইংরেজি জীবনীকার) ১৭৬-৭৭
'রবিনসন ক্রুশো' ১৪৮
রবিনসন, জে. ৬৫
রমণীমোহন রায় ২৮২
রমণীমোহন রায়চৌধুরী ২০৬
রমানাথ ঠাকুর ৩৭, ৫৩, ৯২, ৯৮, ১১৮, ১৩৭, ২২৭, ২২৯, ৩৫৩, ৩৫৮
রমাপ্রসাদ রায় ৮৭, ৯২, ২৯৬, ৩৬৪
রমেশচন্দ্র দত্ত ১১৯, ২১৭
রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১
রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ৮৮
রমেশচন্দ্র মজুমদার ৭১, ১৫৬
রমেশচন্দ্র মিত্র ৪২, ২৩০
'রয়্যাল প্রোক্লামেশন ডে' ৩৬৮-৬৯
—'সংবাদ প্রভাকরে' কলকাতায় উৎসবের খবর ৩৬৮-৭০
—রামগোপাল ঘোষের ভাষণ ৩৭০
রয়্যাল লিথোগ্রাফিক প্রেস (প্রথম বাঙালির চিত্রশালা) ৩৫৬
রস, ডাক্তার ১২৮
'রসতরঙ্গিণী' ৩৫৯
রসময় দত্ত ৪৮, ১০১, ১০৬, ১০৮, ১০৯, ১২৪, ১৩৭, ১৪৮
'রসরাজ' পত্রিকা ১০১
রসা পাগলা স্কুল ১৩৭
রসিককৃষ্ণ মল্লিক ৪৩
রসিকলাল সেন ৭৮, ১০৯
রহমত আলী ২৬২
রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯
রাখালদাস ন্যায়রত্ন ২২০
রাখালদাস হালদার ১৯৪
রাখালদাসী দেবী ৪৭
রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৪২
রাজকুমার সর্বাধিকারী ৩৬
রাজকৃষ্ণ আঢ্য ৪২
রাজকৃষ্ণ দে ২৮, ২৯
রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৮, ১৩৫, ২৯৬
রাজকৃষ্ণ মিত্র ৯২, ১৪৭
রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৮৯, ৯৩, ৯৬
রাজকৃষ্ণ রায় ১৩৬
রাজচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৯২
রাজনারায়ণ দত্ত ৫৯, ৬০, ৬২, ৮৭, ১১৯, ১৭৭, ২৬০, ২৬৮
রাজনারায়ণ বসু ৩৫, ৪২, ৪৬, ৫১, ৫২, ৭৮, ৮৩, ৯৪, (ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা) ৯৫, ৯৮, ১০৩, ১০৮, ১১৮, ১৩৪-৩৫, ১৩৬, ১৪৪, ১৫১, ১৬৬, ('ইংরেজি খাঁ') ১৬৯, ১৯০, ১৯, ২৪৭, ২৫৮, ২৬৭, ২৮৮, ২৯৩, ৩০৫
'রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত' ৮৩-৮৪, ৯৬, ১০৮, ১৪৭, ১৬৬-৬৮, ৩৩৩
রাজনারায়ণ মিত্র ১৩৫
'রাজমোহন্‌স ওয়াইফ' ১৯৭
'রাজসিংহ' ১৬২
'রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্' ৩০৭
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবনী ৩০৭
রাজারাম রায় ১৩৯
রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ১৩৮
—'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্' ১৩৮
রাজীবলোচন শর্মা ২৬৭
রাজেন্দ্র দত্ত ২২৭
রাজেন্দ্র মল্লিক ৩২৭
রাজেন্দ্রকুমার দত্ত চৌধুরী ৪৬
রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, স্যর ২৫০
'রাজেন্দ্রলাল মিত্র' ২২৭

রাজেন্দ্রলাল মিত্র ৩৬, ৪০, ১০০, ১৪৮, ১৫৪, ১৬৯, ২২৭, (এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরির গ্রন্থতালিকা) ২৪৫, ২৪৭, ২৪৮, ২৫৪, ২৮৯, ৩১৫, ৩১৬, ৩১৯, ৩২২, ৩৬৪
রাজেন্দ্রলাল সরকার ৯১
রাধাকান্ত দেব ২২, ২৮, ৩০, ৩৮, ৪০, ৪২, ৪৩, ৭১, ৮৬, ৯১, ১২৪, ১৩৪, ১৩৭, ১৪৬, ১৫১, ১৫২, ১৫৫, ২২৯, ২৩৮, ২৫৯, ২৬০, ২৯১
রাধাকৃষ্ণ বসাক ৯৮
রাধাগোবিন্দ কর, ডাঃ (আর. জি. কর) ১৯৩, ২২২
রাধানাথ বিদ্যারত্ন ২২৩
বাধানাথ শিকদার ১৮৯, ২১৭, ২৫২
রাধানাথ সেন ৭৩
রাধাপ্রসাদ রায় ৪২, ৫৩
রাধামাধব কর ২২২
রাধামাধব মিত্র ২৬৭, ৩০৮
রাধামোহন সেন ২৫৭
রাধারমণ মিত্র ৮৯, ২৫১
রানী রাসমণি ২৫৮
রামকমল ন্যায়রত্ন ২৩৫
রামকমল ভট্টাচার্য ৩৫৩, ৩৬৪
রামকমল সেন ২৯, ৩০, ৩৪, ৩৮, ৪০, ৬৮, ৮৬, ৯১, ১৬৭, ১৭০
রামকান্ত চট্টোপাধ্যায় ১৯
রামকৃষ্ণ দে ৩৪
রামকৃষ্ণ পরমহংস ২৩৫, ২৫৮
রামগতি ন্যায়রত্ন ১১৭, ১৩৫, ২৭৭-৭৮, ৩৫৫
রামগতি বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৪
রামগোপাল ঘোষ ২৮, ২৯, ৩৪, ৩৯, ৪৩, ৫১, ৫৩, ৫৫, ৬৬, ৬৮, ৭১, ৭২, ৭৩, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৯১, ৯২, ১১১, ১১৭, ১৩১, ১৩৫, ১৪৪, ১৪৮, ১৫৬, ২১৭, ২৩২, ২৪৮, ২৪৯, ২৬৩, ২৯৬, ৩৭০
রামগোপাল মল্লিক ২২৯
রামগোপাল সান্যাল ২২৭
রামগোপাল সেন ২৬১
রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার ৮৮
রামচন্দ্র দিচ্ছিত ৩৫৮
রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৫
রামচন্দ্র বসু ২৬৭
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ৩৮, ৪৩, ৫২, ৭৪, ৯০, ২৬৭
রামচন্দ্র মিত্র ৪২, ৪৩, ৭৩, ৮৪, ২৪৬, ৩৫৮
রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৩৭
বামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (সারদামণির পিতা) ২৩৫
রামচন্দ্র রায়চৌধুরী ১০৭
রামজয় বসাক ৩৬০
রামজয় শর্মা ৯৫
রামজীবন চট্টোপাধ্যায় ১৯
রামজীবন ভট্টাচার্য ২৫৯
রামতনু লাহিড়ী ২৮, ২৯, ৩৫, ১৫৬, ২১১, ৩১৯, ৩২৫
'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' ৩০, ৫৬, ৭১, ১০১, ১০৮, ১৩১, ২০৫, ২৩৮, ২৭২-৭৩, ৩১৯, ৩২২-২৩, ৩২৮, ৩৩৭, ৩৫৬
রামদাস সেন, পুরাতাত্ত্বিক ৯৪
রামধন তর্কবাগীশ ২৯৬
রামনাথ তর্করত্ন ১০৭
রামনাথ মিত্র ২৭
রামনারায়ণ তর্করত্ন ২০৪, ২২৭, ২২৯, ২৩৪, ২৪৫, ২৮৮, ২৯১, ৩৫৩, ৩৬২
রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন ২৮৭
রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু) ২৮, ১৪৩, ২২২
রামপদ মজুমদার ২৮২
রামপ্রসাদ সেন ১৮, ১৪৩, ২২২
রামপ্রাণ সরকার ৬৩, ৬৪, ৭৬, ৭৭
রাম বসু ১৪৩, ২২২
রামব্রহ্ম সান্যাল ১৪৪
রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার ৯৭
রামমোহন চক্রবর্তী ১২২
রামমোহন মিত্র ৬১, ৬৫, ১০৮
রামমোহন রায় ১৮, ৪৩, ৫২-৫৩, (ব্রিস্টলে সমাধিমন্দির সংস্কার), ৯৬, ১০২, ১৩৯, ১৬৯-৭০, ২১৫, ২২০-২১, ২৯৭
রামমোহন সেন ৯৪

রামরাম বসু ১৩৮
—'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ১৩৮
রামলোচন ঘোষ ৪৭, ৮৫, ১৩২
রামহরি চট্টোপাধ্যায় ১৯
রামায়ণ ৩০৭
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ৮২
রায়কমল মজুমদার ৩০৮
রায়গোবিন্দ তর্করত্ন ১০৯
রাসবিহারী ঘোষ ৯৪
রায়ান, এডওয়ার্ড ৩৬, ৪৭, ১০২, ১২৪
রাসু ২২২
রিচার্ডসন, ডি. এল. ৫২, ৫৯, ৬১, ৬৬, ৬৭, ৭০, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ১১১, ১২৫, ১৩৭, ১৮০, ২১১, ২২৯, ২৩০, ৩১৬
রিজ, ডি. এল. ৮৫
'রুল্‌স-ফর্‌ দা স্টাডি' ১৬৩
রুস্তমজী কাওয়াসজী ৩৪, ৮৫, ১৯১
রূপচাঁদ পক্ষী ৩৬২
'রেইস অ্যান্ড রায়ত' ২১৩
রেবেকা টমসন ম্যাকটাভিশ ১১৯, ১৩৩, ২৬৮
রেমফ্রে, জি. এফ. ৭১, ৭২
'রৈবতক' ৩৪৪
'রোম সাম্রাজ্যের ইতিহাস' ৩১৬
'রোমীয় ইতিহাস' ২৪৫
রেলগাড়ি—হাওড়া থেকে হুগলি পাণ্ডুয়া ২৫০-৫১
—প্রথম ইঞ্জিন 'ফেয়ারি কুইন' ২৫০
—র ভাড়া ২৫১-৫২
রোলিয়াস, মি. ১২১
রোহিণী দেবী. ১৯
ব্যালি, ডাঃ ১০২
র‍্যালে, ডাবলিউ. ৯০

লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস ২২২
লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার ২৭
লক্ষ্মীনারায়ণ সেন ৩৫৩
লঙ, জেমস ৪২, ৪৮, ৬৫, ১৪৪, ১৪৬-৪৭, ১৫০, ১৭৩, ২৪৭, ৩২২, ৩৫৮
লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ৯৯
লন্ডন মিশনারি সোসাইটি স্কুল ২২৩
লরেন্স পীল পুরস্কার ২৩০
লরেন্স, হেনরি ১৫১
'লর্ড ক্লাইভ চরিত্র' ২২২
'ললিতা' ২৭৬-৭৪
'ললিতা। পুরাকালিক গল্প। তথা মানস' ২৭০, ২৭৩-৭৫, ২৭৮-৮০, ৩০০, ৩৪৬
—এর বঙ্কিমচন্দ্র-লিখিত বিজ্ঞাপন ২৮১
—এর সমালোচনা ২৮৫
'লাইফ অফ শ্রীকৃষ্ণ' ৩১৬
'লাইব্রেরী পদক পরীক্ষা' ৪১
'লাভার্স অব সালামাঙ্কা' ৮৬
লালবিহারী দে ২৭, ৭৩, ৯৫, ৯৯, ১২৫, ১৩১, ১৫০, ২১২, ২৫৭, ২৯৪, ২৯৫
—'অরুণোদয়' ৩৩৩
লালবিহারী-ডাফ সংঘাত ২৫৭
ল্যালমোহন ঘোষ ১৩২
লালমোহন বিদ্যানিধি ৮৮, ৩৫৩
লালা হাজারিলাল ২৩৫
লালু নন্দলাল ২২২
লিউইস লেফটেনান্ট ৩৩৪
লিউসন, ম্যালকম ৩১৭
লিওজিনিস ক্লেন্ট ১২৫
লিগেট, পি. ডাবলিউ. ২৬৭
'লিটেরারি গেজেট' ৪৩, ৫২, ৫৯, ১১৪, ১৫৭, ২৫৭
'লিটেরারি গ্লীনার' ৫২, ৬০, ১১৪, ১৫৭
লুই ফিলিপ ৬১, ৯১, ৯৯
লুইস, জি. ৮৪
লোকনাথ দত্ত ৪২
ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটি ২৮-৩১, ৩৯, ৭১, ১৫৫, ১৭০

'শকুন্তলা' ২৪৫, ৩০৬, ৩৫০
—অভিনয় ৩৬৩
শঙ্করীপ্রসাদ বসু ১১৬
শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮, ৩০১, ৩০২, ৩১৫
'শব্দাম্বুধি' ২২৪
শম্ভুচন্দ্র পাল ২৩০
শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন ১৪৭
শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১১৮, ২২৬, ২২৯-৩০, ৩১৭, ৩৫২

শম্ভুনাথ পণ্ডিত ৪৭, ৯৫, ১১৭, ১১৯, ১৫২, ২২৪, ২২৮, ২৬১
শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় ৩৭
শম্ভুনাথ সরকার ১০১
শরচ্চন্দ্র দাশ ১৩৫
শরচ্চন্দ্র দেব, শিল্পী ৩৫৮
—"কলিকাতার ইতিহাস" ৩৬৮
'শর্মিষ্ঠা' ৯৮, ৩৩৬, ৩৬৩
শশধর বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৮
শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় ৪১
শশীচন্দ্র দত্ত ৩১৪, ৩১৫
—"দি রিপাবলিক অব ওড়িশা : অ্যানালস ফ্রম দি পেজেস অব টুয়েণ্টিয়েথ সেঞ্চুরি" ৩১৪
শশীজীবন ভট্টাচার্য ২৫৯
শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪২
শশীশেখর ভট্টাচার্য ২২০
'শহীদ সিধুমুর্মুর জবানবন্দী' ২৬৬
শাকবার্গ, মেজর ২৬৭
'শারদীয় রানার ১৪০০' ২৬৬
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রের তুলনামূলক তালিকা ২৫৮
শিক্ষা সংসদ ৯৮, ১০৩, ১১৮, ১৪৬, ১৪৯, ২৩২, ২৪৯
শিবচন্দ্র কর্মকার ৩৮
শিবচন্দ্র দেব ২৭, ১৪৩, ১৯০, ২৯১
—সিপাহী বিদ্রোহের পক্ষে মতপ্রকাশে সরকারের কৈফিয়ৎ তলব ৩২৫
শিবচন্দ্র নন্দী ১৫০
শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০
শিবচন্দ্র মল্লিক ১৫২
শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৬
শিবনাথ শাস্ত্রী ৩০, ৫৬, ৭১, ১০১, ১০৮, ২০৫, ২৭২, ২৭৬-৭৭, ২৮৮, ৩৩৭, ৩৫৬
শিবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ১৯, ২২
শিবনারায়ণ বসু ৫১
শিবলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৫৬
'শিল্পপুষ্পাঞ্জলি' (চারুকলা বিষয়ে প্রথম মাসিক পত্রিকা) ৩৫৬, ৩৬৮
'শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী সভা' ২৩৮, ২৪৬, ২৫১
—র উদ্যোগে শিল্প বিদ্যালয়ের ক্লাস ২৫৩
শিশিরকুমার ঘোষ ৪২
শিশিরকুমার দাশ ১১৪, ২৯৮-৯৯
'শিশুপাল বধ' ৩১৬
'শিশুবোধক' ৬৪
'শিশুশিক্ষা' ৩৫৯
শীতলকান্ত চট্টোপাধ্যায় ২৮৭
শীল্‌স কলেজ ৬৯-৭০
শীল্‌স ফ্রি কলেজ ৮৪, ২৩০
শুকদেব রায় ২০
শেক্‌সপীয়র ১৮২, ২২৩
"শেক্‌সপীয়র এবং নিউটন—উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?" ৩১৪
শেলী ১৮০
শোভাবাজার রাজবাড়ি ৮৬
শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ৪২, ৩২৭
—'ভিকটোরিয়া গীতিমালা' ৩২৭
শ্যামনাথ রায়চৌধুরী ২৫৯
শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুল ২৫৮
শ্যামলী চক্রবর্তী ১৬০, ২১৯, ২২০
শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ৩৩, ১৫৬, ২২৪
শ্যামাচরণ ঘোষ ১৯১
শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় ১৯, ২৩, ৭৮, ১১২, ১২২
শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ ৭২
শ্যামাচরণ দত্ত ৩৪
শ্যামাচরণ বসু ১০২
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় ১৫২
শ্যামাচরণ মুস্তাফী ১৪৪
শ্যামাচরণ লাহা ৩৫
শ্যামাচরণ সরকার ৬১, ১০৯
শ্যামাচরণ সেন ৪৫, ৭২, ২৬৭
শ্যামানন্দ গুপ্ত ৩০৮
শ্যালা, জর্জ ৩৫৩
'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ১৬০
শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৭০
শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ ২১৯
শ্রীধর কথক ১৪৩
শ্রীনন্দ ভট্টাচার্য ১২১

শ্রীনাথ চন্দ্র ১৫১
শ্রীনাথ দাস ২৩২
শ্রীনাথ পাল ১২৫
শ্রীনাথ ভট্টাচার্য ১২১
শ্রীনাথ রায় ৩৭
শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় ৩০৮
শ্রীমদ্ গোপাল ভট্ট ৮৮
'শ্রীমদ্ভাগবত' (বেদব্যাসের) ২৫৮
'শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা' ১১৬
শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায় ৩৬৬
শ্রীরাম শিরোমণি ২১৮-১৯
শ্রীরামপুর কলেজ ১৭, ৯৬
শ্রীরামপুর কলেজিয়েট স্কুল ৯৬
শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ২৬৭, ২৯৬
শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ৭৭, ১৮২
শ্রীশ্রী মা সারদামণি ২৩৫

'সংবাদ জ্ঞানোদয়' ১৫২
'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' ২৭, ৪৭, ১৪৮, ১৫৫, ১৭৩, ২৫৭
সংবাদপত্রের উপর থেকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ রদ ৩৬১
—বিষয়ে 'সংবাদ প্রভাকর'
'সংবাদ প্রভাকর' ১৮, ৩৭, ৪৩, ১০৮, ১১২, ১১৯, ১৩৪, ১৪৪, ১৫৩, ১৬৫, ১৭৩-৭৬, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৬, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৭-২১০, (বিশেষ মাসিক সংস্করণ) ২২২, ২২৭-২৮, ২৩০, ২৩৫, ৩৭, ২৩৮-৩৯, ২৪৮, ২৫৯, ২৬০, ২৬২, ২৭৫, ২৮১, ২৮৫, ২৯১, ২৯২, ২৯৪, ৩০০, ৩০৭-০৯, ৩১৮, ৩৩১, ৩৩৪, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৫৩, ৩৫৫, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬৫, ৩৬৮
—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্যবর্গের কবিতা ছাপানোর অনুরোধ পত্র ৩০৮
—অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটক, অভিনয়ের সমালোচনা ৩২২
-এ রা . ন্দনার কবিতা ৩২৬
'সংবাদবৰ্দ্ধমান' ১৪৭
'সংবাদবর্ধমান জ্ঞানপ্রদায়িনী' ১৩৭
'সংবাদ বিভাকর' ১৯০, ১৯৩
'সংবাদ ভাস্কর' ৩৭, ৩৯, ১৩২, ১৩৫, ১৪৯
'সংবাদ মৃত্যুঞ্জয়ী' ২৬
'সংবাদ রত্নাবলী' ১১২
'সংবাদ রসমুদ্গর' ১৩৫
'সংবাদ রসরত্নাকর' ১৩৭
'সংবাদ রসরাজ' ৩৯, ১৩৫
'সংবাদ রসসাগর' ১৩৩
'সংবাদ শশধর' ১৯০
'সংবাদ সাগর' ১৩৩, ২৩৭
'সংবাদ সাধুরঞ্জন' ১১২, ১৯৫, ২০৪, ২১১
'সংবাদ সুধাংশু' ১৪৭, ১৪৯, ১৫৪, ১৬৯
সংস্কৃত কলেজ ১৭, ২৬, ২৯, ৩৫, ৪১, ৪৩, ৪৮, ৪৯, (সংস্কৃত কলেজের প্রশংসাপত্র বিদ্যাসাগরকে) ৪৯-৫০, ৫২, ৬১, ৮৭, ৯৬, ৯৯, ১০১, ১০৩, ১০৮, ১০৯, ১১৩, ১১৭, ১৩৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৯১, ১৯৩, ২১৫, ২১৮, ২৩১-৩২, ২৪৮, ২৪৯, ২৫৩, ২৬২, ২৬৪, ২৬৮, ২৯৫, ৩৫৩, ৩৭১
সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণ ৮৮
'সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটারী' ১০৬
'সখা' ৭৭, ১০৮
'সজ্জন তোষণী' পত্রিকা ৩৪
সঞ্জীবচন্দ্র [সঞ্জীবন] চট্টোপাধ্যায় ১৯, ২৩, ৬৩, ৭৬, ৭৭, ৭৮, (কাঁঠালপাড়ায়) ১১১, ১২৩, ১২৫, ২৪২, ২৭৬-৭৭, ২৮৫
'সঞ্জীবনী' ১৯০, ১৯৪
'সঞ্জীবনীসুধা' ৯, ৭৬, ১৮৭, ২৮৫
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৮২
সতীদাহ প্রথা ৪৯
সত্যচরণ ঘোষাল ৬৮, ৯১, ৯২, ১৫৬, ২০৪
'সত্যধর্ম-প্রকাশিকা' ১৩৫
সত্যপীর ১৫৭
'সত্যপ্রদীপ' ১৪৬
সত্যব্রত তপাদার ৩৪২
'সত্যসঞ্চারিণী' ১০২
'সত্যার্ণব' ১৪৬
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫৪, ৫৬-৫৭, ৮২, ৯৭, ১৪৭, ২৯৭, ৩০৭, ৩১৫
সদাশিব তর্কপঞ্চানন ১২১

সন্তোষকুমার অধিকারী ৬
সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ২৫
'সমকালে বিদ্যাসাগর' ১০৬
'সমবায় হিন্দুস্থানী' পত্রিকা ৩৬
সমাচার চন্দ্রিকা ৩২০
—অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকের সমালোচনা
'সমাচার জ্ঞানদর্পণ' ১০৩
'সমাচার দর্পণ' ৫৩. ৫৫, ১৭৫-৭৬, ১৮৪, ২১২
'সমাচার পত্রিকা' ১১৮
'সমাচার সভারাজেন্দ্র' ১০০
'সমাচার সুধাবর্ষণ' ২২৪, ২৬৭
(সাঁওতালবিদ্রোহের বিরোধিতায় কবিতা)
"সমাজবিজ্ঞানী জেমস লঙ" ৪৮
সমাজোন্নতিবিধায়িনী সুহৃদ সমিতি ২৫৪, ২৫৮, ৩১৯
'সমালোচনী' ৭৭
'সম্বাদ কৌমুদী' ১১৮
'সম্বাদ ভাস্কর' ২৬৭, ২৯২, ২৯৫, ৩২৬
সরকারি শিক্ষানীতির রিপোর্ট ৩৯
সরকারি শিক্ষা বিভাগ ১২০
সরোজিনী নাইডু ১৪৪
'সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা' ২২১
'সর্বতত্ত্বপ্রকাশিকা' ২৯৩, ২৯৪
'সর্বদর্শনসংগ্রহ' ২২৪
'সর্বশুভকরী' ১৪৭, ৩৬৯
সর্বসুন্দরী দেবী ৩৫৮
সর্বানন্দ ন্যায়বাগীশ ৪৩
'সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্র' ২৫৮
'সর্ব্বার্থ সংগ্রহ' ৮৯
সর্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ১৯
'সাংবাদিক কেশরী হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়' ২২৭
সাঁওতাল বিদ্রোহ ২৬৪, ২৬৫-৬৭
'সাগর ও সম্রাট' ৩৪৯
সাটক্লিফ, মি. ২২৪
সাতকড়ি দত্ত ৭২
সাতু সিংহ ৯৫
সাঁদারল্যান্ড ১২৫
'সাধনা' ১১১
'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' ২৯, ৩২, ৩৩, ৩৮, ৩৯, ৪৫, ৪৮, ৪৯, ৬৬, ৬৭
'সাধুরঞ্জন' ২৭৫
সাবিত্রী লাইব্রেরি ২৭১
'সাবিত্রী সত্যবান' ৩৫৩
'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র' ৩৭, ২৪৭
সারদাচরণ মিত্র ১২০
সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ২৮৯
সারদাসুন্দরী দেবী ৩৪, ৫৭
সারস্বত সমাজ ১১১
সালিভান, জন ৭২
সাঁ সুসি থিয়েটার ৮৬, ১১৯
'সাহিত্যসাধক চরিতমালা' ১০৫, ২৭২, ২৭৩, ২৭৫
সিধু মুর্মু ২৬৪, ২৬৭, ২৬৮ (ফাঁসি)
সিনক্লেয়ার, ডবলিউ. ৭৮, ৭৯
সিপাহী বিদ্রোহ ২৬৩, ২৮৩-৮৫, ৩১০-১৫, ৩৩৫, ৩৩৭, ৩৫১
—অবলম্বনে রচিত গ্রন্থের পাঁচ ভাগ : ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাজাত স্মৃতিচারণা, গল্প-উপন্যাস, নাটক ও কবিতা, চরিত কথা, ইতিহাস ৩১১-১২
—কলকাতা, বর্ধমান ও হুগলিতে চাঞ্চল্য ২৮৩-৮৫
—বহরমপুর ৩১৯-২০
—ব্যারাকপুর ৩২২-২৬
—মীরাট ৩২৪
সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার নিয়মকানুন ২৩২
সিম, এ. এইচ. ৪৪
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ৩০৩
সীতানাথ ঘোষ ১০০
সীতানাথ বসু ৮৬
'সীতার বনবাস' ৩৪৮
'সীতারাম' ২৩, ১২৭, ১৬২, ২২০
সুকান্ত ভট্টাচার্য ২৬৯
সুকুমার সেন ১৪৮, ২৫৭, ৩৫৬
সুধীরকুমার মিত্র ১২৮
'সুধীরঞ্জন' ২৪০, ২৪২, ২৭২
সুন্দরীমোহন দাস ৩৩৪
সুপ্রকাশ রায় ২৬৪
'সুবর্ণলেখা' ৩০৬, ৩৩৮
সুবোধিনী ৩৫৮

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১২০, ১৩২, ২১৭, ২৮৭
সুরেন্দ্র রায় ১৫০
সুরেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ২৯০
সুরেশচন্দ্র সিংহ ৩৪৪
'সুলভ পত্রিকা' ২৩১
সুশীলকুমার দে ২৫৭
'সুশীলার উপাখ্যান' ১৪৮
সুশোভন সরকার ২৯
সূর্যকান্ত আচার্যচৌধুরী ১৪৪
সূর্যকুমার চক্রবর্তী ৯০, ৯৯
সূর্যকুমার গুডিব চক্রবর্তী ১৯১, ২৪৬
সূর্যকুমার চট্টোপাধ্যায় ২৬৭
'সেকাল আর একাল' ২৫৮
'সেকালের কৃতী বাঙালী' ২২৯
'সেকালের শিক্ষাগুরু' ৩৫
'সে যুগের রাজকর্মচারী বঙ্কিমচন্দ্র' ৩৪২
সেণ্ট পল স্কুল ৪২
সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ ৮৪
সেফ, টি. আর. ৯০
সৈয়দ আমির আলী ১৩৪
'সোমপ্রকাশ' ১৬২-৬৩, ১৬৯, ৩৭১
—বিষয়ে 'এডুকেশন গেজেটে' ভূদেব মুখোপাধ্যায় ৩৭১
'সোসাইটি ফর দা অ্যাকুইজিশন অব জেনারেল নলেজ' ২৯-৩০
সৌদামিনী দেবী (দেবেন্দ্রনাথের কন্যা) ১০৮, ১৩৪, ২৮৯
—"পিতৃস্মৃতি" প্রবন্ধে সিপাহী বিদ্রোহ বিষয় ৩৩৩
সৌদামিনী দেবী (রাজেন্দ্রলাল মিত্রের স্ত্রী) ৩৬
স্কুল বুক সোসাইটি ১৭, ৪২, ৮৪, ১৪৮, ১৫২, ২২১
স্টকলার, মি. ৯৯
স্টরম্, জন ৪৮, ৪৯
স্টিফেনসন, রোনাল্ড ২৫০
স্টেইনার, জর্জ ৩০৫
স্টুয়ার্ট, ডানক ৩৩
স্তাঁদাল ৩০০
স্তেফান জাইগ ৩০০
স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ভাবনা ২৫২
স্পিড, জি. টি. ই. ৭০, ৭২
'স্পেক্টেটর' ২৬৮
স্পেন্ডার, স্টিফেন ২৯৮
স্বপন বসু ৯৫, ১০৫, ১০৬, ১২৪, ৩০৩, ৩১১, ৩২০
'স্বপ্নদর্শন' ৩৫৩
স্বরূপ খানসামা ১০৩
স্বরূপচন্দ্র দাস ৩৩৪
স্বর্ণকুমারী দেবী ২৯৪
"স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায়" ৩৩৭
স্মিথ, ওব্রায়ান ২৯৩, ৩৫৪

হজসন, মি. ২৫১
'হরকরা, স্যাটারডে ইভিনিংস' ৩১৪
হরকুমার ঠাকুর ৬৯
হরচন্দ্র ঘোষ ১২৫, ১৬৫, ১৯০, ২২৩, ২৪৬, ২৮১-৮২, ৩৪৪
হরচন্দ্র দত্ত ১৯১, ১৯২, ২২২, ২৫৭, ২৬৭, ২৮৮
হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন ১০৮
হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৭
হরচন্দ্র ভট্টাচার্য ২৬
হরনাথ তর্কভূষণ ২৬, ৮৪, ৮৮
'হরপ্রসাদ রচনা সংগ্রহ' ২৭৮
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ২০, ৯৩, ১০৬, ১২১, ১৬০, ১৬৪, ১৮৩, ২১৯, ২৩৫, ২৫২, ২৬১, ২৭১, ২৭৮
হরমোহন চট্টোপাধ্যায় ৪৩, ২৪৬, ৩৫৮
হরমোহন দত্ত ৪৫
হরলাল রায় ৪২
হরানন্দ ভট্টাচার্য ১০৮
হরিচন্দ্র রায় ৮৪
হরিনারায়ণ ঘোষ ১১১
হরিপদ মণ্ডল ৭৮-৭৯
'হরিভক্তি বিলাস' ৮৮
হরিমোহন গোস্বামী ১০৯
হরিমোহন ঘোষ ৩৭, ৪২
হরিমোহন সেন ৬৮, ৭০, ৭২, ৮৬, ৯১, ৯২, ১৫৫, ২২৯
হরিরাম গঙ্গোপাধ্যায় ৩৩
হরিশচন্দ্র মিত্র ২৮

হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮ , ২৫৪, ২৬৫, ৩২৫, ৩২৭, ৩৫১, ৩৬৫
-এর 'পলিসি ফর দা টাইম' ৩৩১-৩২
'হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনী' ২২৭
হরিহর শেঠ ২৮২
হরু ঠাকুর ১৪৩, ২২২
"হরে মুরারে মধুকৈটভারে" ১১৪, ১৫৯, ১৬৪
হলধর তর্কচূড়ামণি ১১৫, ১১৬, ২১৮
হাউস অফ কমন্স ৪৯
হাওড়া স্কুল ১৩৬
হারাধন দত্ত ৩৫
হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৪৪
হার্ডিঞ্জ, লর্ড ৮৬, ৮৭, ৮৯, ৯৬, (স্মৃতিস্থাপন সভা) ১১১, ১১৮
হিউম, জেমস ১১১, ১২১, ৩১৭, ৩১৮, ৩২২, ৩৫৩, ৩৫৮, ৩৬০
'হিতৈষিণী পত্রিকা' ৩৬১
হিতৈষিণী সভা ৩৬১
'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সিয়ার' ১০৪, ১০৭, ১৩২, ২১২, ২২৫, ২২৬, ২৫৯, ২৬৬, ৩০৪
—রাজরোষে বন্ধ ৩২৬
হিন্দু কলেজ ১৭, ২৬, ২৭, ২৮, ৩০, ৩৩, ৩৫, ৪২, ৪৩, ৪৬, ৪৭, ৫১, ৫২, ৫৭, ৫৯, ৬২, ৬৫, ৬৬, ৮৩, ৮৯, ৯৮, ১০২, ১০৬, ১১৪, ১১৮, ১৩৫, ১৩৭, ১৪৬, ১৪৭, ১৯৮, ২১৭, ২২২-২৩, ২২৪, ২২৫ (হেমচন্দ্রের ছাত্রকালে শিক্ষকগণ), ২২৭, ২২৯, ২৩০, ২৩৩, ২৪৫, ২৪৭, ২৬৪, ৩৪৪
'হিন্দু ক্রনিকল' ১৫২-৫৩
হিন্দু থিও-ফিলানথ্রপিক সোসাইটি ৬৮
'হিন্দুধর্মচন্দ্রোদয়' ১০৯
'হিন্দু পেট্রিয়ট' ১০৪, ২২৫-২৭, ২৫৯, ২৬১, ২৬৫, ৩২০-২১, ৩৩৪, ৩৫২, ৩৬৬
—অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকের সমালোচনা
-এ "দি গভর্নমেন্ট অ্যান্ড এডুকেটেড নেটিভস" ৩২৭
-এ "ইয়ং বেঙ্গলস ভিউ অব দ্য মিউটিনি" ৩২৭
—অস্ত্র-শস্ত্র রেজিস্ট্রি আইন বিষয়ক ৩২৭-২৮
—সিপাহি বিদ্রোহ দমনে প্রশাসন বিষয়ে ৩৩১-৩২
হিন্দু ফ্রি স্কুল ৩৬
'হিন্দু বন্ধু' ১১০
হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়, কলকাতা ১৩৪
হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ ২২৯-৩০, ২৩৪, ২৪৫
-এর সভায় সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে আনুগত্য প্রকাশ ৩২৪-২৫
হিন্দুমেলা ৪১
হিন্দু ল কমিটি ৩৭
হিন্দু স্কুল ২৫৭, ২৬৪
'হিন্দু হরবিঙ্গার' ২২৫
'হিন্দু হিতার্থী' বিদ্যালয় ৯১, ৯৫, ৯৮, ১০৬
'হিন্দু হিতৈষী' ৯৮
'হিস্ট্রি অব রোম' ২৪৫
'হিস্ট্রি অব হুগলি কলেজ' ২৮১-৮২
হীরা বুলবুল ২২৯
হীরালাল শীল ৬৯
হুগলি ইনফ্যান্ট স্কুল ২৮, ১৫১
হুগলি কলেজ ১৮, ২৮, ৬৫, ৭৬, ১১১, ১১২, ১১৪, ১১৫, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১৪২, ১৬৫, ১৭২, ১৮৬-৮৭, ১৯৯, ২১২, (হেড মাস্টারের তালিকা) ২১৩, ২৪৩, ২৪৪, ২৮০
"হুগলি কলেজ ও বঙ্কিমচন্দ্র" ২৮২
হুগলি কলেজ ও মুসলমান সমাজের প্রতিক্রিয়া ১২৪
হুগলি কলেজ লাইব্রেরি ১৭৮
হুগলি কলেজ শতবার্ষিকী ২৮২
'হুগলি জেলার ইতিহাস' ১২৮
হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুল ২৮
"হুতোম প্যাঁচার নকসা" ৩৩৭
হুতোম প্যাঁচার বর্ণনায় অস্ত্র-শস্ত্র রেজিস্ট্রি আইন বিষয়ে ৩২৮-৩২৯
হৃষিকেশ লাহা ১৯২
হেন্ডারসন, ক্যাপটেন ১০২
হেন্ডারসন, মেজর ১৪২

'হেমচন্দ্র' ২২৪-২৫, ৩১৭
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪, ৩১, ৩৩, ২২৪, ২৫৭, ২৭১, ২৯৫, ৩০৭, ৩১৬
হেমেন্দ্রকুমার রায় ১২৮
হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৮৫
হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ২৪, ৭৭, ৭৮, ১২২, ১৮১
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ২৯০
হেয়ার, ডেভিড ২৭, ৩০, ৩১, ৩৩, ৩৬, ৩৮, ৫৬, ৫৭ (মৃত্যু), ৫৮ (শোকসভা, মার্বেল স্ট্যাচুর জন্য অর্থসংগ্রহ), ৫৯ (প্রতিমূর্তি স্থাপন), ৭৩, (মূর্তি) ৯১, (দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী সভা) ৮৫, (তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী) ৯২, ১০৪, (মূর্তি) ১০৮, (পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী সভা) ১১০, (মূর্তি প্রেসিডেন্সি কলেজের মাঠে) ১১০, (ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী) ১১৮, (সপ্তম মৃত্যুবার্ষিকী) ১৩৫, ১৩৯, (অষ্টম মৃত্যুবার্ষিকী) ১৪৬
হেয়ার প্রাইজ ফান্ড ৮৬
হেয়ার মেমোরিয়াল কমিটি ৫৮
হেয়ার স্কুল ২৬, ২৯, ৪২, ২১৭
হেয়ার স্মৃতিরক্ষা সভা ৯৯
হেস, ক্যাপটেন ১৫১
হ্যাম্পটন, এফ. আর. ১১৮
হ্যালিডে, ফ্রেডারিক ১১১, ১৯৩, ২৩২-৩৩, ২৪৮, ২৪৯, ২৫৪, ৩৩৪, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৬২, ৩৬৭

'A few remarks on certain Draft Acts, commonly called Black Acts' ২৩২
Abul Fazl's Ayin-i-Akbari ১৩৯
'A Treatise on flowers and Flower gardern' ১৭৬
'A Vision' ১১৫

'Bengali Drama and Stage' ৩১৯
"Bengali Literature" ১৫৯-৬০
Bishops College ১১১
Boswell's life of Johnson ১৩৯
Boyle, Henri ৩০০

Calcutta Printing and Publishing Co. ৩৫৩
'Causes of Mutiny by a Hindu of Bengal' ৩১৭
'Calcutta Star' Extra-ordinary ১০৩
Charter Act : ১৮৩৩ ৭২
Cowper ৩৪৮
Crabbe ৩৪৮

'Edinburgh Review' ৩৪৮
Education Despatch 1854 ১৬৬-৬৭
Enlightened education ৮৭
'Eurasian' ১৩১

'Folk Tales of Bengal' ২৯৫

Hare. David ২৪
Hickely. Captain ১৩৬
'Hindu Charitable Institution' ৯৮
History of Hoogly College ১৬৫, ১৭৮-৭৯

'Inquirer' ১৬৯

Kalidasa ৩০৬
Kerr. P.J. ৫৯, ২৪৩

'Letters and Journals of Lord Byron' ২৭-২৮

Niharranjan Ray ৩৩৯

Outline History of Bengal ১১৭
Ovid ১০৬

'Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar ৩০৬
Pope ১০৬

'Reformer' ১৬৯
'Rijia' নাটক ১৩১

'Selections from the British Poets' ১৭৬, ১৮০
'Sentiment Proper to the Age and Country' ২৯৫

Shakespeare ১০৬
Sisir Kumar Das
—'The Artist in Chains' ৩০৩

'The Formative Years'/ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ ৩৯
Thwaytes. Mr. ২১২
'The Captive Ladie' ১৩৩
"The Late Bankim Chandra Chatterji" ২৭৮

United National Church of Bengal ৯৯

Ure. Mr. ১৫০

'Visions of the Past' ১৩৩

Wilson, Horace ১০৬
Woodruff. Philip
-'The Men who Ruled India' ৩১০
Wordsworth ৩৪৮

Young. A. R. ৩৪৩

Zachariah. K. ১৬৫, ১৭৮-৭৯